হিন্দুর নব জাগরণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সহকারী সভাপতি—

জাতিভেদ আদি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও বঙ্গবিখ্যাত সমাজসংস্কারক—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রী[illegible] বেদশাস্ত্রী

প্রচার মন্ত্রী, আর্য্যসমাজ।

১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ ২২০০

কলিকাতা

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত]

[মূল্য ॥০ আট আনা

উৎসর্গ-পত্র

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলভূষণ, সমাজ-জননী ও মাতার সুপুত্র—
বংশের গৌরব, সমাজ ও সাহিত্যসেবীর পরম বান্ধব—
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ নস্কর দেব-বর্ম্মার
শ্রীকরকমলেষু—

প্রিয় ভ্রাতঃ! স্বর্গগত মহাপ্রাণ সুহৃৎ মহেন্দ্রনাথ করণ ভ্রাতার পত্রে আপনার স্বজাতি হিতৈষণা, মহানুভাবতা, উদারতা, মনস্বিতা ও স্বজাতি-কল্যাণ সাধনার্থ অকাতরে অর্থদান স্পৃহার কথা সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। যখন সাক্ষাতে আপনাকে দেখিলাম—তখন বুঝিলাম মহেন্দ্রবাবুর উক্তিগুলি একটুকুও অতিরঞ্জিত নহে, উহা বর্ণে বর্ণে সত্য। লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন নীরব—নিঃস্বার্থ, প্রশংসায় উদাসীন মহাপ্রাণ সমাজসেবক জীবনে বেশী দেখি নাই। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-জাতির বিস্তৃত ইতিবৃত্ত "কুল প্রদীপ", "ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বনাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়" প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থপ্রচারে আপনি সহস্রাধিক টাকা দান করিয়া সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন ও জাতির পরমোপকারী বান্ধব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। মদীয় মাতৃদেবীর গঙ্গাবাসের নিমিত্ত "মাতৃ-মন্দির—বরদা ভবন" নির্ম্মাণে এবং কল্যাণপুরের (ডায়মণ্ড হারবার লাইনের বারুইপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেসন) "দলিতোদ্ধার আশ্রম"

অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিবার শক্তিও আছে—কেবল মাত্র উহা প্রয়োগের সাহস নাই। অন্ধ সংস্কার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহের ভাব ধুমাইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আগুন জ্বলে নাই। জ্বলিয়া উঠিবার জন্য একটা প্রবল বাতাস মাত্র চাই। অত্যাচারী আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আত্মরক্ষায় নিরাশ হইয়াছে, প্রথম আঘাতেই যে তাহার পরাজয়—সে সম্বন্ধে সে-ও নিশ্চিত, কিন্তু, আঘাত এখনও আসে নাই। ভাব সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। এই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যই 'হিন্দুর নব জাগরণের' প্রকাশ আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

লাঞ্ছনা ও অপমানের চাপে যাহাদের মনুষ্যত্ব আজ ভূলুণ্ঠিত, সেই সকল অবজ্ঞাত হিন্দু সন্তানগণের উত্থানের পথে তাহাদের নিজ নিজ জন্মগত সংস্কারই সব চেয়ে বড় বাধা। অদৃষ্ট, শাস্ত্র ও দেশাচার—এই তিনটী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। ললাটে যাহা লেখা আছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই, আমারই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফলে আমি আজ নীচ জাতির ঘরে জন্মিয়াছি, এ জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আর এই জন্য এই অপমানের মধ্যেই কাটাইতে হইবে ; যদি এ জন্মে সৎকার্য্য করিতে পারি তবে পরজন্মে উচ্চজাতিতে জন্ম-গ্রহণের সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা আছে—এই প্রকারের চিন্তা সকল শ্রেণীর নরনারীর অস্থি মজ্জায় জড়াইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে যাহারা ছোট জাতি হিসাবে দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে অপমানের কষাঘাতে জর্জ্জরিত, তাহারা প্রকৃত অত্যাচারীর প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত অপরাধ ও ভগবানের ন্যায় দণ্ডের দোহাই দিয়া নীরবে শান্ত-ভাবে সব সহ্য করিয়া যাইতেছে। যাঁহারা অত্যাচারী, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অত্যাচার করিবার পাশ পাইয়াছেন—এইরূপ ভাবিয়া বিবেকের

নিষেধাজ্ঞার প্রতি বধির হইয়া আছেন। যে চতুর ব্যক্তিগণ এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষার বিষময় ফল আজ সমাজকে পঙ্গু ও হতচেতন করিয়া রাখিয়াছে। অত্যাচারিতের মধ্যে অত্যাচার প্রতিরোধের মনোভাব যখন নষ্ট হইয়া যায়—তখনই তাহার ষোল আনা অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অদৃষ্টের চাপ হইতে জাতিকে মুক্তি দিতে হইবে। আজ জাতিকে শিক্ষা দিতে হইবে—"ভগবান তোমাকে হাড়ি, ডোম, ধোপা, নাপিত, মুচী, মেথর অস্পৃশ্য বা ঘৃণিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই,—এজন্য দায়ী সমাজ-ব্যবস্থা। ভগবান তোমাকে মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধনী, গুনী দশজনকেও মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

দ্বিতীয় বাধা শাস্ত্র। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা অনেক কিছু অবিচার করিয়া থাকি এবং অনেক কিছু অত্যাচার সহিয়া থাকি। শাস্ত্রের নামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশ, কাল পাত্রের প্রয়োজনীয়তা অথবা স্বার্থ সাধনের জন্য এতকিছু অশাস্ত্র চালাইয়া গিয়াছেন যে, আজ ঐ তথাকথিত শাস্ত্র আমাদের অনেক অনাচার অনুষ্ঠানের বিধি (License) দিতেছে। বাস্তবিক যাহা সার্ব্বভৌম সার্ব্বজনীক শাস্ত্র, যাহা ঋষিদের তপস্যা-লব্ধ সত্য, তাহা ভুলিয়া আজ আমরা ঋষিদের অথবা বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া ষোড়শ শতাব্দীর স্বার্থান্ধ গর্ব্বিত মনুষ্যত্বের মহাশত্রু কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত ২১৪টী শ্লোক তুলিয়া উহাই শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দ মনে অত্যাচার করিতেছি এবং নিরুপায় ভাবিয়া নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই —শাস্ত্রের একচেটীয়া অধিকারী ব্রাহ্মণগণ যাহাদিগকে শাস্ত্রপাঠের ও শাস্ত্র-জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন তাহারাই পদে পদে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ খুঁজিতে ঐ সকল ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতেছেন।

আজ শিক্ষা দিতে হইবে, যে শাস্ত্র পাঠে আমার অধিকার নাই, সে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধেরও আমার উপর কোনও অধিকার নাই। যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্র পাঠে মানুষের পাপ হয় বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী,—যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ অথবা অশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া চালাইতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের মহাশত্রু, তাঁহাদের ক্ষমতার অবসান করিতে হইবে, নতুবা মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ মুক্ত হইবে না।

তৃতীয় বাধা দেশাচার ও লোকাচার। যে বিধি নিষেধ আজ সমাজে বর্ত্তমান আছে, যে ব্যবস্থা চলিতেছে—তাহাই পালনীয়। তাহা পরিবর্ত্তন করা অনুচিত। এই যে বিশ্বাস, ইহা মানুষের ক্রমোন্নতির পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক। এই বিশ্বাস কে অবিলম্বে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করা প্রয়োজন। যে বিধি নিষেধ মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী, তাহার পরিবর্ত্তন না করাই অপরাধ। যে বিধি নিষেধ আমার উন্নতি ও মঙ্গলের সহায়ক —তাহা রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। দেশাচারকে এই বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যাহা বর্জ্জন করা প্রয়োজন, তাহা নির্ভয়ে বর্জ্জন করিতে হইবে; যাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। দেশাচার ও লোকাচারের সনাতনত্ব ধ্বংস করিতে না পারিলে জাতির জয়যাত্রা অসম্ভব।

মানুষের মনে ষোল আনা মনুষ্যত্বের অভিমান জাগ্রত করিতে হইলে তাহাকে এই অদৃষ্ট, শাস্ত্র ও দেশাচারের ভ্রান্ত সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমি মানুষ, আমারই হাতে আমার মান অপমান, জয় পরাজয়,—আমি অপমানের অবসান করিব, আমিই স্বশক্তিতে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করিব—এই উচ্চভাব, ইহা সমগ্র নরনারীর প্রাণে সিঞ্চন করিতে হইবে। আমার দেশে, আমার সমাজে এমন দিন আমাকে আনিতেই হইবে—যখন আমার সমুদয় অসম্মান, সমুদয় লাঞ্ছনা

ও সমুদয় অবিচার বিলুপ্ত হইবে। কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এই যে সংগ্রাম ইহাই জীবন,—ইহাতেই জীবনের সার্থকতা।

বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনার স্তূপ ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে—এমন বিশ্বাস আমার নাই। যেরূপ ধীর গতিতে ক্রমোন্নতি চলিতেছে, ইহার উপর নির্ভর করিতে হইলে সমাজের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই মুসলমান ও খৃষ্টানগণের প্রচারের ফলে এই সমাজই হয় ত বিলুপ্ত হইবে। কাজেই সংস্কারের গতি দ্রুততর করিতে হইবে। বিরাট ঝঞ্ঝা, বন্যা ও বিপ্লবের বহ্নিশিখার মধ্যেই পুঞ্জীভূত দুর্নীতির অবসান হইবে।

ভারত আজ নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। তার আগমনীর সঙ্গীত আজ বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদেরই সম্মুখে আমাদের অলক্ষ্যে ইহা ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে—আমরা প্রাণে প্রাণে তার সাড়া পাইতেছি—তার স্পন্দন অনুভব করিতেছি। নবীন ভারত, বসন্তের শিশির-স্নাত স্নিগ্ধোজ্জ্বল উষার মত আমাদের সমগ্র জীবনকে রঙ্গীন করিয়া প্রকাশ পাইবে। আমরা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার কি আয়োজন করিতেছি? গৃহে গৃহে আশার দীপমালা জ্বালিয়া দাও, প্রাণে প্রাণে আনন্দের শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠুক। বিকসিত-হৃদয়-পদ্মে তাঁর চরণের অর্ঘ্য সাজাও। আজ সত্য, প্রেম ও ভক্তির সম্ভারে তাঁর বরণ-ডালা সজ্জিত কর।

এই জন্মোৎসবের মহাযজ্ঞের যাঁহারা পুরোহিত—গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। 'হিন্দুর নব জাগরণ' তাঁর আহ্বানের মহামন্ত্র বহন করিয়া বাংলার দুয়ারে উপস্থিত।

হিন্দুমিশন,
কালিঘাট, কলিকাতা
২৩-৭-৩১

স্বামী সত্যানন্দ

গ্রন্থকারের নিবেদন

"হিন্দুর নব জাগরণ" প্রকাশিত হইল। আমার "বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়" প্রমুখ কতকগুলি পুস্তিকা ও অধুনা প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সারাংশ লইয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। দিন দিন আমার গ্রন্থাবলী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর আসাম ও ব্রহ্মদেশে সুপ্রচারিত ও আদৃত হইতেছে। এখানাও পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিলে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। যাঁহারা এখনও অধম শূদ্র হইয়া—সমাজে হীন জীবন যাপন করিতেছেন—তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে নবালোক ও নবজীবন লাভ করিবেন এবং আশা করি শূদ্রোচিত হীন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজোচিত শ্রেষ্ঠ সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক জাতি-কুল—বংশের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবেন।

দাসত্ব ব্যবসা উচ্ছেদকারী আমেরিকার মহাপ্রাণ মানব-সেবক থিয়োডোর পার্কার একই কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার বক্তৃতায় বলিতেন। তিনি মনে করিতেন পুনঃ পুনঃ ফুৎকারে বিন্দু পরিমাণ অগ্নিকণা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া প্রবল আকার ধারণ পূর্ব্বক নগর জনপদ ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ একই কথা পুনঃ পুনঃ ফুৎকাররূপে কাণে ও প্রাণের কাছে অনবরত শুনাইতে পারিলে দলিত মানবের অন্তরস্থ সুপ্ত ভাব-বহ্নি-কণা খাণ্ডববন দগ্ধকারী বিরাট দাবাগ্নি আকার ধারণ করিয়া যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কাররাশি ভস্মীভূত করিতে বিলম্ব করে না। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রচার ব্যপদেশে ইহার সত্যতা বিশেষভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। একারণ এই পুস্তকেও একই গুরুতর অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিষয়গুলি বার বার উল্লেখ করিয়া উহার আশু

প্রতিকারের নিমিত্ত পাঠকগণের বিবেকবুদ্ধি উদ্বোধিত ও তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য কেহ বিরক্ত না হইয়া বরং সেই সব অবিচারগুলির সত্বর প্রতিকারার্থ অগ্রসর হইবেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রণয়ণে স্বর্গগত বান্ধব মহেন্দ্রনাথ করণ ভ্রাতার লিখিত "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ" হইতে মাঝে মাঝে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। পরিশেষে নিবেদন, এই পুস্তক যাঁহাদিগের ভাল লাগিবে এবং সমাজের উপকারজনক বলিয়া বোধ হইবে,—তাঁহারা যেন আপনাপন সমাজ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হন, ইহাই অনুরোধ। হিন্দুমিশনের স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ অনুগ্রহ পূর্ব্বক 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমি এই পুস্তকে যে সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি তাহার সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজ জীবনে পদে পদে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত অত্যাচার অবিচার দূরীকরণের নিমিত্ত জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার এই মূল্যবান্ ভূমিকা পাঠে দলিত ও দলনকারী উভয় শ্রেণীই তুল্যরূপে কল্যাণের প্রকৃত পন্থা দেখিতে পাইবেন।

বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের মূল্য যথোচিত সুলভ করা হইল। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩৩৮

হিন্দুর নব জাগরণ

প্রথম অধ্যায়

নব জাগরণ।

ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। শত শত শতাব্দীর পদদলিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জাতি সকল শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্যাগী কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, মনীষীবর্গ দেশে দেশে নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার মৃতসঞ্জীবনী বাণী প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন "—ভাই সব উঠ, জাগ জন্মভূমির বন্ধন মোচন করিতে সকলে একত্র হও, এক সাম্য মন্ত্রের পতাকা তলে সকলে সমবেত হও। মাতৃভূমির সেবায় উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, দ্বিজ চণ্ডাল—সকলেরই সমান অধিকার—ভারত জননীর কোন সন্তান—সে সামাজিক হিসাবে যত ছোট হউক না কেন—অস্পৃশ্য থাকিবে না। পতিতপাবন, অধমতারণ শ্রীভগবান এবার সকলকে ডাক দিয়াছেন। পিতা মাতার কাছে সব সন্তানই সমান, সকলেই তুল্য স্নেহের অধিকারী, এস কে আছ দীন, কে আছ পতিত, কে আছ অনাদৃত, কে আছ অবজ্ঞাত ; এস কে আছ ছোট, কে আছ অস্পৃশ্য, জননী তোমাদের ডাকিতেছেন, সকলে—ভারতের সমস্ত জাতি সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে, শৃঙ্খল মোচন হইবে না—

ভারতের উদ্ধার হইবে না। আমরা সকলকেই চাই। কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না, ভারত আচণ্ডালের। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমের পূত-মন্দাকিনীধারা সারা দেশের মধ্য দিয়া বন্যার আকারে প্রবাহিত হইতেছে। জাতিহিংসা, জাতিগর্ব্ব জাত্যভিমান—অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সে প্রবল বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে। ভারতের কেহই আর অস্পৃশ্য অনাচরণীয় থাকিবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান তাঁহার পতিত সন্তানগণকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছেন, তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন, কত দীন হীনের নয়ন জল মুছাইয়া দিয়াছেন। কেহই নিরাশ প্রাণে বসিয়া থাকিও না, আমরা তোমাদের সকলকেই চাই, জননীর পূজার মন্দিরে সকলেরই সমান অধিকার, এখানে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের, উচ্চ নীচের, দ্বিজ চণ্ডালের বিচার নাই, প্রশ্ন নাই।"

এই সব আশার বাণী, জাগরণের উদ্বোধন মন্ত্র দীনতম সমাজের চিরবধির কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে। নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার আশ্বাস-বাণীও এ জাতির কর্ণে দেববাণীর ন্যায় পৌঁছিয়াছে। "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন" স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় ইহা মহাত্মাজীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া ভারতের সমুদয় স্বাধীনতাকামী নেতৃগণ এবং ভারতজননীর স্বয়ং-সেবকগণ এই পাপ প্রথা দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, এবং শুধু কথায় নহে, তাঁহারা স্বীয় আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করিতেছেন। এই জাতীয় জাগরণের মহা সুযোগে আমরা আমাদের বঙ্গদেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নিরাশা পরিত্যাগ করিয়া, যুগযুগান্তের মোহ জড়তা পরিহারপূর্ব্বক জাগিয়া উঠিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এ যুগে কেহই অন্ধ হীন অধমের মত সমাজের পদতলে পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে। সকলের—চির অবজ্ঞাত চির ঘৃণ্য জাতি সমূহের কর্ণে জাগরণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি পৌঁছিয়াছে।

বিরাট হিন্দুজাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কিসে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়, কিসে আত্মসম্মান রক্ষিত হয় এবং প্রত্যেকের প্রাণে আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হয়, কিসে হিন্দু সমাজের নিকট হইতে আপনাদের ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতে পারা যায়—কিসে সমাজস্থ প্রত্যেক নরনারীর মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় এই কথা লইয়া—সকল স্থানে—হাটে বাজারে পথে ঘাটে গোঠে মাঠে সহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আন্দোলনাদি চলিতেছে। সব সমাজেই সামাজিক সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, সব সমাজ হইতে জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। সকল সম্প্রদায় হইতেই পুথি পুস্তিকা প্রচারিত হইতেছে। তাহারা সকলেই বুঝিতেছে, মানুষ হইয়া পশুরও অধমভাবে জীবন অতিবাহিত করা কিছু নয়। সমাজে গৃহে দেবালয়ে পশুপক্ষীরও যে অধিকার আছে মানুষের সে অধিকার নাই। পশু পক্ষী ঘরে গেলে ঘরের দ্রব্য অপবিত্র হয় না, দেব মন্দিরে গেলে দেবতা অশুদ্ধ হয় না—কিন্তু তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীস্থ হিন্দু মানব ঘরে গেলেই ঘর ও ঘরের দ্রব্যাদি অপবিত্র হয়, দেব মন্দিরের পতিতপাবন অধম তারণ নামধারী দেবতাও অশুদ্ধ হন। এই অন্যায়, এই অবিচার, এই অত্যাচার—এই সামাজিক নির্য্যাতন ভারত বক্ষ হইতে দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। মানুষ বজ্রনির্ঘোষে এই অন্যায় অশাস্ত্রীয় সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, সমাজে পদমর্য্যাদাহীন অথচ সমাজের পরমোপকারী সেবক জাতিদের প্রাণেও স্পন্দন জাগিয়াছে। তাহারাও বুঝিয়াছে এমন করিয়া পশুবৎ—না, পশুবৎ নহে পশুর অধমের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা কিছু নয়। মানুষ যদি মানুষের কাছে মানুষের ন্যায় ব্যবহার না পায়—তবে তার মানুষ সমাজে বাঁচিয়া থাকায় কি লাভ? এই গুরুতর প্রশ্ন সমুদয় নিপীড়িত সম্প্রদায়ের প্রাণেই একসঙ্গে জাগিয়াছে। ভারতের

সপ্তকোটি নিপীড়িত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নরনারী সামাজিক অত্যাচারে জর্জ্জরীত হইয়া অত্যাচারী হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ৩৫০ জন করিয়া লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ভিন্ন ধর্ম্মিগণ বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বাড়িয়া যাইতেছে—আর হিন্দুগণ দিন ২ মাস ২ বৎসর ২ কমিয়া যাইতেছে। এইভাবে বিগত ৭০০ শত বৎসরে ৭ কোটি হিন্দু চলিয়া গিয়া মুসলমান এবং গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতে ৬০ লক্ষ হিন্দু কমিয়া গিয়া খৃষ্টান হইয়াছে। এই সব জাতিক্ষয় চিন্তা করিয়া হিন্দুসমাজপতিগণ পদদলিত অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে বাহুপাশে বক্ষে টানিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এই মহাসুযোগে দলিতগণও আশান্বিত হইয়া আগ্রহ সহকারে উঠিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আশা করি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না। এই সমুদয় অত্যাবশ্যকীয় ও পরম উপকারী সেবাপরায়ণ জাতিগুলির আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং জাগরণের উপর হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। যাহারা এতদিন নিদ্রিত ও অসার অবস্থায় থাকিয়া—নীরবে—বিনা বাধায় সমাজের সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার অবিচার নিগ্রহ লাঞ্ছনা সহিয়া আসিতেছিল,—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম এবং নিত্য অপমান ভোগ করা সত্ত্বেও যাহাদের মুখে কখন একটি কথা ফোটে নাই, যাহারা শত অত্যাচারেও একটা অভিশাপবাণী উচ্চারণ করিয়া অগ্নিগর্ভ বেদনার একটা স্ফুলিঙ্গ বাহির করে নাই—আজ তাহারা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে; তাহাদের সুষুপ্ত চিত্ত ঘুমের ঘোর কাটিয়া পাশ মোড়া দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সমাজে এতকাল যাহাদের থাকার অস্তিত্ব কেহ জানিত না; জানিবার আবশ্যকতাও মনে করিত না—আজ তাহারা সমাজকে তাহাদের জীবন্ত জাগ্রত অস্তিত্ব জানাইতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাহাদের প্রাণে আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা উদ্যম, আত্মসম্মান আত্মাভিমানের সঞ্চার হইয়াছে। জাতীয়

উন্নতি ও জাতীয় জাগরণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ ও শুভ লক্ষণ আর কি হইতে পারে? সর্ব্বসম্প্রদায়ের পতনেই জাতির পতন, আবার সর্ব্বসম্প্রদায়ের উত্থানেই জাতির অভ্যুত্থান। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করিয়া যাহাতে সামাজিক নানা প্রকার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়—তজ্জন্য বৈদ্য কায়স্থ হইতে সুবর্ণবণিক সাহা পোদ নমঃশূদ্র, কপালী, কৈবর্ত্ত, পাটনী, মালী প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কেহই আর নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত নাই। তাহারাও সামাজিক অধিকার লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

আমি বলি ভাই সব, আশ্বস্থ হও—নিরাশ হইও না। যুগ যুগান্তের পর মোহতন্দ্রা কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সম্পত্তিশালী জমিদার ও শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ সকলেরই দৃষ্টি অল্পাধিক এদিকে পতিত হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী হিন্দুসন্তানগণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; হিন্দুজাতিভুক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা, প্রীতি মমতা স্থাপনে সকলে যত্নবান হইয়াছেন। সকলেই বুঝিয়াছেন পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন ভিন্ন পরস্পরের মঙ্গলাশা নাই। নিম্নশ্রেণী বলিয়া ঘৃণা করতঃ তাহাদিগকে ফেলিয়া রাখিলে বা পদতলে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে উভয়েরই অমঙ্গল—উভয়েরই বিপদ। এখন জাতির অভিমান ভুলিয়া গিয়া সকল জাতি মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। সামাজিক জীবনে যাহার যে অভাব আছে তাহার সেই অভাব পূরণ করিয়া দেওয়ার দরকার। হীন, নীচ ছোট অধম বা ঘৃণিত জাতি বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিলে চলিবে না। ঘৃণা অবজ্ঞা ও অপমানের বিনিময়ে কখন প্রেম সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ভক্তি পাওয়া যাইবে না। দর্পণে যেমনটি দেখান যাইবে—দর্পণ প্রতিদানে তেমনই দেখাইবে। ইহাতে ঘোর কলির স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া গেলে চলিবে না। বিশেষ ধীর স্থির ভাবে—গভীর সহানুভূতি লইয়া এই সব আন্দোলনের উৎপত্তির কারণ ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইবে।

বুঝিতে হইবে বিনা বাতাসে, স্থির ধীর অচঞ্চল সাগর-জলে তরঙ্গ উঠে না। সামাজিক বিক্ষোভের মূলীভূত কারণ অন্বেষণ করিয়া সেই কারণের প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই সমুদয় বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মূল কারণ যে সামাজিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার, উহাকে প্রেমের পবিত্র শুদ্ধ বাতাসে উড়াইয়া দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের নিপীড়িত ব্যক্তিসকল ধীরে ধীরে মোহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে তথা কথিত উচ্চজাতি সকলের নির্ম্মম ব্যবহারে, নিষ্ঠুর আচরণে, কঠোর অত্যাচারে জীবন্তে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিল—যাহারা মানুষ হইয়াও পশু পক্ষীর ন্যায় অধমভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, যাহারা সমাজের সর্ব্বস্ব ও মেরুদণ্ড-স্বরূপ হইয়াও সমাজপতিগণের নিকট ঘৃণিত ও অবজ্ঞাতভাবে অবস্থান করিতেছিল—পতিতপাবন অধমতারণ শ্রীভগবানের অলক্ষিত ইঙ্গিতে—তাঁহারই অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। শত শত বৎসরের পদদলিত, নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত জাতিগণের অন্তরস্থ নারায়ণ এইবার গর্জ্জিয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্যাগী মনস্বীবর্গ দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সাম্য মৈত্রীর সঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ করাইয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহারা স্নেহ বিজড়িত মধুর কণ্ঠে সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—ভাই সকল তোমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অমা-রজনীর অবসান হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড-পতির বংশী নিনাদ সমুদয় পতিত জাতির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে; সকলেই বুঝিয়াছে, মানুষ হইয়া পশুর অধমভাবে জীবন অতিবাহিত করা কিছু নয়। যদি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ—তবে মানুষের মতই চলিতে চেষ্টা কর। এযুগে কেহই আর পদতলে পড়িয়া থাকিবে না। বিশাল হিন্দুজাতির তোমরাও যে অঙ্গ, অংশ। মাতৃভূমির দুর্দ্দশা মোচনে,—জননীর দুঃখ দূরীকরণে সকলেরই তুল্য অধিকার। এখানে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উত্তম

অধমের বিচার নাই। এখানে ছোট বড়, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, আর্য্য ম্লেচ্ছ সকলেরই সমান অধিকার। সকলেই জননী জন্মভূমির সমান স্নেহের অধিকারী। এই বিংশ শতাব্দীতে কেহই আর অস্পৃশ্য থাকিবে না, কেহই আর হীন অধমভাবে দিনপাত করিতে প্রস্তুত নহে। শ্রীভগবান্ এবার সকলকে ডাক দিয়াছেন; সকলকেই বুকে টানিয়া তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়াছেন। প্রেমের কণ্ঠে অমৃত নির্ঝরিণী ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"এস কে আছ দীন, কে আছ হীন, কে আছ আর্ত্ত, কে আছ অনাথ; এস কে আছ পতিত, কে আছ লাঞ্ছিত, কে আছ অন্ধ, কে আছ মূক, এস কে আছ চণ্ডাল কে আছ পারিয়া, কে আছ পঞ্চম কে আছ অধম—আমি তোমাদিগকে বুকে তুলিতে আসিয়াছি। যুগ যুগান্তরের অত্যাচার অবিচারে জর্জ্জরিত, ঘৃণাবমাননায় লাঞ্ছিত, দুঃখ বেদনায় অশ্রু-ভারাক্রান্ত—দীনতম সন্তানগণ, আর তোমাদের ভয়—ভাবনা নাই, এই যে আমি আসিয়াছি। সমাজপতিগণের অত্যাচারের অবসান হইয়াছে। এস আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের তুলিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছি। কার সাধ্য তোমাদিগকে দাবাইয়া রাখে, কারশক্তি তোমাদিগকে উত্থানের পথে বাধা দেয়?" শ্রীভগবানের বাণী বৃথা উচ্চারিত হয় নাই। বঙ্গে ব্রাহ্মণেতর বৈদ্য কায়স্থ কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুজীবী সদ্‌গোপ, সাহা, সুবর্ণবণিক, মালী, নমঃশূদ্র পাটনী বেহারা সকলেই ধীরে ধীরে আপন আপন সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের নিমিত্ত শিক্ষা দীক্ষায় আন্দোলন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাগরণের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীভগবানের অপার করুণায়—দীনতম ভ্রাতাদের মধ্যেও সে আন্দোলনের তরঙ্গ—সে ভূকম্পনকারী জাগরণের চাঞ্চল্য আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ইহাদের প্রাণেও আশা জাগিয়াছে—'আমরাও অন্যান্য ভ্রাতাদের মত উঠিব, জাগিব—নিদ্রাত্যাগ করিয়া সমাজের সম্মুখে

বক্ষবিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব।' আজ ভারতের গগন পবন, সাগর মরু, কানন কান্তার, জলস্থল মুখরিত করিয়া জাগরণের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশ প্রেমের পবিত্র জাহ্নবীধারা সারাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে; কৌলিন্য ও আভিজাত্যের বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমাজের অগ্রবর্ত্তিগণ পশ্চাৎবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের হাত ধরিয়া চলিয়াছে। ভারতে নবযুগের সঞ্চার, নব জাতির উদ্ভব, নবীন জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। আজ নিরাশপ্রাণে আশা, ভরসা-হীনের ভরসা জাগিয়াছে। যে অস্পৃশ্যতার মহাপাপ ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরাজিত করিয়াছে, যে জাতিগর্ব্ব জাতিহিংসা ও জাত্যভিমান ভারতকে কলঙ্ককালীমায় নিমজ্জিত করিয়াছে—শ্রীভগবানের কৃপায় এবং বহু স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মার আত্মত্যাগ ও জীবনপণ সাধনার ফলে সেই সব পাপ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে চলিয়াছে। আশা হইতেছে, পুণ্যভূমি ভারতের বক্ষ হইতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কালানল সত্বরই নির্ব্বাপিত হইবে। আবার ভারতের তপোবনে—গঙ্গাগোদাবরী তটে সাম বেদের সাম্য সঙ্গীত ব্রাহ্মণ বালকের কোমলকণ্ঠে প্রাতঃসন্ধ্যায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। ভারতে কেহই আর অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য থাকিবে না। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও হিন্দু মহাসভার আশ্বাস-বাণী সমুদয় নিপীড়িত জাতির কর্ণে দেববাণীর ন্যায় পঁহুছিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, ভারত উঠিবেই উঠিবে; দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ এই দেব ও ঋষিবংশধর জাতি তাঁহাদের লুপ্ত বৈভব ও বিগত গৌরব নিশ্চিত ফিরিয়া পাইবেন। আমরা সেই আকাঙ্ক্ষিত শুভদিনের আশায় নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে চাই না; আমরা সেই অভিলষিত সুদিন আনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে কেহই যেন নিরক্ষর না থাকে। বালকবালিকা—নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আমরা বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর বিদ্যা-মন্দিরের যাত্রীরূপে দেখিতে চাই। আমাদের মধ্যে একজনও যেন নিরক্ষর না

থাকে। আমরা যেন মা ভগিনী কন্যা সহধর্ম্মিণীগণকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা দানে পরাঙ্মুখ না হই। কখনই যেন সমাজের অর্দ্ধশক্তি শক্তি-স্বরূপিণী মাতৃজাতির উন্নয়নে বাধা প্রদান করিয়া বীর সন্তান উৎপত্তির পথে কণ্টকারোপণ না করি। বিধবাগণকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া আমরা যেন সমাজস্থ সমুদয় মাতৃজাতির শিক্ষাদানে নিযুক্ত করি। বিপত্নীকের ন্যায় সমুদয় ন্যায্য অধিকার যেন বিধবা কন্যা ভগিনীগণকে দান করিতে আমরা কুণ্ঠিত না হই। ভাই সকল, মিথ্যা সামাজিক রীতি নীতি, মিথ্যা আচার ব্যবহার, অন্ধ লোকাচার যেন তোমাদিগকে অগ্রগমনে বাধা প্রদান না করে। জঘন্য দেশাচার, হীন লোকাচার, স্ত্রী আচার যেন সত্য শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত না করে। ভণ্ড ও হৃদয়হীন সামাজিকগণ যেন তোমাদিগকে কুপথে পরিচালিত না করিতে পারে। আমাদের বেদ-বেদান্ত গীতা ভাগবতই যেন তোমাদের পথপ্রদর্শক হয়। পূর্ব্বপুরুষগণের যে সমুদয় ভ্রান্তসংস্কার ও অন্ধ লোকাচার তোমাদিগকে এতকাল সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ রাখিয়াছে—সেগুলি এই দণ্ডে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সিংহ বলে নবীন শিক্ষাদীক্ষায় জাগিয়া উঠ। কাহারও ভ্রুকুটি ভ্রুভঙ্গে ভীত ও চকিত হইও না। পার্থসারথি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তোমরা সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ হও। আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ. জাতীয় স্বার্থ সংসাধনোদ্দেশ্যে বলি প্রদান কর। বঙ্গদেশ-বাসী সমুদয় অভিজাত সম্প্রদায়কে জানাইয়া দাও—যে বঙ্গে দলিত ভ্রাতৃগণ এখনও নির্বীর্য্য নিস্তেজ হয় নাই। তাহাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। তাহারাও ধরাতলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মানুষের সর্ব্বপ্রকার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় অধিকার করিতে চায়। অন্য জাতিগণের ন্যায় তাহাদের ভগবতী জননীগণও তাহাদিগকে বক্ষসুধা ধারায় মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। অন্যের

ন্যায় দলিত সম্প্রদায়ভুক্তগণও মাতৃমর্য্যাদা ষোল আনা বজায় রাখিতে প্রস্তুত।

বঙ্গদেশে নবীনভাবে মনুষ্যত্বের আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি সামাজিক অধিকার লাভের জন্য বদ্ধ-পরিকর। শতশত শতাব্দীর অত্যাচারের ফলে বঙ্গের নিপীড়িত জাতিগণের প্রাণে একটা দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। এই বিক্ষোভ আবার বহুস্থলে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতেছে। সমাজ পতিগণের অবিচার ও নির্ম্মম ব্যবহার তাহারা আর নীরবে হজম করিয়া যাইতে প্রস্তুত নহে। কি অত্যাচার! যতক্ষণ পর্য্যন্ত মালী, পাটনী, নমঃশূদ্র, পোদ, ধাত্রী, কেওড়া, বাগ্‌দী, হাড়ী, হিন্দু সমাজভুক্ত ও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, গৌর-নিতাই ভজনা করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা গঙ্গা-যমুনা ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী সিন্ধু সরযূতে স্নান করে, নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মথুরা, প্রভাসে তীর্থ-যাত্রা করে, গো বিপ্র তুলসী শালগ্রাম সেবা করে, সংকীর্ত্তন করে, 'হরি' 'কালী' দুর্গা বলে ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা ধোপা নাপিত বেহারা পায় না। যেই মুহূর্ত্তে তাহারা হিন্দুধর্ম্ম বেদ বেদান্ত গীতা ভাগবত কাশী বৃন্দাবনের মাথায় পদাঘাত করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মগ্রহণ করে, গো সেবার পরিবর্ত্তে গো মাতার বুকে ছোরা বসাইয়া তাহাকে হত্যা করে, গো মাংস ভোজন করে সেই মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে নাপিত ক্ষৌরী করিতে, ধোপা কাপড় কাচিতে, বেহারা ডুলি পালকী বহন করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকালবেলার রামদাস, কৃষ্ণদাস, কালিদাস, শিবদাস, গৌরদাস যখন হিন্দুধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈকালে অন্য ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক পর হইয়া যায়—তখন নাপিত ধোপা বেহারা তাহাদের কাজ করিতে আর দ্বিধা বা আপত্তি করে না। তাহাদের অপরাধ শত সহস্র অত্যাচার অবিচার অপমান লাঞ্ছনা সহিয়াও হিন্দু থাকা। হিন্দু ধর্ম্মে থাকাতেই তাহাদের যত দোষ ত্রুটী অপরাধ,

পাতিত্য ও হীনত্ব। তাহারা ধর্ম্মত্যাগ করিলেই শুদ্ধ ও শুচি; স্বধর্ম্মে থাকিলেই পতিত ও অস্পৃশ্য!! এই সব মহাপাপেই ৭ কোটি ভ্রাতা চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ ভাই খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতিদিন গড়ে [illegible] জন ভারতবাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে!! তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না, তবু কি আমাদের স্বজাতীয়ত্ব বোধ জন্মিবে না? কাহাদের লইয়া দেশ, কাহাদের লইয়া জাতি! তুমি আমি রাম শ্যাম এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভদ্রলোক লইয়া দেশ, না কোটি কোটি মূক জন-সাধারণ লইয়া দেশ! দেশের যাহারা মেরুদণ্ড, জাতির যাহারা রক্ত মাংস—সমাজের যাহারা প্রাণ, যাহাদের এক দণ্ডের সেবা ব্যতীত তথাকথিত ভদ্রলোকদের চলিবার উপায় নাই, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রমের উপর ধনবানগণের সৌধ অট্টালিকা বিলাস বৈভব, বাবুগিরি—বড়লৌকিক চাল—যাহারা আমাদের পেটের অন্ন, পরিধানের বসন জোগাইতেছে, তাহাদের বাদ দিয়া সমাজ ও দেশ রক্ষা পাইতে পারে কি? জাননা কি ভাই বাঙ্গলা দেশ হইতে ক্রমশঃ হিন্দু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে পরন্তু প্রতিবাসী মুসলমানগণই ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এইরূপ ভাবে হিন্দু ক্ষয় হইতে থাকিলে ৫০ বৎসরেই উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য হইয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া দেখ, জাতি হিংসা, জাতি ঘৃণা পোষণ করিয়া, জাতিভেদ বজায় রাখিয়া অস্পৃশ্যতা সাদরে বুকে ধরিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপপ্রাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় অথবা এই সব অশাস্ত্রীয় ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রীআচার পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ২৩ কোটি হিন্দুর একটা বিরাট জাতিরূপে বাঁচিয়া থাকা? কি চাও—? জাতির রক্ষা না জাতিধ্বংস, জীবন না মৃত্যু? হিংসা না প্রেম—? সম্প্রদায়ের লোপ না জাতির সংগঠন? সমাজপতি ভ্রাতৃগণ! এখনও সময় আছে? এখনও ২৩ কোটি হিন্দু অবশিষ্ট আছে। প্রেমাবতার বুদ্ধ গৌরাঙ্গের প্রেম লইয়া আসুন আমরা

আচণ্ডালের মধ্যে গমন করি। সকলকে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরি। যাহার যে অভাব অভিযোগ ও ব্যথা বেদনা আছে আসুন আমরা তাহা দূর করিতে চেষ্টা করি। যে যেরূপ সামাজিক অধিকার চায়—তাহাকে তাহা দেই। অধিকার না দিলে অধিকার পাওয়া যাইবে না। একটা শব্দ উচ্চারণে, একখানা পুথিপাঠে, দেবমন্দিরে ও কূপ-স্পর্শে অধিকার যদি আমরা আমাদের শতকরা ৯৬ জন লোককে দান করিতে কুণ্ঠিত হই, ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার আমরা চাহিতে ও দাবী করিতে পারি কি? অধিকার দিলে তবে অধিকার পাইব। ভগবানকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তিনি সব দেখিতেছেন। আমাদের ভিতরের হিংসা দ্বেষ—মালিন্য পাপ তিনি সবই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তিনি বিনা কারণে বিদেশী ও বিধর্ম্মীকে ভারত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। যে পারিয়াগণকে আমরা পশুর অধম ঘৃণা করিতাম ও করি সেই ২২ শত পারিয়া সৈন্যের সাহায্যেই ইংরাজগণ পলাশি যুদ্ধ জয় করিয়া ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থাপন করেন। ঘৃণার পরিণাম ও প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে ফলিয়াছে। তবু কি আমাদের জ্ঞান নেত্র ফুটিবে না? ভ্রাতৃগণ, আসুন দেশের ও জাতির এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরা জাতি ঘৃণা ও জাতি হিংসা ত্যাগ করিয়া পরস্পর প্রেমের স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই। জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করি। ২৩ কোটি হিন্দুর প্রাণ, চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য এক হউক, সকলের স্বার্থ এক হউক। ভাই সকল তোমরাও আজ আশায় উদ্বুদ্ধ হও। বিশ্বাস কর, তোমাদের দুঃখনিশার অবসান হইয়াছে। তোমরা সিংহ বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠ। সকলের মন এক কর; সকলে একত্র মিলিত হও দেখিবে তোমাদের মধ্যে কি অদম্য শক্তি, কি অসীম বলের সঞ্চার হইয়াছে। মনে রাখিও, তোমরা কাহারও অপেক্ষা এক বিন্দু ছোট নও, দুর্ব্বল নও, হীন নও, অক্ষম নও,

অশক্ত নও। মনে রাখিও. অনন্ত শক্তি তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে, জাগাইলেই সে শক্তি জাগ্রত হইবে, জাতির দুঃখ দৈন্য দূর হইবে।

বঙ্গদেশের হিন্দুজাতিভুক্ত সমস্ত সম্প্রদায় শূদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হইবার জন্য গভীর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহই আর নিজেদিগকে হীন অবজ্ঞাত বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে যাহারা সমাজের সর্ব্বস্ব হইয়াও সমাজপতিগণের নিকট কেবল অপমান, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহই ভোগ করিয়া আসিতেছিল— সেবার বিনিময়ে ঘৃণা অবজ্ঞা, পদসেবার বিনিময়ে পদপ্রহার ব্যতীত অন্য কোনও পুরস্কার যাহারা কখনও আশা করে নাই, আজ তাহাদের প্রাণে এই চিরপ্রচলিত সনাতন অপমান সহ্য না হইয়া দারুণ বিক্ষোভ আনয়ন করিয়াছে। তাহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে—ভগবানের একই প্রকার সৃষ্ট মানুষ কেন—একে অন্য অপেক্ষা বড় বলে, একজন অপর জনকে হীন ছোট অস্পৃশ্য মনে করে; একজন কেন অন্য জনের মাথায় পা তুলিয়া দেয়। মানুষ কেন—ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, এইরূপ অসাম্যপূর্ণ সংজ্ঞা সৃষ্টি করিয়া মানুষ দলনে নিযুক্ত আছে। কেন শ্রীভগবানের এই সাম্যরাজ্যে এরূপ অসাম্য, অভেদবুদ্ধি নারায়ণের সৃষ্ট মানবে এত ভেদ-বুদ্ধি পরস্পর এত উচ্চ নীচ বৈরীভাব!

শ্রীভগবানই যদি সর্ব্বজীবের জনক জননী হন, জগজ্জননী বিশ্বমাতা ভগবতীই যদি সকলের প্রসবকারিণী হন—তবে সন্তানগণ কি করিয়া উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য হইতে পারে? এই চিন্তা বঙ্গীয় হিন্দুজাতির সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রাণে নূতন আবির্ভূত হইয়াছে। অশনে শয়নে, নিদ্রা জাগরণে, চলনে ভ্রমণে সর্ব্বদা তাহাদের প্রাণ আন্দোলিত করিতেছে। যে জগদারাধ্য ভুবনপাবন ঋষিগণ বেদ বেদান্ত শাস্ত্রে গীতা ভাগবতে জীব ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া—নরই নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন— তাঁহাদের বংশধরগণ সেই বেদবিদ্যা বিস্মৃত হইয়া কেমন করিয়া

জীবব্রহ্মের পার্থক্য প্রচার করিতেছেন,—নিজদিগকে ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্যকে শূদ্র ও হীন বলিতেছেন। বেদ বেদান্ত সূত্র তবে কি শুধু আর্য্যদিগের মহিমা ঘোষণার জন্যই রচিত হইয়াছিল? উহা কি পালনীয় ধর্ম্ম নহে? পোষাকী কাপড়ের মত উহা কি লোক দেখানের জন্যই গ্রথিত হইয়াছে? আমাদের তাহা মনে হয় না। ঋষিগণ ব্রাহ্মণ-গণের আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন আমাদের তাহা মনে হয় না।

কৈ শাস্ত্রে ত ব্রাহ্মণব্রহ্ম, শূদ্রব্রহ্ম বলিয়া কিছু দেখিতে পাই না। ব্রহ্ম ব্রহ্মই। কায়স্থ ব্রহ্ম বা কামার ব্রহ্ম, নাপিত ব্রহ্ম বা করণ ব্রহ্ম ত দেখিতে পাই না। স্বরূপতঃ আমাদের উৎপত্তিতে কোন বড় ছোট বা ভেদ নাই। জাতি বা সম্প্রদায় মানবেরই সৃষ্টি। ভগবান কাহাকেও বড় বা ছোট, উত্তম বা অধম করেন নাই; করিলে তিনি পক্ষপাত দোষে দোষী হইতেন।

ছাপাখানার কল্যাণে, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি সংহিতা, পুরাণ তন্ত্র গীতা ভাগবত অনুবাদের সহিত প্রচারিত হইবার ফলে ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গণ শাস্ত্র পাঠের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা আর পোপ-পুরোহিতের কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। তাহাদের অন্তরাত্মা আর শূদ্রত্ব রূপ দাসত্ব-ভোগে সায় দিতে চাহিতেছে না। তাহারা দিন দিন বুঝিতেছে—মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শেয়াল কুকুরের ন্যায় সর্ব্বদা অপমানিত হওয়া কিছু নহে, বরং তাহা অপেক্ষা বাঁচিয়া না থাকাই শতগুণে শ্রেয়ঃ। কেন মানুষ হইয়া মানুষের কাছে মানুষের মতই ব্যবহার না পাইব; কেন মানুষের জন্মগত ন্যায্য অধিকার মানুষ দিবে না। মানুষ, কেন মানুষকে হীন ছোট করিয়া পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিবে? আর অন্য মানুষে নীরবে এই অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে। মানুষ আর এসব অবিচার মুখ বুজিয়া সহিতে প্রস্তুত নয়।

এখন তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদের ভাষা গর্জ্জিয়া উঠিতেছে—"আমরা মানুষ,—মানুষের কাছে মানুষের মতই ব্যবহার চাই।" আজ সুপ্ত প্রাণ জাগিয়াছে, লুপ্ত স্থান ফিরিয়া আসিয়াছে, অবসাদগ্রস্ত দেহে নবীন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে, আলস্য, তন্দ্রা, ভয় ভীতি পলায়ন করিয়াছে, মৃত শরীরে সঞ্জীবনী সুধার স্রোত বহিয়াছে। আজ অন্ধ চক্ষু পাইয়াছে, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনের বল প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ তাহাদের বাহুতে শক্তি, বুকে তেজ, হৃদয়ে উত্তেজনা,—মনে আশা ভরসা জাগিয়াছে! যুগ যুগান্তরের পদাহত—নিপীড়িত অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রাণ বক্ষস্ফীত করিয়া জগৎ সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহার সাধ্য তাহাকে বাধা দেয়, দাবাইয়া রাখে। কোন্ স্নেহকারুণ্যময় নর-দেবতার প্রেমের স্বর্ণকাঠি স্পর্শে যেন এই নিদ্রিত জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এ জাগরণ সহজ জাগরণ নয়, এ জাগরণে ধরিত্রী বিকম্পিত, ত্রিভুবন চমকিত, বিশ্ববাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে। এবার শুনিয়াছে তাহারা ঋষিকণ্ঠের পবিত্র বাণী "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" হে অমৃতের পুত্র কন্যাগণ তোমরা শ্রবণ কর সেই জরামরণবিজয়ী মন্ত্র, তোমাদের সব দুঃখের অবসান, সর্ব্ব সন্তাপের তিরোধান, সর্ব্ব অপমানের সমাধান হইবে।

বাঙ্গালার সমাজজীবনে কি বিপুল পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে। অবজ্ঞাত জাতিসকল শির উন্নত করিয়া ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি শূদ্রত্বের ঘৃণিত ও জঘন্য পরিচয় হইতে মুক্ত হইয়া—আপনাদিগকে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের যুগ যুগান্তরের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। জাগিয়া দেখিতেছে—তাহাদের অবস্থা কি শোচনীয়। সমাজে কুক্কুর বিড়ালের যে সম্মান, যে স্থান আছে—তাহাদের তাহাও নাই। নরাকারে জন্মিলেও তাহারা পশুপক্ষীর অধম ভাবে সমাজে ব্যবহার পাইতেছে। অথচ অন্য

মানুষই সমাজ মধ্যে চোখের সাম্‌নে দেবতার সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। একই মানুষ কেহ লাঞ্ছিত—ঘৃণিত ও অবমানিত এবং অপরে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধার পাত্র। এই অন্যায় বৈষম্য কেন—একই চক্ষু কর্ণ হাত পাওয়ালা মানুষ—দাসানুদাস—আর একজন মাথার ঠাকুর, এ অন্যায় অবিচার ভারত আর কতদিন সহ্য করিবে? ভারতে নব জাগরণ আসিয়াছে, সামাজিক জীবনে নূতন স্পন্দন দেখা দিয়াছে। তাহার চিহ্নস্বরূপ বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তেলী, তাম্বলী, গন্ধবণিক, গোপ, তন্তুবায়, বারু-জীবি, নাপিত, মোদক, মালী, মাহিষ্য, সকলেই ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছে। কেহই আর ঘুমাইয়া নাই। সুবর্ণবণিক, সাহা, স্বর্ণকার কংসবণিক, সূত্রধর, কপালিক, পোদ ঝালমাল, নমঃশূদ্র কোদ্‌মা, কোরঙ্গা বেহারা, হদি কোচ, সকলের প্রাণেই ধীরে ধীরে আত্মসম্মানজ্ঞান জাগিয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের দশ লক্ষ বাগ্‌দী ভ্রাতারাও যোগ্য নেতার পরিচালনে সমাজ শরীর কাঁপাইয়া সমাজে অভিনব তরঙ্গ তুলিয়াছে। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত নিপীড়িত নির্য্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রাণেও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে জাগরণের ঢেউ চিরবধির, চিরনিদ্রিত, চির-অবসাদগ্রস্ত হীনতম সমাজের প্রাণও স্পর্শ করিয়াছে।

ভারতের ত্যাগী—স্বাধীনতার অগ্রদূত, কর্ম্মসন্ন্যাসী মহাপ্রাণগণ সর্ব্বত্র—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পথে ঘাটে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে সমস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন—"ভাই সব উঠ, জাগ, জননী জন্মভূমির সেবায় সকলে একপ্রাণ হও। এই দেবভূমি—কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-ভূমির তোমরা সন্তান, বহু পুণ্যফলে ভারতে তোমাদের জন্ম, অনন্ত শক্তি তোমাদের ভিতরে আছে,—এই অহিংস সংগ্রামে তোমরা কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে? জননী জন্মভূমির বক্ষসুধা—ফলে, জলে, শস্যে, খাদ্যে কি

তোমরা পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধিত হও নাই ? জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, শ্রেণী-ভেদ বিসর্জ্জন দিয়া—ধর্ম্মভেদ, কর্ম্মভেদ, আচারভেদ, পরিচ্ছদ ভেদ ভুলিয়া গিয়া—একই সাম্যক্ষেত্রে মিলিত হও। জন্মভূমির সেবায় সকলেরই সমান অধিকার—এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ, নীচ, উত্তম অধমের বাধবিচার নাই। যুগ যুগান্তের সামাজিক অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে। ভারতবক্ষ হইতে জাতিহিংসা, জাতিদ্বেষ—জাতিগর্ব্ব, জাত্যহঙ্কার ধীরে ধীরে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। উচ্চ জাতিসকল তথাকথিত নিম্ন জাতিগণকে বাহুপাশে ধরিয়া বুকে টানিয়া লইতেছে। তাহাদের বেদনাহত প্রাণের সমুদয় জ্বালা দূর করিয়া দিতেছে, তাহাদের লাঞ্ছনাক্ষত অপমানজাত নয়নজল মুছাইয়া দিতেছে, তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া খাওয়াইতেছে। যাহা রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ অবতারেও কল্পনার অতীত ছিল—আজ তাহাই বাস্তবে পরিণত হইতেছে। যে অস্পৃশ্যতা মহাপাপ ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া—ভারতের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে—সেই অস্পৃশ্যতা মহাপাপ ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছে। সে কারণ শত শত শতাব্দীর পর ভারতের সর্ব্বজাতি পরস্পরের প্রতি অনৈক্য অবিশ্বাস ও ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইতে পারিতেছে। এ সময় কেহ আর দূরে থাকিও না—কেহই আর ঘুমাইয়া থাকিও না। এমন শুভ দিন ভারতে কখন আসে নাই, এমন শুভ সুযোগ আমাদের পিতৃপিতামহগণের জীবনে কখন ঘটে নাই। আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। আমরা আজ ভারতের আত্মোন্নতি-সমরে আত্মনিয়োগ করিবার মহা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। সপ্ত শত বৎসরের দুঃখদুর্দ্দশার পর পতিতপাবন শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি এই পতিত দেশ ও পতিত জাতির উপর পড়িয়াছে। তাঁহারই কৃপায় আজ ঘুমন্ত জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বাণী সকল সম্প্রদায়ের কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছে। জগতের জীবন্ত—জাগ্রত জাতিরা যেমন করিয়া

বুক ফুলাইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে—আমরাও কেন না তাহাদের মতই চলিব? যে শক্তি—এতকাল উচ্চ জাতিগণের পদসেবায়, চরণরজ সর্ব্বাঙ্গে লেপনে, পাদোদক পানে ব্যয়িত করিয়া তদ্‌বিনিময়ে কেবলই লাথি জুতা অপমান লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তিকে এখন আপন আপন সম্প্রদায়ের উত্থানে নিয়োজিত করিতে হইবে। সকলেই মানুষ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তোমরাই কি শুধু পশুর মত, শুধু পশুর মত নহে, পশুর অধম ভাবে পড়িয়া থাকিবে? সমাজে পশুপক্ষীরও যে সম্মান, যে স্থান আছে, তোমাদের তাহাও নাই। বিড়াল, বেজি, সাপ, ব্যাঙ্, ইন্দুর, তেলাপোকা, কাক, সালিক, দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং শুধু প্রবেশ নহে, দেবতার সিংহাসনে চড়িয়া দেবতার অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্য এক বিছানায় শয়ন করিতে পারে,—দেবতার ভোজ্য লুচি, পুরি, সন্দেশ, মোণ্ডা, দুগ্ধ, দধি, পায়স, পিষ্টকে মুখ দিয়া তাহার আস্বাদ লইতে পারে,—তাহাতে দেবতা বা দেবমন্দির অপবিত্র হয় না—আর তোমরা গেলে—শূদ্র নামে অভিহিত ভগবৎসন্তানগণ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলে দেবতা অপবিত্র ও অশুদ্ধ হন, দেবমন্দির অশুচি হয়!!

তোমরা কি তবে পশু পক্ষী বিড়াল কাক অপেক্ষাও অধম হীন অপবিত্র ও অস্পৃশ্য নহ? ভাই সব! এইরূপ মানবাত্মার অপমান আর কতকাল নীরবে ভোগ করিবে! অন্তরাত্মা—ভিতরের নারায়ণ কি এই অপমানে গর্জ্জিয়া উঠিবেন না? হে আমার মহাপ্রাণ নর-সেবক ভ্রাতৃগণ, কতকাল আর সমাজপতিগণের ঘৃণা অবজ্ঞা নীরবে হজম করিবে? কতকাল আর পরপদ সেবাকেই জীবনব্রত করিয়া চলিবে; অপমানিত জীবনে কি একদিনের তরেও ধিক্কার জন্মিতেছে না? হীনতার মোহ কি কাটিবে না? সকলের নীচে—সকলের পিছে—সকলের পায়ের তলা হইতে কি প্রাণের ঠাকুরের, অন্তরের নারায়ণকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিবে না? বঙ্গের অনুন্নত জাতিসকল—কত সভা সমিতি স্থাপন

করিয়াছে, কত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিতেছে, কত পাঠশালা নৈশ বিদ্যালয়, কত পাঠাগার ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া স্বজাতীয়গণকে বিদ্বান ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। কত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছে। পুত্র কন্যাগণকে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা দানে যত্নবান হইয়াছে। সমাজের অর্দ্ধশক্তি নারী জাতির জাগরণে একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—

"না জাগিলে ভারত ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

তাহারা আরও বুঝিয়াছে—

"আদ্যা শক্তি ভগবতী-অংশ-কলা নারী ;
ডুবিল এদেশ হায় নিগ্রহে তাহারি।"

আজ দেশবাসী ঠেকিয়া শিখিয়াছে—মা, ভগিনী, কন্যা, জায়াকে গৃহে বন্দিনী করিয়া অথবা দাসীর মত রাখিলে—চলিবে না। যে দিন আবার ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, বেহুলা, জনা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা জন্মিবে, সেই দিন আমাদের মুক্তি। ভগবতীশক্তি মাতৃজাতির জাগরণ ব্যতীত আমাদের দুর্দ্দশা দূর হইবে না। মা ভগিনী জায়া কন্যাকে বন্দিনী রাখিয়া আমরা কখনও বড় হইতে পারিব না। বিবাহে ঘৃণিত পুত্র কন্যাবিক্রয় প্রথা রহিত করিতে হইবে। নারীগণকে পুরুষের মতই স্বাধীনতা দিতে হইবে—যদি সত্যই স্বাধীনতা আমরা চাই। কোনপ্রকার সমাজ-বিধি, দেশাচার, স্ত্রী-আচার যেন ইহাকে বাধা দিতে না পারে। অন্যের উপর দোষারূপ না করিয়া—নিজেদের উন্নতির পথ নিজেদেরই বাহির করিতে হইবে। এ পথে বিঘ্ন বিপদ পদে পদে, দুঃখ কষ্ট পলে পলে ; উন্নতির পথ চিরদিনই বন্ধুর, কঙ্কর, ও কণ্টকাকীর্ণ, পথে পথে কত বাঘ ভাল্লুক—বাধা বিপত্তি। কত কালনাগিনী ফণা বিস্তার করিয়া পথ-রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সব ভয় দেখিয়া

ভীত ও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। এ সব বিপদ ত অনিবার্য্য। উন্নতির পথ কখনও কুসুমাস্তীর্ণ ও সুকোমল পদ্মদলবিস্তৃত নহে। বাধাবিঘ্ন প্রতি পদে উন্নতিকামীর চির সঙ্গী।

আত্ম-পরিচয় জানিয়া যেই মাত্র তোমরা শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া দ্বিজোচিত আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে; শূদ্রযোগ্য মাসাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ ও দ্বাদশাহাশৌচ, উপবীত গ্রহণ, বেদাদি পাঠ, ওঁঙ্কারাদি উচ্চারণ, দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিবে, তখন চারিদিক হইতে বিভিন্ন জাতীয় অজ্ঞ ভ্রাতৃগণ কত বিদ্রূপ, কত ঠাট্টা, তামাসা, কত টিট্‌কারী কত গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিবে। সে সব "গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা" করিয়াই লইতে হইবে। বিরুদ্ধবাদীর শত কু-সমালোচনা—শত নির্য্যাতন, জমিদারের অবিচার অত্যাচার নীরবে হাসিমুখে সহিয়া যাইতে হইবে। বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদ যেমন অস্ত্রাঘাতে করিপদতলে পাতিত হইয়া বিষান্ন ভোজনে, অগ্নিকুণ্ডে, পাষাণবক্ষে সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই; ভক্ত হরিদাস অত্যাচারী কাজির বিচারে ২২ বাজারে বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই বরং বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—"খণ্ড খণ্ড এই দেহ যায় যদি প্রাণ; তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।" যেমন ভাবে জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস বিষ ভক্ষণে প্রাণ দান করিয়াছিলেন তত্রাচ সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই—তেমনি ভাবে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। শূদ্রত্ব রূপ হীনত্ব ও পশুত্ব, ক্লীবত্ব ও কাপুরুষত্ব হইতে জাতিকে মুক্ত হইতে হইবে। শুধু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই বিরোধ ও শত্রুতাচরণ করিবে এমন নহে—নিজেদের সম্প্রদায়ের অজ্ঞ সংস্কারান্ধ দাসত্ব-অভ্যস্ত বৃদ্ধগণও বিলক্ষণ বিরুদ্ধাচরণ করিবে। এ সবই সহ্য করিতে হইবে।

বঙ্গ দেশের সমুদয় জেলায় প্রত্যেক জাতির এক একটা স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। জেলায় জেলায় তাহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে। প্রতিবৎসর একবার করিয়া বার্ষিক অধিবেশন করিয়া সকলে একত্র সমবেত হইয়া নিজেদের ভাল মন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকেও অর্থ সাহায্য দ্বারা পণ্ডিত, বিদ্বান ও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। যাহাতে প্রত্যেক পুরোহিতের সন্তান সংস্কৃত শিখিয়া—যাজনিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিশুদ্ধরূপে শিখিতে পারেন তজ্জন্য অর্থ সাহায্য ও বৃত্তি ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজস্থ বালকবালিকা নরনারী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই যেন নিজেদের দ্বিজ বর্ণান্তর্গত বলিয়া আত্ম-পরিচয় দান করে। সমাজস্থ বালক বালিকা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতেই হইবে। লেখাপড়া শিক্ষা দান সকলের আগে। একজনও যেন নিরক্ষর না থাকে। বিদ্যাহীন ব্যক্তি অন্ধতুল্য। বিদ্যাই প্রকৃত চক্ষু। বিদ্যা নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল—আশাভরসাহীনের আশা ভরসা, বিদ্যা অন্ধকারগৃহের উজ্জ্বল আলোক,......অমানিশা রজনীর ধ্রুব নক্ষত্র, মৃতজাতির জাগরণের উপায়স্বরূপ। এই বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়াই তোমাদের এই দুরবস্থা—এই শোচনীয় অধঃপতন। ইংরেজ, আমেরিকান, জাপান, তুর্কি, জার্ম্মাণ, ফরাসি, ইটালিয়ান গ্রীক—সমস্ত জাতি এবং আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থগণ এই বিদ্যা প্রভাবেই, এই শিক্ষার বলেই—এত উন্নত—এত শক্তিশালী। আর যাহারা এই বিদ্যাধনে বঞ্চিত তাহারা দুর্ব্বল—হীন—ঘৃণিত দাস। তাই বলি—শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেককে শিক্ষা দান করিয়া চোখের অন্ধতা দুর করিয়া দিতে হইবে।

ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ৬ জন সামান্য লেখাপড়া জানে। বাকি ৯৪ জনই নিরক্ষর। ভূমণ্ডলের অন্যান্য স্বাধীনদেশে শতকরা প্রায় ৯৯জনই শিক্ষিত। শিক্ষার বল ও শক্তিতেই তাহারা প্রভু আর শিক্ষার অভাবে

আমরা দাস। বালকবালিকাগণকে সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রে কাছে বসাইয়া ভাল ভাল ভগবৎ-ভক্তি বিষয়ক স্তব স্তুতি বন্দনা নিবেদন, স্বজাতীয় প্রেমোদ্দীপক ভাল ভাল কবিতা ও গাথা কণ্ঠস্থ করিতে শিক্ষা দিবে। নারীগণকে নারীত্বের মর্য্যাদা অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণদানে প্রস্তুত থাকিতে শিক্ষা দিবে। পুরুষগণ যেন সর্ব্বদা গো বিপ্র নারী ও নারায়ণের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণদানে প্রস্তুত থাকে। শুধু কাগজে কলমে সভায় বক্তৃতায় ক্ষত্রিয় হইলে চলিবে না—কাজে কর্ম্মে আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ক্ষত্রিয়ত্ব দেখাইতে হইবে। যাত্রার দলের সাজা ক্ষত্রিয় হইলে চলিবে না; ক্ষত্রিয়ত্ব তেজে বীর্য্যে দেখাইতে হইবে।

যে জাতিভেদের মহাপাপে ভারতবর্ষ ডুবিয়াছে—মনে করিও না সেই মহা অনিষ্টকারী জাতিভেদ ভগবানের সৃষ্টি—অর্থাৎ ভগবানই পুণ্য পাপ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; ব্রাহ্মণগণ পুণ্য ও ধর্ম্মাধিক্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণ পাপ ও অধর্ম্মাধিক্যের দরুণ নিকৃষ্ট। স্মরণ রাখিবে ভগবান ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণকে নিকৃষ্ট বা হীন করেন নাই। গুণ কর্ম্ম বৃত্তি ও ব্যবসা ভেদে একই ব্রাহ্মণসংজ্ঞক আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন মাত্র। তখন ছোট বড়, উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট এরূপ কোন কথা বা ধারণা ছিল না। এখন যেমন বৃত্তি ও ব্যবসায় ভেদে কেহ উকীল মোক্তার ডাক্তার কবিরাজ ডেপুটী মুন্সেফ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট কেরাণী দোকানদার হোটেলওয়ালা জমাদার হয়, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও এইরূপ ভাবে বৃত্তি অনুযায়ী হইয়াছিলেন এবং এখন যেমন উকীলের পুত্র মোক্তার, ডাক্তার, দোকানদার, কেরাণী এবং জমিদার পুত্র কর্ম্মানুযায়ী মোক্তার ডাক্তার উকীল পোষ্টমাষ্টার হইতে পারে—সে কালেও—সেই প্রাচীন আর্য্যযুগেও তেমনি ব্রাহ্মণবংশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ

বৈশ্য শূদ্র অথবা শূদ্রবংশে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। ইহাকে জাতি না বলিয়া বর্ণ শ্রেণী বা সম্প্রদায় বলা হইত। জাতি বলিতে এক বিরাট আর্য্যজাতিই বুঝাইত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উহার শাখা বা শ্রেণী মাত্র। হিন্দুর দুর্ভাগ্য—তাই আর্য্য হিন্দু সন্তানগণ আর আপনাদিগকে আর্য্য হিন্দুজাতি (Hindu Nation) না বলিয়া নিজদিগকে কায়স্থ ব্রাহ্মণ, করণ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, গোপ, নাপিত জাতি বলিয়া মনে করে ও পরিচয় দেয়। বিরাট বিশাল জাতি (Nation) বুদ্ধি দূরে গিয়া এখন তৎস্থানে সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় (Caste) বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির আকরস্বরূপ সাম্প্রদায়িক জাতি (Caste) বুদ্ধি ভারতমহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আমাদিগকে বিরাট হিন্দুজাতি (Nation) এই বুদ্ধি আনিতে হইবে এবং মনে রাখিতে হইবে যে ২৩ কোটী হিন্দুজাতির এক জনের অঙ্গে কেহ আঘাত দিলে,—এক জনকে অপমানিত করিলে সে আঘাত—সে অপমান ঐ সমগ্র ২৩ কোটী নরনারীর অঙ্গে লাগিবে। এক জনের গৌরবে সকলের গৌরব বোধ ও এক জনের অপমানে সকলের অপমান বোধ জাগাইতে হইবে। এই ২৩ কোটী হিন্দুভাই ভগিনীর মধ্যে কেহই হীন নীচ অস্পৃশ্য অনাচরণীয় থাকিবে না। পরস্পরের সুখ-দুঃখে পরস্পর সুখ দুঃখ বোধ করিতে হইবে। কেহই কাহাকে নীচ বা ছোট মনে করিতে পারিবে না। অন্যকে ছোট হীন নীচ ও হেয় ভাবার ফলেই হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতন!

এই অন্যকে—স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ভাইদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখার মহাপাপেই এদেশ—এজাতি ডুবিয়াছে। এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে এই মহাপাপরূপী অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের ২।৪।১০ জন আভিজাত্যাভিমানী অন্ধ সমাজপতি ইহাতে ভীত বিচলিত ও শঙ্কিত হইলেও ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ, মনীষিগণ একবাক্যে ইহার অবৈধতা ও মহানিষ্টকারিতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয়

জাতীয় মহাসভা, নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী, প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলি—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের পক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রতি বৎসর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের সমগ্র অনাচরণীয় জাতিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় জনসঙ্ঘের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় অনাচরণীয় জাতির সমবেত নেতৃবৃন্দ পরস্পরের জল পান করিয়াছেন। সমুদয় জল অচল জাতিগণের কর্ত্তব্য—তথাকথিত উচ্চ জাতিগণের কৃপার অপেক্ষায় মোটে না থাকিয়া—নিজেদের মধ্যে পরস্পর জল পান করিয়া তথাকথিত উচ্চ জাতিগণকে অনাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করা। সেবা ও কাজও করিবে আর লাথি জুতা অপমানও খাইবে—ইহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। স্মরণ রাখিবে অনাচরণীয় জাতিগুলি যদি তন্নিম্ন জাতিগুলিকে অনাচরণীয় মনে করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে তবে কিছুতেই উচ্চ জাতিগণের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। তোমাদের শতকরা ৭১ জনের মধ্যে যে দিন অস্পৃশ্যতা উঠিয়া যাইবে—উচ্চ জাতিগণ তার পর দিনই বাধ্য হইয়া ডাকিয়া লইয়া তোমাদের জলচল করিয়া লইবেন। মনে রাখিবে—অধিকার ভিক্ষায় মিলে না, আবেদন নিবেদনে—পাওয়া যায় না, অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়, আদায় করিয়া লইতে হয়।

সামাজিক ভেদ যা বর্ত্তমানে চলিতেছে ইহার মূলে কোন বিচার, সত্য, ন্যায় নাই। ইহা নিষ্ঠুরহৃদয় সমাজপতিগণের ঘৃণিত অত্যাচার মাত্র। এই অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রে সমর্থিত হয় নাই। কে বড় কে ছোট, কে উচ্চ কে নীচ, সকলেরই উৎপত্তি এক বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা হইতে—একই ব্রাহ্মণ বংশে সকলের জন্ম। ব্রহ্মা প্রথমে এক জাতি ব্রাহ্মণকেই সৃষ্টি করেন, সেই ব্রাহ্মণ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি এবং ক্রমে সেই চারিবর্ণ গুণ কর্ম্ম ব্যবসায়, বৃত্তি ভেদে—ও হিংসা

দ্বেষে ক্রমে ৩৬ বর্ণ ও এক্ষণে ২৭৭৩ বর্ণে বিভক্তি হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় বা রাজপুতনার ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হাতে জলটুকু পর্য্যন্ত পান করেন না—রান্নাভাত খাওয়া ও কন্যা আদান প্রদান ত দূরের কথা। এই সব সংকীর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে পুনরায় চারিবর্ণ তৈয়ার করিতে হইবে। বাঙ্গালার সমুদয় দ্বিজজাতিগণকে লইয়া একটি বিরাট ও শক্তিশালি ত্রৈবর্ণিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া—ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ত্রিবর্ণের সঙ্গে মিলন স্থাপন; আদান প্রদান করিতে হইবে। সামাজিক সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ও জাল ছেদন করিয়া জাতিকে মুক্ত ও স্বাধীন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণবিধি ব্যবহারগণ্ডী নিষ্ঠুরভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া জাতিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। নিরক্ষর অজ্ঞ অন্ধ সমাজপতি বৃদ্ধদের চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়া—একঘরে হইবার ভয় ত্যাগ করিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া সমাজের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইতে হইবে। পশ্চাতে কেহ আসিল কি না আসিল—আসিবে কি না আসিবে এসব ভয় ভাবনা দূর করিয়া একাকী বীরের মত সত্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয় জাতি—তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ করিতে হইবে, ৩০ দিন বা এক মাসের স্থলে অশৌচ কমাইয়া দ্বাদশ দিন করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় দ্বিজাতির অন্তর্গত; সে কারণ তাহাদিগকে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। শূদ্রের নির্দ্দিষ্ট দাস দাসী পাঠ, এক মাস অশৌচ, দীনতা হীনতা —ভীতি ক্লীবতা এসব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কে কি বলে, না বলে পাড়াপ্রতিবাসী অন্যান্য জাতির ঠাট্টা বিদ্রূপ টিটকারী নিন্দা—অগ্রাহ্য করিয়া হাতীর মত চলিতে হইবে; এবং শ্রীরাধিকার মত বলিতে হইবে—"ননদিনী বলগে নগরে—ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" যদি জাতির মুক্তির ডাক শুনিয়া—অন্য কেহ সাড়া না দেয়—তবে একাকীই

অগ্রসর হইতে হইবে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনের বাধা—নিষেধ—কাতর মিনতি—ভয় প্রদর্শন—সমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে—আর বলিতে হইবে—"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী", বলিতে হইবে—"ভগবান্! আমাকে শত হস্তীর বল দাও—আমাকে অন্ধ জাতির পরিচালনার শক্তি দাও—আমাকে বিপদে ধৈর্য্য, আঁধারে আলোক, নিরুৎসাহে উৎসাহ,—মোহের সময় বিবেক দান কর—সংসারে মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছ,—মানুষের মতই চলিতে সামর্থ্য দাও। যেন শিয়াল কুকুরের মত শত অপমান্ লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে না চাই। আমি যেন জীবন পণ করিয়া স্বজাতীয়গণকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক দাসত্ব ও হীনত্ব হইতে মুক্ত করিয়া হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি। যেন কাহারও পশ্চাতের ডাক—নিষেধ উক্তি, নয়ন জল আমাকে আমার সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে না পারে।" ঝাঁপ দাও, ঝাঁপ দাও—হে বীরহৃদয় ক্ষত্রিয় যুবকগণ, কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়। একাকী বলিয়া ভয় করিও না। একা নেপোলিয়ান, সিজার, আলেকজেণ্ডার, একা পিটার-দি-গ্রেট, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, শিবাজী, একা বুদ্ধ, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ, জগতে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, ভাবরাজ্য কি ওলট পালট করিয়া দিয়াছেন। তুমিও কি সেই মানুষ নও? নিরাশ হইওনা, শত বাধা বিপত্তিতে ঘাবড়াইয়া যাইও না, পার্থসারথী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। সমগ্র জাতির মধ্যে জাগরণের স্রোত বহাইয়া দাও। জাতির যুগ যুগান্তরের, জন্ম জন্মান্তরের মোহ আলস্য নিরাশা অবসাদ দূর করিয়া দাও। কেহই যেন নিজদিগকে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি হইতে এক রতি এক বিন্দু ছোট ও হীন মনে না করে। তোমাকে যে অনাচরণীয় মনে করে, তুমিও তাহাকে তাহাই মনে করিয়া খাওয়া দাওয়া—জলপান বন্ধ করিয়া দাও। সে তোমাকে ঘৃণাই

করিবে—শিয়াল কুকুরেরও অধম জ্ঞান করিয়া দেবমন্দিরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে দিবে না—তোমার পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও শালগ্রাম বিগ্রহকেও যে তোমারই মত অস্পৃশ্য জ্ঞান করে—তাহাদের বাটীতে গিয়া প্রসাদ পাইতে কি তোমার একটুকুও আত্মধিক্কার আসে না? বিবেক একটুকুও বাধা দেয় না? অন্তরাত্মা নারায়ণ একবারও গর্জ্জিয়া উঠেন না? ছি ছি—কি লজ্জা—কি অপমান? শত লাথি, ঝাঁটা, জুতা প্রহারেও—মানাপমান বোধ জাগিতেছে না, দাসত্বে ও পা চাটায় অরুচি জন্মিতেছে না। ভাইসব একবার জাগ—একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠ। তোমরাই যে দেশের সর্ব্বস্ব, বল, শক্তি—বীর্য্য। তোমরা একটিবার তোমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন কর, দেখিবে অত্যাচারী উচ্চ জাতিগণের সমুদয় অত্যাচার অবিচার আগামী কল্যই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান অহিংসা আন্দোলনে যোগ দিতে কেহই যেন পরাঙ্মুখ ও পশ্চাৎপদ না থাকে। বাড়ী বাড়ী কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করাও, গৃহে গৃহে চরকা চালাও, স্বদেশী খদ্দর সকলকে পরাও। প্রতিবাসী মুসলমানদিগকে ভাইএর মত ভালবাস,—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর! মনে আশা রাখ--সাধনায় আমরা দেশজননীর নয়ন-জল মুছাইতে সমর্থ হইব। তোমরা যদি সকলে রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্দেশ মত খদ্দর পরিধান করিতে মনোযোগী হও, নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রতিদিন অর্দ্ধ ঘণ্টা করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ কর, কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হও, দেখিবে, কাল কংগ্রেস কর্ম্মিগণ আসিয়া তোমাদের হাতের জল খাইয়া তোমাদিগকে কোলচণ করিয়া যাইবেন, তোমাদিগকে তাঁহারা মাথায় করিয়া নাচিবেন। তোমরা তাঁহাদের অন্তরঙ্গ,—আপনার জন হইয়া যাইবে। আর যদি এ সব কিছুই না কর, আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিবর্ত্তন না কর, তোমাদের পাতিত্ব ঘুচিবে না। কংগ্রেসের নির্দ্দেশিত কর্ম্ম গ্রহণ না করিলে—কেমন করিয়া দেশভক্ত মনীষিগণের দৃষ্টি ও হৃদয় আকর্ষণ

করিতে সমর্থ হইবে ? কংগ্রেস কর্ম্মিগণের মতানুযায়ী চলিয়া তাঁহাদের চিত্ত জয় করিয়া ফেল,—দেখিবে, তাঁহারা কেমন করিয়া বুকের রক্ত দিয়া সমাজ পতিগণের সঙ্গে তোমাদের জন্য লড়াই করিবেন। কংগ্রেসকে আশ্রয় কর, সমাজপতিগণের সমুদয় অত্যাচার, অবিচার দূর হইয়া যাইবে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলিবার শক্তি কাহারও নাই,—সমাজপতিরা ত নগণ্য। সমাজে একদলের সাহায্য ও সহায়তা না পাইলে কি করিয়া শক্তিশালী তথাকথিত উচ্চ জাতিগুলির সঙ্গে—ন্যায় ও সত্যের সংগ্রাম করিবে। যোগ্যতা অর্জ্জন ব্যতীত যোগ্যের সম্মান কখনও লাভ করিতে পারিবে না।

দেশের সর্ব্বত্র—সর্ব্ব জাতির মধ্যে জাগরণের সঞ্চার হইয়াছে। তোমরাই বা কেন ঘুমাইয়া থাকিবে ? নিজেরা জাগ্রত হও এবং পাড়া-প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী অন্যান্য ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙ্গিয়া দাও, সমুদয় দলিত ও অবজ্ঞাত জাতিগুলি মিলিয়া নিজেদের মান অপমান, লাভ ক্ষতি, ভাল মন্দের আলোচনা কর ; যাহারা তোমাদের অপেক্ষা সমাজে ভাগ্যহীন,—ধোপা নাপিত বেহারাদের সেবায় বঞ্চিত—তাহাদিগকে ভাই বলিয়া বুকে টানিয়া ধর—তাহাদের ধোপা নাপিত বেহারা প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত দাবী যাহাতে পূর্ণ হয় এজন্য তোমাদের মিলিত শক্তি নিয়োজিত কর ; বিনিময়ে তাহাদেরও সহায়তা তোমরা পাইবে। আর যদি তাহাদের দাবীতে সহানুভূতি না দেখাও, তাহারাই বা কেন তোমাদের দাবীতে সহায়তা করিবে। তাহাদের ধোপা নাপিত দিতে না পারিলে, নিজেরা ধোপা নাপিত বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত সহানুভূতি দেখাও। উচ্চ জাতিগণের গৃহে গিয়া জলচল হইবার জন্য ধন্না দিলে, সভা সমিতি করিয়া আবেদন নিবেদন জানাইলে কিছুই হইবে না। যে পর্য্যন্ত তোমরা সমুদয় অনাচরণীয় জাতি মিলিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিতেছ—সে পর্য্যন্ত তোমরা কিছুই করিয়া উঠিতে

পারিবে না। এই জন্যই "বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ" স্থাপিত হইয়াছে। শত শত লোক তাহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হও। টাকার মমতা করিও না; একবেলা আহার করিয়া অন্য বেলার টাকা জাতির মুক্তির জন্য দান কর। তোমরা আপাততঃ সামান্য টাকা পয়সার মমতা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ কর। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারে কত লক্ষ বানর সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন—জান ত? যুধিষ্ঠির অর্দ্ধ ক্রোড়াধিক ক্ষত্রিয় সন্তান এমন কি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সুভদ্রা নন্দন অভিমন্যুকে পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধানলে আহুতি দিয়া তবে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। যত বড় ত্যাগ,—তত বড় সিদ্ধি, যত বড় বলি—তত বড় লাভ। বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায়, বিনা আত্ম-বলিতে কোন জাতি কখনও বড় হয় নাই। তোমাদেরও সেই আত্মবলি—জীবন বলি দিতে হইবে; অর্থ ত সে তুলনায় কিছুই নয়। শত শত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত জাতির উত্থান পতন হইল কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যে একটা লোকও মানুষের মত মানুষ হইতে পারে নাই। সহস্র সহস্র লোক আহার নিদ্রা ও বংশ বৃদ্ধির কার্য্যেই নিমগ্ন আছে—কেহই সমাজের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া খাটে নাই; জীবন বলি দেয় নাই। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাদের আজি এই দুর্দ্দশা—এই শোচনীয় অধঃপতন।

এই যুগ যুগ সঞ্চিত শূদ্রত্ব ও হীনত্বের পাষাণ-বোঝা তোমাদের মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিতে হইবে। এই চির-অভ্যস্ত অপমান নির্য্যাতন, আলস্য জড়তা দূর করিয়া সকলকে আত্মসম্মান-বোধ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। নিজেরা কয়েকজনে মাথা পাতিয়া সমুদয় অত্যাচার অবিচার নিন্দা গ্লানি গ্রহণ কর। যাহাদিগকে তোমরা মানুষ করিতে যাইতেছ, তাহারাই মূর্খগণকে লইয়া দল পাকাইয়া তোমাদিগকে 'একঘরে' করিবে। নিজেদের গৃহ পরিবার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য

হইতে কত বাধা নিষেধ, হাহাকার রোদন ধ্বনি উত্থিত হইবে। নিরক্ষর বৃদ্ধ সমাজপতি, বাপ, পিতামহ, মামা মাতামহ, ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিবেন—এ সকলে অচল, অটল পাহাড়ের মত দৃঢ় থাকিতে হইবে। সমাজের যত তরুণ ও যুবকের দল আছে তাহাদিগকে বুঝাইয়া হাত কর, তারপর সেই যুবক মণ্ডলী লইয়া উপবীত গ্রহণ করতঃ দ্বিজোচিত অশৌচ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ কর। প্রথমতঃ গ্রাম গ্রামান্তর হইতে চীৎকার উঠিবে, ধর্ম্ম গেল—পরকাল গেল—সর্ব্বনাশ হইল। শ্রাদ্ধ শান্তি লোপ করিল বলিয়া আর্ত্তনাদ উঠিবে—তারপর মাসের পর মাস গেলে আস্তে আস্তে সমুদয় আন্দোলন কমিয়া যাইবে, ২।৪ জন করিয়া লোক তোমাদের দলে যোগদান করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে, বিশেষ কিছু আশা করিও না, নিরাশার মধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। শত আন্দোলন, আলোচনা সভা সমিতি অপেক্ষা একবিন্দু কৃতকর্ম্মের মূল্য অনেক বেশী। কিছু করিয়া দেখাও, গ্রাম হইতে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার, মিলের বস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়া খদ্দর প্রতিষ্ঠা কর। পরিধানে একখানা বিদেশী কাপড় বিদেশী পিরাণ চাদর দেখিলেই—দর্শকের মনে ঘৃণা আইসে, তাঁহারা মনে করেন—ভারত জননী জন্মভূমি বোধ হয় ইহাদের জননী নয়। দেশের সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে জাতিকে এমন করিয়া হীন ও অধম বলিয়া প্রতিপন্ন করিও না; পাপের বোঝা আর বাড়াইও না। যাহারা বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিবে—সমাজে তাহাদিগকে অচল অনাচরণীয় ও অপাংক্তেয় কর। তাহাদিগের সঙ্গে পংক্তিভোজন করিও না। পিতা মাতা—তোমাদের কাতর প্রার্থনা, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ না শুনিলে আহার ত্যাগ কর, কথা বন্ধ কর, অবশেষে গৃহত্যাগ করিয়া স্বদেশের কার্য্যে লিপ্ত হও। মনকে পাষাণের মত দৃঢ় কর, শক্ত কর। নিজের স্ত্রী যদি বিদেশী কাপড় পড়ে—সে কাপড়ে নিজ হাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া খদ্দর ক্রয়

করিয়া আনিয়া পরিতে দাও। কাহারও বাধা শুনিবে না, সংসার পরিবার, স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী অপেক্ষা জননী জন্মভূমি অনেক বড়।

পুরোহিতগণকে সকলে মিলিয়া বল—যে গৃহে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হয় সে গৃহে পূজা পার্ব্বণ—শ্রাদ্ধ শান্তি বর্জ্জন করিতে। যে গৃহে একটিও চরকা চলিবে না, খদ্দর পরিধান করিবে না—সে গৃহে পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় আসিবেন না।

তোমরা কি মনে ভাবিয়াছ একদল যুবক—দেশের জন্য, আত্মোন্নতির জন্য প্রাণ দিবে, নির্ব্বাসন কারাগার বরণ করিয়া লইবে আর তোমরা নিশ্চিন্ত মনে দেশদ্রোহিতা করিয়া—সমাজে বড় বলিয়া গৃহীত হইবে! সে আশা মনের কোণেও স্থান দিও না। মহৎ না হইলে সমাজে কখনও মহতের সম্মান পাইবে না, বড় না হইলে সমাজে কখনও বড়র সম্মান পাইবে না। জাহাজ ষ্টিমার চলিয়া গেলেও যেমন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ থাকে তেমনি সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয়,—জগতের কল্যাণকামী ঋষিগণের পুণ্যের ত্যাগের ও সাধনার জোরে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণ শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেছেন। বিনা কারণে সমাজ তাঁহাদিগকে এই শ্রদ্ধা ভক্তি দান করে নাই। তোমাদিগকেও সেই ত্যাগ, সেই মহত্ত্ব, সেই উদারতা দেখাইতে হইবে। ফাঁকি দিয়া বড় হইতে বা জাতিকে বড় করিতে পারিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হয় না, প্রেম, সত্যানুরাগও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।"

স্মরণ রাখিবে বিনা কারণে জাতির পতন হয় নাই, আর বিনা সাধনায় জাতির উদ্ধার নাই। কাজ শক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমরাও ত সর্ব্বশক্তির আধার। বিশ্বাস কর, তোমাদের দুঃখনিশা অবসানপ্রায়। সিংহ তেজে—সিংহ বলে—সিংহ বীর্য্যে বলীয়ান্ হইয়া উঠ, সকলের উদ্দেশ্য এক কর, সকলে একত্র মিলিত হও, দেখিবে তোমাদের মধ্যে

কি অদম্য শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। স্মরণ রাখিও, তোমরা সমাজের কারো অপেক্ষা এক রতি ছোট, দুর্ব্বল, হীন, নীচ, অক্ষম, অশক্ত নও; মনে রাখিও অনন্ত শক্তি তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে, জাগাইলেই সে শক্তি জাগ্রত হইবে। এমন সুদুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াও কি পশু পক্ষীর মত হীন জীবন যাপন করিবে? সমাজের অন্যায় অবিচার অত্যাচার পীড়ন মাথা পাতিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে বহন করিয়া আসিবে! লাথি জুতার বিনিময়ে কত আর বিশ্বপ্রেমিকের মত পদরজ পদজল পান করিয়া শূদ্র-জন্ম ধন্য করিবে। "শূদ্র-দাস" বলিয়া পরিচয় দিতে এতটুকুও কি ঘৃণা বোধ হয় না। পরলোকগত, স্বর্গধামবাসী পিতামাতাকে আর কতকাল শ্রাদ্ধে বিবাহে দাস দাসী বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই স্বর্গবাসী পিতা মাতাকে অপমানিত করিবে! পিতা মাতা কি পুত্রের কাছে দাস দাসীতুল্য—না—পরমারাধ্য পরমপূজনীয়! এই সব মহাপাপ ত্যাগ করিতে হইবে। পুত্রের কাছে পিতামাতা চিরকালই দেব দেবী সুতরাং ক্রিয়াকাণ্ডেও পিতা মাতার দেব দেবীর তুল্যই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, তরু গুল্ম লতা পাতা পর্য্যন্ত নব ফুলে ফলে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, গাছ পাথরেও প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে! এ সময় আর কেহ ঘুমাইয়া থাকিও না—জাগ, জাগাও, ভারতে নবযুগ আনয়ন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হও—তোমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশের দুঃখ দৈন্য, শোকতাপ অপমান ব্যথা দূরীভূত হউক, ৩২ কোটী নর নারীর সর্ব্ব দুঃখের অবসান হউক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণ হইতেই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—কোটি কোটি নর নারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পিতা, জনক ও স্রষ্টা শ্রীভগবান। জলবিম্বের যেমন জলেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিম্বা সমুদ্র-তরঙ্গের যেমন সমুদ্র হইতেই উৎপত্তি সমুদ্রেই স্থিতি এবং সমুদ্রেই লয় হয়, সৎ-চিৎ-আনন্দ-সাগর শ্রীভগবান হইতেই সেইরূপ এই জগৎ ও অনন্ত কোটি জীব জন্তু নরনারীর উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহার মধ্যেই লয় হইবে। কুম্ভকার যেমন এক মাটি দিয়াই মানুষ পশুপক্ষী নানাবিধ জীব জন্তু গড়ায় অথবা মোদকগণ যেমন এক চিনি দ্বারা নানা প্রকার বিভিন্ন সাঁচে ঢালিয়া বিভিন্ন আকৃতির মিঠাই তৈয়ার করে, শ্রীভগবানও তেমন এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। উপাদানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সৃষ্টিতে বড় ছোট উত্তম অধম কোন পার্থক্য নাই ও ছিল না। পার্থক্য আমরাই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি। সৃষ্টির আদিতে এত বিভিন্ন জাতি ছিল না। সর্ব্ব প্রথম ভগবান এক মানব দম্পতী সৃষ্টি করেন; সেই যুগল মানব মানবী হইতেই কোটি কোটি নর নারীর উদ্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নারী পুরুষরূপে শতরূপা ও স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন। বাইবেল ও কোরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে আদম (আদি মানব বা মনু) ও ইভ (হাওয়া) হইতে বিশ্বের নর নারীর সৃষ্টি। এই স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা নারী হইতে নর নারীর সৃষ্টি আরম্ভ। আর একস্থানে আছে ব্রহ্মা প্রজাপতি মরীচিকে সৃষ্টি করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ এবং তাঁহার স্ত্রীগণ হইতেই দেব দৈত্য

দানব মানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কিন্নর পশু পক্ষী জীব জন্তুর উৎপত্তি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম আদিতে জন্মের সময় বড় ছোট উত্তম অধম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শূদ্র হইয়া কেহই জন্মে নাই। এক যুগল মানব দম্পতী বা এক যুগ্ম নর নারী হইতেই সমুদয় মানবের শাস্ত্রকথিত চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। (১) আদি যুগের একই মানব গুণ কর্ম্ম বৃত্তি ব্যবসা ভেদে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হন। সেই চারি বর্ণ হইতেই ভারতের শত সহস্র জাতি বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যা জপ হোম দেবপূজা বেদ বেদান্ত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন তাঁহাদের নাম হইল ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধ বল বীর্য্যের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, যুদ্ধে প্রাণদান, গো বিপ্র, ধর্ম্ম প্রজা রক্ষণের জন্য আত্মত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন তাঁহাদের নাম হইল ক্ষত্রিয়; যাঁহারা কৃষি কার্য্যে ব্যবসা বাণিজ্যে, গো প্রতিপালনে নিরত হইয়া মানব পুঞ্জের ভরণ পোষণে আত্মনিয়োগ করিলেন তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য, আর এক দল যাঁহারা এই ত্রিবর্ণের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিজেদিগকে নিযুক্ত করিলেন—যাঁহারা সরল শান্ত অকপট, পড়াশুনায় বল বীর্য্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসমর্থ তাঁহারাই হইলেন শূদ্র। বলা বাহুল্য ইঁহারা সম্পর্কে পরস্পর জ্ঞাতি ভ্রাতা—একই পিতামাতার বংশধর। গুণ কর্ম্ম ব্যবসা বৃত্তি ভেদে সমগ্র জাতির সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় চারি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। তখন ইহাঁদের মধ্যে কোন বড় ছোট উত্তম অধম উচ্চ নীচ ভাব ও বোধ ছিল না। পরস্পরের সঙ্গে আহার পান ও বিবাহাদি অবাধে চলিত। এখন যেমন এক পিতার সন্তান কেহ উকীল কেহ মোক্তার কেহ ডাক্তার কেহ দোকানদার কেহ কেরাণী কেহ জোত্দার হয় এবং পরস্পর এক সঙ্গে আহারাদি

(১) বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত জাতিভেদ ও চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অবাধে করে, উকীল, মোক্তার অধ্যাপক কেরাণী ব্যবসায়ী জোত্‌দারের মধ্যে বিবাহ আদান প্রদান চলে, প্রাচীন কালেও তেমনি চলিত। সহস্র সহস্র বৎসর সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই নিয়মে সমাজ পরিচালিত হইয়াছে। তারপর জাতি, গুণ কর্ম্ম ব্যবসা বৃত্তি ভেদে না হইয়া বংশগত ভাবে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গুণ কর্ম্ম বৃত্তি বিচার দূরে গিয়া শেষে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষাত্রিয় এবং বৈশ্য শূদ্রের পুত্র বৈশ্য শূদ্রই হইতে থাকে, তা তাহাদের মধ্যে পিতা পিতামহের গুণ কর্ম্ম বৃত্তি থাকুক আর নাই থাকুক। এই খানেই জাতিভেদের বিষময় বীজ উপ্ত হইল এবং তাহারই ফলে ভারতীয় হিন্দু জাতির এই শোচনীয় অধঃপতন ও এই পলে পলে মৃত্যু যাতনাদায়ক—অবমাননাকর পরাধীনতা। আমাদের এখন কর্ত্তব্য সকলে মিলিয়া এই জন্মগত জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া—হিন্দু জাতি তথা ভারতবর্ষকে রক্ষা করা।

তেইশ কোটি নরনারীসমন্বিত হিন্দুর সমাজ-তরণী জলধিমগ্ন প্রায়। মনস্বীবর্গ জীবন পণ করিয়া তরণী উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা আরোহী। নৌকা নিমজ্জিত হইলে আমাদিগকেও ডুবিয়া মরিতে হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ—মহৎ ক্ষুদ্র, ধনী নির্ধন, সকলেরই একই দশা। সে কারণ ভারতব্যাপী উদ্ধার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দুগণই বাঁচিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী আমরা—বঙ্গদেশস্থ আর্য্য হিন্দু জাতির বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। বাঙ্গলার হিন্দু নরনারীর সংখ্যা দুই কোটি আট লক্ষ—তন্মধ্যে শতকরা ছয় জন ব্রাহ্মণ, একজন বৈদ্য, ছয়জন কায়স্থ—ইঁহারাই তথা-কথিত ভদ্র ও উচ্চ জাতি; বাঁকি ষোল জন* আচরণীয় এবং অবশিষ্ট সমুদয় ৭১ জন অনাচরণীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই মুষ্টিমেয় নগণ্য ভদ্র জাতি—অগণ্য মানবপুঞ্জের প্রতি দারুণ অত্যাচার ও অমানুষিক ব্যব-

হার করিয়া আসিতেছে। ইহারা যখন প্রতিদিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে স্বদেশবাসী, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি অবিচার করিয়া বিজাতি বিধর্ম্মী ও বিদেশীর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে, তখন অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ বিদ্রূপের হাসি না হাসিয়া পারেন না। যাহারা নিজেদের ভরণপোষণকারী রক্ষাকর্ত্তা—সেবক ভ্রাতাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুই একটি সামাজিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত—তাহারাই চায় গোটা ভারতের স্বাধীনতার অধিকার! পাগলামী আর কাহাকে বলে? তাই সপ্ত শত বৎসরেও সেই ন্যায়বান্ বিচারপতি বিশ্বপতির আসন টলে নাই— প্রাণ গলে নাই। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যেমন উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন—এমন কোন্ দেশের কোন্ ঋষি কোন্ যুগাচার্য্য করিয়াছেন? কাহাদের কণ্ঠে জীব-ব্রহ্মের অভেদ উক্তি—'তত্ত্বমসি' 'শিবোহং' 'যত্র জীব তত্র শিব' বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল? নর-নারায়ণ শব্দ সৃষ্টি করিয়া কাহারা ভাষাজননীর কণ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন? আর কাহারাই বা এমন করিয়া দুই পা দিয়া সমাজ শাসনের নিষ্ঠুর অজুহাতে কোটি কোটি নরনারী দলিয়া আসিতেছে। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক শব্দ সৃষ্টি করিয়া দিবারাত্র মানবপেষণ যন্ত্র অবিরাম গতিতে চালাইয়া আসিতেছে। আর তাহার ফল? ফল ত হাতে হাতে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর হস্তে পরাজয় ও লাঞ্ছনা—নির্য্যাতন ও অধীনতা স্বীকার! রবীন্দ্র নাথ সত্যই বলিয়াছেন—

> "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান।
> অপমানে হ'তে হবে, তাহাদের সবার সমান॥"

কাদের ছোট, হীন, অস্পৃশ্য বলিতেছি আমরা, যাহাদের না হইলে এক দণ্ড চলিবার নয়, যাহাদের সেবা—হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমের উপর সমাজ-সৌধ টিকিয়া আছে, যাহারা যুগযুগান্তর হইতে বিদেশী অত্যাচারী শাসকগণের হস্ত হইতে—মান, ইজ্জৎ, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া

আসিতেছে, যাহারা অন্নে, বস্ত্রে, খাদ্যে, পানীয়ে, শিল্পে, বাণিজ্যে, দেশবাসীর সেবা ও সহায়তা করিতেছে, নিজেরা সম্মান হারাইয়া উচ্চ জাতিগণের সম্মান বাড়াইয়া আসিতেছে—যুগযুগান্তর হইতে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ও লাঞ্ছনার বিনিময়ে সহাস্য মূক মুখে নীরবে সেবা ব্রত চালাইয়া আসিতেছে—তাহারাই হইল কিনা ছোট লোক, ই তর লোক—অস্পৃশ্য? জানি না এই অবিচার, অন্যায় ও মানব-পীড়ন জননী জন্মভূমি আর কতকাল সহ্য করিবেন। সীমা যে ছাড়িয়াছে—অসহনায় যে হইয়া উঠিয়াছে তাহার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। বঙ্গের দিক্ চক্রবাল আলোড়িত করিয়া—নিপীড়িত অগণ্য মানবপুঞ্জের জীর্ণ কুটীর হইতে 'অভ্যুত্থান কর', 'অভ্যুত্থান কর'—এই কঠোর বজ্রধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের অবাধ বিদ্যা প্রচার—ছাপাখানা, সংবাদ পত্র—সমুদয় ভণ্ডামী, দুষ্টামী কাপট্য, শাঠ্য—তুক তাক্ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। বিংশ শতাব্দী সমুদয় অন্ধবিশ্বাস—লোকাচার, স্ত্রী-আচার, দেশাচার, অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। এই নবজাগ্রত যুগে আর মনু রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া সমাজ পীড়ন, সমাজ শাসন চলিবে না। এক দল মন্ত্রাস্ত্রবিদ্ নিমন্ত্রণ-ব্যবসায়ীর কথায় ও স্বার্থপরতায় অগণ্য মানব আর আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া থাকিবে না, আর তাহারা কলির—কল্কি-নারায়ণগণের পা চাটিয়া—সর্ব্বাঙ্গে পদধূলি মাখিয়া—পাদোদক খাইয়া—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া জন্ম জীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিবে না। সে বর্ব্বর-যুগ অতীত হইয়াছে—মানব-দলনের বর্ব্বর প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। মানুষ যে কখনও মানুষের উপাস্য ভগবান্ নয়—এই সত্য দৃঢ় বিশ্বাস সকলের প্রাণে দিন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। একদল বংশানুক্রমে পায়ের ধূলি ও পাদোদক দিয়াই যাইবে—আর একদল খাইয়াই যাইবে—এসব ধর্ম্মাচার আর এ যুগে চলিবে না। অবশ্য রাম কৃষ্ণ জন্মমাত্রই রাবণ কংস ধ্বংস হয় নাই—সে জন্য কিছু সময় লাগিয়াছিল, বড় হইবার অপেক্ষা

করিতে হইয়াছিল। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও সভামধ্যে লাঞ্ছনার পাপের ফল তদ্দণ্ডেই দুঃশাসন দুর্য্যোধন লাভ করে নাই সত্য,—সেজন্য বনপর্ব্ব, বিরাটপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব লাগিয়াছিল। তারপর কুরুকুল নির্ম্মূল! শত-করা ৮০ জন যাহাদের স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জীবিকার জন্য বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবিকা মারিতেছে—আশ্চর্য্য ও পরিহাসের বিষয় এই যে সেই বৈশ্য শূদ্র যদি বিনিময়ে শাস্ত্রব্যবসায়িগণের বৃত্তি গ্রহণে অগ্রসর হয়—তখন মহা কোলাহল—ধর্ম্ম গেল—ঘোর কলি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই: এর অবধি থাকে না। তোমরা করিবে তাদের বৃত্তি লোপ আর তারা তোমাদের বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিলেই দোহাই দিবে শাস্ত্রের, স্বপ্ন দেখিবে ঘোর কলির!! মজা ত মন্দ নহে? সাহা সুবর্ণ বণিক তেলী নমঃশূদ্রের অন্নাহারে জলপানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির জাত্ যায়—সাহা নমঃশূদ্রজাতি-ভুক্ত হইতে হয়—কিন্তু সাহা সুবর্ণ বণিক তেলী নমঃশূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের অন্ন পানীয় গ্রহণে কখনও ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে কায়স্থ ব্রাহ্মণের অন্ন পানীয়ের কোনই ধক্ নাই—শক্তি নাই—মহিমা নাই—কিন্তু সাহা সুবর্ণ বণিক নমঃশূদ্র কৈবর্ত্তের অন্ন পানীয়ে অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান। আর এক কথা—এই সব অশুদ্ধ অস্পৃশ্য অনাচরণীয়গণের মন্দির প্রবেশে, ঠাকুর দেবতা স্পর্শে বিগ্রহদেব অশুদ্ধ হন—অস্পৃশ্য হন—অব্যবহার্য্য হন কিন্তু ইহারা দেবতার সংস্পর্শে আসিয়া দেবতা হয় না শুদ্ধ হয় না—পবিত্র হয় না। দেখা গেল দেবতা অপেক্ষা ইহাদেরই তাড়িৎ শক্তি অধিক। এই সব ছেলেমানুষেমি ও ভণ্ডামী আর বেশী দিন চলিবে না ইহা নিশ্চিত"।

কতকগুলি জীর্ণ পুঁথির শ্লোক আওড়াইয়া আর মানবপেষণ কার্য্য অবাধে চলিবে না। প্রকৃত ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গে এখন স্বার্থপর

নিমন্ত্রণব্যবসায়িগণের স্বেচ্ছাকল্পিত বচন মিশিয়া উহাকে জগাখিচুড়ি করিয়া তুলিয়াছে। শাস্ত্রেরও সংস্কার করিতে হইবে—আসল শাস্ত্র হইতে ভেজাল শাস্ত্র কষিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

এদেশের বহু পণ্ডিতমূর্খের ধারণা ব্রাহ্মণগণ বিরাট পুরুষ ভগবানের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইতে, বৈশ্য উরু ও শূদ্র পাদ হইতে উদ্ভূত। শূদ্রকে "জঘন্য স্থান" হইতে উৎপন্ন বলিয়া—ছোট বলা হইয়াছে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম জঘন্য স্থানই বটে! এমন না হইলে কি আবার ঋষি। আমি বলি যদি ইহাই সত্য হয় তবে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পূজনীয় ও আরাধ্য,—কেন না—শ্রীপাদনিঃস্রিতা জাহ্নবী যখন ত্রিলোক আরাধ্যা দেবী। বস্তুতঃ এসব রূপক বর্ণনা মাত্র। পুরাণকারগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন—ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। (পদ্মপুরাণ); একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির; ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) ইত্যাদি। অর্থাৎ আদি যুগে সৃষ্টির প্রথম কালে একবর্ণ মাত্র ছিল। সেই ব্রাহ্মণ কথিত একবর্ণ হইতে পরে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হয় এবং এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। গায়ের জোড়ে বড় বলিলেই ত ন্যায় শাস্ত্র অনুসারে বড় হওয়া যায় না। ঋষিদের নামে আইন রচিয়া অন্য সকলকে ধীরে ধীরে বিদ্যা জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া এ দেশকে মূর্খের দেশে পরিণত করা হইয়াছে। শাস্ত্রের নামে যা তা লিখিয়া ও বলিয়া এদেশের কোটি কোটি নরনারীর মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। সহস্র অন্যায় ও লক্ষ অনাচার করিলেও ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণই, আর অশেষ সৎগুণে ভূষিত হইলেও—ধর্ম্ম দয়া সত্য তিতিক্ষা ভক্তি ভূষণে অলঙ্কৃত হইলেও শূদ্র সন্তান শূদ্রই—ইহা আধুনিক অত্যাচারীগণেরই বিধান। ইহার মূলে কোন শাস্ত্র নাই,—শাস্ত্র থাকিতে পারে না। কে না জানে বেশ্যা পুত্র বশিষ্ঠ, বেদব্যাস কৈবর্ত্তকন্যা

গর্ভ-সম্ভূত, দাসীপুত্র নারদ,—শূদ্রাণী গর্ভ সম্ভূত মহামুনি কুশিক, সিন্ধু মুনি শূদ্রাগর্ভ সমুৎপন্ন; ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর পুত্র শুকদেব গোস্বামী; নাবিক কন্যা গর্ভসম্ভূত মুনি শ্রেষ্ঠ মন্দপাল—দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল; পরাশর ঋষি শ্বপাক (চণ্ডাল জাতীয়) কন্যার গর্ভজাত; ক্ষত্রিয় পুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি, ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র ব্রাহ্মণ মিত্রায়ু; শিনির পুত্র গার্গ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অধিক দেখাইবার স্থানাভাব। গুণ কর্ম্ম ও বৃত্তি দ্বারা একই ব্রাহ্মণবর্ণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকার বলিতেছেন ইহারা পরস্পর জ্ঞাতিভ্রাতা। পরিতাপের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ এখন মানুষকে জ্ঞাতিত্বে বঞ্চিত করিয়া বিড়াল বেজি—কাক কবুতরকে জ্ঞাতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এই সব পশুপক্ষী রান্না ঘরে গেলে, খাদ্যদ্রব্যে মুখ দিলে—রান্না ঘর ও খাদ্যদ্রব্য অশুচি অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য হয় না—কিন্তু শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ধরিত্রীর গৌরব মানুষ ঘরে গেলে ঘর—দেবতা—খাদ্যদ্রব্য, জলের কলসী পর্য্যন্ত অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া যায়। মানব পীড়ন আর কাহাকে বলে? আমি আপনাদিগকে সেই মানবোচিত অধিকার সমাজের নিকট কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে বলি। এইটীই আসল গোড়ার কথা।

কে আছ—স্বজাতি প্রেমিক! এস, এই মহাপাপ বর্ত্তমান জাতিভেদ ও তাহারই বিষময় ফলস্বরূপ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর হও, জীবন পণ কর। বৈদিক যুগের গুণ কর্ম্ম গত জাতিভেদ ও সাম্য যখন অন্তর্হিত হইল তখন এক দল স্বার্থপর আভিজাত্যাভিমান-অন্ধ, ভবিষ্যৎ চিন্তা হীন ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণ সংহিতা ও পুরাণের নামে সহস্র সহস্র জাতি বিদ্বেষমূলক হিংসা নিন্দা পূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া মুনি ঋষির নামে চালাইতে লাগিলেন। উহার ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণের মধ্যে ভেদ-বাদের চীনের প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। ব্রাহ্মণগণ লিখিলেন

যে হেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার উচ্চ অঙ্গ মুখ হইতে জাত সে কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয় বাহু হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অবনত, বৈশ্য উরু হইতে জাত বলিয়া সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে অপকৃষ্ট এবং শূদ্র বিরাটপুরুষ ব্রহ্মার পদ হইতে উদ্ভূত হইয়া তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে নিকৃষ্ট অধম ও হেয়। ব্রাহ্মণগণ অতঃপর এই তিন বর্ণের মধ্য হইতে বিবাহ আহারাদি বন্ধ করিয়া দিলেন, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণের দেখা দেখি বৈশ্য শূদ্রের অন্ন ও কন্যা গ্রহণ রহিত করিলেন। বৈশ্যগণ উপরের কর্ত্তা ও নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অনুকরণে শূদ্রের সহিত সর্ব্ব প্রকার সংস্রব বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য শূদ্রগণকে ঘৃণার সহিত পরিবর্জ্জন করিয়া তাহাদের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান, তাহাদের হাতের অন্ন জল অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও এই আত্মসম্মান জ্ঞানহীন অধম বলিয়া স্বীকৃত বৈশ্য শূদ্রগণ উহাদের অন্ন ভোজনে জল পানে পাদোদক সেবনে বিরত হইল না। নিজেদের হীনত্ব নীচত্ব অধমত্ব ছোটত্ব ও অস্পৃশ্যত্ব নিজেরা অবনত শিরে মানিয়া লইল। এখান হইতেই অস্পৃশ্যতার আরম্ভ। ব্রাহ্মণগণ অনেক পূর্ব্ব হইতেই বেদ বেদান্ত হইতে অন্য তিন বর্ণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্লোকের পর শ্লোক, সংহিতার পর সংহিতা রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন শূদ্রগণের কোনও অধিকার নাই; তাহারা তিন বর্ণের সেবক মাত্র—তাহারা প্রকৃতিদত্ত কৃতদাস। তাহারা জন্মের পর হীনতাবাচক নাম রাখিবে, লেখা পড়া জ্ঞান চর্চ্চাদি করিতে পারিবে না; শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্ম সাধনে বেদমন্ত্র ওঁকার উচ্চারণে ও শ্রবণে অনধিকারী; উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, শ্রবণে কর্ণভেদ দণ্ড; পূজার্চ্চনায় প্রাণ দণ্ড। বিড়াল, বেজি, ভেক, কুকুর, গোধা ও পেচক হত্যা শূদ্র হত্যার সমান, প্রায়শ্চিত্ত—এক দিবারাত্রি উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম

দ্বারা শুদ্ধিলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি (১)। এই সব অবিচার অত্যাচারে যখন কোটি কোটি লোক নিপীড়িত হইতে লাগিল,—যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পীড়নে ও লাঞ্ছনায় ইহাদের জীবন ধারণ ভয়াবহ হইয়া উঠিল—যখন কোটি কোটি পদদলিত লাঞ্ছিত—নিগৃহীত মানব-পুঞ্জের ক্ষত বিক্ষত প্রাণ হইতে আর্ত্তনাদ উঠিল, তখনই মহা সাম্যাবতার প্রেমসিন্ধু বুদ্ধদেবের আগমন। তাঁহার সাম্য প্রচারে প্রেমের বন্যায় স্মৃতি সংহিতা পুরাণ উপপুরাণের হিংসা দ্বেষপূর্ণ শ্লোকের গর্ব্ব ও আধিপত্য ভাসিয়া গেল;—ভারতের ১৫ আনা লোকে বুদ্ধদেবের সাম্যের শীতল পতাকামূলে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। শুধু এসিয়ার নহে পৃথিবীর বার আনা লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। ভারত সম্রাট অশোক ২৫৮ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধের সাম্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ও সাড়া ভূমণ্ডলে প্রচারকদল শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়া বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত থাকে। এই সময় বৈদিক যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজা উপবীত অশৌচ সব উঠিয়া যায়। বৈদিক বা স্মৃতির আচার ব্যবহার—অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিয়ম কানুন ব্রত উপবাস সব উঠিয়া যায়। দেশের প্রায় সকলেই, ১৫ আনা লোকই তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। উপবীত আদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোন চিহ্নই ছিল না। সকলেই এসব ছাড়িয়া ছুড়িয়া বৌদ্ধ-আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। এমন সময় প্রায় ১৪½ শত বৎসর পর আসিলেন—আর্য্য বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য ৮ম শতাব্দীতে। তাঁহারা উভয়ে যাহাকে পান তাহাকে ধরিয়া গঙ্গা গোদাবরী নর্ম্মদা তাপ্তি, সিন্ধু শতদ্রুতে স্নান করাইয়া পুনরায় আর্য্য বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ব্রাহ্মণ তৈয়ার করিতে

(১) বিস্তৃত বিবরণ মলিখিত জাতিভেদের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লাগিলেন। শত শত বৎসরের অকর্ম্মণ্য জীবন ধারণ, শাস্ত্র পাঠে বিরতি, মঠে মঠে ব্যভিচার, সাধন ভজন শূন্যতার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচালক শ্রমণগণ ক্ষীণ শক্তি বশতঃ ব্রাহ্মণ কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে শাস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নব তেজে নব উদ্যমে উৎসাহে—নব উদ্দীপনার সহিত বৈদিক ধর্ম্ম—বেদান্তের সাম্য বাদ—তত্ত্বমসি বাণী দেশের সর্ব্বত্র নদীতটে সমুদ্রসৈকতে গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে পল্লী প্রান্তরে—নগরে কান্তারে শত শত নবব্রাহ্মণের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওঁ তৎসৎ, একমেবা দ্বিতীয়ম্—তত্ত্বমসি বাণী। দলে দলে—সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ বিচার বিতর্কে পরাজিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তি পতাকা পুনঃ ভারত গগনে উড্ডিন হইল। আর যাহারা আসিল না—নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল না—নূতন বিজয় উল্লাসোন্মত্ত সমাজের একছত্র সম্রাট প্রচারক ব্রাহ্মণগণের চরণে শরণাপন্ন হইল না—বৌদ্ধধর্ম্মের পতনোন্মুখ অট্টালিকার ছায়া তল পরিত্যাগে তখনও অসম্মত হইল—বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্ম গ্রহণে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না—তাহারাই হইল—বর্ত্তমান যুগের চলমান শ্মশান—ব্রাহ্মণাদির পরিত্যজ্য—ক্রোধের বিষয়ীভূত—অস্পৃশ্যতার অভিসম্পাৎ প্রাপ্ত হতভাগ্য শূদ্রজাতি। সেই যে ব্রাহ্মণগণের কোপ ও ক্রোধ, হেয় ও হীন করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প, আজিও দূর হইল না—শত শত যুগেও ব্রাহ্মণগণের দয়া ও করুণা—স্নেহ ও মমতার সঞ্চার হইল না। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ম্মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্ধের নড়ি অবশিষ্ট বৌদ্ধগণ অগত্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের বংশধরগণই ভারতের বর্ত্তমান সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য অন্ত্যজ কথিত হীন শূদ্র।(১) আমরা চাই বর্ত্তমানে

(১) [২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৩৩৬, কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের ৩৫শ বার্ষিক সভায় সভাপতি ডাক্তার মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. মহোদয়ের

শূদ্র বলিয়া খ্যাত ও পরিচিত, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সন্তানগণকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত উপনয়ণাদি আচার গ্রহণ করাইয়া পুনর্ব্বার নিজদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে। কেহ যেন মনে না করেন আমরা শূদ্রসন্তানগণকে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ করিতে যাইতেছি বা হইতে বলিতেছি এবং এজন্য সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের নিকট নূতন অধিকার দানের জন্য করুণা ও সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি।

বক্তৃতা--"হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল কিরূপে?"—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬] সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন-- যে কান্যকুব্জ হইতে যখন পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আনীত হইলেন, তখন তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন যে, বাঙ্গলাদেশ সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হিন্দুর চিহ্ন নাই বলিলেই চলে। তাহারা কিরূপে নানা শাস্ত্রে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া ক্রমে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন—সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। ফলে ১২ শত বৎসর পরে এখন এমন হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম যে বাঙ্গলায় ছিল তাহাই বুঝিবার যো নাই; তাহা জানিবার জন্য ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে হয়।

বৌদ্ধদের সকল শাস্ত্রেই বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল—যথা ব্যাকরণ; শব্দশাস্ত্র, অলঙ্কার, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থের প্রভাব ও প্রচার খুব ছিল। লোকে বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমস্ত শাস্ত্রেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকে ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ এবং লোপ করিলেন। বৌদ্ধ ন্যায় ও বৌদ্ধ তন্ত্র বাঙ্গালী হিন্দুর নব্য ন্যায় ও তন্ত্রের অভ্যুদয়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার ব্যাকরণ ও স্মৃতি শাস্ত্রের চিহ্নমাত্র রহিল না। হিন্দুরা বৌদ্ধদের অনেক দেবদেবী পূজা পদ্ধতি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অনেক বৌদ্ধ বেমালুম হিন্দু সমাজে মিশিয়া গেল। যাহারা মিশিতে পারিল না, তাহারা পতিত ও অনাচরণীয় হইয়া রহিল। বাঙ্গলার বর্ণব্রাহ্মণ, যোগী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

* * * * "সাহা সুবর্ণ বণিকগণ পূর্ব্বে সব বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু-সমাজপতিগণের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত প্রবন্ধ "সত্তর বৎসর"—প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩৪]

ভারতবাসিগণ যেমন ইংরাজগণের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা চাহিতেছে না দাবী করিতেছে,—হৃত গৌরব পুনঃ স্থাপনে বদ্ধপরিকর; আমরা শূদ্র কথিত ব্রাহ্মণ বৈশ্য সন্তানগণও সমাজ সমক্ষে পূর্ব্ব পরিচয় দান করিয়া সমাজ পতিগণের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত সম্মান দাবী করিতেছি। কোন প্রকার করুণা বা অনুকম্পার ভিখারী ও প্রার্থী নহি। আমরা আমাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ—পূর্ব্বগৌরবের দাবী সমাজ সমক্ষে নির্ভীক অকম্পিত কণ্ঠে সুদৃঢ় বলে ঘোষণা করিতেছি। সমাজের কে কি বলিবে, কে কে কানাকানি বলা বলি করিবে, কে কি ভাবিবে—কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, টিট্‌কারী দিবে—সে সব ভাবনা ভাবিবার আমাদের মোটেই অবসর নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা ভাবুক, বলুক, ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা টিট্‌কারী করুক। যত ইচ্ছা করুক, আমাদের উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হইবে না। ও সব আমরা গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা' করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়াছি। সমাজপতি তর্করত্ন তর্কবাগীশ তর্কবাচস্পতি মহাশয়গণের নাসিকা কুঞ্চন —ভ্রূকুটী কুটিল কটাক্ষ আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিব না। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ যখন স্বার্থপরতা বশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণকে বঞ্চিত করিয়া সম্পত্তি ও জোত্‌জমি ধন ঐশ্বর্য্য স্বীয় ২ বংশধরগণকে মাত্র দিতে লাগিলেন—ব্রাহ্মণগণও তখন পাল্‌টা জবাব স্বরূপ বৈদিক যুগের উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া বেদবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা পূজার্চ্চনা—হইতে অন্য তিন বর্ণকে বঞ্চিত করিয়া শুধু নিজের ছেলেপেলে—ব্রাহ্মণবংশের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তান ব্যতীত আর কাহাকেও বেদ বিদ্যা দান করিলেন না। সরস্বতী, বেদমাতা গায়ত্রী, পুরাণ সংহিতা ও শাস্ত্র সমূহ ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল। তখনই লেখা হইল—শূদ্রের বেদ বেদান্তে অধিকার নাই—বেদ উচ্চারণে জিহ্বা ছেদ—শ্রবণে কর্ণরন্ধ্রে, গলিত সিসা নিক্ষেপ, বেদ মন্ত্র ধারণে অঙ্গ-

চ্ছেদ প্রভৃতি গুরুতর দণ্ড। কিন্তু এখন আর সে যুগ নাই। এখন অবাধ বিদ্যা প্রচারের যুগ—সকলের জন্য সকল শাস্ত্র উন্মুক্ত। মুদ্রাযন্ত্র সমুদয় শাস্ত্র গ্রন্থকে ব্রাহ্মণের লৌহ বাক্স গুপ্ত গৃহ হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের উন্মুক্ত হাওয়া সেবনে সাহায্য করিয়াছে। শাস্ত্র এবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার সুযোগ পাইয়াছে। বাপ্‌রে বাপ্‌, সে কি বন্দী দশা ! স্বার্থপরতার অন্ধকারময় রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ থাকা ! ! বিংশ শতাব্দী সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিয়াছে,—লোকের কুসংস্কার ধীরে ধীরে দূর করিয়া দিতেছে।

মার্টিন লুথারের মত নব অভ্যুত্থানকারিগণ বিরাট হিন্দু জাতিকে রক্ষা করিবার ব্রত লইয়া বিংশ শতাব্দীর নবীনালোকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন—শাস্ত্র কত উদার কত মহান্, এ জাতি কত বড়—বিশ্বে সাম্যবাদ প্রচারের ইহারাই আদি প্রচারক ও প্রবর্ত্তক। সকলেই এক বিরাট বিশাল আর্য্য জাতির বংশধর ; কেহই ছোট নয় নীচ নয় হেয় নয়—হীন নয়, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ নয়। অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মের ত্রিসীমার মধ্যে নাই। আবার বৈদিক যুগ—জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে ; আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,—আবার আর্য্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তি পতাকা ভারত গগনে উত্তোলিত করিতে হইবে—গৃহে গৃহে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া ভারত-আকাশ যজ্ঞীয় ধূম-পুঞ্জে কৃষ্ণ বর্ণে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে, আবার গৃহে গৃহে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা আলোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্মৃতি পুরাণের—অনুদার অসাম্য বাদ পূর্ণ শ্লোকাবলী—পরবর্ত্তী শূদ্র বিদ্বেষী অনুদার ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক লিখিত অংশ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়া—নূতন প্রাণ প্রদ মৃতসঞ্জীবক পুরাণ, নব সংহিতা—নূতন স্মৃতি সংগ্রহ ও রচনা করিয়া দেশের সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইবে। তবে এ জাতির উদ্ধার

এ জাতির রক্ষা। নতুবা এই ভাবে চলিলে এ জাতির পরমায়ু ৪২০ বৎসর মাত্র—বিজ্ঞগণ অঙ্ক কসিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

এ সব করিবে কে? যুগ যুগান্ত হইতে বেদ বেদান্ত পঠন পাঠন দর্শন শ্রবণ বঞ্চিত, অনুদারতা ও সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে বর্দ্ধিত, নর-নারায়ণ-বিদ্বেষ বিষ-জর্জ্জরিত, আধুনিক অনুদার ব্রাহ্মণগণের লিখিত স্মৃতি সংহিতার দোহাই-সর্ব্বস্ব, শূদ্রহিংসুক, অস্পৃশ্যতা-ব্যাধি-গ্রস্ত, ছুঁৎমার্গাবলম্বী আজ কালকার তর্করত্ন তর্কবাগীশ ও তর্কসিদ্ধান্ত, সরস্বতীর বর পুত্রগণ করিবে? ভাটপাড়া—নবদ্বীপ—কোটালিপাড়া—যশোদল—এসব করিবে? ভুল—তোমাদের বড় ভুল। টোলের ব্যাকরণ ষত্ব, ণত্ব—অনুস্বর বিসর্গে সমুদয় শক্তি নষ্টকারী—মরা গরুর পাঁতি দাতা, শ্রাদ্ধের বিরাট গীতার দাক্ষিণার আশাকারী, ম্লেচ্ছ প্রদত্ত উপাধি গৌরব মণ্ডিত ও তজ্জন্য মনে মনে শাস্ত্রজ্ঞানী বলিয়া বিপুল উল্লসিত ও অহঙ্কৃত, স্বজাতি স্বদেশ-প্রেম-ভালবাসা শূন্য, হৃদয় হীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশা ত্যাগ কর। পাষাণে নাস্তি কর্দ্দম। শকুনের যেমন দৃষ্টি ও লক্ষ্য থাকে মরা গরুর মাংসের দিকে—ইহাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্যও তেমনি ভারতের অবশিষ্ট ২৩ কোটি মুমূর্ষু হিন্দু নর-নারীর ভবিষ্যৎ শ্রাদ্ধের বিদায় ও দক্ষিণার দিকে। গত সাত শত বৎসরে ইহারা ৬০ কোটি হিন্দুর ৩৭ কোটিকে খাইয়া শেষ করিয়াছে; অনেক দেব-দেবী আরাধনা ও মানত করিয়া ৩৭ কোটিকে যমালয়ে দিয়া—তাহাদের প্রেতের পিণ্ডদান হইতে আরম্ভ করিয়া দশা—শ্রাদ্ধ—মাসিক—ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক সপিণ্ডকরণে লুচি সন্দেশে—দধি ক্ষীরে—বিদায় আদায়ে, দক্ষিণা চাউল কাপড়ে ভুঁড়ি মোটা করিয়াছে। এই ভারতের সমাজ-পতি পণ্ডিতরূপী নর-রাক্ষসগণ * সাত

* এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥

শত বৎসরে ৩৭ কোটি হিন্দুকে খাইয়া অবশিষ্ট ২৩ কোটির দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে—সজল জিহ্বায় তাকাইয়া আছে। এই সব নর-রাক্ষসদের হাত হইতে এ জাতিকে বাঁচাইতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে। এজন্য চাই, নূতন ব্রাহ্মণ, নূতন ক্ষত্রিয়, নূতন বৈশ্য; এজন্য চাই নূতন শাস্ত্র. নূতন সংহিতা। জীব যখন মায়া আবরণে আবৃত-ব্রহ্ম এবং ইহাই যখন বেদান্তের সার—অদ্বৈত তত্ত্বের সার শিক্ষা—তখন তোমাদের পক্ষে নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির বা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দান ত অনেক ছোট কথা। এজন্য ভয়ই বা কিসের, অনুমতিই বা কার প্রয়োজন? উপনিষদে যোগাবাশিষ্টে—গীতা ভাগবতে হাজার হাজার প্রমাণ ও শ্লোক আছে—জীব ব্রহ্মের অভেদত্ব সম্বন্ধে।

অবাধ বিদ্যা প্রচার ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে এদেশের কোটি কোটি লোকের শত শত বৎসরের ভ্রান্ত ধারণা—হীনত্ব বোধ দূর হইয়াছে। বৈদ্য ও যোগীগণ বুঝিয়াছে, তাহারা শূদ্র বা বৈশ্য নহে—তাহারা ব্রাহ্মণ;

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাপি বরাহপুরাণে মহেশ বাক্যং—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥"

অনুবাদ:—রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; আর সেই ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া, কাল প্রভাবে যাঁহাদিগের দশবিধ সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি অথবা যাঁহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোত্রিয়-কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিষেধ করিবার॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি খণ্ড, ১১শ অধ্যায়, শেষাংশ।

যোগীগণ উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছে। নমঃশূদ্র ও ঋষিদাসগণের অশৌচ ব্রাহ্মণের ন্যায় দশ দিন মাত্র। সুতরাং ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ছিল—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে আমরা ভীতি, দুর্ব্বলতা, লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, ভাবনা ত্যাগ করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি—যদি সত্যই তাহারা মনে করে যে তাহারা ব্রাহ্মণের সন্তান—ব্রাহ্মণ বংশধর। কায়স্থ রাজবংশী ঝালমাল, গোপ, করণ, কর্ম্মকার, মাহিষ্য, কোচ, শুঁড়ি, হদি, পোদ, পুঁরো, নট, আগুরী, বাগ্‌দী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশধর, রাজপুতানার ঝল্লমল্ল ক্ষত্রিয়, যদুবংশীয়, ক্ষত্রিয় ঔরসোৎপন্ন বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত ক্ষত্রিয়, খশ্‌ ক্ষত্রিয়, শৌণ্ডিক, হৈহয় ক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, উগ্র ক্ষত্রিয় ও ব্যগ্র ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে, এবং কায়স্থ, রাজবংশী, কোচ, হদি প্রভৃতিগণের অধিকাংশ ব্যক্তিই ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন আচার ব্যবহার, ১২শ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়গণের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক দ্বাদশ দিন অশৌচ ও অত্যল্প সংখ্যক লোক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক, তাম্বলি বণিক, কংসবণিক, শঙ্খবণিক, সাহা, তন্তুবায়, তিলি, তেলি, মোদক, বারুজীবী, কুম্ভকার, সূত্রধর মালী, প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ আপনাদিগকে বৈশ্য সন্তান বা বৈশ্য বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে, এবং প্রায় সকলেই শাস্ত্র হইতে শ্লোক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পুথি, পুস্তিকা বাহির করিয়াছে। যদি বল সকলেই যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তবে শূদ্র কে? আমি বলি শূদ্র সেই—যে দাসত্ব, চাকুরী বা গোলামী করে। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্"। পরিচর্য্যা বা দাসত্বই শূদ্রের পক্ষে স্বাভাবিক কর্ম্ম। সেই শূদ্র যে পরের দাসত্ব করে—তা ৬ হাজার ৪ হাজার বা ২।১ হাজার টাকারই হউক, আর ২।১০।২০।২৫।৫০।১০০।৫০০ শত টাকারই হউক।

গোলাম—গোলামই, বড় গোলাম আর ছোট গোলাম, বড় শূদ্র আর ছোট শূদ্র।

১৯১১ সনের ভারতীয় সেন্‌সাসে লিখিত হইয়াছে—চতুর্ব্বর্ণ এখন ২৩৭০টী প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের অন্ন বাদে কেহ কাহারও অন্ন ভোজন করে না; অনাচরণীয়গণের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান ও একে অন্য অপেক্ষা নিজেদিগকে বড় জাত্‌ মনে করে। নিজেরা যদিও সমাজে অস্পৃশ্য ও নিতান্ত হেয় ভাবে অবস্থান করে, তত্রাচ প্রত্যেকেই জাত্যভিমানে স্ফীত। সংখ্যায় এই অনাচরণীয়গণই বঙ্গ দেশে প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ—১৬ আনার ১২ আনা। তত্রাচ শত শত বৎসর ধরিয়া ইহারা সমাজস্থ মুষ্টিমেয় উচ্চ আচরণীয় জাতিদের ঘৃণা অবজ্ঞা, অপমান লাঞ্ছনা, নিগ্রহ পীড়ন ভোগ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে ইহাদের ক্ষোভ নাই, রোষ নাই, লজ্জা নাই, ধিক্কার নাই, ঘৃণা নাই, অপমান বোধ নাই। শত শত বৎসরের পীড়ন ও অত্যাচারের ফলে ইহারা আকারে মানুষ হইলেও পশুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদেরই পূর্ব্বতম দূরতম পুরুষ যে একদিন ব্রাহ্মণ ছিলেন—এবং সেই একই ব্রাহ্মণ বর্ণ যে পরে ক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে পরিণত হন এবং পরবর্ত্তিকার ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যে তাহারা নিকটতম বংশধর, শূদ্রোচিত অশৌচাধিক্যে—৩০ দিনে এবং উপনয়ন অভাবে ইহারা শূদ্রবর্ণভুক্ত হইয়া এই অবহেলিত তিরস্কৃত ধিক্কৃত ও অবমানিত জীবন যাপন করিতেছে এ জ্ঞান ইহাদের নাই। এই জ্ঞান ইহাদিগকে পুনরায় দিয়া ইহাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থানে স্বাধিকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পদবীতে উন্নীত করিতে হইবে। কাজ শক্ত কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা। অসম্ভবকে সম্ভব করা, অসাধ্যকে সুসাধ্য করাই আমাদের জীবন ব্রত। মরা মানুষকে জীয়াইয়া তোলাই আমাদের কাজ; আমরা মৃত্যু-বিজয়ী মহাশক্তির সন্তান। ভয়কে আমরা ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেই।

অব্রাহ্মণগণের পরম দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কর্ণধার নেতা ভাগ্য-বিধাতা লিখিলেন—বঙ্গদেশে দুই বর্ণ মাত্র, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। অন্য কোন বর্ণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের শিষ্য চেলা ও ভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই বচনের দোহাই দিয়া বলিতেছেন—বঙ্গদেশে আমরা ব্রাহ্মণ ও তোমরা শূদ্র এই দুই জাতি আছি মাত্র। নিজেদিগকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া অবশিষ্ট সমুদয় হিন্দুসন্তানগণকে তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নস্থ ক্ষত্রিয় ও তন্নিম্নস্থ বৈশ্য অপেক্ষাও হেয় ও নিম্নতম অধম শূদ্র বলিতেছেন। বঙ্গের ২ কোটি ৭ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণ বাদে সকলকেই তাঁহারা শূদ্র করিয়া ফেলিলেন এবং শূদ্র বলিয়া সকলকে জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। এবং বলিতে বেদনায় হৃদয় ভরিয়া উঠে তাঁহারা এই অবশিষ্ট—শিক্ষা দীক্ষায় জ্ঞানে বিদ্যায় বঞ্চিত—হতভাগ্যগণকে সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর শূদ্রত্বে প্রমোশন দিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না—তার উপরে তাহাদিগের ললাটে জারজত্বের—শঙ্কর বর্ণত্বের ঘৃণিত তিলক পরাইয়া দিলেন। নিজেদের বাদ দিয়া আর সকলকেই জারজ বলিয়া লিখিয়া দিলেন। গোদের উপর বিষস্ফোটক! কুব্জত্বের উপর পৃষ্ঠব্রণ!! ব্রাহ্মণগণের ক্ষুদ্রপ্রেমের-চরম নিদর্শন! পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন!!

একে ত্রিবর্ণের দাস সেবক শূদ্র, তাহাতে জারজ, তার উপরে অনেকগুলি জাতিকে বলা হইয়াছে অন্ত্যজ। প্রেমের অগাধ, অফুরন্ত পরিচয়! দুঃখ হয়, তবু এই সব অব্রাহ্মণ নর-পশুদের ঘৃণা নাই, ক্ষোভ নাই, রোষ নাই, পা চাটায় অরুচি নাই, প্রণামে বিরতি নাই, পল্লীরাস্তা রাজপথ-পরিত্যক্ত বিষ্ঠামূত্র বিমর্দ্দিত পাদ-ধৌত জলপানে দ্বিধা নাই, অসম্মতি নাই, ঘৃণা নাই; ব্রাহ্মণগণের সম্মোহন মন্ত্রের কি শোচনীয় প্রভাব! রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—কলিতে দুই বর্ণ মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ নাই, আর মনুসংহিতা বলিতেছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন

বর্ণ দ্বিজাতি, অবশিষ্ট চতুর্থ সকলেই একজাতি শূদ্র ; ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণবাদে বাঙ্গলার সমস্ত জাতি বৈশ্য কায়স্থ, কর্ম্মকার, কুম্ভকার হইতে আরম্ভ করিয়া সাহা, সুবর্ণ বণিক, নমঃশূদ্র. পোদ বেহারা, বাগ্দি পাটনী মালী, মুচি, কেওড়া, হাড়ি, ম্যাথর, ডোম, মুদ্দাফরাস সকলেই এক জাতি—চতুর্থ বর্ণ—শূদ্র। হিন্দু আইনে (Hindu Law) এই কথাই লেখা হইয়াছে এবং কায়স্থ ডোম কন্যার মোকদ্দমায় কলিকাতার হাইকোর্ট ও বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল একই রায় দিয়াছেন। হিন্দু আইন অনুসারে বিচারপতিগণ রায়ে লিখিয়াছেন যে "বাঙ্গলার অব্রাহ্মণ মাত্রেই শূদ্র, কায়স্থ ও শূদ্র, ডোম ও শূদ্র সুতরাং কায়স্থ-শূদ্র পুত্রের সহিত ডোম-শূদ্র কন্যার বিবাহ বিধি সঙ্গত আইন সম্মত এবং এই আইন সঙ্গত ও শাস্ত্র সম্মত বিবাহিত দম্পতির পুত্রও সুসিদ্ধ এবং পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পাঠকগণ দেখিলেন মনু এবং রঘু নন্দনই জাতের দফা রফা করিয়া একাকার করার পথ তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন কিনা। ঘোর কলি আনয়ন ও একাকার করিবার কর্ত্তা নিজে মনু এবং রঘুনন্দন। অন্যের দোষ দেওয়া বৃথা। তাঁহারাই লিখিয়াছেন—বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ বাদে আর সব জাতি এক জাতি শূদ্র এবং শূদ্রের সহিত শূদ্রের আহার পান বিবাহাদি আদান প্রদান স্বাভাবিক। ওরে ভাই, মনু রঘুনন্দনের এই শাস্ত্র এই বিধি যদি তোমরা সুবোধ বালকের মত মানিয়া লও আমার তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। বরং আমি তাহাতে সুখী ও উৎফুল্লই হইব। তোমরা যদি ডোম মুচি ম্যাথর হাড়ি মুদ্দাফরাস-গণকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে খাদ্য খাওয়া, আদান প্রদান ও বিবাহাদি দিতে সম্মত ও প্রস্তুত হও আমার আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই। আর যদি তাহাতে অসম্মত হও তবে তোমাদের এক জাতিত্ব—শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; ১৫, ১২ বা ১০দিন অশৌচ এবং উপবীত গ্রহণ করিয়া

তাহাদের হইতে ভিন্ন বর্ণীয়—ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে হইবে। একদিক হইতে হইবে, মন ও মুখ, কথা ও কার্য্য লেখা ও আচরণ এক করিতে হইবে। পৈতা হীন হইয়া, এক মাস অশৌচ লইয়া শূদ্রবৎ জীবন যাপন করিতে চাহিলে আমার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ম্যাথর, ডোম, মুদ্দাফরাস, হাড়িও যা, তোমরাও তাই। তাহাদের সঙ্গে আহার, পান, বিবাহের কথা শাস্ত্রে বলিতেছে, তাহাতে অসম্মত হইলে চলিবে না, এবং কাগজে কলমে—মুখে বক্তৃতায়—পত্রিকায় প্রবন্ধে, সেন্সাসে—কাগজ পত্রেও নিজেদিগকে শূদ্র বলিয়াই লিখিতে ও পরিচয় দিতে হইবে। "কিন্তু", "হাঁ", "তাইত", "যদি", "প্রভুর ইচ্ছা", "সব হ'য়ে যাবে", "সমাজ বুঝিতেছে না", "এক ঘরে করিবে" এসব কথা বলিতে পারিবেনা। শূদ্র উপবীত হীন ও একমাস অশৌচ প্রতিপালনকারী। যদি শূদ্র না হও তবে এই মুহূর্ত্তে শূদ্রের বিধি ব্যবস্থা—আচার নিয়ম, ৩০ দিন অশৌচ ত্যাগ করিতে হইবে, উপবীত লইতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণেতর ভ্রাতাগণ সকলেই সমাজপতি ও ইংরেজের আইনে শূদ্র বলিয়া গৃহীত ও গণ্য। তোমাদের পুত্র কন্যাগণ যদি স্বেচ্ছায় বা প্রলোভনে মুচি ম্যাথর ডোম মুদ্দাফরাসকে বিবাহ করে, তবে শাস্ত্রানুসারে ও হিন্দু আইন মতে (Hindu Law) সে বিবাহ সিদ্ধ এবং বিবাহিত দম্পতীর পুত্র কন্যা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে গৃহীত হইবে। ঐ পুত্র কন্যা—পিতা পিতামহ প্রপিতামহের সম্পত্তির আইন সঙ্গত মালিকরূপে বিবেচিত হইবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ—৩০ দিন অশৌচ লইয়া পৈতা-বিহীন শূদ্রবৎ থাকার গ্লানি—অপমান ও বিপদ কত? একেত ম্যাথর ডোম মুদ্দাফরাস ভ্রাতাদের সমজাতীয়—বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, দ্বিতীয়তঃ পুত্রকন্যাগণকে শাস্ত্র ও আইনের শৃঙ্খলে আটকাইয়া রাখিতে বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইতে পারিবে না। ডোম কন্যা ও কায়স্থ নন্দনের মামলায় কায়স্থ পক্ষীয়গণ কলিকাতা হাই-

কোর্ট ও বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে হারিয়া গিয়াছেন—এবং এই অপমানের প্রতিকারস্বরূপ শূদ্রত্বের পরিচায়ক ত্রিশ দিন অশৌচ ও উপবীত হীনতা পরিত্যাগ করিয়া ১২শ দিন অশৌচ ও উপনয়ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যোগীগণ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া উপবীত গ্রহণ ও দশদিন অশৌচ অবলম্বন করিয়াছেন। বৈদ্য ভ্রাতৃগণও সঙ্গে সঙ্গে অম্বষ্ঠ বা বৈশ্য বলিয়া নিজ-দিগকে ঘোষণা করিয়া ১৫শ দিন অশৌচ এবং উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুখের বিষয় এক্ষণে তাঁহারা বৈশ্যত্বেও সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া সম্প্রতি বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভা করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং বৈশ্যোচিত ১৫ দিন অশৌচ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত দশ দিন অশৌচ গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছেন। উপনয়নও ব্রাহ্মণগণের বিধিমত হইতেছেন।

বৈদ্য ভ্রাতাদের এই জাগরণে চট্টগ্রামের শ্যামাচরণ সেন কবিরাজ, কলিকাতার মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন এম্. এ, এল, এম এস—কবিরাজ, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক হরিপদ সেন শাস্ত্রী এম্, এ, প্রভৃতি নেতৃবর্গ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। রংপুরের বিখ্যাত কর্ম্মী রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা এম্, এ, বি, এল, বগুড়া আমসট্টের মহেশচন্দ্র মণ্ডল, সিরাজগঞ্জ কালিয়া হরিপুর নিবাসী বঙ্গীয় রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক সীতানাথ বর্ম্মা সীতানাথ জোয়াদ্দার, গণেশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এ, জয়গোপাল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ বর্ম্মা বি, এ, প্রমুখ ভ্রাতৃগণ প্রায় ১৮ লক্ষ রাজবংশীর মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার দান ও দ্বাদশ দিন অশৌচ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সরকার, রমানাথ ঘোষ, সরদিন্দুনারায়ণ রায়, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া

প্রমাণ ও ঘোষণা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ ভালুকার বনমালী বর্ম্মার নেতৃত্বে কোচ ভ্রাতৃগণ খস্‌ক্ষত্রিয় বলিয়া, কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নেতৃত্বে হাদিগণ হৈহয় ক্ষত্রিয় বলিয়া, হাওড়া—খুরুট রোডের বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী ন্যায়ভূষণ মহাশয় বাগ্‌দীগণকে ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বর্দ্ধমানের মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী মহাশয় আগুরিগণকে উগ্রক্ষত্রিয় ও শুক্লীগণ শোনাঙ্কি রাজপুত ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গোপনেতা ৺নবীনচন্দ্র ঘোষ, "নিখিল ভারতীয় যাদব মহাসভার" সম্পাদক পাটনার উকীল নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম এ বি এল, হুগলীর পঞ্চানন মণ্ডল বি, এ, গোপগণকে যদুবংশীয় যাদবক্ষত্রিয় বলিয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মেদিনীপুর নিবাসী কেদারনাথ মণ্ডল, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, স্বর্গগত মহেন্দ্রনাথ করণ, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি-এল, ডায়মণ্ড হারবাবের উকীল শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরদার বি-এল. আগুতির ২৪ (পরগণা) অন্নদাপ্রসাদ নস্কর, কল্যাণপুরের সতীশ ও জ্যোতিষ-চন্দ্র মণ্ডল, মধুসূদন সরদার; বগুড়ার ঝল্লমল্ল ক্ষত্রিয় নেতা উকীল অনন্তচন্দ্রদাস, মোক্তার ব্রজনাথ দাস, পাবনা উল্লাপাড়ার উদ্ধবচন্দ্র বর্ম্মা, গোপালচন্দ্র বর্ম্মা,; কর্ম্মকার নেতা—কিশোরগঞ্জ বর্ণগ্রাম নিবাসী নন্দকুমার সেন, জঙ্গলবাড়ীর গোবিন্দকিশোর বিশ্বাস, সিংরৈলের যামিনীকান্ত কর বর্ম্মা—কর্ম্মার ক্ষত্রিয় বলিয়া; ২২লক্ষ মাহিষ্যের নেতা ফরিদপুর—হাবাশপুরের সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল, সেবানন্দ ভারতী কোলাঘাট—মেদিনীপুরের কুঞ্জবিহারী বর্ম্মণঃ নিজেদিগকে মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া, শিলচর ও শ্রীহট্টের পাটনী শৈলেশচন্দ্র বড় ভুঁইয়া ২৫ সহস্র ভ্রাতাকে উপবীত দিয়া এবং কাশিমপুর—ত্রিমোহনীর (রাজসাহী) আদি কৈবর্ত্ত নেতা রাজেশ্বর সাহা, বগুড়ার রঘুনাথ দাস মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উক্ত সমাজের নেতৃবৃন্দ সহস্র ২ ভ্রাতার মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত

উপনয়ন সংস্কার এবং দ্বাদশদিন অশৌচ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কর্ম্মকার, গোপ ও মাহিষ্য ভ্রাতাগণ পূর্ব্বে বৈশ্যগণের ন্যায় আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া দাবী করিয়া অল্প সংখ্যক লোক ১৫শ দিন অশৌচ ও উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতেছেন। নেত্রকোণার গণ্ডপাল, উড়িষ্যা, বিহার, ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার কুর্ম্মীগণ, ময়ূরভঞ্জের নিরঞ্জন মাহাতের নেতৃত্বে, ঢাকা জয়দেবপুরের বংশীগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শুঁড়িগণ উকীল নারায়ণচন্দ্র সাহা বি-এল এর নেতৃত্বে নিজেদের শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পলিয়গণ পলায়িত ক্ষত্রিয়, নট ও করণ গণও ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অজ্ঞতা, ভ্রান্তি সাহসের অভাব, ও দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনেকে উপবীত না লইয়াই দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মৎলিখিত গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ "বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়" পাঠের পর সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা পরিহার করতঃ আপন আপন সমাজ মধ্যে উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যান্য সম্প্রদায়গণের কথা। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"কৃষি গো রক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।" কৃষি গো-রক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও বৃত্তি। সুতরাং বণিক নামধেয় গন্ধবণিক তাম্বলী বণিক (কোন কোন স্থানে চূর্ণকারগণ জাতি জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজেদিগকে তাম্বলী বা তাম্লী বলিয়া থাকে) কংস-বণিক, শঙ্খ-বণিক, সুবর্ণ-বণিক, স্বর্ণকার গণ যে অবিসংবাদী রূপে বৈশ্য তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ পুথি পত্রিকা প্রচার দ্বারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, বণিকগণের একটি উপাধি ছিল সাধু। সাধু শব্দ ক্রমে

রূপান্তরিত হইয়া সাহু—সাউ, সাও—সাহা-সা হইয়াছে; (যেমন বধূ বহু-বৌ) সাহাগণ আপনাদিগকে বৈশ্য বলিতেছেন। বারুজীবী, তিলি ও তেলী, তন্তুবায়, মোদক, কুম্ভকার, সূত্রধর, চাষাধোবা—কপালী, কাছারু, মালী ভ্রাতৃগণ সকলেই একযোগে আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ ও পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহাঁরাও পুথি বা পত্রিকা প্রচার দ্বারা বঙ্গদেশস্থ সমাজপতিগণকে এবং হিন্দু জনসাধারণকে জানাইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে সুবর্ণবণিকগণ কলিকাতা হুগলি ও হাওড়ার সুবর্ণবণিক সমাজের চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটী জেলায় বৈশ্যোচিত উপনয়ন সংস্কার ও ১৫শ দিন অশৌচ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সাহাদের মধ্যে টাঙ্গাইল—মহেড়ার জমিদারগণ, জামুকির কালীকুমার পোদ্দার, ডাক্তার ভজগোবিন্দ সাহা প্রমুখ নেতৃবর্গের চেষ্টায় টাঙ্গাইলের নানাস্থানে বৈশ্যোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের নেতা শ্রীনগেন্দ্র প্রসাদ সরকার গাইবান্ধার হরিশ্চন্দ্র সাহা বি, এল, বসন্তকুমার সাহা বি, এল, এবং মোগল হাটের বসন্তকুমার সাহা প্রমুখ মনীষিগণের চেষ্টায় রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার মধ্যে বহুল ভাবে উপনয়ন সংস্কার ও দ্বাদশ দিন অশৌচ প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মালী সম্প্রদায়ের অক্লান্ত কর্ম্মী, অবজ্ঞাত সম্প্রদায় সমূহের অকৃত্রিম বান্ধব মহাপ্রাণ মনীষী দামোদর দাস বি, এর চেষ্টায় বহু গ্রন্থ প্রচারের ফলে দিনাজপুর জেলায় ও অন্যান্য ২।৪ স্থানে মালীগণ বৈশ্যোচিত ১৫ দিন অশৌচ ও উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জ বিন্যাটীর কতিপয় নেতা কপালী সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবীত ও ১৫শ দিন অশৌচ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের বারুজীবিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের প্রচার করিতেছেন। সূত্রধরগণের কয়েকব্যক্তি—ক্ষত্রিয় বিশ্বকর্ম্মার (জাতিতে ক্ষত্রিয় কর্ম্মে বৈশ্য) বংশধর

মনে করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই দলে কিছু ২ স্বর্ণকার, কর্ম্মকার কুম্ভকার ভ্রাতাও নাকি যোগদান করিয়াছেন। এই সমস্ত নেতৃবর্গের অনেকে নিজেদের কাগজ পত্রে পুথি পত্রিকায় বৈশ্য. ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিলেও ক্ষত্রিয়ত্বে ও বৈশ্যত্বে ইহাঁদের নিবিড় ও প্রগাঢ় বিশ্বাস নাই—পরন্তু কুক্কুরত্ব-রূপ ঘৃণিত শূদ্রত্বে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ইহাঁদের বচন ও আচরণে মোটেই সামঞ্জস্য নাই। মুখে বড় জাত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও বড় হইবার চেষ্টা যত্ন সাধনা ও তপস্যা করিবার জন্য আগ্রহ নাই। ইহাঁরা বিনা সাধনায় সিদ্ধি চাহেন।

এখন বাকী রহিল—একমাত্র শূদ্র। কে তবে শূদ্র? সকলেই যদি ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তবে শূদ্র কে? শূদ্র কাহারা? প্রশ্নের উত্তর সহজ। "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্"—গীতায় ভগবৎবাণী। পরিচর্য্যা—সেবা—দাসত্ব করাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও বৃত্তি। যাহারা চাকরী করে, পরের গোলামী করে—প্রভুর ইঙ্গিতে চলে ফেরে সত্য মিথ্যা—ভাল মন্দ যাহারা বিচার করিতে পারে না—প্রভুর আদেশে ও ইচ্ছায় যাহারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি ধর্ম্ম কর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি করে—তাহারাই অধম শূদ্র সকলের ঘৃণাভাজন। যদি বল সংখ্যায় ইহারা কত! উত্তরে বলি—ভারতে শতকরা ১½ জন মাত্র দেশী লোকের গোলাম আর হাজার করা ২ জনমাত্র সরকারী—গভর্ণমেণ্টের গোলাম। এই গড়ে শতকরা ২ জনেরও কম লোক এদেশের শূদ্র—আর কে শূদ্র? আর কয়েকটী দেশবৈরী ধর্ম্মবৈরী এবং সমাজবৈরী আত্মঘাতী জাতি-দ্রোহী সম্প্রদায় আছে যাহাদিগকে বাঙ্গলার সমাজপতিগণ হৃদয়বান মনস্বীবর্গ শুধু শূদ্র নহে—শূদ্রাধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গত ৪০ বৎসর হইল বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম মনীষীবর্গ ইহাদের পাপ অপরাধ ভ্রান্তি কুসংস্কার স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও স্বদেশদ্রোহিতা চোখে আঙ্গুল দিয়া

দেখাইয়া দিতেছেন—তথাপি ইহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না—ইহারা ইহাঁদের হীন পদদলিত ঘৃণ্য আভিজাত্য ছাড়িতে চাহিতেছেন না। বঙ্গ দেশের হিন্দু-সমাজ-জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া যে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ভ্রাতা অভিমানে ক্ষোভে ক্রোধে চলিয়া গিয়া হিন্দু জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—এই জাতিগুলির কৃত অপরাধ তন্মধ্যে প্রধানতম। ইহাদের কৃত পাপের ফলে আজ বাংলা দেশে—হিন্দু—অমুসলমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহারা নিখিল ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় কংগ্রেস, জেলা সম্মিলনী, হিন্দুমিশন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখ জমিদারবর্গ, রামগোপালপুর, কালিকাপুর, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর, ভালুকার ব্রাহ্মণ জমিদারবর্গ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সে যুগের সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃতান্তকুমার বসু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্ব্বোপরি জগৎবরেণ্য মানবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ পর্য্যন্ত দুই পা দিয়া দলন করিয়া জাতিধর্ম্ম দেশ দ্রোহীতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। একারণ সকলে ইহাদিগকে ঘৃণিত শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছে। বড় দুঃখে ও বেদনার সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই কারণেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ এই জাতিদ্রোহী সমাজ-ধর্ম্ম ও দেশদ্রোহিগণের মুখ দেখা "অযাত্রাকর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র অন্ত্যজগণকেই সর্ব্বনিম্ন, সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও নীচ বলিয়াছে—

বর্দ্ধকী নাপিতঃ * * * * * * ।১০
বাণক কিরাত * * * * * *
বরটো মেদ চণ্ডাল * * * * * ॥১১
এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনা
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২ ব্যাস সংহিতা।

বর্দ্ধকী, নাপিত, * আশাপ, * * বণিক কিরাত, (ব্যাধ) * * বরট, মেদ, চণ্ডাল, * শ্বপচ, কোল জাতি,—আর যাহারা গো-মাংস ভক্ষণ করে—তাহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ :সকল অন্ত্যজ জাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এই নাপিত প্রভৃতি অন্ত্যজগণের জ্ঞাতি ভাই আর কোন্ কোন্ জাতি তৎসম্বন্ধে অত্রিসংহিতা বলিতেছে—

রজকঃ চর্ম্মকারশ্চ নটঃ বরুড় এবচ।
* * মেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ রজক (ধোপা), চর্ম্মকার (মুচি), ১৯৫ নট, বরুড় * মেদ ও ভিল্ল (ভিল) এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ বলে। লোকে যে কথায় কথায় "ধোপা নাপিত বন্ধের" কথা এবং প্রাতে ইহাদের মুখ দেখিলে অযাত্রার কথা বলে—তাহার মূল কি এই শ্লোক হইতেই পাওয়া যাইতেছে না? বড় দুঃখে, তাপে ও বেদনাতেই এই মর্ম্মান্তিক কথা বলিতে হইতেছে। এই সব ধোপা নাপিত বেহারাগণ নিজের ধর্ম্মাবলম্বী, একই দেবতার উপাসক—একই গো-মাতার সেবক একই হিন্দুজাতিভুক্ত মালী নমঃশূদ্র পোদ-পাটনী-ধাত্রী-বাদ্যকরগণেয় কাজ করে না—কিন্তু ইহারা মুসলমান ও খৃষ্টান হওয়া মাত্র—ইহাদের কুলবধূগণ বেশ্যা (পতিত) হওয়ামাত্র ইহাদের কাজ করিতে একটুকুও দ্বিধা করে না! সমগ্র হিন্দু-স্থানের মনীষীবর্গ ইহাদের এই আত্মঘাতী ব্যবহারে, দেশদ্রোহিতায় ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বহুস্থানে নাপিতগণকে অচল অস্পৃশ্য পর্য্যন্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, শুদ্ধি ও হিন্দু সংগঠন কার্য্যে ইহারা প্রবল বাধা ও বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতিচ্যুত খৃষ্টান ও মুসলমানগণকে শুদ্ধি, যজ্ঞ কার্য্য দ্বারা পুনরায় স্বগৃহে আনয়নে প্রবল বাধা দিতেছে—

১নং মস্তক মুণ্ডনের ক্ষৌরি কার্য্য না করিয়া ২নং হিন্দুস্থানী নাপিত দ্বারা মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া শুদ্ধি করিয়া সমাজে গ্রহণ করিবার পর—ক্ষৌরী না করিয়া এবং ৩নং শত্রুতাচরণ করাতে। বাঙ্গলার প্রায় ২০টি হিন্দু জাতিকে ক্ষৌরী না করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মত্যাগে, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিতেছে; মালী নমঃশূদ্র পাটনী দুলে কোচ হদি পোদ-চর্ম্মকার কেওড়াগণ হিন্দু থাকিলে, হরিনাম করিলে—গঙ্গা স্নান করিলে নবদ্বীপ কাশী বৃন্দাবন পুরী প্রয়াগ গেলে, গো মাতার সেবা করিলে ইহারা কাজ করে না কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যাওয়া মাত্র—ইহারা তাহাদের পায়ে হাত দিয়া পায়ের নখ পর্য্যন্ত ছেদন করিতে একটুকুও ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করে না। এই কারণেই শাস্ত্রকার ইহাদিগকে "এতে শূদ্রেষু" বলিয়া—উল্লেখ করিয়াছেন—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতেশূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

মনু সং ৪র্থ অধ্যায়।

"বর্গাদার, কুল মিত্র, বাড়ীর রাখাল, বাড়ীর দাস বা চাকর,—বাড়ীর **নাপিত-শূদ্রের মধ্যে** ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়, যে আত্ম নিবেদন করিয়াছে—তাহার অন্নও ভোজন করা যায়।

এই তিনটী দেশদ্রোহী স্বজাতি ও ধর্ম্মদ্রোহী শূদ্র ব্যতীত আরও ঘর ভাঙ্গা অমর বিভীষণ জয়চন্দ্র মিরজাফর শূদ্র আছে—যাহারা বৈদেশিক সরকারের চাকরী করিয়া অর্থের জন্য দেশদ্রোহীতা করিতেছে—দেশ সেবার বিনিময়ে দেশ ভক্ত মহাপ্রাণগণকে ধরিয়া দিতেছে—, দেশ ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যথাশক্তি বিদ্রোহাচরণ করিতেছে; আবকারী বিভাগে কাজ করিয়া দেশবাসিগণকে ধ্বংস দারিদ্র্য ও নরকে লইয়া যাইতেছে—ইহারা সকলেই শূদ্র—দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী

ও সমাজদ্রোহী আত্মঘাতিগণ বাদে বাকী সকলেই বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে বঙ্গের ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব দাবীকারী পরন্তু শূদ্র-আচারী, ত্রিশদিন অশৌচধারী ভাই সকল,—সত্যই কি তোমরা যাহা বলিতেছ—তাহাতে তোমাদের গভীর বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় আছে? সত্যই কি তোমরা শূদ্রত্বের অপমানের জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছ?

সত্যই কি আপনাদিগকে তোমরা দ্বিজবর্ণান্তর্গত বেদ-বেদান্ত পূজার্চ্চনায় অধিকারী বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রাণে ২ বিশ্বাস করিতেছ? যদি সত্যই বিশ্বাস কর—তবে এই দণ্ডে শূদ্রত্বের তমোভাব—আলস্য জড়তা, মোহ, ভীতি, দুর্ব্বলতা ক্লীবতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক—অশৌচ কমাইয়া দ্বিজত্বের পরিচায়ক উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ কর। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে এক উপনয়ন বাদ ৯টী সংস্কার ত ব্রাহ্মণগণের মতই আছে। এক উপনয়ন-সংস্কার অভাবে ও অশৌচ আধিক্যে তোমরা সমাজে—সকলের সমক্ষে হীন অস্পৃশ্য শূদ্র বলিয়া পরিচিত আছ। অবিলম্বে উপবীত গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যদি উপবীত গ্রহণ না করে তবে তাহারা মহাপাপী। ঋষি বলিয়াছেন :—

যজ্ঞোপবীত হীনানাং বৃথাসর্ব্বং দ্বিজন্মনাং
পাদোদকং সুরাতুল্যং কীকশং তুলসী দলম্
কাকবিষ্ঠা সমং তেষাং পিণ্ডদানং পিতৃর্মুখে
গোমাংসমিবতদ্ভোজ্যং জলং শূকর-রক্তবৎ।

যজ্ঞোপবীত বিহীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতিগণের পক্ষে পাদ্যদান সুরাতুল্য, তুলসী দান অস্থিতুল্য পিতৃ পিতামহের মুখে পিণ্ডদান কাকবিষ্ঠা দান তুল্য, ভোজন—গো মাংস ভোজন তুল্য—জলপান শূকর রক্ত পান তুল্য।

পদ্ম পুরাণের কৌশল খণ্ডে আছে—

কোটি জন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতঞ্চ যৎ।
যজ্ঞোপবীত মাত্রেন তৎসর্ব্বং যাতি যৎ ক্ষয়ং॥

অর্থাৎ কোটি জন্মার্জ্জিত জ্ঞানাজ্ঞান সমুদয় পাপ যজ্ঞোপবীত ধারণ মাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

তবে ভাই তোমরা কি মোহে বসিয়া আছ? কেমন করে শ্রাদ্ধে পিতৃ পিতামহ মাতৃ মাতামহের মুখে কাক বিষ্ঠা দান করিতেছ, প্রতিদিনকার ভোজন যে তোমাদের গোমাংস ভোজন ও জলপান যে শূকর রক্ত পান হইতেছে? দুর্ব্বল ভীত কাপুরুষ ও ক্লীবস্থানীয় নেতৃগণের মূঢ়তা ও অজ্ঞতায় কত কাল আর তোমরা এই মহাপাপ করিতে থাকিবে। সমাজপতি ক্লীবগণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই দল সৃষ্টি করিয়া দলে দলে উপনয়ন গ্রহণ কর। এক ঘরে হইবার বৃথা ভয় করিও না কোন্ বেটার সাধ্য তোমাদিগকে এক ঘরে করে? গ্রামে গ্রামে গিয়া এই সব কথা প্রচার করিয়া দল বাঁধ এবং দলে দলে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ কর। কাহারও তোয়াক্কা রাখিও না কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সাম্যবাদী সংস্কারকগণ ব্রাহ্মণগণের পৈতা ফেলিয়া দিয়া সকল হিন্দুকে এক পর্য্যায়—এক মানবতার সমভূমিতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজি হন নাই। পৈতা কৃত্রিম বস্তু সন্দেহ নাই—ভগবানের অভিপ্রেত হইলে ব্রাহ্মণ-নন্দন পৈতা-সহই মাতৃজঠর হইতে জন্মগ্রহণ করিত। অন্য সকল হিন্দু অপেক্ষা নিজেদিগকে বড় উচ্চ পৃথক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করাইবার জন্যই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং ব্রাহ্মণেতর সমুদয় হিন্দু ও এই উপবীত-মাহাত্ম্যেই—পৈতা গ্রহণের জন্যই তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া ও তাঁহাদের পাদোদক পান

করিয়া আসিতেছে। ভিতরে সত্ত্বগুণ—ব্রাহ্মণ্যশক্তি—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি—উদারতা—সর্ব্বজীবে কল্যাণ কামনা না থাকিলেও শুধু পৈতার গুণেই তাঁহারা সমাজে সর্ব্বে সর্ব্বা—একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া আছেন। সে কারণ সকলকে বলি ভাই সকল! তোমরাও সকলে দলবদ্ধ ভাবে উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ কর। ব্রাহ্মণগণ পৈতা ফেলিয়া—তোমাদের সমান হইতে চান নাই,—তোমরা পৈতা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সমভূতিতে গমন কর—সমান হও, এক হও। আর্য্য সমাজের মত সকলেই পৈতা লও, বিলম্ব মাত্র করিয়া ছোট থাকিও না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অনুমতির জন্য,—ব্রাহ্মণ সভার পাঁতির জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করিও না। তাঁহাদের পাঁতির অর্দ্ধ পয়সাও মূল্য নাই; টাকার জন্য পাঁতি দেয় ও দিতে পারে; কিন্তু সেই পাঁতির উপর পাঁতিদাতার নিজেদেরই বিশ্বাস নাই। হাজার হাজার টাকা খাইয়া—অনেক মহামহোপাধ্যায়—অনেক অনাচরণীয় জাতিদের বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পাঁতি দিয়াছে, কিন্তু নিজেরা তাহাদের হাতের জল খায় নাই—ও খায় না। বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পাঁতি দিয়াছে সত্য কিন্তু শাস্ত্রানুসারে তাহাদের কন্যা ও অন্নগ্রহণ ত দূরের কথা—তাহাদের কূপের জল—হাতের জল পর্য্যন্ত পান করে নাই—ও করে না। করিলে রাজা মহারাজা—জমিদার—বড় লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ বাদ যাইবে এই ভয় ও আশঙ্কা। ইহাদের মন মুখ এক নহে। সে কারণ বলি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতামত—ব্যবস্থাপত্র ও পাঁতির আশা ত্যাগ করিয়া নিজেদের পুরোহিত দ্বারা নিজেরাই পৈতা গ্রহণ কর। অনাচরণীয় ভাইদের অনাচরণীয় পুরোহিত বর্ণব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণকে এই কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করি। ঘৃণাকারিগণের দুয়ারে কৃপার ভিখারী হইয়া আর যাইও না—আর পিতা পিতামহ—মাতা মাতামহ ও জাতি বংশের অমর্য্যাদা—অপমান করিও না। ডাকিয়া

আর অপমান বরণ করিয়া লইও না। পরাধীন ভারতে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেহই নাই—থাকিতে পারে না। সকলেই দাস গোলাম—শূদ্র। বড় গোলাম আর ছোট গোলাম; পণ্ডিত গোলাম—আর মূর্খ গোলাম, ধনী গোলাম—আর দরিদ্র গোলাম। বিদ্বান শূদ্র আর মূর্খ শূদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র আর শূদ্র-শূদ্র। সকলেই ম্লেচ্ছ-পদসেবী দাস—গোলাম। সমাজে যদি ব্রাহ্মণ-শূদ্র থাকিতে পারে তবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-শূদ্র থাকিবে না কেন? যাত্রার দলে পরাশর—ব্যাস—বিশ্বামিত্র—নারদ যেমন সাজে—দশরথরাজা বৈশ্য—সূতঅধিরথ ও শূদ্র বিদুরও তেমনি সাজে। কৃত্রিম ব্রাহ্মণ ব্যাস নারদ যদি হইতে পারে—কৃত্রিম ক্ষত্রিয় হরিশ্চন্দ্র দশরথ—নন্দ মহারাজই বা হইতে পারিবে না কেন—থাকিতে পারিবে না কেন? সমাজে ব্রহ্মণ্য শক্তিহীন ব্রাহ্মণ যদি থাকিতে পারে; তবে ক্ষাত্র বীর্যাহীন ক্ষত্রিয়—বৈশ্য থাকিতে পারিবে না কেন? সমাজে নকল ব্রাহ্মণ যদি থাকিতে পারে তবে নকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য থাকিতে পারিবে না কেন?

তোমরা সকলে আপন আপন মনের দৌর্ব্বল্য—সম্প্রদায়গত দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর। ভয় ত্যাগ কর, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়। পদাঘাতে এই মহাপাপ ভয়কে বধ কর—ধ্বংস কর। কাহাকেও ছোট মনে করিও না—বড় বলিয়াও কাহাকে মানিও না। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ কেন ব্রাহ্মণগণের পা চাটিয়া চাটিয়া চলিবে? কেন বাঘের পাছের 'ফেউ' হইবে? ছি ছি—কি লজ্জা—কি অপমান! পিতামাতাকে আর দাস দাসী বলিও না;—দাসের পুত্র আর দাস হইও না। দেবতার পুত্র দেবতা হও। কেন ভাই এমন দুর্ল্লভ মানব জন্ম এমন অধম অস্পৃশ্য ভাবে সকলের পদতলে ক্ষয় করিয়া চলিয়াছ। যে তোমার হাতের জল,—কূপের জল খায় না ও খাইবে না,—যে তোমার শাল-গ্রাম শিলা নারায়ণ ও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরও জাত্ মারিয়াছে—অশুদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছে—তাহাদের চরণ-ধূলি মাথা পাতিয়া—পাদোদক পান না করিলেই কি নয়? এ যে কুকুরের স্বভাব। শত লাথি জুতা ঝাঁটা প্রহারেও অপমান বোধ নাই—'তু' বলিয়া ডাকিলেই আনন্দে গদ-গদ হইয়া—লেজ নাড়িয়া হাজির! তোমাদের স্বভাবও ঠিক কুকুরের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোলামেরও তোমরা গোলাম কি না, যুগ-যুগান্তরের দাস্যভাব সহজে কি ছাড়া যায়? আর শূদ্ররূপ কুকুর জীবন যাপন করিতে সাধ করিও না। সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের কাছে আর সামাজিক ন্যায় বিচার প্রার্থনার জন্য গমন করিয়া জাতির অপমান করিও না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার স্বাধীনতা-কামী মহাপ্রাণ কর্ম্মিগণের পার্শ্বে সমবেত হও,—তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা কর। তাঁহারাই তোমাদের সামাজিক দাসত্ব মোচনে—নানা প্রকার মানবোচিত অধিকার দানে অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহারা স্বাধীনতা চাহিতেছেন—কাজেই স্বাধীনতা দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। পাষাণ দিয়া বুক বাঁধ—প্রণাম বন্ধ করিয়া দাও; সমাজস্থ বালক বৃদ্ধ যুবতী সকলের প্রাণে আত্মসম্মান জ্ঞান জাগাইয়া তোল। তোমাদের রান্না ভাত ত দূরের কথা—তোমাদের হাতের জলটুকু খাইতে যাহারা অপমান ও জাত্ যাওয়ার ভয় করে—তাহাদের হাতের ভাত জল খাইতে তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না? ধিক্কার আসে না? তোমরা মানুষ হইলেও—যাহারা তোমাদের সঙ্গে মনুষ্যের মত সমান ব্যবহার করে না—এমন কি পশু পক্ষীরও অধম ব্যবহার করে,—ঘরে ঢুকিতে বা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না—ধারণা—তাহাতে ভাত জল লুচি পায়েস নষ্ট হইবে—দেবতা অশুদ্ধ হইবে—এমন সব মানব-শত্রু—দেশ ও সমাজ-বৈরী ভণ্ড—কপট—দাম্ভিক সমাজপতিগণের বাড়ীতে যাও—তোমরা কুকুরের মত প্রসাদ চাটিতে? ধিক্ ধিক্ তোমাদের জন্মে ধিক্,—সম্পদে ধিক্, বিদ্যায় ধিক্! তোমরা আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য

বলিয়া পরিচয় দাও? মানুষই হইতে পার নাই—তা আবার—বৈশ্য ক্ষত্রিয়!

ব্রহ্মের সন্তান,—ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ আজ হীন শূদ্র কেহ কেহ বা অস্পৃশ্য হইয়া আছ, তাহাতে তোমাদের কোন দুঃখ বোধ নাই। জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণ আজ গৃহ—রান্নাঘর, দেবালয় হইতে কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়া—নিজেরা দখল করিয়া বসিয়াছে, বারোয়ারি পূজাতেও তোমরা চোরের মত কুকুরের মত দূরে দূরে স'রে স'রে পালাইয়া ফের, ভয় পাছে—তোমাদের স্পর্শে—ছায়া স্পর্শে ভোগের দ্রব্যাদি—দেবতা, লুচি সন্দেশ অপবিত্র হয়! নিজেদের প্রতি যাহাদের এইরূপ ছোট হীন ও নীচ বোধ—তাহাদিগকে কে বড় করিতে পারে? তেত্রিশ কোটী দেবতা তোমাদিগের কি করিয়াছে ও করিবে—যদি তোমাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস—আত্মমর্য্যাদা—আত্মসম্মান বোধ না থাকে। বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ত সামান্য পরিচয়! ব্রহ্মের সন্তান—সকলেই ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দসাগর শ্রীভগবানের তোমরা—এক একটি তরঙ্গ—বারিবিন্দু—জলবিম্ব। ২৫ বৎসর অন্ধকার কারাকক্ষে বাস করিয়া যেমন ফরাসী দেশের—স্বাধীনতা কামী বীরের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বাহিরের আলো চক্ষে সহ্য করিতে পারিতেন না—তোমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। 'তোরা ছোট—নীচ—হীন—অস্পৃশ্য—অপবিত্র' প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে সত্যসত্যই তোমাদের হৃদয়ে মনে প্রাণে ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মূর্খতা—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে—যুগ-যুগান্তর বংশ-পরম্পরা ক্রমে বাস করিয়া করিয়া সত্যসত্যই তোমাদের দৃষ্টি-শক্তি—চক্ষের আলো—হৃদয়ের আলো নিভিয়া গিয়াছে, আত্মপরিচয় ভুলিয়া গিয়াছ। তোমরা সচল ব্রহ্ম তত্ত্বমসি—নরনারায়ণ একথা ভাবিতেই পার না। শূদ্রত্বের আবরণে আবৃত হইয়া—নিজকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছ। তোমরা—শিক্ষায়—উচ্চচিন্তায়—সংস্কারে

বঞ্চিত বলিয়াই—তোমাদিগকে—ছোট কথা—বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিতেছি। তোমরা সকলে শিক্ষা ও জ্ঞানালোক পাইলে—তোমাদিগকে একেবারে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতাম—বা করিতে বলিতাম;—তার পর বলিতাম ইহাও সত্য নয়—'এহ বাহ্য'—তোমরা সকলেই অমৃতের সন্তান জীবন্ত নারায়ণ—প্রকট ব্রহ্ম।' নিরক্ষরের নিকট বি, এ, এম, এর পাঠ্য উপস্থিত করিয়া লাভ নাই, তাই প্রথম ভাগের অ আ ক খ গ ঘ উপস্থিত করিতেছি। তোমরা পাঠে অগ্রসর হইলে পাঠ্যও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। কূপের ব্যাঙ্কে একেবারে সমুদ্র দেখান ঠিক নয়,—খাল বিল নদী সরোবর দেখাইয়া সাগরে লওয়া হইবে। বিলম্ব করিও না—মূর্খত্বরূপ শূদ্রত্ব হইতে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন লও—তার পর তোমাদের সকলকে ব্রাহ্মণত্বে—ব্রহ্মত্বে—প্রমোশন দেওয়া হইবে। নিরাশ হইও না—বুকভরা আশা লইয়া অগ্রসর হও। কাহারও নিষেধ—বা বাধা গ্রাহ্য করিও না। কে আসিবে না আসিবে,—কে আসিল বা পিছাইয়া গেল দেখিবার দরকার নাই। একজন সাহস করিয়া বিশ্ব-সংসার—পশ্চাতে ফেলিয়া—অগ্রসর হইয়া—উপবীত লইয়া—বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হও। এক-ঘরে করে করুক, পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধ বন্ধ করে গঙ্গাতীরে গয়ায় গিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া আইস। কারো মুখের দিকে—তাকাইয়া ব্রত উদ্‌যাপনে ক্ষান্ত হইও না। যে আসে আসুক—যে যায় যাক্; কাহাকেও খোষামোদ তোষামোদ করিয়া দল পাকাইতে চেষ্টা করিও না। দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ সকলকেই তোমাদের দলে আসিতেই হইবে। পিতা-মহ মাতামহ প্রভৃতি বৃদ্ধ বিজ্ঞের দলকে—দুই দিন পরেই তোমাদের দলে আসিতেই হইবে। পিতা পিতামহ মাতা মাতামহ প্রভৃতি বৃদ্ধ বিজ্ঞের দল দুইদিন পরেই তোমাদের দলে যোগ-দান করিবে। পুরোহিতগণকে বুঝাইয়া বল, আমার গ্রন্থাবলী একে একে পাঠ করিয়া শুনাও। তবু যদি তাঁহারা তোমাদের কথায় সম্মত না হইয়া

তোমাদিগকে শূদ্র রাখিয়া নিজেরা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ হইয়াই থাকিতে চান—তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বৈশ্য কায়স্থ রাজবংশী যদি কোচদিগের ন্যায় নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবে। কোন বাধায় বিচলিত হইও না—সমাজস্থ ব্রাহ্মণ পদসেবী ভীরু সমাজপতি অধমগণের মানায় পশ্চাৎপদ হইও না। "পৈতা লইয়া বা গলায় দড়ি দিয়া কি হইবে, অশৌচ কমাইলে কি কিষ্ট বিষ্টু হওয়া যাইবে" প্রভৃতি মূর্খগণের বিজ্ঞজনোচিত সমালোচনা পদাঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া অগ্রসর হও। আপন আপন সমাজ বা সম্প্রদায়কে তুলিতেই হইবে, কোটি কোটি ভ্রাতা ভগিনীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ জাতিগণের সম-পর্য্যায়ভুক্ত সমপদবীতে তুলিয়া যাইতেই হইবে। সামাজিক দাসত্বের মুক্তি ও ভারতের উদ্ধার জীবনে দেখিয়া যাইতে হইবে। মানুষের কাছে—মানুষের মত ব্যবহার আদায় করিয়া লইতেই হইবে। ব্রত কঠিন সন্দেহ নাই, পথ দুর্গম তাহাও জানি, অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু—আপনার জন ছাড়িয়া যাইবে, পদে পদে বিঘ্ন বিপদ মেঘ বিদ্যুৎ বজ্রবহ্নি—পরিদৃষ্ট হইবে, কণ্টকাঘাতে শ্রান্ত পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া উঠিবে, তত্রাচ আমরা এই বীরোচিত পথেই যাত্রা করিব। আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণের জাতি-হিংসা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভারতের মুক্তি আনয়ন করিব। শ্রীভগবান্ আমাদের শিরে নিশ্চয় স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ এবং দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্ব্বর্ণের শোচনীয় পরিণতি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুইবর্ণ—রঘুনন্দনের শূদ্র-বিদ্বেষ।

ভাটপাড়া ও ব্রাহ্মণ সভামহলে চীৎকার উঠিয়াছে—একদল পাষণ্ড কালাপাহাড় জাতিভেদ বর্ণভেদ সম্প্রদায়-ভেদ বড় ছোট ভেদ উঠাইয়া দিয়া একাকার করিতে উদ্যত হইয়া "ঘোর কলি" আনয়ন করিতেছে। ধর্ম্ম যায়, শাস্ত্র যায়—বর্ণাশ্রম লোপ প্রায়, সর্ব্বনাশের আর বিলম্ব নাই। আমরা কিন্তু বলি এই সর্ব্বনাশের জন্য পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও তাঁহার সাহায্যকারী হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষক বলিয়া কথিত "বঙ্গবাসীর" শাস্ত্র প্রচার—কার্য্যই সম্পূর্ণ দায়ী। মনুসংহিতা এবং স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনই যে, জাতের দফা রফা করিয়াছেন—তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে হিন্দুগণ মনে করিত—এবং সমাজপতিগণও তাহাই নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে—উচ্চ—নীচ—বড় ছোট ব্রাহ্মণ চণ্ডালের নির্দ্দিষ্ট স্তর বা সিঁড়ি বাঁধা আছে। সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্য-ফলে শততম সিঁড়ির উপরিতম সিঁড়িতে আছেন—আর ডোম ম্যাথর সর্ব্ব নিম্নতম প্রথম সিঁড়িতে আছে। রঘুনন্দনের মতে কলিতে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই—তখন পঞ্চসপ্ততি (৭৫) ও পঞ্চাশৎ (৫০)-সিঁড়ি শূন্য আছে, শূদ্রগণ পঞ্চবিংশতি (২৫) সিঁড়ির মধ্যে আছে। শূদ্রের মধ্যে বৈদ্যশূদ্র ২৫ পঞ্চবিংশতি সিঁড়ি, কায়স্থ ২০ বিংশ সিঁড়ি, কর্ম্মকার কুম্ভকার তিলি তাম্বুলি বারুই গন্ধবণিক গোপ মালী—

তাঁতি মোদক প্রভৃতি নবশায়কগণ ১৫ পঞ্চদশ সিঁড়ির মধ্যে, সাহা সুবর্ণবণিক মালো কপালি সূত্রধর প্রভৃতি অনাচরনীয় শূদ্রগণ দশম সিঁড়ির মধ্যে, নমঃশূদ্র ভুইমালী পাটনীগণ ৬ষ্ঠ ৭ম সিঁড়ি, বাগদি কোচ, পলিয়া হদি হাজং প্রভৃতি ৪র্থ ৫ম সিঁড়ি, ঢুলে গোলাম—বাদ্যকর, ধাত্রী প্রভৃতি ৩য়, মুচি—চর্ম্মকার হাড়ি ডোম মুদ্দাফরাস—ম্যাথর অর্দ্ধ সিঁড়িতে আছে। ভগবান পাপ পুণ্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিক্তিতে ওজন করিয়া—এইরূপ ভাবে উচ্চ নীচ বড় ছোট —স্তর বা সিঁড়ি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সব সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ তাহাদের নীচে ও পায়ের তলে আরও অনেক হিন্দু আছে এই আনন্দে ও তৃপ্তিতে মস্‌গুল হইয়াছিল, কিন্তু এই সব অব্রাহ্মণ শূদ্রদের অশৌচ প্রায় সকলেরই সমান—৩০ দিন। মাত্র—"চাঁড়াল বামুন মুচি—দশদিনে শুচি।" শুনিয়াছি আরও কতিপয় জাতির অশৌচও বামুনের মতই দশদিন। অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে—বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণের অশৌচ প্রায় সর্ব্বত্রই দশদিন। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে অশৌচ দশদিনই হউক আর এক মাসই হউক বড় কিছু আসে যায় না, ব্রাহ্মণের পক্ষে সবাই সমান। নমঃশূদ্র বা মুচিদের অশৌচ ব্রাহ্মণের সমান দশদিন হইলেও সমাজে তাহাদের সে জন্য অর্দ্ধ রতির কৌলিন্য বা মর্য্যাদা বাড়ে নাই। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য শূদ্রাপেক্ষা বরং তাহাদের স্থান বহু নিম্নেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মান বাড়ান নাই। এই যে বড় ছোট উচ্চ নীচের থাক শ্রেণী বা সিঁড়ি নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে এক শত ডিক্রি ৯০ ডিগ্রি ৮০ ডিগ্রি ২৫।১৫।১০।৫ বা ৩।২।১ ডিগ্রি আধ ডিগ্রির কুলিন বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন—তাহাতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। একই শূদ্র হইয়াও বা থাকিয়াও তাহারা অন্য শূদ্রাপেক্ষা নিজেদের বড় শ্রেষ্ঠ ও কুলীন বলিয়া মনে করিয়া

পরমানন্দে ব্রাহ্মণগণের পদরজ মর্দ্দনে ও পাদোদক পানে মগ্ন আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করিতেছেন—আমি পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসী অমুক শূদ্রাপেক্ষা বড় ও উচ্চ জাতি, আমি ৩।০, ৩।০, ৩ ডিগ্রির, অর্দ্ধ ডিগ্রি পোয়া ডিগ্রির কুলীন, আমি কি উহার সঙ্গে মিশিতে পারি—উহার ভাত জল খাইতে পারি?—আমি সমাজ-পতি ব্রাহ্মণের খাই ৫ জুতা আর ও খায় ৭ জুতা, আমি ২ জুতার কুলিন। এ সম্বন্ধে একটা রহস্যময় গল্প আছে। দুই বন্ধু গিয়াছিল—সন্ধ্যাবেলা একটা হাটে—বেড়াইতে। ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া যখন তাঁহারা হাটের বাহিরে আসিয়া পকেটে হাত দিলেন—তখন একজন চম্‌কাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওরে ভাই সর্ব্বনাশ হইয়াছে পকেটে যে ৭৫৲টাকার কয়েকখানা নোট ছিল, উহা গাঁটকাটা পকেট কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।' তাহা শুনিয়া অপর বন্ধুটী তাড়াতাড়ি তাহার নিজের পকেটে হাত দিয়া অনুরূপ, ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—'ভাই আমারও সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার পকেটের ৫০৲ টাকার নোটও গাঁটকাটা পকেট কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।—তবুও আমার সান্ত্বনা—আমার ২৫৲টাকাই লাভ?' অন্য বন্ধুটী তখন বলিলেন--"তোর ২৫৲ লাভ হইল কিসে? তোর না ৫০৲ টাকার নোট লইয়া গিয়াছে?" 'হাঁ--আমার ৫০৲ টাকা গিয়াছে সত্য, কিন্তু তোর গিয়াছে ৭৫৲ টাকা আর আমার গেল ৫০৲ টাকা, সুতরাং তোর সঙ্গে তুলনায় আমার ২৫৲ টাকাই লাভ।" শূদ্র কথিত অব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণও ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার লাথি জুতা কে কত কম খাইয়া বড় ও কুলিন হইয়াছে ও আছে এই আহ্লাদেই মগ্ন! বৈদ্য কায়স্থ বা কর্ম্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি নবশায়কগণ সমাজে বিদ্যা অর্থ বা মর্য্যাদায় অন্যান্য দলিত শূদ্রদের চেয়ে বড় আচরণীয় বলিয়া মনে করিলেও নৈষ্ঠিক-কুলিন ব্রাহ্মণগণের

নিকট সকলেই সমান। তাঁহাদের নিক্তিতে কিছুমাত্র কম বেশী নয়। অনেকের অপ্রীতিকর হইলেও প্রমাণ দেখাইয়া মিথ্যা ভ্রম দূর করিতেছি।

	[illegible] মুচি বাগ্‌দী পোদ রাজবংশী কৈবর্ত্ত মাল্লো নমঃশূদ্র কপালিক সূত্রধর মালী ধোপা সাহা প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়	বৈশ্য কায়স্থ ও অন্যান্য নবশাখগণ	— ব্রাহ্মণের আচরণ
১।	ইহাদের প্রতিমা	ইহাদের প্রতিমা	ব্রাহ্মণের অপ্রণম্য।
২।	স্পৃষ্ট জল	,, জল	দেবকার্য্যে ব্রাহ্মণের অব্যবহার্য্য।
৩।	,,	,, ,,	দৈনন্দিন সন্ধ্যা ও তর্পণে ,,
।	,, পুরোহিত	,, পুরোহিত	ব্রাহ্মণের নিকট বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধে অগ্রাহ্য।
৫।	,, ,,	,, ,,	,, ,, সামাজিক ভোজনে অপাঙ্‌ক্তেয়।
৬।	,, দান	,, দান	ব্রাহ্মণের নিকট অগ্রাহ্য। বহু ব্রাহ্মণ (প্রকাশ্যত) বলিয়া থাকেন অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ; কায়স্থ ও বৈশ্য প্রভৃতিও শূদ্রের অন্তর্গত।)
৭।	,, জল ও খাদ্যদ্রব্য	,, জল ও খাদ্যদ্রব্য	ব্রাহ্মণের গ্রহণ নিষিদ্ধ। বহু ব্রাহ্মণ শূদ্র স্পৃষ্ট জল ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না। ইহারাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।
৮।	,, স্ত্রী ও পুরুষের মুখ	,, স্ত্রী ও পুরুষের মুখ	কোনো ব্রাহ্মণ সন্তানই উপনয়নের পর দর্শন করে না।
৯।	,, প্রদত্ত ব্রত ভিক্ষা	,, ব্রত ভিক্ষা	কোন ব্রাহ্মণই গ্রহণ করে না।

	[illegible] মুচি বাগ্দী পোদ রাজবংশী কৈবর্ত্ত মালো নমঃশূদ্র কপালিক সূত্রধর মালী ধোপা সাহা প্রভৃতি তথা-কথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়	— বৈদ্য কায়স্থ ও অন্যান্য নব-শাখগণ	ব্রাহ্মণের আচরণ
১০।	ইহাদের স্পর্শ	ইহাদের স্পর্শ	ব্রাহ্মণের প্রতিমা ও বিগ্রহকে অপবিত্র করে এবং পবিত্র করিতে হইলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইতে হয়।
১১।	,, গৃহে	গৃহে	ব্রাহ্মণের শালগ্রামাদি লইয়া গেলে অপবিত্র হয়; পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শুদ্ধ করিতে হয়।
১২।	,, স্ত্রী-পুরুষ	।-পুরুষ	প্রণবযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে না।
১৩।	,, স্ত্রী-পুরুষের	,, স্ত্রী-পুরুষের	দীক্ষা মন্ত্র প্রণববিহীন।
১৪।	,, শবানুগমন	,, শবানুগমন	ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।
১৫।	,, স্ত্রী-পুরুষকে	,, স্ত্রী-পুরুষকে	ব্রাহ্মণের গৃহে সামাজিক ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে হয়।
১৬।	আসন	,, আসন	সামাজিক ক্ষেত্রে (বিবাহও শ্রাদ্ধাদি বাসরে) পৃথক। *

সুতরাং উক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে ৫০৲ টাকার ক্ষতি যাঁহার হইয়াছিল এবং যিনি ঐ ৫০৲ টাকার ক্ষতি মনে না করিয়া অপর বন্ধুটীর তুলনায় ২৫৲ টাকা লাভ মনে করিয়াছিলেন—আমাদের রঘুনন্দন নির্দ্দেশিত শূদ্র কথিত বৈদ্য ভ্রাতারাও ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ৫ জুতা খাইয়াও তৃপ্ত ছিলেন, কায়স্থ ৭ জুতা খায়—এই আনন্দে—এই ২ জুতা কম খাওয়ার লাভে।

---

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বিদ্রোহী শূদ্র।

কায়স্থগণের তৃপ্তি—তাঁহারা খান ৭ জুতা, আর কামার কুমার তিলি মোদক আদি নবশাখগণ খায় ১০ জুতা, সুতরাং ৩ জুতাই লাভ; নবশাখগণের আনন্দ ও তৃপ্তি তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ১০ জুতা খাইলেও সাহা সুবর্ণবণিক কপালী কৈবর্তগণ যখন খায় ১৫ জুতা—সুতরাং তাঁহাদের ৫ জুতাই লাভ। ইঁহাদের তৃপ্তি—নমঃশূদ্র মালী পাটনী পোদগণ খায় ২০ জুতা আর তাঁহারা খান ১৫ জুতা—৫ জুতাই লাভ। নমঃশূদ্রাদির তৃপ্তি—মুচি হাড়ি কেওড়াগণ খায় ২৫ জুতা—আর তাঁহারা খান ২০ জুতা—৫ জুতাই লাভ। মুচিদের তৃপ্তি তাঁহারা খান ২৫ জুতা ডোম মুদ্দাফরাস খায় ৩০ জুতা—সুতরাং তাহাদের ৫ জুতাই লাভ। ডোম মুদ্দাফরাসের তৃপ্তি ম্যাথরগণ খায় ৩০।। জুতা, আর তাহারা খায় ৩০ জুতা—আধ জুতাই লাভ। এমনই ভাবে প্রত্যেক অব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কে কত কম জুতা খান বলিয়া গৌরবান্বিত ও অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্বিত আছেন। সকলেই যে সমভাবে—সমবেত ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অত্যাচার অবিচার পীড়ন লাঞ্ছনা ও জুতা প্রহার খাইতেছেন—এজন্য কাহারও দুঃখ নাই, তাপ নাই, বেদনা নাই, ব্যথা নাই, ক্ষোভ নাই, রোষ নাই—আছে অন্যাপেক্ষা ৫।৭।১০।১৫ জুতা কম খাওয়ার গৌরব ও তৃপ্তি!!

এই কম অত্যাচার ভোগের মিথ্যা গৌরবে ইহারা পরস্পরের উপর অবাধে নিশ্চিন্ত মনে অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে, একদিনও সকলে মিলিয়া সমবেত ভাবে ইহার প্রতিকারের জন্য দণ্ডায়মান হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা ইহারা যে ছোট হীন হইয়া আছে, এজন্য ইহাদের দুঃখ নাই, বরং অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা তাহারা বড় কুলিন ও শ্রেষ্ঠ এই আনন্দেই তাহারা ভরপুর ও মসগুল আছে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট যেমন করিয়া প্রজাবর্গের মধ্যে ভেদ নীতি প্রচার দ্বারা (Divide and rule) বিদেশ ও বিদেশীগণকে শাসন

করিয়া থাকেন—আমাদের স্বদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বী ও স্বজাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণরগণও এই ভেদ-নীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় দ্বারা এতকাল নিরাপদে কোটি কোটি শূদ্র দাস দাসী শাসন করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক জাতিকে সম্প্রদায়কে বেশ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানা শাস্ত্র রচনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন তোরা উহাদের অপেক্ষা অনেক বড় শ্রেষ্ঠ, উহারা আবার তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বড় কুলিন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের এই ক্রূরতা ভেদ-নীতির দুর্ভেদ্য জাল ছিন্ন করিয়া কায়স্থ ডোম কন্যার বিবাহে হাইকোর্টের রায়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এতকাল ধরিয়া যাহা সংগোপনে বহু চেষ্টায় রক্ষা করা হইয়াছিল—এতদিনে তাহা ফাঁসাইয়া গেল। বৈদ্যকায়স্থগণের মত বিদ্বান বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণধী মনীষিগণও ব্রাহ্মণগণের কুটীলতা ভেদ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশে অব্রাহ্মণ সুতরাং শূদ্র কথিত বৈদ্য কায়স্থগণের অশৌচ যে কামার কুমার তিলি তামুলি সাহা সুবর্ণ-বণিক মালী ঢুলী বেহারা বাগ্দিগণের সমান এবং ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণগণ যে সকলকেই সমান করিয়া রাখিয়াছে—এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াও তাঁহারা এতকাল ব্রাহ্মণগণের হীন অভিসন্ধি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। অজ্ঞ নবশাখগণের ত কথাই নাই। তাহারা কি বুঝিবে—ব্রাহ্মণগণের চালাকি!

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের পর—এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতে তথা বঙ্গে নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারই দূরাগত ফল স্বরূপ অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে যোগী ও বৈদ্যগণের মধ্যে প্রথম সাম্প্রদায়িক জাগরণ আসিয়াছে। যোগীগণই সর্ব্বপ্রথম নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করতঃ উপবীত ধারণ ও দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যগণ প্রথমতঃ নিজেদের অম্বষ্ঠ, পরে অম্বষ্ঠ বৈশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বৈশ্যোচিত ১৫শ দিন অশৌচ ও উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। শূদ্র কথিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের

মধ্যে সাম্প্রদায়িক জাগরণ কতদিনে আসিত বলা যায় না—যদি কায়স্থ ডোমকন্যা বিবাহের মোকদ্দমা—হাইকোর্টে না উঠিত। অকৃতকার্য্যতার মধ্যে যেমন কৃতকার্য্যতা, অমঙ্গলের মধ্যে যেমন মঙ্গল—মন্দের মধ্যে যেমন ভাল—বিষের মধ্যে অমৃত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, একটি কায়স্থ পরিবারের বিপদ অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত জাগরণের কারণ ঘটিয়া গেল। যোগী এবং বৈদ্যগণ নিজেদের শূদ্রত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উহাহইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেও সমাজ হইতে শূদ্রত্বরূপ মহাবলশালী দানবকে শানিত খড়্গে দ্বিখণ্ডিত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কায়স্থ ও ডোম কন্যার বিবাহ-মামলায় কায়স্থসমাজ আপনার স্নেহের পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া সমগ্র বাঙ্গলায় এক নব যুগের, নব চেতনার সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নব জাগরণের সঞ্চার করিয়াছেন—সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণ-সাধক ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেই ভারত ও বাংলা বিখ্যাত মোকদ্দমার বিবরণটী এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

শূদ্র থাকার গ্লানি ও অপমান—

বঙ্গদেশের কোন এক জেলার জনৈক সম্ভ্রান্ত জমিদার ঘরের একটি ছেলে কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিতেছিলেন। কলেজে যাতায়াত কালে এক পরমাসুন্দরী অতুল লাবণ্যবতী ডোমকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আত্মীয় স্বজনগণের শত অনুরোধ উপরোধ নয়নজল অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁহাদের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করে। কালে এই পৌত্রটী বড় হইয়া পিতামহের সম্পত্তির দাবী করে এই আশঙ্কায় পিতামহের পক্ষ হইতে এই বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া আদালতে মামলা দায়ের করেন। এই মামলা নিম্ন আদালত হইতে ক্রমশঃ হাইকোর্টে উঠে। বিশেষ আদালত গঠন করিয়া হাইকোর্টের বিশিষ্ট ২ কয়েক-

জন বিচারপতি এই মামলা বিচার করিতে বসেন। কেন না এই প্রকার মামলা কখনও হাইকোর্টে ইতঃপূর্ব্বে উঠে নাই। কায়স্থ পক্ষ হইতে তাঁহাদের পক্ষীয় উকীলগণ বলেন—যে এই বিবাহ অসিদ্ধ; কেননা কায়স্থ একবর্ণ বা জাতি আর ডোম আর এক জাতি। কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ। একারণ এই কায়স্থ ও ডোম এই দুই অসবর্ণের (জাতির) বিবাহ অসিদ্ধ—অসিদ্ধ বিবাহের ফলে জাত পুত্র অসিদ্ধ এবং অসিদ্ধ পুত্র বা পৌত্র পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য নহে। ওদিকে ডোম পক্ষ হইতে উকীলগণ হিন্দু আইন (Hindu Law) এর নজির উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে—কায়স্থ উপবীত বিহীন এবং ৩০ দিন অশৌচ ধারণকারী সুতরাং শূদ্র আর ডোমও পৈতাহীন—শূদ্র,—এবং সব শূদ্রই এক জাতি (জাতীয়)। শূদ্রের মধ্যে ২।৪।১০ জাতি বা ৩৬ জাতি থাকিতে পারে না। সব শূদ্রেরই এক জাত্। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যঃ ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্র, নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥ ১০।৪

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি; চতুর্থ এক জাতি শূদ্র আর কোনও পঞ্চম বর্ণ নাই।" মনু—অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারিবর্ণ ছাড়া আর কোন পঞ্চমবর্ণ বা জাতি নাই। যে কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় এই চারি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে—চারিবর্ণের মধ্যেই থাকিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজন্ম * লাভ করিয়া দ্বিজ হইবেন—কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার

* "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজপদ বাচ্য; এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার দ্বিতীয় জন্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নে আচার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতৃস্বরূপা।" অনুবাদ ১ম অধ্যায় ৬।৭ শ্লোক শঙ্খ সংহিতা।

জনিত দ্বিজন্ম (২য় জ্ঞান জন্ম) নাই এজন্য সে দ্বিজ নহে—এবং সব শূদ্রই একই বর্ণ বা জাতিভুক্ত। আর রঘুনন্দন মতে কলিতে মাত্র দুইটী বর্ণ বা জাতি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যম-সংহিতা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধার করিয়া স্বীয় স্মৃতিগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।" এই জঘন্য কলিযুগে দুইটী মাত্র জাতি বা বর্ণ—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র—অন্য ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যবর্ণ নাই—উহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিরূপে এই কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠাদি লোপ প্রাপ্ত হইয়া শূদ্র হইয়া গিয়াছে এসম্বন্ধেও রঘুনন্দন নজির দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। সেটী এই :—

ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্ব মাহ,

মনু :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ১০।৪৩

অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবা পরোঽখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাঃ ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।

তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যা-নামপি তথা। এবম্ অম্বষ্ঠাদীনামপি।

(রঘুনন্দনকৃত শুদ্ধিতত্ত্ব)

অর্থাৎ—এই সকল (নিম্নলিখিত) ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু (বেদের অদর্শন অথবা ব্রাহ্মণ কর্তৃক যাজন অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান না করাতে) ও উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া পড়ায় ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরে এই ক্ষত্রিয় জাতিগণের নাম মনু বলিতেছেন—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ ॥ ১০।৪৪

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস। রঘুনন্দন বলিতেছেন—অধুনা ক্ষত্রিয়েরা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—মহানন্দি পুত্র শূদ্রাগর্ভোদ্ভব অতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দ, পরশুরামের ন্যায়, অখিল ক্ষত্রিয় বিনাশকারী হইবে। তারপর হইতে শূদ্রেরা রাজা হইবে। মহানন্দি পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় ছিল। উপনয়ন সংস্কারাদি ক্রিয়া লোপ হেতু বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠগণও শূদ্র হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলা হইল সব শূদ্রের একই জাতি—; ৪র্থ বর্ণ শূদ্র সকলেই এক জাতিভুক্ত; শূদ্রের মধ্যে ২।৪।১০ বা ৩৬ জাতি নাই, বড় ছোট, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, আচরণীয়—অনাচরণীয়—বলিয়া কিছু নাই; আর এক্ষণে বলা হইল—এই জঘন্য কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সব লোপ হইয়া শূদ্র হইয়া গিয়াছে,—কাজেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বা জাতি নাই। কায়স্থ যখন ব্রাহ্মণ নয় এবং ডোমও যখন ব্রাহ্মণ নয়—আর কলিতে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই—তখন কায়স্থ ও ডোম উভয়েই এক জাতিবিশিষ্ট সমান শূদ্র। উভয় শূদ্রের মধ্যে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। ডোম পক্ষের এই উক্তি যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণে বিচার-পতিগণ রায় দিলেন—যে—ডোমকন্যার গর্ভজাত পৌত্র তদীয় পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। বঙ্গদেশের রাজা মহারাজা জমিদার ও বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণ এই সাংঘাতিক দারুণ অপমানকর রায় শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন—এবং বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিলেন,—পরম দুর্ভাগ্য তাঁহাদের প্রিভিকাউন্সিলেও তাঁহারা হারিয়া

আসিলেন। শত শত শতাব্দীর অহঙ্কার অভিমান সম্মান গর্ব্ব—ম্লেচ্ছ ইংরাজের কলমের একটি খোঁচায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ হইয়া গেল—ব্রাহ্মণ বাদে বৈশ্য কায়স্থ হইতে কামার কুমার তিলি তাম্বুলি সাহা সোনারবেণে কপালী মাল নমঃশূদ্র মালী মুচি ম্যাথর ডোম মুদ্দাফরাস সকলেই সমান—একজাতিভুক্ত—অধম শূদ্র। ইহাদের মধ্যে—কিছুমাত্র উত্তম অধম বড় ছোট নাই। এই রায় শুনিয়া কেহ যেন মনে করেন না—যে কায়স্থ ও ডোম একই জাতি, কিন্তু কামার কুমার তিলি তাম্বুলি সাহা সুবর্ণ-বণিক, ডোম ম্যাথর অপেক্ষা বড় জাতি। রায়ের মর্ম্ম পরিষ্কার—পৈতাহীন এক মাস অশৌচ, পালনকারী সকলেই শূদ্র—সকলেই সমান—সকলেই তুল্য অধম। *

হাইকোর্টের ও প্রিভিকাউন্সিলের এই রায়ে সমস্ত বঙ্গদেশের কায়স্থ ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির মোহঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জ্ঞান নেত্র প্রস্ফুটিত হইল,—তাঁহারা বুঝিলেন যাঁহাদের উপর এতকাল মান ইজ্জতের ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন—তাঁহারা সে মান ইজ্জত কত খানি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর নেতৃত্ব অভিভাবকত্ব তাঁহাদের হাতে রাখা চলিতে পারে না। এইবার নিজেদের সমাজের ভার নিজেদের হাতে লইতে হইবে। ইহাই মনে করিয়া কায়স্থগণ সভা করিয়া শ্রেষ্ঠ নেতৃবর্গ একত্রিত হইয়া, শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধার করতঃ—প্রমাণ বাহির করিলেন—কায়স্থগণ শূদ্র নহে—দেবতা চিত্রগুপ্তের বংশধর—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি।

শূদ্র থাকার কিরূপ গ্লানি ও অপমান,—হীনতা ও নীচতা,—লাঞ্ছনা

* এতদনুরূপ কায়স্থ ও তন্তবায় কন্যার বিবাহেও বিচারপতিগণ রায়ে লিখিয়াছিলেন যে—কায়স্থও শূদ্র ও তন্তবায়ও শূদ্র—এ কারণ এই বিবাহও হিন্দু আইন সম্মত—ও উভয়ের সঞ্জাত পুত্র পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী।

ও অসম্মান উপরের একটি মোকদ্দমায় প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাই হইল ১নং অপমান।

ইহাপেক্ষাও শতগুণ অপমানকর ও নারীজাতির মর্য্যাদা-হানিকর আর একটি মোকদ্দমা হয়—তাহাতেও অবশিষ্ট শূদ্র ভাইদের চক্ষু ফুটিয়াছে। সে মামলাটী এইরূপ—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর জনৈক কায়স্থের উপপত্নীপুত্র হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে পিতৃসম্পত্তিতে, আইনানুমোদিত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন। এই মোকদ্দমায় হাইকোর্ট কায়স্থকে শূদ্র গণনা করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।*

হিন্দু শাস্ত্র তথা হিন্দু আইন শূদ্রের মান-সম্মান—শূদ্র-নারীগণের সতীত্ব-মর্য্যাদা দুই পা দিয়া দলন করিয়াছে। শূদ্রগণ ক্রীতদাস ও শূদ্র নারীগণ ক্রীতদাসী। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর মান মর্য্যাদা কোন কালে কেহ কোথাও দেয় নাই। হিন্দু আইনে ব্রাহ্মণপত্নী পত্নী, ও ব্রাহ্মণপুত্র পুত্র, ক্ষত্রিয়পত্নী পত্নী, ও ক্ষত্রিয়পুত্র পুত্র, বৈশ্যপত্নী পত্নী, বৈশ্যপুত্র পুত্র, কিন্তু শূদ্রের বিবাহ এক প্রকার অনুমোদিত উপপত্নী রক্ষণ; পত্নী উপপত্নী তুল্য, বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র আর উপপত্নীর গর্ভজাত জারজ পুত্রে তফাৎ নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপপত্নী-গর্ভজাত সন্তানগণ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না—কিন্তু শূদ্রের উপপত্নী গর্ভজাত সন্তানগণ পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারী হয়। ইহাই হইল শূদ্র থাকার ২ নম্বর অপমান।

নিম্নে হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল—

The Hindu Law regarded the Sudras as slaves and their marriages as little better than licensed concubinage."—Indian Law Reports, 3. Bombay. 273. P. 280.

* স্বর্গগত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ—২৯৮ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ হিন্দু আইনে শূদ্রদিগকে ক্রীতদাস বলিয়া মনে করা হয় এবং তাহাদিগের বিবাহ এক প্রকার অনুমোদিত উপপত্নী রক্ষণ অপেক্ষা বিশেষ কিছু উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

In Hindu Law illegitimate son of a regenerate man is always excluded from inheritance, but in the case of a Sudra, the illegitimate son of a particular description namely the son born of an unmarried female slave or slaves inherits his father's property."

Mitakshara, Chap 1. Sec. XII. 1-3, Dayabhag Chap. IX. 28—3.

[Dr. Gurudas Banerjee's Marriage and Stridhana, P. 160—161.]

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে হিন্দু আইনে উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হয় না—কিন্তু শূদ্রের পক্ষে তাহা হইবে।

উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত দ্বিজাতি ব্রাহ্মণগণ অন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য দুই দ্বিজাতির পর সমান রাখিয়া নিজেদের ঘরের কুলবধূ-কুলকন্যাগণের —মা লক্ষ্মীগণের সতীত্ব মান মর্য্যাদা সাড়ে ষোল আনা বজায় রাখিয়া —সমস্ত অপমান অসম্মানের পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা নির্ম্মম ভাবে শূদ্র-কন্যা শূদ্র-মা-বধূ-ভগিনীগণের মাথায় চাপাইয়া শূদ্র-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শূদ্রের মা-ভগিনী-বধূ-কন্যাগণকে উপপত্নীর সমান ও ঘরের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী বেহুলা সতী লক্ষ্মীগণকে রক্ষিতা—বেশ্যার প্রায় সমতুল্যা বলাতেও যে সব অব্রাহ্মণ হতভাগ্যগণের চৈতন্য হইবে না,—শূদ্র থাকায় অরুচি জন্মিবে না, শূদ্রের হীন জীবন যাপনে অশ্রদ্ধা জাগিবে না— তাহাদের ধিক্কার দিবার আর ভাষা নাই— শব্দ নাই। শাস্ত্র যে শূদ্রকে বিড়াল কুকুর, বেজী ব্যাঙ—গোসাপ ও

গর্দ্দভ বলিয়াছে—বুঝিব সেই সব হতভাগ্য মান মর্য্যাদা জ্ঞানহীন নরপশুগণ সত্যই পশুর মত ঘৃণার যোগ্য—পদতলে থাকিবারই উপযুক্ত!!

শূদ্র থাকার জন্য অপমান—

মনুসংহিতায় প্রথমে লক্ষ শ্লোক ছিল। তাহা পাঠ করা অসম্ভব বিবেচনায় নারদ তাহার সার সংগ্রহ করিয়া নারদসংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন একথা তিনি নারদসংহিতার প্রথমেই বলিয়াছেন। সেই নারদসংহিতার বিধি এইরূপ—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরাশর-সংহিতা, গরুড়পুরাণ।

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে কিম্বা পতিত (জাতিচ্যুত) হইলে এই পঞ্চ প্রকার আপদে স্ত্রীগণের পুনরায় অন্যপতি গ্রহণ (বিবাহ) শাস্ত্রসম্মত।

স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে কতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের পত্নীগণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবেন? পরেই তাহা বলিতেছেন—

"স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে পুত্রবতী ব্রাহ্মণী ৮ বৎসর, পুত্রহীনা তার অর্দ্ধেক ৪ বৎসর; পুত্রবতী ক্ষত্রিয়া ৬ বৎসর পুত্রহীনা ৩ বৎসর, এবং পুত্রবতী বৈশ্যা ৪ বৎসর ও পুত্রহীনা তার অর্দ্ধেক ২ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে।* আর শূদ্রগণের পত্নীগণ—

অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদ প্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥ নারদ সংহিতা

ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃকাল এষপ্রোষিত যোষিতাম্।—নারদসংহিতা

অর্থাৎ—"শূদ্রপত্নীগণের পক্ষে অপেক্ষা করিবার কাল নিয়ম নাই। স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়া মাত্র—সময়ের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া পতিগ্রহণ করিবে।"

যাঁহারা ব্রাহ্মণসভা ও ভাটপাড়ার মোহে এখনও শূদ্র হইয়া আছেন—তাঁহারা বাটী হইতে কোথাও যাইবার পূর্ব্বে ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, নতুবা হয় ত বাড়ী আসিয়া দেখিবেন যে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রচার গ্রন্থাবলীর অনুবাদ পাঠ করিয়া গৃহসংসার আঁধার করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

৪নং অপমান—সংহিতা শ্রেষ্ঠকার মনু বলিতেছেন—

"জঘন্য প্রভবো হি সঃ॥" ২৭০ অষ্টম অধ্যায়।

শূদ্রের জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে। বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইল কিনা জঘন্য স্থান! জঘন্যস্থান হইতে উৎপন্ন অধম শূদ্রের কিরূপ নাম রাখা হইবে? মনু (২য় অঃ ৩১) বলিতেছেন ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং "শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্"—শূদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম, বৈশ্যের ভূতি এবং শূদ্রের দাস সংযুক্ত করিবে। শূদ্রগণ কি করিবে, কি তার বৃত্তি ব্যবসা? মনু বলিতেছেন—

শূদ্রন্তু কারয়েৎ দাস্যং ক্রীতং অক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩—৮ম অঃ

"পরন্তু শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক শূদ্রদ্বারা তিনি (রাজা) দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা পুরুষ ভগবান দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

মানুষ বলিতে সংহিতাকারগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেই বুঝাইয়াছেন।

শূদ্রকে তাঁহারা মানুষের মধ্যে গণ্য করেন নাই। পশুপক্ষীর সমান জ্ঞান করিয়াছেন—

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥

মনু ১১শ অঃ ১৩২।

"বিড়াল বেজি, চাষ পক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটিকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" এসম্বন্ধে অত্রি বলিয়াছেন—

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দ্দূলগর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ২২২।

"শরভ (অষ্টচরণ বিশিষ্ট মৃগ বিশেষ), উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

সে প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ?

অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।

পরাশর সং ১৯।

এক দিবারাত্র উপবাসপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে।

পাঠকগণ জানেন যে বিড়াল, বেজি, পক্ষী, ব্যাঙ, কুত্তা (কুকুর), গুইসাপ (গোসাপ), পেঁচা, হরিণ, উট, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, বাঘ ও গাধার কোন ক্রিয়াকলাপ, ধর্ম্মকর্ম্ম, যাগযজ্ঞ, ব্রতওপস্যা, সাধন ভজন, পূজা অর্চ্চনা, পাপ পুণ্য নাই এবং থাকিতেও পারে না। আর এ সমস্ত না থাকিলে গুরু পুরোহিতেরই বা কি প্রয়োজন? সে কারণ শূদ্রের বিবাহাদিও নাই; হিংসুক যুগের নীচমনা দেশ ও সমাজবৈরিগণ শাস্ত্রের নামে লিখিয়াছেন—

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥

মনু, ১০ম অঃ ১২৬।

অর্থাৎ মনুসংহিতার মতে—"শূদ্রের কোনও পাপ নাই, সে সংস্কারের যোগ্য নহে, ইহার কোন ধর্ম্মে অধিকার নাই, কোন ধর্ম্ম হইতে নিষেধও নাই।"

শাস্ত্রানুসারে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দশবিধ সংস্কার আছে। যথা—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন ৩। সীমন্তোন্নয়ন, (এই তিনটী গর্ভ সংস্কার), ৪। জাত কর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন (এই তিনটী শৈশব সংস্কার), ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯। সমাবর্ত্তন, (এই তিনটী কৈশোর সংস্কার), ১০। বিবাহ (যৌবন সংস্কার)।

মনু শূদ্রগণের পক্ষে উপরিলিখিত সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন। অথচ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কার বাদে অন্যান্য সংস্কারগুলি অব্রাহ্মণ জাতিগুলির মধ্যে অনেকটা প্রচলিত আছে। যাঁহারা নিজেদের শূদ্রত্ব ত্যাগে অনিচ্ছুক এবং নিজেদিগকেই শাস্ত্রবিশ্বাসী বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা উপবীত লইয়া অশৌচ কমাইয়া বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইয়া শাস্ত্রহানি ধর্ম্মহানি করিতেছেন বলিয়া মনে করেন—তাঁহারা এই মনুর বিধি শুনিয়া এখন হইতে কি করিবেন? শাস্ত্র মানিবেন? কি শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিবেন? মানিলে তাঁহাদের বাপ পিতামহগণের এবং নিজেদের বিবাহাদি অন্যায় অসঙ্গত ও অবিধিপূর্ব্বক হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক সাবধান হইয়া এগুলি যাহাতে আর বাড়ীতে পরিবারবর্গের মধ্যে অনুষ্ঠিত না হয় তাহার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শূদ্রগণ কুকুর বিড়াল বেজি ব্যাঙ গোসাপ গাধার সমান। এই সব পশুগণের বিবাহ অন্নপ্রাশন কখনও হয় কি? এবং হওয়া উচিৎ ও সম্ভবপর কি? ব্যাস-সংহিতা বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য,—এই তিন বর্ণই—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে।৫

"শ্রুতিস্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী কিন্তু—

বেদমন্ত্র স্বধা স্বাহা বষট্কারাদিভির্বিনা॥ ৬

বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা বষট্কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।"

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বর্ত্তমানকালে শূদ্রগণ ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবন যাত্রায় যেরূপ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। শূদ্রেরা কোন বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী নহে। বিবাহে কুশণ্ডিকা, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদী গমন কিছুই করিতে পারে না। শূদ্রের যে ভাবে বিবাহ হয় তাহাকে ঠিক বিবাহ বলা যায় না। মনু বলিতেছেন—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।

তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥ ৮।২২৭

অর্থাৎ পাণিগ্রহণ মন্ত্রপাঠ ও সপ্তপদী গমন হইলে তবে বিবাহ সমাপ্ত হয় নচেৎ নহে। শূদ্রের বিবাহে ঐ মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা নাই,— সুতরাং বিবাহ একপ্রকার অসিদ্ধ। পারস্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শূদ্রের বিবাহ অমন্ত্রক হইবে এবং যদি ক্রিয়াই অমন্ত্রক হয় তাহা হইলে তাহাকে (বিবাহ) সংস্কার বলিয়া গণ্য করা যায় না। পুরোহিতগণ কখনও স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্র পাঠ করান না। "দেবী জন্মলে" লিখিত আছে—

স্বাহা প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র ব্রাহ্মণ শূদ্রকে পাঠ করাইলে শূদ্র নরকগামী ও ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। *

---

* স্বাহা প্রণব সংযুক্ত শূদ্রে মন্ত্র দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্র নিরয়াপ্নোতি ব্রাহ্মণো ইত্যধোগতিম্॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বঙ্গদেশের শূদ্রাদিগের বিবাহ অমন্ত্রক না করিয়া ঐ সমস্ত মন্ত্র পুরোহিতদিগকে নিজে উচ্চারণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু শূদ্রের স্বয়ং প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নাই। পুরোহিত-দিগের পঠিত মন্ত্রে স্বাহা প্রণব শূদ্রের বেলায় প্রযুক্ত হয় না। ফলে শূদ্র কন্যাদের বিবাহ মন্ত্র পাঠক পুরোহিতগণের সঙ্গেই একরূপ হইয়া যায়!!

শূদ্র দীক্ষাদাতা গুরু ও শূদ্রযাজী পুরোহিত পতিত

শূদ্রাতিরিক্ত যাজী গ্রামযাজী য কীর্ত্তিতঃ।

*   *   *   *

এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তিতে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ৩০।২০২—২০৪

"এক জাতীয় শূদ্রের অতিরিক্ত যাজী অর্থাৎ বহু শূদ্রযাজী ও গ্রাম যাজী ব্রাহ্মণগণ মহাপাপী, তাহারা কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে।" "যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের জন্য হোম করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে॥" (পরাশর সংহিতা ১২।৩৫)

হিন্দু শাস্ত্র গো মাংস ভক্ষণে চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন —আর "যাজকান্নং নবশ্রাদ্ধং * * * * * * * ভুক্ত্বাচান্দ্রায়নং চরেৎ॥"*

আপস্তম্ব ৯।২২

* দুঃখের বিষয় শূদ্রকথিত অব্রাহ্মণ যজমানগণ দ্বিজোচিত উপনয়নাদি কোনও প্রকার জাতীয় উন্নতিকর সংস্কার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেই শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরোহিতগণই প্রথমে বাধা প্রদান করেন। শাস্ত্রকারগণ এই সব শূদ্রযাজী পুরোহিত মহাশয়গণের যে নাক কান মলিয়া গলা ধাক্কা দিয়া একেবারে অধম পতিত, অপাংক্তেয় বলিয়া পাঁতি দিয়াছেন—এবিষয়ে তাঁহারা একেবারেই অজ্ঞ উদাসীন; শত পদাঘাতে—লক্ষ কান-নাক-মলাতেও লাজলজ্জাহীন, নির্ব্বিকার। যে স্মৃতির দোহাই দিয়া তাঁহারা যজমান চালান সেই স্মৃতিগুলি পাঠ করিলেই তাঁহাদের রঘুনন্দন-ভক্তি-সাগরে

শূদ্রযাজী-ব্রাহ্মণের অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত করিবে।*

চড়া পড়িলে, তাঁহারাই প্রথমে বিদ্রোহী হইয়া যজমানদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা জানেন না যে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব ও পৌরোহিত্য বজায় রাখিতে হইলেই যজমানদিগকে হয় বৈশ্য নয় ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিবার দরকার, যজমান বা শিষ্য শূদ্র হইলে পুরোহিত ও মন্ত্র দীক্ষাদাতা গুরুদেবগণও পতিত শূদ্র হইয়া যান। এই কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য এখানে একটা আখ্যান বলিতেছি। (আমাদের দেশের জনৈক সাহা মহাজন জনৈক গৃহস্থকে মাসিক টাকা প্রতি ৵০ আনা সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে ২৫৲ ধার দেন, তিন বৎসর পর খাতক সুদের মাত্র ১০৲ ও আসল ২৫৲ —মোট ৩৫৲ দিতে আসে, মহাজনটী টাকা গ্রহণ করেন না। সামান্য কিছু লইয়া খতের পৃষ্ঠে ওয়াশিল লিখিয়া রাখেন। এইভাবে বার বৎসর যখন উত্তীর্ণ প্রায় তখন পেয়াদা দ্বারা খাতককে ডাকাইয়া আনিয়া টাকা চাহেন। দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘ বার বৎসরে খাতক সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দিন মজুরী সার করিয়াছে। মহাজন সবই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি অগত্যা আসল ২৫৲ টাকা মাত্র চাহিলেন, খাতক দিতে অসমর্থতা জানাইলে, তিনি ক্রমে ২৫৲ হইতে ১০৲ ৫৲ ২৲ ও সর্ব্বশেষে মাত্র একটি টাকা ঋণ শোধের জন্য চাহিলেন ও বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন হাসিয়া খাতক বলিল 'হুজুর এত টাকাই মাপ দিলেন আর সামান্য একটি টাকার জন্য এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন কেন!' মহাজন বলিলেন—'তোরই মঙ্গলের জন্য বলিতেছি মাত্র। শাস্ত্রে কি শুনিস নাই মহাজনের ঋণের টাকা শোধ না দিলে কলুর বলদ হইয়া ঘানিতে জুড়িয়া তৈল বাহির করিয়া দিয়া পূর্ব্ব জন্মের ঋণ শোধ দিতে হয়।' খাতক বলিল 'বেশ ত আমি না হয় কলুর বলদই হইয়া ঘানি টানিব তাতে আপনার ক্ষতি কি?' মহাজন—"আরে নির্ব্বোধ তুই কলুর বলদ হইয়া জন্মিয়ে কলুর ঘানিতে জুড়িয়া তৈল বাহির করিয়া পয়সা রোজগার করিয়া দিলে আমার কাছেকার তোর ঋণ ত শোধ হইবে না? আমার ঘানিতে জুড়িয়া আমাকে তৈল বাহির করিয়া দিলে না তোর ঋণ পরিশোধ? ওরে তোর পায়ে পড়ি—হাতে ধরি মিনতি করি, তুইও ঋণের দায়ে মরিয়া বলদ হোস নে, আর আমাকেও কলু বানাস নে। শুধু আমার প্রতি দয়া করিয়া একটি মাত্র টাকা জমা দিয়া ঋণ হইতে খালাস হ, এবং আমাকেও পরজন্মে কলু হওয়ার দায় হইতে খালাস দিয়া যা, তুই ত শুধু বলদ হইলে হইবে না, আমাকেও যে তোর ঋণ শোধের দায়ে কলু হইতে হইবে।")

শূদ্রযাজী পুরোহিতগণের সামান্য পড়াশুনা ও শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে তাঁহারাই জেলায়

অসিজীবী মসীজীবী দেবল গ্রামযাজকাঃ।
পাচক ধাবকশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ॥

যুদ্ধ ব্যবসায়ী, লিপিজীবী (কলম পেষা কেরাণী), দেবপূজক, গ্রাম-যাজক, পাচক ও দূত এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ।

মনু—তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"বেদ-অধ্যয়নশূন্য, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, বহুযাজনশীল, চিকিৎসক, প্রতিমা পরিচারক দেবল, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুসীদজীবী, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান রহিত। ১৫৪। শূদ্র শিষ্য (শূদ্রদীক্ষা দাতা গুরু), যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, মদ্যপায়ী। ১৬৯। শূদ্রসেবী, নানা জাতীয় লোকের যাজক ব্রাহ্মণগণকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা মেদ মাংস রক্ত মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ। ১৮২। অনুবাদ মনু সংহিতা। *

শূদ্রের তীর্থযাত্রা পাপজনক—

অত্রি সংহিতায় আছে—

জপস্তপঃ তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রী শূদ্র পতনানি ষট্॥ ১৩৫।

জেলায় গ্রামে গ্রামে যজমানগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া খোসামোদ তোষামোদ করিতেন-—"বাবাসকল তোমাদের মঙ্গল ও উদ্ধারের জন্য নয়—আমাদের পাতিত্য দূর করিতে ও ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে তোমরা অগৌণে শূদ্রত্ব পরিত্যাগ করতঃ দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হও, আমাদের বাঁচাও। নতুবা আমরা পতিত অপাংক্তেয় থাকি!'

* শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও শূদ্রযাজন নিন্দনীয় ছিল। যাজন ত দূরের কথা দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দকে প্রথম দেখা মাত্র প্রেম-বিহ্বল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন তখন স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণগণ এজন্য চৈতন্যদেবকে বিলক্ষণ নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছিলেন। একে

"জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন (গুরু মন্ত্র গ্রহণ ও সাধন) দেবতা আরাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে পাপজনক।" এই সব গুরুতর (!) পাপ কোন প্রজা করিলে রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন—কারণ, জলধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপ হোম, পূজার্চ্চনাতৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে" (১৯—অত্রি অনুবাদ।)

বিপ্র সেবাই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম।

মনু শূদ্রের জন্য উৎকৃষ্টতম—শ্রেষ্ঠতম একটি ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—

স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণ শব্দস্য সাহ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥ ১২২
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ততে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥১২৩।১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ স্বর্গ লাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজ জীবিকা—এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক"—এই শব্দ বিশেষণ মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। ১২২। বিপ্র সেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতৎভিন্ন যে যাহা কিছু করে তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল।১২৩

ব্রাহ্মণ তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, শূদ্র কায়স্থ রামানন্দ রায়কে স্পর্শ করা ও আলিঙ্গন দেওয়া তাঁহারা ঘোর অশাস্ত্রীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভুবনবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক অমিয় নিমাই চরিত প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ৶০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে (১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ) নবশাখের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, ধনী নবশাখগণ কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইলে ব্রাহ্মণের বাটী গিয়া পূজা দিয়া আসিত। তাহাদিগকে মন্ত্র দীক্ষা দিলে কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের বাটীতে গেলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন।"

শুনিলেত ভাই সকল, অত্যাচারী গর্ব্বিত মানুষের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সব! "এই ত শুনিলেন শূদ্র থাকার কিরূপ গৌরব—ও শূদ্রের কত দূর সম্মান? এইরূপ সম্মান ও গৌরব লইয়া কি আপনারা থাকিতে চান? আমার বিশ্বাস একজনও এমন শূদ্র থাকিতে চাহিবেন না। আপনাদের মধ্যে এমন কে হতভাগ্য—অধম আছেন যিনি নিজকে কুকুর ও গর্দ্দভ তুল্য শূদ্র এবং স্বীয় পরমারাধ্যা জননী দেবীকে কুক্কুরী বা গর্দ্দভী তুল্যা মনে করেন—পিতাকে শূদ্র কুকুর বা গর্দ্দভ তুল্য হীন মনে করেন। আমি মনে করি পিতামাতার অপমানকারী ও আত্মসম্মানহীন এমন অধম সন্তান কেহই নাই, কেহই থাকিতে পারে না। যদি আপনারা শূদ্র না হন, তবে কেন শূদ্রোচিত এক মাস অশৌচ ধারণ ও উপবীতহীন অধম জীবন যাপন করিবেন।"

"আপনাদের কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে উপবীতহীন দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধক্ষত্রিয় অর্দ্ধশূদ্র নামক নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনাদের সমাজ পরিচালক নেতৃবর্গের ক্ষত্রিয়ত্বে নিবিড় ও গভীর বিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের একান্ত অভাবই ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে এবং তাঁহাদের এই শূদ্রোচিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের ফলেই সমগ্র ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সমাজের এই শোচনীয় দুরবস্থা! আপনাদিগকে জাগাইবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রাণ নেতৃবর্গ বহুগ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া বহু চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি আপনাদের অনেক মহাপ্রাণ, নেতৃবর্গের এই গুরুতর কলঙ্ক ও দুর্ব্বলতা অপনোদন করিবার জন্য সাহস করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনারা দলে দলে যোগদান করতঃ তাঁহাদের এই মহৎ ব্রত উদযাপনে সহায়তা করিয়া ধন্য হউন ও সমাজ জননীর কলঙ্ক কালিমা বিধৌত করুন। আশা করি আপনারা এই মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিবেন। কেহই আর হীন অধম অস্পৃশ্য শূদ্র হইয়া থাকিবেন না—নিজেদের

পবিত্র বংশমর্য্যাদা আর নষ্ট করিবেন না। ভারতের সুদিন সম্মুখে সমুপস্থিত। এখন আর কেহ অধমের মত সমাজের পদতলে পড়িয়া থাকিবেন না। ক্ষত্রিয়ের পতনেই ভারতের অধঃপতন—আবার ক্ষত্রিয়ের অভ্যুত্থানেই ভারতের অভ্যুত্থান। আপনাদের পুরোহিতগণের মত এমন উদার মহৎপ্রাণ যজমানহিতৈষী—জাতির মিত্র বেশী দেখি নাই। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত অজ্ঞান অবুঝগণের বিদ্রূপ টিট্‌কারী ও সমালোচনায় বিচলিত হইবেন না। যার যা ইচ্ছা সে তাই বলুক। শৃগাল কুকুরের চীৎকার যেমন হাতী গ্রাহ্য না করিয়া রাজপথ দিয়া বীরদাপে চলিয়া যায়—আপনারাও তেমনি অন্যের হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঘেউ ঘেউ রব অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইবেন। কেহ কেহ বলিতেছেন উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিয়া মাঠে আমরা হালচাষ ও কৃষিকার্য্য করিব কিরূপে? ইহার উত্তর সহজ। কৃষিকার্য্য হীন শূদ্রের কার্য্য নহে, ইহা অতি পবিত্র কার্য্য, পবিত্রতম বৃত্তি। ভারতসম্রাট কুরু, জনক প্রভৃতিগণ আপনাপন ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের অন্য নাম হলধর। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম সকলেই গোঠে গরু চরাইতেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা আপনারা পৃথিবীর নর-নারীগণকে পিতৃরূপে ভরণপোষণ ও অন্ন দান করিতেছেন। বেশী মাহিয়ানার গোলাম বা বড় বড় চাকুরে বাবু অপেক্ষা নিজেদিগকে আপনারা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যতীত কখনও হীন বা ছোট মনে করিবেন না। শাস্ত্রে আছে আপৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য করিতে পারেন।* শূদ্রত্ব গোলামী ভিন্ন কিছু নহে।

* কৃষিবৃত্তি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশই করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—

কৃষিং সাধ্বিতি বিপ্রাণাং শক্তি পুত্রাদয়ো জগুঃ।—অথর্ব্ববেদ।—অথর্ব্ববেদে কৃষিকার্য্য বিপ্রদিগের পক্ষে সাধু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কে আছ মানুষ—এস, কে আছ লাঞ্ছিতা সমাজ-জননীর দুঃখ-গ্লানি মোচনে বদ্ধপরিকর সুসন্তান এস। পিতমাতা ভাই ভগিনী কাহারও নিষেধবাণীতে—নয়নজলে বাধা-প্রদানে সঙ্কল্পচ্যুত হইও না—পশ্চাতে ফিরিও না,—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—হে বীর হৃদয় ক্ষত্রিয় যুবকগণ।”

ষট্‌কর্ম্ম সহিতো বিপ্রঃ কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ।
কুর্য্যাৎ কৃষি প্রযত্নেন সর্ব্বসত্বোপজীব্যকৃৎ॥ —পরাশর

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ষট্‌ কর্ম্মের (বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ মনু ১০।৭৫) সহিত কৃষি কর্ম্ম করিবেন। যিনি সর্ব্বজীবের উপজীবী হইতে অভিলাষ করেন—তিনি প্রযত্ন সহকারে কৃষিকার্য্য করিবেন।

স্বয়ঞ্চ বাহয়েৎ ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয় মর্হিতৈঃ
কুর্য্যাৎ বিবাহযাগাদি পঞ্চযজ্ঞাশ্চ নিত্যশঃ॥ —পরাশর

অর্থাৎ দ্বিজগণ স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিবেন এবং স্বহস্তার্জ্জিত ধান্য দ্বারা বিবাহ যাগাদি ও পঞ্চ যজ্ঞ নিত্য সম্পাদন করিবেন।

ষট্‌ কর্ম্মভিঃ কৃষিং প্রোক্তো দ্বিজানাং গৃহমেধিনাং।
ষট্‌ কর্ম্মভিঃ কৃষিং যে তু কুর্য্যুঃ জ্ঞাননিধি দ্বিজাঃ॥ —পরাশর

অর্থাৎ গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে ষট্‌ কর্ম্মের সহিত কৃষি বিহিত আছে। যে সকল জ্ঞানবান্ দ্বিজ ষট্‌ কর্ম্মের সহিত কৃষিকর্ম্ম করেন তাঁহারা দেবতা হইতে ভূচর প্রাণী পর্য্যন্ত সকলের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

উভাভ্যামপ্য জীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষি গোরক্ষা মা স্থায় জীবে বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥ মনু—১০ম অঃ ৮২

অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা না চলিলে কৃষি গোরক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

অন্যচ্চ—ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ও কৃষি কর্ম্ম করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিবেন। বিশেষতঃ এই পরাধীন ভারতবর্ষের ঘোর আপৎকালে আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে ঋষিগণ ভুলেন নাই। বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"তারপর দিগিন্দ্রবাবু প্রাণস্পর্শী ভাষায় ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞা, ক্ষত্রিয় সন্তান-গণের কর্ত্তব্য ও গুরুদায়িত্ব, সমাজে ক্ষাত্রশক্তির একান্ত আবশ্যকতা—লাঞ্ছিতা সমাজ জননার বন্ধন মোচনের কথা,—গো, বিপ্র, নারী, দেবায়তন ও তীর্থক্ষেত্রের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সতত প্রাণদানে প্রস্তুত থাকার কথা,—অস্পৃশ্যতা বিতাড়ন, শুদ্ধি ও হিন্দু সংগঠন, স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার, বাঙ্গালা পীড়ন হইতে সমাজের মুক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—

নিবেদন, আবেদন, ভিক্ষা, যাচ্ঞা ত্যাগ করুন, সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দিয়া ভীমবলে জাগিয়া উঠুন। মনে রাখিবেন—সামাজিক মুক্তি আনয়নের জন্য আগুনের দাহিকা, বজ্রের শক্তি, বিদ্যুতের অগ্নি, শমনের কঠোরতা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—ভীমের প্রতিশোধ বাঞ্ছা,—রুদ্রের তেজ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজকে নব-জাগরণে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, স্বজাতীয়গণকে নব আশা আকাঙ্ক্ষায় নব-আলোকে মাতিয়ে তুল্‌তে হবে। কথায় কথায় ভগবানের দয়ার দোহাই দিবেন না। সপ্ত শত বৎসরে ৩৩ কোটি দেবতার ত যথেষ্ট দয়ার পরিচয় পাইয়াছেন; প্রেমসিন্ধু—দীনবন্ধু—পতিতপাবন,—অধমতারণের উপাসনা ত্যাগ করিয়া শক্তির উপাসনায় প্রমত্ত হউন। শাস্ত্রের শ্লোক ও সমাজ-পতি পণ্ডিতগণের পাঁতির আশায় আর বসিয়া থাকিবেন না। সর্ব্ব প্রকার অনাচার, অবিচার, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্ষ-স্ফীত করিয়া সকলে দাঁড়ান। কার ভয়ে ভীত? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণস্য যাজন প্রতিগ্রহৌ, ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্, কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য কুসীদ যোনি পোষণানি বৈশ্যস্য, শূদ্রস্য সর্ব্ব শিল্পানি। আপদানন্তরা বৃত্তিঃ। ২য় অঃ ৫।৬

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য পালন, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, গো—পোষণ, সুদ লওয়া ও ধান্যাদি বীজ রক্ষা এবং শূদ্রের সকল প্রকার শিল্প কার্য্য আপৎকালে পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

"যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি, সম্মুখে তাহার,—তখনি সে,
পথ কুক্কুরের মত সত্রাসে সঙ্কোচে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে. কেহ নাহিক সহায় তাহার—
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার!" *

বিলম্ব মাত্র না করিয়া এই সমুদয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। তোমরা কেহই শূদ্র নও। শূদ্রের কোন লক্ষণ তোমাদের মধ্যে নাই, তবে কেন আর শূদ্র হইয়া থাকিবে? এতকাল শাস্ত্র অপ্রকাশ ছিল, একদল ব্যবসায়ীর লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ ছিল—কেহ কিছু জানিতে পারে নাই। এক্ষণে সমুদয় শাস্ত্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে,—পড়িয়া জানা যাইতেছে কে কোন্ জাতি? কে কোন্ বর্ণভুক্ত?

মহাভারত শান্তি পর্ব্বে (১৮৭ অধ্যায়ে) লেখা আছে—"ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের হরিদ্রাবর্ণ ও শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ শরীরের সাধারণ রং"। শূদ্র কাহাকে বলে?

সর্ব্ব ভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্মকরোহশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥২৭

শান্তিপর্ব্ব, ভৃগু—ভরদ্বাজ সংবাদ।

যে ব্যক্তির সকল প্রকার খাদ্যই গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যে সর্ব্ব কর্ম্মই করিয়া থাকে—অর্থাৎ যাহার কাছে কোন কর্ম্মই অকর্ম্ম নহে, অশুচি অশুদ্ধ, বেদত্যাগী, অনাচারী, সেই শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। ম্যাথর, ডোম, মুদ্দাফরাস,

---

* মল্লিখিত "ক্ষত্রিয় সমাজে নব-জাগরণ" হইতে উদ্ধৃত।

শিয়ালমারা শবর ও ব্যাধ জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত এরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট জাতি বাঙ্গলায় নাই। সে কারণ কাহারও শূদ্র বলিয়া আর আত্ম-পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্ব্বর্ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

যদি এই জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ ভারতবর্ষে না থাকে তাহা হইলে মহর্ষি মনুর মতে ইহাকে "আর্য্যাবর্ত্ত" না বলিয়া "ম্লেচ্ছ" দেশ বলিতে হয়। 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ ও (চারি বর্ণের ধর্ম্ম) কোন দেশে না থাকিলে সে দেশকে "ম্লেচ্ছ" দেশই বলিতে হয়। * মনু যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সংহিতাকারগণ একবাক্যে বলিয়াছেন—দেশকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে দেশে চারিবর্ণই চাই। চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম (ব্রাহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ব্যতীত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্মণ সভা ও ভাটপাড়া বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ও আশ্রমের মধ্যে দাসাশ্রম দিয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চালাইতে চাহেন। রঘু নন্দনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে—"বলো হরি হরিবোল" দিয়া মহাযাত্রা করাইয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দুই বর্ণাশ্রম রক্ষক ও প্রতিপালক

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥৪

৮৪ অধ্যায়, বিষ্ণু সংহিতা

"যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে; তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।"

বর্ণদ্বয় এবং চারি আশ্রমকে বহুদিন হইল শ্মশানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন আর মরা কান্না কাঁদিয়া লাভ কি? চারিবর্ণ না থাকিলে চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম বা ব্যবস্থা থাকিতে পারে কিরূপে? আর "চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা" না থাকিলেই বা সেই "ম্লেচ্ছ দেশে" ব্রাহ্মণ সভার পরিচালক ব্রাহ্মণগণ থাকেন কিরূপে? চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা না থাকার দরুণও বটে এবং প্রকৃত পক্ষেও এই দেশ ভারতবর্ষ (ব্রাহ্মণদেরই কথিত) ম্লেচ্ছাধিকৃত। তোমাদেরই না বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে—

ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥১॥

৮৪তম অধ্যায়।

ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবেনা। "ম্লেচ্ছদেশে * * * বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না" (৪—১৪অধ্যায় শঙ্খ সংহিতা অনুবাদ) এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি এই ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে আপনারা পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিরূপে করিতেছেন এবং করাইতেছেন? শাস্ত্রমতে ত এই সব শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ পরন্তু নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলেও ম্লেচ্ছ অধিকৃত দেশে বাস করিতে শাস্ত্রকারের নিষেধ আজ্ঞা। মনু বলিতেছেন—

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক জনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেহন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ।৬১ ৪র্থ অঃ

চতুর্থ অধ্যায়

"শূদ্র বশবর্ত্তী রাজ্যে বাস করিবে না, অধার্ম্মিক বহুল দেশে, বেদ বহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না।"

ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে বাস করা ত দূরের কথা—শূদ্রবশবর্ত্তী দেশে বাস করিতেও মনুর নিষেধ। জিজ্ঞাসা করি গত সাত শত বৎসর ধরিয়া

আপনারা এত শ্রদ্ধা ভক্তির সনাতন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ কিরূপে এই যবন ম্লেচ্ছের দেশে নিশ্চিন্তে বসবাস করিতেছেন এবং শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়া কলাপ করিয়া জাতি ধর্ম্ম বজায় রাখিতেছেন? যে শাস্ত্রবিধি গত ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া নিজেরা পদদলিত করিতেছেন—অথচ অন্যে শাস্ত্রবিধি মানেনা বলিয়া বড় গলায় চীৎকার করিয়া মরা কান্না কাঁদিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। ধন্য আপনাদের মুখোস পরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাণ, ধন্য আপনাদের স্বার্থপরতা ভণ্ডামী ও আভিজাত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা!! আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসা রক্ষক অধুনা প্রেত লোকবাসী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অস্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তথা হিন্দু জাতির যে মহানিষ্ট ও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন—আমরা তাহার প্রতিকার করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। বাঙ্গলা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে যত সত্বর সম্ভব পুনরায় চারিবর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে আমরা যত্নবান হইয়াছি এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে আমাদের এই জাতির অশেষ কল্যাণকর শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবেই হইবে। গত ২৫ বৎসর হইতে তাহার শুভ সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

বৈদিক উপনয়নাদি সংস্কার বর্জ্জিত কোটি কোটি ধর্ম্মান্তরিত বৌদ্ধ-গণকে যেমন করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট পুনরায় গায়ত্রী ও উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে আনয়ন ও হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন * আমরা ও সেইরূপভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

* প্রাচীনকারিকায় আছে—

এক বাপের দুই বেটা, দুই দেশেতে বাস
বুদ্ধ পাইয়া জাত্ খাইয়া করল সর্ব্বনাশ।

আচার ভ্রষ্ট উপনয়নহীন আত্ম-পরিচয় বিস্মৃত শূদ্রবৎ ব্যবহৃত ও শূদ্র কথিত ভাইভগিনীগণকে যথাবিধি ব্রাত্য সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য করিয়া লইতেছি। আজ সাড়া বাঙ্গলায় সর্ব্ব জাতির মধ্যে নবোৎসাহ, নব উদ্দীপনার প্রবলবন্যা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রাত্যের পুনঃ সংস্কার ও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত

মনু ১০ অঃ ২০ শ্লোকে লিখিয়াছেন—দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কারবিহীন হয় তবে ঐ সন্তানদিগকে ব্রাত্য বলে।”

“ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশবর্ষ এবং বৈশ্যের গর্ভ চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হয় না। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎকাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে ইহারা উপনয়ন ভ্রষ্ট হইয়া আর্য্য সমাজে নিন্দিত হয় এবং ইহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায়। বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশধর ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লব প্রভৃতি নানাবিধ কারণে উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া ব্রাত্য বা শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল—শূদ্র হয় নাই। ব্রাত্য শূদ্র নহে—শূদ্রভাবাপন্ন। মনুর টীকাকার কল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন—

পৈতা ছিঁড়িয়া, পৈতা চায়, বৈদিকে দেয় পাঁতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল, বারেন্দ্র আখ্যাতি।

দিগ্‌শূল নিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র ঘটক রাজের সংগৃহীত—“প্রাচীনকারিকা”
(বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস)

* * * * “ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে * * * * অন্ততঃ ৫।৭ পুরুষ নিরুপবীত ছিলেন, কিন্তু পরে উপবীত লইয়া ব্রাত্যত্ব দূর করেন।”

জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থাবলী—২৪ পৃষ্ঠা

পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ
ক্রিয়া লোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ ॥"

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক প্রভৃতি দেশের ক্ষত্রিয়গণ ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়া—উপনয়নাদি সংস্কার—ইহারই অভাবে পৌণ্ড্রগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। টীকাকার ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন "ব্রাত্যা সংস্কার হীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়াঃ ইত্যাদি। বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

প্রাঙ্‌মৌঞ্জী বন্ধনাদ্ দ্বিজঃ শূদ্র সমোভবতি।

উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজগণ শূদ্রতুল্য থাকে।

অন্যত্র—"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারা দ্বিজঃ

উচ্যতে"—জন্মাবস্থায় শূদ্র থাকে, (উপনয়ন) সংস্কারাদি দ্বারা দ্বিজ বলিয়া কথিত হয়।

ব্রাত্যগণ "শূদ্রপ্রায়"—"শূদ্র" নহে। ইহারা দ্বিজোৎপন্ন ও উপনয়নার্হ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমদতে ক্রতোঃ।

অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনয়ন না হইলে দ্বিজাতি সর্ব্বত্রই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে পর্য্যন্ত ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্ত না করে, সে পর্য্যন্ত দ্বিজোচিত কার্য্যে অনধিকারী হয়।

ব্যাস সংহিতা বলিতেছে—

বেদব্রত চ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যস্তোম মর্হতি।

অর্থাৎ বেদ পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার হীনেরা ব্রাত্য বলিয়া কথিত হয়—তাহারা ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় বেদপাঠ ও উপনয়নের অধিকারী হইবে।

সংহিতাকার বশিষ্ট বলিয়াছেন—

* * * "পতিত সাবিত্রীক উদ্দালক ব্রতং চরেৎ"।* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের-গর্ভ ষোড়শ, গর্ভ-দ্বাবিংশতি ও গর্ভ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে—ইহার পর অনুপনীত থাকিলে তাহাকে পতিত-সাবিত্রীক বলা যায়। পতিত-সাবিত্রীকগণ যে পর্য্যন্ত উদ্দালক ব্রত * না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না এবং তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না।

অতঃপর বহুপুরুষ অনুপনীত ও সংস্কার বিহীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াদির পুনরায় সংস্কার বিষয়ে শাস্ত্র মত্ অনুসন্ধান করা যাউক।

পরশুরামের নির্ম্মম কুঠারে ধ্বংস প্রাপ্ত কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের অধস্তন বংশধরগণ ছদ্মবেশে ভিন্ন নাম, জাতি ও কর্ম্মাবলম্বী হইয়া রহিয়াছিল—মহাভারতে তাহাদিগের পুনরায় সংস্কারের বিবরণ অবগত হওয়া যায়; যথা—

"পৃথিবী কাশ্যপকে কহিলেন,—'হে ব্রহ্মণ, আমাতে গুপ্তভাবে এ সকল ক্ষত্রিয় সন্তানেরা অন্যান্য নাম, জাতি ও কর্ম্মাবলম্বী হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশজ; তাঁহাদিগকে আনয়ন

* গায়ত্রী পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতাঃ।
অশক্তে চৈব যজ্ঞস্য চরেদোদ্দালকং ব্রতম্॥

ইতি মৎস্যসূক্তে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ৩৮ পটলঃ

দুইমাস যব, এক মাস দুগ্ধ, এক পক্ষ দধি, এক সপ্তাহ ঘৃত, ছয় দিবস অপ্রার্থিত ভাবে যাহা পাওয়া যায় তদ্দ্বারা এবং তিন দিবস জলপান দ্বারা অতিবাহিত করিবে। পরে একদিন রাত অনাহারে থাকিলে সংস্কৃত হইবে। ইহাই উদ্দালক ব্রত বলিয়া কথিত।

করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ইহাঁদের মধ্যে বিদূরথ ক্ষত্রিয়ের সন্তানেরা-ও আছেন,—যাঁহাদিগকে ভল্লুকেরা প্রতিপালন করিয়া ঋক্ষবৎ পর্ব্বতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। কোন কোন বালককে পরাশর মুনি রক্ষা করিয়াছিলেন, উহারা সৌদাস রাজন্য—বংশজ। ইহারা অপকৃষ্ট বলিয়া শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম কুশল সেই ক্ষত্রিয় ভূপতি সন্তানেরা আমায় পালন করুন।" মহর্ষি কাশ্যপ পৃথিবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়—সংস্কার প্রদানে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। (অনুবাদ শান্তিপর্ব্ব —১১ শ অধ্যায় ৭৫—৭৮) মহাভারতের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানগণ উপযুক্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

বহুপুরুষ সংস্কার বিহীন অনুপনীত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াদিগণের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়নাদি বিহিত হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে শাস্ত্র মতের আলোচনা করা যাইতেছে। 'মিতাক্ষরা' নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিতে আপস্তম্বের মতানুসরণে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন— * "যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, তাহার সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন করিতে হইবে। আর যাহার প্রপিতামাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না, তাহার দ্বাদশ বার্ষিক 'ত্রৈবিদ্যক' † ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।

আপস্তম্বের মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে—* * * * প্রতি পুরুষ সংখ্যায়া সংবৎসরান্ যাবন্তঃ অনুপেতা স্যুঃ। অথ যস্য প্রপিতামহাদেঃ

* যস্য পিতৃ পিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদেঃ ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং-ব্রহ্মচর্য্যং।

† অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং শুশ্রূষা এই তিনটী বিষয় ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে খ্যাত।

নানুস্মর্য্যাতে উপনয়নং * * * তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথ উপনয়নং ততঃ উদকোপস্পর্শনং পাব মন্যাদিভিঃ। তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ।

(আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১ম খণ্ড ১ পরি। ২৪—৩২ সূত্র ২।১, ৫—৬ সূত্র) অর্থাৎ

* * * * "যদি পিতা ও পিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তীরও উপনয়ন না হইয়া থাকে তবে যত পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হয় নাই, তাহা গণনা করিয়া তত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিতে হইবে। যাহার প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না * * * * তাহারা (অর্থাৎ সেই বালক ও তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা জীবিত আছে) ইচ্ছা করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ত্রিবেদ-বিহিত ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করণান্তর উপনয়ন লাভ করিবে, এবং তৎপরে পূর্ব্ববৎ অবগাহন স্নানাদি করিবে। তারপর প্রকৃতিবৎ অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন যাহাদের হইবে, তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির যে স্বাভাবিক ভাব তাহাই প্রাপ্ত হইবে।"

বাচস্পত্যাভিধানেও এইরূপ আপস্তম্ভোক্তি সমর্থিত হইয়াছে। যথা —"বহুকাল পতিত সাবিত্রীকস্য অপি প্রাগুপ্ত আপস্তম্ভবচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্ত আচরণে চ উপনয়নাদি অধিকারিতা ভবিতুম্ ইতি এব।" অর্থাৎ বহুকাল যাবৎ পতিত-সাবিত্রীক জনেরও আপস্তম্ভ বচন মতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায় সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন ও বেদাধিকার করিতে পারে।

ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই যুগকে কলিযুগ বলেন। এ যুগে নাকি ১৬ আনার ১২ আনাই পাপ পূর্ণ—৪ আনা মাত্র ধর্ম্ম। কলির জীব দুর্ব্বল

পাপাসক্ত ও শক্তিহীন। এই যুগে তপস্যা ব্রত যাগযজ্ঞ—কঠোর ধর্ম্ম সাধন অসাধ্য। সে কারণ কলিযুগের জন্য পরাশর ঋষি স্বতন্ত্র সংহিতা ও বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিয়াছেন। কোন কঠোর সাধনাই—এ যুগে সম্ভব পর নহে। সেই জন্য সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপন আপন সন্তানদের দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে অরণ্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের পরিবর্ত্তে মাত্র ১০ দিন স্বায় স্বীয় গৃহে চন্দ্র সূর্য্য ও শূদ্রাদির মুখ না দেখিয়া আবদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ত্রিবর্ণের গুরু সমাজপতি ব্রাহ্মণের জন্যই যখন এই পাপপূর্ণ কলিযুগে ১২ বৎসরের স্থলে মাত্র ১০ দিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জন্য নিশ্চয়ই ইহাপেক্ষা সহজ কোন বিধি ব্যবস্থেয়। এই জন্য শাস্ত্রকারগণও কলি-যুগোচিত সহজ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরে ব চ।
কৃচ্ছ্রাদিনাস্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে। ত্রেতাতে ব্রতের পরিবর্ত্তে ধেনু-দান করিতে হইবে, আর দ্বাপর ও কলি-যুগে ধেনু মূল্যদান করিয়া সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ধেনু মূল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান এই যে,—আঢ্য মধ্য দরিদ্র বিভাগ ক্রমে ধেনুর সম সংখ্যক রৌপ্যমান, তাম্রমান ও কপর্দ্দকমান মূল্য দিতে হইবে। ব্রাত্যতারূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তার্থে ৩৬০ ধেনু মূল্যদান বিহিত।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সম্বতে প্রকাশিত "ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা" গ্রন্থে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত যো নহি কর্ সক্‌তে হৈঁ, উনহেঁ উস্‌কা প্রত্যাম্নায় ৩৬০ গো প্রদান কর্‌না হোগা, গোকা নিষ্ক্রিয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দকমান ভেদ তিন প্রকারকা হোগা, যিস্‌কী যৈসী শক্তি হৈ

উস্‌কে অনুসারে কর্‌না হোগা, ধনী বীর, দরিদ্র, অতি দরিদ্র ভেদ্‌সে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ কর্‌না হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রাহ্মচর্য্য মহাব্রত পালনে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০ গো-দান করিতে হইবে!

ধনী, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে—অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গো'র মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গঙ্গামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—*

"যেখানে গঙ্গা আছেন, সেখানে গঙ্গাস্নানেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যেখানে গঙ্গা নাই কেবল সেখানেই বিধানানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিতে হইবে। দুরাধর্ষ ব্রহ্মবধাদি পাপ গঙ্গাস্নানে কিরূপে যাইবে এরূপ চিন্তা যে করিবে বা এরূপ কথা মুখেও আনিবে তাহার কোটি ব্রহ্মবধের অধিক পাপ হইবে। "স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও 'গঙ্গা মাহাত্ম্যের' বচন ধরিয়াছেন। আর্য্য হিন্দুকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে এমন কোন পাপ নাই গঙ্গাস্নানে যাহার শুদ্ধি না হইবে। সুতরাং ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যদি কাহারও কোনও সংশয় উপস্থিত হয় বা কেহ প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন, তিনি গঙ্গাস্নান দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া উপনয়নাদি গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুকল্প ধেনুদানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বহু ব্যয় সাধ্য; গৃহস্থের পক্ষে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করা দুঃসাধ্য। গঙ্গাস্নান রূপ

* প্রায়শ্চিত্তং তত্র ভবেৎ যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে।
পাপং ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি।

প্রায়শ্চিত্তাচরণ প্রায় সকলের পক্ষে সম্ভব। গঙ্গাস্নান সর্ব্ববিধ প্রায়শ্চিত্তের ঊর্দ্ধে, অন্য কোনও ব্রত পুণ্যের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে না; দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত উদ্যাপন গঙ্গাস্নানের সমকক্ষ নহে।

ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ গো-বধ ও গোমাংস ভক্ষণাদি মহাপাপের জন্য সাধারণতঃ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

আমরা বলি বৈষ্ণব স্মৃতি 'হরি ভক্তিবিলাস' মতে হরিনাম সংকীর্ত্তনের অগ্রে অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত দাঁড়াইতে পারে না।

আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান॥
কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥

চৈতন্যমঙ্গল।

বৈষ্ণবগণ লিখিয়াছেন—

সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে হরির নামে।
সেই প্রভু নাচে গায়, দেখে ভাগ্যবানে॥
কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডি, দণ্ডে তার যম॥"

কলিপাবকাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম যায়॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
চৌষট্টি অঙ্গের শ্রেষ্ঠ নব বিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম লৈলে মিলে প্রেমধন॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"দেবহূতি কপিলদেবকে বলিতেছেন—হে ভগবন্! যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, তিনি চণ্ডাল হইলেও অতিশয় পূজ্য; কারণ যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি তদ্দ্বারাই তপস্যা করেন, হোম করেন, সমস্ত তীর্থে স্নান করেন এবং সদাচার সম্পন্ন হইয়া বেদাঙ্গ সহিত সমগ্রে বেদ অধ্যয়ন করেন।" * এ জন্য বলি উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বে সর্ব্ববিধি ব্রাত্য-পাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তার্থে মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে শত শত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া লইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ

যুগযুগান্তের পর নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সকলেই বুঝিয়াছে—সমাজের অন্যায় অত্যাচার অবিচার ও পীড়ন নীরবে সহ্য করিলে কখনও অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। হৃদয়হীন—মায়ামমতাশূন্য পাষাণ-প্রাণ সমাজপতিগণের পা চাটিয়া সেবা করিয়া অনুগত ভৃত্য হইয়া চলিলে এই সামাজিক দাসত্ব কখনও ঘুচিবে না। এর জন্য রীতিমত সংগ্রাম করা চাই—সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালান চাই। সেবার বিনিময় যখন ঘৃণা ও অবমাননা, পদাঘাত ও লাঞ্ছনা—তখন সেবা করিয়া কি লাভ? মৎস্য-ব্যবসায়ীগণ উচ্চজাতিগণকে

* অহোবত! শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। ইত্যাদি

মাছ খাওয়ায় বলিয়া পতিত, পাটনীগণ পারাপার করে বলিয়া পতিত, নমঃশূদ্র কপালী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি কৃষিকার্য্যদ্বারা উচ্চ জাতির আহারের সংস্থান করে বলিয়া পতিত, সূত্রধর খাট-পালঙ্ক চৌকা কবাট চেয়ার টেবিল ঘর দুয়ার তৈয়ারী করে বলিয়া পতিত, ঢুলি বাদ্যকর, ঢাকঢোল বাজায় বলিয়া পতিত, যোগীগণ বস্ত্র নির্ম্মাণ দ্বারা মা ভগিনা-গণের লজ্জা নিবারণ করে এবং সভাসুন্দরগণ বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া উচ্চ জাতিগণকে বাবু সাজায় বলিয়া পতিত, বেহারাগণ ডুলি পালকী বহন করে বলিয়া তাহারা অধমজাতি, চূর্ণকর আমাদের পানে চুন যোগায় বলিয়া পতিত। এইরূপে মুচি পাদুকা নির্ম্মাণের অপরাধে, হাড়ি ডোম—ম্যাথর মুদ্দাফরাস আমাদেরই বাড়ীঘর পরিস্কার করে, মা ভগিনীগণের কার্য্য করে বলিয়া পতিত, ঘৃণিত! কি অবিচার কি আস্পর্দ্ধা! যাহারা সমাজের সেবা করে উপকার করে, যাহাদের না হইলে সমাজের একদণ্ড চলে না—তাহাদিগকেই কিনা সমাজ কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘৃণায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, কাছে আসিতে বসিতে দেয় না, সর্ব্বদা ছুবি ছুবি—সর্ সর্ করে। কিন্তু হায়—ইহাতেও এই সব নর-পশুগণের লজ্জা নাই, ঘৃণা-বোধ নাই আত্মগ্লানি নাই পা চাটায় অরুচি নাই। শত পদাঘাত জুতা প্রহারেও এই সব নররূপী পশুদের অন্তরস্থ নারায়ণ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে না—অন্তর দেবতা সাড়া দিতেছে না। ইহারাই যে সমাজের যথার্থ মেরুদণ্ড, সর্ব্বস্ব, বলবীর্য্য, শক্তি সে বোধ ইহাদের নাই।

কুকুর বিড়াল যেমন পাতের পরিত্যক্ত এঁটো কাঁটা এক মুষ্টি অন্নেই তৃপ্ত ও কৃতার্থ, শত ঝাঁটা কিল গদপ্রহারেও যেমন কুকুর বিড়াল বাড়ী ছাড়ে না—এই সব নর-কুকুররাও তদ্রূপ শত পদাঘাত মাথা পাতিয়া বহন করে ও বংশ-পরম্পরা-ক্রমে একমুষ্টি অন্নের বিনিময়ে দাসত্ব করিয়া জীবনজন্ম শেষ করিয়া দেয়। বারণ করিলে বারণ শোনে

না,—পা চাটিতে মানা করিলে পা চাটা ত্যাগ করে না। বরং বিরক্ত হয়, অসন্তুষ্ট হয় রাগ করে, চৈতন্যদানকারীর বিরুদ্ধে দল পাকাইতে চেষ্টা করে। এই ভারতে হাজার করা ২ জন মাত্র সরকারের গোলাম, আর শতকরা ১॥ জনমাত্র দেশী লোকের গোলাম। এই গড়ে শতকরা ২ জনেরও কম গোলাম অধমগণকে কি সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জননী জন্মভূমি অন্নদানে কুণ্ঠিত? বঙ্গদেশে ১০ কোটি বিঘা জমি, তন্মধ্যে ৬ কোটি আবাদ হয়, বাঁকি ৪ কোটি কৃষক অভাবে আবাদ হয় না। ভারতের অস্পৃশ্য হতভাগা দাসগণ ঘৃণিত দাসত্বত্যাগ করিয়া যদি পবিত্রতম কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয় তবে আর এমন করিয়া ঘৃণা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি এই সব হতভাগাদের লাথিজুতা খাইতে খাইতে এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিদের লাথি জুতা না খাইলে ইহাদের রাত্রে ঘুমই হয় না। চাক্‌রাণ প্রাপ্ত হতভাগ্য গোলামদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দিন নাই রাত্রি নাই ঝড় নাই বৃষ্টি নাই, আহার নাই বিশ্রাম নাই আরাম নাই বিরাম নাই যেই মুহূর্ত্তে জমিদার প্রভু তু বলিয়া ডাক দিলেন—পাইক পেয়াদা পাঠাইলেন অমনি গোলামগণ কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। হায়, চাক্‌রাণের গোলামগণ, তোমাদের জননীদেবী কি তোমাদিগকে এরূপ ভাবে মান মর্য্যাদা ভুলিয়া গোলামী করিবার জন্যই বক্ষসুধা-পান করাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য এই দণ্ডে এই সব চাকরাণের গোলামগণকে কাজ ছাড়াইয়া আনিয়া জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করা। যাহারা বলে চাক্‌রাণ ছাড়িলে আমরা খাব কি? তাহাদিগকে বল, 'উনুনের ছাই খাও,—গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মর'। ওরে ভাই জীবনযাত্রার জন্য কত না কর্ম্ম পড়িয়া আছে। লক্ষ লক্ষ লোক এখন ও কত কৃষিকার্য্য দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁতের কার্য্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম। কেন

ভাই মান-ইজ্জৎ হারাইয়া আপন আপন জাতির মর্য্যাদা গৌরব অতল সলিলে ডুবাইয়া দিয়া, চাকরাণের গোলাম হইয়া অধম জীবন যাপন করিতেছ? তোমরা কি মানুষ নও; তোমাদের কি মানসম্মান নাই? তোমাদের কার্য্যের জন্য ঐ দেখ তোমাদের সমাজের ও সমাজপতি-গণের মাথা কতদূর হেট হইয়া আছে। জমিদারগণ তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সমাজপতিগণের সঙ্গে কিরূপ হেয় ব্যবহার করিতেছে। তোমা-দের কি চৈতন্য হইবে না? তোমরা যদি কুকুর বেড়ালের মত পাই চাট—সামাজিক উচ্চ অধিকার কোনকালে লাভ করিতে পারিবে না। ভাইসকল! কি শোচনীয় অপমানের মধ্যে তোমরা বাঁচিয়া আছ। একই পরম পিতা শ্রীভগবানের সন্তান—কেহ স্পৃশ্য, কেহ অস্পৃশ্য—কেহ উত্তম কেহ অধম, কেহ জল আচরণীয় কেহ অনাচরণীয় এ কি ভাই ভগবৎ বিধান, ইহাই কি মুনিঋষির শাস্ত্র? না, না, ইহা ভগবানের বিধান নয়, শাস্ত্রের বিধান নয়; ইহা সয়তানের বিধান, হীন দেশাচার স্ত্রী-আচার লোকাচার মাত্র, ইহা অত্যাচার অবিচার ব্যভিচার মাত্র। পদাঘাতে এই সব লোকাচার দেশাচার স্ত্রী-আচার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। উচ্চজাতিগণের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া—দরখাস্ত পেশ করিয়া এক কণা অধিকারও লাভ করিতে পারিবে না। অধিকার শক্তিদ্বারা সাধনাদ্বারা সংগ্রাম দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহার অস্ত্র লাঠি কিম্বা বন্দুক নহে, ইহার অস্ত্র বয়কট বা বর্জ্জন। যাহারা তোমাদিগকে এক আসনে বসিতে দেয় না, কুয়া ছুইতে দেয় না, যাহাদের দেবমন্দিরে—পাকের ঘরে প্রবেশ করিলে দেবতা পর্য্যন্ত অশুদ্ধ ও ভাত ডাল লুচি পায়স—জলের সহিত জলের মেটে কলসি পর্য্যন্ত অপবিত্র অশুদ্ধ ও অব্যবহার্য্য হয়, যাহারা তোমাদের পুরোহিতকে পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, তোমাদের শালগ্রামেরও জাত্ মারিয়াছে,—তাঁকে প্রণাম করিলে ও তাঁহার চরণামৃত খাইলেও যাহাদের জাত্ যায়—

সেই সব পাপিষ্ঠ নরাধম—জাতির শত্রু, সমাজবৈরী, নর-বিদ্বেষী, স্বধর্ম্মদ্রোহী সয়তান ও সয়তানের দূতগণকে এই মুহূর্ত্তে বর্জ্জন কর, তাহাদের বাড়ী যাওয়া কাজকর্ম্ম করা তাহাদের দাসত্ব করা—চাকরী করা—তাহাদের ভাত খাওয়া—হাতের জল খাওয়া—তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়া প্রসাদ খাওয়া এই দণ্ডে বন্ধ কর। আমরা আচার্য্য ব্রাহ্মণ হইতে সাহা সুবর্ণবণিক কপালি, অনাচরণীয় মাহিষ্য, সূত্রধর নমঃশূদ্র, মালী, পাটনী ধীবর তিয়র, মাল, রাজবংশী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, শঙ্করদাস, হদি, সভাসুন্দর, বেহারা বাগ্যকর হাড়ি ডোম মুচি ম্যাথর সকলকেই একযোগে এক সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে এই সব জাতিকুল-মদান্ধ দাম্ভিক কপটাচারী ভণ্ডগণকে বন্ধ করিতে—বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করি। শত শত যুগ গিয়াছে, তোমরা একে অন্য হইতে দূরে সরিয়া পৃথক আছ বলিয়া, নিজকে অন্যাপেক্ষা পোয়া ডিগ্রি, আধ ডিগ্রি ১ ডিগ্রি ১। ডিগ্রির কুলিন মনে করিয়া পৃথক আছ বলিয়া এই সব সামাজিক পীড়ন ও অপমান পদাঘাত ও জুতা-প্রহার অবলীলা ক্রমে নির্ব্বাধায় চলিতেছে। বর্ণ-ব্রাহ্মণগণকে বলি আপনারা অগৌণে সকলে মিলিয়া আপনাদের যজমানগণকে লইয়া এই সামাজিক অধিকার-লাভ-সংগ্রামে ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হউন। ব্যাস বশিষ্ঠ শাতাতপ গৌতম যাজ্ঞবল্ক্য শাণ্ডিল্যের বংশধরগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই সব অস্পৃশ্য পতিত ভাইদের তুলিতে ও ভিন্ন ধর্ম্মগ্রহণের পথে বাধা দিতে গিয়া আজ আপনাদেরও এই শোচনীয় অধঃপতন, আজ আপনারাও শেয়াল কুকুরের অধম অস্পৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শেয়াল কুকুরেরও যে অধিকার আছে, বিড়াল-বেজির ও কাক-কবুতরের ও যে অধিকার আছে—আপনাদের তাহাও নাই। পশুপক্ষিগণ ঠাকুরঘরে ও ভোগ ঘরে গেলে, লুচিপুড়ি পায়স মিষ্টান্নে মুখ দিলে—বারান্দায় উঠিলে—ঠাকুর দেবতা, পায়স মিষ্টান্ন, লুচিপুড়ি, জল ও জলের মেটে হাড়ি

অপবিত্র ও অশুদ্ধ হয় না কিন্তু হে বর্ণ-ব্রাহ্মণ মহাপ্রাণ, হিন্দু-সমাজের মহাকল্যাণকারী ভাই সকল আপনারা ঘরে বা বারান্দায় উঠিলে—খাদ্যদ্রব্য জল, জলের হাড়ি ঠাকুরদেবতা সব অপবিত্র ও অখাদ্য হইয়া থাকে। মুচি ম্যাথর ডোম মুদ্দাফরাস অপেক্ষা একরতি মর্য্যাদাও আপনাদিগকে অধিক দেওয়া হয় নাই। মুচি ম্যাথর ঘরে গেলেও ঘরের ও ঘরের খাদ্য দ্রব্যাদির যে দশা আপনারা ঘরে গেলেও সেই একই দশা। তবে আর বৃথা দেমাক করিয়া জাঁক করিয়া কুলিন বলিয়া উহাদের অপেক্ষা দূরে সরিয়া আছেন কেন? ৪½ শত বৎসর গেল, পৃথক থাকিয়া—একাকী উদ্ধার হইতে পারেন নাই। এইবার ভারতে নব-জন্ম আসিয়াছে। সমস্ত বর্ণ ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় ভাইদের সহিত মিলিয়া—পরস্পর জল পান করিয়া—শক্তি-সঞ্চয়-পূর্ব্বক একযোগে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। সংখ্যায় যে আপনারই ১২ আনা, বাকি ৪ আনা মাত্র—উচ্চ শ্রেণীর জল আচরণীয় জাতি। সকলেই আপনাদিগকে বৃথা বড় ও কুলিন মনে না করিয়া—সকলের জল সকলে পান করিয়া—প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে বিভিন্ন ফুলের সূত্রগ্রথিত মালার ন্যায় একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হউন। পৃথক থাকিয়া জলচল ও জলাচরণীয়গণের সমান হইতে পারেন নাই, ৪½ শত বৎসরে সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এইবার—সব অনাচরণীগণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া চেষ্টা করুন। ফল হাতে হাতে পাইবেন। আপনাদের আপন আপন যজমানগণকে ডাকিয়া বলুন—তাহারা যেন আপনাদের এবং তাহাদের ঘৃণাকারী জলাচরণীয়গণের ত্রিসীমানা না মারায়—তাহাদের বাড়ী না যায়—নিমন্ত্রণ না খায়, ভাত জল না খায়। আপনাদের লজ্জা ও ধিকার হয় না যে, পূজা অর্চ্চনাকারী উপবীতধারী সাবিত্রীদীক্ষিত বেদ বেদান্তপাঠী আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকেও—যাহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ এই হীন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া নিত্য শেয়াল কুকুরের অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিয়া আসিতেছে—তাহাদের

বাড়ীতে গিয়া আপনাদের যজমানগণ দাসত্ব করে, ভাত খায়—জল খায়—পাতের প্রসাদ চাটে—পাত ফেলে। আপনাদের দ্বারা যাজনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার দরুন এবং আপনাদের জল অন্ন আহারে যদি অনাচরণীয় যজমানগণ আচরণীয় জাতিদের নিকট হেয় ঘৃণিত হয়—অনাচরণীয়দের ও তাহাদের পুরোহিত বলিয়া আপনাদের জল পানে যদি আচরণীয়দের জাত্ যায়, অপমান হয় তবে তাহাদের (জল আচরণীদের) অন্ন জল পানে আপনাদের এবং আপনাদের যজমানগণের জাত্ যায় না কেন—অপমান হয় না কেন ? হায় অধম, নির্লজ্জগণ এম্নি করিয়াই নিজেদের অপমান অমর্য্যাদা—নিজেরা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছ,—এই জাতিগত অপমান শত শত বৎসর হইতে নীরবে মূক পশুর মত সহিয়া যাইতেছ ? অপমান ও জুতা চলিবে না কেন ? সাহা, সুবর্ণবণিক মাহিষ্য (অনাচরণীয়) মাল, সূত্রধর, কাপালী প্রভৃতি ভাইদের বলি—কতকাল আর এইভাবে জাতীয় অপমান—অমর্য্যাদা চক্ষে দেখিবে। হুঙ্কার দিয়া—সকলকে ডাকিয়া বল—কোন আচরণীয়ের জল কোন আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-বিশিষ্ট অনাচরণীয় ভ্রাতা যেন কখন পান না করে,—তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া কুকুর-জীবন সার্থক না করে,—ভাত খাওয়ার কথা ত উঠিতেই পারে না। আচরণীয় বাড়ীতে মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত বন্ধ হউক। অনাচরণীয়ের জল যে না খাইবে তাহার রান্না অন্ন—ডাল তরকারী, তাহাদের আনিত জল, তাহাদের তৈয়ারী দধি খাওয়া হইবে না। হে আচার্য্য, সাহা, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতীয় সমাজপতিগণ, যুবক ভাইগণ, তোমাদের কি একটুকুও মনুষ্যত্ব বোধ নাই ? আত্ম-সম্মান জাতীয়-গৌরব বোধ নাই ? যাহাদের কাছে তোমরা মানুষের মত ব্যবহার ত দূরের কথা শেয়াল কুকুর বেড়াল বেজির মত ব্যবহার ও পাওনা, যাহাদের বাড়ীতে ও গৃহে পশুর অধম ব্যবহার পাও, তোমাদের স্পর্শে যাহাদের ফরাসের হুকার জল—৪০ হাত নিম্নের কূপের

জল অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য হয়, সেই সব পাপিষ্ঠগণের হাতের জল কূপের জল,—ভাত ডাল মহোৎসবের অন্ন খাইতে তোমাদের বুকে বাধে না—শেল সম অপমানের বোঝা বুকে ঠেকে না। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? প্রমাণ হইতেছে না কি—যে তাহারা শ্রেষ্ঠ তোমরা নিকৃষ্ট, তাহারা উচ্চ, তোমরা নীচ—তাহারাই মানুষ, তোমরা পশুর অধম। হায়, দোষ দিব কাহার; তোমরা নিজেরাই এই ঘৃণা, এই অপমান এই সামাজিক অবিচার অন্যায় অত্যাচার এই জাতীয়-অমর্য্যাদা স্বেচ্ছায় আদরে বরণ করিয়া লইতেছ,—এই পদাঘাত নিরাপত্তিতে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছ? বঙ্গের যে এমন বিখ্যাত বৈশ্য সাধু সাহা জাতি—আজ তাহারা শুঁড়ি বলিয়া সমাজপতি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া কত অপমানে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। তাহাতে তাহাদের লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই—রোষ নাই—ঘৃণা নাই। "তু" বলিয়া নিমন্ত্রণে ডাক দিলেই দৌড়িয়া যায়—প্রসাদ চাটিতে। কত অপমান, কত জাতীয় অমর্য্যাদা যে এই নিমন্ত্রণের প্রসাদ খাওয়া, জল পানের সঙ্গে আছে তাহা তাহারা বোঝেনা,—বুঝাইলেও বারণ শোনে না। সমাজপতিগণ অন্ধ, গতানুগতিক কুসংস্কারের দাস—ঘৃণা ও অপমানকারী ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিগণের বিনা মাহিনার গোলাম, ভৃত্য। শিক্ষিত যুবকগণও ভীরু—ক্লীব কাপুরুষ। তাহাদের মধ্যেও এই জাতীয় অপমান দূর করিতে প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই। কাকে বলিব'—কে শুনিবে—কে আছে মানুষ? অনাচরণীয় নর-পশুদের মধ্যে একজনকেও সর্ব্বাস্বান্ত হইতে—একটি যুবককেও সন্ন্যাসী হইয়া এই অত্যাচারের প্রতীকার করিতে দণ্ডায়মান দেখিতেছি না। সকলেই সমাজপতি নিষ্ঠুর মানবরূপী দানবগণের পাদপদ্ম তলে মনুষ্যত্ব—নরত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নাকে গলায় দড়ি বাঁধা পশুর মত হীন, বিনা মাহিনার দাসত্ব জীবন যাপন করিতেছে। কেহই দাস করিয়া রাখে নাই অথচ নীজেরাই স্বেচ্ছায় দাস হইয়া আছে।

মালী, পাটনী, বাস্তকর, বেহারা, ধাত্রী, নমঃশূদ্র, পোদ, ডুলে, হাড়ি, কোড়ঙ্গা প্রভৃতি ধোপা নাপিত বেহারা বঞ্চিত ভাইদের বলি তোমরা সকলে একযোগে দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে নাপিত ধোপা বেহারাগণকে বর্জ্জন কর, তাহাদের বাটীতে যাইবে না—তাহাদের কোন কাজ করিবে না। এবং শুধু তাহাদিগকে নহে—তাহাদের গুরু পুরুহিতগণকে এবং তাহারা যাহাদের বাটী গিয়া, যাহাদের কাজ কর্ম্ম করে তাহাদিগের সংশ্রব পর্য্যন্ত বর্জ্জন কর। দেখি নাপিত ধোপা বেহারা পাওয়া যায় কি না। এই বর্জ্জন-রূপ পাশুপাত অস্ত্রের প্রভাব অব্যর্থ। বহু স্থানে ফল ধরিয়াছে ও ধরিতেছে। নাপিত ধোপা বেহারা বঞ্চিত জাতিগণের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি এবং সমাজপতিগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে তাঁহারা অগৌণে তাঁহাদের যজমানগণকে এবং স্বজাতীয়গণকে এই বর্জ্জন-অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সর্ব্বত্র বঙ্গের সমুদয় জেলায়—আদেশ প্রদান করুন। যাহারা এই আদেশ না শুনিবে তাহাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করুন। এই কঠোর কর্ম্মে ব্রতী না হইতে পারিলে আত্মঘাতী পাপিষ্ঠ সমাজের নিকট হইতে মানবোচিত কোন স্বাভাবিক অধিকার লাভ করা যাইবে না। বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র-ভূমি দানেও সম্মত হন নাই, বিনা যুদ্ধে রাবণ রাজা রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দেন নাই। ইহার জন্য দুই পক্ষে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সেনাপতি পুত্র পৌত্র হত হইয়াছে। তবে যুদ্ধে জয়, রাজ্য-লাভ, সীতা উদ্ধার হইয়াছে। পা চাটিয়া গাল গল্প করিয়া তাস পাশা খেলিয়া, আহার পান বংশবৃদ্ধি করিয়া যে পশুর অধম জীবন যাপন করিতে চায়—সে তাহাই করুক। সমাজে যাহারা আছ, মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ—মানুষের মত থাকিতে চাও—এস্ তাহারা, আমরা তাহাদিগকেই চাই। ভীরু—ক্লীব সংস্কারান্ধ—পা চাটা স্বভাব, অধমগণকে আমাদিগের কিছুই বলিবার নাই। যাহারা মানুষ, এস তাহারা, তাহাদিগকে আমরা চাই। তাহারা

সংখ্যায় নগণ্য ও মুষ্টিমেয় হইলেও নিরাশার কোন কারণ নাই। সেই অগ্নিমন্ত্র-দীক্ষিত, সুর-বীর্য্য-শালী, অঘটন ঘটনকারী, অমিত বিক্রম—মুষ্টিমেয় সৈন্যই যুদ্ধজয়ে সমর্থ। পা চাটা স্বভাব, বিনা বেতনের গোলাম, বাপ পিতামহ মামা কাকা—জেঠা পিসার দল বেশীদিন দূরে সরিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহাদিগকেও এই তরুণদলে সত্বরই আসিতে হইবে। কে আছ, জাতির গৌরব ও মর্য্যাদা স্থাপনে দৃঢ় সঙ্কল্প, অঘটন ঘটাইতে সমর্থ, যুগযুগান্তরের সামাজিক অপমান ও নির্য্যাতনের করাল কবল হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাই ভগিনী মাতা পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে প্রাণপণকারী অমিত-শক্তি-সম্পন্ন তরুণ যুবক, এস, অনাচরণীয় ভ্রাতৃগণকে "বঙ্গীয় জন-সঙ্ঘে' মিলিত কর একত্র কর—সঙ্ঘবদ্ধ কর। এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে এই বিজয়-বার্ত্তা আশারবাণী—ব্রহ্মাণ্ডপতির বংশীধ্বনী সকলকে শুনাও—সকলের প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার কর, সকলের হৃদয়ে নব্যভারত সংগঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোল।

ওরে ভাই, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে উভয়েই তুল্য পাপী, তুল্য অপরাধী। অন্যায় নীরবে সহ্য না করিলে কেহই অন্যায় চালাইতে পারে না। তোমরা নীরবে নির্ব্বাধায় শত শত বৎসর ধরিয়া সামাজিক এই সমুদয় অন্যায়—অবিচার অত্যাচার সহিয়া আসিতেছ বলিয়াই এই সব অন্যায় অনায়াসে চলিতে পারিতেছে। এই অস্পৃশ্যতার অন্যায় অশাস্ত্রীয় বিধি যদি তোমরা সকলে মিলিয়া না মানিতে প্রস্তুত হও, অগ্রাহ্য করিয়া চল এক মুহূর্ত্তও এই পাপ-প্রথা ভারত বক্ষে টিকিয়া থাকিতে পারে না। তোমরা যে সব নিত্যানন্দ ও যিশুখৃষ্টের দল হইয়া দাঁড়াইয়াছ। কিন্তু শোন অক্ষম ভীরু নির্লজ্জ নরপশুগণ, বীর ব্যতীত কাপুরুষ কখনও ক্ষমা করিতে পারে না। "* * শাস্ত্র বলেছেন, তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে

দাও, তুমি পাপ করবে।" * * বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে—ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার "মোক্ষ" !! *)

বঙ্গের এই জাতীয় জীবনের জাগরণের দিনে সকলেই আপন আপন জাতির ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সামাজিক অসম্মান ও অবজ্ঞা সকলের প্রাণে দারুণভাবে আঘাত দিতেছে। এতকাল জাতি-তত্ত্ব জানিবার কোনই সুযোগ ছিল না। শাস্ত্রগ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের ঘরে রুদ্ধ ছিল। শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ অব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যাহা কিছু দয়া করিয়া বলিয়াছেন, জানিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল; মাথা কুটিয়াও এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানিবার উপায় ছিল না। কিন্তু সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!! যাহা কল্পনার অতীত স্বপ্নের অগোচর ছিল—তাহাই আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়া বঙ্গবাসী হিন্দু-সন্তান মাত্রেরই ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে। সকলেই শাস্ত্র-গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের রীতি-নীতি বিচার-ব্যবস্থা অবগত হইতে পারিতেছে। মুদ্রিত শাস্ত্র গ্রন্থগুলি দলিত সম্প্রদায়গুলির কাণে ও প্রাণে আশার সংবাদ আনিয়া দিয়াছে। তাহারাও বুঝিতেছে—তাহারা হীন নয়—ছোট নয়, অধম নয়—অনার্য্য নয়। নানা প্রকার রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের ফলে অপরাপর জাতিদের ন্যায় তাহাদের অবস্থাও হীনতর হইয়া পড়িয়াছে মাত্র—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা হীন নয়।

---

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।'

গ্রামের অন্যান্য সব জাতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চল, অন্য জাতির বিপদ আপদে নিজের বিপদ মনে করিয়া দৌড়িয়া গিয়া আপদ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ কর। তোমার ভিতরের দেবতা জাগিয়া উঠিলে, কতক্ষণ অন্য জাতি ঘৃণা করিয়া থাকিতে পারিবে? ছুটিয়া আসিয়া ভাই বলিয়া বক্ষে টানিয়া লইবে। স্বজাতি প্রেমের পবিত্র জলে জাতিদ্বেষ, জাতিঘৃণার সমুদয় মলিনতা ধুইয়া যাইবে। সকল প্রকার তুল্যাধিকার পাইবার দাবী তোমরা সমাজের সম্মুখে দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে উপস্থিত কর। সমাজ পতিগণকে ডাকিয়া বল—আপনারা যদি আমাদিগকে অধিকার না দেন—আমরাও আমাদের সেবা হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিব। আমাদের জাত্‌ব্যবসায়ে আমাদের পেট ভরেনা—সংসার চলেনা, পরন্তু সেবার পুরস্কার স্বরূপ ঘৃণা অবজ্ঞা করেন, শেয়াল কুকুর অপেক্ষাও আমাদিগকে হীন ও নীচ মনে করেন। আমরা এতদিন এসব বিষয়ে চিন্তা করি নাই, ভাবি নাই। নানা জেলার হিন্দু-মহাসভার ও কংগ্রেসের বিরাট দৃশ্য দেখিয়া এবং সভাস্থলে সর্ব্বজাতির জল ও বহুস্থলে অন্নচল হইতেছে দেখিয়া আমাদের চক্ষের ধাঁধাঁ মনের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে। আর আমরা নীরবে আপনাদের ঘৃণা অবজ্ঞা হজম করিব না। যদি আমাদের সামাজিক অধিকার দেন বিলক্ষণ, আর যদি না দেন—আমরাও আর সেবা করিব না। কৃষি শিল্প বাণিজ্যে জাতিকে ধীরে ধীরে নিয়োজিত করিব। দোকানদারী, দৈনিক শ্রমিকের কার্য্য, কামার, কুমার, বরোজের (পান উৎপাদন) কার্য্য, নৌকাচালান, তাঁত প্রভৃতি কার্য্যে সংসার চালাইব। আমরা প্রথম স্তরে সামাজিক অধিকার দানের প্রবল বিরোধী পুরোহিত ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কার্য্য পরিত্যাগ করিব। তাঁহারা যখন আমাদের কার্য্য করেন না—আমরাই বা তাঁহাদের কার্য্য কেন করিব? তাঁহাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, জাতির গর্ব্ব আছে,—আর আমাদের নাই? আমাদেরও আছে। তাঁহাদের জননীগণের ন্যায় আমাদের

ভগবতী জননীগণেরও বক্ষসুধার মর্য্যাদা আছে। আমাদের জননীগণ ত আমাদিগকে কুকুর বিড়ালের ন্যায় শত চড় থাপড়ে, পদাঘাত লাঞ্ছনায় অপমান বেদনাবোধহীন পশুপ্রসব করেন নাই,—স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাই খাওয়াইয়া আমাদিগকে ত এত বড় করেন নাই। মার স্তন্য দুগ্ধের তাঁহারা মর্য্যাদা হানী করিতে চান না, আমরাই বা করিব কেন? ঘৃণার বিনিময় ঘৃণা—অপমানের বিনিময় অপমান, বিদ্বেষের বিনিময় বিদ্বেষ।—এখানে কোন মমতা, কোন—বিবেচনা,—কোন ওজর আপত্তি শোনা হইবে না। অসীম ধৈর্য্য ধরিয়া একাগ্রচিত্তে সাধনারূপ আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। সমাজে ধনবান নাই, উকীল মোক্তার নাই, বিদ্বান লোক নাই বলিয়া নিরাশ হইও না। গরীবেরা সকলে একত্র দলবদ্ধ হইতে পারিলে মহা মহা কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। দারিদ্র্যে দুঃখ করিও না, ধনবান্ লোক সমাজে নাই বলিয়া নিরাশ হইও না। তোমরা গরীবগণ, মহাশক্তি সম্পন্ন তোমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তিকে জাগাও, শক্তির উদ্বোধন কর—দেখিবে স্বয়ং মহাশক্তিময়ী জননী ভগবতী দশ হাত প্রসারিত করিয়া তোমাদিগকে বিজয় মণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। পার্থ সারথী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে সতত সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। জয় কিম্বা মৃত্যু, অধিকার লাভ অথবা জাতির বিলোপ, ইহাই তোমাদের আকাঙ্ক্ষা হউক। অনাদৃত লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, পদদলিত, ঘৃণিত অবমানিত হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এত লাথি জুতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, কত কি করিবার আছে? না, জাত্ ব্যবসা করিয়া, সমাজের লাথি জুতা না খাইলে পেট ভরে না? অমন দগ্ধোদর ভাত দিয়া না ভরিয়া ছাই দিয়া ভরা উচিত। এমন ভাবে জাতীয় মর্য্যাদা হারাইয়া পশুর অপেক্ষা ঘৃণিত ভাবে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা

মরাই ভাল। জাগ, জাগ,—অনন্ত শক্তিশালী, মহাবীর্য্য সম্পন্ন—নিপীড়িত নরনারায়ণগণ উঠ, উঠ মহানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, শত অশনির বল বুকে বাঁধিয়া। ভয় নাই—চিন্তা নাই, ভবিষ্যৎ তোমাদের অতি উজ্জ্বল—দেবালোক মণ্ডিত! স্বর্গরাজ্য তোমাদের ন্যায় অকপট কষ্টসহিষ্ণু নিষ্কাম্ সরল প্রপীড়িত সমাজ সেবকগণের জন্যই। ভাইসকল, তোমরা পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করতঃ একবার সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও। বিচ্ছিন্ন থাকিয়াই ত তোমাদের এই শোচনীয় দুরবস্থা ও অধঃপতন। কি হীনতম দশা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে—কি গভীরতম-অপমান ও ঘৃণার মধ্যে, কি মর্ম্মদাহী অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার মধ্যে তোমরা জীবন অতিবাহিত করিতেছ,—বাঁচিয়া আছ। এরূপ অপমান ও নিগ্রহের মধ্যে হীন জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকাপেক্ষা মরণ অনেক শ্লাঘ্য, বাঞ্ছনীয় এবং প্রার্থনীয়। শত পদাঘাত, সহস্র নির্য্যাতনেও তোমাদের কিছুমাত্র চৈতন্যোদয় হয় নাই, কিছুমাত্র আত্মগ্লানি—আত্মাবমাননা বোধ জাগ্রত হয় নাই। নিজেদের মধ্যে এখনও ছোট আমি, বড়, ও অকুলীন আমি, কুলীন, ও নিকৃষ্ট আমি, উৎকৃষ্ট, ও অধম আমি, উত্তম ও জন আমি—প্রধান আমি এই হীন জঘন্য আভিজাত্য বোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্বজাতীয় স্বজনগণকে ছোট হীন নীচ অকুলীন মনে কর—তবে উচ্চজাতিদের দোষ কি? তাঁহারা ত তাহা হইলে বলিতেই পারেন—"তোরা আমাদের অপেক্ষা ছোট হীন নীচ অধম অস্পৃশ্য।" এক স্বজাতীয় ভাই, দলিত যদি অন্য দলিতকে অধম হীন ছোট ভাবিতে পার,—তবে উচ্চ জাতিগণের পক্ষে তোমাদিগকে ছোট জ্ঞান করার দরুণ কি দোষ, কি অন্যায় হইতে পারে? দর্পণে যেমনটী দেখাইতেছ—তেমনই দেখিতেছ। ঘৃণার বিনিময়ে ঘৃণা, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা, শ্রদ্ধার বদলে শ্রদ্ধা পাওয়া—ইহাই

জগতের নিয়ম। তোমরা এখনও নিজেদের বক্ষরক্ত নিজেরা পান করিয়া রাক্ষসীলীলাভিনয় করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছ না! অণুমাত্র দ্বিধা ও কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না! তোমাদের এই কৌলিন্যকে শত ধিক, আর তোমাদের এই স্বজাতি-দলন প্রচেষ্টাকে ছিন্নমস্তা নীতিকে সহস্র ধিক! ছি ছি, কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, তোমরা এখনও ঘরোয়া কলহে—আত্মবিবাদে মগ্ন আছ। কোথায় সকলে মিলিয়া,—সমস্ত অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য অভাজনগণ একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজে স্পৃশ্য ও জলাচরণীয় হইবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিবে—তাহা না করিয়া কিনা—নিজের রক্ত মাংস নিজেরাই রাক্ষসের মত ভোজন করিতে উৎসুক আছ। ভ্রাতৃগণ, স্বজাতিবিদ্বেষ মনে পোষণ করিয়া মনপ্রাণকে কলুষিত ও অপবিত্র করিও না। কুলীনগণ এই দণ্ডে এই মুহূর্ত্তে কৌলিন্যরূপ হীন আভিজাত্যের জঘন্য লোকাচার, জাতি-সংগঠনের প্রধান পরিপন্থি স্বরূপ দুষ্ট কুলাচার পরিত্যাগ করতঃ সকল ভাইকে ভাই বলিয়া বুকে টানিয়া লও,—স্নেহভরে অকুলীনগণকে কোলে তুলিয়া লও—কৌলিন্যের সর্ব্ব-প্রকার অবিচার ও অত্যাচার হইতে নিজ নিজ সমাজকে মুক্ত কর।

তারপর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কথা। পিঞ্জরাবদ্ধ আকাশের পাখী ও বনের পশুর পক্ষে পিঞ্জর ভেদ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া মুক্ত হওয়াই যেমন সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ বা কর্ত্তব্য—তোমাদের ন্যায় অস্পৃশ্য অনাচরণীয়গণের পক্ষে অস্পৃশ্যতা পরিহার করতঃ স্পৃশ্য বা আচরণীয় হইবার চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ—জীবন ব্রত। এতদপেক্ষা বড় কোন কার্য্য, ভাবনা, চিন্তা, সাধনা কিছুই নাই—কিছুই থাকিতে পারে না। অস্পৃশ্যের অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম—পূজা অর্চ্চনা, যাগ যজ্ঞ, ব্রত তপস্যা—থাকিতে পারে না। তোমাদের তীর্থযাত্রা গঙ্গাস্নান—কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, গয়া, মথুরা, প্রয়াগ গমন পণ্ডশ্রম মাত্র। তোমাদের তুলসী সেবা, বৃন্দাদেবীকে জল দেওয়া, সন্ধ্যায় দীপ দান করা

সমস্তই বিফল—সমস্তই বৃথাশ্রম। জিজ্ঞাসা করি :এ সব করিয়া, এতকাল গো-বিপ্র-নারায়ণের প্রণাম বন্দনা সেবার্চ্চনা করিয়া কি লাভ হইয়াছে? তোমরা যে অস্পৃশ্য সেই অস্পৃশ্যই আছ, কিছু পরিমাণও পবিত্র হইতে পার নাই। গঙ্গাস্নান তীর্থদর্শন ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানের পূর্ব্বেও যা—পরেও তাই। কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই ও হয় না। গঙ্গাস্নান করিয়া পাপমুক্ত শুদ্ধ নির্ম্মল অপাপবিদ্ধ হইয়া আসিলেও নাপিতগণ তোমাদিগকে মাথা স্পর্শ করিয়া ক্ষৌরী করে না,—বেহারাগণ তোমাদের ডুলি পালকী বয় না, ধোপা কাপড় কাচে না। কি পরিতাপ! কি দারুণ অবজ্ঞা! কি ভীষণ অপমান! অথচ তোমরাই যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, গো-বিপ্র-তুলসী-নারায়ণ সেবায় জলাঞ্জলি দিয়া, কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, গয়া, মথুরা দ্বারকায় না গিয়া, মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যাও—হিন্দুর অখাদ্য খাও—অকরণীয় পাপ কর,—তবে নাপিত তোমার পায়ে হাত দিয়া পায়ের নখ কাটিতে, ক্ষৌরী করিতে, ধোপায় কাপড় কাচিতে এবং বেহারাগণ ডুলি পালকী বহন করিতে অস্বীকৃত ও অসম্মত হয় না বা হইবে না। এইত সমাজে ও ধর্ম্মের নিকট তোমাদের মর্য্যাদা ও স্থান?

এ সব মর্ম্মদাহী চিন্তা এক দিনের জন্যও কখন কর কি? এ সব ভাবিয়া একদিনও কি নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া প্রাণের দেবতার কাছে নিবেদন জানাইয়াছ? একটি বিনিদ্র রজনীও কি এই ভাবনায় —কখনও কাটাইয়াছ? কে বলে ভগবান চিন্ময়—অন্তর্য্যামী, দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু পতিত পাবন, অধম তারণ,—কে বলে তিনি দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ পিতা—স্নেহ মন্দাকিনী জগন্মাতা? যদি সত্যই তাহা হইতেন—কখনও তাহার সন্তান হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া—সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী এইরূপ দারুণ অপমান, কঠোর নির্য্যাতন—বংশ পরম্পরাক্রমে ভোগ করিয়া আসিতে না। এযে সহ্যের অতীত, ধৈর্য্যের অতীত অবস্থা!

বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর। ভগবানই হউন, বাপ পিতা মাতা খুড়া জ্যেঠা মামা পিসাই হউন, গুরু পুরোহিতই হউন, আর সমাজপতি তর্কবাগীশ তর্করত্নই হউন—নিষ্ঠুর রক্ত পিপাসু মহাজনই হউক আর প্রজা পীড়ক জমিদারই হউন সকলের বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা কর—

বিদ্রোহী তুই বিদ্রোহ কর্,
নেরে আপন বুঝ বুঝে,
থাক্‌তে কভু পারবিনে আর,
মরার মত চোখ বুঁজে।
সমাজ তোরে যতই দলুক,
যতই হানুক বজ্র তার,
সিদ্ধিলাভের সাধ থাকে ত
টলিস্ নে তায় একটি বার।
দূর করে দে তিলক শিখা
মালার ঝুলি কর্‌বে দূর,
বদ্‌লে দেরে, বদ্‌লে দেরে,
'হরে কৃষ্ণ' নামের সুর।
লক্ষ বরষ নাম জপিয়ে,
মাথায় ঢেলে গঙ্গাজল,
কি হয়েছিস্, কি পেয়েছিস্?
হিসেব করে বল্‌রে বল।
হরিনামে গঙ্গাজলে
মহাপাপীও হয় শুচি,
তবে কেন আজো পতিত
হরিভক্ত সব মুচি?

বন্ধ করে দেরে যাওয়া
গয়া কাশী বৃন্দাবন,
বৃথাই কেবল কষ্ট করা
অর্থ নষ্ট অকারণ।
ভুলে যা'রে গুরুমন্ত্র
ভণ্ডামী আর বুজরুকি,
জীবন ভ'রে জপ ক'রে তা'য়
কি ফল হ'ল বল্ দেখি ?
মিথ্যা পরকালের আশায়
ইহ কালটাও খোয়ালি,
বৃথাই কেবল পরের চরণ
নয়ন জলে ধোয়া'লি।
মানুষ হয়ে পশুর চেয়েও
স্থান পেয়েছিস্ নীচুতে,
এতই জুতো, এতই লাথি
(তবু) ঘুম ভাঙ্গেনি কিছুতে।
বল্ দেখি ভাই, আর কি বাকী
অপমান আর লাঞ্ছনার,
প্রমাণ কিছু চাস্ কি আরো,
তোর অধিকার বঞ্চনার ?
সাগর মথে তুল্লি সুধা,
ভাগ্যে এল হলাহল,
তুই যে সরল আপন ভোলা,
অমর যা'রা কপট খল ! (১)

(১) পাবনার সুকবি শ্রীযুক্ত প্রিয় বল্লভ সরকার ভারতী সরস্বতী প্রণীত—"রুদ্রবীণা"।

ভীত হইও না,—নিজেদের দুর্ব্বল শক্তিহীন অক্ষম অসমর্থ মনে করিয়া আর অধিক পাপ বাড়াইও না। স্মরণ রাখিও, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ভয়। সর্ব্ববিধ ভয়—কারা-ভয়, রাজভয়, লোকভয়, লোকাচার স্ত্রীআচার দেশাচারের ভয়—গুরু পুরোহিতের ভয়, সমাজপতি মানবরূপী দানবগণের ভয়, এক ঘ'রে হইবার ভয়, সমুদয় ভয়—ভাবনা ত্যাগ কর। সমুদয় দলিত নির্য্যাতিত অস্পৃশ্য জাতীয় ভ্রাতৃগণ অগোণে পরস্পর জলপান করিয়া একই মিলন ক্ষেত্রে—সঙ্ঘবদ্ধ হও। সিংহ বলে জাগিয়া উঠ, গর্জ্জিয়া উঠ। পরশুরামের প্রতিজ্ঞা—ভীষ্মের দৃঢ়তা, মৃত্যুর কঠোরতা, শ্মশানের শুষ্কতা, ভীমের তেজ, অর্জ্জুনের সাহস, বজ্রের প্রচণ্ডতা লইয়া সামাজিক অধিকার অর্জ্জন সংগ্রামে অগ্রসর হও। এতে কি শুধু তোমারই অপমান সূচিত হইতেছে? না, না, এতে তোমার বংশ, কুল, পিতৃপিতামহ, জননী দেবী ও মাতৃস্তন্য-দুগ্ধের পর্য্যন্ত অবমাননা করা হইতেছে! ওরে হতভাগ্য অভাজনগণ, এখনও তোমরা নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রা, শয়ন পান, বিবাহ বংশ-বৃদ্ধির চিন্তায় মগ্ন আছ? মানুষ হইয়া জন্মিলেও যে সমাজের নিকট হইতে মানুষের মত ব্যবহার ত দূরের কথা শৃগাল কুকুর, বেজি ব্যাঙ, কাক কবুতরের মত ব্যবহারও যে পাও না এ বিষয়ে একবারও কেহ ভাবিয়া দেখিতেছ না। এই সব পশুপক্ষী ঘরে গেলে ঘরের খাদ্যদ্রব্য ভাত ডাল লুচি পায়েস, জলের সহিত জলের মেটে কলসী, ঠাকুর দেবতা কালী দুর্গা শালগ্রামশীলা নষ্ট হয় না—অশুদ্ধ অপবিত্র অব্যবহার্য্য হয় না। কিন্তু তোমরা রান্নাঘরে, দেবালয়ে গেলে সব নষ্ট হইয়া যায়। ওরে হতভাগ্যগণ এতেও তোমাদের অন্তরস্থ নারায়ণ ক্ষোভে রোষে ক্রোধে ঘৃণায় অপমান-যাতনায় বিদ্রোহী হইয়া গর্জ্জিয়া উঠে না, প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বহাইতে বাঞ্ছা হয় না? তোমরা কি আর মানুষ আছ? আকারে আকৃতিতে, চেহারায় হাত পায়ে কেবল মানুষ, কিন্তু আচরণে ব্যবহারে

হীনতায় দীনতায় তোমরা পশুর অপেক্ষাও অধম। জাগ, জাগহে নিদ্রিত সিংহ, জাগ জাগ হে সর্ব্বশক্তির আধার, জাগ জাগ হে যোগ-নিদ্রাগত নারায়ণ!

নারীর মর্য্যাদা বাড়াও—আর মা-ভগিনী-স্ত্রী-কন্যার নামের শেষে দাসী পদবী লিখিও না ও তাঁহাদিগকে দাসী মনে করিও না। তাঁহাদিগকে দাসী করা ও দাসী মনে করার দরুণই তোমরা সব দাস গোলাম অধম সন্তান জন্মিয়াছ। দাসী-মাতার গর্ভে দাস ভিন্ন আর কি জন্মিতে পারে? দাসী না বলিয়া তাঁহাদিগকে দেবী বল—লেখ ও দেবী বানাও। দেখিবে দেবী গর্ভে সব দেবতা জন্মিবে,—সমাজের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইয়া যাইবে। তোমরা ত শূদ্র নও, দাস নও, হীন নও, ছোট নও, অস্পৃশ্য নও।

বীর হৃদয় যুবকগণ! তোমরা দৃঢ় সঙ্কল্প কর,—যাহাতে তোমাদের সমাজ ও সম্প্রদায় ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় উচ্চ ও গৌরবান্বিত হয় তৎপক্ষে জীবনপণ সাধনায় ব্রতী হইবে। সর্ব্বপ্রকার মানবোচিত তুল্যাধিকার লাভ করিতেই হইবে।

সমাজপতিগণকে ডাকিয়া বল—অস্পৃশ্যতার জ্বালা তোমরা বহন করিতে অসমর্থ। যদি হিন্দুসমাজ তোমাদের এই ন্যায্য দাবী না শুনেন সমুদয় অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য ভ্রাতা মিলিয়া পরস্পর জল পান করতঃ নিজদিগকেই আচরণীয় ও আচরণীয়গণকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া দাও। ইহা যদি না পার, বুঝিব,—তোমরা শিক্ষিত যুবকেরাও মানুষ নও, নরাকারে পশু,—বা পশুরও অধম জীব। হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সঙ্ঘের পরিচালকবর্গের সঙ্গে সমুদয় দলিত জাতিগণ এক যোগে যোগ দান কর। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার লাভ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। পশ্চাতে কে আসিল না আসিল—দেখিও না। স্মরণ কর—"যদি তোর ডাক শুনে কেও না আসে, তবে একলা চলরে।"

মৃত জড়পিণ্ডপ্রায় সমাজে নব জীবন, নব জাগরণ, নব চেতনার সঞ্চার কর। হয় সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ—না হয় মৃত্যু।

দাঁড়াও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ বুক বাঁধিয়া—সমাজের দুঃখ দৈন্য, অপমান অবজ্ঞা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। জাতির মহাসুদিন সম্মুখে—সর্ব্বপ্রকার নিরাশা হীনতা দীনতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার উদার-চেতা স্বজাতি-প্রেমিক পরিচালকবর্গের সঙ্গে দলে দলে মিলিত হও। তোমার আর্য্যভূমির বৈদেশিক শাসনতন্ত্র বিগত ৭০০ বৎসর মুখে মুখে সাম্যবাদের বহু বুলি আওড়াইলেও তাহাদের কাছ হইতে কোন প্রকার সাম্য লাভ করিতে পার নাই। ২।৪ টী পরিত্যক্ত চাকুরীর এঁটো কাটা কুকুর বিড়ালকে দিবার মত ছিটাইয়া দিয়াছে ইহাতেই তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবকগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রভুর গুণ গান ও স্বদেশদ্রোহিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোটাকয়েক চাকরী পাইলে জাতির কিছু মাত্র উপকার হইবে না—উপকার সর্ব্বসাধরেণের জাগরণে—মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে। নিজেদের সমাজের ভিতরকার পুঁজ ক্লেদ দূর কর। উচ্চজাতিদের নিন্দা করিয়া লাভ নাই। সেদিকের জন্য ত আমরাই আছি। যাহারা তোমাদের কাজ করিবে না—তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া দাও। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠিবে না—এর জন্য রীতিমত সংগ্রাম—যুদ্ধ ও শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ, মানুষের মত চল। কেন শৃগাল কুকুরের ন্যায় সমাজে ভয়ে ভয়ে চলিবে। সমস্ত অনাচরণীয়গণ মিলিয়া বারোয়ারী দেবমন্দিরে প্রবেশ কর। বাধা গ্রাহ্য করিও না। যেখানে সকলের সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে না—সেখানে চাঁদা দিবে না। হিন্দুর বিরুদ্ধে কখনও অহিন্দুর পক্ষে যোগ দিও না। নিজেরা নিজেরা মারামারি করিয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর,

তথাপি কখনও ভিন্ন ধর্ম্মীর কাছে সাহায্যের সহানুভূতির জন্য যাইও না। ইহার পরিণাম কখনও ভাল হয় নাই—হইতেও পারে না।

তামাক ছিগারেট খাওয়া ত্যাগ করিয়া সেই টাকা দ্বারা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়া সমগ্র বঙ্গে সাম্যবাদ প্রচার করিতে মনোযোগী হও। টাকা পয়সার মমতা কিছু কিছু করিয়া ছাড়, আর কতকাল শৃগাল কুকুরের মত হীন অধম জঘন্য জীবন যাপন করিবে। এত অপমানেও ভাত তোমাদের উদরস্থ হয় কিরূপে, এত অপমানের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হয় কেন বুঝিতে পারি না। উঠ, উঠ, সমাজ-জননীর স্নেহের সন্তানগণ! তোমরা না উঠিলে মা উঠিবেন না। তোমরা না জাগিলে মা জাগিবে না। তোমাদের জন্য স্বরাজপথের পথিকগণ পথপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছেন—আর কালবিলম্ব করিও না; ভারতে স্বরাজ আনয়নের জন্য সকলে দলবদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসভায়—হিন্দু মহাসভায় যোগদান কর।

ক্রমশঃ দুর্দ্দিন সরিয়া গিয়া সুদিন আসিতেছে। ভারতের মুক্তি অনিবার্য্য—সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। নিরাশা, দুঃখ, দৈন্য, অবসাদ মন হইতে দূর করিয়া মন-প্রাণকে আশা, উৎসাহ, উদ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া ফেল। অসাধ্য সাধন—অঘটন ঘটন করিবার দুর্জ্জয় সাহস লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। সংসার করা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করা, বাড়ী-ঘর করাই, মানবজন্মের চরম ও পরম সার্থকতা নহে। ইতর জন্তু, পশু-পক্ষীও এগুলি নিয়মিতরূপে করে। তুমি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ,—মানুষের মত মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। পল্লীগ্রামগুলিতে শিক্ষা ও সংস্কারের আলো মোটে প্রবেশ করে নাই। তোমাদের লক্ষ লক্ষ মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী—পশু-পক্ষীর মত হীন অধম জীবন যাপন করিতেছে—

শত শত মানুষ তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে ; অগণ্য দেশাচার, স্ত্রী-আচার, লোকাচার, অনাচার তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে ; সত্য পথে, শাস্ত্রানুযায়ী পথে, দেশ ও সমাজ সেবার পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। এই সব বাধা তোমাদিগকে দূর করিতেই হইবে। শিক্ষিত যুবকগণ সমাজপরিচালক অভিভাবক-নেতৃবর্গের মোটে অপেক্ষা না করিয়া নিজেরা সঙ্ঘগঠনপূর্ব্বক সমাজ-সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হও। বিবাহ না করিয়া, সংসারী না হইয়া একদল যুবক "অনুন্নত জাতির" উন্নতির বার্ত্তা বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে দলিত ভ্রাতাদের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে থাক। বিক্রয়ার্থ সঙ্গে রাখ ভাল ভাল পুঁথি পুস্তিকা। তোমরা চলিয়া গেলে পুঁথি পুস্তিকাগুলি তোমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবে। লক্ষ লক্ষ দলিত ভাই ভগিনীগণকে সঞ্জীবনী বাণী শুনাও। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সাম্য মৈত্রী ও সামাজিক উন্নয়নের কল্যাণময়ী বার্ত্তা প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ কর। গ্রামে গ্রামে একখানা দৈনিক পত্রিকা প্রচারের চেষ্টা কর। সম্মুখে সুদিন সমাগত। সর্ব্ব-ত্যাগী নেতৃবর্গের পুণ্যময় কার্য্যে তোমরা কাঠবিড়ালীর মত যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ধন্য হও,—জন্ম জীবন সার্থক কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিধবা-বিবাহ

বৈধব্যে শিশু-বিধবার মনোভাব—

(তুই কেন মা কাঁদিস্ এত, আমার দিকে চেয়ে ?
আমায় দেখে শিউরে উঠিস, চোখের জলে নেয়ে ?

সকল কথা লুকাস কেন, ধরিস কেন ছল্,
কিসের ব্যথা বাজল বুকে, বলনা মাগো বল্ ?
শ্যামলী গা'য়ের বাছুর সেদিন গেছেই যদি মারা,
তাইতে কি মা ঘরের কোণে কাঁদিস অমন ধারা ?
পুষিটা হায় ! পালিয়ে গেছে, কাঁদিস বুঝি তাই ?
সেবারে সে পালিয়েছিল, তুই তো কাঁদিস্ নাই ?
দিদি তো শ্বশুর-বাড়ী সেদিন গেল চ'লে,
এই মাসেরি শেষের দিকে আস্‌বে গেছে বলে ;
তবে কেন কাঁদিস্ মা তুই সত্যি ক'রে বল্,
দেখলে আমায়, চোখের কোণে আস্‌ছে ভ'রে জল !
আর কেন মা দিস না আমার সিঁদুর সিঁথির পরে ?
লাল পেড়ে ঐ নতুন শাড়ী রাখলি' তুলে ঘরে ?
সেদিন মাগো দুপুর বেলায় দিলি না চুল বেঁধে',
হাতের নোয়া খুললি আমার অমন ক'রে কেঁদে ।
কালকে মাগো, "বকুল ফুলের" বাসর ঘরের কাছে,
যেতেই মোরে দিলে নাকো, ছুঁয়েই ফেলি পাছে !
বল্‌লে সবাই মুখ খিঁচিয়ে, "তুই এখানে কেন ?"
হাত ধরে মোর তাড়িয়ে দিলে শেয়াল কুকুর যেন !
"বকুল ফুলের" বিয়ে যে মা, "বকুল ফুলের" বিয়ে,
কেমন ক'রে শেষ হো'ল যে আমায় ফাঁকি দিয়ে,
মুখ নেড়ে' সব বল্‌লে আমায় "সর বিধবা মেয়ে—
অলুক্ষণে হাসছে দেখ স্বামীর মাথা খেয়ে—"
আমার বিয়ে পড়্‌ছে মনে স্বপন দেখার মত,
সেই যে মাগো বাজ্‌ল সানাই লোকেরি ভিড় কত !

সেই ও-পাড়ার মুক্ত-দিদি সাজিয়ে দিলে মোরে,
অনেক রাতে মালা বদল ঘুমের ঘোরে ঘোরে !
সেই যে মাগো, চিনি নাকো কাদের ছেলে এসে,
পাল্কী চড়ে' চলল নিয়ে আমায় তাদের দেশে ;
সব অচেনা লোকের মাঝে কান্না কেবল আসে,
তোরি মাগো মুখটি শুধু চোখের 'পরে ভাসে !
বললি সেদিন সেই ছেলেটি হঠাৎ গেছে মারা,
আছড়ে কি তাই পড়লি মাগো কেঁদেই হলি সারা ?
তার জন্যে কান্না মা তোর বুঝতে পারি হায় ;
আমায় দেখে কাঁদিস কেন সেইটে বোঝা দায় !
সিঁথেয় সিঁদুর না দিলে মা তাই বিধবা হয় ?
সিঁদুর যদি দিস্ মাগো তুই, তা' হলে তো নয় ?
হাতের নোয়া ভাঙ্গলে যদি অলুক্ষণে হই,
পর্‌লে আবার হাতের নোয়া আর বিধবা নই ?
অমন করে কাঁদিস্ না মা, আমায় চেপে বুকে,
অমন ক'রে চোখের জলে থাস্‌নি চুমু মুখে ;
খেলতে আমায় ডাক্‌ছে নুটু পুতুল খেলায় তা'র,
লক্ষ্মীটি মা অমন ক'রে কাঁদিস নাকো আর ! *)

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে লিখিয়াছেন :—

("ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে !
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে ;

* শ্রীকৃষ্ণধন দে। প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৩

মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন
আহা দেখ অঙ্গে নাই, অঙ্গের ভূষণ!
দিবানিশি একি বেশ, বার মাস সেই ক্লেশ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে,
হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে?
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার,
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার;
অবিলম্বে হিন্দু ধর্ম্ম ছারখার হবে!
হিন্দু কুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে!
দেখরে দুর্ম্মতি যত চির ম্লেচ্ছ পদানত—
বিধবার শাপে হায়, এ দুর্গতি হয় রে।"

তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে হৃদয়হীন পুরুষগণকে ধিক্কার দিয়া পুনরায় বলিয়াছেন—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হ'য়ে আর্য্য বংশ—অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হ'য়ে!

এখনো ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া,
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হ'য়ে ?
বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া, গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া ল'য়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার বাজু বালা দেহের ভূষণ ;
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।"

বাল-বিধবাগণের অসহনীয় জীবন ধারণ ক্লেশের বিষয় চিন্তা করিয়া অন্য একজন কবি মনের আবেগে লিখিয়াছেন—

"পুরাণ তন্ত্র অন্ধ আচারে লুপ্ত ধর্ম্ম পুণ্যালোক,
শত ব্যভিচার মিথ্যা কুহকে মুগ্ধমগ্ন যতেক লোক,
কাঁদিছে রমণী, কাঁদিছে বিধবা, ফেলিছে তপ্ত দুঃখ-নীর,
"নাহি, নাহি ভয়" ঘোষিল উচ্চে বিজয়ী যতেক শ্রেষ্ঠ বীর।"

বিধবার দুঃখে বিগলিত প্রাণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের-অন্ধ কুসংস্কারে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া করুণ কণ্ঠে লিখিয়াছেন—

"হে ভারতবর্ষীয় মানবগণ, আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে ? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। তোমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছ। আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে। এবার শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবন কর এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলেই তোমাদের

জন্মভূমির কলঙ্ক দূর হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমরা কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, তাহাতে আশা করা যায় না যে তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, হতভাগ্য বিধবাগণের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদিগের কঠিন হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হয় না; এবং ব্যভিচার ও ভ্রুণহত্যা দর্শনে তোমাদের মনে ঘৃণার উদয় হয় না। তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা ভগ্নী ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার কাম-রিপুর বশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ এবং ধর্ম্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক লজ্জা ভয়ে তাহাদের ভ্রূণ-হত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ! তোমরা মনে কর, বিধবা হইলে স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণ হইয়া যায়, দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ থাকে না। কালরিপু সকল একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তোমাদের এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহার প্রমাণ ত পদে পদে প্রাপ্ত হইতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্ বিবেচনা নাই, কেবল লোকাচার রক্ষা করাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে! হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না!

দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ-হত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা বোধ হয়, চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব হে পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন—বিধবা বিবাহের প্রথা পুনঃ প্রচলন করিয়া হতভাগা বিধবাদিগের বৈধব্য যন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ-হত্যা পাপের স্রোত-নিবারণ করা উচিৎ কি না?"

অন্য এক কবি বিধবা-বিবাহের একান্ত আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি,
দিয়াছেন নানাশাস্ত্রে বহু শাস্ত্রকার।
সেই প্রথা প্রচলিত নাহি চলে এবে,
ঘটিছে সমাজে কত জঘন্য ঘটনা।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, হতাশ পরাণে
কাঁদিছে বিধবাগণ বসিয়া বিরলে।
তাহাদের মর্ম্মস্পর্শী করুণ-ক্রন্দন,
বাতাসে মিশিয়া যায়, নাহি শুনে কেহ।
সেই দুঃখে ধৈর্য্যহীনা বিধবা সকল,
দুর্নিবার ইন্দ্রিয়ের প্রবল তাড়নে
স্বজাতির মুখে মাখি কলঙ্ক কালিমা,
ক্ষণিক সুখের তরে করে জাতি নাশ।
দুশ্চরিত্র যুবকের প্রলোভনে পড়ি,
কত যে আশ্রয়হীনা বিধবা অবলা,
পদে দলি সতীধর্ম্ম পরিণামে তার,
ভ্রূণ-হত্যা মহাপাপ করিছে অর্জ্জন।

এই সব গ্লানিকর করমের ফলে,
ক্রমে ক্রমে হিন্দুকুল হ'তেছে নির্ম্মূল।
হিন্দু ভ্রাতাদের পাশে এ মিনতি মম—
ছাড়ি হিংসা কপটতা, সরল অন্তরে,
কাল ধর্ম্ম বিবেচনা করি সূক্ষ্মরূপে,
পরিহরি দেশাচার, রাক্ষসের মায়া
বিধবা-বিবাহে করি সম্মতি প্রদান
অক্ষুণ্ণ রাখুন বিদ্যাসাগরের মান।
তা না হ'লে বিধবার শাপানলসহ,
ভ্রূণ-হত্যা পাপানল হ'য়ে একত্রিত,
হিন্দুকুল ভস্মীভূত করিবে অচিরে।"

পাবনার কবি শ্রীযুক্ত প্রিয়বল্লভ সরকার ভারতী মহাশয় তাঁহার "রুদ্র-বীণায়" গাহিয়াছেন—

"আর কত কাল বিধবা-বালার
তপ্ত অশ্রুবারি,
তরল-অনলকুণ্ড ভারতে
গড়াবে রে সারি সারি?
শাস্ত্রবিধির ছলে,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে,
আর কতকাল সাগরে ডুবায়ে
বধিবি বিধবা-নারী;
হৃদয় বিহীন সমাজের পতি,—
বিধান মানিবি তা'রি?"

* পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয়কুমার দে লিখিত।

জগৎ বরেণ্য অবতার-প্রতিম ধরিত্রীর মুকুটমণি নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী বিধবাগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাদের বিবাহ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"বালিকা বধূকে কখনও বিধবা বলা যাইতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে আপন ইচ্ছায় অথবা সম্মতিতে যার বিবাহ হইয়াছে, যে স্ত্রী পুরুষের ভিতরের সম্বন্ধ কি তা বোঝে, স্বামী মারা গেলে সেই নারীকে বিধবা বলিতে হইবে। কিশোরী, বালিকা, যে বালিকা অক্ষতযোনী অথবা মা বাপ যাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাকে বিধবা বলা যায় না। অতএব বালিকার নামমাত্র বৈধব্যের সমর্থন করা অন্যায়।

যে সব বালিকা বিবাহ সংস্কারের অর্থই বোঝে না। সেইরূপ তিন লক্ষ বাল-বিধবার উপর ধর্ম্মের নামেই বল প্রয়োগে বৈধব্য ধর্ম্ম চাপাই! ছোট ছোট বালিকার উপর বৈধব্য চাপান এক মহাপাপ—ইহার নিদারুণ ফল আমরা সব সময় ভুগিতেছি। আমাদের বিবেক বুদ্ধি যদি সত্যই জাগ্রত হইত, তবে ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহ দিতাম না এবং এই তিন লক্ষ বালিকাকে বিধবা না কহিয়া ঘোষণা করিতাম যে—ইহাদের ধর্ম্ম সঙ্গত বিবাহই হয় নাই। এই প্রকার বৈধব্যের বিধান কোন শাস্ত্রে নাই।

যে মা বাপ কচি মেয়ের বিবাহ দেয়, সেই কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হইলে তার বিবাহ দিয়া মা-বাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, বেশী বয়সে বিধবা হইলে, কন্যা নিজেই ঠিক করিবে তার পুনর্ব্বিবাহ করা উচিত কি না? এ সম্বন্ধে কি নিয়ম হওয়া উচিত, তা যদি কেউ জানিতে চান তবে বলিব, যে নিয়ম নারীর জন্য হইবে, তাহাই পুরুষের জন্য হওয়া চাই। (৫০ বৎসরের বিপত্নীক যদি পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, তবে ৫০ বৎসরের বিধবারও পুনর্ব্বিবাহের অধিকার থাকা চাই।*)

বৈধব্য হিন্দু-ধর্ম্মের শোভা, বৈধব্য ধর্ম্মের ভূষণ—কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে কোন্

বৈধব্যের স্তুতিগান করে?—যে বিবাহ কি জানে না, এরূপ ১৫ বৎসরের বালিকার বৈধব্যের প্রশংসা শাস্ত্রে করে না। বাল-বিধবার পক্ষে বৈধব্য ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম,—তার পক্ষে ইহা অত্যাচার। বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি হিন্দু ধর্ম্মের অবনতি দেখিতেছি। বৈধব্য সব রকমে সব স্থানে সব সময় অনিবার্য্য বিধান নহে। যে স্ত্রী উহা রক্ষা করিতে পারে ইহা তাহারই পক্ষে ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে হাজার হাজার বিধবা থাকিবে ততদিন বুঝিতে হইবে আমরা বারুদ ঘরের উপর বসিয়া আছি—যে কোন মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। যদি পবিত্র হইতে চাই, যদি হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাই, তবে এই বিষময় বৈধব্য প্রথা হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। যাঁহাদের অধীনে বাল-বিধবা আছে, তাঁহারা যেন পূরা সাহসের সহিত বাল-বিধবাদের যথারীতি খাঁটি বিবাহ দেন—পুনর্ব্বিবাহ বলিলাম না, কারণ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে তাহাদের যথার্থ বিবাহই হয় নাই।"

"যদি কোন পিতা দশ বৎসরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেন, তবে কি কারণে ঐ বালিকা ও তাহার স্বামীকে লোকে 'এক ঘরে' করে? ইহা কি পুণ্যের কাজ? যে লোকে দুরাচার করে, প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করে, মদ মাংস খায়, তাহাকে কি কেহ জাতিচ্যুত করে? যে ব্যক্তি বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যভিচার করে, তার খোঁজ খবর কি কেউ লয়?" *

সমাজের নিষ্ঠুর বন্ধন ছেদন

বৈধব্যে যুবতী-বিধবার মর্ম্মবাণী

পিতামাতার নিকট বিধবা যুবতীর করুণ পত্র

আমেদাবাদের এক হিন্দু-বিধবা যুবতী সাহসের সহিত সমাজের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার প্রণয়ীকে বিবাহ করায় গুজরাটের জনসাধারণের

* মহাত্মা গান্ধী লিখিত "বিধবা-বিবাহ," শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন অনুদিত।

মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে,—হিন্দু যুবতীর এই পুনর্ব্বিবাহ ব্যাপারটি করুণ কাহিনীতে পূর্ণ।

বালিকা যশস্বতী বাঈ ঔদীচ্য ব্রাহ্মণবংশসম্ভূতা এবং আমেদাবাদের রাও বাহাদুর কেশবলালের কন্যা। বার বৎসর বয়সের সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর তিন মাস যাইতে না যাইতেই সে বিধবা হইয়া পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। বালিকাটী পরে রায়কোয়াল-বংশজাত রমণলাল ভট নামক একটি লোকের সংস্পর্শে আসে। রমণলাল ন্যাশনাল কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রোপাইটরী হাই-স্কুলের একজন শিক্ষকরূপে ভর্ত্তি হইল; যশস্বতী ঐ স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করিল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

পরিশেষে যশস্বতী ও তাঁহার বন্ধু মনে করিলেন যে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার পিতার সম্মতি আদায় করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহারা গোপনে বরোদায় গমন করিলেন। সেখানে আর্য্য সমাজ মন্দিরে বালিকা তাহার প্রণয়ী রমণলালকে বিবাহ করিল।

বিবাহের জন্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যশস্বতী তাহার মাতাপিতার ও ভাইভগ্নীর নিকট একটি করুণ চিঠি লিখিয়া গিয়াছিল। ঐ চিঠির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যশস্বতীর পত্র

আমার পিতামাতা এবং যে গৃহে আমি জন্ম হইতে লালিতপালিত হইয়াছি, সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি জানি আমার এই চিঠি পড়িয়া আপনারা নির্ম্মম আঘাত পাইবেন,—এইরূপ আঘাত আপনারা জীবনেও আশা করিতে পারেন নাই, কিন্তু কি করিব! প্রেমময়ী জগদীশ্বরীর সেবক-সেবিকারা যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথেই যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি।

আমার কার্য্যের ফল কি হইবে, সেই বিষয়ে ভাবিতে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি ; কিন্তু তাহা সত্বেও আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, আমার চক্ষের জলে আপনাদের চরণ ধৌত করিলেও আপনারা আমায় সে সম্মতি দিবেন না, তখন আমি বাধ্য হইয়াই এই ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের সমাজের লোকেরা আপনাদিগকে এবং আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, কিন্তু হায়! কি করিব! উপায় নাই!

যখন আমার বার বৎসর বয়স, তখন আপনারা আমাকে আপনাদের মনোমত এক বালকের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, তখন কি আপনারা এই বিশ্বাসেই আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন যে, আপনারা প্রকৃত প্রস্তাবেই আমার বিবাহ দিতেছেন? যদিও আমি সুখী হই নাই, তথাপি মাত্র তিন মাসের জন্য আমাকে ঐ বালকের পত্নীরূপে ধরিয়া লওয়া হইল। সেই সময় হইতে আমি একজন বিধবা হইয়াছি। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা আমার বৈধব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহারা আমার যৌবন অবস্থার কথা ভুলিয়া গেল—না, না, তাহারা ভুলিয়া গেল না, তাহারা আমার যৌবনকে অগ্রাহ্য করিল। তাহারা আমাকে এক বুড়ী ঠানদিদির মত দেখিতে লাগিল—যেন আমার আর কোন চিন্তা কোন ভাব থাকিতে পারে না।

তাহারা একবারও মনে করিল না যে,—আমারও ভিতরে একটি হৃদয় আছে, তাহা জীবনের সাধারণ সুখভোগের জন্য আকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি যদি এক পয়সায় এক জোড়া কাচের চুড়ি আমার হাতে পরি, কিংবা আমার চুলে যদি আমি দুই একটি ফুল গুঁজিয়া রাখি তাহা হইলে তাহা যাহাতে অপরের চক্ষে না পড়ে, সেজন্য আমাকে সযত্নে তাহা গোপন করিতে হইবে।

ঐরূপ নির্দ্দোষ আনন্দটুকুও কি ভোগ করিবার ইচ্ছা আমার থাকা উচিত নয়? ভগবান্ যখন আমাদিগকে সৌন্দর্য্যবোধ দিয়াছেন, তখন আমি

কি আমার নিজের শরীরকেও সাজাইতে পারিব না? মাত্র বার বৎসর বয়সের একটি বালিকা কি করিয়া ঐরূপ কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারে? আমার অন্তরের এই সকল ভাব এই দীর্ঘ নয় বৎসর কাল চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন কি ঐ সকল প্রকাশ করিবার অধিকারও আমার ছিল না।

কে আমার কথা ভাবিয়াছিল?

আমার বড় ভাইয়ের বয়স তখন ত্রিশ, আমার বয়স বার ছিল। তিনি তাহার স্ত্রী বিজয়া ভবীর সহিত দশ বৎসরকাল সুখভোগ করিয়াছিলেন, আর আমি আমার স্বামীর সহিত দশদিনও সুখে কাটাইতে পারি নাই। প্রায় একই সময়ে তিনি বিপত্নীক হইলেন, আর আমি বিধবা হইলাম। আপনারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিলেন, তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু আমার কথা কে স্মরণ করিয়াছিল?

সে জন্য আমি কাহারও উপর দোষারোপ করিতেছি না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথাই দোষী। এ কি নির্ব্বোধ প্রথা, একজন বিপত্নীক ব্যক্তি পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে কিন্তু সেই একই অধিকার হইতে বিধবাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

তাহাকে ত্যাগ অবশ্যই অনুশীলন করিতে হইবে। একজন বিধবার পক্ষে অপর একজন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবার অধিকার নাই। বিধবা যদি হাসে, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার অন্তঃকরণ কলুষিত হইয়াছে।

একি সমাজ! কেহ যদি এই নির্দ্দয় প্রথার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুখের পথ অবলম্বন করে (পুনরায় বিবাহ করে), তাহা হইলে পাপ কোথায়?

আমি ইহার ভিতর পাপের কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরং আমি মনে করি, গোপন পাপের পথ অপেক্ষা প্রকাশ্যে বিবাহ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। শরীরকে বন্ধনে রাখা যায়, কিন্তু মন ত বাঁধা মানে না।

আপনারা আমাকে এক প্রগল্‌ভা বালিকা মনে করিতে পারেন। কিন্তু কি করিব! আমি অবশ্যই আমার মাতাপিতার নিকট আমার বিনীত অভিমত নিবেদন করিব।

যাহারা যথারীতি বিচারবিবেচনা না করিয়া অপর একজন পুরুষের সহিত পলাইয়া যায়, আমাকে অবশ্যই কখনও সেই শ্রেণীর বালিকাদের মধ্যে ফেলা যায় না।

আমি যাঁহাকে আমার স্বামীরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে আপনারা যাহা কিছু মনে করুন না কেন, আমি আমার শরীর, আমার আত্মা সকলই আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছি। সংসারের সকলের চক্ষের উপরেই অতঃপর আমি তাঁহার হইব।

ওগো আমার বড় আদরের বাবা, মা, তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি আগেকারই মত এখনও সেই তোমাদেরই মেয়ে। যদি তোমরা আমাকে তোমাদের কন্যা বলিয়া অস্বীকার না কর, তাহা হইলে আমি সকল সময়েই তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

এই বাড়ীতে আমি আমার নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারি, এইরূপ বহু কাপড়চোপড় ও গহনা তোমরা আমাকে দয়াকরিয়া দিয়াছিলে; কিন্তু এখন আমি মাত্র যে কাপড়খানা পরিয়া রহিয়াছি, সেই কাপড়খানা লইয়াই তোমাদের গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছি, ঐ কাপড়খানিও আমি পরে ফেরত পাঠাইব। যে পিতামাতা আমাকে আর তাঁহাদের কন্যা বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদের বাড়ী হইতে গোপনে কোন জিনিষপত্র লইয়া যাওয়া আমি পাপ বলিয়া মনে করি। আমি কাপড় ও গহনার তত প্রিয় নই। অলঙ্কার ভারগ্রস্তা দুঃখিনী বিধবা হওয়া অপেক্ষা অলঙ্কারহীনা একজন বিবাহিতা স্ত্রী হইতেই আমি অধিক পছন্দ করি।

আমার এই নুতন জীবনের জন্য আমি তোমাদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। ইতি—

তোমাদের অকৃতজ্ঞ মেয়ে—যেশু।

—"ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল হেরাল্ড॥" *

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

(২)

এক বিধবা ভগ্নী লিখিয়াছেন :—

"আমি একজন বালবিধবা। এখন আমার বয়স তেইশ বৎসর। ১৩ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় আমার স্বামীর যক্ষ্মা রোগ ছিল। বিবাহের দেড় বৎসর পরে আমি বিধবা হই। ইহার পর আট বৎসর গত হইয়াছে। শ্বশুর-বাড়ীতে আমার এক বৃদ্ধা শাশুড়ী ছিলেন। তিন চার মাস হইল তিনিও মারা গিয়াছেন। এখন সেখানে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই। আমি এখন আমার কাকার ও ভাইদের বাড়ীতে আছি। কাকা প্রাচীন মতের লোক। কিন্তু তিনি আমাকে কন্যার মত ভালবাসেন। আমি কিছু কিছু সংস্কারের পক্ষপাতী। আমি খাদি পরি ও 'নবজীবন' পড়িয়া থাকি। ইহা কাকার ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি আমার মনে দুঃখ দেন না। গত তিন বৎসর হইতে আমার মনে পুনর্বিবাহের কথা জাগিয়াছে, কিন্তু আমি সে ইচ্ছাকে দাবাইতে এবং মনকে ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। গীতা পাঠ করিতেছি। গীতার প্রায় সব শ্লোক আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের সংস্কার দূর হইতেছে না। আমার শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গত তিন চার মাস এই চিন্তা খুব বেশী বেশী আসিতেছে। মনের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া

---

* আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ আশ্বিন ১৩৩৫

মরিতেছি। মনের অবস্থা এ পত্রে হুবহু প্রকাশ করিয়া অন্তরের বোঝা হালকা করিতেছি। একদিকে সমাজের ভয় এবং কাকা তথা ভাইদের ভালবাসা আমাকে টানিতেছে; অপর দিকে ভাই-ভাইবৌদের দেখিয়া ঐ সুখের দিকে মন যাইতেছে। কাকার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে লোকে তাঁহাকে ছোট মনে করিবে ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। আমাদের জাতির ভিতর তিনচারটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু সেই সব বেচারী নিজেদের ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বিধবা থাকিয়া খুসীমত ব্যভিচার করিলে সমাজ কিছু বলে না; কিন্তু কোনো বিধবা যদি পুনর্বিবাহ করে, তবে সমাজ তাহাকে বর্জ্জন করিবে, এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনকে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। আর তাহারা দেখা সাক্ষাৎ করিলেও তাহাদের নিন্দা করিবে। পুনর্বিবাহিতা বিধবা তো মুখ তুলিয়া তাকাইতেও পারে না। ব্যভিচারী বিধবাকে কেহ কিছু বলে না। সমাজের এই নীতি আত্মঘাতী। আমার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় হইয়াছে। বিবাহ করিলে উপরে লেখা সমস্ত আপদ বিপদ্ ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে—ভাই, কাকা প্রভৃতি সকলের তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে। আর বিবাহ না করিলে অন্তরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা শূলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে যে, আমি লোক-দেখান বৈধব্য পালন করিতে গিয়া সকলকে ঠকাইতেছি। ভাই এবং কাকার অধীন থাকিলে আমার কোনো রকমে মঙ্গল হইবে না। তাঁহারা আমাকে অধিক পড়াশুনা পর্য্যন্ত করিতে দেন না। ফলে অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া বিবাহের চিন্তায় জ্বলিয়া মরিতেছি। এ অবস্থায় আমি কি করিব? কৃপা করিয়া সব কথা লিখিবেন। ইহার উত্তর 'নবজীবনে' দিলে ভাল হয়, কারণ অপর পাঠকও ইহা হইতে উপকৃত হইতে পারেন।"

এই ভগ্নী এবং এইরূপ অন্য ভগ্নীদিগকে আমি বলি, তাঁহারা যেন পুনর্বিবাহ করেন এবং এজন্য যে বিপদ আসে, তাহা সহ্য করেন। যোগ্য পতি মিলিলে তো কাকা এবং ভাইদের পরিবারে থাকার প্রয়োজন বড় থাকিবে না। মনে মনে বিষয় চিন্তা করা অপেক্ষা, শরীর দ্বারা বিষয় ভোগ করা ভাল। মনে ইন্দ্রিয়ভোগের ইচ্ছা আসিলেই, তাহা খারাপ লাগা এবং তাহাকে দমন করার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু শারীরিক সম্ভোগের অভাবে মন যদি ভোগের চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, তবে দেহের ক্ষুধা শান্তি করাই ধর্ম্ম—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। বিধবা-বিবাহ কোনো পাপ কাজ নহে—পাপ কাজ হইলেও বিপত্নীকের বিবাহে যতটুকু পাপ হয়, ইহাতেও ততটুকু পাপ হইবে। বৈধব্যমাত্রই ধর্ম্ম নহে। যে ইহা পালন করিতে পারে, তাহার পক্ষে ইহা ভূষণস্বরূপ। এই ভগ্নীর যদি সাহস থাকে, তবে তিনি যেন আপনার কাকা ও ভাইদের কাছে মনের কথা খুলিয়া বলেন এবং তাঁহাদের সাহায্য চান। তাঁহারা যদি বিবাহের সাহায্য করিতে না পারেন, তবে বিধবাকে তাঁহাদের ঘর ছাড়িতে হইবে এবং কোনো বিধবা-সহায়ক সভার আশ্রয় লইতে হইবে। এই ভগ্নীর আত্মীয়-স্বজন যে অবস্থায় আছেন, ঐ অবস্থায় কাকা এবং ভাইদের নিকট আমার পরামর্শ এই যে, তাঁহারা যেন সময়ের গতি বুঝিয়া এইরূপ অসহায় ভগ্নীদিগকে দুঃখ হইতে মুক্ত করেন।

কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ

১। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব।

অর্থ—হে নারী, তুমি মৃত পতির নিকট শয়ন করিয়াছ (সহমরণের

* হিন্দী-নবজীবন—৯ই মে, ১৯২৯—অনুবাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন। বঙ্গবাণী ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৬।

জন্য)। এখান হইতে উঠিয়া এখন সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। যিনি তোমার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু পতি। বর্ত্তমানে তুমি তাহার পত্নী হও।—ঋগ্বেদ—১০, ২, ১৮, ৮।

২। অপশ্যং যুবতীং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্

অন্ধেন যৎ তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রোক্তো আপাচীনয়ং তদেনাম্।

ভাবার্থ—যুবতী বিধবাকে মৃতপতি (পতির ধ্যান) হইতে স্বতন্ত্র করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়া দেখা গিয়াছে, যে পূর্ব্বে (শোক অথবা দুঃখ হেতু) নিরানন্দ ছিল সে এখন সুখী আছে।—অথর্ববেদ-১৮, ৩,৩।

৩। যা পূর্ব্বংপতিংহিত্বাঅথান্যং বিন্দতেপরং

পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিয়োষতঃ।

অর্থ—যাহার প্রথম স্বামী মরিয়া গিয়াছে, সে যদি আবার বিবাহ করিবার সময় পঞ্চৌদন যজ্ঞ করে [পাঁচজনকে খাওয়ায়] তবে, তাহাদের আর বিচ্ছেদ হইবে না।—অথর্ববেদ—৯-৩-৫-২৭।

৪। সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবা হপরং পতিঃ।

অর্থ—এই দ্বিতীয় পতি পুনর্ব্বিবাহিত স্ত্রীর সহিত একই পরলোক-প্রাপ্ত হইবে। অথর্ব্ব বেদ—৯, ৩, ৫, ২৮।

৫। পরিনীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।

সাত্যাদ্ বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষয়ং বিধিঃ॥

অর্থঃ—স্বামীর সহিত রমণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন স্ত্রী বিধবা হয় তবে পিতা সেই কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

৬। পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।

সা চেদক্ষত যোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥

অর্থঃ—মন্ত্র দ্বারা বিবাহের পর কন্যা বিধবা হইলে, সে যদি অক্ষত যোনি হয়, তাহা হইলে নবীন পতিকে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

বশিষ্ঠ ১৭।৭৪

৭। মনুসংহিতা ৯ অধ্যায় ১৭৬ শ্লোক—

সাচেদক্ষত যোনিঃ স্যাদ্ গত প্রত্যাগতা পিবা
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ **সংস্কার** মর্হতি।

অর্থাৎ যদি (পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা) সেই স্ত্রী অক্ষত যোনি (পুরুষ সংসর্গ রহিতা) হয় তবে দ্বিতীয় বরের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

৮। বিষ্ণু সংহিতা ১৫ অধ্যায় ৮ম বচন

অক্ষতা ভূয়ঃ **সংস্কৃতা** পুনর্ভূঃ।

অর্থাৎ অক্ষত যোনি বিধবার পুনরায় বিবাহসংস্কার হইলে তাহার নাম হয় পুনর্ভূ।

৯। অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ **সংস্কৃতা** পুনঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৬৭

অক্ষত যোনিই হউক কিম্বা ক্ষত যোনিই হউক পুনরায় বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা বিধবার নাম পুনর্ভূ। বাহুল্য ভয়ে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতমহাশয়গণ যে বিধবার বিবাহ হইতে পারে না কিন্তু রক্ষিতা রাখা যায় বলেন ইহা তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান জনিত মস্ত বড় মূঢ়তা।

বিধবা বিবাহের আপত্তি খণ্ডন

১। কন্যাদান—জামাতাকে কন্যার লালন পালন ও পোষণ কর্তৃত্ব এবং পত্নীরূপে গ্রহণের অনুমতি দান মাত্র। কাপড় পোষাক ছাগমেষ গাড়ী নৌকা দানের মত কন্যাদান নহে। যেমন ধোপাকে কাপড় দান— দান নহে পরিষ্কার করার জন্য—সাময়িক দান মাত্র। দাতার দত্ত বস্তু গ্রহীতা—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরা ক্রমে ভোগ করিতে পারে কিন্তু কন্যাদান সেরূপ নহে। ২। বিপত্নীকসহ

কুমারী কন্যার বিবাহের মতই বিধবা বিবাহের ক্রিয়া কলাপ ও মন্ত্রাদি পঠিত হইবে এবং, ৩। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণই কন্যাদান করিয়া বিবাহ দিবেন। ৪। পুনর্ব্বিবাহে বিধবার গোত্র উল্লেখ স্থলে পিতার গোত্রই উল্লেখিত হইবে, পূর্ব্বস্বামীর গোত্র নহে; পিতৃ পুরুষের আদি পুরুষ ঋষিগণের নামানুসারেই গোত্র প্রচারিত হইয়াছে। ৫। সম্মতি—১৮ বৎসর বয়সে কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়—তার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে অভিভাবক বর্গের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন। ৬। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত এ কারণ বিপত্নীকের ঔরসজাত পুত্র কন্যার ন্যায় দ্বিতীয় বার বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্র কন্যাও পিতা মাতার ও পিতৃ মাতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং পিণ্ডাদি দানের শাস্ত্র সঙ্গত অধিকারী। ৭। বিধবা বিবাহ আইন সম্মত বলিয়া—বিধবার গর্ভে জাত পুত্র কন্যাদি পিতৃ মাতৃ সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী ৮। বিধবা পরলোকে পরবর্ত্তী স্বামীলোক প্রাপ্ত হইবে।

বিধবা বিবাহের কতিপয় দৃষ্টান্ত

সত্যযুগে—১। বিধবার পুত্র ভগীরথ। ত্রেতায় "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় অবতীর্ণ" ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ২। সুগ্রীবসহ বালীর বিধবা পত্নী তারা। ঐরূপ ৩। বিভীষণ ও মন্দোদরী। দ্বাপরে ৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাধিপতি নরকাসুরের বহু বিধবা পত্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ, ৫। শ্রীকৃষ্ণের গুণধর পুত্র শম্বরাসুর নিহতকারী প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক তদীয় বিধবা পত্নী মায়া দেবীর পাণি গ্রহণ। ৬। শ্রীকৃষ্ণের সখা ভারত সম্রাট অর্জ্জুনের সহিত নাগরাজকন্যা বিধবা উলূপীর বিবাহ। বিধবার জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও পুনর্ব্বিবাহ এই তিনটী পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর সঙ্গে মাদ্রী সহমৃতা হন; কুন্তীদেবী পাঁচ পুত্রের লালন পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মচারিণী

থাকেন এবং তৎপুত্র অর্জ্জুন বিধবা বিবাহ করেন। একই শ্রেষ্ঠ পরিবারে ৩টী পথের দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭। বেদব্যাস কর্তৃক বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম। ৮। নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার পতিব্রতা রাণী দময়ন্তী ঘোষণা করাইয়াছিলেন—"বীর নল জীবিত আছেন কিম্বা মরিয়াছেন, তাহা দময়ন্তী জানেন না, এ কারণ তিনি সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয় পতিকে বরণ করিবেন।" (বনপর্ব্ব, মহা ভারত) ৯। শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস গোস্বামী—বিধবা নারায়ণী দেবীর গর্ভজাত।

বর্ত্তমান—যুগে ১০। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহ করেন। ১১। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন। ১২। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এর, সহিত মদন মোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। ১৩। আলিপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি এল এর বিধবা কন্যা। ১৪। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র নাগের বিধবা কন্যা। ১৫। হাইকোর্টের জজ্ ও ভাইস্ চ্যানসেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা। ১৬। বিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিধবা কন্যা। ১৭। বরিশালের গভর্ণমেণ্ট উকীল গণেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, বি, এল এর বিধবা কন্যা। ১৮। চট্ট-গ্রামের উকীল বিপিনচন্দ্র গুহের বিধবা-কন্যা ১৯। ময়মনসিংহের উকীল নিশিকান্ত ঘোষের বিধবা-কন্যা (সন্তোষের রাজার শ্যালিকা-কন্যা)-র পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত এক্ষণে শত শত দেখান যাইতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার স্থানাভাব। আর দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া শেষ করিব—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় পুত্র রথীন্দ্র নাথের সহিত শেষেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এবং নরসিংদী—ঢাকার জমিদার ও উকীল বিধবা বিবাহ প্রচারের মহাপ্রাণ কর্ম্মী ললিত মোহন রায় বি, এল এর দুইটী যোগ্য পুত্রকেই বিধবা বিবাহ দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহে বিরোধী কাহারা ?

১। (ক) যাঁহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, কামের দাস দাসী, বহু সন্তানের জনক জননী। (খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের—ঘর ভরা পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী সমন্বিত মরণ যাত্রী ভীমরতি বৃদ্ধেরদল। ২। বিধবা শিষ্যার ধন বিত্ত এমন কি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন অভিলাষী গুরুর দল। ৩। বার মাসে তের পার্ব্বণ—পূজা ব্রতাদি করাইয়া বিধবার আমরণ শোষণকামী, পুরোহিতের দল। ৪। তীর্থের পাণ্ডার দল। ৫। বিধবার স্বামী অস্থাবর ধন বিত্তের লোভী আমরণ বিনামূল্যের দাসীরূপে রাখার সুবিধাকামী দেবর ভাসুর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর দল। ৬। গ্রামের কামান্ধ পশু প্রকৃতির জমিদার ও গুণ্ডার দল। ৭। নিজেরা পুনর্ব্বিবাহের সুখ শান্তি ও সুবিধা লাভে বঞ্চিতা পরন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত পুনর্ব্বিবাহে সুখী ও সৌভাগ্যবতী বিধবাগণের প্রতি দারুণ ঈর্ষান্বিতা ও হিংসাপরায়ণা প্রৌঢ়া বিধবার দল। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ইঁহাদের স্বার্থে দারুণ আঘাত লাগার জন্যই ইঁহারা যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

১৯২১ সালের বঙ্গদেশের সেনসাস্ রিপোর্ট

প্রতিহাজার পুরুষে—কত স্ত্রীলোক আছে তাহার তালিকা—দিতেছি।

বৈষ্ণব	১১৬৭	কপালী	৯৭২
ভূমিজ	১০০৬	নমঃশূদ্র	৯৬৯
বাউরী	১০০১	হাড়ী	৯৬৮
বাগ্দী	৯৯৭	যুগী বা যোগী ...	৯৬৬
কৈবর্ত্ত	৯৮৫	বৈদ্য	৯৬৫
তাম্বুলী	৯৮০	ক্যাওরা	৯৬৩
ডোম	৯৭৫	পোদ	৯৫১
সদ্গোপ	৯৭৩	ভুঁইমালী	৯৬১

প্রতিহাজার পুরুষে—কত স্ত্রীলোক আছে তাহার তালিকা

সাহা	৯৫৩	ধোবা	৯১৪
সোণার বেণিয়া	৯৫৩	কায়স্থ	৯১১
পাটনী	৯৪৬	কলু	৯০১
কোচ	৯৪১	গন্ধবণিক	৮৯০
কুম্হার	৯৩৮	ময়রা	৮৮৪
আগুরী	৯৩৬	তাঁতি	৮৮১
শুঁড়ী	৯৩১	মুচি	৮৪৮
লোহার	৯২৮	ব্রাহ্মণ	৮৪৫
নাপিত	৯২৬	গোয়ালা	৮০৭
বারুই	৯২৫	ভূঁইয়া	৮০১
রাজবংশী	৯২৫	সোনার	৭৯৫
কামার	৯২৪	রাজপুত (ছত্রী)	৫৫৮
সূত্রধর	৯২৩	দোসাধ	৪১৭

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৩১

প্রতি সহস্র পুরুষ উপরি উক্ত সংখ্যক নারী অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না সুতরাং তাহাদের ও বিধবাদের সন্তান না হওয়ায় হিন্দু দিন দিন কমিতেছে।

৬। বাংলায় ও ভারতে বিধবার সংখ্যা

১৯২১ সালের সেন্‌সাস্‌ বা সরকারী লোক-গণনার হিসাব অনুসারে এক বৎসরের কম হইতে ২৫ বৎসর বয়সের হিন্দু-বিধবা সমগ্রভারতে ও বাংলায় কত ছিল তার হিসাব এখানে দেওয়া গেল :—

বিধবার বয়স		ভারতবর্ষ	বাংলা
জন্ম হইতে	১ বৎসর পর্য্যন্ত	৭৫৯	৪৫
১ বৎসর হইতে	২ " "	৬১২	২৫
২ " "	৩ " "	১৬০০	১২৪
৩ " "	৪ " "	৩৪৭৫	৩২৫
৪ " "	৫ " "	৮৬৯৩	৯২০
৫ " "	১০ " "	১০২২৯৩	৮৭৫১
১০ " "	১৫ " "	২৭৯১২৪	৩৬৩২৩
১৫ " "	২০ " "	৫১৭৮৯৮	৯৬৪৭০
২০ " "	২৫ " "	৯৬৬৬২৭	১৫১০৮৬
মোট ১ বৎসরের কম হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত		১৮,৮১,০৭১	২,৯৪,০৬৯

১৯২১ সালে বাংলাদেশে মোট হিন্দু দুই কোটি আট লক্ষ তন্মধ্যে হিন্দুনারীর সংখ্যা ছিল ৯৯,৫০৮২৫; ইহার মধ্যে বিধবা ছিল ২৫,২৮,৮০৩। ঐ সালে ভারতে মোট ২,১২,৫৫,৫৫৪ হিন্দুবিধবা ছিল।

৭। ভারতে বিধবা-বিবাহের প্রসার

কিরূপ দ্রুত-গতিতে ভারতে বিধবা-বিবাহের সংখ্যা বাড়িতেছে তার হিসাব জাতি হিসাবে এখানে দেওয়া হইল। এসব বিবাহের খোঁজ লাহোরের বিধবা-বিবাহ সভা পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিধবা বিবাহ হইয়াছে।

জাতি	১৯১৫-২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	মোট
ব্রাহ্মণ	২১৪	১৬৩	৩৩৮	৪৪৭	৫৭৬	৭৩৯	৫৩৩	৩০১০
ক্ষত্রিয়	২৭৯	১৮৩	২৭৩	৫০৮	৪০৫	৬২৯	৫৩১	২৮০৮
রাজপুত	৪৮	৬৩	১৪০	২০২	২৮৯	৩৬৪	৩২৪	১৪৩০
কায়স্থ	৫৩	১৯	৫৬	৭৬	১২৭	১৮৯	৩৪৯	৮৬৯
শিখ	৩৬	৬	৪৬	২৫১	২৮৫	৪০২	৩৪৩	১৩৬৯
আরোড়া	২৭৫	২৩২	৩৪৭	৫৭০	৬১৩	৩৫৭	৫৪১	২৯৩৫
আগরওয়ালা	১৬৫	১০৫	১০৮	১৮০	৩৭৭	৬৩২	৬২৬	২১৯৩
বিবিধ	১০৬	১২১	২৯৫	৪২৯	৫০০	৮৯৪	১০৯২	৩৪৩৭
মোট	১১৭৬	৮৯২	১৬০৩	২৬৬৩	৩২৭২	৪২০৬	৪৩৩৯	১৮.০৫১

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ নিতান্ত শোচনীয় দশাগ্রস্ত এবং ধ্বংসোন্মুখ। বিধবা বিবাহের প্রচলন না করিলে বহু প্রাচীন জাতির ন্যায় হিন্দু জাতিও নিশ্চয়ই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সনাতন হিন্দু জাতি মরিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এখনও বহুদিন ধরিয়া এই জাতি শান্তি ও মঙ্গল বিতরণ করিবে। তাই আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ বহু হিন্দু সাধক আজ কায়মনোবাক্যে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। কর্ম্মিগণ! মা-ভৈঃ! দৃঢ়পদে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হউন। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং ভগবান্ সত্য স্বরূপ।

সপ্তম অধ্যায়।

ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু ও তৎপ্রতিকার।

সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য্যজাতির যতই গৌরব ঘোষণা দিনরাত করি না কেন, যতই পূর্ব্বপুরুষগণের দোহাই দিয়া নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করি না কেন—হিন্দু যে দিন দিন ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইতেছে—একথা কয়জন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতঃ তন্নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কি ছিল, আর কি হইয়াছে! সে স্বাধীনতা, সে তেজবীর্য্য, সে প্রতাপ শৌর্য্য কিছুই নাই; সে উদারতা সে সাম্যবোধ সে স্বজাতিপ্রিয়তা—সে জীবের মধ্যে শিব দর্শন, সে মমত্ব বুদ্ধি কিছুই নাই। আর্য্য-হিন্দুজাতি-অধ্যুষিত হিন্দুস্থান আজ পরাধীন,—হিন্দুজাতি আজ পর-পদানত। জন্মগত জাতিভেদের মিথ্যা অভিমান অহঙ্কার এবং তাহারই বিষময় ফলস্বরূপ অস্পৃশ্যতা—এই দুই মহাপাপ হিন্দুকে ধ্বংস ও অধঃপতনের চরম সীমায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে! সমান ভাবে নর ও নারী পীড়ন, হিন্দুজাতিকে ডুবাইবার

প্রধান মূলীভূত কারণ। নরনারায়ণ ও নারীলক্ষ্মী নিগ্রহের অপরাধেই হিন্দুজাতির এই সর্ব্বনাশ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতেই এই জাতি-হিংসা—এই নারী-নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষি ও মহা মনীষী সমাজপতিগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সাম্রাজ্যমদগর্ব্বী ক্ষত্রিয় রাজন্য এবং ধন-মদান্ধ বৈশ্যগণের অহঙ্কার ও স্বার্থপরতায় দারুণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য জোরে কলম ধরিয়া সংহিতার পর সংহিতা শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া সমুদয় অব্রাহ্মণ দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই উচ্চ তিন বর্ণের স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও ঘৃণার বিষময় ফল আমরা গত সপ্তশত বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছি। বিনা কারণে কার্য্য এবং বিনা পাপে সাজা ভোগ হয় না। পাপ ও অপরাধ, অত্যাচার ও অবিচারের ফল ফলিবেই ফলিবে দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ। তাই পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতাপরাধের ফল আমরা ভুগিতেছি; পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছি। হিন্দুজাতির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। মুসলমান আগমনের সময়ে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, * আর আজ—আজ মাত্র ২৩ কোটি।

---

* স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন—মুসলমানেরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল, তখন হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটী। এটা অবশ্য আমার কথা নয়, মুসলমানদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ঐতিহাসিক 'ফেরিস্তাই' একথা বলেছেন। কিন্তু আজকে হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে বিশ কোটিতে। আর কেবল এ হলেও দুঃখ ছিল না; প্রত্যেকটী হিন্দু যখন হিন্দুত্বের বাইরে চলে যায়—শুধু যে একজন হিন্দুই কমে যায় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর একজন শত্রুও বেড়ে উঠে। 'শুদ্ধি সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ অনুবাদ এপ্রিল ১৮৯৯, প্রবুদ্ধ ভারত।

* প্রাচীনকালে হিন্দুরা সংখ্যায় ছিল ৬০ কোটি কিন্তু বর্ত্তমানকালে বৈদেশিক আক্রমণ সমূহের ফলে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২২ কোটী। পুণা হিন্দু যুবক সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি, এ, গাদকারীর অভিভাষণ। ৩০শে জুলাই ১৯২৮, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৭ শ্রাবণ ১৩৩৫।

আর মুসলমান! যেদেশের নাম ছিল হিন্দুস্থান, সেই মাত্র হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে আজ তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সপ্ত কোটি। ইহারা কি সকলে বিদেশাগত? না না, ইহাদের ১৫ আনাই ছিল—হিন্দু,—আমাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী, ভাই, আত্মীয়—স্বজন, জ্ঞাতি—স্বগোত্রীয়।

মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে মাত্র ১ লক্ষ মুসলমান সৈন্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আইসে। পুনঃ পুনঃ পৃথীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অর্দ্ধেকেরও বেশী নিহত হয়। অবশিষ্ট ৪০।৫০ হাজার মাত্র সৈন্য থাকে। ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় সঙ্গে নারী আইসে নাই। হিন্দু নারীর সাহায্যেই তাহাদের বংশ ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেদিন হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে আসল মুসলমান প্রায় চল্লিশ হাজার † ছিল এবং বাকী যাহা সব দেখা যায় তাহা ভারতবর্ষেরই হিন্দু, পরে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মুসলমান হইতে আজ কোটী কোটী মুসলমান হইয়াছে তাহার মূল কারণও ঐ। উচ্চবর্ণ হইতে মুসলমান খুব কমই হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমান এবং খৃষ্টান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। আজ ও

---

† রাজমহল হইতে বঙ্গবাণীর নিজস্ব সংবাদ দাতা ২৬ শে মে (১৯৩১) তারিখে লিখিয়াছেন—গত রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্তরাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আবদুল বারি এখানে আসিয়া এক বিরাট জন সভায় বক্তৃতা দান করেন। * * * অতঃপর মৌলানা আবদুল বারি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে প্রকাশ করেন যে, মুসলমানগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন,—তাঁহারা আট হাজারের বেশী ছিলেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা তখন নির্ভয়ে ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা সংখ্যায় আট কোটি হইয়াও, হিন্দুদের ভয়ে সর্ব্ব বিষয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চাহেন, ইহা ভীত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বঙ্গবাণী, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

যে ভারতবর্ষে মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সমাজের কুপ্রথাই তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।" (১) ২৩শে মে ১৯২৬ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য আরার হিন্দু সংগঠন বক্তৃতায় বলেন—"ভারতে ২৩ কোটী হিন্দু ও ৭ কোটী মুসলমান এই সাত কোটী মুসলমানের মধ্যে এমন কি এক লক্ষও খাঁটি মুসলমানের বংশধর নাই। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন এবং পরে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।" (২) বিহারের কথা ধরা যাউক। "এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই এত অল্প পরিমাণ স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নবাব সমসুদ্দীনের সময় সমস্ত বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে চৌত্রিশ হাজারের অধিক মুসলমান ছিল না (বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস)।" (৩) ১৯২১ সনে বাঙ্গালায় মুসলমান ২,৫৪,৮৬,১২৪। আর বিহার উড়িষ্যায় ৩৬,৯০১৮২ জন; বিহারে যদি ইহার অর্দ্ধেক ধরা যায় তবে হয় ১৮,৪৫,০৯১ তার সঙ্গে বাঙ্গালার মুসলমান যোগ দিলে হয় মোট ২,৭৩,৩১,২১৫। কোথায় চৌত্রিশ হাজার, আর বাড়িয়া হইল প্রায় পৌণে তিন কোটী। সম্রাট আকবরের সময় এই হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে প্রতি সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান ছিল, অর্থাৎ তখন মুসলমান মাত্র ৬ লক্ষ ছিল—এখন তাহার শতগুণ বাড়িয়া ৬ কোটির উপর হইয়াছে। তখন ছিল প্রতি সহস্রে একজন এক্ষণে প্রতি তিন জনে একজন মুসলমান। আর বাঙ্গালায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অর্দ্ধ ক্রোড়ের মত বেশী; উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে গড়ে প্রায় ৩ ভাগের দুই ভাগই মুসলমান। পাটনা হিন্দু সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে অভিভাষণে বলিয়াছেন:—"খ্রীষ্টীয়

(১) দৈনিক হিন্দুস্থান।

(২) হিন্দুস্থান ২০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

(৩) ভাগবত চন্দ্র দাশ দেববর্ম্মা বি, এল প্রণীত নারী মঙ্গল ৪৭

১০২০ অব্দ পর্য্যন্ত আফগান রাজ্য ও বেলুচিস্থানে হিন্দুরাই বসবাস করিতেন। কাবুল ও কান্দাহারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই কান্দাহার বা গান্ধার রাজকন্যার সহিত ভারত সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল—এক্ষণে সেই হিন্দুরাজ্য মোস্‌লেম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।"

"ভারতে মুসলমানদিগের মধ্যে ইরাণী তুরাণীদিগের বংশধর অনেকে আছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মুসলমান যে এই দেশেরই অধিবাসী যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করিবার যে কোন উপায় নাই।" অধ্যাপক খোদাবক্স গত বৎসর "বেঙ্গলীতে" একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এ দেশের মুসলমানদিগের মনে একটা সংস্কার আছে যে তাহারা বিদেশ হইতে এই দেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, এই সংস্কার ভ্রান্ত; ইতিহাস দ্বারা ইহার সমর্থন করা যায় না।

অল্পদিন পূর্ব্বেই মস্‌লেম লিগের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহারই মত পদস্থ আর একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বলিয়াছিলেন—"হিন্দুদিগের ধমনীতে যেরূপ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শোণিত প্রবাহিত, মুসলমানদিগের ধমনীতেও সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শোণিত প্রবাহিত। সুতরাং এদেশের হিন্দু এবং প্রায় সমস্ত মুসলমান একই বংশ সম্ভূত এই সত্য সুশিক্ষিত এবং অভিজাত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃত।" (১) ঠিক্ এই একই উক্তি বঙ্গ-বিখ্যাত বাগ্মী অসাধারণ লেখক ও তেজস্বী, নিগৃহীত দেশভক্ত সিরাজগঞ্জের মৌলানা ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের মুখে আমরা বহুদিন শুনিয়াছি। "বাঙ্গলার মোছলমান সমাজের এক ক্ষুদ্র নগণ্য অংশ যে অনার্য্য তথা কথিত অস্পৃশ্য জাতি হইতে উদ্ভূত

(১) অভিভাষণে অজ্ঞতা প্রকাশ—হিতবাদী ২৩শে পৌষ ১৩৩২।

তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে যে, বিদেশাগতদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্টের অধিকাংশ মোছলমানই উচ্চবর্ণের হিন্দু হইতে উৎপন্ন।" (১) পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে ভূতপূর্ব্ব মোঃম্মদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আক্রাম খাঁ সাহেব পীড়ালী ব্রাহ্মণভুক্ত এবং ৪ পুরুষ হইল মুসলমান ধর্ম্মান্তরিত।

ইংরাজ ঐতিহাসিক ও লেখকগণও এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন। "ভারতের মুসলমানের সংখ্যা ৬ কোটির কিঞ্চিৎ অধিক। স্যার এড্‌ওয়ার্ড গেট, মিঃ টমসন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে ইহাদের শতকরা ১৬ জনের মধ্যেও খাঁটি বিদেশাগতের রক্ত নাই।" (২) এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অভিধানে সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত বঙ্গীয় সমাজতত্ত্বে দৃষ্ট হয় যে, "এই বঙ্গের আনুমানিক ৪ ভাগের ৩ ভাগ মুসলমান জাত্যন্তরিত হিন্দু।" ১২৯১ সনের বঙ্গদেশীয় রিপোর্টে রিজ্‌লী সাহেব লিখিয়াছেন যে, এক বঙ্গদেশেই ৯০ লক্ষ পোদ ও নমঃশূদ্র মুসলমান হইয়া গিয়াছে। (৩) "হিন্দুদিগের জঘন্য জাতিভেদ বর্ণভেদ সম্প্রদায়ভেদ ও শ্রেণীভেদ যে মণিমাণিক্য ভূষিতা স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতকে যুগের পর যুগ বৈদেশিক আততায়িগণের লুণ্ঠন নিপীড়নে—কোটী কোটী নির্য্যাতিত দলিত অবহেলিত অনাদৃত অবজ্ঞাত হিন্দু নরনারীকে ইস্‌লামের সাম্য পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে"—তাহা কয়জন মনস্বী হিন্দু হৃদয় দ্বারা অনুভব করিয়া মর্ম্ম বেদনায় ব্যথিত হইতেছেন? পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ প্রণেতা মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনাথ করণ লিখিয়াছেন:—"সামাজিক অনুদারতা ও স্বার্থপরতার নিপীড়নে বিশাল পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের

(১) মোহাম্মদী ৮ই মাঘ ১৩৩২।

(২) হিন্দু সঙ্ঘ ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

(৩) গৌড়ের ইতিহাস ও দ্রষ্টব্য।

খাম-খেয়াল তন্ত্রের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টার লিখিয়াছেন—"শেখ মুসলমানগণ সমস্তই প্রাগুক্ত দুই জাতির বংশধর। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দেড় কোটী মুসলমানের অধিকাংশ এই দুই জাতি হইতে মুসলমান ধর্ম্মে আগত! প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুসলমানের মধ্যেও এই জাতিদ্বয়ে দীক্ষিত সংখ্যা অল্প নহে।" (১) দুই জাতি—নমশূদ্র ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।

মুসলমান বাঙ্গালীদের বংশ পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে মার্চ্চ মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় একজন লোক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ইংরাজ লেখকদিগের গ্রন্থ হইতে যে সকল মত ও তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে "অধিকাংশ মুসলমান বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষ" অন্যবাঙ্গালীদের মত এই দেশেরই মানুষ ছিলেন, বিদেশী মানুষ ছিলেন না। * * * মুসলমান বাঙ্গালীদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে যে হিন্দু সমাজত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে যাইতে হইয়াছিল, ইহা বরং হিন্দু সমাজের পক্ষেই অগৌরবের বিষয়। সামাজিক অবজ্ঞা ও উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক হিন্দু অতীত যুগে মুসলমান হইয়া থাকিবেন। ইহা তাৎকালিক হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। কেহ কেহ ধন

(১) "The Namasudras aggregate about 18, 61, 000, and the Pods nearly half a million; but the full large numbers have been converted to Mahomedanism and now called themselves Seikh. There are ten and a half millions of Mahomedans in the Dacca and Chittagang Divisions, and it has been shown that the great majority of these are the descendants of converts from the ranks of these two castes. There must also be many converts of the same origin in the Southern districts of the Presidency Division. It would probably be safe to say that at least nine millions of the Mahomedans of Bengal proper belong to this Stock."

The Census Report of Bengal page 396.

মান উচ্চপদের প্রলোভনেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে। ইহাও নিন্দনীয়। অনেকে প্রাণ ভয়ে বা অন্য কোন বিপদের ভয়েও মুসলমান হইয়া থাকিবে। ইহার দ্বারা হিন্দু সমাজের নিজের লোকদিগকে সাহসী করিবার এবং রক্ষা করিবার ক্ষমতার অভাব সূচিত হয়। ধর্ম্মের আকর্ষণেও কেহ কেহ মুসলমান হইয়া থাকিবেন। হিন্দু শাস্ত্রে অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশের অভাব নাই। হিন্দু সমাজের নেতারা এই সকল উপদেশকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বরাবর দিয়া আসিলে এবং তৎসমুদয়ের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিলে কোন হিন্দুকেই ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় লইতে হইত না।" (১)

বিগত ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার (১৩৩২ সন) বড় বাজার শ্রীমাহেশ্বরী বিদ্যালয়ে হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বলেন—ভারতের ৭ কোটী মুসলমানের অধিকাংশই জাতিচ্যুত হিন্দু। (২) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বোম্বাই হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে মাড়োয়ারী বিদ্যালয়ে "হিন্দুসংগঠন ও শুদ্ধি," সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেন—যে, ১৯১১ সালে কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি একখানি পুস্তকে দেখান যে হিন্দুজাতি দিন দিনই ধ্বংস হইতেছে এবং যে অনুপাতে হিন্দুর ধ্বংস হইতেছে সেই অনুপাতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বাড়িতেছে এবং যদি এই ভাবে হিন্দুরা ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে, তবে ৪২০ বৎসরে সমস্ত ভারত হিন্দুশূন্য হইয়া পড়িবে। * * * ভারতে প্রায় ৭ কোটী মুসলমান ও ৭০ লক্ষ খ্রীষ্টান আছে। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল। ইহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াই মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রথম অধিবেশনে (১৯ জ্যৈষ্ঠ

(১) সম্পাদক—বিবিধ প্রসঙ্গ—মুসলমান বাঙ্গালীদের বংশ পরিচয়। চৈত্র প্রবাসী ১৩৩১।

(২) হিন্দুসংগঠনে পণ্ডিত মালব্য—হিতবাদী ১১ই বৈশাখ ১৩৩২।

সোমবার ১৩৩১) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—১৮৮১ সালে হিন্দুর সংখ্যা ভারতে ছিল শতকরা ৭৪, ১৯১১ সালে ৬৯, এবং ১৯২১ সালে ৬৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশেই মুসলমান ধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গের মুসলমান সংখ্যা ২ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮৬ হাজার অর্থাৎ ভারতের সমগ্র মুসলমান সংখ্যার শতকরা ৩৬ জনই বঙ্গদেশবাসী। ইহার কারণ, এক কথায় বলা যায়—উচ্চশ্রেণী হিন্দুর নিম্ন শ্রেণীর প্রতি অত্যাচার। আবার অনেক সময়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দুই হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে কালিকটের হিন্দুরাজা জমরিন স্বীয় নৌবহরের খালাসী করিবার জন্য হিন্দুদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন, কারণ হিন্দুরা অজ্ঞতা বশতঃ কালাপানি পার হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনে করিয়া জাহাজে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়।"

"এদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে অন্ততঃ ১৫ আনা লোক এ দেশীয় লোকেরই বংশধর। যে সমস্ত আফগান, আরব ইরানি ও তুর্কি এদেশের বিজেতারূপে আসিয়াছিলেন, এক পঞ্জাব ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে তাঁহাদের বংশধরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পঞ্জাবেও বিদেশীর বংশধরদের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের অধিক হইবে না। বাঙ্গলা দেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী মুসলমান হইলেও বোধ করি শতকরা ১ জনের শরীরেও পূরা বিদেশী রক্ত নাই।" (১) উক্ত উপেন্দ্রবাবু পরে লিখিতেছেন—"ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের বেশী একেবারে খাঁটি এদেশী লোক।" (২) স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"এখন ত দেখিতে পাই বাঙ্গলার অনেক লোক মুসলমান। ইহার

(১) উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিত আত্মশক্তি ১১ই বৈশাখ ১ম বর্ষ, ২য় সং ১৩৩৩।

(২) ঐ, আত্মশক্তি ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৩।

অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেননা ইহারা অধিকাংশই যে নিম্ন শ্রেণীর লোক—কৃষিজীবি। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবি হইবে, আর প্রজা (হিন্দু)র বংশাবলী উচ্চশ্রেণী ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে—ইহাও সিদ্ধ।"

সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু দ্রুত ধ্বংস হইতেছে। ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ হিন্দু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। (৩) আর ১৯১১—১৯২১ এই দশ বৎসরে হিন্দু কমিয়াছে—১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩২৩ জন। সমাজপতি ব্রাহ্মণ কমিয়াছে—৩,৪৩,৭১৭ জন। (৪) আর মুসলমান বাড়িয়াছে এই দশ বৎসরে ২০ লক্ষ, এবং খৃষ্টান বাড়িয়াছে—১০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বৎসর ২ লক্ষ করিয়া মুসলমান ও ১ লক্ষ করিয়া খৃষ্টান বাড়িতেছে—এবং ১ লক্ষের উপর হিন্দু ক্ষয় হইতেছে। এই ১০ লক্ষ খৃষ্টানের মধ্যে হিন্দু জাত্ দিয়া খৃষ্টান হইয়াছে ৭ লক্ষ।

বাঙ্গালী পাঠক—এইবার চলুন বাঙ্গলার দিকে, দেখিবেন বাঙ্গলার হিন্দু কি শোচনীয় ধ্বংসাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার হিন্দু ছিল ১ কোটী ৭১ লক্ষ, আর মুসলমান ছিল ১ কোটী ৬৭ লক্ষ—মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী ছিল। (৫) আর ১৯২১ সালে দাঁড়াইল মুসলমান ২ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ১২৪ এবং হিন্দু ২ কোটী

(৩) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ।

(৪) দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি, ৫ নং সমবায় ম্যানসন। ২৯শে শ্রাবণ শনিবার হিন্দু সঙ্ঘ।

(৫) এক কোটী ৬৭ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দেড় কোটী জাতিচ্যুত পোদ ও নমঃশূদ্র বাদ দিলে থাকে মাত্র ১৭ লক্ষ মুসলমান। এর মধ্যে শেখ মুসলমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের চব্বিশ পরগণা নদীয়া খুলনা, যশোহর মুর্শিদাবাদ জেলার জাতিচ্যুত পোদ ও নমঃশূদ্র বাদ দিলে মোগল পাঠান আরব পারস্য

৮ লক্ষ ৯ হাজার ১৪৮। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী এই অনুপাতে হিন্দুর হওয়া উচিত ছিল (২ কোটী ৫৪ লক্ষ মুসলমান+৪ লক্ষ হিন্দু বেশী ছিল=২ কোটী ৫৮ লক্ষ) ২ কোটী ৫৮ লক্ষ। সে স্থানে হিন্দু ৫০ লক্ষ কমিয়া হইয়াছে ২ কোটী ৮ লক্ষ ; এবং মুসলমান ১ কোটী ৬৭ লক্ষ স্থলে বাড়িয়া হইয়াছে ২ কোটী ৫৪ লক্ষ। ৫০ বৎসর আগে হিন্দু ছিল মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ বেশী বিগত ৫০ বৎসরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৪৬,৭৬,৯৭৬ জন বাড়িয়াছে। ১৯২১ সালে হিন্দু ২.৮,০৯.১৭৮ জন। ১৯১১ সালে হিন্দু ছিল ২,০৯,৪৫,৩৭৯ জন অর্থাৎ গত দশ বৎসরে হিন্দু কমিয়া গিয়াছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩১ জন এবং মুসলমান বাড়িয়াছে—১২,৮৭,২৬২ জন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৭০ জন হিন্দু ও ৩০ জন মাত্র মুসলমান ছিল—, আর ৫০ বৎসর পরে বর্ত্তমানে হিন্দু শতকরা ৪৫ জন ও মুসলমান ৫৫। পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮১ খৃঃ হিন্দু ছিল ৫৬,৭৩,৭১৫ আর ১৯২১ সালে হইয়াছে ৪৯,৩৭,২৭১ ; ৭,৩৬,৪৭৪ জন কমিয়া গিয়াছে ; মুসলমান ১৮৮১ সালে ছিল ৮৫,৪১, ৪০৬ জন, ১৯২১ সালে হইয়াছে ১,২৭,৬৭,৮৯০ অর্থাৎ ৪০ বৎসরে বাড়িয়াছে মোট ৪২,২৬,৪৮৪ জন।

১৯১১—১৯২১ সন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে হাজার করা হিন্দু কমিয়াছে ৪ জন ; আর মুসলমান বাড়িয়াছে ৫১ জন। এই অনুপাতে হিন্দু কমিতে ও মুসলমান খৃষ্টান বাড়িতে থাকিলে হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ আফগানিস্থান বা তুর্কিস্থানে পরিণত হইতে আর কত বিলম্ব হইবে ?

তাতার তুরস্কের বংশধর কয়জন থাকে। অপিচ বাংলার অবজ্ঞাত দলিত, সর্ব্বাধিকার বঞ্চিত প্রায় ২০টা জাতির মধ্যে পোদ ও নমঃশূদ্রই যদি ধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া ১ কোটী ৬৭ লক্ষ হয় তবে অবশিষ্ট ১৮টী জাতির ধর্ম্মান্তরিত বংশধর গণের হিসাব কোথায়। একারণ বলা যায় বাঙ্গলায় সব মুসলমানই জাতি ধর্ম্মমতে হিন্দু।

এইবার পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির উল্লেখ করিয়া অধ্যায় শেষ করিব। মালদহের অধিবাসীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার, হিন্দু ৪ লক্ষ; দিনাজপুর ১৭ লক্ষ হিন্দু ৭॥ লক্ষ, রংপুর ২৫ লক্ষ—হিন্দু প্রায় ৮ লক্ষ; পাবনা ১৩—৮৯ হাজার, হিন্দু ৩—৩৪ হাজার; রাজসাহী ১৪—৮৯ হাজার, হিন্দু ৩—১৮ হাজার; বগুড়া ১০॥ লক্ষ—হিন্দু পৌণে ২ লক্ষ; ময়মনসিংহ ৪৮ লক্ষ, হিন্দু ১১—৭৪ হাজার; ঢাকা ৩১॥ লক্ষ, হিন্দু ১০॥ লক্ষ; বরিশাল ২৬।০ লক্ষ, হিন্দু ৭।।০ লক্ষ; চট্টগ্রাম ১৬ লক্ষ, হিন্দু ৩—৬৩ হাজার; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পৌনে ২ লক্ষ হিন্দু ৩১৷৷০ হাজার; নোয়াখালি পৌনে ১৫ লক্ষ হিন্দু ৩—২৯ হাজার; মুর্শিদাবাদ ১২—৬২ হাজার হিন্দু ৫—৬৮ হাজার; নদীয়া ১৪—৮৭ হাজার, হিন্দু ৫—৮১ হাজার; ফরিদপুর ২২৷৷০ লক্ষ হিন্দু ৮—১৫ হাজার; শ্রীহট্ট প্রায় ২৫৷৷০ লক্ষ, হিন্দু ১১ লক্ষ; শিলচর ২৷৷০ লক্ষ হিন্দু ১ লক্ষ…। (১৯২১ সালের সেন্সাস্) অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন—যে ৬০ কোটি হিন্দুর সাত শত বৎসরে ৩৭ কোটি ক্ষয় হওয়া অসম্ভব! তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বাঙ্গলার কতিপয় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের হিন্দুক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। আমার জন্মভূমি পাবনা জেলার ২২২৩ গ্রামের মধ্যে ১০১ গ্রামে মাত্র হিন্দু আর ২১২২ গ্রামের অধিবাসীগণ সকলেই মুসলমান (১)। অন্যান্য

(১) "একতাড়াশ থানায় ১৩০১ সনে ১। সদ্গুণা গ্রামে হিন্দু ছিল ১৩০ ঘর, ১৩৩৫ সনে ১৭ ঘর ২। ঘরগাঁও ৫২—৫, ৩। নবগ্রাম ৫৭—০, ৪। মাধাই নগর ৩২—১২, ৫। নিম- গাছি ৫২—৩, ৬। গুড়্পিপুল ৫—০, ৭। তালম ১১০—০।" — (পাবনা জেলায় লোকক্ষয়—স্বরাজ, প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৫)

পাবনা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী রহিমপুর গ্রামে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ১৪০৫ হিন্দু একণে টেকে মাত্র ৭৫ জন। ব্রাহ্মণ ৫০ স্থলে ০, কায়স্থ ৫০০ স্থানে ৫, সাহা ৪০০—২৫, ভুইমালী ৩০—০, জেলে ২০০—২০, বুনো ১০০—২৫, কৈবর্ত্ত দাস ১২৫—৭ জন মাত্র ("পাবনায় হিন্দু কি নিশ্চিহ্ন হইবে?" স্বরাজ)

জেলার অবস্থাও এইরূপই শোচনীয়। মেদিনীপুরের অবস্থা শুনুন—সেখানেও দ্রুত হিন্দু ক্ষয় হইতেছে (২)। বাঙ্গলার অবতার—ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নদীয়া জেলার অবস্থা হিন্দুর পক্ষে ভীষণ ও শোচনীয়। তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মভূমি, প্রেম প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র নদীয়া জেলার ১৪,৮৭,৭৫২ জনের মধ্যে ৯,০৫,৯৮৯ জনই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু অবশিষ্ট আছে মাত্র ৫,৮১,৭৬৩ জন (১৯২১ সেন্সাস্) (৩)। সসাগরা ধরিত্রী শাসনকারী পৃথিবীর সম্রাট আজ স্বদেশেও পরাধীন। হিন্দু, তোমার চৈতন্য ও জ্ঞানোদয় কবে হইবে? কবে তোমার প্রাণ মন আত্মাবমাননার ব্যথা বেদনায় ভরিয়া উঠিবে—আত্মাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কবে তুমি অগ্রসর হইবে? কুমারী সধবা বিধবা নির্ব্বিশেষে কোটি কোটি নারী ও অগণ্য মানব নির্য্যাতনের পাপেই তোমাদের এই না দুর্দ্দশা! সামান্য ২ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্রটীও অপরাধ ধরিয়া এই সব কন্যা ভগিনী ও মা লক্ষ্মীগণকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছ, তাহারা বাধ্য ও অনন্যগতি হইয়া বিধর্ম্মীগণের অঙ্কশায়িনী হইয়া কোটি কোটি অহিন্দু সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের ক্রোধ ক্ষোভ, মর্ম্মদাহী বেদনা অভিমান হিংসা দ্বেষ সন্তান সন্ততিগণে সংক্রামিত হইয়া আজ হিন্দু ধ্বংসে সহায়তা করিতেছে। হিন্দু দ্বারা গর্ভবতী বিধবা

(২) চন্দ্রকোণায় (মেদিনীপুর) ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৮,০০০ হাজারেরও অধিক আর ১৯২১ সালে ৫ হাজারের কিছু বেশী টেকে। তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছে। স্বর্ণের কারিগর আর নাই বলিলেই চলে। রায়পুর (বীরভূম) ১৮০০ শত ঘর লোক ছিল; এখন আছে মাত্র ৬০০ শত ঘর। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ইংরাজ শাসনকেই এজন্য দায়ী করেন।"

(৩) (বাঙ্গলার কথা ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) নদীয়া জেলান্তর্গত উলা বা বীরনগরের লোকক্ষয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—"এককালে লোকসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার, এক্ষণে মাত্র দুই হাজার অবশিষ্ট আছে।"

হিন্দু আত্মীয় স্বজন পিতামাতা ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও গৃহ বহিষ্কৃতা হইয়া—ক্রোধে ক্ষোভে হিংসা বিষে জর্জ্জরিত কাল নাগিনী হইয়া বিধর্ম্মীর অঙ্কশায়িনী হইয়া কাল-সর্প-স্বরূপ সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং স্তন্য দুগ্ধ দানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষ—হিন্দু ধ্বংস-বিষ তাহাদিগের রক্তে-মাংসে মেদ-অস্থিতে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। একটি ছেলে কিম্বা মেয়ে ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজ ত্যাগ করিলে ১ জন হিন্দুই যে কমিয়া যায় তাহা নহে পরন্তু সে বিবাহ করিয়া ৯।১০টী সন্তান জন্ম দিয়া ১০।১১টী বিধর্ম্মী সৃষ্টি করে ও বাড়াইয়া দেয়। হিন্দু কমে একটি আর বিধর্ম্মী বাড়ে ১০।১১টী। এইরূপ ভাবে একটি দুইটী, এক শত দুই শত, এক সহস্র দুই সহস্র করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া দেব-ঋষির পবিত্র লীলা স্থল—তপঃক্ষেত্র হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে কোটি কোটি অহিন্দুর সৃষ্টি হইয়াছে,—আমরাই সৃষ্টি করিয়া—এখন "স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি।" তাহাদিগকে বা অন্যকে দোষ দেওয়া বৃথা। ইহারা আমাদিগেরই ঘৃণা অবজ্ঞা রোপিত ও সযত্ন পরিবর্দ্ধিত বিষ বৃক্ষেরই বিষময় ফল। দর্পণে যেমনটী দেখাইয়াছ তেমনই দেখিতেছ ; বিদ্বেষের বিনিময়ে প্রেম, অবিচারের বিনিময়ে সুবিচার, অত্যাচারের বিনিময়ে ভালবাসা—ভাল আচরণ আশা করিতে পার কি ? তাহা পার না।

উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণে গর্ব্বিত হিন্দু! কোটি কোটি নর নারীর মনুষ্যত্ব ধ্বংস ও অপহরণ কারী সমাজ পতি! দুই পা দিয়া নির্ম্মম ভাবে দলিত লাঞ্ছিত উৎপীড়িত অবজ্ঞাত এই সব ঘৃণিত শূদ্র আখ্যাত হিন্দু—দলে ২ গ্রামকে গ্রাম মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে ইহারা হিন্দু ছিল সে কেবল মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম না আসার কারণ। এতকাল অন্য কোথাও আশ্রয় লইবার—অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সুযোগ সুবিধা ছিল না জন্যই উহারা হিন্দু ছিল। হিন্দু না থাকিয়া অন্য কিছু হইবার উপায় ছিল না। যেই ইহারা আশ্রয় ও অবলম্বন পাইল—অমনি দলে দলে

অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্য—ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সব লক্ষ লক্ষ দলিত হিন্দু দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম্ম জৈন ধর্ম্ম শিখ ধর্ম্ম ও ইদানীং মুসলমান এবং খৃষ্টধর্ম্ম পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এমন করিয়া আত্ম হত্যা, আত্মীয় হত্যা—ভাই ভগ্নী ত্যাগ কেহ কোন দেশে কোন যুগে করে নাই—যেমন তোমরা করিয়াছ। বিরাট বিশাল শক্তিশালী বলিষ্ঠ জাতিকে কাটিয়া কাটিয়া সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছ—খণ্ডিত দেহ অস্থি হাত পায়ের কি কখন বল থাকিতে পারে। হিন্দুজাতি আজ শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন আছে। অন্যকে ঘৃণা করিয়া তোমরা আজ সাড়া বিশ্বের ঘৃণিত—দাস হইয়া দাঁড়াইয়াছ। অন্য ভাইকে শূদ্র ছোট হীন করিতে গিয়া তোমরা নিজেরাই এখন দাস শূদ্র অধম হীন হইয়া পড়িয়াছ—সাম্রাজ্যের "পরিয়া" হইয়াছ, জগতের স্বাধীন শিরোন্নত জাতিদের দরবারে তোমার স্থান নাই "প্রবেশ নিষেধের সাইন বোর্ড" তোমার দাস—ললাটে লিখিয়া দিয়াছে। তবু তোমার দুঃখ জ্বালা আত্মগ্লানি নাই—কৃত পাপের জন্য অনুমাত্র অনুশোচনা নাই। মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ এই সব তথাকথিত শূদ্রগণকে স্পর্শ করে নাই—দীক্ষা দেয় নাই, যাজনিক ক্রিয়া বা পৌরহিত্য করে নাই।

শুধু কি নিজেরাই অত্যাচার করিয়াছ? না, না; নিজেরাও করিয়াছ এবং অন্যের দ্বারাও অত্যাচার চালাইয়াছ। বহু জাতিকে ধোপা নাপিত বেহারা দাও নাই, নৌকারোহণে অনধিকারী করিয়াছ। আজো পর্য্যন্ত সে অবিচার অত্যাচারের শেষ হয় নাই। অবিরাম গতিতে—নিশ্চিন্ত চিত্তে সে অত্যাচার—সে জাতিধর্ম্ম মনুষ্যত্বের অপমান—চালাইতেছ। সুস্বাদু-সলিল-রাশিপূর্ণ-স্বচ্ছ-তোয়া সুশীতল সরোবর সম্মুখে থাকিলেও তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জল পান করিতে দাও নাই। বেদবেদান্ত গীতা ভাগবত স্মৃতিসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিতে, ওঁকার

উচ্চারণে গায়ত্রী পাঠে,—তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্ব থাকিলেও—উহার পূজার্চ্চনায় দেবমন্দির প্রবেশে শূদ্র নাম দিয়া কোটি কোটি নরনারীকে বঞ্চিত করিয়াছ। অধম পতিত অনাথ দীনগণকে অধম তারণ, পতিতপাবন অনাথশরণ দীনদয়াময় জগৎ পিতা শ্রীভগবান্ ও জগজ্জননী ভগবতীর চরণ সমীপে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দাও নাই। হাঁসপাতাল কিম্বা বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া কেহ যদি উহার গায়ে সাইনবোর্ড লিখিয়া দেয়—যে এখানে ব্যাধিগ্রস্ত রোগী কিম্বা বিদ্যাহীন মূর্খের প্রবেশ নিষেধ,—তাহা যেমন অদ্ভুত শোনায়,—পতিত অধমগণের জন্য পতিতপাবন ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ও অজ্ঞানের জন্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে নিষেধ করাও কি সেইরূপ পাগ্‌লামী নয়? (১) নমঃশূদ্র, মালী, হাজঙ্গ, ঢুলী, কোদ্‌মা, ধাত্রী হাড়ী, দোষাদ, গোলাম, প্রভৃতি গো সেবক বিষ্ণু উপাসক—সংকীর্ত্তনকারী, মালা তিলকধারী স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের কাজ ধোপা নাপিত বেহারাগণ করে না। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় ইহারা যে মুহূর্ত্তে মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যায় সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ধোপা নাপিত বেহারাগণ ইহাদের কাজ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু থাকিতে যে নাপিত ইহাদের মাথায় হাত দিয়া মাথার চুল কাটে নাই, তাহারা

---

(১) ধরার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব সন্তান দেবমন্দির প্রবেশে অনধিকারী, কিন্তু বেজি বিড়াল ছাগ মহিষ অধিকারী, অস্পৃশ্য হিন্দুর আনীত বলিদানার্থ মানতের ছাগকে স্নান করাইয়া পুরোহিত মন্দিরের মধ্যে দেবীর সম্মুখে লইয়া যান; কিন্তু যিনি ছাগ আনিলেন—সেই ছাগের মালিককে শূদ্র বা অস্পৃশ্য হিন্দু বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। মা কালী বা ভগবতী অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য হিন্দু সন্তানের জল সন্দেশ খান না কিন্তু ছাগ মেষ মহিষের রক্তমাংস খান। ব্রাহ্মণগণ মৎস্য ও ছাগ মেষের মাংস খান কিন্তু অনাচরণীয় জাতিগণের জল সন্দেশ খান না। মানুষ অপেক্ষা দেবতা ও সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের কাছে—ছাগ মেষ মহিষাদি পশুও শ্রেষ্ঠ, পবিত্র সম্মান ও আদরের পাত্র!! হায় ব্রাহ্মণ! মানব ঘৃণা, স্বজাতি বিদ্বেষ ও উচ্চ জাতিত্বের গর্ব্ব তোমাকে কত দূর না অন্ধ বিচারহীন করিয়াছে।

মুসলমান ও খৃষ্টান হওয়া মাত্র পায়ে হাত দিয়া পায়ের নখ কাটিতে আর জাত যাওয়ার ভয় করে না। যতক্ষণ তাহারা হিন্দু, গো-বিপ্র নারায়ণ-শীলা-রক্ষক, রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ উপাসক, ততক্ষণই তাহারা সমাজের সকলের নিকট ঘৃণার্হ অস্পৃশ্য পতিত অশুদ্ধ কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান হওয়া মাত্র তাহারা পবিত্র শুদ্ধ উচ্চ ও ব্যবহার্য্য হইয়া যায়। এই সব ভীষণ অবিচার ও অত্যাচারের ফলেই ভারতে সপ্তকোটি মুসলমান, ৭০ লক্ষ খৃষ্টান এবং বঙ্গে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ মুসলমানের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। এই সব কোটি কোটি দলিত নর-নারী যে কেবল অত্যাচারী উচ্চ জাতিগণ কর্ত্তৃকই নিপীড়িত হইতেছে এমন নহে—ভারতবর্ষের দেবতাগণ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছেন। তাঁহাদের পীঠস্থানে মন্দিরে পর্য্যন্ত ইহারা প্রবেশ করিয়া দেব-দর্শন করিতে পারে না। ১৯১১ সালের সেনসাস কমিশনার কোন্ কোন্ জাতি দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না—তাহার একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়া তদীয় রিপোর্টে মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নমঃশূদ্র, ভুঁইমালী, বাগ্দী, বাউরি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চামার, ধোপা, হাড়ি, যুগী, কলু (তেলী) কামার, কেওড়া, কাপালী, কোড়া, মাল, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোণার, শুঁড়ি, সূত্রধর ও টীয়রগণ দেব-মন্দিরে প্রবেশে অনধিকারী (১)।" এমন যে অধমতারণ পতিত-পাবন নীলাচলচন্দ্র পুরী ধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব তাঁহার দর্শনার্থ তাঁহার মন্দিরে যাইতেও নিম্নলিখিত হিন্দুগণ অনধিকারী— ১। "লোলি বা কস্‌বি, ২। কলান বা শুঁড়ি, ৩। মেছুয়া। ৪। নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল, ৫। ঘুস্‌কী, ৬। গাজুর, ৭। বাগ্দী। ৮। যোগী বা নয়বফ। ৯।

(১) "কে হিন্দু আর কে অহিন্দু" এবং কোন্ কোন্ জাতি মন্দিরাদিতে যাইতে পারে না—প্রশ্নের উত্তরে এই সব জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

সঞ্জীবনী ৩০ মাঘ ১৩২০

কাহার বারই ও চুলিয়া। ১০। রাজবংশী। ১১। পিরালী। ১২। চামার ১৩। ডোম। ১৪। পান। ১৫। তিয়র। ১৬। ভুঁইমালী। ১৭। হাড়ি (১)।"

উড়িষ্যার পশ্চাৎ লিখিত জাতিগুলি মন্দিরে প্রবেশে নিষিদ্ধ বলিয়া পুরী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে। যথা—১। "খ্রীষ্টান ও ইহুদী, ২। মুসলমান। ৩। পার্ব্বতীয় বন্য জাতি। ৪। শবর। ৫। হাড়ি (আবর্জ্জনা পরিস্কারের জন্য ব্যতীত)। ৬। চিড়িয়ামার। ৭। শিয়াল (মদ্য বিক্রেতা) ৮। গোথা (ধীবর) ৯। সিউলা (ধীবর)। ১০। সুলিয়া (তেলিঙ্গা নৌ-জীবী)। ১১। কাঁড়ুরা। ১২। সাধারণ বেশ্যা (অর্থাৎ মন্দিরের নর্ত্তকী নহে)। বাউরী জাতি বহিঃস্থ প্রাঙ্গণ (intercourt) পর্য্যন্ত যাইতে পারে। জেলখানা ফেরৎ যে জাতিই হউক প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন মন্দিরে প্রবেশে অনধিকারী।" (২) বল দেখি আভি-জাত্যভিমানী সমাজপতি! কোন্ আশায়, কি সান্ত্বনা ও ভরসায় কোন্ আকর্ষণে মমতায়—ইহারা হিন্দু থাকিবে? ইহাদের গুরু ছিল না—পুরোহিত ছিল না (এখনও অনেক জাতির নাই) ধোপা, নাপিত, বেহারা ইহাদিগকে ছোয় নাই, কাজ করে নাই, নৌকাজীবী কুলিন হিন্দুগণ ইহাদিগকে নৌকায় তোলে, নাই গ্রামের বা দেশস্থ মন্দির দূরের কথা—ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সার্ব্বজনীন মন্দিরেও ইহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না! ইহার উপর রাজা, জমিদার, বড়লোক, মহাজন পাইক পেয়াদা প্রতিদিন অত্যাচার করিয়াছে। কত সহ্য করিবে ইহারা? কিছুমাত্র প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া—না পাইয়া দলে দলে গ্রামকে গ্রাম মুসলমান হইয়া গিয়াছে? গ্রামকে গ্রাম পাহাড়কে পাহাড়

(১) Section 7. of Regulation IV of 1809.

(২) Bengal District Gazetteer, Puri—Excluded classes. Page 98.

খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে? ভারতের প্রায় ৭০ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে গড়ে তিন সহস্র লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পর হইয়া যাইতেছে। (১) ময়মনসিংহ সিংরৈলের জনৈক মহাপ্রাণ কায়স্থ জমিদার আমাকে বলিয়াছেন যে "এতদঞ্চলে যত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিল—তাহারা জমিদার এবং অন্যান্য বলবানগণের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া দলে দলে মুসলমান হইয়া গিয়াছে, যাহারা মুসলমান হইতে পারে নাই তাহারা আসাম চলিয়া গিয়াছে। বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল সহায়হীন পাটনা মালী নমঃশূদ্র পোদ ঢুলী ধোপা নাপিত বেহারাগণকে অত্যাচার করিলে তাহাদের পশ্চাতে কোন হিন্দুই দাঁড়ায় না। তাহাদের হইয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কেহই লড়ে না, প্রতিকারার্থ অগ্রসর হয় না—কিন্তু তাহারা মুসলমান হওয়া মাত্র সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাহাদের পক্ষে সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। খৃষ্টান হইলে পাদরীগণ এবং পাদরীগণের অনুরোধ পত্রের জোরে রাজকর্ম্মচারিগণ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তখন আর কোনও অত্যাচারী জমিদার বা সমাজপতি কিছু করিতে সাহস করে না। প্রতিদিনকার লাঞ্ছিত লক্ষ লক্ষ দলিত নর-নারীর পক্ষে ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্ম-সম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করা ব্যতীত আর কোনও উপায় ছিল না। উপায়ান্তরহীন অবস্থায় নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ইহারা চলিয়া গিয়া পর হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলা বা ভারতের হাজার করা ৯৯৯ জন মুসলমানই অত্যাচার জর্জ্জরিত, ও অপমানিত জাত্যন্তরিত হিন্দু। ১৮৭২ সালের বাঙ্গলার ১ কোটি ৬৭ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ধোপা, নাপিত, বেহারা বঞ্চিত নৌকা-

(১) "প্রতি সপ্তাহে তিন সহস্র ভারতবাসী খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। * * * এই অনুপাতে ভারতের খ্রীষ্টভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আশা করা যায় যে কোন না কোন সময়ে সমগ্র ভারত খ্রীষ্টীয় দেশে পরিণত হইবে।"

প্রচার, জুলাই সংখ্যা ১৯৩০

রোহণে অনধিকারী, পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মন্দির প্রবেশে অনধিকারী, পূজার্চ্চনাদিবিহীন ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত বঞ্চিত, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার পরিত্যক্ত পোদ ও নমঃশূদ্র এই মাত্র দুই সম্প্রদায়ের লোকই দেড় কোটি মুসলমান হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর প্রায় ৪॥ শত বৎসর হইল ইহারা মাত্র ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত পাইয়াছে। জেল থানায় নমঃশূদ্রগণের দ্বারা ম্যাথরের কাজ করান হইত তারই প্রতিকার ফরিদপুরের পাদ্রী সাহেব মিঃ মিড করেন, এবং তাহারই ফলে ফরিদপুর ওড়াকান্দি ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলের সহস্র সহস্র নমঃশূদ্রের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও গ্রামকে গ্রাম খৃষ্টপল্লী প্রতিষ্ঠা॥ অসহনীয় অত্যাচার ও গুরুতর পীড়ণ ব্যতীত পিতৃ পিতামহের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ইহারা ত্যাগ করে নাই! হিন্দুর এই আত্মঘাতী নীতি—ছিন্নমস্তার মত নিজের শির নিজ হস্তে ছেদন ও নিজের রক্ত নিজে পানরূপ অভিনব রাক্ষসী লীলার ফলেই হিন্দুস্থান ভারতের এই দুর্গতি—এই দুঃখ দুর্দ্দশা! পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের কবি এই সমস্ত প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন—

"হিন্দুর দুর্গতিমূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর ;
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ দৈন্য হবে দূর।"

বল দেখি হিন্দু! এমন আত্মহত্যাকারী পাপিষ্ঠ জাতি ধরাতলে আর কোথায় দেখিয়াছ? আপনার রুধির ছিন্নমস্তার মত এমন করিয়া আর কোন্ দেশের কোন্ জাতি পান করিয়াছে! এখনও কি চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিবে না, তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ ও কি হইতে চলিয়াছ? তোমাদের স্নেহ প্রেম ভালবাসা মিষ্ট বাক্য ও সহানুভূতির অভাবে সমাজের গ্রামের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাই ভগিনী ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পর হইয়া গিয়াছে। তোমাদের সেবা পরিচর্য্যা করিবার অপরাধে হীন ও অস্পৃশ্য হয় নাই,—সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জিত এমন সব কোল,

ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, নাগা, অসুর, ওরাং, কোচ, ম্যাচ, ল্যাপচা, লেম্বুজ, গুর্খা, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া—লুসাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য ও পাহাড়িয়া হিন্দু ভ্রাতৃগণও তোমাদের প্রেম সহানুভূতির অভাবে দলে দলে খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে।

এই মহাপাপিনী—কাল নাগিনী স্বরূপিনী অস্পৃশ্যতা ও বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা তোমাদিগকে দিন দিন ধ্বংস ও গ্রাস করিতেছে,—অভ্যুত্থানের পথে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়া অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিতেছে। তবুও কি তোমরা এই অস্পৃশ্যতা ও জাতি হিংসা—ত্যাগ করিয়া বাঁচিবার পথ ধরিবে না? এই অস্পৃশ্যতা বিরাট বিশাল শক্তিশালী হিন্দুজাতি তথা হিন্দুস্থান ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—ও এখনও করিতেছে। ৬০ কোটি হিন্দু সমন্বিত মহাশক্তিশালী ভারতবর্ষ এই পাপে ডুবিয়াছে—মুষ্টিমেয় বিদেশী বিজাতি ও বিধর্ম্মী দ্বারা বার বার পরাজিত ও পরাধীন হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—"যদি আমাকে কোন বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন—'৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলি?' আমি এক কথায় তাহার উত্তর দিব—'অস্পৃশ্যতার অভিশাপ।' যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন—'স্বরাজলাভের প্রধান পরিপন্থী কি?' আমি এক কথায় উত্তর দিব—'অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ'। (১) স্বাধীনতা গিয়াছে এই পাপে—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিও যাইতে বসিয়াছে। এই পাপে। এই ৭ কোটি (মুসলমান) ৭০ লক্ষ (খৃষ্টান) গৃহ বহিষ্কৃত—হিন্দু ভ্রাতার গৃহ—ভবন—হইতে বেদ বেদান্ত গীতা ভাগবত—পুরাণ চণ্ডী চলিয়া গিয়াছে, দেবালয় আরতি শঙ্খ ঘণ্টার মধুরধ্বনি তুলসীমঞ্চ—ঠাকুর ঘর উঠিয়া গিয়াছে। চলিয়া গিয়াছে—রাম সীতা, শিব দুর্গা

(১) ৺মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত—"সমাজরেণু" হইতে উদ্ধৃত।

রাধাকৃষ্ণ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার—নাম, জপ, পূজা অর্চ্চনা ভোগ, রাগ। উঠিয়া গিয়াছে—গো মাতার সেবা যত্ন, কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী বিষ্ণু হরিপূজা। ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত—পাঠক কথক তীর্থ পাণ্ডাগণ এই ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ভক্ত শিষ্য সেবক যজমান হারাইয়াছেন—ইহাদের প্রণামী অর্থ বিত্ত বার্ষিক হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহারা আর নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড রামকেলি, গয়া প্রয়াগ কাশী বৃন্দাবন—অযোধ্যা মথুরা পুরী ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, প্রভাস দ্বারকা যায় না—তীর্থে তীর্থে পূজা ভোগ দেয় না, গঙ্গা গোদাবরী নর্ম্মদা তাপ্তী সিন্ধু শতদ্রু ব্রহ্মপুত্র যমুনার পুণ্য সলিলে স্নান করিতে ছুটিয়া আসে না। হিন্দুর কি না সর্ব্বনাশই হইয়াছে? এই অস্পৃশ্যতা হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন—"হিন্দু মুসলমানের মিলন ব্যতীত স্বরাজলাভ হইবে না, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিলন না হইলেও হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হইবে না—খদ্দর না চলিলেও হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হইবে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না হইলে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হইবে।" (১) প্রমাণ ত হাতে হাতে পাইতেছে। ভারতের ⅕ অংশ হিন্দুর গৃহ হইতে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হইয়াছে, দেব দেবী লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে,—পূজা পাঠ সংকীর্ত্তন, আরতি মহোৎসব হরি-কৃষ্ণ রাম কালী গৌর নিতাই নাম দূরে চলিয়া গিয়াছে। ⅕ অংশ ভাই পর হইয়া গিয়াছে। সমাজ দেহের ⅕ অংশ রক্তমাংস হাত পা কর্ত্তিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সমাজের বল শক্তি তেজ স্বাস্থ্য আনন্দ উৎসব থাকিতে পারে কি? এজন্য হিন্দু জননীর কিনা মর্ম্মদাহী শোক—কিনা মর্ম্মন্তুক ব্যথা—কিনা অসহনীয় বেদনা!!

সুচতুর লর্ড ক্লাইব কাহাদের লইয়া পলাসীর যুদ্ধে বঙ্গদেশ জয় করেন জান কি? সেই মান্দ্রাজী তেলেঙ্গী সৈন্য কাহারা ছিল? তাহারা আর কেহ নয়—তোমাদেরই দলিত পদাহত অভিমান বিক্ষুব্ধ সর্ব্বপ্রকার

(১) শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন—অনুবাদিত "মহাত্মা গান্ধী লিখিত "অস্পৃশ্যের মুক্তি।"

মানবোচিত অধিকারে বঞ্চিত হতভাগ্য 'পারিয়া হিন্দু'। যাহাদের পশু অপেক্ষা ঘৃণা করিয়াছিলে—দেবমন্দিরে যাহাদের প্রবেশ, এক সরোবরে স্নান—এক গাড়িতে আরোহণ, এক রাস্তায়—চলিবার অধিকার ছিল না—তাহারাই ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতে ইংরাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছিল। পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত সুগ্রীবের সহায়ে রামচন্দ্র বালী বধ, এবং পদাঘাতে বিতাড়িত বিভীষণের সহায়ে রাবণ বধ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজের শত পুত্রকে গোপনে বধ করেন। কৌশলে জ্ঞাত শত-ভ্রাতৃ-শোকে-মুহ্যমান ক্রুদ্ধ গান্ধার রাজপুত্র শকুনী প্রতিবিধিৎসিতে হস্তিনাপুরে আসিয়া পাশা ক্রীড়ার কৌশল করিয়া কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিল। সাম্রাজ্য বঞ্চিত,কন্যা সংযুক্তার বলপূর্ব্বক হরণে ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ জয়চন্দ্রের সাহায্যেই মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত, হত ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ধ্বংস করে। জাতি-হিংসা জাতি-দ্বেষের পরিণাম—যুগে যুগে এই প্রকারই ঘটিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যই করুণ কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান ;
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে, বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে, তবু কোলে দাও নাই স্থান ;
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
দেখিতে পাওনা তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল, তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
চৌদিকে জড়ায়ে রেখে আপনার বৃথা অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

হিন্দু, এখনও প্রতিকারের সময় আছে—এখনও প্রায়শ্চিত্তের কাল

অতীত হয় নাই। গৃহ পরিত্যক্ত—সমাজ জননীর স্নেহাঞ্চল হইতে দূরে—বিতাড়িত—ভাই ভগিনীগণকে সাদরে বক্ষে টানিয়া লও, ঘরের ছেলে মেয়ে—ভাই ভগিনীগণকে আবার ধান্য দুর্ব্বা দিয়া ঘরে তুলিয়া লও—; কান্ত কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া—জননীকে ডাকিয়া বল—

(ওমা) "কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো কাদা মেখেছে ব'লে।"

অপরাধ ত তাহাদের নয়—অপরাধ যে আমাদেরই ? প্রায়শ্চিত্ত—আমাদেরই করা উচিৎ। তবু ভ্রমান্ধ আচার-সর্ব্বস্বগণের জন্য গঙ্গা স্নান করাইয়া—হরিনাম—গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাইয়া শুদ্ধ করিয়া সমাজে তুলিয়া লও। গো-বধ ব্রহ্ম-বধ প্রভৃতি যাবতীয় মহাপাপ গঙ্গা গায়ত্রী হরিনামে—দূর হয়। এমন কোনও মহাপাপ বা মহাপরাধ নাই বা থাকিতে পারে না—যাহা রাম, কৃষ্ণ হরিনামে গঙ্গা স্নানে গায়ত্রী পাঠে বিদূরিত হইবে না—বা হইবার নয়। বৈষ্ণব ভক্তগণ ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে বলেন—

একবার হরিনামে এত পাপ হরে ;
মহাপাপীর সাধ্য নাই, তত পাপ করে।

রত্নাকর দস্যু ছিল—মরা মরা জপিতে জপিতে রাম নাম উচ্চারণ হওয়া মাত্র সর্ব্বপাপমুক্ত শুদ্ধ বাল্মীকি মুনি হইয়া রামায়ণ রচনা করেন। মহাপাপী অজামিল বেশ্যা গর্ভজ পুত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যান। জগাই মাধাই ছিল মহাপাপী যাহারা—

ব্রাহ্মণ হইয়া করে গোমাংস ভক্ষণ ;
ডাকা চুরি পর গৃহ দহে অনুক্ষণ।

তাহারাও এক মাত্র হরিনামে—গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ মুক্ত পরম ভক্ত হইয়া যায়। শূকর মাংস ভোজনের মহাপাপ যদি আল্লার নামে দূর হয় তবে গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণের পাপ কেন হরিনামে গঙ্গাস্নানে—

গায়ত্রী দ্বারা শুরু মন্ত্রে দূর হইবে না? অবশ্যই হইবে। না হইলে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না—যে আল্লার নাম—হরিনাম কৃষ্ণনাম গঙ্গা গায়ত্রী মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী? ইহা কি কোনও হিন্দু বলিতে, ভাবিতে ও মনে করিতে পারেন? তাই বলি আর কাল বিলম্ব মাত্র করিও না।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের রুদ্ধদ্বার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু মিশন প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ খুলিয়া দিয়াছেন। আর ভাবনা নাই—ভয় নাই। এই কয় বৎসরে ৪।৫ লক্ষ গৃহ পরিত্যক্ত মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণকারী হিন্দু ভাই ভগিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সমাজ গৃহ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ ও বহির্গমনের দ্বার মুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "অভিমন্যু মাতৃগর্ভ হইতে ব্যূহ প্রবেশ-কৌশল শিক্ষা করেন কিন্তু জননী সুভদ্রা নিদ্রামগ্ন হওয়ার দরুণ—ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল শিখিতে পারেন নাই। এই আত্মঘাতী হিন্দু সমাজ তার বিপরীত শিক্ষা লাভ করিয়াছে; সে বাহির হইবার বা বাহির করিয়া দিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছে কিন্তু প্রবেশের শিক্ষা পায় নাই।" গত ৭ শত বৎসর হইল ইহারা কেবল কোটি কোটি ভাই ভগিনীকে বাহির করিয়াই দিয়াছে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কেবল বিয়োগ দিয়াছে যোগ দিতে দেয় নাই; বিসর্জ্জনই দিয়াছে আবাহন করিয়া কাহাকেও গ্রহণ করে নাই। সেই শোচনীয় ও স্মরণীয় দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে—সুদিন আসিয়াছে। প্রতিদিন নানাস্থানে, নানা জেলায় ভারতের নানা প্রদেশে শত শত পরিত্যক্ত ভাই সাদরে গৃহীত হইতেছে। সহস্র সহস্র লোক মহা ধুম ধাম সহকারে—পরমোৎসাহ ভরে পুনরাগত ভাই ভগিনীগণকে সাদরে হিন্দু সমাজে পুন গ্রহণ করিতেছে। তর্ক বিতর্ক—শাস্ত্র বিচার সব থামিয়া গিয়াছে—সমাজ

কল্যাণকামী মহাপ্রাণ সমাজপতিগণ সকলেই একমত হইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত শুদ্ধি সমর্থন করিতেছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ, হিন্দু নেতৃগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সুতরাং আর কাল বিলম্ব মাত্র না করিয়া ভাই বলিয়া অবশিষ্ট সপ্ত কোটি অস্পৃশ্যকে—কোলে তুলিয়া লও, প্রেমামৃত প্রলেপে—প্রাণের সমুদয় ক্ষতগুলি মাখাইয়া দাও। অনাদৃত ও পরিত্যক্ত ভাই ভগিনী দিগকে আবার স্নেহ ভরে ডাকিয়া আনিয়া সমাজ বক্ষে তুলিয়া লও—গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আনন্দের রোল উঠুক। বিধবা কন্যা ভগিনীগণকে পুনরায় বিবাহ দাও; অস্পৃশ্যতা দানবকে ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দাও। "হিন্দু জাতির এই আসন্ন ও ভয়ঙ্কর বিধ্বংস দেখিয়াও যাঁহারা ইহার প্রতীকারে যত্নবান্ না হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন—তাঁহারা দেশের ও সমাজের শত্রু। নিশ্চয় জানিবেন—শুদ্ধি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও বিধবা বিবাহ প্রচলন ব্যতীত ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর বাঁচিবার উপায় নাই।" (১) ভারতের গৃহে ২ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ঘুমন্ত অর্দ্ধশক্তি ভগবতীরূপিণী মা-ভগিনী-জায়া-কন্যাগণকে পুরুষের সমান স্বাধীনতা দিয়া দেশজননীর মুক্তি ব্রতে সহকর্ম্মিণী করিয়া লও। ভারতের উদ্ধারে বিলম্ব হইবে না।

(১) গুরুগোবিন্দ প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্য-স্মৃতি-সাংখ্যতীর্থ লিখিত "বিধবা-বিবাহ।"

সমাপ্ত

যুগান্তরকারী লেখক, নবযুগপ্রবর্ত্তক, বঙ্গবিখ্যাত সমাজসংস্কারক—

শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাভূষণ প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জাতিভেদ (পরিঃ তৃতীয় সং) ২৲ ২। শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার (পরিঃ ২য় সং) ১৲ ৩। জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার (পরিঃ ২য় সং) ১৲ ৪। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ (পরিঃ ২য় সং) ১৲ ৫। সন্ধ্যা বিধি ⁄॰ ৬। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ৵॰ ৭। মালীজাতির উদ্বোধন (পরিঃ ২য় সং) ৶॰ ৮। নিপীড়িত শূদ্রের নিদ্রাভঙ্গ ⁄॰ ৯। হিন্দুর নব-জাগরণ ॥॰ ১০। মালীজাতির ইতিবৃত্ত ।॰ ১১। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ (পরিঃ ২য় সং) ।॰ ১২। দেবীপূজায় জীববলি (৩য় সং) ।॰ ১৩। বিধবা বিবাহ ⁄॰।

যুগান্তরকারী গ্রন্থাবলী, নিপীড়িত শূদ্রের নূতন বেদ। জ্বলন্ত ও জীবন্ত ভাষায় হৃদয়ের তপ্ত শোণিতে লিখিত। প্রচারে সমাজমধ্যে নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে। পদদলিত মৃতবৎপ্রাণে জীবনসঞ্চারকারিণী সঞ্জীবনী সুধার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আভিজাত্যের দুর্গ ভূমিসাৎ ও বৃথা জাত্যভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইয়াছে। সামাজিক অধিকার প্রার্থী প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য—গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে ভারতের কোন ভাষায় এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতাকে এই প্রাণপ্রদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ (শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত) সচিত্র ৵॰; দেশসংস্কারে দিগিন্দ্রনারায়ণ (শ্রীসতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত) ⁄১০; শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী প্রণীত—ব্রাহ্মণ শূদ্রের সংঘর্ষ—⁄॰। সমাজবিপ্লব ।⁄॰। ভাটপাড়া বধ কাব্য ৵॰। দিগ্বিজয়ী দয়ানন্দ ⁄॰। শ্রীহিন্দুপতি মুখোপাধ্যায় লিখিত জাতের খবর ৵॰, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাধি ও চিকিৎসা ।॰

যুগান্তরকারী দিগিন্দ্র-গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত—

ভুবনবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী (কাঁথি মেদিনীপুর) বলিয়াছেন :—আপনি ত আমারো অনেক আগে থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন (অনুবাদ)। **বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—(অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের প্রতি—) সিরাজগঞ্জ যদি যান তবে "জাতিভেদ" বইখানির গ্রন্থকার দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিবেন। তিনি ভীমরুলের চাকে বসেই ভীমরুলের দলকে খোঁচা দিচ্ছেন। এটা বড় সহজ কাজ নয়। কলিকাতায় বসে সমাজসংস্কারের কথা বলা সহজ, কিন্তু পল্লীসমাজের বুকে বসে, সমাজকে সাহস করে ঘা দেওয়া ভারি কঠিন, তিনি তাই কর্‌চেন। **স্বামী শ্রদ্ধানন্দ** (দিল্লী হইতে) সমাজ সংস্কার বিষয়ক পাঁচখানা গ্রন্থের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইহা আমাকে প্রচুর আনন্দ দিতেছে। **আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়**—ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্য হ'তে আমরা কত মহাপুরুষকে পেয়েছি। আমাদের দিগিন্দ্র বাবুও ব্রাহ্মণ সন্তান। জাতির মর্ম্ম বেদনায় ইনি ব্যথিত হইয়াছেন—ইঁহার পাণ্ডিত্যও যথেষ্ট আছে ; বাঙ্গালায় এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কে আছেন—যিনি ইহাঁদের সামনে সাহস ক'রে শাস্ত্রের বচন আওড়াতে পারেন। জাতির মুক্তির জন্য ইনি কত বই লিখিয়াছেন—সমাজের নিকট কত নির্য্যাতন ভোগ করেছেন। আজ সারা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর দ্বারে দ্বারে আকুল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন।

নব্যভারত—গ্রন্থকার অসাধারণ শক্তি লইয়া নিম্ন শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। গ্রন্থকারের ক্ষমতা অসাধারণ, গবেষণা গভীর হইতেও গভীর।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অতি যত্ন ও তৃপ্তির সহিত পাঠ

করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তথা-কথিত পতিত জাতিদের বিষয় যে প্রকার সৎসাহস ও নির্ভীকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আপনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। **হিন্দু পত্রিকা**—হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। **প্রবাসী**—বঙ্গভাষায় সম্প্রতি যে কয়েকখানি খাঁটি বই লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লেখক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ নিজকে বিলোপ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। **উপাসনা**—গ্রন্থকার শাস্ত্রসিন্ধুমন্থন করিয়া অজ্ঞাত নিম্ন শ্রেণীর জন্য অমৃত তুলিয়া আনিয়াছেন। **নব্যভারত**—অমর হইবার যোগ্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা—স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং নানা মহাজন বাণী মথিত করিয়া দীনের জন্য যে মুক্তির—অমৃতের সন্ধান গ্রন্থকার পাইয়াছেন, তাহাই আপামর সাধারণকে গ্রহণ করিবার জন্য দেশকে আহ্বান করিয়াছেন! এ আহ্বান আজ হউক, কাল হউক—দেশ শুনিতে বাধ্য। *** দিগিন্দ্রবাবু অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। দিগিন্দ্র বাবুর দুঃসাহসের আমরা প্রশংসা করি—তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করি। তিনি যে প্রাণ লইয়া এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেরূপ বিরাট প্রাণ আজকালকার এই ভণ্ড সমাজে বড় একটা দেখা যায় না। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত পণ্ডিত ও প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব; কেন না সর্ব্বভূতে তিনি নারায়ণ দর্শন করিতে শিখিয়াছেন, আজ সেই অবনত অস্পৃশ্য, অনাচরণীয়রূপী নারায়ণগণের সেবার জন্য তিনি কেবল গ্রন্থ লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—তাহাদের উদ্ধার কার্য্যে সমাজের অত্যাচার, নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে হাসিমুখে মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন। **বেঙ্গলী**—অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। হিন্দুসমাজের অশেষ উপকারী।

আনন্দবাজার পত্রিকা—এই শাস্ত্রজ্ঞ সমাজকল্যাণে উৎসর্গীকৃতজীবন ব্রাহ্মণের স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ আজ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে খুব সুলভ নহে। **বারীন্দ্র ঘোষ**—অনুপম জিনিষ।

কলিকাতা আর্য্যসমাজের মুখপত্র **আর্য্য-গৌরব**—দিগিন্দ্রবাবু বঙ্গের মার্টিন লুথার; তাঁর লেখনী বাঙ্গলার অবসন্ন হিন্দুজাতিকে জাগাইয়া দিয়াছে—হিন্দী অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে সমগ্র ভারতের উপকার হইত। **হিন্দুমিশন**—দিগিন্দ্রবাবু অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের গুরু। **শিবনাথ শাস্ত্রী**—জাতিভেদের ন্যায় গ্রন্থ কখনও যে হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। **স্বরাজ**—সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ অসহযোগী কর্ম্মী, অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব দিগিন্দ্রবাবু তাঁহার কর্ম্মময় জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। নিন্দুকের আক্রমণ, সমাজের অত্যাচার, জেলের নির্য্যাতনকেই অঙ্গের চিরভূষণ করিয়া একান্ত মনে, একনিষ্ঠার সহিত দেশের সেবা করিয়া যাইতেছেন। **টাঙ্গাইল-হিতৈষী**-দিগিন্দ্রনারায়ণ পতিত জাতির বন্ধু। **উপাসনা**—"গ্রন্থকার শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া অবজ্ঞাত নিম্ন শ্রেণীর জন্য অমৃত তুলিয়া আনিয়াছেন।" গ্রামে গ্রামে ও প্রত্যেক অব্রাহ্মণ বিশেষতঃ দলিত-সমাজে বহুল প্রচারার্থ—গ্রামবাসিগণ সকলে মিলিয়া একসেট পূর্ণ গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া পাঠ করুন। অর্থব্যয়ের লক্ষ গুণ উপকৃত বোধ করিবেন।"

এক টাকার কম বহি এবং জানিত গ্রাহক ব্যতীত ভিঃ পিঃ তে পুস্তক প্রেরিত হইবে না। যাঁহারা প্রয়োজন মনে করিবেন তাঁহারা

মূল্য বা অন্ততঃ একটি টাকা মানিঅর্ডার করিলে সত্বর বহি প্রেরিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—(১) শ্রীদামোদর দাস বি-এ, ৩৯ হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা;
(২) আর্য্য-গৌরব কার্য্যালয়, ১৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
(৩) হিন্দু-মিশন—পোঃ কালিঘাট, কলিকাতা;
(৪) তরুন সাহিত্য মন্দির; ১৬নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা;

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ   গায়ত্রী।*

পৃথিবীর যে কোন জাতির যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন
ধর্মাবলম্বী নরনারী হিন্দুধর্মগ্রহণেচ্ছু হইয়া (প্রকৃত সৎ)
যোগ্য হইয়া আচার্যের নিকট হইতে বৈদিক আচার গ্রহণ
করিয়া এই পরমব্রহ্মের উপাসনার পরম পবিত্রতম
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উদার ও সাম্যময় হিন্দুধর্মে-
আর্যধর্মে আসিতে পারেন। শ্রী ভোলানাথ চক্রবর্তী
সন ১৩৩৮ সাল ২৮শে ভাদ্র।

জলচল

জলচল

ও

স্পর্শদোষ বিচার।

"জাতিভেদ," "শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার" এবং
"চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ
প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা,
২নং বথুন রো,—ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৩১

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত] [মূল্য ১৲ এক টাকা

সিরাজগঞ্জ হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

বিশ্বপিতা প্রেমময় ভগবানের স্নেহের সন্তান হইয়াও

যাহারা সমাজের অবিচার ও অত্যাচারে সামাজিক

অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত হেয়,

অবজ্ঞাত ও দীন হীন ভাবে জীবনাতি-

বাহিত করিতেছে, সেই সব জল অচল,

অনাচরণীয় ভ্রাতৃবর্গের করকমলে

আমার বহু পরিশ্রমের

জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার

হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি, প্রেম ও

অনুরাগের সহিত অর্পিত

হইল।

ভগবৎপাদপদ্মে নিয়ত উন্নতিকামী

—গ্রন্থকার

নিবেদন।

"জলচল ও স্পর্শদোষ-বিচার" প্রকাশিত হইল। সমাজের এই শোচনীয় অধঃপতনের সময় আপনার হীন জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সমদর্শী ভগবান যে কাহাকেও ছোট বা অস্পৃশ্য করেন নাই, কাল প্রভাবে—কর্ম্মানুযায়ী ও সামাজিক নিয়মে এই সব ঘটিয়াছে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। ফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমার জাতি-ভাইগণের বিদ্রূপ, শ্লেষ, তিরস্কার ও অভিসম্পাত আমি যেন আশীর্ব্বাদের দূর্ব্বাচন্দন পুষ্পমাল্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমি যেন কণ্টকময় বন্ধুর দুরারোহ শৈলপথে অটল ধৈর্য্য ও অসীম মনোবল লইয়া অগ্রসর হইতে পারি।

অধিক কিছু বলিবার নাই। যাহাদের জন্য পুস্তক লিখিয়াছি তাহারা পড়িলেই—আমার তৃপ্তি ও শান্তি। মুদ্রণে যে সব ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল—পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। প্রুফ্ দেখার দোষে এসব হইয়াছে। যাঁহাদিগের পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি—তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ কৃপা করিয়া—পুস্তক সম্বন্ধে আপনাপন অভিমত লিখিয়া জানাইলে অনুগৃহীত হইব। অর্থাভাবে পুস্তকের কলেবর মনোমত ভাবে, বর্দ্ধিত আকারে বাহির করিতে পারিলাম না। বহু কথা বলিবার থাকিল। যদি কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তবে সে বাসনা পূর্ণ হইবে। নিবেদনমিতি—

পোঃ সিরাজগঞ্জ,
কাওলাকোলা।
শ্রাবণ ১৩২২।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীভগবানের কৃপায় পরিবর্দ্ধিত আকারে 'জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার' প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর হইল ১ম সংস্করণের সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে ২য় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জস্থ আরবান্ ব্যাঙ্ক হইতে ৮৵১০ সুদে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ করিয়া পুস্তক প্রকাশে অগ্রসর হইলাম। ২য় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইল। মূল্যও সেকারণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। এ সংস্করণে ভারতীয় সমুদয় হিন্দু নেতৃবর্গের অভিমত ও সংবাদ পত্রের মন্তব্য প্রকাশিত হইল। ভরসা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকও পাঠকবর্গের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইবে। যাঁহাদিগের ভাল লাগিবে—তাঁহাদিগকে ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি। মুদ্রণে এবারেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল, পাঠকগণ সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন—ইহাই অনুরোধ। স্থানাভাবে এবারও বহু কথা রহিয়া গেল, ভগবৎ কৃপায় তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইবার প্রয়োজন হইলে বিস্তৃতভাবে বলিবার বাঞ্ছা রহিল। যে সমুদয় হিতৈষী বন্ধুবর্গের পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা ও সহায়তায় পুস্তক প্রকাশিত হইল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দামোদর বি, এ. মহাশয়ের ও শ্রীমান্ দীনবন্ধু আচার্য্যের কঠোর পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সিরাজগঞ্জ, বৈশাখ ১৩৩১।

জলচল।

অবতরণিকা।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রাচীন যুগের প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ কতই না হৃদয়-রুধির দান করিয়া গিয়াছেন! মানবজাতির উন্নতি সাধনই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, ভারতীয় হিন্দুগণের নৈতিক আধ্যাত্মিক দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণ পাত করিয়া গিয়াছেন। বিরাটরূপী মানব সমাজের সেবাই তাঁহারা ভগবানের সেবা বলিয়া মনে করিতেন। যেরূপ বিধি-নিয়মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের সমভাবে কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেইরূপ বিধি ব্যবস্থা আইন-কানুনই তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ ব্যবস্থায় একদেশদর্শিতা ছিল না। সমাজবিশেষের নিগ্রহ করিয়া সমাজ-বিশেষের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ থাকিতেন না; হিংসা-দ্বেষ সে পূত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এক ভূমা মহান্ ভগবানের অংশ প্রত্যেক মানবের মধ্যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে, জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। মানুষকে ঘৃণা করিলে সেই ভূমাকেই ঘৃণা করা হইবে, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই প্রত্যেক জীবের প্রতি, মানবের প্রতি, তাঁহারা সমান স্নেহ, সমান ভালবাসা পোষণ

করিতেন। কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। যেরূপ ভাবে সমাজকে পরিচালিত করিলে, যে নিয়মে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচার করিলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ মনঃ, আত্মার কল্যাণ অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থাই প্রণয়ন করিতেন। যাহাতে প্রত্যেক মানবের মানবত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে প্রত্যেক মনুষ্যের ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, সেইরূপ বিধি-নিয়মই তাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! কাল-বশে সে বিধি-ব্যবস্থার কি শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন, আত্মার উন্নতি সাধনই মানবের চরম উন্নতি সাধন। সেই আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে মনঃ পবিত্র করা প্রথম প্রয়োজন। আবার দেহ শুদ্ধি মানসিক পবিত্রতার হেতু। পবিত্র অশন বসন, বিশুদ্ধ স্থান, নিরাময় সংসর্গ দেহ-শুদ্ধির অনুকূল এবং উহাও আবার আহার্য্য বস্তুর পবিত্রতা, আধার, স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। ইহার যে কোন বিষয়ে দোষ ঘটিলে খাদ্য দ্রব্য শরীর রক্ষক না হইয়া, মনঃ ও আত্মার কল্যাণ সাধনের সাহায্য না করিয়া বরং সকলের অনিষ্টকারকই হইয়া থাকে। আধারের দোষে, স্থানের দোষে, কালের দোষে পাত্রাপাত্রের দোষে, খাদ্য বস্তু যে দূষিত হয়—তাহা সকলেরই সুবোধ্য। কিন্তু স্পর্শমাত্রই—স্পর্শদোষেই কি প্রকারে খাদ্যে দোষ ঘটে, সেই দোষে কিরূপে মনঃ কলুষিত হয় ও আত্মার অবনতি হয় তাহা তত সহজে বোধগম্য বা ধারণা হয় না। আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জাতির স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য কিম্বা জল খাদ্য উভয়ই অপর কতকগুলি জাতির অগ্রাহ্য। শৈশবে খেলিতে খেলিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যখন উৎপলদের বাড়ীতে জল খাইতে গিয়াছিলাম এবং উৎপলের মা বলিয়াছিল "বাবা আমরা জাতিতে সা, আমাদের হাতে তোমাদের জল খাইতে নাই, যাও বাবা, বাড়ী গিয়ে জল খেয়ে এসো"; যে দিন পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাখালদের বাড়ী জল খাইতে গিয়াছিলাম তখন রাখালের মাও বলিয়াছিল,

"বাবা আমরা সুতার, আমাদের হাতে কি তোমরা বামণের ছেলে জল খাইতে পার? আহা বাবা, আমরা ভাগ্যহীন তোমাদের জল দিবার কি আমাদের সাধ্য আছে? আমরা কি অত পুণ্য করিয়াছি? যাও বাড়ী গিয়ে জল খাওগে?" সেই দিন হইতেই ধারণা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি নীচ (?) জাতির জল গ্রহণ করিতে পারে না। খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধেও বাল্যকাল হইতে আমাদের ধারণা পূর্ব্বরূপই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতদিনে কথাটা বুঝিবার জন্য একটা আশা জাগিয়াছে। এক ব্যক্তির স্পর্শে অপরের পক্ষে জল কিরূপে দূষিত হয় পানের অযোগ্য হয় ইহা একটা রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতির কোন্ মহীয়সী শক্তির প্রভাবে, ভগবানের কোন্ অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার শক্তিতে, মানব বুদ্ধির অন্তরালে সৃষ্ট হইয়া যে জল বিধাতার নিদেশে গিরি প্রান্তর বন উপবন নগর পল্লী ভেদ করিয়া কুলুকুলু-নাদে তরঙ্গ-ভঙ্গে বহিয়া বহিয়া অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে প্রাণীমাত্রের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, সেই জীব-মাত্রের জীবন-স্বরূপ জল একটী মানুষের স্পর্শে—অব্যক্ত ব্রহ্ম ভগবানের ব্যক্ত মূর্ত্তি স্বরূপ মানুষের স্পর্শে কিরূপে অপবিত্র অপানীয় হয় তাহা আমাদের অবোধগম্য। যে জলে মানব অপেক্ষা ইতর জন্তু মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তুগণ নিয়ত বাস করিয়া থাকে, কত প্রকার বিষাক্ত—বিষধর জন্তু বাস করিয়া থাকে; যে জলে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মৃত দেহ গলিত পচা দুর্গন্ধময় শবদেহ নিরন্তর ভাসিয়া যাইতেছে, যে জলে কত কলেড়া কত বসন্ত কত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীর ক্লিন্ন শবদেহ পচিয়া পচিয়া খসিয়া যাইতেছে, ক্রীমিকীট কেন কত প্রকার মৎস্যাদি কর্ত্তৃক নিরন্তর ভক্ষিত হইতেছে; যে জলে শিশু সন্তানগণের মল মূত্র প্রতি নিয়ত ধৌত করা হইতেছে, সেই জল পানে—দেব-কার্য্যে ব্যবহারে অপরাধ হয় না, জাত যায় না, আর সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর নমঃশূদ্র প্রভৃতি স্বধর্ম্মা-

বলম্বী ভ্রাতৃগণের স্পর্শে অপবিত্র হয়, পানের অযোগ্য হয়, জাতি যায় ? কি প্রহেলিকা !

যে মৎস্য, পচা মৃত মনুষ্য গো, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর মাংস নিয়ত লোক-লোচনের সম্মুখে ভক্ষণ করিতেছে, যে মৎস্য, মানবের অতি ঘৃণিত মল বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে, যে মৎস্য, কফ কাশ ক্রীমি কীট ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হইতেছে, সেই মৎস্য আহারে কোন ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি অপবিত্র অশুচি ও পাতক-গ্রস্ত হইতেছেন না, কাহারও জাত যাইতেছে না, কিন্তু সাহা সুবর্ণবণিকের জল পানে তাঁহারা জাতি যাইবার আশঙ্কা করিতেছেন।

যাঁহারা সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তৎপর তাঁহাদের মত এইরূপ শুনি যে, ঐ সাহা সুবর্ণ-বণিক নমঃশূদ্র সূত্রধর প্রভৃতি হীন জাতীয় লোক সকলের দেহ হইতে এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষরিত হইয়া ঐ জলে প্রবেশ করে এবং ঐ স্পৃষ্ট জল, জল-পানকারীর শরীরের মধ্যে সেই শক্তি আনয়ন করে, সুতরাং স্পর্শদোষে একের ভাব প্রকৃতি চরিত্র অন্যের দেহে প্রবেশ করে। কাজেই উত্তম যদি অধম স্পৃষ্ট জল বা খাদ্য গ্রহণ করে, তবে তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রেরও অধমত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ নিয়ম করিলেন, উত্তম ব্যক্তি অধমের জল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু হায় সেই নিয়মের এখন কি শোচনীয় পরিণতি ! আমাদিগের দুর্ভাগ্য, ভারতীয় হিন্দু জাতির দুর্ভাগ্য, যে সে সুব্যবস্থায় কালক্রমে নানা প্রকার গোড়ামী গলদ্ প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজপতিগণের সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, পাত্রাপাত্র বিচারের ক্ষমতা নাই, দেশ কাল পাত্র ভেদে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের শক্তি নাই, উত্তম অধম বিচারের সামর্থ্য নাই। বন্দ্যপাদ আর্য্যঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া তাহা খাটাইবার দক্ষতা নাই। অন্ধের ন্যায় কেবল পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন মাত্র। বিধি

ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল আকৃতি লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন, ভিতরকার সার বস্তুটী হারাইয়া বাহ্যিক খোলসখানা লইয়া, নারিকেলের ভিতর ত্যাগ করিয়া বাহিরের ছোবড়া লইয়া টানাটানি মারামারি করিতেছেন ; মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাষাটী শ্লোকগুলি ধরিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্যই হিন্দু সমাজের—ভুবন-বরেণ্য হিন্দু-সমাজের আজ এই দুর্দ্দৈব, এই শোচনীয় অধঃপতন, এই অনর্থ সৃষ্টি! দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে সমাজ দেহে গোঁড়ামি-কীট প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে ও দিন দিন শোচনীয় ভাবে ফেলিতেছে। ভূয়োদর্শী ঋষিগণ গভীর গবেষণা বলে নির্ণয় করিলেন, উত্তম অধমের—সত্বগুণাবলম্বিগণ তমোগুণাবলম্বিগণের স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয়াদি গ্রহণ করিবে না। বর্ত্তমান সমাজাচার্য্যগণ ইহা হইতে বুঝিয়া বসিলেন, কতিপয় জাতি অপর কতিপয় জাতির খাদ্য পানীয়াদি গ্রহণ করিতে পারিবে না ; করিলে জাত যাইবে, সমাজচ্যুত করা হইবে। তাঁহাদের নিয়ম ছিল ব্যক্তিগত ভাবে ব্যষ্টিকে লইয়া, ইঁহাদের নিয়ম হইল সমষ্টিকে লইয়া জাতির সমগ্রকে লইয়া। তাঁহারা উত্তম অধম নির্ণয় করিতেন, ব্যবহার চরিত্র গুণ ও কার্য্য দ্বারা, ইঁহারা করিলেন জন্ম দ্বারা। তাঁহাদের নিয়মে অধম হইলে ব্রাহ্মণও পরিত্যাজ্য ছিল, ইঁহাদের নিয়মে উত্তম হইলেও শুধু জন্মের জন্যই শূদ্র পরিত্যাজ্য, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি জাতির স্পৃষ্ট জল ও খাদ্য পরিত্যাজ্য অগ্রাহ্য। তাঁহারা সংজ্ঞা দ্বারা কার্য্যাকার্য্যের লক্ষণ দ্বারা উত্তম অধম নির্ণয় করিতেন, ইঁহারা ক্ষমতা ও ন্যায় বিচারের অভাবে এবং কষ্ট-লাঘব করিবার জন্য উত্তম অধমের সিল্ দিয়া মার্কা মারিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। হাজার কুকর্ম্ম করিলেও সেই মার্কা মারা উত্তম অধম বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং হাজার সৎকর্ম্ম করিলেও মার্কা মারা অধম উত্তম হইতে পারিবে না। প্রাচীন ঋষিগণ বিধাতার বিধান রক্ষা করিয়া বিধি ব্যবস্থা

প্রণয়ন করিতেন, সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মবলে, ভক্তি ও জ্ঞান-প্রভাবে যিনি যতটা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তাঁহারা তাঁহাকেই তত উচ্চে স্থান দান করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজপতিগণ বিধাতার উপরেও কলম চালাইতে কুণ্ঠিত হন নাই; দোষ গুণের পাপ পুণ্যের ভাল মন্দের বিচার না করিয়া একেবারে সহজ উপায়ে জন্ম দ্বারা উচ্চ নীচ বংশ দ্বারা উত্তম অধম স্থির করিয়া দিয়াছেন!

ফলতঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। শম দম শৌচ সন্তোষ সম্পন্ন জ্ঞানবান্ দয়ালু সত্যশীল অচ্যুতে নিবিষ্টচিত্ত সংযতচেতা ধ্যান-ধারণামগ্ন জিতেন্দ্রিয় (১) ব্যক্তিগণের সহিত কি হিংসাপরায়ণ মিথ্যাবাদী লোভী সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী শৌচাচার পরিভ্রষ্ট মধু মাংস বিক্রয়ী সর্ব্বভক্ষক (২) মানবের সমতা হইতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী মানবগণ কি কখন পরবর্ত্তী এতাদৃশ তমোগুণাবলম্বী মানবগণের উপযোগী খাদ্যাদি খাইতে পারেন অথবা তাহাদের স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয় আদি কখন গ্রহণ করিতে পারেন? না তাহা পারেন না। উভয় শ্রেণীর রুচি সম্পূর্ণই বিভিন্ন। একের যাহাতে রুচি, অন্যের তাহাতে বিতৃষ্ণা; এক জন ভোগী, অন্য জন নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী, একজন ইহলোক সর্ব্বস্ব, অন্য জন পারলৌকিক মঙ্গল সাধনে ধ্যানমগ্ন। সুতরাং কেমন করিয়া মিলন হইতে পারে? তৎকালের সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ তমোগুণান্বিত

(১) শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি রার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম লক্ষণং।—(শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্ব কর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ। (মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)
সর্ব্বভক্ষ রতি র্নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।—(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

তৎকালীয় শূদ্রের সংস্রব সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। শূদ্রের মাংস-বহুল খাদ্য ব্রাহ্মণের অমেধ্য তুল্য পরিত্যাজ্য ছিল। শূদ্র আচার হীন নিষ্ঠুর অপবিত্র দেহ বেদবিদ্যা-বিগর্হিত তাহার সহিত কেমন করিয়া আচারবান্ ভগবৎ পদারবিন্দনিমগ্ন-চিত্ত সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি পরম দয়ালু পবিত্র দেহ বেদ-বিদ্যা-মণ্ডিত ব্রাহ্মণের সংস্রব থাকিতে পারে? বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে অনেক সময় শূদ্র জাতীয় ব্যাধগণ পানীয়জলে কুপোদকে ও খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে বিষাক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ পথিকগণের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। এই জন্যও তৎকালে এই সব শূদ্রগণের স্পৃষ্ট জল, খাদ্য দ্রব্য এবং স্পৃষ্ট কূপের জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিগণ আইন করিয়া ব্যবহার রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপকরা তৎকালে সময়ের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়ই হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহা অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু প্রাচীনকালের সেই নিয়ম এক্ষণে চলিতে পারে না। কেন না তখনকার মত ব্রাহ্মণ এখন নাই এবং তখনকার মত শূদ্রও এখন নাই। ব্রাহ্মণের শোচনীয় পতন হইয়াছে শূদ্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একটু পূর্ব্বে শূদ্রের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ের শূদ্রগণ আর সেরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট নহে। তাহারা সর্ব্বাংশে উন্নত হইয়াছে। বিদ্যায় জ্ঞানে আচারে ব্যবহারে কার্য্যে তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অথবা বলিতে কি প্রাচীন-কালে শূদ্র বলিতে যাহাদিগকে বুঝাইত বর্ত্তমান সময়ে হাড়ি ডোম মুদ্দাফরাস ব্যাধ ও ম্যাথর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে আর বুঝাইতেছে না। সমাজপতিগণ যাহাদিগকে এখন শূদ্র বলিতেছেন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অধিকাংশই শূদ্র নহে—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। কাল ধর্ম্মে বৈদেশিক আক্রমণে বিজাতীয় শাসনে ব্রাহ্মণগণের যেরূপ শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণেরও ঠিক তদ্রূপই হীন দশা ঘটিয়াছে। কালচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণের ন্যায়

বৈশ্য,ক্ষত্রিয়গণেরও অস্থি মজ্জা পিষিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ উপপ্লাবনে বৈদিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি ভাসিয়া গিয়াছিল। যদুবংশের আত্মকলহে ও শেষ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারতের অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ যাহা ছিল, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ দিনের মহাকাল সমরে চির নিদ্রায় শয়ন করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও একবিংশতিবার না হউক, দুরন্ত ব্রাহ্মণ পরশুরামের হস্তে ভারতের বহু ক্ষত্রিয় সন্তান জীবন দান করিয়াছিল এবং প্রাণ ভয়ে অনেকে বৈশ্য শূদ্র সাজিয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক বৈশ্য শূদ্রোচিত বৃত্তি অবলম্বন করতঃ প্রাণ ধারণ করিতেছিল। যে দুই চারি জন ক্ষত্রিয় ছিল তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীগণের ক্রীড়নক স্বরূপ ছিল। এইরূপ ভাবে যখন ব্রাহ্মণগণের দারুণ অত্যাচারে ও মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়গণের নিদারুণ অবিচারে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৈশ্য শূদ্রগণ জর্জ্জরিত হইতেছিল, কুক্কুর বিড়ালের মত তাহাদের উপর ব্রাহ্মণগণের অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন অত্যাচার অবিচারের ঘনান্ধকার অপসারিত করিয়া, স্নেহ সহানুভূতির, করুণা ভালবাসার, প্রেম শান্তির বিজয়পতাকা লইয়া পরম প্রেমাবতার শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার স্নেহবিজড়িত প্রেমের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অত্যাচার নিপীড়িত পদ-দলিত ঘৃণিত বৈশ্য শূদ্র আসিয়া সমবেত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া অত্যাচার দাবদগ্ধ প্রাণ সুশীতল করিল। দেখিতে দেখিতে শুধু ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর বার আনা লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাবন্যার ভারতবর্ষ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। কোথায় তাহার যাগযজ্ঞ, কোথায় তাহার বৈদিক আচার বিধি, আর কোথায়ই বা তাহার সাধের জাতিভেদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম!

পরে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির চেষ্টায় কয়েক লক্ষ লোক মাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তথাপি বঙ্গদেশ যেমন তেমনই ছিল। বঙ্গে আর হিন্দু ধর্ম্মের, বৈদিক আচারের কোন চিহ্নই ছিল না। তাই আদিশূর কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ উপপ্লাবনের ফলেই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ বৈদিক সংস্কার ও উপবীত ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই যাহা জানেন বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পণ্ডিত মহাশয়গণ তাহা জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের ঐ এক ছেলেমানুষের কথা—বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইলে উপবীত নাই কেন—বেদ-বিদ্যা নাই কেন? তাহাদের মাসাশৌচ কেন? বিদ্যালয়ের তরলমতি বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা বুঝে এই প্রবীণ পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য! দেশের অগণ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অধিবাসীকে শূদ্ররূপ মনঃকল্পিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া, তাহাদিগকে পংক্তি নির্ব্বাসন করিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্ব প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া অস্পৃশ্য অধম করিয়া রাখিয়া সমাজপতিগণ যে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন, তাহা কি হিন্দু জাতির এই মুমূর্ষু দশাতেও তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না? ৯।০ সাড়ে নয় শত বৎসরে প্রায় ৪০ কোটি হিন্দু লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইলে ১০০০ বৎসর পর একটি হিন্দুও হিন্দুনাম রক্ষার জন্য জীবিত থাকিবে না। কেন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ লোকদিগকে ঘৃণা করি, কি তাদের অপরাধ বুঝিতে পারি না। কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর, তেলাপোকা, পশু-পক্ষী যে অধিকার পাইতেছে সে অধিকার কেন আমাদের অগণ্য লোক পাইবে না? মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও হীন নীচ, মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষা অস্পৃশ্য ঘৃণিত? হায়! হিন্দুসমাজ, এই সব দারুণ অত্যাচার রূপ পাপেই না তোমার আজ এই পরিণাম ঘটিয়াছে! পূর্ব্বে বলিয়াছি ত সে ব্রাহ্মণও নাই সে শূদ্রও নাই। শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয়েরই বিলোপ ঘটিয়াছে। "সে রামও নাই

সে অযোধ্যাও নাই।” এক্ষণে দেখা যাউক আমরা যাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের স্নেহ বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া পংক্তি নির্ব্বাসন করিয়াছি, যাহাদের আনীত জল ও স্পৃষ্ট খাদ্য আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? মল্লিখিত “জাতিভেদ” ও “চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ” পুস্তকে আমি অবিসংবাদীরূপে প্রমাণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে বর্ত্তমানে যতই কেন পার্থক্য ঘটুক না কেন মূলতঃ উহারা এক জাতি। ঋষি বংশেই সকলের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র) জন্ম। কর্ম্ম ও গুণানুসারে পরে পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। একই প্রজাপতির আমরা সব সন্তান, বড় ছোট কেহই নাই। আমাদের চারি জাতির মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বর্ত্তমান। এক ব্রাহ্মণ জাতিই প্রথমতঃ সৃষ্ট হন, পরে সেই ব্রাহ্মণ হইতেই গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতির পরিণতি। আমাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিন্তু এ কথা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন—ভগবান্ বিরাট পুরুষের উচ্চ অঙ্গ মুখ হইতে উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য ও নিম্নাঙ্গ পাদ হইতে নিম্নজাতি শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এ মত যে নিতান্ত অসার ও ভ্রমাত্মক তাহা আমি পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি পুস্তকে বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি। কাজেই এস্থানে আর সে বিষয়ে আলোচনা করা সঙ্গত বোধ করিলাম না। আমাদের কর্ণধার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—বঙ্গদেশে মাত্র দুই জাতি আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। কাজেই পণ্ডিত মহাশয়গণও একবাক্যে রঘুনন্দনের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—বঙ্গে গড়ে ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আর বাকি ৯৪ জন শূদ্র। অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্বুলী, তন্তুবায়, তিলি, চাষীকৈবর্ত্ত, গোয়ালা, বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণ-বণিক সেকরা, চাষাধোবা, তাঁতি, সূত্রধর, কৈরী, পুরা, সাহা, ধোপা, জেলিয়া,

কৈবৰ্ত্ত, কলু, কাপালী, মালো, নমঃশূদ্র, কাছারু, পলিয়া, পোদ, রাজবংশী, শুক্লী, টিপরা, তেওর, ধানুক, বেলদার, চূনারী, কোরা, নাইক, মাঝি, বটী, বাগ্দী, রওয়ান, লাসারি, বহেলিয়া, বাউরী, ভূইয়া, বিন্দ্‌ চাঁই, হাড়ি, মালী, কেওরা, চামার, ডোম, মুচি, তুরী, দোছাদ, কারঙ্গা, সাপুড়ে, খন্দীকার, পাশী, পান, বুনা, বাদিয়া, শিকারী, ব্যাথর, মুদ্দাফরাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর সমুদয় জাতিকে রঘুনন্দন শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২২।২৩টী জাতি আপনাদিগকে কেহ বৈশ্য কেহবা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিয়া জাতীয় সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তন্মধ্যে বৈদ্য, কায়স্থ, রাজবংশী, নমঃশূদ্রগণের আন্দোলনের মাত্রা সুগভীর—সুভীষণ। বারুই সৎগোপ, তিলি, কৈবর্ত্ত, চাষী-কৈবর্ত্ত ঝালমাল, সুবর্ণ বণিক, চাষাধোপা, সাহা, সূত্রধর, কর্ম্মকার নাপিত প্রভৃতি জাতির আন্দোলন ইহার নিম্নে। এই আন্দোলনের ফল যাহা হইবে—তাহা বিচক্ষণগণ দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। নমঃশূদ্রগণই হিন্দুর মধ্যে চাষী প্রধান জাতি। তাহারা একযোগে দলবদ্ধ হইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে—বর্গাজমি চষিতে প্রস্তুত কিন্তু ক্ষেত্র হইতে বাটীতে বোঝা বা শস্যাদি দিতে অসম্মত! জোতদার হিন্দুগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত! ওদিকে মুসলমান বর্গাদারগণও বাটীতে শস্য আনিয়া দিতে অসম্মত। মালী অনেক জাতির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, নৌকার মাঝি পোঁটলা-পুটলী বহন করিয়া বাড়ী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত আনিতে—স্ত্রীলোক লইতে, অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। মজুর একরূপ মেলে না। যাহা মেলে তাহা দৈনিক।০, ॥৵০, কি ৸০ আনা পর্য্যন্ত। তাও বহু সাধ্য সাধনা করিয়া আনিতে হয়। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচারিত প্রাণ এইবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা—অবাধবিদ্যা, স্কুল কলেজ অত্যাচারের মূল্যোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাগণ অস্ত্র-বলে যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরাজী আমলে, অবাধবিদ্যা প্রচারে তাহা সম্পন্ন হইতে

চলিয়াছে। মানবের অধিকার কি এবং তাহা কেমন করিয়া হস্তগত করিতে হয় অবজ্ঞাত শ্রেণীর অগণ্য লোক-সমূহ তাহা এক্ষণে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছে এবং জ্ঞাত হইয়া তল্লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বেদ পাঠে জিহ্বাচ্ছেদ, বেদ শ্রবণে কর্ণরন্ধ্রে তপ্ততৈল নিক্ষেপ, ভগবৎ আরাধনায় শিরশ্ছেদ প্রভৃতি শূদ্রযোগ্য ন্যায় ও দয়ালদণ্ডের এইবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ। চারি যুগের দারুণ অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত এক সঙ্গে উপস্থিত! অভিজাতগণ, এইবার সাবধান ও সতর্ক হউন!

এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত সামাজিক আন্দোলনকারিগণের প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রসম্মত কোন দাবী আছে কি না। তাহারা কি বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতেছে, না—অমনি শুধু শুধুই একটা মিথ্যা কল্পনা জল্পনা লইয়া আন্দোলনে তৎপর হইয়াছে। আমি যতটা জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, আন্দোলনকারী-গণের প্রকাশিত ও লিখিত পুস্তকাদি কোনরূপ যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হইতেছে না, কেবল মুখে মুখে সভাসমিতি করিয়া বলা হই-তেছে, 'তোমরা যাহা আছ তাহাই থাক, তোমাদিগকে কোনপ্রকার উচ্চ অধিকার দেওয়া হইবে না।' এই বিংশ শতাব্দীতে এ প্রকার উত্তরে শিশুকেই নিবৃত্ত করা যায় না তা আবার ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত বিপুল উদ্যমশীল যুবকগণকে কি কখন নিবৃত্ত করা যাইতে পারে? কখনই নয়। ভারত এখন আর শুধু ব্রাহ্মণের ভারত নাই। ভারত এখন আচণ্ডালের ভারত। সারা ভারতময় হিন্দু সমাজের একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণগণকে এখন উঠাইয়া লইতে হইবে। ২০ কোটি হিন্দু লইয়া হিন্দুসমাজ, না মুষ্টিমেয় তর্ক-চূড়ামণি, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ লইয়া হিন্দুসমাজ? ভারতীয় হিন্দুসমাজ এখন আর তর্কবাগীশের নয়—এখন উহা ন্যায়বাগীশের। তর্কের যুগ গিয়াছে, তর্ক করিয়া অধিকার লাভের যুগ অতীত হইয়াছে। এখন ন্যায়ের যুগ—যুক্তির যুগ। এ যুগ শাস্ত্রের ভ্রূকুটীতে, পারলৌকিক দোহাইএ অভিশম্পাতের ভয়ে, টিকির

আন্দোলনীতে ভীত হইবার নহে। সে বর্ব্বর যুগ কালের কুক্ষিতে চিরতরে বিলীন হইয়াছে।

শূদ্রের লক্ষণ।

অন্যান্য সমুদয় জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর জলচল জাতির জাতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। নতুবা প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র আলোচনা করা এতাদৃশ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে, প্রয়োজনও নাই। আমাদের উপস্থিত আলোচ্য জাতি হইতেছে বৈদ্য, কায়স্থ, বারুজীবি, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, তিলি, তাম্বুলি, কর্ম্মকার, মালাকার, তন্তুবায়, নাপিত, মোদক প্রভৃতি। ইহারা সকলেই উচ্চশ্রেণীস্থ এবং সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে জলাচরণীয় জাতি। রঘুনন্দন এবং তৎপ্রদর্শিত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইহারা সকলেই শূদ্র। এক্ষণে দেখা যাউক ইহারা প্রকৃত পক্ষেই শূদ্র কি না। শাস্ত্রকারগণ শূদ্রের এইরূপ লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

(মহাভারত; শান্তিপর্ব্ব, ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ।)

"যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, মিথ্যাবাদী ও শৌচ ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়া ছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

লাক্ষা লবণ সম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০

(অত্রি সংহিতা)

যে লাক্ষা লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু মাংস বিক্রয় করে সেই ব্রাহ্মণ নামধেয় আর্য্য শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপিচ—

সর্ব্ব ভক্ষ রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি অপবিত্র অশুচি, যাঁহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সর্ব্ব-ভক্ষক, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, জীবিকা নির্ব্বাহের, ব্যবসায়ের বা বৃত্তির স্থিরতা নাই, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে শূদ্র বলা যায়।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শূদ্র তমোগুণ প্রধান, অলস, নিরুৎসাহ এবং জ্ঞানহীন সুতরাং দাসত্বই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শূদ্র চিনিবার আর একটি প্রধান চিহ্ন ছিল—শরীরের রং। ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণের

"শূদ্রাণামসিতস্তথা,,

(মহাভারত ; শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।)

শরীরের সাধারণ রং ছিল কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ আফ্রিকার নিগ্রো-গণকে দেখিবা-মাত্র যেমন তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা চিনিতে পারা যায় পূর্ব্বে শূদ্র দাসগণকেও শুধু শরীরের বর্ণ বা রং দ্বারাই চিনিতে পারা যাইত যে ইহারা শূদ্র।

সৎকথিত জলাচরণীয় নবশায়কগণ কিন্তু প্রথম শ্লোকের মোটেই অন্তর্ভুক্ত নহে। দ্বিতীয় শ্লোকে যে দুগ্ধ ও ঘৃত বিক্রয়ের কথা আছে উহাতে আংশিক ভাবে সৎগোপ দোষী বটে কিন্তু বৈশ্যের লক্ষণেইত আছে।

"কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্"

কৃষি গোপালন গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের জীবিকোপজীবী বৃত্তি, কথিত আছে—দ্বাপরে ব্রজগোপিনীগণ পর্য্যন্ত মথুরার বাজারে দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখনাদি বিক্রয় করিতে যাইতেন। সুতরাং সৎগোপের পক্ষে দুগ্ধ ঘৃত

বিক্রয় অপরাধের মধ্যে, গণ্য হইতে পারে না। গোরক্ষা গোপালন কার্য্য যদি বৈশ্যের হয়, তবে ঘৃত দধি দুগ্ধ বিক্রয় বৈশ্য না করিলে অন্য তিন জাতি কোথায় পাইবে।

তৃতীয় শ্লোকে—"ত্যক্ত বেদ" ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণের সঙ্গে ইহাদের সামঞ্জস্য নাই। "ত্যক্ত বেদ" ইহাই যদি শূদ্রত্বের কারণ হয় তবে ব্রাহ্মণগণও এ শূদ্রত্ব হইতে নিস্তার পান না। কেন না বেদ পাঠ করা ত দূরের কথা কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাটীতে বেদ আছে কিনা সন্দেহ,—বেদ যে কি পদার্থ তাহা অনেকে দেখেনই নাই—পাঠ ত দূরের কথা। "এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি"। বেদ বেদান্তের বড় বড় কথা কেবল আমরা মুখে আওড়াইতেছি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া আসর রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সুতরাং "ত্যক্ত বেদ" বলিয়া ইহাদিগকেই শুধু দোষী করা যাইতে পারিতেছে না। আর পূর্ব্বেও ত বলিয়াছি—দারুণ বৌদ্ধ বিপ্লবে দেশ হইতে বেদের শিক্ষা বেদ-চর্চ্চা বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় এই সব জাতি বেদ পাইবে কিরূপে? বিশেষতঃ তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেও বেদ ব্রাহ্মণগণের এক চেটিয়া সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বংশপরম্পরারূপে ব্রাহ্মণ-গণ শুধু ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকেই বেদ-বিদ্যা দান করিতেন। ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রগণ যেরূপ বংশপরম্পরারূপে পিতৃ-সিংহাসন পিতৃ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন—ঐ সিংহাসনে বা রাজৈশ্বর্য্যে এবং বৈশ্যের ঐ ধন সম্পত্তিতে যেমন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ-শূদ্রকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল কাজেই বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের একমাত্র সম্পত্তি বেদ-বিদ্যা ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা হইতে অপর তিন জাতিকে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইলেন এবং উহাকে তাঁহারা আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ও উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই সময় হইতেই বেদমন্ত্র ও পূজার্চ্চনায় 'দক্ষিণা-বাক্যের' সূচনা আরম্ভ হইল। তাই বলিতেছিলাম এই

"ত্যক্ত বেদ" অপরাধেই তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। চতুর্থ শ্লোক অনুযায়ী দাসত্ব তাহাদের বৃত্তি বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক—একশত বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত কায়স্থ নরসুন্দর মালী তন্তুবায় নমঃশূদ্র প্রভৃতি ভিন্ন প্রায়শঃ অন্য কোন বর্ণ অন্য বর্ণের (ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত) দাসত্ব করিত না। ইহাদিগের মধ্যে—ব্যক্তিগত হিসাবে অনেকে দারিদ্র্য বশতঃই দাসত্ব করিত, সমষ্টি হিসাবে নহে। কেন না—ঐ সমস্ত জাতির ব্যবসায়ে যথেষ্ট পয়সা রোজগার হইত। দাসত্ব করিতে যাইবে তাহারা কোন্ দুঃখে? বর্ত্তমান কালের ন্যায় দাসত্বের নামান্তর চাকুরীর প্রতি তখনকার, শতবৎসর পূর্ব্বের লোকের এতাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সুতরাং "পরিচর্য্যা করা" অপরাধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত মনে করিতে হইবে। ৫ম বা শেষ শ্লোকে যে"কৃষ্ণ বর্ণ" শূদ্রের শরীরের রং এর কথা বলা হইয়াছে সে অপরাধেও তাহাদিগকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। কেন না ইহাদের সন্তানগণের মধ্যে অনেক পূর্ণচন্দ্রানন—ইন্দিবরাক্ষ পক্কবিম্বাধর দেখিতে পাওয়া যায়—অন্য পক্ষে অনেক ব্রাহ্মণের গৃহে অমাবস্যা পরাজিত—আবলুস বিনিন্দিত নধরকান্তি শিশুর অভাব নাই। সুতরাং শাস্ত্রের লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া দেখা গেল, ইহারা শূদ্র লক্ষণাক্রান্ত নহে; তাহাপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত সুতরাং বৈশ্য ক্ষত্রিয় সংজ্ঞাভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই পাঁচ শ্লোকের প্রমাণও যাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন না তাঁহাদিগের জন্য আরও প্রদর্শন করা যাইতেছে। ধীরচিত্তে পাঠ করুন।

(১) শাস্ত্রে আছে—"ন চ সংস্কার মর্হতি—"

শূদ্রের কোন সংস্কার নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির যেমন (ক) বিবাহ (খ) গর্ভাধান (গ) পুংসবন (ঘ) সীমন্তোন্নয়ন (ঙ) জাতকর্ম্ম (চ) নামকরণ (ছ) অন্নপ্রাশন (জ) চূড়াকরণ (ঝ) উপনয়ন (ঞ) সমাবর্ত্তন এই দশবিধ সংস্কার আছে, শূদ্রের সেরূপ কিছু নাই। কিন্তু আমাদের কথিত নবশায়কগণের

মধ্যে এক (ঝ) উপনয়ন-সংস্কার ভিন্ন আর সবগুলিই ব্রাহ্মণের ন্যায় আছে। সুতরাং ইহারা শূদ্র নহে।

(২) শূদ্রের "অমন্ত্র যজ্ঞো" মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ। কিন্তু নবশায়কগণের পূজাদিতে পুরোহিতগণ কর্তৃক মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২ক) চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ

ব্রতং নাস্তি তপোনাস্তি হোম নৈব চ বিদ্যতে॥ ৩

পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্র বিবর্জ্জনাৎ।

খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানান্ত শূদ্রো দানেন শুধ্যতি॥ ৪

(৫ম অধ্যায়, আপস্তম্ব সংহিতা)

"চতুর্থ বর্ণ শূদ্রজাতির—প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোমও কর্ত্তব্য নহে; পঞ্চগব্য বিধি দিবে না, যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই—শূদ্র দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।"

(২খ) অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃশূদ্রজাতিষু।

অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি॥ ২৪৮।

(অত্রি সংহিতা।)

"ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান করিলে স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবেন।" কিন্তু উপরি উক্ত জাতিগণের জল সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ব্রাহ্মণগণের পানীয়, গ্রাহ্য ও আচরণীয়।

(৩) উদ্বাহতত্ত্বে দেখা যায়—শূদ্রের কোন গোত্র নাই। কিন্তু এই সমস্ত জাতিগণের মধ্যে যথাবিধি গোত্র প্রচলিত আছে।

(৪) মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্॥

ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না * * * * কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না কিংবা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।"

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে বহুকাল হইতে লৌকিক ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও ব্রতাদি পালনের আদেশ দিয়া এবং নিজেরা সেই ব্রত সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

(৫) জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।

দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥১৩৫ অত্রি সংহিতা।

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা-আরাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্বজনক।"

তপস্যা ব্রাহ্মণেই করেন না, তা আবার অন্যে করিবে। বাকি পাঁচটী, ব্রাহ্মণের ন্যায় নবশায়কগণও করিয়া থাকেন। বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৬) "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ" কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ পাপ-পুণ্য বোধ আছে এবং সামাজিক কোন পাপ করা মাত্র পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পতিত।

(৭) কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্র-যাজন করিবেন না। যিনি শূদ্র-যাজন করিবেন, তিনি মহর্ষি তুল্য হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতির যাজককে, শূদ্রজাতির যাজককে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ পতিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

যথা—

হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণণাঞ্চৈব যাজকাঃ॥ ১৬৪

* * * *

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।

তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্॥ ১৭৮

* * * যে ব্রাহ্মণ নানা জাতীয় লোকের যাজক, যিনি শূদ্র যাজক

ব্রাহ্মণ, ইঁহারা যে যে পংক্তিতে উপবেশন করেন সেই সেই পঙক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এক জাতীয় শূদ্রের অতিরিক্ত শূদ্র-যাজী ব্রাহ্মণগণ, গ্রাম-যাজীগণ মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যথা—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যে গ্রাম-যাজী য কীর্ত্তিতঃ।

* * * * ॥২০২

এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তিতে ॥ ২০৪

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—৩০ অধ্যায়ঃ)

নিম্নে ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলা হইতেছে—

অব্রাহ্মণাস্ত ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।

* * * *

তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থো গ্রাম-যাজকঃ।

(ইতি শাতাতপঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।)

গ্রামস্থ নানা বর্ণানাং পুরোহিতঃ। সতু চতুর্থো ব্রাহ্মণঃ।

গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং শূদ্রবৎ—

অসিজীবি মসিজীবি দেবল গ্রামযাজকাঃ।
পাচক ধাবকশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ ॥

এই স্থলে গ্রামযাজী ব্রাহ্মণগণের একটু বর্ণনা প্রদানের লোভ সামলাইতে পারিলাম না। ইহার লেখক কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রায় ৩৮৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক—

'মূর্খবিপ্র ব'সে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখায় পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজা ঘরে ঘরে,
চা'লের বোচকা বান্ধি টান ॥

ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপ ঘরে দধিভাণ্ড,
তেলি ঘরে তৈলকুপি ভরি।
কোথায় মাসড়া কড়ি, কেহ দেয় ডাল বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি॥
গুজরাট নগরে, নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে,
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান।
সঙ্গে করি দ্বিজ কয়, কাহণ দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশা দক্ষিণা স্ফুরণ॥

যদি এই নবশায়কেরা শূদ্র হয়, তবে ইহাদের যাজক ব্রাহ্মণগণকেও পতিত ও শূদ্রবৎ হীন হইতে হয়। কিন্তু ইহারা ত সমাজে পতিত নহেন। ব্রাহ্মণ সমাজে ইহারা হীন হইলেও ইহাদের কন্যাগণকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন—আর আহারাদি সম্বন্ধে ত কথাই নাই। এই সব পতিত ব্রাহ্মণগণের যাজক-পুরোহিত কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণগণ। ইহারা শূদ্র-যাজনের জন্য পতিত হইলে সে পাপে ও সংস্রব-দোষে সারা ব্রাহ্মণ জাতিই পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে।

শূদ্রগুরু ব্রাহ্মণ পতিত।

(৮) ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র শিষ্য করা শূদ্রযাজনের মতই পাতিত্বজনক।

যথা—"শূদ্র শিষ্যো গুরুশ্চৈব * * * * ॥ ১৫৬

ঐ তৃতীয় অধ্যায় মনু।

"যিনি শূদ্র-শিষ্য—যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান—* * * * * * তাঁহাদিগকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না। কেন না ইহারা পতিত ব্রাহ্মণ।"

ইহারা যদি শূদ্র হয় এবং ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরুগণ যদি পতিত হন, তবে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই পতিত হইয়াছেন—যাঁহাদের এ সব জাতি শিষ্য নাই তাঁহারাও শূদ্র-শিষ্য পতিত ব্রাহ্মণগণের সহিত আহারাদি করার দরুণ ও

গৌন সম্বন্ধে নিশ্চয় পতিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের আপনাদের শুধু ব্রাহ্মণ নাম বজায় রাখিতে হইলেও ইহাদিগকে শূদ্রেতর বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহা না হইলে তাঁহাদের নিজেদেরই জাত থাকে না।

নবশায়কগণ শূদ্র নহে।

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, নবশায়কগণ শূদ্র নহে—শূদ্র হইলে বা তাহাদিগকে শূদ্র বলিলে ব্রাহ্মণের আর ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। অন্ততঃ ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিতে হইলেও তাহাদিগকে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। আর ইহারা যে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে কিন্তু এ পুস্তকে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পুস্তকান্তরেই আমি তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাদিগকে দ্বিজবর্ণান্তর্গত বৈশ্য, ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে গণ্য করিবার ও প্রমাণ করিবার কারণ এই যে—তাহা হইলে ইহাদের অন্ন গ্রহণ যোগ্য ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে; কেন না ব্রাহ্মণগণ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেন, শাস্ত্র পাঠে ইহা অবগত হইতেছি। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেন তাহাই প্রমাণ করিয়া অতঃপর প্রমাণ করিব যে তাঁহারা শূদ্রের অন্নও গ্রহণ করিতেন। পরাশর স্মৃতি কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা :—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশরস্মৃতঃ॥ ২৩

পরাশর সংহিতা—১ম অঃ।

উক্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ক্ষত্রিয়বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

"যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্ এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্য কব্যে" ভোজন করিবে।

মনু আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের মতামত উদ্ধৃত করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এম্, এ; পি, এইচ, ডি; সি, আই, ই; মহোদয় তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস" নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"But in the olden times we see from the Mahabharat and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other. Manu lays down generally that a twice born should not eat the food cooked by a Sudra (IV. 223); but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV. 253). The implication that lies here is that the three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of a Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriya or Vaisya) who observes his religious duties (17. 1). Apastamba, another wtiter of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the *varnas* who observe their proper religious duties, except with the Sudras. But even here there is a counter exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra who may have attached himself to him with a holy intent.

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এলফিনষ্টোন সাহেবও তৎকৃত "ভারত ইতিহাসের" ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

But there is no prohibition in the code against eating with other classes or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras; and even then the offence is expiated by living on water gruel for seven days. (Manu Ch XI. 153)

পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় মান্দ্রাজে হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—

Even in the time of the epics the Brahmans dined with the Kshatryas and Vaisyas as we see from the Brahmanic—sage Durvasa having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas"

প্রাচীন আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখন শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও সেই সকল নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞকালে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুনি-ঋষিগণকে ভোজন করাইতেন। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন—প্রাচীন কালে বৈশ্যই সূপকার বা পাচক ছিল। বর্ত্তমান কালের মত ব্রাহ্মণের তখন পাক করিয়া দিয়া বেতন লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত না। তাঁহাদের এমন শোচনীয় পতন তখন হইয়াছিল না। বিরাট-রাজভবনে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন আপনাকে সূপকার বলিয়া পরিচয় দান পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে (রন্ধনের কার্য্যে) নিযুক্ত হইয়া অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করেন। রাজবাটীতে মুনিঋষি যাঁহারা

অতিথিধর্ম্মী হইয়া আসিতেন সকলেই ঐ সূপকারের অন্নই গ্রহণ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য লোপ হইত না। এবং নিজেরাও কখন পাক করিয়া খাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতঃপর তথা কথিত রঘুনন্দনবর্ণিত শূদ্রগণের অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন আলোচনা করা যাউক। সর্ব্ব প্রথম মনুর কথাই ধরা যাউক। মনু লিখিয়াছেন—

আৰ্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাস গোপালো নাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২৫৩

(মনু-সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।)

ভূমি-কর্ষক (অর্দ্ধসীরী, বর্গাদার অর্থাৎ যাহার সহিত আধা আধি ভাগ লইয়া এক খণ্ড জমিতে চাষ করা যায়), কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে) গোপালক (রাখাল), ভৃত্য (চাকর), ক্ষৌরকার (নাপিত), এবং যে "আমি আপনার সেবা করিয়া নিকটে অবস্থান করিব" এরূপ আত্ম নিবেদন করে, এমত শূদ্রের অন্নও ভোজন করা যায়। ভগবান বিষ্ণু বলিয়াছেন :—

আৰ্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষুভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬

(বিষ্ণুসংহিতা, ৫৭ অধ্যায়।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৬৮

(যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা,—১ম অধ্যায়।)

যম বলেন :—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০

(যম-সংহিতা,—১ম অধ্যায়।)

মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন ঃ—

নাপিতান্বয় মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাস-গোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি ॥৫১

(ব্যাস-সংহিতা,—১১শ অধ্যায়।)

* * * ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না।

তদীয় পিতৃদেব পরাশর ঋষিও বলিতেছেন ঃ—

দাস নাপিত গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানঃ নিবেদয়েৎ ॥ ১০

(পরাশর সংহিতা,—১১শ অধ্যায়।)

উপরে মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, যম, ব্যাস, পরাশর সংহিতা হইতে উপরি-উক্ত জাতিগুলির অন্ন-গ্রহণ বিধি ও তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তদীয় সংহিতায় আদেশ করিয়াছেন ও ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৫ জন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি অনুমোদন করিতেছেন। এখন ভগবানের আদেশ ও পরাশর, ব্যাস, মনুর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে? আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কি ভগবান বিষ্ণু ও পরাশর ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষাও অধিক শাস্ত্রজ্ঞ নাকি? কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ পণ্ডিত মহাশয়গণ নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারাও হিন্দু-শাস্ত্রের পাতা উলটাইতে ২ শ্লোকের পর শ্লোক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে "আদি পুরাণ হইতে পরাশর ভাষ্যধৃত" বাহির করিয়া দেখিলেন এক শ্লোক! আর চাই কি? আনন্দে আটখানা!

সে ভাষ্যটি এইরূপ ঃ—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং, দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ দত্তাকন্যা
প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং
কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব প্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজ রক্ষার্থে ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস (ভৃত্য), গোপালক (রাখাল), কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী (বর্গাদার) শূদ্র জাতির মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন ইত্যাদি।

এখন এই আদি পুরাণের বচন হইতে অনেকগুলি প্রশ্ন উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে :—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥২৩
(১ম অধ্যায়, পরাশর সংহিতা।)

"সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপর যুগে শঙ্খ লিখিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম।" ইহা যদি সত্য হয় অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম যদি পরাশর মতানুযায়ীই হয় তবে মহাত্মা বুধগণ (পণ্ডিতগণ) কেমন করিয়া কলির প্রারম্ভেই পরাশরের আইন উল্‌টাইয়া দিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিতে পারেন? সমগ্র কলিযুগের জন্য ব্যবস্থা হইল পরাশরের ধর্ম্ম ও বিধি। সেই পরাশরের বিধি অনুসারে কাজ না করিয়াই পণ্ডিতগণ কলির প্রথমেই নূতন হাতগড়া আইন জারি

করিতে পারেন কিরূপ ? বরং এরূপ লিখিলে কতকটা সম্ভবপর হইত যে পরাশরের বিধি কলির সিকিকাল কি অর্দ্ধেককাল গত হওয়ার পর। পণ্ডিতগণ দেখিলেন ঐ বিধি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়া উঠিল, তখন ঋষিগণ বা মহাত্মাগণ নূতন বিধি রচনা করিয়া পরাশরের বিধি উলটাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নতুবা ঋষিগণ যাহাকে কলিযুগের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে অনুরোধ ও আদেশ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণের কি সাধ্য ও সাহস যে তাঁহাদের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থা, নূতন হুকুম জারি করিতে পারেন ? পরাশরের তুল্য অন্য কোন ঋষি হইলেও না হয় মানিয়া লওয়া যাইত, কিন্তু পণ্ডিত-গণের কলম ঋষির উপর জারি করা নিতান্তই শোভন হয় নাই। ইহা যেমন দৃষ্টি ও শ্রুতি কটু তেমনি মূর্খতাব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—পরাশর নিজে বিধি রচনা করিয়া নিজেই উহার প্রতিকূল মত কেন আদি পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতে যাইবেন ?

তৃতীয়তঃ—ইহা আদি পুরাণের বচন। পুরাণের স্থান শাস্ত্রকারগণ স্মৃতিসংহিতার নিম্নে প্রদান করিয়াছেন। পুরাণের প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু স্মৃতিসংহিতার সহিত উহার সমতা থাকে। স্মৃতিসংহিতার সহিত উহার যখনই—যে অংশই গরমিল ও মত দ্বৈধতা উপস্থিত করিবে তদ্দণ্ডেই—সেইটুকুই অগ্রাহ্য। যেহেতু শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধঃ যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

অর্থাৎ যে স্থানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবে, তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। সুতরাং মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস ও যম-সংহিতার বচনের সহিত পুরাণ শাস্ত্র আদি পুরাণের বচনের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উপরের শ্লোক অনুযায়ী আদি-পুরাণের ঐ বচন অগ্রাহ্য হইয়া গেল। বিশেষতঃ বেদব্যাস ঋষি

আপন রচিত সংহিতায় যাহা লিখিলেন তাহা কি আবার নিজের আদি পুরাণে খণ্ডন করিয়া দিবেন! ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। নিজেই একস্থানে বিধি দিয়া আবার নিজেই উহা কি অবিধি বলিয়া লিখিতে পারেন? মনে হয় না। আমাদের মনে হয় ঐ শ্লোক অতি আধুনিক এবং আদিপুরাণে প্রক্ষিপ্ত না হইলেও উহা ন্যায়তঃ অগ্রাহ্য। আরও না হয় যদি বুঝিতাম যে, সংহিতাকার এক যোগে ভৃত্য, গোপাল, কুলমিত্রগণের অন্ন গ্রহণ যোগ্য বলিলেও আদিপুরাণের ন্যায় অন্যান্য পুরাণকারগণ ও উহার বিরুদ্ধে মত দিতেছেন, কিন্তু তাহা ত নয়। পৌরাণিক বিধিতেও উহার অনুকূল মতই লিখিত আছে।

যথাঃ—শূদ্রেষু দাস-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
(গরুড়-পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৯৫অ—৬৬)

অপিচ—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালঃ দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ—১৭)

এতৎ সঙ্গে আরও দুইটী বিশেষ বিধি কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

কুশীলবঃ কুম্ভকারঃ ক্ষেত্র-কর্ম্মকঃ এব চ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্বা স্বল্পং পণং বুধৈঃ॥
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ—১৮)

নট, কুম্ভকার, কৃষক ইহাদিগকে অল্পমূল্য দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়।

পায়সং স্নেহ-পক্বং যদ্গোরসশ্চৈব সক্তবঃ।
পিণ্যাকশ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ॥
(কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭অ)

পায়স, জলোপসেক ব্যতীত ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা পক্ক বস্তু (মোহনভোগ প্রভৃতি), শক্তু (ছাতু), পিণ্যাক (তিলের খৈল) ও তৈল এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। (১)

সাংহিতিক যুগের ন্যায় তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগেও কুম্ভকার, নরসুন্দর ও কৃষকাদির অন্ন ভোজ্যান্ন ছিল, উল্লিখিত বচন দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে। দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী শাস্ত্রের বিধি পরিবর্ত্তনশীল। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কলমের জোরে ইহাদিগকে শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও মনঃ প্রাণে জানিতেন ইহারা হীন শূদ্র নহে এবং কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল ধন ধান্য, অমিত বৈভব দেখিয়া সহসা লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাই পায়সাদি মুখরোচক সুস্বাদু আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অন্ন বাদ দিয়া এখানে শুধু পায়স, ঘৃতপক্ক মোহনভোগাদির ব্যবস্থা আছে! ফলতঃ এই সমস্ত কৃষক আদি জাতি কখনও শূদ্র ছিল না ইহা শাস্ত্রকারগণ মনঃ প্রাণে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের গৌরব সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় জাতিকে তাঁহাদের বহু নিম্নে অবনত করিয়া রাখিবার জন্য ইহাদিগকে বৈশ্যাদি সংজ্ঞা হইতে অপসৃত করিয়াও ইহাদের মায়া—ইহাদের প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন পায়স মোহন-ভোগাদির মায়া ও লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুধু পুথিগত ভাবেই বহুদিন পর্য্যন্ত শূদ্রে সংজ্ঞায় নাম লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। কলমের খোঁচায় ইহাদিগকে যে শূদ্রত্বে পরিণত করা হইল, ইহা তাহাদিগকে কোন প্রকারেই জানিতে দেওয়া হয় নাই। অন্নাদি যথারীতি ব্যবহৃত হইত, সম্মানের কোন প্রকার লাঘব করা হইল না। এইরূপ ভাবে, কি বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর, ব্রাহ্মণগণ সুযোগ ও সুবিধামত আপনাদের পুথিগত ব্যবস্থা তখন আস্তে

(১) পূর্ব্বে তেলি বলিয়া এক জাতীয় শূদ্র ছিল, তাহারাই তৈল যোগাইত এখন কিন্তু ব্রাহ্মণের তৈল যোগায় মুসলমান কলু। শাস্ত্রমতে হিন্দুশূদ্রের তৈলই গ্রহণযোগ্য, মুসলমানের নহে। পণ্ডিত মহাশয়গণ কি বলেন ?

আস্তে কার্য্যে পরিণত করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশের অস্তিত্ব কলমের খোঁচায় শাস্ত্রের নামে লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন, ফলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই—নামান্তর পরিগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নাম না থাকিবার ইহাই মূল কারণ, ইহাই যুক্তি-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা!

এইত ভূরি ভূরি শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম—এক্ষণে শাস্ত্র সর্ব্বস্ব বচন-বাগীশ হিন্দু সমাজ কি এই বিধি মানিতে প্রস্তুত আছেন? এখন না মানিলেও শীঘ্রই মানিতে হইবে। বিংশ শতাব্দি সমুদয় জড়তা, সমুদয় গোঁড়ামী-নষ্টামী-ভণ্ডামীর মূল উপড়াইয়া ফেলিয়া তবে ছাড়িবে। তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পদ্মার পার ভাঙ্গার মত ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? গলা বাজিতে ও আর্য্যামীর ন্যাকামীতে এ ভাঙ্গা আর রোধ করিতে পারিতেছ না। মঙ্গলময় বিধাতা শ্রীহস্তে নূতন ভারতের নূতন সজীব হিন্দু সমাজ গঠনের পত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন ভ্রান্ত সমাজপতি! বৃথাই ইহার গতি রোধ করিতে—অনর্থক গলাবাজী করিয়া —চীৎকার করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতেছ মাত্র। তোমার শত চীৎকার, সহস্র আর্ত্তনাদ, সে নির্ব্বিকার নবসমাজগঠনকারী বিধাতা পুরুষের ইচ্ছার গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। শাস্ত্রের নামে কপটতা, ধর্ম্মের নামে প্রতারণা, ঋষিগণের নামে প্রবঞ্চনা, আর কতকাল চলিতে পারে? শাস্ত্রের নামে লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী আচার, কুলাচার এবং অনাচার-অত্যাচার দেশবাসীর, হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অবিচার যতটা করা সম্ভব—করা হইয়াছে। আর না। যথেষ্ট হইয়াছে। আর তর্কচূড়ামণি স্মৃতিরত্নের বেদ ব্যাখ্যায়, ন্যায়ের কচ্‌কচিতে, ঘটত্ব পটত্বের বাগ্‌-বিতারে, দেশবাসী তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। আর তোমাদের ৬ জনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া বাকি ৯৪ জন চোখে তৈল দিয়া ঘুমাইতেছে না। এইবার তাহারা জাগ্রত হইয়াছে, আপনাদের স্বার্থ, কল্যাণ ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছে। ধর্ম্মের নামে—শাস্ত্রের নামে—

ভুয়া জিনিষ দিয়া এতকাল তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তাহারা খাঁটি নকল বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছে। স্ত্রী আচার লোকাচার দেশাচারের নামে দেশের অগণ্য লোককে কুক্কুর বিড়াল অপেক্ষাও ঘৃণিত ভাবে রাখা হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রাণ-প্রিয় সন্তানগণকে, দেশের অস্থিমজ্জা স্থানীয় অগণ্য অধিবাসীকে, সমাজের—জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ কোটি কোটী প্রকৃতি পুঞ্জকে, ছুঁৎমার্গের দোহাই দিয়া অচল অস্পৃশ্য অব্যবহার্য্য পঙ্‌ক্তি নির্ব্বাসন করিয়া দিয়াছ। দেবালয়ের পবিত্র মণ্ডপেও তাহাদের প্রবেশ অধিকার বন্ধ করিয়া দিয়াছ। পবিত্র দেবমন্দির ঘৃণায় হিংসায় ছুঁৎমার্গে ক্রৌমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত করিয়াছ। পদদলিত নিপীড়িত বুভুক্ষিত জনমণ্ডলীর বুকের রক্ত দিয়া, ক্ষীণ কঙ্কাল দিয়া, মেদ মাংস দিয়া, দেব মন্দিরের উচ্চ চূড়া তুলিয়াছ কিন্তু উহাতে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই! তাহারা টাকা দিবে, পয়সা দিবে, অলঙ্কার দিবে, বস্ত্র দিবে, চাল দিবে, দাল দিবে কিন্তু একটু জল দিতে পারিবে না! কেন এ অবিচার? তুমি সমাজপতি গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, মদ গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে দূর দূর করিতেছ কিন্তু প্রভু ত আমার কাহাকেও ত্যাগ করেন না। তাঁহার কাছে সব সমান। তাঁর কাছে ত ছোট বড় নাই, তাঁর কাছে ত উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। তুমি অন্ধ জাত্য-ভিমানে স্ফীত হইয়া তাহাদিগকে মন্দি-রের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে দিতেছ না বরং দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ—কিন্তু ঐ যে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, করুণার মহাজলধি, দয়ার আধার, সর্ব্ব জীবের শরেণ্য বরেণ্য—প্রেমময় পিতা আমার ছল ছল নেত্রে কাতর দৃষ্টিতে বাহু প্রসারণ করিয়া ডাকিতেছেন—"ওরে যাস্‌নে যাস্‌নে ফিরে আয়, আমার বুকে আয়, এখানে ব্রাহ্মণের ভয় নাই পুরোহিতের চোখ্ রাঙ্গানি নাই, সমাজপতির কুটীল ভ্রূকুটী নাই। আমার কাছে চণ্ডাল নাই, পাড়িয়া নাই, মেঘ নাই, মুদ্দাফরাস নাই, মুচি নাই, ডোম নাই, হাড়ি নাই ম্যাথর নাই, আয় আয়! কোলে আয়! আহা তোদের বড় বেদনা, বড় কষ্ট,

তোদের ব্যথা যে আমি সইতে পারি না। মূঢ় অত্যাচারিগণ, ব্রাহ্মণাদি সমাজপতিগণ, তোদের শীর্ণ দেহে, কঙ্কাল শরীরে, দারিদ্র্য-দুঃখ-অত্যাচার-নিপীড়িত দুর্ব্বল অঙ্গে যতগুলি আঘাত দিয়াছে, যতবার পদদলিত করিয়াছে, লাথি জুতা মারিয়াছে—এই দেখ সবগুলিই আমার অঙ্গে, আমার পৃষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে! পতিত আর্ত্ত কাঙ্গাল যে আমার অভিন্নদেহ! আমার যাহারা অভিন্নদেহ, আমার যাহারা সন্তান, মূঢ় অভিজাতবর্গ বৃথা জাত্যভিমানে অন্ধ জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাদিগকে ঘৃণা অবজ্ঞা করিয়া, পদদলিত লাঞ্ছিত করিয়া আমারই লাঞ্ছনা করিতেছে, কিন্তু ইহাই শেষ নহে, ইহারও পরিণাম আছে। পিতার মন্দিরে কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উত্তম অধমের ভেদ আছে? পবিত্র দেব-মণ্ডপে কি উচ্চ নীচ, মহৎ ক্ষুদ্র, জাতি বিজাতি আছে? এখানে সকলের সমান প্রবেশ অধিকার। আমি যাহাকে কোল পাতিয়া গ্রহণ করি, মূঢ় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে তাড়াইতে চায়। কি ভ্রান্তি! কি আস্পর্দ্ধা! কি গর্ব্ব!!"

কলিযুগ পাবনাবতার আমার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গও ত এইরূপ কথাই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
(মধ্যলীলা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

যে সুবর্ণবণিক জাতিকে মহারাজ বল্লাল সেন "বিষ্ঠার ক্রীমি-কীট তুল্য করিয়া ছাড়িব" বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, যাহারা বিশুদ্ধ বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইয়াও বল্লালের অত্যাচারে সমাজে পতিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের সহিত তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন। প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির অন্ন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিয়া ভোজন করিতেন, তাহাদেরই কিনা আজ জল অচল! তাহারাই কিনা আজ অস্পৃশ্য—হেয়, অবজ্ঞাত, মন্দিরে প্রবেশাধিকার

বর্জ্জিত! অধিক দিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেমাবতার মহাত্মা নিত্যানন্দদেব সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক-বংশীয় উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী মহাশয় তল্লিখিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' নামক বৈষ্ণব জগতের বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—"উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অম্বিকানগরে উপনীত হইয়াছেন। তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী বসুধা দেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয়, আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্ন :—শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ?

উত্তর :—প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥

প্রশ্ন :—তারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন্ জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম, কোথায় বসতি॥

উত্তর :—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণবণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
বৈশ্যকুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এ জন্য উহার অন্ন,ঘৃণা নাহি করি॥
সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত।)

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির রন্ধন-অন্ন শত শত ব্রাহ্মণ নিত্য ভোজন করিতেন, পাঁচশত বৎসর পর সেই সুবর্ণবণিকজাতি জল স্পর্শে অযোগ্য অনাচরনীয়! কি পরিবর্ত্তন! অথচ বলা হয় "আর্য্য হিন্দু সমাজ কোনরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে—শত অত্যাচারে, শত বিপ্লবেও ইহা অচল অটল, হিমাদ্রীর মত ঠিকই রহিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে? কত কালাপাহাড় কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কত বুদ্ধ রামমোহনই না হয়রান হইয়া গিয়াছে, তোমরা ২।১০ জন রাম শ্যাম পরিবর্ত্তন করিতে চাও, এত বড় দুরাশা তোমাদের? ইত্যাদি।" কিন্তু বিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতেছেন ভারতীয় হিন্দু সমাজ যেমন পরিবর্ত্তনশীল এমন পরিবর্ত্তনশীল বোধ হয় ভূমণ্ডলের কোন সমাজই নহে। কি ছিল আর কি হইয়াছে! স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিশ্রন ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে বিবাহ ছিল, আহারাদি ছিল, দেবরাদির দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের নিয়ম ছিল, সমুদ্রযাত্রা, বিধবা-বিবাহ ছিল, সতীদাহ ছিল, কতই না ছিল এখন কোথায় সে গুলি? যাঁহারা অন্ধ তাঁহারাই বলিবেন, সনাতন হিন্দু সমাজের কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই কখনও হইবেও না। যে পবিত্র সুবর্ণ-বণিক জাতি চিরকাল বৈশ্য বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদের কন্যা ব্রাহ্মণগণ বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের অন্ন ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বৈশ্য সুবর্ণবণিক জাতিকে, হীন চরিত্র পাপিষ্ঠ লম্পট বল্লালসেন নিজের খেয়ালমত পতিত পঙ্‌ক্তি-নির্ব্বাসিত করিলেন, আর সমাজপতি ভীরু কাপুরুষ, ভয়ে ভীত পরন্তু অর্থে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সেই অন্যায্য, অনার্য্যোচিত, সত্যবিরোধী মতকে ভগবান বেদব্যাসের মত বলিয়া শির পাতিয়া মানিয়া লইলেন। হা ধিক! হিন্দুসমাজের কর্ণধার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে! যাঁহাদের ভয়ে স্বর্গের দেবতাগণসহ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পবান্ ছিলেন, যাঁহাদের ভয়ে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ সিংহাসনে বসিয়াও কম্পিত কলেবর থাকিতেন, যাঁহাদের সম্মান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত করিতেন বলিয়া বলা হইয়া থাকে সেই

ভূদেব ব্রাহ্মণগণ, ত্রিলোক পূজনীয়, ধর্ম্ম বেদ ও সত্যরক্ষক ব্রাহ্মণগণ আজ কিনা পাপিষ্ঠ বল্লালের অন্যায় অশাস্ত্রীয় অবৈদিক প্রার্থনা নয়,—অনুরোধ নয় ঘৃণিত আদেশ—বাক্য মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন না,—ব্রাহ্মণ্য-গৌরব অতল জলে ডুবাইয়া দিলেন। কার্য্য না করিয়া, ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা ন. করিয়া, ব্রাহ্মণ্যতেজ বিকসিত না করিয়া, শুধু মুখে মুখে চীৎকার করিলেই ব্রাহ্মণ্য-গৌরব লাভ করা যাইবে না, ব্রাহ্মণ্যতেজ ফিরিয়া আসিবে না, তার জন্য সংযম চাই সাধনা চাই, তার জন্য ত্যাগ স্বীকার চাই, পরার্থপরতা চাই, তার জন্য তপস্যা চাই, সিদ্ধি চাই। বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা বিলক্ষণই অবগত ছিলেন, তাই হীন জাতীয় ডোম কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াও মনে করিয়া ছিলেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার সমর প্রভাবের ভয়ে কেহ তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রিয় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন না। কিন্তু তাহা হইল না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। বল্লালসেন তদীয় অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী নব প্রণয়িনী ডোমকন্যার অন্ন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমাজের সমুদয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে অনেকেই আপন আপন জাতি-ধর্ম্ম-কুল রক্ষার্থে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বল্লালের ডোমকন্যা বিবাহ ও তাঁহাকে সমাজে চল করার অভিপ্রায় বিষয়ক কিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কবিবর যদুনন্দন কৃত "ঢাকুরে" এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

* * * *

একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে ॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেল লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে ॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোম কন্যা প্রাতঃকালে আসি ॥

বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার।
শাস্ত্রমতে কার্য্য করি কি দোষ আমার॥

মহারাজ বল্লালসেন ডোমকন্যা বিবাহ করিয়া এবং তাহার হস্তস্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "পাঁতি" দিয়াছিলেন। এখন এ দেশে সমাজগর্হিত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম নিন্দিত কার্য্য করিয়াও লোকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু এই সকল কার্য্য সমাজ ও দেশের যাবতীয় লোক একমতে গ্রহণ করিবে এ কথা বলা যায় না। এখনও এ দেশে কেহ জাতিচ্যুত হইতে হয় এরূপ কার্য্য করিলে তিনি স্বপক্ষে কতক লোক যে না পান তাহা নহে। অপিচ পাপানুষ্ঠানাকারীর অর্থ-সম্পদ-প্রতিপত্তির উপর তাঁহার সমর্থনকারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

হিন্দু রাজা অসীম প্রতাপশালী বল্লাল—রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া, অস্পৃশ্য ডোমকন্যাকে নিজ অঙ্কশায়িনী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—সমাজে তাহাকে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—এবং পরিশেষে তাহাকে সমাজে চালাইয়াও ছিলেন।

"এই (ডোমকন্যা) পদ্মিনীর পাকস্পর্শ ব্যাপারে মহারাজ বল্লালসেন নিমন্ত্রণ করিলে বৈদ্যগণ তৎপুত্র লক্ষ্মণের উপদেশানুসারে স্ব স্ব উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যগণের মধ্যে লক্ষ্মণী ও বল্লালী দুইটী থাক হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" (১)

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস।"

'পদ্মিনী ডোমকন্যার পাকস্পর্শ ব্যাপার সত্য। কাহাকে লইয়া এই পাকস্পর্শ হইয়াছিল? প্রায় সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য-মহারাজের এই সমন্বয় ব্যাপারের কোন না কোন প্রকারে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই অনার্য্যাচার সহ্য করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

"উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্ব স্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ।

"এই অত্যাচারিত, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ বল্লালের রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান নোয়াখালি, কুমিল্লা, পূর্ব্বময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। সে সময় মধুপুরের বন নিবিড় জঙ্গল, গৌড় এবং কোচ রাজ্যের সীমান্ত দেশ ছিল। কালক্রমে এই প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য তেজঃ মণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ কোচ প্রভৃতি অনুন্নত জাতীয় রাজগণের রাজ্যে বাস করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন অথচ যে সকল ব্যক্তি রাজকোপ-ভয়ে অধর্ম্ম সমর্থন করিয়া দেশে ছিলেন তাঁহারা সমুন্নত প্রদেশে বাস নিবন্ধন ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন।

"মহারাজ বল্লালের এই কদাচার দুষ্ট ডোমকন্যা বিবাহ তৎকালীয় হিন্দু সমাজ অবনত মস্তকে সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই হিন্দু বংশধরগণের— ডোমকন্যা অপেক্ষা উন্নত জাতি সমূহের হস্তে বর্ত্তমান সময়ে আহার ত দূরের কথা, জলটুকু গ্রহণেরও আপত্তি। হা! আচার-দোহাই-সর্ব্বস্ব হিন্দুসমাজ! তোমার কিই না অধঃপতন ঘটিয়াছে। ডোমকন্যায় অন্ন গ্রহণ চলিল, আর সাহা সুবর্ণবণিক মাহিষ্য—যোগী সূত্রধর নমঃশূদ্রগণের জলটুকু চলে না! তাহাতে জাতি যায়, ধর্ম্মযায়, ব্রাহ্মণ্য লোপ পায়!

"আর কৌলীন্য-গর্ব্ব-বিমূঢ় তুমি কুলীন, বল্লালের এই অশাস্ত্রীয় পতিত বিবাহ ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়া সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছিলে, তাহার

ফলে গৌরবাত্মক উপাধি লাভ করিয়াছ এবং এখন ও শিরে সেই কলঙ্ক রাশি বহন করিয়া জন সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ! যাঁহারা বল্লালের এই দুষ্কার্য্যের সহায় ও সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন! সে কালেও রাজানুগৃহীতের ভাগ্যে উপাধি লাভ হইত। বল্লালের এই অনুগ্রহ ও উপাধি দানের মূলে কি ছিল আমরা উপরে তাহার আভাস প্রদান করিলাম। বর্ত্তমান বল্লালী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সংখ্যায়, ধনগৌরবে এবং বিদ্যার প্রভাবে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সন্তান ডোমকন্যার অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ ডোম অপেক্ষা কোটি গুণে সমুন্নত হিন্দু জাতির জলপান করিতে ধর্ম্মচ্যুত, জাতিভ্রষ্ট ও কুণ্ঠিত হইবেন কেন?" (১)

কিন্তু পাপিষ্ঠ বল্লালের অত্যাচার ও অবিচারের এইখানেই শেষ নহে। ইহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বৈশ্যগণের পাতিত্ব বিধান ও দেশ হইতে নির্ব্বাসন! বল্লালের চরিত্রহীনতা, ধর্ম্মহীনতা, পরস্ত্রীতে লোভ, পরধনে অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতির কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একদা দুষ্ট বল্লাল রাজকোষে অর্থের অল্পতা হওয়ায় বিশেষ চিন্তিত হয়েন। ঐ সময়ে বাণিজ্যাদি দ্বারা সুবর্ণবণিক জাতি বিশেষ ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছিল, বল্লাল তাহাদের অনেকের নিকটে অনেক মুদ্রা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে ও রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায়, অবশেষে সুবর্ণবণিক জাতীয় মহা ধনবান্ বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট পুনরায় প্রচুর অর্থ ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মণিপুরে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধের ব্যয় জন্য বল্লাভানন্দের নিকট বল্লাল সেন পুনরায় ঋণ প্রার্থনা করেন। পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণ এখনও পরিশোধ হয় নাই দেখিয়া বল্লভানন্দ বল্লাল সেনকে পুনরায় ঋণ দিতে

(১) চারুমিহির, ১০ই শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "বল্লাল সেন ও কৌলীন্য প্রথা।"

অস্বীকার করেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বল্লভানন্দ শাসন পত্রেও বশীভূত হয়েন নাই।

তৎসকাশং ততোদূতো রাজ্ঞাতেন চ প্রেষিতঃ।
শাসন পত্র দানেন বশীকরণমিচ্ছতা॥

(গোপালভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত"।

তখন বল্লাল সেন, বল্লভানন্দের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—

সুবর্ণ-বণিজাং স্বামী বল্লভানন্দ নামকঃ।
আসীৎ দুষ্টো ধনশ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ॥৯

(গোপালভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত")

বল্লভানন্দকে হস্তগত করিতে অসমর্থ হইয়া, বল্লালসেন ধনবান্ সুবর্ণ-বণিকদিগের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * *

জহার বণিজাং বলাৎ।
ব্যবহারে ধৃতং বস্তু কেষাঞ্চিৎ ক্রোশতামপি॥"

অবশেষে যখন বল্লাল দেখিলেন, সুবর্ণ-বণিক জাতিকে একেবারে পর্য্যুদস্ত করা সহজসাধ্য নহে, তখন তাহাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য, রাজবাটীর এক মহাভোজে নিমন্ত্রন করিলেন। সুবর্ণবণিকেরা উপস্থিত হইলে, শূদ্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে উপবিষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন, বণিকেরা কহিল "আমরা বৈশ্য, বিশেষতঃ রাজবাটীতে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৈশ্যসঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন করিয়া আমরা শূদ্রের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতে সম্মত হইতে পারি না।"

ভুজ্যমানেষু সর্ব্বেষু বল্লালেন মুদা সহ॥
সৎশূদ্রাণাঙ্গনাস্তত্রাপরা ভোজন শালিকাঃ।

স্পর্দ্ধয়া বিবিশু ভোক্তুং বিশাংন দৃশ্যতেস্থলী ॥
তস্মিন্নবসরে বৈশ্যা মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্।
উক্তস্থ নির্য্যাতু কামাস্তদানীং রাজসবনঃ ॥

(আনন্দ ভট্টকৃত "বল্লাল চরিত")

অতঃপর সুবর্ণ-বণিকেরা ভোজনশালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। রাজা বল্লাল সেন এ কথা শুনিয়া কহিলেন "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা"—

"ঈদৃশী স্পর্দ্ধা, ইত্যুক্তা তান বাক্ষিপৎ" (বল্লাল চরিত্র—২২ অধ্যায়)

অল্প দিবস পরে, বল্লালসেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি দুঃশীলান্ সুবর্ণবণিজঃ অধম জাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরত্মনঃ সমুচিত দণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ যোষিদাদি ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্র-বিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ, এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। যদি দাম্ভিক-বল্লভানন্দ-বণিকস্যদুরাত্মনো দণ্ডং ন বিধাস্যামি তদা পাতকানি ভবিতব্যানি।" অর্থাৎ "আমি যদি দুষ্টস্বভাব সুবর্ণবণিক-গণকে নীচ জাতীয় মধ্যে ভুক্ত না করি এবং দুরাত্মা বল্লভানন্দকে সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণহত্যার মহাপাতক হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের শত শত পুত্র বিনাশে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা যদ্রূপ, সুবর্ণবণিকজাতি সম্বন্ধে আমার এই প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপ ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

ইহার কিছুদিন পরে বল্লালসেন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞো-পলক্ষে সুবর্ণ নির্ম্মিত ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইয়াছিল। রাজা বল্লালের কুপরামর্শানুসারে একজন ব্রাহ্মণ একটা হিরণ্ময় গাভী শ্রীবিন্দপাইন নামে জনৈক সুবর্ণবণিক জাতীয় সওদাগরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। (১) শ্রীবিন্দ

(১) মতান্তর—মণিদত্ত নামক বল্লভানন্দের ভাগিনেয়ের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ রাজ-প্রদত্ত স্বর্ণধেনু গচ্ছিত রাখিয়া কিছু অর্থ ধার লয়েন, পরে লোভপরবশ হইয়া মণিদত্ত ঐ স্বর্ণধেনু-গ্রহণ অস্বীকার করেন এবং উহা অগ্নিতে দ্রব করেন। রাজা বল্লালের বিচারে মণিদত্তের প্রতারণা সাব্যস্ত হয় এবং সেই অপরাধে সমুদয় স্বর্ণ-জাতিকে "পতিত" করেন।

পাইন উহা ভগ্ন করিয়া অগ্নিতে দ্রব করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তত করিয়াছিলেন, বল্লালসেন এইরূপ শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে কহিলেন "ইহাতে নিশ্চয়ই গো-হত্যার অপরাধ হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, অগ্নিতে গো-দাহনের মহাপরাধ ঘটিয়াছে। অতএব সুবর্ণবণিক জাতি অদ্য হইতে অধম শূদ্রজাতি মধ্যে গণ্য হইল।" এতদিনে প্রতিহিংসা-পরায়ণ রাজা বল্লালসেনের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। "অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত-ধারণং ব্যর্থং এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্। অতোদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্ত স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যাকারিণশ্চ তদেতে অদ্যপর্য্যন্ত পতিতাঃ, শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ।" পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই কারণেই বল্লালের সময় হইতে অনেকে সুবর্ণবণিক জাতিকে "পতিত" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা নিরপেক্ষভাবে বলিতে বাধ্য যে বিনাপরাধে সুবর্ণবণিক জাতি দুষ্ট বল্লাল কর্ত্তৃক 'পতিত' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।"

সুবর্ণ-বণিকগণের ন্যায় অন্যান্য বৈশ্যবণিকগণ ও বৈশ্যকৃষকগণ কতক বল্লালের কোপে, কতক সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের কৃপাবঞ্চিত হইয়া এবং কতক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া সমাজে অনাচরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ইহারা কেহই হীন শূদ্রবর্ণ নহে—পতিত জাতি নহে। কাল প্রভাবে ইহাদের পাতিত্ব ঘটিয়াছে। এখন ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির ন্যায় আচার ব্যবহারে বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ইহাদিগকে আর হীনতর ভাবে রাখা কিছুতেই সঙ্গত নহে। সামাজিক অধিকার দান করিয়া ইহাদের হাত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আর হীন ঘৃণিত অবজ্ঞাত ভাবে রাখা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবেনা। এখন আর রাজকোপ নাই, ব্রাহ্মণগণেরও কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষের কারণ নাই—অনাচার

বিদ্যাদিহীনতাও নাই ; সুতরাং কেন আর অগণ্য দেশবাসী ভ্রাতৃগণকে জল অচল করিয়া রাখি এবং তাহাদিগের মনে দারুণ বেদনা বিদ্ধ করি? তমোগুণ অনাচার ম্লেচ্ছাচার প্রভৃতির জন্যই জল অচল করা হইয়াছিল। "ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে—কেবল, ইহার সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আহার সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ স্বরূপ এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিতে একটা প্রসিদ্ধ বাক্য আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"—যখন আহার শুদ্ধ হয় তখন সত্ত্বশুদ্ধ হয়, আর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটী লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহাবিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি সাংখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, ঐ তিনটী গুণ, কিন্তু তাহা নহে ; উহারা জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ হইলে এই সত্ত্ব পদার্থ নির্ম্মল হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বলাভ করাই বেদান্তের একমাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ, আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশ স্বভাব, আর যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তদ্রূপ আত্ম চৈতন্যও সহজেই সত্ত্ব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ গিয়া কেবল সত্ত্ব দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইবে ; অতএব এই সত্ত্বলাভ করা অত্যাবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।" রামানুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে

গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইহা তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বন স্তম্ভ স্বরূপ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার শব্দের অর্থ কি, এইটা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহার শুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ বা দোষযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জাতি দোষ—যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ; যেমন পেঁয়াজ, রশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতি-দুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। ঐ সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে কাম রিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত ও অসৎ কর্ম্ম সকল করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয় দোষ—যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্য ও দুষ্ট হইয়া থাকে। অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়তঃ নিমিত্ত দোষ—খাদ্য দ্রব্যে কেশ, কীট, আবর্জ্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে নিমিত্ত দোষ বলে। * * এই ত্রিবিধ দোষ-নির্ম্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্ব শুদ্ধি হইবে।”

“তবে ত ধর্ম্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খাইলেই ধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই ত ইহা করিতে পারে! জগতে এমন কে দুর্ব্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষ সমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য্য এ আহার সম্বন্ধেই কি অর্থ করিয়াছেন দেখা যাউক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আহার শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। উহা নির্ম্মল হইলে, সত্ত্ব নির্ম্মল হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার! যদি কেবল পবিত্র

ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কি না। এরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত—

নিত নহনেসে হরি মিলে ত জল জন্তু হই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাদ্‌রাই
তিরণ ভখনকে হরি মিলে ত বহুৎ হয় হ্যায় অজা
দুধ পিকে কে হরি মিলে ত বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা॥

যাহা হউক এই সমস্যার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, উভয়ই চাই। তবে গোল এই টুকু দাঁড়াইয়াছে যে বর্ত্তমান কালে আমরা শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল 'খাদ্য' অর্থ টা লইয়াছি। এই কারণেই যখন আমি বলি, "ধর্ম্ম রান্না ঘরে ঢুকিয়াছে," তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি তোমরা আমার সহিত মান্দ্রাজে যাও—তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা বাঙ্গালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মান্দ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চ বর্ণের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবর দাবার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা ইহার দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচাইলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে—মান্দ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ হইত কিন্তু তাহারা তাহা নহে।" (১)

"শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এখন সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল এই টুকুতে

কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা—"সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত।" ভারতে বিবেকানন্দ ১৬১—২৬৩ পৃষ্ঠা।

ঠেকিয়াছে যে, আমাদের আপনার লোক না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক হউক। ময়রার (মিঠাইবিক্রেতার) দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম যে কিরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছি সব চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে, রাস্তার ধূলা উড়িয়া মিঠাই এর উপর পড়িতেছে আর ময়রার পোরও কাপড়খানা এমনি যে চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে। * * * পূর্ব্বকালে লোক সংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে—অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। আমাদের এতদিন উৎকৃষ্টতর বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন জলে থু থু ফেলিও না, আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। * * * এখন তাহা সব চলিয়া গিয়াছে। এই কারণেই যদি কেহ আমাকে 'হিন্দু কে?' এই প্রশ্ন করে, তবে আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্রকৃত হিন্দু কাহাকেও দেখিতে পাই না। প্রকৃত হিন্দুচিত গুণ-সম্পন্ন যখন কাহাকেও দেখিতে পাই না, তখন বাধ্য হইয়া যে আমার সহিত একসঙ্গে খায় অথবা আমার বংশে বিবাহ করে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব দেখিতেছ, এখন কেবল এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার রহিয়াছে, মন কলুষিত হইয়াছে, লোকে আসল জিনিষটাই ভুলিয়াছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতে লইব, কিন্তু যদি একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভাল লোকের সঙ্গে বসিয়া খায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটীই স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া

থাকে আর অসৎ সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্যশৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন।" (১)

আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ দোষের কথা বর্ণিত হইল, পাঠকগণকে এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করি। (১) জাতি-দোষ (২) আশ্রয় দোষ (৩) নিমিত্ত দোষ। সমাজপতি পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রথম ও তৃতীয় দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অন্ধ ও বধির, কেবল দ্বিতীয়টাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহারও যদি মূল—প্রকৃত তত্ত্ব ধরিতেন তাহা হইলেও আমাদের অধিক কিছু বলিবার ছিল না। তাঁহারা মূল তত্ত্ব প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া নারিকেল ফলের শাঁস ত্যাগ করিয়া বাহিরের ছোবড়া লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে "ধর্ম্ম গেল" "ধর্ম্ম গেল" শব্দে গগনমণ্ডল কম্পিত করিতেছেন, দ্বিতীয়টীকে বলা হইল আশ্রয় দোষ। অর্থাৎ অসৎ, দুষ্ট, পাপী, অধার্ম্মিক, শৌচ-পরিভ্রষ্ট সত্যহীন তমোভাবাপন্ন ব্যক্তির আশ্রয়ে সংস্পর্শে খাদ্য দ্রব্য কলুষিত হয় এবং তদাহারে সাধুব্যক্তিগণের চিত্ত ও মলিন হয়। যেমন অম্ল-দ্রব্য পিতল বা কাংস দ্রব্যের স্পর্শে তিক্ত বিষাক্ত হয় তেমনি অসৎ পাপী লোকের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্য কলুষিত, বিষাক্ত, তমঃগুণ বর্দ্ধক হইয়া থাকে।

অসতের স্পর্শে খাদ্যদ্রব্য অসৎভাবোদ্দীপক হয়, ইহাই হইতেছে শাস্ত্রকারের বক্তব্য। শাস্ত্রকার অবশ্য একথা বলিতেছেন না যে, অসতের পরবর্ত্তী ৫২ পুরুষ বা ৩৬০ পুরুষ পর্য্যন্তও অসতই থাকে এবং তাহাদের সংস্পৃষ্ট খাদ্যও অসৎভাবোদ্দীপকই হইয়া থাকে। দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র কিছু হিরণ্যকশিপু হয় নাই, রত্নাকর বা জগাই মাধাই কিছু চির কালই রত্নাকর বা জগাই মাধাই ছিল না বা থাকিতে পারে এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রকার ব্যক্তিগত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সমষ্টিগত ভাবে বা বংশগত

(১) শিয়ালকোটে বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা "ভক্তি"। ভারতে বিবেকানন্দ ৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা।

ভাবে উল্লেখ করেন নাই। পাপীর বংশেও পুণ্যবান সন্তান, অসতের কুলেও সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিতেছেন, মূর্খ বংশেও বিদ্বান, গরীবের ঘরেও ধনবান্ জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতের গৃহেও মূর্খ, ধার্ম্মিক বংশেও কুলাঙ্গার, গঙ্গাজলেও গজার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সাহা কুলের কোনও একজন উর্দ্ধতন পুরুষ না হয় মানিয়াই লইলাম সুরা বিক্রয় করিয়াছে, সুবর্ণ বণিক কুলের উর্দ্ধতন ৫২ পুরুষ পূর্ব্বেই না হয় ব্রাহ্মণের সুবর্ণ ধেনু অপহরণ বা প্রতারণাই করিয়াছিল, সূত্রধরকুলের ৫৫৭ পুরুষ পূর্ব্বে একজন না হয় যজ্ঞ-কাষ্ঠ দিতে বিলম্বই করিয়াছিল, নমঃশূদ্রকুলের আদি পুরুষ কশ্যপ ঋষি না হয় ঋতুর প্রথম দিন সন্তান উৎপাদন করিয়া ভ্রমই করিয়াছিলেন, গোয়ালার ৮৯২ পুরুষের উর্দ্ধতন একজন না হয় গরুই দাগাইয়াছিল। ধোপার ১৫৬৩ পুরুষ পূর্ব্বের একজন উর্দ্ধতন বেকুব পুরুষ না হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি ভদ্রলোকগণের কাপড় কাচিয়া মহাপরাধের কার্য্যই করিয়াছিল, মালী না হয় হিন্দু সমাজপতিগণের বাড়ী-ঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছিল, তাই বলিয়া কি তাহার অধঃস্তন ৫০০ পুরুষও জল স্পর্শ করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? শাস্ত্রকি মানা করিতেছেন? ৫০০ পুরুষ পূর্ব্বে কাহার প্র প্র প্র প্রবৃদ্ধ পিতামহ হাতে লাল রং মাখিয়াছিল, এখনও কি সেই রং অধঃস্তন বংশধরের হাতে লাগিয়া আছে? না থাকিতে পারে? কাহারও উর্দ্ধতন ৭০০ পুরুষ হয়ত একদিন নিমন্ত্রণ খাইয়া হজম করিতে না পারিয়া বমন করিয়াছিল, এখন কি এই নিয়ম হইবে যে ৭০০ বৎসর পরবর্ত্তী পুরুষ পর্য্যন্ত কেহই নিমন্ত্রণ খাইতে পারিবে না; কেন না নিমন্ত্রণ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের এক জনের হজম্ হয় নাই। এই উত্তরে বালিকা সন্তুষ্ট হইতে পারে, শিশু বাহবা দিয়া পাণ্ডিত্যের গৌরব করিতে পারে। বালক "কি চমৎকার দার্শনিক যুক্তি"—"অকাট্য প্রমাণ" বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-বিদ্যা-পূর্ণ, বিজ্ঞান দর্শনময় ন্যায়

যুক্তির যুগে ইহা উন্মাদের প্রলাপ উক্তি ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শাস্ত্র এমন কোন কথা বলিতেছে না যে, ব্রাহ্মণ বংশে যত অধমই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তাহার খাদ্য জল গ্রাহ্য ; আর শূদ্রবংশে যত উত্তমই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তাহার খাদ্য জল অস্পৃশ্য অগ্রাহ্য। শাস্ত্রে সেরূপ কোন কথা লিখিলে তাহা কর্ম্মনাশার গভীর জলে নিক্ষেপ করিতে বলিতাম।

শাস্ত্রকার ত একথা বলিতেছেন না যে ব্যভিচারী বেশ্যাশক্ত লম্পট উপদংশবিষ জর্জ্জরিত চরিত্রহীন ব্যক্তির অন্নও নির্ব্বিচারে খাওয়া যাইতে পারে যদি তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অথবা শাস্ত্রকার একথাও বলিতেছেন না যে মিথ্যাবাদী শঠ প্রতারক প্রবঞ্চক অনাচার দুষ্ট মৎস্য মেষ ছাগ কপোত হংস চক্রবাক কচ্ছপ প্রভৃতি মাংস খাদক মদ্যপায়ী গঞ্জিকাসেবী রক্ষিতা নারীপ্রণয়বদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্ন খাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি শূদ্রের অন্ন খাওয়া যাইতে পারে না। অথবা শাস্ত্রত একথা বলিতেছেন না যে ঝি চাকরাণীর প্রণয় মুগ্ধ ঘৃণিত জঘন্য ব্যাধিমণ্ডিত সন্ধ্যা-পূজা-বর্জ্জিত বারবিলাসিনী-সংশ্রব-দূষিত অনাচার-কলুষিত শুধু পৈতা মাত্র সর্ব্বস্ব পাচক বামুন ঠাকুরের অন্ন নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য কিন্তু পবিত্র চরিত্র ধর্ম্মশীল দেব-দ্বিজ-অতিথি-পরায়ণ নিত্যস্নায়ী নিরামিশাষী বিশুদ্ধদেহ শূদ্রের অন্ন অগ্রাহ্য। কত গুরু পুরোহিত প্রকাশ্যে—বাড়ীতে রক্ষিতা নারী রাখিয়াছেন, কত সমাজপতি টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রকাশ্যে ব্যভিচার করিতেছেন, অগম্যা গমন করিতেছেন, পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলিয়া বেশ্যাবাড়ী ব্যভিচারিণীর বাড়ী বিশুদ্ধ বৈদিক ভাষায় সম্ভাষণাদি প্রণয়ালাপ করিতেছেন ; কত স্মার্ত্ত চূড়ামণি ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য বংশ, গুরুবংশ, মদ্যপান গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন অন্ধ সমাজ তাহা দেখিবে না, তাহাদের হাতের অন্ন খাইতে বারণ করিবে না কিন্তু কেহ যদি ভুলক্রমেও শূদ্রের হস্তে অন্ন গ্রহণ করে তবে আর তাহার নিস্তার নাই। কেন হে বাপু এ অত্যাচার অবিচার ! শাসন করিতে পার যদি

ত সকলকেই শাসন কর আর না পারত হাল ছাড়িয়া দাও। সবলকে ছাড়িয়া দুর্ব্বলের উপর পীড়ন কর কেন? ধর্ম্মে তাহা সইবে কেন? ধর্ম্মের নিকট এ অত্যাচার কতদিন চলিবে? অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছে। তাহাতেও কি শিক্ষা হইবে না? কত সমাজ-শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেখিতেছি যাঁহারা রাত্রিতে নিম্নশ্রেণীর রক্ষিতা প্রণয়িণীর গৃহে তদীয় শ্রীহস্ত তৈয়ারী নানাবিধ খাদ্য আহার করিতেছেন ও প্রভাতে বাটী আসিয়া "বিলাত যাত্রীর" কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত নাই—তুষানলেও তাহার পাপ দূরীভূত হইবে না বলিয়া অজ্ঞ-জনগণের নিকট শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইতেছেন। নিজে টাকা লইয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন কিন্তু ওদিকে কেহ পাগল অবস্থায় কাহারও জল ভাত খাইয়াছে—এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নগদ মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের "পাঁতি" লিখিয়া দিতেছেন। কোন তর্কসিদ্ধান্তের অবস্থা জানি যিনি বিধবা পুত্রবধূ গমন করিয়াও সমাজপতি বড় পণ্ডিতের বিদায় পাইয়াছেন এবং তিনিই কত লোকের প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি লিখিয়া দিয়া, ব্যবস্থা পত্র দিয়া পাপ হইতে নিস্কৃতিদান করিতেছেন। কত পণ্ডিতের চরিত্রহীনতা ব্যভিচার অনাচারের কথা যে জানি তাহা লিখিবার যোগ্য নয়। আর ইহাঁরাই কিনা সমাজের দণ্ডদাতা বিধাতা পুরুষ। ইহাদের অঙ্গুলি হেলনেই হিন্দু-সমাজকে চলিতে হইবে। কত সমাজ-পতি ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণকে দেখিতেছি যাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিত মদ্যপায়ী বেশ্যাগমনকারী, যাঁহারা ষ্টিমারে উঠিলেই মুসলমান বাবুর্চ্চি প্রস্তুত অখাদ্য মুরগীর মাংস দিয়া অন্নাহার করিতেছেন এবং বাটী আসিয়াই বিলাতযাত্রী দেশবাসী আত্মীয়কে একঘরে করিবার জন্য দল পাকাইতেছেন এবং সহস্র কণ্ঠে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন! অথবা সামান্য সামান্য সামাজিক অপরাধের জন্য দুর্ব্বল স্বজাতীয় ভ্রাতাকে সকলে মিলিয়া একঘরে করিয়া রাখিতেছেন। যাঁহারা দেবী স্বরূপিণী গৃহস্থের বিধবা কন্যাকে নানাবিধ আর্থিক ও সুখের প্রলোভন

দেখাইয়া তাহার সর্ব্বস্বহরণ করিয়া নরক রাজ্যের দ্বার পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছেন—তাঁহারাই বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সভা সমিতি করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন! কত লিখিব! সমাজপতিগণের পাপেই, অহরহঃ অনুষ্ঠিত গুপ্ত পাপেই হিন্দু-সমাজের—হিন্দু-জাতির এই শোচনীয় পরিণাম! তুমি বড় লোক জমিদার বা তালুকদার—নায়েব বা এষ্টেটের ম্যানেজার, তুমি বড় প্রফেসার অধ্যাপক উকীল মোক্তার, তোমার ধন আছে ঐশ্বর্য্য আছে—সম্পত্তি আছে—তালুক আছে, টাকা আছে কড়ি আছে—সুতরাং তোমার আর ভয় কি? ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তোমার অখণ্ড মণ্ডলাকারং রজতখণ্ডের দাস, মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস পরাশর রঘুনন্দন জিমুতবাহন মেধাতিথি মল্লিনাথ, স্মৃতি সংহিতা তোমার অমিত প্রতাপে অর্থের প্রলোভনে তটস্থ! আর আমি—আমি যে দীন হীন দরিদ্র দুর্ব্বল, যত বিধি-নিয়ম-ব্যবস্থা-প্রায়শ্চিত্ত সবই আমার জন্য। পান থেকে চুনটুকু খসিয়া গেলে আর আমার নিস্তার নাই—এক রাত্রির বৈঠকে সহস্রখানা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। পরদিনই আমার হুঁকা কল্কে বন্ধ—আমি একঘরে! তুমি জমীদার অর্থশালী টোল করিয়া দিয়া—মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেছ—সুতরাং সেই অনন্যগতি প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ আর তোমার উপর কোন্ মনু—কোন্ রঘুনন্দন জারি করিবেন? এবম্বিধ-রূপে দুর্ব্বলের প্রতি যে জাতির প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা ও বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে যে জাতির আগ্রহ, সে জাতির পতন হইবে না ত কোন্ জাতির পতন হইবে? দেশের জন্য, সমাজের জন্য সমগ্র জাতির জন্য যাঁহারা কর্ত্তব্যের গুরুভার মস্তকে ধারণ করিয়া, মাতৃভূমির শিরে জ্ঞান বিদ্যার বিজয়মুকুট পরিধান করাইয়া ধন্য হইবার আশায়—পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণের স্নেহের বন্ধন অশ্রুসিক্ত নয়নে সবলে ছিন্ন করিয়া—উত্তাল তরঙ্গ-

আলা বিক্ষুব্ধ সাগরাম্বু রাশির গভীর গর্জ্জনের মধ্য দিয়া অপরিচিত—বিদেশে উপনীত হইয়া বিদ্যাজ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক মাতৃভূমিকে—গৌরবান্বিতা করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন—তাঁহাদিগকে আমরা কোল পাতিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে সাগ্রহে সমাজে টানিয়া লইবার পরিবর্ত্তে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি—আর যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া মদ্যপান ব্যভিচারে বারবণিতালয়ে অস্পর্শীয়াগণের স্পৃষ্ট তৈয়ারী খাদ্য আহার করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—সমাজের পবিত্র আদর্শ ধ্বংস করিতেছে—চক্ষের উপর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—তাহাদিগকে আমরা পরম সমাদরে সমাজপতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি ও তাহাদের আদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। আমরা করিতেছি কি! পুণ্যকে তাড়াইয়া দিয়া পাপকে ডাকিয়া আনিতেছি—ধর্ম্মকে বিদায় দিয়া অধর্ম্মকে গ্রহণ করিতেছি, লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্মীকে গৃহে তুলিতেছি, দেবতাকে ত্যাগ করিয়া দানবের পূজায় ব্রতী হইয়াছি! সুতরাং এ দেশের পতন কি অনিবার্য্য নহে? কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, দেশের জলবায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, দেশবাসী আপনাদের ভালমন্দ অকল্যাণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে, দিন দিন নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে। রঘুনন্দনকে রম্ভা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতি বৎসর দলে দলে শিক্ষিত যুবকগণ বিদেশে গমন করিতেছেন। আর যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন—দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ভবিষ্য-নেতা সমাজপতি যুবকদল তাঁহাদিগকে সাদরে হৃদয়মন্দিরে টানিয়া লইতেছেন। ইহা মঙ্গল-ময় বিধাতাপুরুষের অদৃষ্ট ইঙ্গিত—সমাজপতির কি সাধ্য, মানুষের কি সাধ্য ইহার গতি রোধ করিতে পারে! ইহাদের অপরাধ কি? অপরাধ ত অখাদ্য খাওয়া ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ! আচ্ছা দেখা যাউক—এ অপরাধের শাস্ত্রে কি দণ্ডবিধান আছে। আর আমরাও এরূপ অপরাধে সম অপরাধী বা ইহাপেক্ষাও গুরুতর অপরাধী কি না! বিলাতযাত্রীর অপরাধ

(১) অখাদ্য ভোজন—যথা (ক) গোমাংস, শূকর মাংস, মুরগী মাংস প্রভৃতি—(২) ম্লেচ্ছান্ন—ম্লেচ্ছ সংস্পৃষ্ট খাদ্য-গ্রহণ, (৩) শীতপ্রধান দেশে পানীয়াভাবে মদ্যপান। প্রথম ও তৃতীয় দোষ হইতে অধিকাংশ ভারতীয় ও বঙ্গীয় বিলাত জাপান বা আমেরিকা প্রত্যাগত যুবকই নির্ম্মুক্ত! তত্রাচ তর্কস্থলে ধরিয়া লইলাম ইহাঁরা ত্রিবিধ দোষেই দোষী—অপরাধী। এক্ষণে আমরা একে একে প্রত্যেক অপরাধ লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ অখাদ্য-ভোজন—গো-মাংস শূকর মাংস বা মুরগী মাংস প্রভৃতি।

উশনঃ সংহিতা বলিতেছেনঃ—

শললঞ্চ বলাকঞ্চ হংসকারণ্ডবং তথা ॥ ২৪
চক্রবাকঞ্চ জগ্ধা চ দ্বাদশাহমভোজনম্।
কপোতং টিট্টিভং ভাসং শুকং সারসমেবচ ॥ ২৫
জলৌকং জল পাতঞ্চ জগ্ধা হ্যেতদ্‌ব্রতঞ্চরেৎ।
শিশুমারং তথা মাষং মৎস্যং মাংসং তথৈব চ ॥ ২৬
জগ্ধাচৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতরেৎ।

(নবম অধ্যায়)

"শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে।"

কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুক্কুটং রজকাং তথা ॥ ৩০
প্রাজাপত্যং চরেজ্জগ্ধা তথা কুম্ভীরমেব চ।

(উশনঃ সংহিতা ; নবম অধ্যায়)

"কপোত, হস্তী, শজিনা, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রজাপত্য করিবে।"

বিষ্ণু সংহিতায় ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন—

* * * অন্যতমস্য প্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

লশুন পলাণ্ডু গৃঞ্জনৈতদ্গন্ধিবিড়্বরাহ গ্রাম্য কুক্কুটবানর

গোমাংসভক্ষণে চ ॥ ৩ ॥ * * * *—(একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ)

* * * * * "অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লশুন, পলাণ্ডু গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (লশুনাদি গন্ধদ্রব্যযুক্ত) বিড়্বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গোমাংস ভোজনেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।"

* * * খরোষ্ট্র কাক মাংসাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রাগুজ্ঞাতং সূণাস্থং শুষ্কমাংসঞ্চ ॥২৭ ॥

(৫১শ অধ্যায়—বিষ্ণুসংহিতা)

"খর মাংস, উষ্ট্রমাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয়ই নাই—সেই পশু পক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিতমাংস (কসাইখানার) ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।"

বার্ত্তাকুং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি। ৩২

অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব ভূক্ত্বাপ্যেতদ্‌ব্রতং চরেৎ ॥ ৩৩

(উশনঃ সংহিতা—নবম অধ্যায়)

"বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু, সাদা বেগুন) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, অলাবু (লাউ), গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ গাঁজর) ভোজন করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে।"

এক্ষণে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

বাপী-কূপ তড়াগানারামস্য সরঃসুচ।

নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ ৩৭৩—অত্রিসংহিতা।

"যে নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম স্থল রুদ্ধকরে—সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়।" চণ্ডাল কিন্তু ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও অধম জাতি। চণ্ডাল সর্ব্ব নিম্ন—সর্ব্বাপেক্ষা অধম জাতি। অত্রি পরবর্ত্তী শ্লোকে চণ্ডালের নিম্নলিখিত প্রকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ—
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৪

(অত্রি সংহিতা)

"ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মরহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য।

আর্য্যগণ ভারতেতর দেশকেই ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সুতরাং তাহাদের (ম্লেচ্ছগণের) অন্নাদি আহারের তখন কোনই প্রয়োজন হয় নাই। ম্লেচ্ছদেশে গমনই শুধু নিষেধ করিয়াছেন। ম্লেচ্ছান্ন আহার সম্বন্ধে মনু অত্রি বিষ্ণু পরাশর ব্যাস গৌতম যাজ্ঞবল্ক্য উশনঃ অঙ্গিরা প্রভৃতি বিংশতি-খণ্ড সংহিতা গ্রন্থে প্রায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। নানা জাতির অন্ন পানীয় গ্রহণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত ও বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। সেই জন্য ঠিক ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে চণ্ডালাদি তন্নিম্ন জাতির অন্ন গ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের অপরাধের পরিমাণ করিয়া লইতে পারিব। চণ্ডাল যখন ম্লেচ্ছ অপেক্ষাও হীন তখন চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ যে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের অপেক্ষা অধিকতর অপরাধজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিলেও আমরা না হয় মানিয়া লইলাম চণ্ডাল—ম্লেচ্ছ অপেক্ষা হীন নহে সমান এবং চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের তুল্য অপরাধজনক। এক্ষণে দেখা যাউক ম্লেচ্ছের সমান জাতি চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি বলেন।

ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভূঙ্‌ক্তে চণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্র যাবকাহারাদ্দশ রাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩০

(পরাশর সংহিতা ; ষষ্ঠ অধ্যায়।)

"ব্রাহ্মণ কখনও অজ্ঞান পূর্ব্বক চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে দশরাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। দশদিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবে।"

পরাশর ঋষি পুনরায় বলিতেছেন ঃ—

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভূক্তন্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১

(একাদশ অধ্যায় ; পরাশর সংহিতা ॥)

"বিপ্র যদি অপবিত্ররেতঃ, গোমাংস কিংবা চণ্ডালান্ন ভোজন করেন তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন।'

তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্তদর্দ্ধন্ত সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবং যদা ভূঙ্‌ক্তে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২

সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে।"

অত্রি বলেনঃ—

চাণ্ডালান্নং যদা ভূঙ্‌ক্তে চাতুর্ব্বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ ॥১৭২
ষড়্‌রাত্রমাচরেদ্বৈশ্যঃ পঞ্চগব্যং তথৈব চ।
ত্রি রাত্রমাচরেচ্ছূদ্রো দানং দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥১৭৩

(অত্রি সংহিতা।)

"চণ্ডালান্নভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমান প্রকারে শুদ্ধি, যথা—ব্রাহ্মণ—চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয়—সান্তপন; বৈশ্য—ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র—ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।"
ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন :—

* * বেদনিন্দা ॥৪॥ অধীতস্য চ ত্যাগঃ ॥৫॥ অগ্নি মাতৃ পিতৃ সুত দারাণাঞ্চ ॥৬॥ অভোজ্যান্ন ভক্ষ্য ভক্ষণম্ ॥৭॥ পরস্বাপ-হরণম্ ॥৮॥ পরদারাভিগমনম্ ॥৯॥ অযাজ্য যাজনম্ ॥১০॥ বিকর্ম্ম জীবনঞ্চ ॥১১॥ অসৎ প্রতিগ্রহশ্চ ॥১২॥ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্র গোবধঃ ॥১৩॥ অবিক্রেয় বিক্রয়ঃ ॥১৪॥ * * * ভৃতকাধ্যাপনম্ ॥২০॥ ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানম্ ॥ * দ্রুমগুল্মবল্লীলতৌষধীনাং হিংসা ॥২৪॥ আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ ॥২৭॥ অনাহিতাগ্নিতা ॥২৮॥ দেবর্ষি পিতৃঋণানামনপক্রিয়া ॥২৯॥ * * কুশীলবতা ॥৩২॥ ইত্যুপ পাতকানি ॥৩৪॥ উপপাতকিন স্তেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ। পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোসবেন বা ॥৩৫

(৩৭শ অধ্যায়; বিষ্ণু সংহিতা।)

* * "বেদনিন্দা, অধীত বেদ বিস্মরণ, আহিত—অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্ন ভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন), অভক্ষ্য ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ), পরস্বাপহরণ, পর স্ত্রী গমন, অনুচিত কর্ম্ম (যথা—ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম যুদ্ধাদি করা (দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য ও পরশুরাম ইহাঁদের উপায় কি ?) বৈশ্যাদির দোকানদারী, কুসিদ, বাণিজ্যাদি কিংবা শূদ্রের কার্য্য দাস্য কর্ম্ম (গোলামাদি কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা), অসৎ প্রতিগ্রহ, শূদ্রের দানাদি গ্রহণ ক্ষত্রিয় হত্যা বৈশ্যহত্যা, শূদ্র হত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয় প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন, দ্রুম, গুল্ম, লতা এবং ঔষধির বিনাশন, দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নি—আধান না

না করা, দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ এই সকল উপপাতক। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ, চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে।" বিষ্ণু সংহিতা পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

চাণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥৫৭॥ সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ ॥৫৮

(৫১শ অধ্যায় ;)

"চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির অপক্ক অন্ন ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পরাকব্রত করিবে" অঙ্গিরঃ সংহিতা বলেন :—

অন্ত্যানামপি সিদ্ধান্নং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্ম ক্ষত্রবিশাং বিদুঃ ॥২

(প্রথম অধ্যায়।)

"দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চণ্ডালাদি নীচ জাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত।" অত্রি পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

রজকঃ শৈলূষশ্চৈব বেণুকর্ম্মোপজীবনঃ।
এতেষাং যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বৈ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৬৮
সংস্পৃষ্টং যস্তু পক্কান্নমন্ত্যজৈর্ব্বাপ্যুদক্যয়া।
অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যার্দ্ধমাচরেৎ ॥১৭১

"রজক শৈলূষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে,) বেণু কর্ম্মোপজীবী (ডোম ইত্যাদিগের অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা-স্পৃষ্ট পক্কান্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ করিবে।"

অপিচ—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥১৯০
এষাং গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেদজ্ঞানাদৈন্দবদ্বয়ম্ ॥১৯৬

(অত্রি সংহিতা)

"রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহকারী), বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদিগের স্ত্রীগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ (একবৎসর একাধিক্রমে প্রাজাপত্যব্রত, ৩০ প্রাজাপত্য) করিতে হইবে; অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চান্দ্রায়ণদ্বয়।"

"রজকব্যাধশৈলুষবেণু চর্ম্মোপজীবিনাম্।
ভুক্ত্বৈষাং ব্রাহ্মণশ্চান্নং শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণে ন তু ॥৩১

নবম অধ্যায়; আপস্তম্বসংহিতা।

"রজক, ব্যাধ, শৈলুষ, বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে।'

আপস্তম্ব পরে বলিতেছেন :—

রজক ব্যাধশৈলুষবেণু চর্ম্মোপজীবিনাম্।
যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্তমেতাষাং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্ ॥১২

দশম অধ্যায়, আপস্তম্ব সংহিতা।

"* * অন্ন ভোজনে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে।' এতৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ মনু সংহিতা কি বলেন দেখা যাউক :—

গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃ ত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্নোঃ সুতস্য চ ॥৬০

* * * * বার্দ্ধষ্যং * * *

ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ ॥৬৩

সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহা যন্ত্র প্রবর্ত্তনম্।

হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভীচারো মূলকর্ম্ম চ ॥৬৪

ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামব পাতনম্।

আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা ॥৬৫

অনাহিতাগ্নিতা স্তেয় মৃণনামনপ ক্রিয়া।

অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া ॥৬৬

ধান্য কুপ্য পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।

স্ত্রী শূদ্র বিট্ ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্ ॥ ৬৭

* * * * * *

এত দেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।

অবকীর্ণিবর্জ্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়াণমথাপিবা ॥ ১১৮

(একাদশ অধ্যায়)

"গো হত্যা, অযাজ্যযাজন (শূদ্রযাজন), পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তাগ্নিত্যাগ, * * * বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা (সুদের টাকায় জীবন ধারণ) * * অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা, ওষধি নষ্ট করা, অভিচার দ্বারা অনিষ্ট করা, জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন, দেব পিত্রাদির উদ্দেশ্য নয়—পরন্তু আপনার জন্য পাকানুষ্ঠান লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ, অগ্ন্যাধানের অকরণ সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি; দেব, পিতৃ ও ঋষ্যাদি ঋণের অপরিশোধ, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা, নৃত্য গীত বাদিত্রোপ সেবন, ধান্য,

তাম্র ও লৌহাদি ধাতু এবং পশুচুরি, * স্ত্রী হত্যা, বৈশ্য হত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকলের প্রত্যেককে "উপপাতক" বলা যায়। * * *

"অবকীর্ণী ব্যতীত অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে॥"

"লবণ উৎপন্ন করা, * * তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রবমর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, শূদ্রসেবা * * এ গুলিও উপপাতক। দণ্ড চান্দ্রায়ণ। (অনুবাদ ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

যাজকান্নং নবশ্রাদ্ধং সংগ্রহে চৈব ভোজনম্।
স্ত্রীণাং প্রথমগর্ভে চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২২
ব্রহ্মৌদনে চ শ্রাদ্ধে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
অন্নশ্রাদ্ধে মৃত শ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২৩

(নবম অধ্যায় ; আপস্তম্বসংহিতা)।

"বহু-যাজী কিংবা গ্রামযাজীর (শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ,—শূদ্রবহুল গ্রামযাজী পুরোহিত ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের কথা পুস্তকের প্রথম ভাগে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—ইহাদিগকে শাস্ত্রকার পতিত বলিয়াছেন) অন্ন, আদ্য-শ্রাদ্ধের অন্ন, * * * ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মৌদন নব শ্রাদ্ধে * * * অন্ন শ্রাদ্ধে, আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে।"

পাচকান্নংনব শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৯২, অত্রি সংহিতা

"পাচক (রাঁধুনী) ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে।"

শাস্ত্রকার বলিতেছেন ঃ—হাঁস, কবুতর, মৎস্য, মাংস ও শূকর ভোজন তুল্য-অপরাধ। প্রায়শ্চিত্ত ১২ দিন উপবাস। পরে বলা হইতেছে—কবুতর ও কুক্কুট, সাদা বেগুন ও লাউভোজন তুল্য-অপরাধ। দণ্ড প্রাজপত্য প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন ঃ—লশুন, পেঁয়াজ, গাঁজর ও লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য—গ্রাম্য কুক্কুট, বিড় বরাহ, গোমাংস

ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য নিশ্চয় জানা যায় নাই এবং অজ্ঞাত মাংস, বধস্থানস্থিত (কসাই খানার) মাংস, শুষ্ক মাংস ভোজন করা তুল্য অপরাধ। দণ্ড—চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। এই ত গেল অভক্ষ্য মাংসাদি ভোজনের দণ্ড। এক্ষণে চণ্ডালাদি নীচ নীচ জাতির অন্ন ভোজনে কি অপরাধ ও দণ্ড শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছাপেক্ষা উন্নত চণ্ডালাদি নীচ জাতির অন্ন ভোজন, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন, অধীত বেদ বিস্মরণ, লশুনাদি ভক্ষণ, পরদ্রব্য অপহরণ, পরস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য দোকানদারী প্রভৃতি, শূদ্রের কার্য্য দাসত্ব করা চাকরী করা গোলামী করা প্রভৃতি; ক্ষত্রিয় হত্যা, বৈশ্য হত্যা, শূদ্র হত্যা, স্ত্রী হত্যা, গো হত্যা, লবণাদির বিক্রয়, দ্রুম, গুল্ম, লতা বিনাশ করা, কৃষকের ওষধি নষ্ট করা, দেব পিত্রাদির উদ্দেশে নয় পরন্তু নিজের জন্য পাকানুষ্ঠান করা, দেবঋণ পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ না করা, থিয়েটারের বা যাত্রার দলে থাকা, রজক ব্যাধ, ডোম, চামার বা মুচির অন্ন ভোজন, আদ্য শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন, রাঁধুনি বামুনের অন্ন ভোজন শূদ্রযাজন, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, টাকা ধার দিয়া তাহার সুদে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, সোনার খনিতে বা বড় পুলে চাকরী করা, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য তাজা গাছ কাটা, শূদ্র সেবা তুল্য অপরাধ। দণ্ড—ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।

পাঠকগণ, এক্ষণে দেখুন বঙ্গের হিন্দু সমাজ কিরূপ শাস্ত্রানুসারে ও ধর্ম্মবিধি মানিয়া চলিতেছে। মুখে মুখে আর্য্যধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিলে,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলে লাভ নাই। প্রবৃত্তি মার্গে সমাজ সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—উদ্দাম বেগের সম্মুখে আর বাধা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা সমাজপতির ত দূরের কথা বিধাতা পুরুষের পর্য্যন্ত বোধ হয় নাই। সমাজপতিগণ! সতর্ক হউন, আর ২৫ বৎসর। তাহা হইলে চেঁচা চেঁচি সব বন্ধ হইয়া যাইবে।

হিন্দু সমাজ, এখন দেখ দেখি তোমরা আমেরিকা ফ্রান্স জার্ম্মানি জাপান বা বিলাত যাত্রী অপেক্ষা কোনও অংশে নিরপরাধ কি না? তাঁহারা বিদেশে যাইয়া যাহা করিতেছেন—তোমরা বাড়ী বসিয়াই সে সমুদয় অপরাধ করিতেছ। অথচ তোমরা মিছামিছি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সরল বিশ্বাসী হিন্দুর মনে ধাঁধাঁ জন্মাইয়া, কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া হিন্দু সমাজের—হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ। ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণের বা নানাবিধ অভক্ষ্য ভক্ষণের অপরাধে যদি তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়, তবে সে সব অপরাধে তোমরাও ত বাদ পড় না! তোমরাও ত তুল্য অপরাধী! তাঁহারা হয়ত একটা অপরাধ করিতেছেন—মাতৃভূমির কোটি কোটি স্বজাতীয়ের মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য,—আর তোমরা করিতেছ—সেইরূপ শত শত অপরাধ, তা ও—বিনা কারণে ঘরে বসিয়া। সমাজ এ সব অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিয়াছে—এতকাল। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর,—যে দেশের ৩১ কোটি লোকের মধ্যে সাড়ে উনত্রিশ কোটি লোক নিরক্ষর, সে দেশে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভগবানের নাম লইয়া ফাঁকি দিয়া ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কঠিন কার্য্য নহে। তোমাদের শাস্ত্রের বচনের জাড়ি জুড়ির কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর নয়,—স্মৃতি সংহিতার পাতরা পাতরি এখন গুটাইয়া লইয়া শিকায় তুলিয়া ফেল। বিংশ শতাব্দির কালের বন্যা নব জাগরণের—নূতন জীবনের, শিক্ষা দীক্ষার প্রবল স্রোত বহিয়াছে। তাড়াতাড়ি না করিলে সামলান ভার হইয়া উঠিবে। দেখিতে দেখিতে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। তোমার টিকিতে হাত দিয়া ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত দিবে না। বাঁধ বাঁধ—স্মৃতি সংহিতা পুরাণ গল্প তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া ফেল। ঐ শুন বেদান্তের গভীর গর্জ্জন। খেঁকশিয়ালের রব আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারিবে। বেদান্ত কেশরী আসিয়াছেন—স্মৃতি সংহিতারূপী

খেঁকশিয়ালগণ এখন আপনাপন পলাইবার গর্ত্ত অনুসন্ধান করুন। আরও শাস্ত্র বচন শ্রবণের সাধ আছে না কি? যদি থাকে তবে শোন—

সুরাপান সম্বন্ধে তোমাদের স্মৃতিকারগণ সমস্বরে কি বলিতেছেন। মনু,—উশনঃ (১ম শ্লোক ৮ম অধ্যায়), বিষ্ণু (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ১।২।৩।৪।৫) অত্রি (১৬৪ শ্লোক), যাজ্ঞবল্ক্য (২২৭—তৃতীয় অধ্যায়), গৌতম (দ্বাবিংশ অধ্যায়), বশিষ্ঠ (প্রথম অধ্যায়) প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন ঃ—

ব্রহ্ম হত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা।)

"ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ হরণ, গুরু-পত্নীগমন, ও এই সকল পাপীর সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ—এই পাঁচটীকে "মহা পাতক" বলে।"

আর তার প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড?

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ ॥৯১
গোমূত্র মগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশাকৃদ্রসমেব বা ॥৯২

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা)

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপ ক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জলন্ত সুরাপান করিবে; ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়। অথবা অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল দুগ্ধ ঘৃত বা গোময় জল যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি।"

গৌতম বলেন ঃ—

সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃ শুধ্যেৎ।

(চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়, গৌতম সংহিতা)

"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণমদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে উহার পাপ ক্ষয় হয়।" প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস ভক্ষণ তুল্য আর পাপ নাই, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, শাস্ত্রকারগণ গো-মাংস ভক্ষণ ও সুরাপান অপেক্ষা অল্প পাতকজনক বলিয়াছেন।

বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে ঃ—

অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দুষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্ ॥৯৭॥

জাত্যপহারিণাশতম্ ॥৯৮॥ সুরয়া বধ্যঃ ॥৯৯

(পঞ্চম অধ্যায়)

"অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড, জাতি-নাশক অভক্ষ্য গো-মাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে শত সুবর্ণ অর্থদণ্ড; আর সুরাদ্বারা দুষিত করিলে বধদণ্ড।" কিন্তু হায়! এই সুরা বিশ্ববিজয় করিয়াছে। রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, প্রফেসর, উকীল, মোক্তার, কবিরাজ, ডাক্তার, শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু পুরোহিত স্মার্ত্ত পণ্ডিত পর্য্যন্ত এই সুরাস্রোতে ভাসমান—নিমজ্জমান। এখানে দণ্ডের কথা প্রায়শ্চিত্তের কথাটী মাত্র নাই। মনু স্মৃতি এখানে কেঁচো প্রায়; যত হাম্বি তাম্বি বচন শ্লোক বিলাত ফেরতের পক্ষে, আহারাদি ও জলচল সম্বন্ধে। "জলচল" শুনিলেই প্রভুরা চমকিয়া উঠেন ও ঘোর কাল আগমনের স্বপ্ন দেখেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দাঁত খেমটী বাহির করেন।

লোকে রঘুনন্দন ও মনুকে রম্ভা প্রদর্শনপূর্ব্বক অনবরত বিচারালয়ে হলপ পড়িয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। তাহাতে সমাজে উচ্য বাচ্য নাই—ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল প্রভৃতি রব নাই কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছে—

ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপান সমানি ষট্॥৫৭

(একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা)

"অনভ্যাস হেতু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ বিস্মরণ, বেদ নিন্দা, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা কথন, মিত্রবধ, লশুন প্রভৃতি গর্হিত ও বিষ্ঠা মূত্রাদি অখাদ্য দ্রব্যের ভোজন—এই ছয়টী সুরাপানের "সমান পাতক।" দণ্ড—ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ প্রাণদণ্ড।

অতঃপর আহারাদি সম্বন্ধে লঘুতর দণ্ডের ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।

* * * ভুক্ত্বা সপ্তরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ॥৭॥ তক্ষকান্নং কর্ম্মকর্ত্তুশ্চ ॥৮॥ বার্দ্ধুষিককদর্য্যদীক্ষিতবদ্ধনিগড়াভিশস্তষণ্ঢানাঞ্চ ॥৯॥ পুংশ্চলী দাম্ভিক চিকিৎসকলুব্ধকক্রূরোগ্রোচ্ছিষ্টভোজিনাঞ্চ ॥১০॥ * * সুবর্ণকার সপত্ন পতীনাঞ্চ ॥১১॥ পিশুনানৃতবাদিক্ষতধর্ম্মাত্মরসবিক্রয়িনাঞ্চ ॥১২॥ শৈলুষতন্তুবায়কৃতঘ্ন রজকানাঞ্চ ॥১৩॥ কর্ম্মকারনিষাদরঙ্গাবতারিবেণশস্ত্র বিক্রয়িণাঞ্চ ॥১৪॥ শ্বজীবিশৌণ্ডিকতৈলিকচৈলনির্নেজকানাঞ্চ ॥১৫॥ * * নার্চ্চিতং বৃথামাংসঞ্চ ॥২০॥

(বিষ্ণুসংহিতা ৫১শ অধ্যায় ; মনু ৪র্থ অধ্যায়)

"তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, সুদ খোরের অন্ন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, সুবর্ণকার (সেঁকরা), শত্রু, পতিত, পিশুন (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক (ধোপা), কর্ম্মকার (কামার), নিষাদ (ব্যাধ) * বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শ্বজীবী (কুকুরবৃত্তিধারী, চাকুরে, দাস গোলাম), শৌণ্ডিক (সুঁড়ী), তৈলিক (তৈলবিক্রয়কারী কলু) * * ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অনর্চ্চিত (অনিবেদিত) অন্নাদি অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও সাত দিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে।"

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন ঃ—

রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্। ২৯৮।

(মনু ২১৮, ৪র্থ অধ্যায় ; অত্রি সংহিতা)

"রাজার অন্ন তেজ—এবং শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে (সুতরাং অভোজ্য)। দণ্ড—প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত।

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ।

নরেন্দ্র ভবনে ভূক্ত্বা বিষ্টায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৩০০

"চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) রাজার ভবনে ভোজন করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।" ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতি সুসঙ্গের ব্রাহ্মণ মহারাজা এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর কি বলেন ? যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন— তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি কঠোর মন্তব্যই না প্রকাশ করিয়াছেন !

মনু আরও বলিতেছেন ঃ—

রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।

আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নাং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥ ২১৮ ॥

কারুকান্নং প্রজাংহন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।

গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২১৯ ॥

পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।

বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥ ২২০

* * * *

মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিন্মূত্রমেবচ ॥ ২২২

(চতুর্থ অধ্যায়)

"সুবর্ণকারের অন্ন ভোজনে আয়ু নষ্ট হয় এবং চর্ম্মকারের অন্ন ভোজনে খ্যাতি লোপ হয়। শিল্পকারের অন্ন ভোজন করিলে সন্তান নষ্ট হয়,

বস্ত্রাধাবকের অন্ন ভোজনে বল হানি করে; মিলিত জনসমূহের (হোটেলাদির) অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। চিকিৎসকের (কবিরাজ মহাশয় ও ডাক্তার বাবুদের) অন্ন ভোজন পুঁজ সমান, অসতী স্ত্রীর অন্ন ভোজন শুক্র ভোজন তুল্য; বৃদ্ধি উপজীবির অন্ন ভোজনে (সুদখোর মহাজন গণের অন্ন ভোজন) বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহবিক্রয়ীর অন্ন ভোজন শ্লেষ্মা ভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে। * * * ইহাদিগের মধ্যে যে কাহারও অন্ন জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয় এবং রেত, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত।" এক্ষণে দোকানের বা শূদ্রদের চিড়া মুড়ি খাওয়ার সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের অনুশাসন লেখা যাইতেছে।

শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহ মৃচ্ছতি॥ ৪৬

(অঙ্গিরঃ সংহিতা, ১ম অধ্যায়),

"ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে।"

বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ যে সিদ্ধান্নকে চিরসাথী করিয়াছেন দেখা যাউক শাস্ত্রকার সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন :—

মনু বলিতেছেন :—

অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা

অজ্ঞান ভুক্তন্তূত্তার্যং শোধ্যং বাপ্যাশুশোধনৈঃ॥১৬১

(একাদশ অধ্যায়)

"আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিষিদ্ধ অন্ন (সিদ্ধান্ন) ভোজন করা উচিত নয়; প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে শীঘ্রই ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধির কথিত জল পান করিবে।"

ইহা হইতেছে প্রমাদ বশতঃ অজ্ঞানকৃত ভোজনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। প্রতিদিনের ২ বেলার জ্ঞান কৃত অপ্রমাদ জনিত এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পণ্ডিতমহাশয়গণ করিতেছেন কি? না, বিধি ব্যবস্থা আইন কানুন দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত সব শূদ্রের বেলায়। নিজেদের জন্য নহে।

অতঃপর অনাচরণীয় শূদ্রগণের জল পান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

শাস্ত্রে বহু স্থানে শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান সম্বন্ধে নিষেধ বিধি করা হইয়াছে—যথা :—

"যে ব্রহ্মচারী শূদ্র হস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাস অন্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে"। (অনুবাদ, সংবর্ত্তসংহিতা, ৩০শ শ্লোক) অথবা।

"ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্টজল পান করিলে স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।"

(অত্রিসংহিতা, অনুবাদ ২৪৮ শ্লোক)।

পাঠকগণ দেখিবেন—শাস্ত্রকার শূদ্রের জল অপানীয় লিখিয়াছেন কিন্তু রঘুনন্দন ইহার মধ্যে বেশ এক চাল চালিয়া লইয়াছেন। তিনি শত করা ৬ জন ব্রাহ্মণ বাদদিয়া ৯৪ জন বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানকে শূদ্রও করিয়াছেন—জলও শতকরা ৪৮ জনের পানীয় রাখিয়াছেন। অর্থাৎ 'ধরি মাছ না ছুই পানী।' একে বারে সবশুদ্ধকে—৯৪ জনকে অচল, অনাচরণীয়, অপানীয় বলিলে তাহারাও মানিবে না, নিজেদেরও ও চলিবে না। তাই অর্দ্ধেকের মত গায়ে হাত বুলাইয়া—পৃষ্ঠদেশ চাপ্‌ড়াইয়া—হ য ব র ল একটা নূতন কিছু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমুদয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে শূদ্রও করিলেন, জলও চালাইলেন এবং এক কালে সর্ব্বশুদ্ধ লোককে চটাইতেও হইল না। শতকরা ৪২ জনকে হাতে রাখিয়া তাহাদিগকে জলচলের অধিকার দিয়া অবশিষ্ট ৫৮ জনের প্রতি তাহাদিকের দ্বারাই পাশবিক অত্যাচারের সূচনা করিয়া দিয়া

হিন্দু জাতির সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক শূদ্রবিদ্বেষের পুঞ্জীভূত পাপ লইয়া ধরা হইতে অপসৃত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গৃহে গৃহে ভাই ভাই এর মধ্যে ছুৎমার্গের” দারুণ ঘৃণার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উহারই শোচনীয় ফল স্বরূপ আজ হিন্দুজাতি মরণোন্মুখ—ধ্বংসোন্মুখ!

শাস্ত্রকার শূদ্রমাত্রকেই অনাচরণীয়, অপানীয় করিয়াছেন। রঘুনন্দন অনাচরণীয় সমুদয় শূদ্রকে আচরণীয় বা পানীয় শূদ্র করেন নাই, অনধিকারীকে অধিকারী করেন নাই বরং সুবর্ণবণিক প্রমুখ সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সর্ব্ববাদী সম্মত বৈশ্যজাতিগণকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না তিনি দাবাইয়াই গিয়াছেন। অথবা ক্ষমতা ছিল কিন্তু বুদ্ধ গৌরাঙ্গের মত তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত অভাব ছিল। তাই—তুলিবার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছেন, গ্রহণের পরিবর্ত্তে বর্জ্জন করিয়াছেন, প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হাতে কল্যাণকারিণী শক্তি অনেকখানি ছিল কিন্তু উহা দ্বারা হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিবর্ত্তে ধ্বংস সাধনই করিয়া গিয়াছেন। বালকের হস্তে লৌহ অস্ত্র দিলে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। বঙ্গদেশে অনাচরণীয় শূদ্রগণের স্পর্শিত দধি গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু শাস্ত্রকার তদীয় হীন অস্পৃশ্য অপানীয় শূদ্রগণের দধি ব্যবহারযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ঋষি অত্রি বলিতেছেন ঃ—

দেব যাত্রা বিবাহেষু যজ্ঞ প্রকরণেষু চ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্নবিদ্যতে ॥২৪৫
আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধি শক্তবঃ।
স্নেহপক্কঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি ॥২৪৬

“দেব যাত্রা (দেব দর্শনার্থ গমন), বিবাহ, এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শ দোষ নাই। আরনাল (কাঁজি, অম্লজল), দুগ্ধ, খই প্রভৃতি, দধি, শক্তু,

স্নেহপক্ক (তৈলাদি দ্বারা পক্ক) ও তক্র (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না।"

মনুও বলিয়াছেন :—

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয় দক্ষিণাম্ ॥২৪৭

* * * *

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্দধি।
ধানামৎস্যান্পয়োমাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ণুদেৎ ॥২৫০

(চতুর্থ অধ্যায়; মনুসংহিতা)

"কাষ্ঠ, **জল**, মূল, ফল ও খাদ্য—যাহা অযাচিত ভাবে আপনা—আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয়দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়।" শয্যা, গৃহ কুশ, কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য, **জল**, পুষ্প, মণি, **দধি**, ধানা (ভৃষ্ট যব তণ্ডুল) মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও শাক—এ সমুদায়ও অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না।" উপরে এবং এখানে সর্ব্বজাতির জল চলের বিধি পাইতেছি। পাঠকগণ, লক্ষ্য করিবেন। তবে— শ্বপাক চণ্ডাল সম্বন্ধে ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ করা হইয়াছে।

যথা:—অত্রি সংহিতায় :—

শ্বপাক চণ্ডাল পরিগ্রহে তু
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥২২৯

"শ্বপাক চণ্ডালাদি নীচজাতি স্পৃষ্ট জল পান করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।" (আপস্তম্ব সংহিতায় ২য় অধ্যায় ২য় শ্লোকেও এই একই কথা

আপাস্তম্বও বলিতেছেন :—

অন্যৈস্তু খানিতাঃ কূপস্তড়াগানি তথৈব চ।

এষু স্নাত্বাচ পীত্বাচ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৫—(দ্বিতীয় অধ্যায়)

"অন্য কর্ত্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।" পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হওয়া আর তাসের ঘরে বাস করা সমান নহে কি ? একটা ধোকা দেওয়া হইয়াছে মাত্র ! ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণগণ "ছুঁৎমার্গের" দোহাই দিতে যাইয়া অনেক সময় পাগলামী প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা যে তীর্থ ক্ষেত্রকে আচার্য্যগণ মহা মহা পাপী উদ্ধারণ বলিয়া, কোটি কোটি জন্মের পাপ, মলিনতা হরণকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে তীর্থের পবিত্র রজঃস্পর্শে গো-বধ, ব্রহ্ম-বধ, মহা অশুচি, শ্বপাক চণ্ডাল পর্য্যন্ত শুচি শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ হইয়া যায় সেই সুপবিত্র তীর্থ ভূমিকেও চণ্ডালাদি স্পর্শে অশুচি হয় বলিয়া সংহিতাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! হায় ! শুদ্ধ মুক্ত ঋষিগণের মানব প্রেম—জীব শিবে অভেদবুদ্ধি, অদ্বৈত জ্ঞান, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলার সার্থকতা সম্পাদন !

সংবর্ত্ত সংহিতার নামে বলা হইতেছে :—

অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।

শুদ্ধতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ ॥১৮৩

"অন্ত্যজ জাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত যে সকল তীর্থ, পুষ্করিণী এবং নদী তাহার জল অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে।" অন্ত্যজ স্পর্শে তীর্থ, নদী পর্য্যন্ত অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া যায়। তীর্থের ত মান ও মূল্য এই প্রকার বাড়াইয়াছেন ! অন্যকে শুচি ও পবিত্র করা ত দূরে থাকুক তীর্থ নিজেই অপবিত্র হইয়া থাকেন—হীনের স্পর্শে। শূদ্রের অন্ন যে ঠেকিলেই ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্রেই রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় রহিয়াছে :—

*　　*　　*　　*

অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি ॥১৬০—(প্রথম অধ্যায়)

"অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই, তাহাদিগের—শূদ্রাদির) অন্ন আপৎকাল ব্যতীত ভোজন করিবে না।" অর্থাৎ আপৎকালে স্বচ্ছন্দে ভোজন করা যায়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় হিন্দুর এমন আপৎকাল আর কখনই বা ঘটিয়াছে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্র গৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯
(একাদশ অধ্যায় ; ২০শ শ্লোক, ৮ম অধ্যায়, আপস্তম্ব।)

"যদি কোনরূপ আপদ্‌কালে বিপ্র শূদ্রগৃহে ভোজন করেন তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন।" আমাদের বঙ্গ দেশে আচরণীয় জাতি ভিন্ন অন্যের স্পৃষ্ট জল ও দধি ব্যবহার্য্য ও পানযোগ্য নহে। যত শাস্ত্র, বিধি ঐ জল টুকুর মধ্যে, যত দোষী ঐ জল দৈ টুকু লইয়া। অনাচরণীয় হিন্দু ত দূরের কথা—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনাচারী (?) মুসলমানগণের দাইল সম্ভার দানের অশুচি দুগ্ধ ভাণ্ডে আনীত, অনেক সময় পচা পাগাড়ের—ডোবার ময়লা পানী মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যবহারে আমাদের বিন্দু মাত্রও আপত্তি নাই। মুসলমান দুগ্ধ বিক্রেতার অনেকের মুখে শুনিয়াছি—"দুধের ভাঁড়ে দাইল সম্ভার দিলে সে দাইল খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয় বলিয়া আমরা মাঝে মাঝে উহাতে দাইল সম্ভার দিয়া থাকি। আর পানী দেওয়া (দুধে জল দেওয়া) সে ত আমাদের অভ্যস্ত কার্য্য ! প্রতিদিন ত আর দুধ সমান হয় না,—কিন্তু আমাদের রোজ দেওয়ার দুধ সমানই দিতে হয়, কাজেই গঙ্গা মাইর আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর কি ? তবে ঠাকুর মহাশয় ! আমরা গোয়ালাদের মত বেশী জল দেই না। অল্প করিয়াই—যৎ-সামান্য দিই পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য !" ইত্যাদি। স্বার্থান্ধ সমাজপতি !

এসবই তুমি দেখিতেছ কিন্তু তথাপি তুমি নীচ আর্য্যামী ছাড়িয়া মন মুখ এক করিতেছ না। মুসলমান ভাইগণের ত শুচিঅশুচি এঁটো বাচ বিচার নাই। তাহাদের দেহ বিছানা আসবাবপত্র কুপোদক সবই ত আমাদের পক্ষে ঘোর অশুচিজনক (!) সুতরাং কেমন করিয়া তাহাদের দোহন করা ভাড়ের দুধ শুচিবাই গ্রস্ত আমাদের চলিতে পারে বলিয়া দিবে কি? দুধ ও জল মিশ্রিত দুধ যদি চলে তবে শুধু জল চলে না কেন? কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে দেখাও দেখি? শাস্ত্র ছাড়া, বেদ তন্ত্র পুরাণ সংহিতা, পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচলিত "সনাতন ধর্ম্ম" নিয়ম ছাড়া কোন কথা কোন যুক্তি শুনিতে চাওনা, জিজ্ঞাসা করি কোন্ শাস্ত্রের কোন্ পাতায় কোন্ শ্লোকে মুসলমানের দুধ গ্রহণ ও পানের ব্যবস্থা আছে? না—"ধরা পড়লে বৌএর মা, আর ফস্‌কিলেই চাচি!" ধিক কপটাচারী অনভিষিক্ত সমাজপতিকে—ধিক্ তোমাদের শাস্ত্র চর্চ্চা, বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য উপাধিকে! ঐ ত শাস্ত্র বলিতেছেন:—

ভাণ্ডস্থিতমভোজেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ং
অকামতস্তু যো ভুঙক্তেপ্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥ ২৪
ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রোবাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথা বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ॥ ২৫

(পরাশর সংহিতা, একাদশ অধ্যায়।)

"যাহার অন্নগ্রহণ বা জলপান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে।" (গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশজল ইহাই ব্রহ্মকুর্চ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপ নাশকারক।)

অজ্ঞানতঃ ত দূরের কথা, সমাজপতিগণের চেলা চেলা দুই দুইটা চোখের সামনে সজ্ঞানেই এ সব চলিতেছে কিন্তু কৈ কাহাকেও ত গোবর চোনা খাইয়া শুদ্ধ হইতে দেখিতেছি না। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের মতে ত ব্রাহ্মণ ৬ জন ছাড়া আর বাকি ৯৪ জনই শূদ্র এবং ব্রাহ্মণগণ ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। অথচ শাস্ত্রকার বলিতেছেন— যাহার হস্তে অন্ন আহার ও জল পান করা যায় না—তাহার ভাণ্ডস্থ জল দধি-দুগ্ধও গ্রহণ করা যাইবে না। এনতাবস্থায় মুসলমান বা অনাচরণীয় হিন্দু ত দূরের কথা—দধি দুগ্ধ ঘৃত ব্যবসায়ী বর্ত্তমান শূদ্র সংজ্ঞক ঘোষনন্দন এবং বৈদ্য কায়স্থ কর্ম্মকার কুম্ভকার তিলি তাম্বুলি বারৈ গন্ধবণিক প্রভৃতি আচরণীয় নবশায়কগণের দধি দুগ্ধ ঘৃতও ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। কেন না ইহাদিগের কাহারও অন্ন ব্রাহ্মণগণ আহার করেন না।

সহৃদয় পাঠকগণ দেখিবেন—শাস্ত্রকার কি বলিয়াছেন আর আমরা কি করিতেছি। অথচ শত করা ৯৯ জন শাস্ত্র শাস্ত্র করিতেছেন ও শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন। শাস্ত্র গিয়াছে ব্যবস্থা গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, আচার গিয়াছে নিষ্ঠা গিয়াছে,—আছে কেবল "মুণ্ডমালার দাঁত খেমটী," ছুৎমার্গ, 'ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল' রব। ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে—? যে দিন মাতৃঘাতী নরশোণিত পিপাসু ব্রাহ্মণ অবতার পরশুরাম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ডুবাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতমাতার সুশীতল বক্ষ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষক, গো বিপ্র প্রতিপালক, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় সন্তানের তপ্ত রুধিরে তর্পণ করিয়াছেন, যে দিন কুরুক্ষেত্রের কাল সমরে ভ্রাতৃবিরোধ যজ্ঞে সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়কুল নিমন্ত্রিত হইয়া আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন,—সেই দিনই ভারতের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা পুণ্য যাহা কিছু ছিল, চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম আর নাই—আছে কেবল উহার কঙ্কাল মাত্র—খোসা ভুঁসি,—নারিকেলের

বাহ্য ছোবড়া বাহিরের আবরণ। ধর্ম্ম থাকিলে—দ্বাবিংশতি কোটি মানব সন্তান—হিন্দু সন্তান এমন পশুর মত হীন ভাবে জীবন যাপন করিত কি? "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়—একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়—সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ" তাহারাই আজ কিনা সমুদ্র যাত্রার নামে শিহরিয়া উঠে, দাঁত শিট্‌কায়—আর ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া চেঁচায়? অদৃষ্টের এমন উপহাস আর কেহ কখন দেখিয়াছে কি? "হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানব আত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দু ধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।" (১) "ধর্ম্ম কি ভারতে আছে? এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা আমায় ছুঁওনা এই ভাব,—দুনিয়া মহা অপবিত্র—কেবল আমি ও আমরাই পবিত্র। জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ কর্ম্মমার্গ সব পলায়িত, এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা—আমায় ছুঁওনা; হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই—গোলকেও নাই—যোগী মুনি ঋষিগণের হৃদয় কন্দরেও নাই—যাগ যজ্ঞ উপাসনা তপস্যাতেও নাই—ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে—ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে"। (২) 'রান্নাঘরে ঢুকিলেই, ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করিলেই ব্রহ্ম ওলট পালট, হ্যাকচ্ প্যাকচ্! হায়! হিন্দু সমাজ! তোমার কি না অধঃপতনই ঘটিয়াছে। প্রতিপদ-বিক্ষেপে তোমার জাতি যাইবার আশঙ্কা'! যবন ম্লেচ্ছের পদাঘাতে

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী"।

হাজার বৎসরের দাসত্বে—গোলামীতে পা-চাটায় যাহাদের জাতি যায় নাই—তাহাদের জাতি এত সহজে, একটু জল পানে—যায় কেমন করিয়া বুঝিতে পারি না। বিধি ব্যবস্থার দৃঢ় বন্ধনে এ জাতির উত্থান শক্তি গতপ্রায় হইয়াছে। "বন্ধন খোল—বন্ধন খোল—জীবের যতদূর সাধ্য বন্ধন খোল, কাদা দিয়ে কি ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে—মুক্তি লাভ করা যায়?' (২) চীনাগণ যেমন একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা সমুদয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, আমরাও সেইরূপ বিধি ব্যবস্থার দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। কূপের ব্যাঙ যেমন মনে করে তাহার কূপই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এ ছাড়া জগৎই নাই—এর নিকট সাগর মহাসাগর দাঁড়াইতেই পারে না—আমরাও তদ্রূপ আমাদের নীচ আর্য্যামীর ক্ষুদ্র কূপে আবদ্ধ থাকিয়া ইহাকেই সারা বিশ্ব বলিয়া মনে করিতেছি—এবং আনন্দে আটখানা হইয়া কতই আবোল তাবোল বকিতেছি। শাস্ত্রে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এতই বিধি নিয়ম লিপি বদ্ধ হইয়াছে যাহা পালন করিতে মানুষ ত দূরে থাকুক মুনিগণও অসমর্থ। এই বিধি নিষেধের বেড়া জালে হিন্দু জাতি আচ্ছন্ন। আবার বলি খুলে দাও বন্ধন—জাতিটা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচুক। সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চির দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটি মহৎগুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটী এই যে দুটী একটী কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর

(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রবলী"।

রকমে লোকে করিতে পারে। * * * কিন্তু এই সমস্তগুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া মনুষ্যে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃ সূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

"নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তর খণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছ? অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের ইঞ্জিন,—তাহা ও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটানুটী রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্ম রক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটী চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছা শক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটী নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয় তাই সে চেতন। এই ইচ্ছা শক্তির যে খানে যত সফল বিকাশ, সেখানে সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। * * * চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর মৃৎপিণ্ড প্রায়, প্রাণহীন যন্ত্র গুলির মত, উপল রাশির ন্যায় রাশীকৃত মনুষ্য সমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত

হয়, সে কি সমাজ ? তাহার কল্যাণ কে চায় ? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহা মূর্খতার আকর না হইয়া ভারত ভূমিই বিদ্যার চির প্রস্রবণ হইত।"

"* * * দুষ্ট পুরুত গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেওয়ার কি দরকার ছিল ? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে !" (১)

"* * * স্বাধীনতা না দিলে কোনওরূপ উন্নতিই সম্ভব পর নহে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্ম চিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দু'চার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতা পূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে। মানুষের * * উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ, তাহার **খাওয়া দাওয়া**, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

"আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন ? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি ! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নর-নারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে ! কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে ? * * ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী" ১ম ভাগ।

এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে। * * * পৌরিহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। * * এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। * ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস, ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।" (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার—পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে সমাজ তর তর বেগে ছুটীয়াছে। কার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে। কোন্ যুগে কোন্ কালে ব্রাহ্মণ রাজা ও মহারাজা "ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলন" স্থাপন করিয়া নিজেরা সেই সভার সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান ছিলেন! ইহা কি পাশ্চাত্য ধন মাহাত্ম্য নহে? ব্রহ্মণ্য গৌরব ত্যাগের মহিমা লুপ্ত হইয়া ধনের বিজয় বৈজয়ন্তি পতাকা উড্ডীয়মান হইল না কি? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব আরও কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? পাশ্চত্য শিক্ষা সমাজের অভ্যন্তরে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে, বাহিরের প্রলেপে—উত্তপ্ত বক্তৃতায়, উচ্চ নিনাদে, সভা সমিতিতে ইহার গতিরোধ করিতে পারিতেছ না। দাও—দাও যত সত্বর সম্ভব অধিকার দাও। এখন অধিকার না দিলে অধিকার কাড়িয়া লইবে, তাহার পরিণাম কখনও তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। "জল চল ও অন্ন রন্ধনের" অধিকার ত সামান্য কথা ইহার পর তোমাদের বড় সাধের সভা সমিতির—বক্তৃতার খবরের কাগজের (কেন না ঋষিত্ব এখন এই সমস্ত দ্বারাই দর্শিত হইতেছে)

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী" ১ম ভাগ।

ঋষিত্ব ও ব্রাহ্মণ্য পর্য্যন্ত বল-পূর্ব্বক অধিকৃত ও লুন্ঠিত হইবে। ভারত আর এখন শুধু ব্রাহ্মণের ভারত নাই, ভারত এখন আচণ্ডালের ভারত।

ভারতের জাত্যভিমানী উচ্চবর্ণের লোকেরা স্বদেশের ৫ কোটি লোককে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্পর্শকে ইহারা যত অশুচি মনে করে কুকুর বিড়ালের স্পর্শকেও তেমন মনে করে না। অভিমানীরা যাহা-দিগকে অস্পৃশ্য মনে করে তাহাদের ছায়াপাতেই তাহাদের অন্নজল অশুদ্ধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মানুষ মানুষকে এমনই ঘৃণা করে, মানুষের মনুষ্যত্ব এই দেশে এমনই লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেছে।

যে দেশে মানুষের প্রতি মানুষের এমন ঘৃণা রহিয়াছে সেই দেশ কিরূপে আত্ম প্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন হইবে?

ভারতের কল্যাণকামী মহাত্মারা বহুকাল ধরিয়া বলিতেছেন,—"জাতিভেদ, উচ্চ নিম্ন বর্ণের বিভেদ রাজনৈতিক দাসত্বের প্রধান কারণ।" তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসী ভাইকে হাত ধরিয়া এক সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিবে না, তবে কিরূপে সমষ্টির বল অনুভব করিবে? ভারত সন্তানগণ ভারত-বর্ষকে কস্মিন কালেও সমবেত কণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকে নাই, ইহাই ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতনের ইতিহাসের শিরো-ভাগে লিখিত রহিয়াছে।

ভারতের স্বরাজ আন্দোলন যাঁহারা সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহারা ইহা নিসংশয়ে জানিবেন যে ভারতবর্ষে জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বহু শতাব্দী যাবৎ যে ব্যবধান রচিত হইয়া আছে, তাহা দূর না করিলে এই দেশের রাজ নৈতিক মুক্তি সম্ভবপর হইবে না।

বড়ই সুখের বিষয় ছত্রপতি শিবাজীর সুযোগ্য বংশধর কোলাপুরের মহা-রাজ বাহাদুর ভারতীয় অবনত সম্প্রদায় সমূহের উন্নতি বিধানে আন্তরিক প্রচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সভাপতিত্বে গত ৩০শে মে নাগপুরে এক নিখিল ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মধ্য

প্রদেশ ও বেরারের সকল স্থল হইতে দলে দলে প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। মারাঠা মহিলারা সাগ্রহে এই সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সভাপতির বক্তৃতা।

সভাপতি কোলাপুরের মহারাজা বাহাদুর সুদৃঢ় ভাবে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার উদারতা ব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পুনঃ পুনঃ উল্লাস ধ্বনি করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যায় বোধ।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পরে বহু বক্তা এই সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে একটি বিষয় অতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকগণ যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিম্ন বর্ণের লোকদের উপর দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে, সেই অন্যায় বোধ বক্তা ও শ্রোতা সকলের বাক্যে ও মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক বক্তা বলিয়াছেন,—

উচ্চ বর্ণের লোকগণ যদি যুক্তির প্রতি কর্ণপাত না করেন, তাঁহারা যদি এখনও অবনত জাতির লোক সমূহকে আপনাদের লোক বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এখন বহু দিনের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মণদিগকেই এখন অস্পৃশ্য করিয়া রাখা উচিত। এতকাল ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগকে কুকুরের অধম মনে করিয়াছেন, যাহাদের স্পর্শে তাঁহারা আপনাদিগকে অশুচি মনে করিয়াছেন এখন সেই দুর্ব্ব্যবহারের ক্ষোভ তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন অবস্থায় সমগ্র দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য উন্নত অবনত সকল সম্প্রদায়ের লোকের সামাজিক সম্মিলনের পরিপন্থী বিধি সকল রহিত করা আবশ্যক।

মানুষ কি কুকুরেরও অধম ?

কন্‌ফারেন্সে এক বক্তা বলিয়াছেন ;—এক শিক্ষা পরিষদে যোগ দিবার জন্ত দুইজন শিক্ষক পূর্ব্ববর্ত্তী সভাস্থলে যাইতেছিলেন। শিক্ষক দ্বয়ের এক জন উচ্চ বর্ণের, অন্য জন অবনত শ্রেণীর। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত শিক্ষক দ্বয়ের জলপানের দরকার হয়। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া জলপান করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্পৃশ্য তাঁহারত পুষ্করিণী স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক কুকুর সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে গমন করিয়া জলপান করিয়া আসিল, তথাপি তিনি যাইতে পারিলেন না ? তিনি লোকের প্রতীক্ষায় তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক সহৃদয় "ব্যক্তি" তাহাকে জল তুলিয়া দিল। তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

এক চর্ম্মকারের বক্তৃতা।

বোম্বাইর এক চর্ম্মকার এই সভায় আবেগময়ী বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ টিলক সম্পাদিত কেশরী পত্রিকা হইতে বচন উদ্ধার করিয়া তিনি বলেন :—মিঃ টিলক ও তাঁহার দলভুক্ত লোক ভারতবর্ষের জন্ত স্বাভিলাস শাসন দাবী করিতেছেন, সোপান পরম্পরায় স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য যে আইন প্রণীত হইয়াছে তাঁহারা উহার বিঘ্ন ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন তাঁহারাই আপনাদের অন্যায্য অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অসংখ্য স্বদেশীয়কে চির দাসত্বে নিযুক্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

ন্যাসন্যালিষ্ট দল।

নাগপুরের ন্যাসন্যালিষ্টদের এক প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়া

বলিয়াছেন ;—"অবনত সম্প্রদায়ের লোকগণের দুর্গতির মূলে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অক্ষমতা দৃষ্ট হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও এই ক্ষেত্রে অপরাধ আছে। তাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিলে ইহাদের দুর্গতি দূর হইত। পরলোকগত গোখলে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই বক্তা যাহা বলিয়াছেন উহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা বারংবার তাহাকে ধিক্কার করিয়াছেন। কোন্ পূর্ব্ব পুরুষের কি অক্ষমতা বা পাপ ছিল, যাহার জন্য তাহার বংশধরগণ অকারণে অনন্তকাল লাঞ্ছিত হইবে? বক্তা ইহার কোন সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

সার বিপিন কৃষ্ণ বসু।

সার বিপিন কৃষ্ণ বসু বলেন,—এই কন্‌ফারেন্স সকল সম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহারগত যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। উহাতে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে। অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া এখন আমাদিগকে সকলকে তুল্য ভাবে শ্রদ্ধা প্রীতি দেখাইতে হইবে। সমাজে একদল লোক অন্য দলকে পদদলিত করিয়া রাখিবে এমন কোন নৈতিক বিধি থাকিতে পারে না। সমাজে এক্ষণে যে অনর্থক ভেদ আছে উহারই ফলে হিন্দু সমাজ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অপমানিত ও লাঞ্ছিতেরা সমাজ নিগ্রহ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাভিলাষ শাসন দাবী করি, সমাজেও সেই স্বাভিলাষ নীতি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল সামাজিক-বিধি সম্প্রদায় সমূহ মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে এক্ষণে আমাদিগকে সেইগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। যাহারা অবনত বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে তাহারা আমাদেরই ভাই। এক রক্ত এক মাংস। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে বাহু প্রসারণ করিতে হইবে।

নিন্দা অঙ্গের অলঙ্কার।

অবনত জাতির উন্নতি বিধানে কোলাপুরের মহারাজা বাহাদুর প্রচেষ্ট হওয়ায় অনেক দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ বহু বিজ্ঞাপন মহারাজা বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে। তিনি কন্‌ফারেন্সের উপসংহারে যে বক্তৃতা করিয়াছেন উহাতে তিনি বলিয়াছেন, আমি এই নিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ কল্যাণকর আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইব না। কন্‌ফারেন্স ভাণ্ডারে মহারাজা বাহাদুর ৫ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ভারতের অবনত জাতি—সঞ্জীবনী।

অমৃতসহরের কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অভিভাষণের মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দেখিলাম—ধনিক এবং শ্রমিকের বিবাদের ফলে ইউরোপ এখন ছিন্ন ভিন্ন—শ্রমজীবীরা সেখানে ক্রমে প্রবল হইতেছে, অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। হইতে পারে যখন আমরা স্বায়ত্বশাসন পাইব, তখন পূর্ব্ব পশ্চিমের "নীর" বাদ দিয়া ক্ষীর টুকু লইয়া আমরা নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিব। আসুন, এই অবসরে আমরা পশ্চিমের ত্রুটীগুলি কি তাহা স্থির করি ও এ দেশের বদ্ধমূল কুপ্রথা ও মিথ্যা ধারণা সমূলে উৎপাটিত করি। আমাদের আদর্শ ভারত এমন হইবে যেখানে সকলে স্বাধীন রহিবে, যেখানে সকলে আত্মোন্নতির সমান সুবিধা পাইবে, যেখানে নারীজাতি দাসত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে, যেখানে জাতিভেদের কঠোর অত্যাচারনিগড় থাকিবে না, যেখানে বিশেষ অনুগৃহীত কোন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় থাকিবে না, যেখানে সকলে বিনাবেতনে শিক্ষা পাইবে, যেখানে ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার নির্বিবশেষে সকলে শিক্ষার আলোক পাইবে, যেখানে ধনিক এবং ভূস্বামী শ্রমজীবী ও রায়তকে অত্যাচারপিষ্ট করিবে না, যেখানে শ্রমিক দিগকে সকলে সম্মানের চক্ষে দেখিবে এবং তাহারা যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইবে, যেখানে বর্ত্তমান ভারতবাসীর সর্ব্বদুঃখ-

জনক দারিদ্র্য থাকিবে না। তখন ভারতে বাসকরা আনন্দের কারণ হইবে—আমাদের সব দুঃখ দূর হইবে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বক্তৃতা হইতে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিতেছেন এই যুগে কেহ আর অস্পৃশ্য থাকিবে না। প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনারা 'অস্পৃশ্যদিগকে' উদ্ধার করিবেন তাহাদিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং আপনাদের বাসের ও পাকের ঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন।"

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে পণ্ডিত নেহেরু ও শ্রদ্ধানন্দ স্বামী উভয়েই বর্ত্তমানের জাতিভেদ ও স্পর্শদোষের বিরোধী। নেহেরু বলিয়াছেন—আমরা যেমন রাজনৈতিক অধিকার পাইব রাজনীতি ক্ষেত্রে সকলে সমান হইব, তেমনি সামাজিক অধিকারে ও আমরা সমান হইব। এদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীকে শ্রমিকদিগকে সামাজিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইতে পারে তার আভাষ ও তিনি ইউরোপের শ্রমিক ও ধনিকের উল্লেখে দিয়াছেন। আশাকরা যায় তথাকথিত উচ্চজাতির লোকে ইহা মনে রাখিয়া কাজ করিবেন। তাঁহারা যেন মনে রাখেন সকলে এক সঙ্গে না টানিলে জগন্নাথের রথ নড়িবে না। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি, এ,

সিরাজগঞ্জ।

বিদেশী বণিকদের বঞ্চনা ও শোষণ এবং কার্য্যতঃ তাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে ইংলণ্ডের রাজার নামে যাঁরা রাজত্ব করেন তাঁদের শাসন ও ত্রাসন—শুধু এতেই কি আমরা এত হতমান, হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়েছি? না বহুশতাব্দী ধরে আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হতে হতে আজ আমরা কাল-সাগরে ডুবে যাচ্ছি, পৃথিবী থেকে চিরতরে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছে?

এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে অনন্তজীবনের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এনে দিতে হলে,

সকলের আগে চাই যে সব মলিনতা আবর্জ্জনাতে তার অভ্যন্তরীন জীবন জীর্ণজরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেই সব দূর করে ফেলা। এ জাতি আজ ঘুমন্ত অজ্ঞানমোহঘোরে আচ্ছন্ন। কত অলীক স্বপ্নই যে তাকে আত্মভ্রান্ত করে রেখেছে তার সীমা নেই। সজাগ জীবনের মতি ও গতি হারিয়ে এ জাতি কত অসত্যকে যে আজ সত্য করে মেনে নিয়েছে, কত পাপ কদাচারকে যে পুণ্য সদাচার বলে পুষে রেখেছে, তা সংখ্যা করা যায় না। বাস্তব জীবনের কষ্টিপাথরে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া নিতে হলে যে শক্তি ও স্ফূর্ত্তির দরকার, তা আমাদের কোথায় ?

আমরা সুপ্তির ঘোরে নিসার হয়ে ছিলাম, মায়াস্বপ্নে আত্মবোধ হারিয়েছিলাম—এমন সময় পাঞ্জাবের বুকের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল, চারিদিকে জাগার সাড়া পড়ে গেল! জেগে আমরা নিজের দিকে চাইলাম, দেখ্‌লাম আমরা অন্নাভাবে শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে নগ্ন ;—এ বীভৎস দশা দেখে আমরা শিউরে উঠ্‌লাম। যারা আগে জাগ্‌লেন সেই মহাপ্রাণেরা সমস্ত জাতিটা এক আসন্নমরণ মোহের নীলসাগরে মূর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়েছে দেখে অধীর হয়ে পড়্‌লেন্, সকল লাজমান, ভয় লোভ ত্যাগ করে হাহাকার ক'রে পথে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বাহিরে থেকে এই যে বিপুল আলোড়ন হতে লাগল, তাতে সকলেই বুঝতে পার্‌লেন আর ঘুমাবার সময় নেই। আত্মস্থ বীর যারা তারা অচিরে তাঁদের বাঁধনবেড়ি খুলে ফেলে মুক্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কেউ বা জেগে ঘুমালেন, দাসত্বের কালসাপকে তাঁরা সোণার শিকল জেনে গলায় জড়িয়ে ধরে আরামের মোহে মজে দিনপাত করতে লাগলেন! আমাদের ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীরা যখন ভালবাসার সুর ভেজে আর ভুলিয়ে রাখতে পার্‌লেন না, তখন সবাইকে নিয়ে শাসন করে, লোহার খাঁচায় পুরতে লাগলেন। এ অভিনয় আজো পুরোদমে চলছে। ক্রমেই তাঁরা ভীষণ হতে ভীষণতর রূপ ধারণ করেছেন। তাঁদের

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা দেখে তাঁদের একান্ত বশংবদ ভালো ছেলেরাও প্রমাদ গ'ণেছে, উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে;—কিন্তু তাতে কি আমাদের শাসন কর্ত্তাদের প্রভুত্বের জিদ কমে? জগতে তাঁরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সাম্রাজ্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যধন বলে জেনেছেন। তবে যে দিন কালপূর্ণ হবে সেদিন মনে হয়—এই ভেদনীতি তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশ করেছে তা তাঁরা বুঝতে পারবেন,—বুঝতে পারিবেন সাম্যস্থাপনই সকল শক্তি ও শান্তির একমাত্র উপায়,—সেদিন হয়ত এঁদের ভাবতে হবে 'নিজেরে করিয়া গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান।"

যাক্, বড় দুঃখে পরের সমালোচনা করতে হ'ল। যে জাতের অন্তর থেকে মুক্তির আদর্শ মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে, জীবন যাদের অস্বস্থ, শক্তি-হারা তাদের হীনতা ও দুর্ব্বলতার উপরই যে বিদেশী এসে তাদের প্রভুত্বের সৌধ নির্ম্মাণ করেছে সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না। শত সহস্র ভেদবিভাগে অনর্থক নিয়মকানুনের জীর্ণ জঞ্জালে আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু ক্ষত বিক্ষত ও অসার হয়ে পড়াতেই, অত সহজে অধীনতা পাশকে মাথা পেতে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ স্বাধীন জাতি,—জড়-সভ্যতার মোহে অনেক পরিমাণে সত্যন্যায়ের মর্য্যাদাবোধ হারিয়ে থাক্‌লেও আজো তাদের মধ্যে এমন সহৃদয় ব্যক্তির একান্ত অসদ্ভাব নেই যাঁদের প্রাণ সত্যিকার আমাদের দুর্দ্দশা দেখে কাঁদে,—আমাদের মুক্তির চেষ্টার সঙ্গে যাঁহাদের সহানুভূতি আছে। তাই আমাদের ইংরেজ জাতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, আমাদের সংগ্রাম ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সাথে। শুধু প্রভুত্ব গর্ব্বই যে ইংরেজকে বিকৃত করেছে তা নয়, তার বিকারের জন্য আমাদের দাস মনোভাবও নিঃসন্দেহরূপে দায়ী। আমলাতন্ত্র আমাদের মুক্তির বিরোধী তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তার চাইতেও অনিষ্ট করেছে আমাদের অভ্যন্তরীন জীবনের অনন্ত বিধিনিষেধ। তাই আজ বাহিরে যে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে

তাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে বটে; কিন্তু আমাদের 'স্বরাজ' লাভ করতে শুধু আমাদের শাসকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই চলবে না। আজ আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। নিজেদের চিনতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে, অসহযোগ নেতিমূলক নয়, এ নৈষ্কর্ম্যের মানে স্বাবলম্বন পর-মুখাপেক্ষিতার অভাব। স্বরাজের অর্থ—নিজের স্বত্বকে পূর্ণরূপে পাওয়া, মানবতার চিরন্তন মুক্তিকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্ত করে তোলা। বড় ভাগ্য, বজ্রবেদনার মধ্য দিয়ে আজ আমরা বুঝতে পারছি স্বাধীনতা হারা জীবনের মরণাধিক নির্ম্মম পরিহাস প্রথমে বাহির থেকে সত্যের যে রুদ্র আহ্বান এনেছে তাতে আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সাড়া দেবই;—কিন্তু নিছক রাজনীতিদ্বারা স্বরাজ গড়া যায় না,—জীবনের সমস্ত অংশ জুড়ে রাজনীতির আসনও নয়। অন্তর বাহিরে যে দিন মুক্তিকে আমরা রাজাসনে বসাতে পারব যেদিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতার নিশান উড়াব সেই দিন আমরা ভারতমাতার হৃত গরিমা উদ্ধার করেছি বলতে পারব। আজ স্বাধীন জীবনের গুরু-দায়িত্ববুদ্ধি থেকে আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি এতদিন আত্মঘাতী অন্ধের মত ছুঁৎমার্গ অনুসরণ করে আমরা কত দীনহীন অক্ষম হইয়া পড়েছি। ভারত যেদিন দেশবিদেশে ধনৈশ্বর্য্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিতরণ করিত, সে দিন তার ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উদারতার অন্ত ছিল না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। অন্ত্যজ বর্ণেরা সদাচারী হলেই উন্নীত হত। সেকালে অসবর্ণ-বিবাহের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আজ আমরা অশিক্ষায় অজ্ঞানতায় সত্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি। জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য, শক্তি ও আনন্দ সকলই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোপ পেয়েছে। সমাজ প্রথার কল্যাণে আমাদের জীবনস্রোত ভেদ বিদ্বেষের অতি সঙ্কীর্ণ খাত দিয়ে কোনো প্রকারে বয়ে যাচ্ছে। আজ মুক্তবিশ্বের অনন্ত কর্ম্মশক্তি ও আনন্দ হতে বিদায় নিয়ে আমাদের ধর্ম্ম ক্ষুদ্র ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসীর মধ্যে ঢুকেছে

ও মিথ্যা জাতিভেদের আশ্রয় নিয়েছে। এত পূণ্য সদাচারেও আমরা শক্তি বা শান্তি পাচ্ছি না। আজ প্রেম নেই; -মিলন ও একতা হতে যে শক্তি জাগে তা থেকে আমরা বঞ্চিত। দেশে আজ সত্যদর্শী জ্ঞানী নেই, আছে যারা তাদের অধিকাংশই "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মুর্খাঃ"। বিভিন্ন দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্ম হয়েছে বটে; কিন্তু সকল দেশের তত্ত্বজ্ঞ সাধকদের বাণীতে একই কথা উচ্চারিত হচ্ছে—সে হচ্ছে সাম্য ও মিলন। জগতে নূতন উন্নতির সত্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা, ভট্টাচার্য্য বা মোল্লারা নয়। তার পর অতীতে যা অপূর্ণ রয়ে গেছে ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হবে। আমাদেব বর্ত্তমান দায়িত্ব সমূহ ভবিষ্যৎ অতীত বা বর্ত্তমানের চাইতে উজ্জলতর, বিপুলতর। ভবিষ্যতে যে যুগ আসছে তাতে মানব ত পশুর মত ঘৃণ্য থাক্‌বেই না সে তার দেবত্বের অধিকার প্রাপ্ত হবে;—আর অমৃতের অভিসারে ভারতই হবে পথ-প্রদর্শক। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ;—আর মানব মাত্রেরই এই ব্রাহ্মণ্যের বা দেবত্বে সমান অধিকার আছে। আজ পঞ্চম, পারিয়া, শূদ্র চণ্ডাল সকলেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী এ কথা তাদের মুক্তউদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে দিতে হবে। এ তাদের উপর কিছু অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রকাশ নয়। সমাজের অগ্রণী যারা তাঁরা যদি অগ্রসর হন তা হলেই তারা বাঁচবেন, জগতের শান্তি বৃদ্ধি পাবে, অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তাঁরা তাঁদের মিথ্যা মান বিসর্জ্জন দিতে না পার্‌লে ও, দেবতা পথের ধূলায় পড়ে থাক্‌বে না।

আজ পৃথিবী জুড়ে মহামানব জাগ্‌ছে, এ সত্যের প্রেরণাকে ব্যর্থ করে এমন শক্তি নেই। আজ যদি আমরা জাতিবর্ণের ভেদবুদ্ধি না ভুলে যাই তবে অচিরে দেখ্‌তে পাব, কবি যে গেয়েছিলেন,—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সমান।

সেই কথা সফল হয়েছে—আমাদের স্বরাজের স্বপ্নও শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ; যাদের অপমান করে আজ আমরা শক্তিহীন, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হয়েছি তাদের সমান হলেই আমাদের হবে যথার্থ সম্মান, সেই মহামিলনের নবীন উষায়ই স্বরাজ সূর্য্য দীপ্তশ্রীতে মহিমময় হয়ে উঠ্‌বে।

ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানব তার আত্মার গৌরবে চির-মহিমান্বিত ; জগতের প্রতি মানবের মধ্যে সেই আত্মা, বিশ্ব চরাচরের অন্তর-বাহির যিনি পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তার অন্তরে ভগবত্তার বীজ নিহিত আছে। এ জগতে মানবাত্মা চিরমুক্ত, অমৃতের অধিকারী। আত্মার জাতি নেই, মলিনতার স্পর্শ নেই। সচ্চিদানন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ মানবকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করবার স্পর্দ্ধা করতে পারে এমন অজ্ঞানতা, এমন দুরভিমানতা আছে কার ? ঐ নরের মাঝে যে নারায়ণ আছেন, ঐ মাটির ঘরে যে নিরঞ্জনের আসন পাতা আছে ! আমরা নীচ বলে মানুষকে ঘৃণা করে যে আমাদের পূজার ঠাকুরকে অবমাননা করি। মানুষ হীন,—এ মিথ্যা কথা শুধু জড়বাদী নাস্তিকের মুখে শোভা পায়। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব যে হিন্দুর জীবনের গোড়ার কথা তার কাছে মানবতার অবমাননা যে বড়ই দুঃসহ, বড়ই বিসদৃশ ;—তাইত মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ বলেছেন। মানুষ ক্ষুদ্র হয় অজ্ঞানে ডুবে ;—অপরকে হীনও করে অজ্ঞানের অভাবে। মানুষ যখন তার স্বরূপ উপলব্ধি করে, যখন সকলের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করে তখন তার প্রাণে অখণ্ডতার বোধ থেকে বিপুল শক্তি জাগে, তখন তার চক্ষে সবাই হয় বিরাট ও মহান্। তার ভেদবুদ্ধিজনিত অহঙ্কারে অন্ধকার কেটে যায়। বিশ্বের সঙ্গে অস্তিত্ব অনু-ভূতির অসীম শক্তি সে পায়। এই আত্মজ্ঞানটী আস্‌লেই আমাদের সকল ভেদগণ্ডী দূর হয়ে যাবে। ঐ বোধি, ঐ বিজ্ঞানের জ্যোতিফোয়ারায় স্নান করে আমরা যে অমর বীর্য্য লাভ করতে পারব—তা থেকে গ'ড়ে উঠ্‌বে

স্বাধীন ভারত নয়—মহান্ ভারত! শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন এম, এ, লিখিত "অস্পৃশ্যতা"। (বাঙ্গালার কথা)

"জাতিভেদ ও স্পর্শ-দোষ-প্রথা বেদানু-মোদিত নহে। সুতরাং উহা উঠাইয়া দিলে হিন্দু-ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় না। এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা না করিয়া এবং কি প্রকারে এই অশাস্ত্রীয় ব্যবহার উঠাইয়া দিতে পারা যায়, তদ্বিষয় কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না করিয়া, আমাদের নেতৃগণের পক্ষে স্বদেশী-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া অন্যায় হইয়াছে। স্পর্শ-দোষ-প্রথা থাকা-সত্ত্বে, হিন্দুর যে বিভিন্ন জাতি গুলি আছে, তাহাদের মধ্যেও কি পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হয়? হে শিক্ষিতা-ভিমানী কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ! তুমি কি প্রকৃত প্রস্তাবে নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) গণের সহিত প্রেমালিঙ্গন কর?

নিম্নশ্রেণীরা প্রকাশ্য ভাবে বলিতেছেন, কুকুর স্পর্শেও যে দোষ ও ঘৃণার উদয় না হয়, হিন্দুর নিম্নশ্রেণীর স্পর্শে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণার উদ্রেক হয়। একথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? ঠিক্ সমগ্র নমঃশূদ্রাদি অনাচরণীয় হিন্দুর মনের ভাব এইরূপ। তাই বলিতেছি, অগ্রে স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইয়া দেও, তার পরে স্বদেশীয় আন্দোলন কর।

তুমি হয়ত বলিবে যে, স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইলে, জল-চল করিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কথাটা সত্য নয়। স্পর্শ-দোষ প্রথা থাকাতেই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, কেন না উহা বেদানুমোদিত নহে। সে যাহা হউক, মানিয়া লইলাম, লোকাচারই তোমার ধর্ম্ম এবং স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দিলে সে ধর্ম্ম থাকে কই? কিন্তু ধর্ম্মটা কি কেবল তোমার? অনাচারণীয় হিন্দুর কি এই হিন্দুধর্ম্ম নহে? তাহার পক্ষে স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া স্বার্থ ও ধর্ম্ম। সুতরাং তোমার যাহা অধর্ম্ম তাহার তাহা ধর্ম্ম। সুতরাং তুমি অনাচারণীয় হিন্দুকে কি প্রকারে প্রেমালিঙ্গন দিবে? সেই বা কেন তোমার জন্য রক্তপাত করিতে আসিবে? আমি অবগত আছি ১৮৯১ সনের সেন্‌সাসের পূর্ব্বে কোন একটী

মহকুমার উকীল ও মোক্তারগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেল না যে, চণ্ডালগণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকটে একখানি আবেদন পত্রের মোসোবিদা করিয়া দেন। টাকা দিয়াও চণ্ডালগণ উক্ত ঘৃণিত নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নমঃশূদ্র বা শূদ্র নামে সরকারী সেরেস্তায় লিখিত হইবার জন্য ২০ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এক জনের হস্তও ক্রয় করিতে পারিল না! তাঁহারা বলিলেন চণ্ডাল শূদ্র বা নমঃশূদ্র হইবে, ইহার দরখাস্ত লিখিতে যাইবে কে? তাঁহাদের এই বিরুদ্ধতায় চণ্ডালগণের কোন ক্ষতি হয় নাই; তাঁহারা সেই সেন্সাস হইতেই নমঃশূদ্র বলিয়া সরকারী কাগজ-পত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা দ্বারা উচ্চ-শ্রেণী হিন্দুর মনের ভাব তাহাদের নিকট সম্যক উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে নিম্নশ্রেণীর প্রতি সদ্ব্যবহারে কুণ্ঠিত, ইহা আর বুঝিতে বাকী নাই। আমরা যে এক্ষণে তাহাদিগকে স্বদেশী ও স্বজাতি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি, ইহা যে আমাদের অন্তরের কথা নহে—প্রবঞ্চনা বাক্য, তাহা নিম্নশ্রেণী হিন্দুরা ক্রমশঃ বুঝিয়া উঠিতেছে।

ঘৃণাতেই ঘৃণা উৎপাদন করে। ইহা আমাদের শাস্ত্রেও আছে।—

"তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি। ১
তোমার জ্বালায়ে তারে কর জ্বালাতন;
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি।" ২

অথর্ব্ববেদ ২।১৯

এজন্য বলিতেছি "পাড়াবাসী প্রতি প্রেম" এই মহামন্ত্র যদি গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও; প্রকৃত জাতীয়তার বীজ বপন কর। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম যাইবে না, প্রোজ্জ্বল হইবে। আমি অবগত আছি, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের চেষ্টায় বরিশাল জেলার স্থানে স্থানে তাহাদের ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়া

স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এতাদৃশ একজন ব্রাহ্মণের সহিত আমার ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি বলেন, আমার যজমান নমঃশূদ্রেরা বলে, স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যোগ দিয়া ফল কি? আমাদের সহিত উচ্চশ্রেণী হিন্দুর কখনইত মিলন হইবে না! আমরা অস্পৃশ্য থাকিব, কাটকে গেলে মেথরের কাজ করিব, ইহার কোন প্রতিবিধান করা হইবে না, অনর্থক রাজার সহিত কলহ করিতে যাইব কেন? তারপর বিদেশী বস্ত্র খরিদ না করিয়া দেশী বস্ত্র খরিদে সম্প্রতি অর্থ ব্যয় বেশী। বর্ণবিপ্র মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিলেন আমি দেখিলাম, আমাদের শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এই অশিক্ষিত নমঃশূদ্রগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি ভাল বুঝে। বরিশালের নমঃশূদ্রের কথা ত বলিলাম। তাহাদের মনের ভাব পাঠক জানিতে পারিলেন। এক্ষণে ফরিদপুরের নমঃশূদ্রের কথা বলি। ফরিদপূরে মোট হিন্দু সংখ্যা ৫,৭০,০০০, তন্মধ্যে নমঃশূদ্র সংখ্যা ৩,২০,০০০। গত দুর্ভিক্ষের সময় শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত সম্পাদক এই নমঃশূদ্র-প্রধান জেলায় অনেক স্থানে রিলিফ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন (নব্যভারত, গত পৌষ মাঘ সংখ্যা) নমঃশূদ্রের মধ্যে যাহারা রাজদ্বারে চাকরী বা ব্যবসায় করিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "বয়কট" করিতেছেন এবং নানা রকমে তাঁহাদের উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছেন।

তোমরা ভাবিতেছ, ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড জাতীয়তার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাহার নাকি ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপিত হইয়াছে। জাপানে কতকটা এরূপ আছে বলিয়া তোমাদের ধারণা। এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে, ইহা ভুল। জাপান ঠিক্ হিন্দুস্থানের মত নহে। সেখানে সমাজে কোন বিভিন্নতা নাই। কেহ বৌদ্ধ, কেহ খ্রীষ্টান হইতে পারে কিন্তু খায় দায় একত্রে। তাঁহাদের স্পর্শ-দোষ-প্রথা নাই। তাই বলি, যদি

স্বদেশীয়তা রক্ষা করিতে চাও, স্পর্শদোষ প্রথা উঠাইয়া দাও। একজন নমঃশূদ্র বা অন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সহিত সজল ব্যবহার করিলে সহস্রখানি বিলাতী-বস্ত্র পরিবর্জ্জনের ফল আছে। শ্রীমধুসূদন সরকার। (নব্যভারত, আষাঢ়, ১৩১৪)

"হিন্দু হিন্দুকে ঘৃণা করে, হিন্দু হিন্দুকে স্পর্শ করিলে আপনাকে অপবিত্র মনে করে, হিন্দু হিন্দুর জলগ্রহণ করে না ; এই জন্যই হিন্দুর সর্ব্বস্ব গিয়াছে। তবু হিন্দুর চৈতন্য হইতেছে না। ইহাই মৃত্যুর লক্ষণ।

হিন্দু হিন্দুকে ঘৃণা করিয়া অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘৃণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দু হিন্দুর জল স্পর্শ না করাতে হিন্দু প্রাণশূন্য হইতেছে। হিন্দু যে বর্ণেরই হউক, তাহার জল গ্রহণ করিতে হইবে। যদি না কর, তোমার মৃত্যু কে বন্ধ করিবে ?

তুমি ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে তুমি কয়জন ? খাস বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০ লক্ষ মাত্র। কায়স্থ ! তোমার সংখ্যাই বা কত ? বাঙ্গলা দেশে কায়স্থের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার মাত্র। বৈদ্যের সংখ্যা কেবলমাত্র ৩১ হাজার। তোমরা বাঙ্গালা দেশের ১৮ লক্ষ নমঃশূদ্র, ১৫৷৷ লক্ষ রাজবংশী, ৭ লক্ষ বাগদী, ৫ লক্ষ বাউরি, ৪ লক্ষ পোদকে অনাচরণীয় রাখিয়া কখনও শক্তিশালী হইবার আশা করিও না। তোমরা ৩½ লক্ষ সাহা, ২৫ হাজার সুবর্ণ বণিকের কি দুর্দ্দশাই না করিয়াছ ! তাঁহারা ধনে বা গুণে কোন অংশে হীন নহেন, অথচ তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছ।

হিন্দু যদি ধ্বংস হইতে না চাও, তবে হিন্দু নামধারী সকলেই বেশী কিছু যদি আপাততঃ না করিতে পার, তবে তাহাদিগের জল গ্রহণ কর।

বাঙ্গালা দেশে কি ভীষণ মূর্খতা ! ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর ! বাঙ্গালা দেশে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ মুসলমানের বাস। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ সম্পূর্ণ নিরক্ষর।

বাঙ্গালা দেশের ৩৩ লক্ষ হিন্দু আর ৯ লক্ষ মুসলমান ব্যতীত আর কাহারও অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নাই; এইরূপ মূর্খ লোক লইয়া চাষ বাস করিবে, আর শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে? পৃথিবীর সুশিক্ষিত চাষা শিল্পীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবে? তাহার যে ফল হইতেছে, তাহা ত দেখিতেছ। বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে আমরা প্রত্যেক বিষয়েই হারিয়া যাইতেছি। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে নিরক্ষরদিগকে শিক্ষা দেও।" ফরিদপুর সমাজ-সংস্কার-সমিতি (সঞ্জীবনী)।

"দেশের নেতাগণ শিমলা শৈলে চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় ষোড়োশোপচারে সম্ভোগ ক'রে লাট দরবারে গোটাকতক রিজালিউশন পাশ করিয়ে মৃত ভারতকে তুলিতে চান, তা' কি সম্ভব? এদেশের অসংখ্য লোক অস্পৃশ্য। মৃত শবকেও মানুষ ছোঁয় এদের কেউ ছোঁয় না। মৃত শবকেও মানুষ বুকে জড়িয়ে কাঁদে—এদের জন্য কেউ অশ্রুপাত করে না। এদের অবস্থা শবাপেক্ষাও শোচনীয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এদের ভিতর কাজ করিতেছি। কিন্তু এদের তোলা যে কি কঠিন তা আর কি বলিব। একাজ মনুষ্য শক্তির অতীত। জন সমাজের নিম্নতম স্তরে মহাপঙ্কে এরা ডুবে আছে। নামে শুধু মানুষ—অবস্থায় পশু অপেক্ষাও হীন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথাত জানেই না—নৈতিক জীবন মহা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত। আজ একটু তুলিলাম, কাল আবার চতুর্গুণ নীচে পড়িয়া গেল। তা' ছাড়া যা'রা তাদের তুলিতে চায়, অন্যলোকে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে—গড়া কাজ ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করে। লাটসাহেবের সভায় গিয়া এদের সপক্ষে বলা অতি সহজ। কিন্তু গ্রামের যে কূপ হইতে তুমি জল তোল, সেই কূপ হইতে এদের জল তুলিতে দেওয়া সহজ নহে। শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না। অস্পৃশ্যদের তুলতে হলে, তোমায় অস্পৃশ্য হ'তে হবে! তা'দের পূর্ণ সংস্পর্শে আসিতে হইবে। ভাই ব'লে তাদের গলা

জড়িয়ে ধরিতে হইবে। মুখে মুখ বুকে বুক না রাখিলে এ মৃতে প্রাণ আসিবে না।

* * * মৃত ভারতকে প্রাণ দিতে হইলে এই সাধন চাই। যাদের তুমি হাত দিয়ে ছোবে না, তাদের জন্য গোটাকতক রিজলিউশন পাশ করিয়ে তাদের তুমি তুলিতে পারিবে না। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, ব্রাহ্ম হও, আর খৃষ্টান হও, যতদিন এই সহানুভূতি ও সমবেদনা মন্ত্রে দীক্ষিত না হইবে, ততদিন তুমি ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবে না। * * *" শ্রীবিনোদবিহারী রায়। শবসাধন, ভাদ্র, নব্যভারত।

মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার পঞ্চম সভ্য।—মান্দ্রাজের পঞ্চমরা তথাকার ব্রাহ্মণদের কর্ত্তৃক যেমন ঘৃণিত হইয়া থাকে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবরে কোন পঞ্চম ৪৮ হাত মধ্যে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা অশুচি হইয়া থাকে।

সংপ্রতি আদি দ্রাবিড় জনসভার সম্পাদক মিঃ রাজা মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। তিনি পঞ্চম সম্প্রদায় ভুক্ত। এখন ব্যবস্থাপক সভায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের সভ্যগণ পঞ্চমের পার্শ্বে তুল্য আসনে আসীন হইবেন। এক সঙ্গে তাহারা রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব আলোচনা করিবেন। ইহাদের জাতির অভিমান অতিরিক্ত। তাহারা কি এখন লাট মজলিসে যাইতে বিরত হইবেন? পঞ্চমের হাওয়া, ছায়া, স্পর্শ, দৃষ্টি এমন কি বাক্যও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদের এখন ক্রমে ক্রমে সহিয়া আসিবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলা গাছির জাতীয় বিদ্যালয়ে জনমন মুগ্ধকারী বক্তৃতায় জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আমরা হিন্দুজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। ফলে যেখানে আমরা কয়েকটী, সেখানে মুসলমান ৫০।৬০ জন। তাই আমাদিগকে অনেক জটিল সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে।

এর ছোঁয়া জল খাইব না, ওর ছোঁয়া জল খাইব না, ইত্যাদি ভণ্ডামি ও কপটাচারে সমাজ জর্জ্জরিত। হিন্দু-সমাজ গেল। মুসলমান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে আরও পঞ্চাশ বৎসর পরে গঙ্গার ওপারের সমস্ত হিন্দু মুসলমান হবে। গঙ্গার ওপারের হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বেশী বলিয়া, নিম্নশ্রেণী হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার বেশী, সেজন্য তারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। (সত্যবাদী)

জাতি ভেদ ও অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সম্বন্ধে সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় বিগত কাশী হিন্দু-মহাসভায় বলিয়াছেন ঃ—আমার দৃষ্টিতে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ও চণ্ডাল উভয়েই আমার ভাই। যদি কোন চণ্ডালের সন্তানকে দেখিয়া আমার মনে প্রেমের উদয় না হয় তবে যেন আমার পরমাত্মা দোষী হয়। কিন্তু আমি চতুর্ব্বর্ণে বিশ্বাস করি। আমাদের এই হিন্দুধর্ম্মের বিরাট ইমারতে যদি কোনও নূতন দরজা জানালা খুলিতে হয় তবে খুলিব ; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও এই ইমারত ভাঙ্গিতে দিব না।

হিন্দু-মহাসভা সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর,—সে চণ্ডালই হউক আর আর ব্রাহ্মণই হউক। আমাদের চামার ভাই রাম নাম করে, শিখা বাঁধে, দুই চারিটা পয়সা হইলে রামজীর মন্দির নির্ম্মাণ করায়। কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের মন্দির এক চামার নির্ম্মাণ করাইয়াছে। সেই চামার কি আমার ভাই নয়? আমার চামার ভাই আমার কত সেবা করে,—সকল সেবার চেয়ে যে সেরা সেবা—সে তাহাই করে ; সে দুই তিনবার আমার বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে ; না করিলে আমার বাড়ীতে টেকা দায় হইত। আর ইংরেজের সঙ্গে আমার কত প্রভেদ ; সে শৌচ করে না, ২।৪ মাস স্নান না করিয়া থাকে, কত অখাদ্য ভক্ষণ করে। সভাসমিতিতে, কাউন্সিলে সর্ব্বত্র আমি তাহাকে ছুঁই, আদর করি। তাহাকে ছুঁইলে আমার জাত যায় না, কিন্তু আমার যে রামদাস চামার, সে রাম নাম করিয়া স্নান করিয়া সভায়

আসিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

আজ প্রাতে আমি বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়াছিলাম। জীবনের কোনও সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইলে আমি বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যাই। মন্দিরে মধ্যে চারিদিকে কেহ উপাসনা করিতেছিল; কেহ পূজা, কেহ স্তবপাঠ করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে আমার গ্রামের কয়েকজন শূদ্রও ছিল। তাহারাও কত ভক্তির সহিত পূজা করিতেছিল। ভাইসকল সভায় উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলী আজ আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা যে,—যার ভগবানে বিশ্বাস আছে,—যে ভগবানের নাম লয়,—সে যেন প্রবেশ করিয়া ঢুকিতে ভগবানের দর্শন পায়।

আর নীচজাতিকে গ্রামের কূপ হইতে জল লইতে দেওয়া হয় না।' মিশনারীরা হাট কোট ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া উহাকে বলে যে হিন্দুরা তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি খ্রীষ্টান হও। মুসলমানও তাই বলে। সে খ্রীষ্টান হইলে গ্রামের কূপ হইতে তাহার জল লইবার আর বাধা থাকে না। ইহার ফলে দলে দলে লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। মীরাটের জমিদার আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার চামার প্রজারা দলে দলে খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। তিনি জমিদার হইয়াও এই খ্রীষ্টান প্রজাদের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা জোরজবরদস্তি করে, জমিদার তাহার কোনও প্রতিকার করিতে পারেন না। কারণ তিনি আদালতে নালিশ করিলে মিশনারী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নোট (note) পাঠান, ফলে সব ডিশমিশ হইয়া যায়। অন্য জাতি আমার মন্দির আক্রমণ করিতে আসিলে চামার ভাঙ্গী তাহাতে বাধা দেয়, তাহার জন্য প্রাণ দেয়, আর সেই চামার সেই ভাঙ্গীকে আমরা মন্দিরে ঢুকিতে দিই না; কূপ হইতে জল লইতে দিই না। আমার চণ্ডাল ভাই গ্রামে থাকে, গ্রাম সাফ রাখে, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করে,

নিজে সারাদিন অপরিষ্কার কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন স্নান করিবার জন্য কূয়ার জল তুলিতে যায় তখন তাহাকে জল তুলিতে দেওয়া হয় না। সর্ব্ব-জাতির লোক, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে কূয়া হইতে জল লইয়া যায়, কেহ তাহাদিগকে বারণ করে না। কিন্তু আমার ভাই আমার ধর্ম্মরক্ষাকারী, আমার স্বাস্থ্যরক্ষাকারী, আমার জীবন রক্ষাকারী ভাইকে জল লইতে দেওয়া হয় না।

আচার্য্য রায় অন্যত্র বলিয়াছেন—প্রত্যেক I. Sc.র ছাত্র জানে যে, hydrogen ও Oxygen এর রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। সেই জল যদি কাঁচপাত্রে থাকা অবস্থায় কোন নমঃশূদ্র স্পর্শ করে, অমনি তাহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের অপেয় হইয়া যায়; কিন্তু কেন? কাচ non-porous, non conductor of Electricity এবং bad conductor of heat, তবুও গ্লাস ছুঁইলে তাহার ভিতরস্থ পানীয় কি প্রকারে অশুচি হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িকগণও বলিতে অক্ষম। অথচ সেই জল অবস্থাবিশেষে লেমনেড রূপে স্নিগ্ধ হইলে বা জমাট বাঁধিয়া শীতল বরফ হইলে স্পর্শদুষ্ট হইবার ভয় থাকে না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে, অধ্যাপকমণ্ডলী বরফ দেওয়া স্নিগ্ধ পানীয় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কেন, ভাটপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণেরা, গঙ্গাস্নান করিয়া, নামাবলী গায় দিয়া, গায়ত্রী জপ করিতে করিতে পবিত্র গঙ্গাজলে, শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে কি বরফ তৈয়ারী করেন? বরফ লেমনেডে জাত যায় না, কিন্তু একজন সুবর্ণ বণিক ব্রাহ্মণকে পরিবেষন করিলে তার জাতি নষ্ট হয়। মানুষ মানুষের ছোঁয়া খায় না এর চেয়ে নীচতা, এর চেয়ে পাপ জগতে আর আছে কিনা আমি জানি না।

গলায় একগোছা সাদা সুতা থাকিলে তাদের হাতে খেতে আমাদের কোন আপত্তিই থাকে না। তা ঐ পৈতাধারী বিহার উড়িষ্যার যে কোন নীচ

বংশসম্ভূত হউক না কেন! অনেক ডাক্তার বলেন যে কলিকাতায় শতকরা ৯৫ জন রাঁধুনী বামুনের দেহে কুৎসিৎ ব্যাধি আছে। আমরা অম্লানবদনে তাদের স্পৃষ্ট অন্ন খাই। কিন্তু শুদ্ধাচারী তথাকথিত নিম্ন জাতির ছোঁয়া খাইতে নাসিকা সঙ্কুচিত করি। অবশ্য আপনারা জানেন, অনেক মুখ্য কুলীনই লাট প্রাসাদে নৈশ ভোজনে যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমি ব'লে থাকি বাংলাদেশের যুবকবৃন্দ আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থল—কিন্তু তাদের মধ্যে এই সব ভণ্ডামী দেখলে হতাশ হইতে হয়। লেখাপড়া শিখে, B. A., B. Sc. এমন কি D. Sc., P. R. S. হয়েও cleanliness is next to godliness এই সার বাক্যটীর উপর অনেকের শ্রদ্ধা দেখা যায় না—বোধ হয় জাত যাবার ভয়ে। এই জাত যাবার ভয়ই যে জাতি লোপ পাবার অন্যতম কারণ তা কেউ ভেবে দেখেছেন কি?

Plague এ দেশ সময় সময় উজাড় হয়ে যায়—একস্থানে আরম্ভ হ'লে বায়ুগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেল্লার ভিতরে Plague হয় কি? কেন হয় না? Plague কি কামানের ভয়ে কেল্লায় ঢুকতে সাহস পায় না? তা নয়, উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল। প্লেগ, কলেরা সব সময়েই বস্তিতে, অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার স্থানেই বেশী প্রকাশ পায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সকলেরই ইচ্ছাধীন; বাতাস ও সূর্য্যের আলোর জন্য এখনও tax দিতে হয় না। তবুও ভগবানের দেওয়া এই দুটো জিনিস থেকেই আমরা দূরে থাকি। কলের পরিষ্কৃত জল খাই না, কিন্তু আবর্জ্জনা দুষ্ট, অপরিষ্কার নদীর জলের পক্ষপাতী কেন না শাস্ত্রানুসারে উহাই শুদ্ধ। অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার শাস্ত্রকারগণের সময়ের নদীর অবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ের নদীর অবস্থার কত প্রভেদ। দেখা গিয়াছে, পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করাতে কলেরার প্রকোপ অনেক কমে গেছে। এখনও অনেক স্থানে পাইখানা ও কুয়া পাশাপাশি তৈয়ারী করা হয়, উহাতে পাইখানার

ময়লা সছিদ্র মাটির ভিতর দিয়া কূপের ভিতর পড়িয়া কূপের জলকে দুষিত করে।

অস্পৃশ্যতার কথা একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন আমরা ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন জাতিদিগকে দিন দিন নিজেদের নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দিতেছি—ফলে তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আর সমাজে যারা স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে, তারা উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত। আপনারা ত সকলেই জানেন যে, দেশের কার্য্যে, দেশোন্নতির পবিত্র যজ্ঞে সকলেরই সমান অধিকার, সকলেরই সমান প্রয়োজন—তবুও কেন মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষের নিকট থেকে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা? গত মহাযুদ্ধে যদি লক্ষ লক্ষ ফরাসী ইংরাজ আত্মোৎসর্গ না করিত, তবে মারসেল ফস বা লর্ড হগএর সাধ্য কি, তাঁহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করেন? দেশের নেতারা সব কাজেই বাহবা পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে শুধু নীরব কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

(সমাজ সেবা-"আনন্দ বাজার পত্রিকা")

আচার্য্য রায় বিক্রমপুরে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অস্পৃশ্যতা জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ইহা সমাজ হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে দূর করিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা নিম্নজাতির প্রতি অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। মুসলমান ভ্রাতাগণ হিন্দুগণ হইতে এ বিষয়ে অনেক উদার। হিন্দুদের মন্দিরে সকলের প্রবেশের অধিকার নাই, কিন্তু মুসলমানের মসজিদে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে। দেখিয়াছি আফগানিস্থানের আমীরের সহিত এ দেশের ভিস্তিও একাসনে বসিয়া নমাজ পড়িয়াছিল। আর আমাদের সমাজের অস্পৃশ্য জাতিদের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। দেবমন্দির হইতে বহুদূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেবদর্শন করিতে হয়। ইহা ছাড়া নানা ভাবে আমরা নিম্নজাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছি। তাহার ফলে

আমরা সাধারণ লোক হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এতদিন তাহাদিগের সহিতই অসহযোগ করিয়া আসিতেছি। এখন আমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

যে সকল জাতি উপেক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতি সাধন গুরুতর প্রশ্ন। এ দেশে যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটি কোটি লোকে জ্ঞানের আলোকে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, সমাজ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছে, নির্য্যাতন করিয়াছে, নিম্নস্তরে স্থান দান করিয়াছে। তাহারাও এতদিন আপনাদিগকে হীন বলিয়াই মনে করিয়াছে। যে দেশে শতকরা ৯৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে না—সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমানে ভারতে যে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষিত জাতিগণও জাগ্রত হইয়া আপনাদের অধিকার লাভের দাবী করিতেছেন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছেন; ইহা অতি শুভলক্ষণ। কিন্তু এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জাতি তাহাদিগকে এত হীন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি ইহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ ভাব জাগিয়াছে। সে দিন আর্য্যসমাজ গৃহে যে "সর্ব্ববঙ্গ-শিক্ষা সমিতি"র অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উপেক্ষিত জাতির কোন কোন শিক্ষিত লোক বলিতে ত্রুটী করেন নাই—"আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হিন্দুসমাজ দেন নাই রাজা দিয়াছেন, উচ্চ বর্ণের রক্ষণশীল হিন্দুগণ ও জমিদারগণ আমাদের শিক্ষার বিরোধী।" যদি তাহারা সকলে মন খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন, তবে অনেকেই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা এক্ষণে শিক্ষা করিতেছেন। সমাজে কতকগুলি অধিকার চাহিতেছেন। তাঁহারা সমাজের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন,—তোমরা দিবে, না, আমরা গ্রহণ করিব। তাহাদের দাবী এখন আর অগ্রাহ্য করার সাধ্য নাই। তাহাদের উন্নতি না হইলে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে, তাহাদের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া না উঠিলে, দেশের উন্নতি হইবে না। তাঁহারা যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে

তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য, উহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সময়ে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সমাজ যদি তাহাদিগকে সাহায্য না করেন, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া না তোলেন, তবে তাহারা দেশহিত-সাধনে সহায় হইবেন না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে কেবল প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই চলিবে না, তাহাদিগের মধ্যে স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহারা কতগুলি সামাজিক অধিকার চাহিতেছেন; তাহারা জলচল চাহিতেছেন, ধোবা নাপিত চাহিতেছেন, এই সকল অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। মানুষকে মানুষ বলিয়া মান্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে পশু পক্ষী অপেক্ষাও হীন চক্ষে দেখিলে চলিবে না। জানি, আজ তাঁহারা যে অধিকার চাহিতেছেন, এই অধিকার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের দাবী আরও বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে হানি কি? রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমেই অধিকতর অধিকার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা এই চিরলাঞ্ছিত উপেক্ষিত জাতির দাবী যদি অগ্রাহ্য করেন তবে তাঁহাদের জীবনে সামঞ্জস্য থাকে কোথায়? জাতিভেদ, বর্ণভেদ এদেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ; এই জাতিভেদ দূর করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতি সমূহকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হইবে। "সমাজ-সংস্কার-সমিতি" আপাততঃ জাতিভেদ সম্পূর্ণ রূপে দূর করিতে সাহস করিবেন না। কিন্তু একই জাতির যে বিভিন্ন শাখা আছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন, বিলাত প্রত্যাগত লোকদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য করিতে পারেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করাও সমাজ-সংস্কার-সমিতির কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতি।

কেরল প্রাদেশিক কনফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীরূপে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন (৭ই মে, ১৯২৩)

"দক্ষিণ ভারতের নিষ্ঠুর এবং ভীষণ সমস্যা—অস্পৃশ্যতার বিষয় আজ আপনাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আপনারা আপনাদের অন্ত্যজ

ভাইদের এক সঙ্গে বসিতে দিয়া নিজেরাই সেই সমস্যার সমাধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ যদি মহাত্মাজী দেখিতে পাইতেন যে, একই গৃহতলে নম্বুদ্রি, নায়ার ও নায়াদী একত্রে উপবেশন করিয়াছি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, একা মালাবারই ভারতের স্বরাজ আনয়ন করিবে। অস্পৃশ্যতার উপর তিনি কিরূপ জোর দিয়াছেন আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রধান প্রশ্ন—লক্ষ্মী কেমন আছে? আজ তাঁহারই শিক্ষার গুণে গর্ব্বিত নম্বুদ্রি ও বিনীত নায়াদী একত্রে উপবেশন করিয়াছে। মালাবারের শোচনীয় ব্যাপারের কথা মনে পড়িলে আমার চোখ ফাটিয়া জল আসে; তবুও এই সম্বন্ধে আমি একটী কথা বলিতে চাই। কতিপয় মুসলমানের দুষ্কার্য্যের জন্য এখানকার হিন্দু সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদিগের এই কার্য্যে ভারতের উক্ত সমাজের সমস্ত ধর্ম্ম গুরুরাই প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর হিন্দুরাও এই বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না বলিয়া মুসলমান ভ্রাতারাও ক্ষুব্ধ হইয়াছে।"

হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

পাঞ্জাবে বা যুক্ত প্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতুটাতু খায় কিন্তু হিন্দুই পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই অরগেনাইজিং স্পিরিট কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্ম্মই তাকে অরগেনাইজ করে। মুসলমানের ধর্ম্ম সাম্যবাদ-মূলক। মুসলমানে মুসলমানে যে যে সহানুভূতি তার সেংকশন বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্ম্মে। হিন্দুর ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলে বুঝি তা অরগেনেইজেসন এর পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্ত প্রদেশের এক

গল্প বলছিলেন। আফ্রিদীরা প্রায়ই সীমান্তের ব্রিটিশ প্রজাদের উপর চড়াও কো'রে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েচে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে ছিল। তিনি দেখলেন যে হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'ল না, তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, একি রকম? আপনারা যে টু শব্দটি করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "উয়োঃত বেনিয়াকা লেড়কী!"

কবি বল্লেন এই ত হিন্দুর মন, মুসলমান কিন্তু কখনও এ রকম জবাব দেবে না।

অস্পৃশ্যতা দোষ

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা শুধু দৈহিক নয়, তার চেয়ে প্রবল হচ্ছে নৈতিক অস্পৃশ্যতা। বাংলাদেশে দৈহিক অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ নেই কিন্তু নৈতিক অস্পৃশ্যতা খুবই আছে। যাতে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সব বর্ণের মধ্যেই আছে। * * *

হিন্দুদের দুর্ব্বলতার কারণ মূলগত। হিন্দুসমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্মগত ভেদ করে রেখেছে যার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না। জগতে কোন জাত উন্নতি কর্ত্তে পারে নি যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নিজেদের ধর্ম্মগত বা অভ্যাস-গত আচার ব্যবহার না পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পেরেছে। কবে মনু-সংহিতায় সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে গিয়াছে আর যতই অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক না কেন তাই আকড়ে ধরে বসে থাকতে হ'বে, এ বিশ্বাস না বদলালে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য সব জাতেরই কতকগুলি সংস্কার আছে এবং সংস্কার-গত আচার ব্যবহার আছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখানো যায় না। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংস্কার ও আচার ব্যবহার উন্নতির

পরিপন্থী তা ত্যাগ করতে পেরেছে। জগতে আমরা অর্থাৎ কেবল হিন্দুরাই তা ত্যাগ কর্ত্তে পারি নি। তাই আমরা মানুষে মানুষে জন্মগত বা অনৈসর্গিক প্রভেদ, যা হয়ত কোনো কালে, কোনোও উপযুক্ত কারণে বা নিষ্কারণে করা হয়েছিল, তা এখনও বজায় রাখতে চাই। বাস্তবিক ভগবান মানুষে মানুষে এমন কোন ভেদ করে দেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ তার ব্যতিক্রম কোরে কখনও সত্যিকার মিলন গড়ে উঠতে পারে না।

হিন্দু মহাসভা

কবি বলেন যে "হিন্দু-মহাসভা" যদি হিন্দু-সমাজের কীটস্বরূপ, দৈহিক নৈতিক অস্পৃশ্যতা দূর কর্ত্তে পার্ত্তেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও, কাজের মত এক কাজ হোতো।

ঘরের গলদ দূর কর্ত্তে পাল্লে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (ফিসিকেল ও মর‍্যাল) দোষ আছে তা নিরাকরণ কর্ত্তে পাল্লে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শরীর আর শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা কল্লে কিছু হবে না। মুসলমানও হিন্দুদের দেখাদেখি গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা ক'রতে পারে। এ রকম চেষ্টাও বিপরীত চেষ্টা, কেবল পাপের পথে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি ?" কবি আবার বল্লেন যে "শারীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জ্জন করা দরকার সেত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দ্দেশ করে তাই উৎপাটন করার চেষ্টা হচ্ছে গোড়ার কথা।" হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসল-মানরা সন্দেহের চক্ষে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না ?" —এ প্রশ্নের জবাবে কবি বল্লেন—"হাঁ, তা হবে বৈ কি ? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায়

আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনো করচে—আমরা তো কখনও বাধা দিতে দাঁড়াই নাই। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?"

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বল্লেন—তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?

"কিন্তু—কবি তারপর বল্লেন—হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।

কবি তারপর বল্লেন আমি আমার জমিদারীতে দেখেছি হিন্দু প্রজা কোন-রূপ সংস্কারই বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ হচ্ছে।

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বল্লেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার আরো কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় ২ ঘণ্টা আলাপ করবার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বল্লেন আর বল্লেন যে দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার। শ্রীমৃণালকান্তি বসু (বিজলী)

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতি 'উচ্চ-

জাতি' বলিয়া গণ্য। এই 'উঁচু জাতের' লোকেরা নিজেদের কৃত্রিম সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরাও যে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, এমন কি অনেক স্থলে মেরুদণ্ড স্বরূপ, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই। আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফলে এই তিন জাতির হাতে নানা কারণে বহু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই উচু জাতের লোকেরা সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্মৃতিশাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই দিয়া, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কৃত্রিম ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন নাই। সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া যাহাতে তাঁহারা নিজেদের ও হিন্দুসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন, উচ্চজাতির লোকেরা সে পক্ষে কোন উৎসাহ দেন নাই; এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতিকে "অস্পৃশ্য, জলানাচরণীয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া পশুবৎ ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। ফলে হিন্দু-ব্যবসায়ী জাতিরা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে, কৃষক ও শ্রমিক জাতিরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের স্থান মুসলমান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, এমন কি বাঙ্গালার বাহিরের লোক আসিয়া অধিকার করিতেছে।

সমাজের প্রধান বন্ধন সংহতিশক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুসমাজে এখন তাহাই নাই। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে উহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাই বাঙ্গালার তথা ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; আর হিন্দুরা কেবল "ছুঁৎমার্গের" নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে। সমাজের এই নিম্নবর্ণের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারই যে হিন্দুসমাজে বলক্ষয় ও ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ, একথা আজ বুঝিয়াও

কেহ বুঝিতে চাহিতেছে না! অথচ এই তথাকথিত "উচ্চজাতি" হিন্দুসমাজের কতটুকু অংশ? সমগ্র বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা প্রায় ২০৮ লক্ষ। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৩ লক্ষ, কায়স্থ ১২ লক্ষ, এবং বৈদ্য ১ লক্ষ—মোট ২৬ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ এই তিন জাতি একত্রে হিন্দু-সমাজের মাত্র শতকরা ১২॥০ ভাগ। বাকী শতকরা ৮৭॥০ ভাগ তথাকথিত "নিম্নবর্ণের" লোক। যে সমাজের মুষ্টিমেয় শতকরা ১২॥০ ভাগ লোক, কতকগুলি কৃত্রিম দেশাচার ও প্রথার বলে সমাজের অপর ৮৭॥০ ভাগ লোককে দাবাইয়া রাখিতে পারে, সে সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধেকের বেশী, এবারকার সেন্সাসে Depressed classes অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতি বা অবনত জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই সমস্ত জাতিদের মোট সংখ্যা ১ কোটী ১২ লক্ষেরও উপর। কোন্ কোন্ জাতি "অবনত" বা অস্পৃশ্য" বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিতেছি!—বাওরী, বাগ্দী, ভুঁইমালী, ভূইয়া, ভূমিজ, চামার ও মুচি, চাষী কৈবর্ত্ত, ডোম, গারে, হদি, হাজঙ্, হাড়ি, জেলে কৈবর্ত্ত, কলু, কেওড়া, কায়রা, কান্তা, খণ্ডায়েত, খেন, কোচ, কৈরী, কোড়া, কুর্ম্মি, লোহার, মাল, মালো, মেচ, মুণ্ডা, নমঃশূদ্র, নুলিয়া, ওরাও, পাটনী, পোদ, পুণ্ডরী, রাজবংশী রাজু, সাওতাল, শুকালী, তিয়ার। ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং চাষী কৈবর্ত্তদের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ।

হিন্দু সমাজের অর্দ্ধাংশেরও বেশী এই বিরাট অবনত বা অস্পৃশ্যজাতি, সমাজপতিদের কাছে কি ব্যবহার পাইতেছে? দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে কি ইহারা নিমগ্ন হইয়া নাই? ছুৎমার্গাবলম্বী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের ফলে, ইহারা কি দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছে না? মিশনরীরা স্থানে স্থানে মিশন খুলিয়া তাহাদের মধ্যে যেরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার ও সেবাকার্য্য করিতেছেন, হিন্দুরা সেরূপ কিছু করিয়াছেন কি?

বাঙ্গালার যেখানে অনুন্নত জাতিরা একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই খানেই 'উচ্চজাতিরা' মিলিয়া তাহাদের বাধা দিতেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে, হদি জাতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদারেরা যেরূপ বৈরভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমস্ত হিন্দু—মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা দেখায়, স্বধর্ম্মীদের প্রতি তাহাও দেখাইতে চায় না। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, ঢাকার স্কুল কলেজের হোষ্টেলে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রেরা মুসলমানদের সহিত এক ঘরে থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্রদের সঙ্গে এক ঘরে থাকিতে গেলেই তাহাদের জাতি যায়। আরও দুঃখের কথা এই যে' 'উচ্চজাতিদের' কুদৃষ্টান্তের প্রভাব সমাজের সর্ব্ব-স্তরে সংক্রামিত হইতেছে। প্রত্যেক "জাতিই", তার চেয়ে ঈষৎ 'অনুন্নত' অন্য জাতিকে দাবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। নিজেরা যে অধিকার চায়, অন্যকে তাহা দিতে রাজী নয়। সেন্সাসের রিপোর্টে লিখিত আছে—লোক গণনার সময় প্রত্যেক জাতিই নিজেদের বড় করিতে এবং অন্যকে "হীন ও ছোট" বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। চাষী-কৈবর্ত্তেরা নিজেরা মাহিষ্য হইবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু জেলে, কৈবর্ত্ত পাটনী প্রভৃতিকে ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে কিছুতেই দিবে না। আনন্দবাজার ১৬।৮।৩০

মধ্যযুগে যখন ভারতবর্ষ বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্ম প্রবল বহিঃশক্তির সংঘর্ষে টলমল করিতেছিল, তখন হিন্দুর সমাজপতি ও ধর্ম্মাচার্য্যেরা এক নূতন অস্ত্র অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অস্ত্রের নাম'কমঠব্রত'। কূর্ম্ম যেমন আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে সংহৃত করিয়া, বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, মধ্যযুগের বিশাল হিন্দুসমাজও তেমনি নিবৃত্তির মার্গ অবলম্বন করিয়া আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাকে রক্ষণশীলতা বলিতে হয় বল বা গোঁড়ামী

বলিতে হয় বল। মধ্যযুগের ধর্ম্মাচার্য্য ও স্মৃতিকারেরা এইরূপে শক্তিসংহরণ করিয়াই জীবনসংগ্রামে বাঁচিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এ নীতি হয়ত সময়োপযোগী হইয়াছিল, কেননা, বহিঃশত্রু যখন প্রবল পরাক্রান্ত, তখন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লওয়াও রণনীতির একটা অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

কিন্তু এই কমঠব্রতের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা ধ্বংসকর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। "ছুঁৎমার্গ" তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা সমাজ-দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্য ও জলাচরণীয় বলিয়া প্রায় এক চতুর্থাংশ লোককে আমরা নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে মানুষের সম্মান ও মর্য্যাদা পায় না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য উচ্চবর্ণের লোকেরা কোন চিন্তাই করে না। তাহারা দুঃখ-দৈন্য পীড়িত, অ-শিক্ষা কু-শিক্ষা নিমগ্ন যুগব্যাপী কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হিন্দুসমাজের সকল শুভ চেষ্টা ও আন্দোলনে তাহারা পাষাণ-ভারের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এমন অস্বাভাবিক সমাজ-বিন্যাস কি কখন টিকিতে পারে? হিন্দুর সমাজে তাই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তথাকথিত "অস্পৃশ্য ও জলাচরণীয়েরা" দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মানুষের মর্য্যাদা লাভের চেষ্টা করিতেছে। খৃষ্টান মিশনরী প্রভৃতির প্রতি বিরূপ হইলে তো চলিবে না। তাঁহারা হিন্দুসমাজের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই আপনাদের প্রচারকার্য্য করিতেছেন। আনন্দবাজার ৪।৫।৩০

অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমান একতা সম্বন্ধে উক্ত প্রতিনিধির নিকট তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উহার সার মর্ম্ম প্রদান করা গেল।

স্বামীজী বলিলেন,—তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি হিন্দুদিগের

মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য নিয়োগ করিবেন। অস্পৃশ্যতা রূপ দোষ হিন্দুদিগের নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছ। সমগ্র ভারত তাঁহাদের এই পাপের ফল ভোগ করিতেছে। যখনই আমাদের কোনও নেতা স্বরাজ্যের কথা উত্থাপন করেন, এই অস্পৃশ্যতার কথা বলিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করা হয়। যাহারা নিজেদের স্বজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা বিদেশীর অধীনতার অভিযোগ করিতে পারে না। তাঁহার মতে যে পর্য্যন্ত ভারতের ৭ কোটি নরনারী নিজেদের স্বজাতীয়ের পদতলে নিপীড়িত হইবে সে পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসভার গঠনমূলকই হউক আর ধ্বংসমূলকই হউক, কোনওপ্রকার কার্য্যপদ্ধতিই সফল হইবে না।

অস্পৃশ্য জাতিরা কে ?

প্রশ্ন উঠে—এই অস্পৃশ্য জাতিরা কে ? জুলুল্যাণ্ড হইতে তাহারা ভারতে আসে নাই অথবা নরকের মধ্য হইতেও তাহাদের উদ্ভব হয় নাই ; আর স্বর্গ হইতেও যে তাহারা পতিত হয় নাই, ইহাও ঠিক ; কেন না তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাই উহার পরিচয় দেয়। নিরপেক্ষভাবে একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই অস্পৃশ্যদের সকল সম্প্রদায় এমন কি বেদীয়া, ভাঙ্গিয়া পর্য্যন্ত তথাকথিত উচ্চ ত্রিবর্ণের মত একই গোত্র হইতেই উদ্ভূত। খুব সম্ভব নৈতিক চরিত্রহীনতাই ইহাদের সামাজিক অবনতির কারণ। তাহারা যদি তাহাদের বর্ত্তমান জীবনধারা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্ব সামাজিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোন অন্তরায় আসিতে পারে না। সেই সোজা সত্যটা হিন্দুসমাজ এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিত মহাপ্রভু চৈতন্য, কবির, নানক, সাধু গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই পাপ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাই একরকম বিফলে গিয়াছে। অতঃপর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সর্ব্বমানবের ক্ষমতা প্রচার করেন। তাঁহার বার্ত্তা শ্রবণে সমগ্র আর্য্যসমাজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি

জাগরিত হয় যে সময় উক্ত মহাপুরুষেরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে হিন্দুরা খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া পড়িতেছিলেন।

অস্পৃশ্য জাতিকে উন্নয়ন অতীব গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন ২৫০ জন প্রচারক সংগ্রহ করা। যে সমস্ত স্থানে অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা বেশী সেই সব স্থানে ইহাদিগকে প্রেরণ করা হইবে। ইঁহারা একদিকে সেই সব জাতিকে শরীর ও মনে পবিত্র হইতে শিক্ষা দিবেন, অপর দিকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যাহাতে ইহাদিগকে সামাজিক সমানাধিকার প্রদান করে তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন। এই সব অস্পৃশ্য জাতির লোককে কাজ দেওয়ার জন্য এবং ইহাদের সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কতকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় খুলিতে হইবে।

এই কার্য্যের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনতিবিলম্বে আড়াই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অবশিষ্ট অর্থ দিয়া একটী স্থায়ী ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে হইবে। হিন্দুসংগঠনের বিরুদ্ধ সরস বাদীরা ৮ কোটী লোকের জন্য ৮ কোটী টাকাই ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মরক্ষার্থ মাত্র এক কোটীর চতুর্থাংশ প্রার্থনা করিতেছেন।

মহাত্মাজী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুণা সেস্থন হাঁসপাতালে গমন করেন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে স্বামিজী ১৫ মিনিট কাল আলাপ করেন।

সেই অপরাহ্নে স্বামিজী এক সাধারণ সভায় শুদ্ধি ও সংগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি কংগ্রেস নেতাগণের সর্ব্বপ্রকার যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহারা যেন একতাবদ্ধ হইয়া অন্ত্যজ জাতিকে তাহাদের মধ্যে তুলিয়া লয়। সভায় প্রায় ৫০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল।

বোম্বাইয়ে সভা

২৬শে তারিখে বোম্বাই পৌঁছিয়া তিনি এক বিরাট জনসভায় যোগ দান করেন। তিনি মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতির অভিভাষণ হইতে দেখাইয়া দেন, যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্য সম্প্রদায়গুলিকে যদি জাতে তুলিয়া না লয়, তাহা হইলে মুসলমান ও খৃষ্টানরা তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিবে। অস্পৃশ্য জাতিদিগকে বিদ্যালয়, কূপ ও মন্দিরে সমান অধিকার দেওয়া হয়, সে জন্য তিনি হিন্দুদিগকে বিশেষ অনুরাধ করেন।

ছুঁৎমার্গ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী—

নির্ভীক সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাম বাঙ্গালায় অপরিচিত নহে। সত্যাগ্রহ অন্দোলনের সময় হইতে ইনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। আমলাতন্ত্র এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেশ সেবার জন্য পুরষ্কার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। গত ৪ বৎসর কাল অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুসমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৭ কোটী মানব—উচ্চবর্ণের জাতিসকলের নিকট অস্পৃশ্য। এই শোচনীয় বৈষম্য বিদূরিত না হইলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব —শ্রদ্ধানন্দজীর এই কথা অর্থের খাতিরে অনেকেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি দৈনন্দিন জীবনে ঐ সাত কোটি মানুষকে মানুষের মত ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী। পণ্ডিত মালব্যজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতির উদ্যম, অনেকাংশে সফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার হিন্দুর-সমাজ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সামাজিক কুপ্রথাগুলি পরিহার কল্পে এক তীব্র আন্দোলন জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন, এমন শক্তিমান তো বর্ত্তমানে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। অথচ ভেদ দ্বন্দ্বে, হিন্দু সমাজ রসাতল যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু

ছত্রভঙ্গ হইয়া মরিবে—না—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাঁচিবে,—বাঙ্গালী প্রধানেরা অগ্রসর হইয়া এই সমস্যার মীমাংসায় আর কত কালক্ষেপ করিবেন ?

"হিন্দুসমাজে শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের লোক আছে। কিন্তু মান্দ্রাজের ব্রাহ্মণগণ বহু কাল হইতে সে প্রদেশে 'পঞ্চম' নামক আর এক বর্ণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। অনেকেই জানেন সামাজিক অত্যাচারে মান্দ্রাজ আছেন ভারতে শীর্ষস্থানীয়। সেখানকার ন্যায়নিষ্ঠ (?) ব্রাহ্মণগণ তথা কথিত সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোক দিগকে চতুর্ব্বর্ণের শূদ্র আখ্যা দিতে না পারিয়া 'পঞ্চম' বর্ণের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই 'পঞ্চম' বর্ণের লোক দূর হইতে ও কোন ব্রাহ্মণের অগ্নিপক্ক খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা অপবিত্র হইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত গান্ধি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ভ্রমণ কালে 'পঞ্চম'দের নিকট এক অভিনন্দন পত্র পাইয়া বলেন :—

সৌভাগ্য বশতঃ পঞ্চমভ্রাতাদের নিকট আমি এক অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি। আমি শুনিলাম পঞ্চমেরা অপর শ্রেণীর ব্যবহৃত জলাশয়াদি হইতে পানীয় জল লইতে পারে না, তাহারা জমাজমি ক্রয় করিতে অথবা উহার মালিক হইতে পারে না। সরকারী আদালতে উপস্থিত হওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত—সেখানে যাইতে তারা সংস্কুচিত হয়, ভয় পায়, তাদের এই সঙ্কোচ ও ভয়ের জন্য দায়ী কে ? এজন্য তথা কথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেই দায়ী। আমরা কি এই অবস্থা চিরস্থায়ী করিব ? হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি কাহাকেও 'অস্পৃশ্য' করিয়া রাখা ধর্ম্ম-বিগর্হিত। যদি কেহ আমাকে বুঝাইতে আসেন ইহা হিন্দুধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, তবে আমি নিজেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিব। ব্রাহ্মণগণ যদি পারিয়াদের সহিত মিশেন, তবে অপর হিন্দুরা তাদের অনুসরণ করিবে।"

আর এক স্থলে মহাত্মা গান্ধি বলিতেছেন :—

"এত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তার সত্ত্বেও দেশের 'স্পর্শদোষ' লোপ পাইতেছে না কেন? শিক্ষার প্রভাবে আমরা বুঝিয়াছি যে 'শুচি ব্যাধি' ভয়ানক সামাজিক পাপ। কিন্তু আমরা ভয়ে জড়সড় বলিয়া পরিবার মধ্যে এই মত প্রচার করিতে পারি না। প্রাচীন রীতি নীতি, ও পরিবারের লোকের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ আছে। আপনারা হয়ত বলিবেন, পিতামাতা অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবাদ সন্তানে কিরূপে করিবে?' প্রহ্লাদের কথা মনে করুন। পিতা হরির নাম করিতে নিষেধ করিলেও, প্রহ্লাদ এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পিতৃদেবের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া হরিধ্বনি দ্বারা রাজপুরী মুখরিত করিয়াছিলেন। আমরাও এইরূপে পূজনীয় পিতা-মাতার পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব, পুত্রের মুখের প্রতিবাদ শুনিয়া যদি কোন পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাতে দুর্দৈব মনে করিব না। আমরা মান্ধাতার আমল হইতে অনেক সামাজিক পাপের আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মনিগ্রহ—আত্মবলিদান চাই। সকলকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।"

নাপিত ও চিকিৎসকের ব্যবসা আমার নিকট সমান গৌরবজনক মনে হয়। পৃথিবীর কোন মানুষ হীন অথবা অস্পৃশ্য হইতে পারে না ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে তার পর পরিবার ও সমাজের মধ্যে এই ভাবকে প্রচার করিতে হইবে।"

উদ্ধৃত কথার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ (?) বর্ণের লোকদের প্রতি আমার নিবেদন তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুষ্ঠিত পাপের জন্য সমাজে যে বৈষম্য দেখা দিয়াছে, সামাজিক অত্যাচারের ফলে কোটী কোটি অমৃত সন্তানের যে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, অবিলম্বে তাঁদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করা উচিত।

একটা কথা আছে অবস্থা বিশেষে হিংসুক সর্পই সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ উঠাইয়া লয়—আশা করা যায় দেশের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সেইরূপে সমাজ শরীরের বিষ উঠাইয়া লইবেন। শ্রীবিনয়কৃষ্ণসেন বি, এ প্রতিজ্ঞা ১৪।২।১৩২৬

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি অন্য এক স্থানে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছেন ঃ—

অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দুরপনেয় কলঙ্ক। আমি বিশ্বাস করি না যে ইহা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। আমার বোধ হয় যখন হিন্দুধর্ম্ম অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল, তখন এই সর্ব্বনাশ-কারী, মনুষ্যত্ব-হারী, কৃত দাস-কারী স্পর্শদোষ রূপ ব্যাধি সমাজ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত উহা রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে আমি ভগবানের অভিশাপ মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন সকলের মনে রাখিতে হইবে এই পবিত্র ভারত ভূমিতে আমরা যত প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করি না কেন, তাহা এই অমোচনীয় মহা পাপের ফল—যাহা আমরা প্রত্যহ ভোগ করিতেছি। যে কোন বিশেষ ব্যবসা করে বলিয়া, কাজ করে বলিয়া কাহাকেও যে অস্পৃশ্য মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি এই স্পর্শ দোষের হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারেন, তবে তাঁহারা শিক্ষা না পাইলেই ভাল হইত। লোক মান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কতকগুলি মানুষকে পশুর মত করিয়া রাখা কখনও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রেত নয় এবং এই আন্দোলনে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

গত ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বরোদাতে বরোদার গাইকোয়াড়ের সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় অস্পৃশ্যোদ্ধার সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাতে লোকামান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠি ভাষাতে একটী বক্তৃতা দান করেন।

তাঁহার জনৈক বন্ধু এই বক্তৃতাটী নোট করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি বেনারসের "আজ" পত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিষয়ে লোকমান্য তিলকের মতামত কি ছিল তৎসম্বন্ধে পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদান করিলাম। লোকমান্য বলেন "অস্পৃশ্যতা সমস্যা রাজনীতি ও সমাজ এই উভয় দিক হইতেই বিশেষ আলোচ্য। শীঘ্রই উভয় ক্ষেত্র হইতে উহার দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। একজন মানুষ অন্যের কাছে অস্পৃশ্য হইতে পারে উহার তাৎপর্য্য কি আমি তাহা বুঝিতে পারি না। কোনও শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোন বিধান নাই। অন্য ধর্ম্মী এবং অন্য দেশবাসীর সঙ্গে আমরা অস্পৃশ্যদের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করি। অথচ দেশবাসীকে দূরে সরাইয়া রাখি। এই দোষ সমাজ হইতে দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। পেশোয়াদের সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভিতর এই দোষ ছিল না। বর্ত্তমানে উহার এত বাড়াবাড়ি জাতীয় অধঃপতনের চিহ্ন। যুদ্ধে অথবা জাতীয় উৎসবে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নাই। আমাদিগকে উহাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতে হইবে এবং মন হইতে ভেদ সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে। অন্ত্যজকে ছুঁইলে পাপ হয় এই কুবুদ্ধি আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চ নীচ এই ভাব আমাদের যতদিন দূর না হয় ততদিন আমাদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

অনেকে আমাকে বলেন যে, আমি কেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মন দিতেছি না। তাঁহাদের প্রতি আমার এই উত্তর যে সবদিকে দৃষ্টি রাখিতে আমি অসমর্থ। তবে এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি এই বলিতে পারি যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গণপতি উৎসবে একজন চর্ম্মকারকে অনেকে যোগদান করিতে বাধা দিয়াছিলেন। আমি উহা অবগত হইয়া তাহাকে আহ্বান করি এবং আমরা বাড়ীতে তাহার মূর্ত্তি রাখিতে বলি। আনন্দের বিষয় যে এই জন্য কেহ আমাকে পতিত করিতে

চেষ্টা করেন নাই। তেলীগাও যে এক কাচের কারখানা আছে উহাতে আমি সব বর্ণের লোক নিযুক্ত করিয়াছি। যখন একজন শ্বেতাঙ্গ আমাদের কাছে আসে তখন আমরা কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করি না যে সে স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি চাই তবে সকলকে মিলিয়া মিশিয়াই কাজ করিতেই হইবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্য্যে উহাদিগের সাহায্য লইতে হইবে—উহা দিগকে অবজ্ঞা করিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে।

আমি স্বয়ং কখনও এই প্রকার ভেদবুদ্ধি মানি না। আমার বাড়ীতে অন্ত্যজ জাতির প্রবেশাধিকার আছে, অনেক সময়ে আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলি এবং আমি যে বিছানায় বসি তাহাতে উহাদিগকে বসিতে দেই।

আজ সমাজের ভিতর অস্পৃশ্যতা দারুণ ব্যাধিরূপে বর্ত্তমান আছে। এই রোগ দূর করাতেই আমাদের ধর্ম্ম লাভ হইবে। আমি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। আমার আশা হয় যে শীঘ্রই সমাজ হইতে এই ব্যাধি দূর হইবে।”

রাজনীতি ও সমাজনীতি।

আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে—পরাধীন জাতি আমরা রাজনীতির চর্চ্চা করি, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার প্রার্থনা করি, তাহার জন্য অন্তরতম ইচ্ছার সহিত সাধনা করি। কিন্তু আমাদের সমাজে—ভারতবর্ষীয় সমাজে সাম্য কোথায়, স্বাধীনতা কোথায়, মৈত্রী কোথায়? হিন্দুসমাজ জাতিভেদের কঠোর নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত, শূদ্র স্বার্থপর ব্রাহ্মণের চর্ম্ম-চটিকার তলদেশে ধূলিমলিন অবস্থায় পতিত; অতএব সাম্য কোথায়, স্বাধীনতা কোথায়? ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দাস জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা দূরে থাকুক্ তাহাকে স্পর্শ করিলে নিজেকে অপবিত্র ও স্নানার্হ মনে করে, অজ্ঞ ও অন্ধস্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া মানুষকে অবমাননা করিয়া নিজেরই

মনুষ্যত্বের অবমাননা করে। অতএব সাম্য কোথায়? স্বাধীনতা কোথায়? মৈত্রী কোথায়? রাজনীতিতে আমরা, ভারতবর্ষের কৃষ্ণচর্ম্মা শূদ্র আমরা, ইউরোপের শ্বেত ব্রাহ্মণের সমান স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিতেছি, তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা অবজ্ঞা করে এজন্য তুমুল প্রতিবাদ করিতেছি, সাম্য এবং মৈত্রীর কামনা করিতেছি কিন্তু আমাদের ভিতরকার অবস্থা দেখিতেছি কি? কৃষ্ণচর্ম্মা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচর্ম্মা শূদ্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, তাহার প্রতিকারে আমরা যত্নবান হইয়াছি কি? অতএব আমাদের সাধনায় আন্তরিকতা, কামনায় সত্যের প্রভাব আকাঙ্ক্ষায় প্রাণের ছাপ কোথায়? এক শ্রেণীর লোকে, অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায়, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার শত্রু, জাতিও শ্রেণীভেদের সমর্থক স্বার্থান্ধেরা বলিয়া থাকেন রাজনীতি ক্ষেত্রের সাম্য ও স্বাধীনতার সহিত সমাজের সাম্যের সম্বন্ধ কি? জাতি ও শ্রেণী ভেদ অটুট অবস্থায় রাখিতে আপত্তি কি? অর্থাৎ ইঁহারা বলিয়া থাকেন রাষ্ট্রীয় সাম্যের সহিত সামাজিক সাম্যের সম্বন্ধ নাই। এ দুইটি জীবন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাই? তুমি ব্রাহ্মণ, শূদ্রের প্রভু ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ঘৃণা ও অবজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ, তুমি কেমন করিয়া একই প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালনা করিবে? রাজনীতিক সভায় কেমন করিয়া তুমি শূদ্রের সহিত একাসনে বসিবে? কেমন করিয়া তোমার মতে যে নীচ এবং অস্পৃশ্য তাহার সহিত—প্রভু ও দাসরূপে নহে—বন্ধু ও সখারূপে তর্ক ও প্রালোচনা করিবে? গর্ব্বিত তুমি, দর্প ও দম্ভে স্ফীত তুমি, মানুষের অধিকার হরণকারী দস্যু তুমি, কেমন করিয়া তাহা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়? বাটীতে বসিয়া যাঁহাদিগকে তুমি কুক্কুর বা তদপেক্ষাও অধম মনে করিবে, রাজসভায় গিয়া কিরূপে তুমি তাঁহার সহিত সমান অধিকার বিশিষ্ট সখা ও সহচররূপে ব্যবহার করিবে? ফলতঃ সমাজনীতির সঙ্কীর্ণতা ও মিথ্যাভাব অটুট রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার

ভাব জাগরিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করার ন্যায় ভণ্ডামী আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত। সমাজের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত অধিকার যাহা দস্যু দানবের কুক্ষিগত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে পুনরায় যেনতেন প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে আবার মনুষ্যত্বের আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে দেশের লোককে শিখাইতে হইবে। তবেই রাজনৈতিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, তবেই দেশ প্রেমিকের স্বপ্ন সত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। (মোহাম্মদী।)

এদেশের কোটি কোটি লোক নিরক্ষর। মানুষ শিক্ষার অভাবে—মানাপমানবোধ হইতে বঞ্চিত হইয়া পশু পক্ষীর মত জীবন যাপন করিতেছে লেখা পড়া জানিলে নিম্ন শ্রেণীর লোক সামাজিক সাম্য সম্বন্ধে নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইবে। একথা সত্য; এবং ইহাতে উপকার বই অনিষ্ট হইবে না। তোমরা উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন লোক কোটি কোটি মানব সন্তানকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছ, তাহাদিগকে শিক্ষা ও সভ্যতায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে দেও নাই; আজ তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, আজ তাহারা উন্নত হইতে চাইতেছে, শিক্ষা পাইলে তোমাদের অন্যায্য দাবী তাহারা সহ্য করিবে না। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইবেই হইবে। অশিক্ষিত দুর্নীতি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজের নিম্নস্তরে যাইবেন; আর "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ" এই বাক্যের স্বার্থকতা হইবেই। নিরক্ষর ২৮॥ কোটি লোক জাগিয়া উঠিবে; সমাজের পুনর্গঠন হইবে; যোগ্য যে, সে উচ্চ স্থান পাইবে; জোর করিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা রোধ

করা যাইবেনা। রোধ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অন্যায়। তোমরা কংগ্রেসে কন্‌ফারেন্‌সে ইংরেজের সমান অধিকার দাবী করিতেছ, তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ তুলিয়া দিতে চাহিতেছ, আর তোমাদের অনুন্নত ভ্রাতাদিগকে মস্তক তুলিতে দিতেছনা, এ কি লজ্জার কথা। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "সমাজ সংস্কার ও জাতীয় সাধনা" (সঞ্জীবনী।)

কেবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ও তদিতর উচ্চ সমাজ বলিয়া নহে। আমাদিগের চারিদিকে যে সকল ডিপ্রেস্‌ড্‌ক্লাস—নিগৃহীত সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইতে হইবে—নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তাহাদিগের জাতীয় ও সামাজিক উন্নতির সহায় হইতে হইবে। কাহাকেও এখন নীচ বা হীনভাবে দেখিবার সময় নয়, এখন ভারতের উচ্চ নীচ সকল জাতির হৃদয়ে জাতীয় উন্নতির জন্য জ্বালাময়ী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, শান্তিপ্রিয় ন্যায়পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সকলেই এখন স্ব স্ব সামাজিক অবস্থা ভাবিবার ও উন্নত করিবার শুভ অবসর পাইয়াছে। এখন তাঁহাদের অনুকূল স্রোতের গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যিনি সেই কালস্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহার যে সেই উদ্যম বৃথা ও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ কারণ আমি মনে করি, সমস্তটা না হউক, যাহাতে তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম কতকটা সিদ্ধ হয়, তৎপ্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজার ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ। আনন্দ বাজারও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১৭।১।১৩২১

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—
"এত নিষ্ঠুর জবর দস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া ছোঁওয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকান হয় এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে,

তারা রাষ্ট্র ব্যাপারে অবধি অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন ?”

রবীন্দ্রনাথ, সে দিন “ধর্ম্মের অধিকার” নামক প্রবন্ধে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের তীব্র ঝঙ্কারের সহিত বলিয়াছেন—“তুমি লোক সমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন, তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্ম্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্ম্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া শত শত বৎসর ধরিয়া এত বড় একটি সমগ্র জাতিকে, তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া, তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই! যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কি প্রকাণ্ড, কি অসঙ্গত, কি অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ঙ্কর বোঝা মানুষের মাথার উপরে শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্ন-মেরুদণ্ড নিষ্পেষিত-পৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই, কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আস্ফালনে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছ, চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জ্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেন না তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেন না তুমি অক্ষম, সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সহিত তোমাকে আপাদ মস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি কেন না নূতন করিয়া নিজের কল্যাণ চিন্তা করিবার শক্তি মাত্র তোমার নাই! নিষেধ-জর্জ্জরিত চির-কাপুরুষ নির্ম্মাণ করিবার এত বড় সর্ব্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহ যন্ত্র ইতিহাসে আর কোথায়ও কি কেহ সৃষ্টি

করিয়াছে এবং মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোন দেশে ধর্ম্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে ?"

রবীন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় গাহিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান ;
বিধাতার রুদ্র রোষে,
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে,
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান,—"

সেই ;—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে ;
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে,
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে,
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

অথবা—

"তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিয়ে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব বিসর্জ্জন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে,
ধুলায় সে যায় ব'য়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান।"

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে !
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ॥
অজ্ঞানের অন্ধকারে ;
আড়ালে ঢাকিছ যারে ;
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ॥"
"শতেক শতাব্দি ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি,
দেখিবারে পাও নাকি,
নেমেছে ধূলার তলে নীচ পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান।
দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
চৌদিকে জড়ায়ে রেখে আপনার অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥"
রবীন্দ্রনাথ যৌবনে গাহিয়াছিলেন—
"ওই যে দাঁড়ায়ে নত-শির,
মূক সবে,—ম্লান-মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার ;—
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,

মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটী অন্ন খুঁটী, কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া, সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘ শ্বাসে
মরে সে নীরবে! এই সব মূঢ় মুক ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্তি শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনই দাড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখন সে
পথ-কুক্কুরের মত সত্রাসে সঙ্কোচে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে কেহ নাহি সহায় তাহার
মুখে করে আস্ফালন জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে!
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষ পট!

এ দেশের কোটি কোটি অজ্ঞজনসাধারণ সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বেদনাবিদ্ধ প্রাণে বলিয়াছেন—

যাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া ঘোর দারিদ্র্য দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা সহিয়াও ভারতের নিজস্ব সাধনা ও সভ্যতাকে জ্ঞানে কি—অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতি শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে জমিদারের খাজনা ন্যায্য ভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই একাধারে বাঙ্গালাদেশের রক্ত-মাংস-প্রাণ তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি—সেই আমরা যে দিনে দিনে যাহা হিন্দু ধর্ম্মের ধর্ম্মস্থান সেখানে যাইয়া আঘাত করিতেছি। এমনি আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না বুঝিয়াও বুঝিব না। বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! ওঠ! ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমান বর্জ্জন কর! ঐ যে বাঙ্গলার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার ও আমার কাজ শেষ করিয়া নিশাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে। উহারা মুসলমান হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী তোমার শুষ্ক প্রাণে বিশ্বাস জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরিকা ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে, কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগো! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল, এস ভাই তুমি মুসলমান হও খৃষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি।"

আর ভারতের যে কোটী কোটী নর-নারায়ণকে নিম্নবর্ণ আখ্যা দিয়া আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে আবার মনুষ্যের মর্য্যাদা দিতে হইবে। ভারতের অপমানিত উপেক্ষিত গণ নারায়ণকে—যদি আমরা তাহাদের জন্মগত অধিকার দিতে সঙ্কুচিত হই, তবে স্বরাজ লাভের কথা বলিবে কোন্ সাহসে? মহাত্মা গান্ধি এই উপেক্ষিত নর-নারায়ণকে ভুলেন নাই, কারামুক্ত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহাদের কথাই মনে হইয়াছে। আনন্দবাজার ১।১১।৩০।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ এণ্ড্রুজ বিহার ছাত্র কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কার্য্য করিবার নিমিত্ত ডানটন গঞ্জে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় বাঁকিপুরে সার্চ্চ্‌লাইট পত্রিকার এক প্রতিনিধির সহিত এইরূপে কথোপকথন হয়। * * *

প্রশ্ন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উত্তর। ভারতবর্ষ অবশ্য স্বাধীন হইবে। উহা ব্যতীত ভারতবর্ষের আত্মসম্মান রক্ষার উপায় নাই। আমি ইংরাজ, ইংরাজ জাতি স্বাধীনতাকে খুব সম্মান করে। আমি যথার্থ খৃষ্টানের মত এই সাধু ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করি যে, আমি যেমন স্বাধীন ভারতীয়েরা তেমনই স্বাধীন হউক।

প্রশ্ন। ইংলণ্ড কি এখন ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন?

উত্তর। ইংলণ্ডকে উহা স্বীকার করিতে হইবে। নিখিল ভারত যদি সম্মিলিত হইয়া এই দাবী জানান যে, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কিছুতে তাহাদের তুষ্টি নাই তাহা হইলেই উহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি অধিকাংশ লোকে স্বাধীনতা দাবী না করে তাহা হইলেই অবস্থা বিপজ্জনক হইবে।

প্রশ্ন। আপনি কোন্ শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছেন?

উত্তর। আমি ভারতবর্ষে ৫ কি ৭ কোটি অস্পৃশ্য অনুন্নতদের কথা

ভাবিতেছি। অপর ভারতীয়েরা এই সকল অস্পৃশ্যকে তাহাদের সমান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। হিন্দু মুসলমান অনৈক্য সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এক্ষণে এই অস্পৃশ্য জাতির সমস্যার যদি আজ সমাধান হয় তবে আগামী কল্যই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। জোহনবর্গে এক ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"মিঃ এণ্ড্রুজ, আমরা শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগকে "অস্পৃশ্য" বলিয়া মনে করি। উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়েরা ভ্রাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন অন্যত্র সেইরূপ ব্যবহারই পাইয়া থাকেন।" সঞ্জীবনী ২৫।৭।২৭।

অধ্যাপক বেদান্তশাস্ত্রী ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় "যশোহর প্রাদেশিক সম্মিলন" হইতে আসিলে তাঁহার ব্রাহ্মণ-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও অস্পৃশ্য জাতির সহিত জলাচরণ বিষয়ক জাতনাশা প্রস্তাব কিরূপে সমর্থন করিলেন। শ্রীযুত বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় উত্তরে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন—যাহা তিনি প্রকাশ্য কন্‌ফারেন্সেই বলিয়াছিলেন।—

১ম।—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল কংগ্রেসকর্ম্মী তাঁহার মতে সন্ন্যাসীর শ্রেণীভুক্ত। সন্ন্যাসীদের যেমন জাত নাই, গোত্র নাই, পিতামাতার পরিচয় নাই,—অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যাঁহারা নিজের দেশ, সকল জাতিকে যাহারা নিজের জাত, সকল গোত্রকে যাঁহারা নিজের গোত্র, বিশ্বের পিতামাতা যাহাদের উপাস্য, যাঁহারা পরব্রহ্ম গোত্র,—তাঁহারাই সন্ন্যাসী। নারায়ণের "পাঞ্চজন্য" ধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া যাঁহারা অনাসক্তভাবে বিশ্বের মুক্তি কামনাকে বুকে লইয়া কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন—তাঁহারা সন্ন্যাসী বৈ আর কি? সুতরাং ইঁহাদের অস্পৃশ্যতারূপ ছোঁয়াচে রোগ থাকিতে পারে না—থাকা উচিত নয়।

২য়—মানুষের প্রাণে যখন খুব বড় রকমের একটা অনুরাগ আসে, বিশেষ একটি ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে, সেখানে ছোটখাট দু একটা খুচরা আচারধর্ম্ম চাপা পড়িলে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। স্বাধীনতারূপ মহান্ ভাবের বন্যায় সত্যই যাঁহাদের প্রাণ ভরপুর, তাঁহাদের কাছে সাধারণ গৃহস্থের ছোটখাট দু'একটা আচার উপেক্ষিত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। হিন্দুসমাজে এহেন প্রেমিকদের জন্য উচ্চ আসন থাকা উচিত—চিরকালই তাই ছিল।

৩য়—যে হিন্দু-সমাজে হাড়ের কয়লা দ্বারা পরিষ্কার করা বিলাতী চিনির মিষ্টান্ন এবং বিলাতী লবণে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা নারায়ণের ভোগ চলিতে পারে, যাঁহারা গরু, শূকর ও অন্যান্য অজ্ঞাত পশুর অস্থি পোড়ান কয়লার দ্বারা পরিষ্কৃত লবণ ও চিনি দিন রাত উদরস্থ করিতেছেন, বাজারের সিদ্ধ চাউল খাইয়া যাঁহারা কৌলীন্য রক্ষা করেন, শাস্ত্রানুসারে পবিত্র বিলাতী বস্ত্র যাঁহাদের অঙ্গের নিত্য ভূষণ—তাঁহাদের কাছে অশুচি বা অস্পৃশ্য কিছু আছে কি? যে কারণে কার্পাসসূতার তৈয়ারী যজ্ঞোপবীত ব্যবহার্য্য, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি ধর্ম্মকার্য্যে পট্টবস্ত্র পরিধানের বিধান, তাহাত, হিন্দু সমাজ ভুলিয়াই রহিয়াছেন।

৪র্থ—ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে—জাতীয় উত্থানের জন্য এমন একদল লোকের দরকার, যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড়—এমন কি একমাত্র ধর্ম্ম হইবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্ম সংস্থাপন। স্ত্রীপুত্রের কান্নাকাটীতে যাঁহাদের চরণ টলিবে না পিতার তর্জ্জনে গর্জ্জনে ও মাতার ক্রন্দনরোলে যাঁহাদের হৃদয় গলিবে না, বিদ্যুতের ছটায়, বৈজ্ঞানিক যান বাহনে, তরবারির ঝনঝনায় ও গোলাগুলীর ঘড় ঘড় শব্দে যাঁহাদের প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিবে না, স্বাধীনতার সংগ্রামই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সকল বিশ্বপ্রেমিক কর্ম্মিগণের ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দু সমাজ আনন্দে ইহাদের বরণ করিয়া লইবেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুত বেদান্ত শাস্ত্রী সাধারণ ভাবে যে একটী কথা বলেন, তাহা এই—একজন নমঃশূদ্র বা অন্য কোন অস্পৃশ্য জাতির লোক যতদিন হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলে, ততদিনই হিন্দুগণ উহাদের অস্পৃশ্য মনে করেন, খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পর হইতে স্পর্শ দোষের বন্ধন হিন্দুরাই শিথিল করিয়া দেন। এইরূপ ছুৎমার্গের কোন মৌলিকতা আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা নাই।

"যাঁহারা যুগ যুগান্তর হইতে সেবার বিনিময়ে ঘৃণা অবজ্ঞা লাথি জুতা খাইয়া নীরবে আপন ব্রত সাধন করিয়া যাইতেছেন। * * * তাঁহারা অস্পৃশ্য হইল। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া আছেন। মানুষ তাঁহাদিগকে না ছুঁইলে সেটা মানুষের অতি বড় আস্পর্দ্ধা ও ভ্রম। গায়কবাড় ঠিকই বলিয়াছেন, যে, Those who seek equity must do equity, যাহারা ন্যায্য ব্যবহার পাইতে চায় তাহাদিগকে ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইবে! সুতরাং আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেরূপ সমান অধিকার চাহিতেছি, সামাজিক ব্যবহারেও তেমনই সমান অধিকার দিতে হইবে। বোম্বাইএর সভায় শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি বলেন—হিন্দু শাস্ত্র অস্পৃশ্যতার সমর্থক নহে। মন্বাদিতে ইহার অনুকূল ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।" (অস্পৃশ্যতা নিবারণের মন্ত্রণা সভা—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৫—৭০ পৃষ্ঠা)

"স্মৃতি পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষ বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ গীতা যথার্থ শাস্ত্র। রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই,—পরের দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই।

অপর এক মহা বিপ্রপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকারী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক,—বাহিরে, ব্যবহারিকে জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈ কি। মনে মনে অভেদ বুদ্ধি—আর বাহিরে পিশাচ নৃত্য—অত্যাচার উৎপীড়ন—গরীবের যম—আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক !!

* * * আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়,—ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি—তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।" (স্বামীবিবেকানন্দ প্রণীত পত্রাবলী ৩য় ভাগ)

স্বামী অভেদানন্দ বলেন—আমাদের ধর্ম্মে কোনরূপ জাতিভেদ থাকিবে না, জাতিভেদ সামাজিক প্রথা মাত্র, ধর্ম্মের সহিত উহার কোনই সংস্রব নাই। বেদও তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। (উদ্বোধন ১।৫।১৩)

এইরূপ ভাবে শত শত শতাব্দীর ঘৃণা অবজ্ঞায় নিম্ন শ্রেণীস্থ ভ্রাতৃবর্গের ইংরাজী শিক্ষিত বর্ত্তমান যুগের আলোপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের প্রাণে যে কিরূপ হিংসা ও ক্রোধের বাড়বানল সঞ্চিত হইতেছে তাহা কি অন্ধ জাত্যভিমানী তথাকথিত উচ্চ জাতিগণ বুঝিতেছেন না? একটু নমুনা মাত্র দেখাইতেছি। "এই যে ভারতের অজ্ঞাত মেরুদণ্ডস্থানীয়, তথা কথিত শূদ্র প্রমুখ "নিম্ন শ্রেণী" লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার, পদাঘাত, কষাঘাত, ঘৃণা, অবমাননা সহ্য করিতে করিতে পশুর মত হইয়াছে, তোমরা জন কয়েক উচ্চ শিক্ষিত লোক তাহাদের জন্য কি করিতেছ? আর তোমার পুরোহিত, তোমার জমিদার, তোমার উকীল, তোমার মোক্তার, তোমার দারোগা, তোমার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদ পত্র "ওগো একে ছুঁইও না জাতি যাবে, ইহার সহিত একত্র বসিও না মান যাবে, ইহাকে লেখাপড়া

শিখাইও না, ভদ্রলোকের ভাত মারা যাইবে। ইহারা শিক্ষা পাইলে জমীদারীতে অত্যাচার উপদ্রব চলিবে না, মাম্‌লা মোকদ্দমা হ্রাস পাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে নির্ব্বোধ রাখ,—ইত্যাদি ধুয়া ধরিয়া দেশকে প্রকৃত শ্মশানে পরিণত করিয়াছ ও করিতেছ। তোমরা কি স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য হইয়াছ? তোমরা স্বায়ত্ত শাসন পাইলে কি নিম্ন শ্রেণীর রক্ষা আছে? তোমাদের প্রতিবন্ধকতায় নিম্নশ্রেণী কি রাজকীয় কোনও উচ্চ অধিকার পাইতে পারে? হাজার হাজার বৎসরের নিপীড়িত জাতি আমরা, ইংরেজ আমলে ইংরেজী আইনের উদারতায় ক্রমশঃ আমাদের মানুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে। আমরা চিরদিন ইংরেজ রাজের অধীনে সুখে সম্মানে শান্তিতে রাজভক্ত প্রজারূপে বাস করিতে চাই। রাজ-ভক্তি আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং উপকারী।”

“শোন হিতবাদী প্রমুখ বাঙ্গালার মসীজীবি বাবু সম্প্রদায়, জ্ঞান-গরিমা ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম, সভ্যতা ও স্বাধীনতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি ইংরাজের নিকট তোমরা শতবৎসরের পরাধীন দুর্ব্বল প্রজা হইয়া যে অভাবনীয় সদ্ব্যবহার আশা কর, তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের অন্নদাতা বস্ত্রদাতা দৈনিক-শারীরিক-পরিশ্রমদাতা, সাহা, মাহিষ্য নমঃশূদ্র সূত্রধর, স্বর্ণকার কুম্ভ-কার, মালাকার, তেলি, তিলি, ধোপা, পোদ, গজেন্দ্র-দাস, নাথ, ব্রাত্যক্ষত্রিয় ভূমিমালী, প্রভৃতি কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর (তোমরা যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বল, এখন কতকটা সাধুভাষায় “অনুন্নত সম্প্রদায়” বল) তেমন সরল সদয় ব্যবহার করিতে কোন দিনও শিখিয়াছ কি?

বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘোর প্রতিযোগিতা হেতু বাঙ্গালার জীবন-মরণের দিনে যাহারা জাতি-কুল-মান রাখিয়াছে, রাখিতেছে, যাহাদের সংখ্যা হিসাবে তোমরা বাঙ্গালায় একেবারে মুষ্টিমেয়; রাজনৈতিক চালের গলাবাজিতে এই সকল নিরীহ, নিরক্ষর সরল, ধর্ম্মভীরু সম্প্রদায় সমূহকে অন্ধকারে রাখিয়া,

গোটা বাঙ্গালা দেশের উপর ইংরেজ রাজপুরুষ, ইংরেজ আমলা-তন্ত্র ও ইংরেজ ব্যবসায়ী দলকে চটাইয়া দিতেছ।

ছিল একদিন—যে দিন তোমরা ওকালতী মোক্তারী করিয়া ধন-কুবের হইতে; ছিল একদিন—যেদিন তোমরা কেরাণী-গিরি ও ডাক্তারী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতে; দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও শক্তিহীনতার উপর তোমাদের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব-বিলাস-জীবন সদর্পে সমুন্নত ছিল। জাতিভেদের প্রাথমিক সময় হইতে এই পর্য্যন্ত তোমরা স্বজাতির প্রতি স্বজাতির হিংসা বিদ্বেষ ও অনুচিত অত্যাচার মূলক আধিপত্যকেই হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছ এবং স্বার্থানুরোধে নিরাশ্রয় জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছ, তোমরা কর্ম্মদোষে অভাবে পড়িয়া ইংরেজের বিদ্বেষ-পরায়ণ, আবার এদিকে সরল ব্যবসায়ী শ্রেণীকে (তোমাদের ভাষায় নিম্নশ্রেণী) রাষ্ট্র-ব্যাপারে তোমাদের দলে টানিতে মজবুত। হাজার হাজার বৎসর হইল, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রাণ যাহা, তাহা পদ-দলিত করিয়াছ।

নিজেদের কল্যাণ নিজেরা করিতে পার না,—তোমাদের প্রাণের ভিতরই প্রাণ নাই,—অনুন্নত সম্প্রদায় কি তোমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিবে? কিছুতেই দিবে না। তোমাদের গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব, মানব সেবার উপযোগী হইলে অনুন্নত সম্প্রদায়তো তুচ্ছ কথা, পৃথিবী শুদ্ধ তোমাদের কাছে আসিবে।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স করিয়া তোমাদের দেশের শাসনভার হাতে চাও, আর জনসাধারণকে ভেড়ার মত যে পথে খুসী সেই পথে নিতে চাও, তোমরা শাসনে অধিকার পাইলে বিদ্যা শিক্ষার অপরাধে ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য পুনঃ "জিহ্বাচ্ছেদ," "কর্ণবেধ" প্রভৃতি দয়াল দণ্ডের ব্যবস্থা হবে নাকি? দেশ দেশ করিয়া মর, দেশের মানুষ-গুলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ কি? আগে নিজের আত্মার মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন লাভ কর, পরে বাহিরে স্বায়ত্ত শাসনের সন্ধান পাইবে।

তোমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের আমলা-তন্ত্রের বিরোধী, তোমাদের হিন্দু জমিদার, তালুকদার ও তাহাদের নায়েব গোমস্তাগণ কালান্তক যম সদৃশ সুদূর মফঃস্বলে নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান প্রজার উপর কর আদায়ে, বৃদ্ধিতে ও উৎকোচ গ্রহণে কিরূপ পাশবিক অত্যাচার করে, একদিনও তাহার খবর রাখিয়াছ কি? সেদিকে তোমাদের প্রবৃত্তি আছে কি?

নিরাশ্রয়, নিরক্ষর জনসাধারণের প্রতি আগে নিজেদের দোষ সংশোধন কর, নিজেদের মনুষ্যত্বের প্রতিদানে আগে তাহাদিগকে মানুষ কর। মফঃস্বলে অত্যাচারী জমিদার ও দুষ্ট মহাজনদিগের কবল হইতে তাহাদের ধন, মান, প্রাণ সম্পত্তি রক্ষা কর, অবৈতনিক পাঠশালার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের ছেলেদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দাও। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেগণ উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও যাহাতে চাকুরীর জন্য ব্যস্ত না হন, শারীরিক পরিশ্রমকে আদর করেন, আগে তাহাই কর।" (সমাজ বন্ধু অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৪)

জল চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। অহিন্দু হস্তে জল খাওয়ার দরুণ ভারতে কি কাণ্ডই না হইয়াছে। মানুষ যে এত হীন এত নির্ম্মম হইতে পারে মানুষ যে মানুষকে এত ঘৃণা এত অবজ্ঞা এত ছোট এত নীচ অধম ভাবিতে পারে, এ পৃথিবীতে অন্য কেহ ভারতবর্ষ ব্যতীত এ কল্পনা আনিতেই পারে নাই। এক সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, ভারতের পর পদানত হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রাজা রাজ্য পালকে মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া এবং তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক মুসলমান দ্বারা আনীত জলাদি পান করিতে বাধ্য করিয়াছিল সুতরাং সেই দিন হইতে তাঁহার জাতি গিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যেদিন রাজ্যপাল যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণের দ্বারা বাহুবলে পরাজিত হন, সেই দিন হইতে ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাত হয় নাই পরন্তু যেদিন রাজা রাজ্যপাল, বহু চেষ্টায়

রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যখন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন না এবং যখন তুষানলে জীবন আহুতি দিলেন সেই দিনই আমার যথার্থ মনে হয় ভারতের পরাধীনতার প্রথম আরম্ভ। যে দিন হলদিঘাটের যুদ্ধের পর রাণাপ্রতাপের কনিষ্ঠ সহোদর শক্তসিংহ যখন রাণাপ্রতাপের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু যবনের অন্নগ্রহণ জন্য তাঁহাকে ভাই বলিয়া বক্ষে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলেন—সেই দিনই মনে হয় ভারতের অধীনতা ভগবানের ন্যায়বিচারে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। শক্তসিংহের মত বীর—যিনি প্রতাপের তুল্য বীর ছিলেন এই দুই বীর যদি একত্রে দণ্ডায়মান হইতেন তবে ভারতের ইতিহাস কি পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে পারিত? ঐতিহাসিক ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করুন। যেদিন ভারতের বীর শ্রেষ্ঠ মহব্বৎ খাঁর পত্নী স্বামীর মুসলমান্ সংস্রবে যাওয়ার পরও যখন স্বামীর প্রতি অনুরাগ থাকা নিবন্ধন গৃহ হইতে, হিন্দুসমাজ হইতে, নির্ব্বাসিত হইয়া, গৃহ হইতে একাকিনী হিন্দু মহিলার স্বামী সকাশে গমনের করুণ কাহিনী যখন শুনিলাম তখনি বুঝিলাম ভগবান আমাদিগকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ন্যায় বিচারই করিয়াছেন। আজকালকার ঝুটা স্বদেশ প্রেমিকগণ বিশেষতঃ বাঙ্গালি স্বদেশ প্রেমিকগণ যেরূপে জাতিভেদের সমর্থন করিতেছেন ও পরস্পর জাতি বিদ্বেষের অনল জ্বালিতেছেন তাহাতে মনে হয় ভারত মাতা সত্বরই—গৌরবের আসন লাভ করিবেন! কি দুর্দ্দিনই না উপস্থিত ভারতে হইয়াছে! (শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন সিরাজগঞ্জ।)

মরণপথ যাত্রী ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতিকে কি না দুর্ব্বুদ্ধিই ধরিয়াছে—কি না বুদ্ধি ভ্রংশই তাহার ঘটিয়াছে। সমাজে যে যত উপকারী, যে যত দরকারী, যাহাদের একদিনের সেবা ব্যতীত সমাজ একদিনও চলিতে পারে না—তাহার প্রতি তাহার ততোধিক অবিচার—ততোধিক অত্যাচার, ততোধিক ঘৃণা-

বমাননা—তত লাঞ্ছনা গঞ্জনা। 'যারে দিয়া চক্ষুদান তারেই করি অপমান।' এ দেশ এ জাতি ডুবিবে না? সকলেরই ভাত কাপড় চাই, বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা ও রাখা চাই, এখানে সেখানে—জলপথে স্থলপথে নানা স্থানে গমনাগমন যাতায়ত করা চাই। তার জন্য কতকগুলি সেবাপরায়ণ জাতি আত্মদান করিয়াছে; আর তার পুরস্কার! পুরস্কার যুগযুগান্তরের লাথি ঝাঁটা পদ প্রহার নির্য্যাতন—অপমান লাঞ্ছনা প্রদান। যোগী সমাজ কাপড় বয়ন করিয়া বস্ত্রাভাব দূর করিত, ধোবা কাপড় কাচিত, নমঃশূদ্র—চাষি কৈবর্ত্ত পোদ কৃষিকার্য্য দ্বারা অন্ন যোগাইত—মালী বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিত ধীবর মাছ খাওয়াইত,—নৌকা বাহিত, পাটনী পারাপার করিত, হাঁড়ি পূজা পার্ব্বণে বিবাহে অন্নপ্রাশনে ঢোল ডাক বাজাইত, ময়লা আবর্জ্জনাদি সাফ্ করিত। চুনারি পান খাইবার চুন যোগাইত—তেলী বা তৈলী তৈল যোগাইত—মুচি জুতা যোগাইত, বেহারা ডুলি পাল্কী বহিত ম্যাথর ময়লা পায়খানা পরিষ্কার করিত—ডোম শ্মশানের শেষ দিনে সেবা করিত। আর তার পুরস্কার! সে কথা লিখিয়া জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবার নয়। ভদ্রলোকগণকে ও বরং ২।৪।১০ দিন ২।৪ বৎসর না হইলে চলে কিন্তু ইহাদিগকে একদিন না হইলেও সমাজের চলে না—অথচ তার পুরস্কারের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয় কি না, ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান অবহেলা। বিদেশী বিধর্ম্মী ও বিজাতির লাথি ও বুটের আঘাত অল্প অপরাধে বিধাতা ব্যবস্থা করেন নাই, তবুও কি, আমাদের লজ্জা হইয়াছে? চৈতন্য আসিয়াছে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি যে চলিয়া গেল—অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিল—তবুও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? হায় আত্মঘাতি হিন্দু-জাতি! ম্লেচ্ছ বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া নাক শিট্কাও কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—তারা কেন প্রভু আর তোমরা কেন তাদের দাস। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত আছে। বেশী দেখাইবার ইচ্ছা নাই।

জাতিভেদের অত্যাচার ঃ—সম্প্রতি 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা এদেশের জাতিভেদ প্রথার ভীষণতা সম্বন্ধে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এলাহাবাদ ষ্টেশনে একদল মেথর ট্রেণের টিকেট করিয়া ট্রেণের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া কোথায়ও গাড়ীতে উঠিবার সুবিধা পাইল না। মেথর বলিয়া যাত্রীগণ তাহাদিগকে কোন গাড়ীতে উঠিতে দিল না, সকলেই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। সংবাদদাতা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন। তাহারা পরিশেষে একদল ইউরোপীয় যাত্রীর শরণাপন্ন হয়। তাঁহারা মেথরদিগকে নিজেদের চাকরের কামরায় তুলিয়া লইলেন। দলে দলে লোক মুসলমান খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে বলিয়া হিন্দুগণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। অথচ যে অকথ্য অত্যাচারের ফলে নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে, সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। (সঞ্জীবনী)

তোমরা ত মেথরদের ঘৃণা কর—তোদের মহা অপরাধ তারা তোমাদের গু মূত সাফ করে। যা, মা, ভগিনী, পিসীমা, মাসিমা,—ঠাকুরমা, আজি-মা স্ত্রী কন্যা প্রেমের বশে মায়ার বশে করে—, অথবা তাঁহারাও যাহা করেন না—(কেন না পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী ছোট থাকিতেই করেন বড় হইলে আর করেন না) মেথর তাহাই করে—সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে। ভাব দেখি, তোমরা শিক্ষিত ভদ্রজাতি না—অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্নজাতি? তোমরা ভাবিয়াছ কি ভগবানও মুচি মেথর বেহারা বাগদিকে ঘৃণা করেন? ভুল—, তোমাদের বড় ভুল। ভগবান তাহাদিগকে কি চক্ষে দেখেন—শুনিবে? তবে শোন কবির 'শেষ অভিষেক'—

"ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে ঐ যে
আসেন বিজয়ী কল্কি!
যত বেটা আছে মেথর চামার
কচু কাটাগোছ হবে তা সাবাড়—

ব্রাহ্মণদের নাচে ভূঁড়ি ভার,
বিলম্বে আর ফল্ কি ?
ললাট তাঁদের সজ্জিত হল
ঘন-চন্দন-পঙ্কে !
দিনে চোখ্ বুজে জাগিয়া ঘুমায়
চণ্ডাল-মুখ পাছে দেখা যায়—
শেষে যদি কিছু বাদ পড়ে হায়
দীর্ঘ পুণ্য-অঙ্কে !
অতি সাবধানে ঢাকা দিয়ে তাঁরা
বাঁচান পরম সত্ত্ব !
যত টীকিটীর বাড়ে গো দৈর্ঘ্য
যত বেড়ে ওঠে ফোঁটার বর্গ,
তত কাছাকাছি গো-লোক স্বর্গ
এমনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব !
আসেন কল্কি দৃপ্ত বিজয়ী
তরবারি হাতে ঝলিছে
প্রসন্ন মুখে করুণ হাসিটী
বেদনায় যেন বাজায় বাঁশিটী—
যুগান্তরের অত্যাচারের
বহ্নি নয়নে জলিছে !
ব্রাহ্মণ সব চীৎকারি ওঠে
"জয় কল্কির জয় হে !
তরবারি হাতে চমকে ভীষণ
অশ্বের খুরে বাজে ঝন্ ঝন্,

বিদ্যুৎ ভরা উজল নয়ন
আহত চাহিয়া রয় যে !
ব্রাহ্মণ যত প্রমাদ গণিয়া
পঠিতেছিলেন মন্ত্র !
কল্কি কিছুই নাহি বোঝে মানে,
ব্রাহ্মণদের ধরি দুই কাণে,—
বলে আজ যাও যাগার যেথানে
থামাও মৎস-তন্ত্র !
কাল হবে জেন বিচার আমার
মাপিব পাপ ও পুণ্য !
আসিতে ভুলোনা টীকিধারিগণ
আজ যাও সবে নিজের ভবন !
কি করিবে আর যত ব্রাহ্মণ
চলিল ফিরিয়া ক্ষুণ্ণ !
বিচার-সভায় বসেন কল্কি
শান্ত গভীর ছন্দ !
ডান দিকে বোসে সব দেবতাই
বামেতে বুদ্ধ নিমাই নিতাই
খৃষ্ট কৃষ্ট—আরো দেখা যায়
গান্ধী বিবেকানন্দ।
বলেন কল্কি—ব্রাহ্মণদের
বিচার হউক অগ্রে
হর্ষে তাদের বিপুল ভুঁড়িতে
পুলক নাচিল কি সুড়সুড়িতে !

ভাব আধিক্যে মুক্ত কচ্ছ—
চালান যাইবে স্বর্গে !
কল্কি বলেন—"ইহাদের পাপ
ছেয়েছে ভারতবর্ষ !
ত্রিভুবনে যত পাপ, তুলনায়
ইহাদের পাপ ভারী ভুল নাই,—
মহাকাশ ছেয়ে করেচে সে পাপ
বিধির চরণ-স্পর্শ !
স্বার্থের তরে ধর্ম্মের ভানে
শাস্ত্রের ছলনায় গো—
এরা পাষণ্ড এরা বর্ব্বর
ভণ্ড দস্যু এরা তস্কর,
যুগ যুগ ধরি কোটী কোটী নরে
রেখেছে পশুর প্রায় গো !
টীকির জোরেতে আছে এরা টিকে
সূত্র গলায় বাঁধিয়ে,
নাহিক সত্য, নাহিক শিক্ষা
কূপের মন্ত্রে এদের দীক্ষা,
এরা অমানুষ, এরাই ম্লেচ্ছ,
অন্ধকারের আঁধি হে !
এরা তমোগুণী, অহঙ্কারের
করে চির ক্রীতদাস্য !
এরা মানবের সনাতন অরি
হুকুম দিলাম—ইহাদের ধরি

পাঠাও নরকে, কহিলা কল্কি
গম্ভীর প্রীতি-আস্য!
তারপর তিনি মেথরের দিকে
চাহি কহিলেন হেসে যে—
"এস সুন্দর, এস পবিত্র,
এস চিরশুচি, উদার চিত্ত!
এস গো মহান্ গুরু গরীয়ান্
এস অকুণ্ঠ বেশে হে!
সেবা যে ধর্ম্ম, কারে বলে ত্যাগ
দেখায়েছ তুমি কার্য্য!
মানবের সেবা করেছ নিত্য
কুণ্ঠাবিহীন অমল চিত্ত,
জননীর স্নেহে ভায়ের মতন—
তুমিই শ্রেষ্ঠ আর্য্য!
তুমি যদি ওগো দিনেকের তরে
করিতে গো সেবাবন্ধ!
সোণার জগত হইত নরক
কত মহামারি কত না মড়ক
জগৎ করিত শ্মশান সড়ক
প্রাণহরা দুর্গন্ধ!
তুমি যে মহৎ মানব সেবক,
তুমি হিমালয় তুল্য!
কোন সাধু চেয়ে নও তুমি কম
সেবার ত্যাগের করেছ চরম—

তবু হায় হায় জগতে তোমার
কেহ বোঝে নাই মূল্য !
না বুঝুক তারা হওনি যেমন,
হয়োনা তেমনি ক্ষুণ্ণ !
ছোঁয়নি তোমারে তাহারা তোমায়
ছিল না যোগ্য তব মহিমার
করিতে স্পর্শ—তুমি যে অপার
পারাবার সম-পুণ্য !
মানব সেবক খৃষ্ট গান্ধী,
বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য !
তুমি নও কম ইঁহাদের চেয়ে
জ্যোতির সাগরে আসিয়াছ নেয়ে—
মানব সেবক মহাত্মা তুমি
এঁদের মতনই ধন্য !
আজ হতে তুমি ইঁহাদের দলে
গণ্য হইবে অগ্রে,
আজ হতে তব, ওগো মহাপ্রাণ
উঁহাদের সাথে একাসনে স্থান
যাও চড়ি ওগো পুষ্পবিমান
নর-দেবতার স্বর্গে !
বিস্ময়ে মুখে কথা নাই সরে
আনন্দে ঝরে আঁখি, আ— !
আজি মেথরের মহা অভিষেক
অরুণ পরায় কিরণের লেখ,—

বৃদ্ধ নিমাই বাঁধে বাহু ডোরে
লয়ে যায় সাথে ডাকিয়া !”

শিবরাম চক্রবর্ত্তী (আত্মশক্তি)

তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীরা “অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ” জাতিদের উপর কিরূপ অত্যাচার করে, তাহার বিষময় ফল স্বরূপ হিন্দু-সমাজ দিন দিন কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে সে সম্বন্ধে ভ্যাক্সিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, সেন গুপ্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় একখানা পত্র লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম :—

দোসাদ শ্রেণীর এক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার দুইটী শিশুপুত্র ও বিধবা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে শিশু দুইটীর মাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তাহাদের প্রতিবেশী একটী উচ্চ শ্রেণীর জনৈক হিন্দুবৃদ্ধ তাহাদিগকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত বৃদ্ধও প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু তখন এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। দুইটী অস্পৃশ্য জাতির অনাথ শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার দরুণ, তাহার জাত গিয়াছে সেই জন্য কেহই তাহার শব দাহ করিতে রাজী হইল না। তখন উক্ত সেনগুপ্ত স্বয়ং নিজের পয়সা খরচ করিয়া তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করান, কোন প্রকারে তাহার শ্রাদ্ধাদিও সম্পন্ন করান, এবং উক্ত অসহায় বালক দুইটীকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ বালক দুইটী নিরুদ্দেশ হয়, এবং কয়েক দিন পরে তাহারা মুসলমান বেশে ফিরিয়া আসে। তাহারা তখন বলে যে, তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহারা আর অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ নয়। হিন্দু ব্যারিষ্টার ও ভদ্র শ্রেণীর লোকে আদর করিয়া তাহাদিগকে

কাজে রাখিবে আর কোন নবাবও তাহাদের অন্ত্যেষ্টীতে যোগদান করিলে তাঁহার জাতি যাওয়ার আশঙ্কা নাই। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

টিয়াদের হিন্দুধর্ম্মত্যাগ।

মান্দ্রাজের পশ্চিম উপকূলে ২॥ লক্ষ টিয়া বাস করে। ব্রাহ্মণের নিকট ইহাদের দেহ অস্পৃশ্য, ছায়া অস্পৃশ্য, এমন কি বাতাস পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য। ইহারা যদি কোন ব্রাহ্মণের নিকট কোন কথা বলিতে চায় তবে ২০০ হাত দূর হইতে কথা বলিতে হয়। টিয়ারা এখন লেখা পড়া শিখিতেছে—লেখাপড়ার ফল স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান। টিয়া ব্রাহ্মণের পাড়ায় যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণ যে রাস্তা দিয়া যান, সে রাস্তায় চলিতে পারেনা; ব্রাহ্মণ যে পুষ্করিণীর জল খান, টিয়া সে পুষ্করিণীর তীরে যাইতে পারে না; শিক্ষিত টিয়া ইহা মানিবে কেন? টিয়ারা রাজপথে স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। যতদিন লেখাপড়া জানিতনা, ততদিন তাহারা ব্রাহ্মণকে দেবতা মনে করিয়া সবই সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহারা অপমান সহিতে পারে না। তাই ২॥লক্ষ টিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বহু সহস্র টিয়া খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়াছে সম্প্রতি তাহাদের যে কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে শীঘ্র এক বৃহৎ সভা করিয়া তাহারা বৌদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। টিয়াদের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়াও মালাবারের নম্বোদ্রি ব্রাহ্মণের চৈতন্য হয় নাই।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে মালাবারে ১৬ লক্ষ হিন্দু ৬ লক্ষ মুসলমান, ৩২ হাজার খ্রীষ্টানের বাস ছিল। এখন মুসলমান সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা দেড়গুণও হয় নাই। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৪২ হাজার, ক্ষত্রিয় ৫০০, বৈশ্য ২৭০০০, নায়র ৩ লক্ষ ও টিয়া ৫॥ লক্ষ ছিল। তখন মালাবারে

যত লোকের বাস তন্মধ্যে হিন্দু শতকরা ৭২ ছিল। ৫০ বৎসর পরে হিন্দু সংখ্যা শতকরা ৫০ হইয়াছে। টিয়ারা যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে হিন্দুর সংখ্যা আরও হ্রাস হইবে। মোপলাদরে উৎপাতে হিন্দুদের মালাবারে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। টিয়ারা যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে হিন্দু আরও দুর্ব্বল হইবে। তবু হিন্দুর চৈতন্য হইতেছে না। হিন্দু যদি মান সম্মান লইয়া বাঁচিতে চায় তবে অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলকে সমভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (সঞ্জীবনী ২২শে চৈত্র ১৩১৩)

আরও শুনিতে চাও কি? কেন বৎসর বৎসর হিন্দু কমে আর মুসলমান খৃষ্টান বাড়ে। পুনরায় সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখিয়াছেন—

হিন্দুর আশঙ্কা।—বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের ৪০ হাজার হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দু খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। হিন্দু যতদিন আপনার স্বধর্ম্মী ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদান করিতে শিক্ষা না করিবেন, ততদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দু এইরূপ স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। (সঞ্জীবনী ফাল্গুন ১৩২০)

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কি ধ্বংস হওয়া না বাঁচিবার চেষ্টা করা। কেবল কি প্রধান ২ পণ্ডিতগণের পাঁতির আশায় বসিয়া থাকিলেই চলিবে,—না, আমাদের নিজেদের স্কন্ধে এই গুরুভার লইতে হইবে। আমরা বলি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। এ ভার আমাদেরই নিজেদের হাতে লইতে হইতেছে।

"সমাজ-বিধান চিরদিনই ব্রাহ্মণ দিয়াছেন। তখন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সে দিনও মনীষী রঘুনন্দনের ব্যবস্থার সম্মুখে সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু মাথা নত করিয়াছিল। সেদিনকার বাঙ্গালাও স্বাধীন ছিল না—মুসলমানের অধীন ছিল। মুসলমান-যুগেও ব্রাহ্মণ ছিল,—ব্রাহ্মণের মেধা ছিল, হৃদয় ছিল। তাঁহারা সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে সে ব্রাহ্মণ

ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিলাসের পঙ্কে আকণ্ঠ-নিমজ্জমান ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-গরিমার স্পর্দ্ধা হাস্যোদ্রেক করে মাত্র। ধনীর চাটুকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুত্রকে ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া যখন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন,—তাহাও যদি উপেক্ষার হয়, তবু দারোগা-ব্রাহ্মণ, উকীল-ব্রাহ্মণ, কেরাণী-ব্রাহ্মণের এমন কি পাচক-ব্রাহ্মণের—জাত্যভিমান একেবারেই অসহনীয়।

এই সমস্ত আচার ভ্রষ্ট, স্ববৃত্তি ত্যাগী, বিপথগামী-ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের মধ্যে মহাপ্রভুর হৃদয় নাই, রঘুনন্দনের মেধা নাই। সে দিনের ব্রাহ্মণের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম নাই। ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কোন ফল নাই। জাতি হিসাবে, সমাজের কর্ত্তা হিসাবে—ইহারা একা কোন বিধান দিতে পারিবেন না। আবার দোষ কেবল একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ব্রাহ্মণ-সভার মতে যাহারা শূদ্র, তাঁহারাও অপর শূদ্রকে অস্পৃশ্য বলেন। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি, ব্রাহ্মণ-সভার আপত্তি সত্ত্বেও, নির্দ্দিষ্ট শূদ্রবর্ণে থাকিতে রাজী নহেন, অথচ যদি অন্য কোন জাতিও তাঁহাদেরই মত শূদ্রবর্ণে থাকিবার আপত্তি প্রকাশ করেন, তবে তাঁহারা সেই অভিপ্রায়কে কিরূপ চক্ষে দেখেন, এবং ঐ জাতি সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন?

যাহা হউক বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। তবে একথা বলা যায় যে, বাঙ্গালার অবজ্ঞাত জনসাধারণ অস্পৃশ্য ও জল-অচল থাকিতে ক্রমে ক্রমে অধিকতর অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধির আশ্বাস বাক্যে, তাঁহারা আশান্বিত হইয়া উঠিতেছেন, কোন প্রকার স্তোকবাক্যে প্রতারিত হইতে আর তাঁহারা রাজী নহেন। স্বরাজ যদি আমরা একান্ত ঐকান্তিক ভাবেই কামনা করি, তাহা হইলে এই সমস্যার মীমাংসা করিতেছি না কেন?

মীমাংসা খুব কঠিন নয়। সহরে আসিয়া তো আমরা বেশ উদার হইয়া পড়ি, রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে বেশ উদারতা; তবে গ্রামে ফিরিয়া গেলেই ভণ্ড

সাজি কেন? ছুঁৎমার্গের ব্যাধির এক প্রধান উপসর্গ—ব্যবহার, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভণ্ডামী।

জনসাধারণের অনুমোদন ও সমর্থনেই বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন এত প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর গণবিগ্রহ নিদ্রিত নহেন। অপেক্ষা?—বহুদিন করা হইয়াছে; সহ্যতা—সীমা অতিক্রম করিয়াছে!

ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন বিশেষ জাতির চেষ্টায় এই ব্যাধি দূর হইবে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত একত্র মিলিত হইয়া এই চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসকেই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া কার্য্যে হাত দিতে হইবে। জনসাধারণ ও শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট, সমাজ সংস্কার ও হিন্দুমহাসভার নিকট, আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।" (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

তার পর জল চলের কথা। এ সম্বন্ধে 'হিতবাদী' লিখিয়াছিলেন :—

জলচল।

"আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন—"তোমরা কি ছত্রিশ জাতিকে জলচল করিয়া লইতে চাও?" উত্তরে আমরা বলিলাম—"হাঁ, আমাদের সেই বাসনা। আপনারা এখন যাহা চালাইয়াছেন, তাহাতে ছত্রিশ কেন, ছাপ্পান্ন জাতি জল চল হইয়া গিয়াছে। আমরা কেবল সেইটুকু আপনাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চাহি।" তিনি আমাদের উত্তর শুনিয়া নীরব রহিলেন। আজ আমরা সেই কথাটা পাঠকবর্গকে খুলিয়া বলিব।

"পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে চলিত, তখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমাজের উচ্চ জাতীয়গণ অজ্ঞাত-কুলশীল কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিতেন না; অজ্ঞাত-কুলশীল কাহাকেও চাকর খানসামার পদে নিযুক্ত করিতেন না। তখন বাড়ী বাড়ী পাচক

ব্রাহ্মণ থাকিত না ; যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া গৃহে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে হইত, তাঁহারা সে ব্রাহ্মণের চৌদ্দপুরুষের সমাচার লইয়া তবে তাহাকে পাকশালায় প্রবেশ করিতে দিতেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই রন্ধন করিতে জানিতেন এবং বিদেশে যাইলে স্বপাকেই ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন। যতদিন সমাজে এই কড়াকড়ি ছিল, ততদিন জল-চল ও জল-অচলের কথা লোকে কহিত এবং সে কথার একটা মূল্যও ছিল।

এখন সমাজের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল জাতিই এখন বাঙ্গালীর ঘরে চাকরী করিতেছে। উড়ে, হিন্দুস্থানী, গুর্খা, শিখ, পাহাড়ি, বুনো প্রভৃতি অজ্ঞাত-কুল-শীল ভারতবাসী অন্নাভাবে বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইলেই, তাহাকে বাবুরা খানসামা ও বেহারার পদ দিতেছেন। কাহার, কুর্ম্মী, ধানুক, রাজবংশী প্রভৃতি পশ্চিমের বহু স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতিই বাঙ্গালায় আসিয়া জল চল হইয়া যাইতেছে। যে যজ্ঞোপবীতধারী উৎকলবাসী কলিকাতার ড্রেণে নামিতেছে, তাহারই জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন, কেহ বা কোন বাবুর বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছে, কেহ বা অন্য কোন বাবুর বাড়ীতে সর্দ্দার বেহারা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এখন বাঙ্গালায় জলচল কে নহে ? আমাদের চাকর চাকরাণী, পাচক পাচিকা—সবাই ত অজ্ঞাত-কুলশীল ; আজ যে আমার বাড়ী কায়স্থ পরিচয় দিয়া খানসামার কাজ করিতেছে, কাল সে স্থানান্তরে যাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পাচক ব্রাহ্মণ হইতেছে। আমরা স্বয়ং এমন ঘটনার কথা জানি বলিয়াই কথাটা এত জোর করিয়া বলিলাম। দেখিয়াছি পশ্চিমের মুর্যহর ও মঘইয়া ডোম জাতীয় হিন্দুস্থানী সকল কলিকাতায় আসিয়া, বাঙ্গালার অন্য বহু নগরে যাইয়া খানসামার কাজ করিতেছে ; অজ্ঞাত-কুলশীল হিন্দুস্থানী, উড়ে, গুর্খা প্রভৃতিকে আমরা অম্লান মুখে জলচল করিয়া লইতেছি, আর যত গোল বাধাইব কেবল স্বদেশের অন্ত্যজ জাতি সকলকে

জল চল করিয়া লইতে? তখনি যত গোঁড়ামি আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে, ইহ-পরকালের যত ভাবনা তখনই জাগিয়া উঠিবে।

"আর এক কথা; পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন উচ্চজাতীয় হিন্দুই দোকানের পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন না। জানাশোনা হালুইকর ব্রাহ্মণের দোকান না হইলে, কেহ কেহ দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা পর্য্যন্ত আহার করিতেন না। এখন সকল দোকানের সিঙ্গাড়া, আলুর দম, লুচি কচুরি মিঠাই সন্দেশ—সর্ব্বস্বই আমাদের আহার্য্য হইয়াছে। চাকরে বাজার হইতে লুচি কচুরি আনিতেছে, হাঁসের ডিম আলুর দম আনিতেছে, আর আমরা অম্লান বদনে তাহাই খাইতেছি। রেল গাড়ীতে যাইতে হইলে, কেল্‌নারের সান্‌কী ভোগ যদি না খাই, কিন্তু পাঁড়েজীর রথ্যাধূলি-বিমণ্ডিত মক্ষিকাকুল-সমাচ্ছন্ন, পুরীতরকারী মালাই মিঠাই অসঙ্কুচিত চিত্তে ভোজন করিয়া হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতেছি। ক্ষুধার চোটে আহারের সময়ে মনে থাকে না যে, রেল ষ্টেশনের খাবারওয়ালার খোঞ্চার খাবার কেলনারের প্রসাদ অপেক্ষা সহস্র গুণে হীন জঘন্য এবং মনুষ্যমাত্রেরই অভোজ্য ও অস্পৃশ্য। এ সব, যে হিন্দু সমাজে চলিতে পারে, এমন ব্যবহার করিয়া যাহারা বড়াই করে, তাহারা স্বদেশের নমঃশূদ্রগণকে ও মালীদিগকে, পোদ কৈবর্ত্ত সকলকে জল চল করিতে কেন আপত্তি করিবে? ইহার উপর সোডা লেমনেড আছে, বরফপানী আছে, আরও কত কি আছে। আমরা ত এক হিসাবে তেত্রিশ কোটি জাতিকে জল চল্ করিয়া লইয়াছি। যত গোল কি ঘরের কয়জনকে জল চল্ করিতে ঘটিতেছে! বিবাহের ভোজে, শ্রাদ্ধের পংক্তিভোজনে, দুর্গোৎসবের প্রসাদ ভক্ষণে, উড়ে হিন্দুস্থানী গুর্খা খানসামারা ঘটে ঘটে জল দিয়া যাইতেছে, মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার, কটক-যাজপুরের অজ্ঞাতকুলশীল পাচকে লুচি ভাজিয়া পাতে পাতে দিয়া যাইতেছে; বাঙ্গালার সকল জেলার অপরিচিতা চাকরাণীরা বাটনা বাঁটিতেছে, তরকারী ধুইয়া

দিতেছে, মা-ঠাকুরাণীদের শুচীবাইয়ের জল যোগাইতেছে, ঠাকুর ঘর ধুইতেছে, পুষ্পপাত্র মার্জ্জনা করিতেছে; ঘরের বাহিরের সকল কাজই অপরিচিত অপরিচিতার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে! ইহাতে কাহারও জাতি যায় না' কাহারও পরকালে কাঁটা—পড়ে না, কাহারও পূজাপার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ শান্তি নষ্ট হয় না। আর যত সর্ব্বনাশ ঘটিবে বলিয়া-কহিয়া বাঙ্গালার গোটাকয়েক জাতিকে জল চল করিতে? বলিহারী!

"গোস্বামী প্রভুগণও এখন আর অন্ত্যজ জাতির গুরুগিরি করিতে চাহেন না; বেশ্যাকে দীক্ষা দিতে লজ্জা বোধ করেন। ফলে, বাঙ্গালার বহু শূদ্রজাতি এখন এই নবীন সভ্যতার—কর্কশ জাতিভেদের প্রভাবে গুরু পুরোহিত বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে। যাহাদের অর্থবল আছে, তাহারা টাকার জোরে বিদ্যাভূষণ তর্কালঙ্কারকে গুরু পুরোহিতের পদে বরণ করিতেছে। যাহারা দরিদ্র গৃহস্থ, তাহাদের দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কারই হইতেছে না। তাই বাঙ্গালার অন্ত্যজ জাতি সকল এখন দলে দলে মুসলমান হইতেছে, খৃষ্টান সাজিতেছে। সমাজ ও ধর্ম্ম পাইবার জন্য, ভদ্র সাজিবার বাসনায়—সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য যদি আমরা বলি যে অন্ত্যজ জাতি সকলকে জলচল করিয়া লও, তাহা হইলে অমনি শাস্ত্র, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মনু পরাশর প্রভৃতির দোহাই দিয়া গোঁড়ামীর ক্লেদ কর্দ্দম শত ধারায় বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাই বল্‌তে ইচ্ছা করে যে, ভাই! নিজের বুকে হাত দিয়া গোঁড়ামীর ডঙ্কা মারিও. নিজের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিও, সমাজের চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া আমাদের কথার প্রতিবাদ করিও।"

এই জলচল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রসিক লাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"একই জাতি বিভিন্ন প্রদেশে আচরণীয় ও অনাচরণীয় বলিয়া গৃহীত।

গোপ বা গোয়ালা জাতি পূর্ব্ববঙ্গে আচরণীয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের জলচল নাই। যশোহরের গোয়ালারা গরু দাগাইয়া অনাচরণীয় হইয়াছে। বিহারে কাহার জাতির জল চল আছে, কিন্তু বঙ্গে কাহার অচল। লোকে এদেশে হাড়ি ও কাহার এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া কাহারকে হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু বিহারী কাহার আমাদের চক্ষে 'কুলিন', তাহাদের জল খাইতে আমরা ইতস্ততঃ করি না। ছোটনাগপুরে কাহার মুর্গী ও ইন্দুরের মাংস ধ্বংস করিয়াও উচ্চ শ্রেণীর আচরণীয়। চাষী কৈবর্ত্তেরাও স্থান বিশেষে অচল। বিহারের কুম্ভকার অপেক্ষা বঙ্গের কুম্ভকারের সামাজিক অবস্থা উন্নত। বিহারে তাহাদের জল উচ্চ বর্ণের অব্যবহার্য্য।" (সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী তেঁতুলিয়া, হরিপুর, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পাটি প্রস্তুত কারিগণ আচরণীয় কিন্তু ময়মনসিংহে তাহারা অনাচরণীয় অচল।) "সুরা ব্যবসায়ী (বলিয়া) শৌণ্ডিক জাতি অনাচরণীয়। বঙ্গে, বিহারে এবং ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দু সমাজে তাঁহারা অনাচরণীয়।" (কিন্তু সুরা বা মদ অচল নহে। সুরা বিক্রয় অপরাধে শুঁড়ী পতিত, কিন্তু সুরা পানে কেহ পতিত নহেন যত দোষ বিক্রয়ে, পানে নহে।) "স্বর্ণকার (ও সুবর্ণবণিক) অচল কিন্তু কর্ম্মকারের (লৌহকার) জল চল। রাউতির (চূণ বিক্রয়কারী চূর্ণকার) জল দ্বারা প্রস্তুত চূণ পানের সঙ্গে সকলেরই মুখে যায়, কিন্তু তাহার জল কেহই স্পর্শ করে না।" (অর্থাৎ চূণ মিশ্রিত জল চলিবে কিন্তু শুধু জল অচল—সে জলে ব্রাহ্মণাদির ব্রহ্মতড়িত লোপ পায় ;) নমঃশূদ্র, মালী, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধরের জল অচল—কিন্তু সেই জলে সোডা মিশাইয়া দিলে কিংবা জলকে বরফে পরিণত করিয়া দিলে করিম চাচার হাত হইতে লইয়া খাইতে কাহারও আপত্তি নাই - সমাজের বাধা নাই। মুসলমান কলুর তৈলে সকলেই হাড়িতে ভোজ্য সামগ্রী ভর্জ্জিত করে, কিন্তু তাহার জল কাহারও চিপিটকে যুক্ত হইতে পারে না।" সকলেই বোধ হয় জানেন তৈল নির্য্যাস করিবার কলে (গাছে) জল না দিলে—শুধু সরিষা

ও তিল হইতে কথনও তৈল বাহির হয় না। সে জলে দোষ হয় না; যত দোষ জল বেচারীর একা একা থাকিলে। শুধু জলে যত দোষ, মিশ্রিত হইলে কোন দোষ নাই। "মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর ও কৈবর্ত্তগণ অস্পৃশ্য, কিন্তু বঙ্গে মৎস্য অস্পৃশ্য নহে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, সুরা বা মৎস্য রূপ অপবিত্র ও অশুদ্ধ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া—সাধারণের পানে ও আহারে প্রশ্রয় দেওয়া ও সহায়তা করার অপরাধে শুঁড়ি ও ধীবর পতিত কিন্তু উহা পানে ও আহারে কেহ পতিত হইতেছেন না। মৎস্য ও সুরা পানে জাতি যায় না, তাহার বিক্রয়ে জাতি যায়। অর্থাৎ—সমাজ বলিতে চাহে গো বিক্রয়ে জাতি যাইবে কিন্তু গো ভক্ষণে কোন দোষ হইবে না—পতিত হইতে হইবে না! "বিহারে আহীর ও কোন কোন স্থলে রাজপুতগণও বরাহ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে—তথাপি তাহারা আচরণীয় হিন্দু—" আর বঙ্গে সাহা সুবর্ণবণিক মাহিষ্য নমঃশূদ্র মালী অচল অস্পৃশ্য। "বিহারে জলচল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অনাচরণীয় অস্পৃশ্য জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। * * * অতএব সামাজিক রীতিনীতি ও ও খাদ্যাখাদের বিচার দ্বারাও অনাচরণীয় হইবার একমাত্র কারণ নহে।" * * * "পঞ্জাবে ডালরুটী বাজারে ক্রয় করিয়া 'ক্ষত্রি' রাজপুত ও কায়স্থাদি ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্যবহার করে। * * মান্দ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর গৃহে পালিত কুক্কুট দৃষ্ট হয়। * * ইংরাজ সংসর্গে, ইংরাজী শিক্ষায়, ইংরাজী আইনে আমাদিগের মতের, চিন্তার, বৃত্তির, ব্যবহারের, ধর্ম্মের গতিবিধির ও ইচ্ছার স্বাধীনতা শিক্ষা হইয়াছে। প্রভাতে তরুণ অরুণ দীপ্তির প্রথম প্রকাশে বিহঙ্গকুল যেমন উল্লাস ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণকরে, ধর্ম্ম সমাজ বাণিজ্য সাহিত্য চিন্তায় ও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের 'বারতা, শুনিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়া বঙ্গবাসী সেইরূপ জয়ধ্বনি করিয়াছিল। সেই আনন্দধ্বনি কবির কণ্ঠে, বক্তার বাগ্মিতায়, লেখকের লেখনীতে, কর্ম্মীর কর্ম্মে,

দর্শকের সমালোচনায় শতমুখে সহস্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজের আইন সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের ধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে। এখন সমাজের শাসন অপরাধজনক, ধর্ম্মের উন্মাদনা অযৌক্তিক ও আইন বিরোধী। অতএব হিন্দু সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজের শিক্ষা ও সভ্যতা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।" * * * "ইংরাজ যে সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও বর্ণাশ্রম প্রথার মূলে যুগপৎ কুঠারাঘাত করিয়াছে, ইয়ুরোপের সভ্যতা আশিয়াকে অভিভূত করিয়াছে, প্রাচীনের ভগ্নপ্রায় প্রাচীরের উপর নবীনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। আরবের ভীম ঝঞ্জা-বাতের বেগ তুচ্ছ করিয়া যে হিন্দু দুর্গের গর্ব্বোন্নত শিখর গগন স্পর্শ করিয়াছিল, ইংরাজ যাদুকরের মলয় মারুতের মৃদুস্পর্শে তাহা আলাদিনের অট্টালিকার ন্যায় শূন্যে মিলিয়া যাইতেছে; ইংরাজের যুক্তিবাদ ভারতের শ্রদ্ধাবাদকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। ইংরাজের শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের তরঙ্গ স্তরে স্তরে সমাজের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে।" * * "আমাদের দেশে রেলে, ট্রামে, জাহাজে, বিদ্যালয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে ও রাজদ্বারে জন সাধারণের তুল্যাধিকার। জাতিগত পদমর্য্যাদা—অর্থ ও পদজনিত সম্মানের নিকট পরাজিত হইয়া পল্লী প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লালায়িত হইয়াছে। খৃষ্টমিশনারিগণ এবং হোটেল, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, মেস, সুরালয়, বারাঙ্গণা গৃহ প্রভৃতি সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সন্ধুক্ষিত বিপ্লবানলে ইন্ধন প্রদান করিতেছে।"* "বৃহৎ নগরীতে জীবন সংগ্রামের

* এখন পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও শাসন করিতে পারিবে না; সমাজ শাসনের পুরাতন পদ্ধতি একঘরিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কাহাকেও অনুগত করিতে পারিবে না। সে পক্ষে পীনাল কোড তোমার বিরোধী। * * আজি পর্য্যন্ত সর্ব্বভুক্ অভোজ্য ভোজী ব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তের হয় নাই। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া ১৩২১, আষাঢ়.

তীব্রতা আচরণীয় ও অনাচরণীয় হিন্দুকে সমসূত্রে গাঁথিয়া এক নূতন জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।” “স্বাধীনতার যুগে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও শাসন ও প্রভুত্ব স্বীকার করিতে চাহেনা। এখন উচ্চ নীচ প্রত্যেকে আপন আপন অধিকার কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত। প্রতিপদে প্রতিকার্য্যে যুক্তির অবতারণা না করিলে কেহ ব্যবস্থার নিকট মস্তক অবনত করে না। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার আসিতে পারে; কিন্তু তাহা ব্যবস্থার নামে যথেচ্ছাচার অপেক্ষা শতগুণে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলজনক নহে কি? এখন আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হইতেছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইলেও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যকতা সত্বেও হইতেছে না। পল্লীতে সমাজ-পতি নাই, ব্যবস্থাকার ব্রাহ্মণ নাই।* সমাজহিতৈষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রাচীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারাও পরমার্থ অপেক্ষা অর্থ, যশঃ, মান, পদমর্য্যাদা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসূত সুখ ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পুত্র পৌত্রদিগকে ইংরাজী ভাবাপন্ন করিয়া গৌরব ও আত্ম প্রসাদ অনুভব করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায়গণের পুত্রগণ এখন কেহ উকীল—ইংরাজীর অধ্যাপক, ডাক্তার কেহ বা কৃষিতত্ত্ববিদ্ হইতেছেন। জনৈক বিশিষ্ট বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বয়ং সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহাদের পুত্রদিগকে টোলের চতুঃসীমা স্পর্শ করিতে দেন নাই, খাটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।” (মালা-তিলকধারী, মুণ্ডিত-মস্তক দীর্ঘ-শিখা-সূত্রধারী টোলের শিক্ষিত জামাতাকে কন্যাদান না করিয়া হ্যাট কোটধারী চস্‌মা আঁটা খাটো দরশন স্কুল বা কলেজের

---

* আমরা—যাহারা ছত্রিশ জাতির সহিত একাসনে বসিয়া একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর-কাল ইংরাজী শিখিয়া এম্ এ, বি এ, পাশ হইয়া বাবু সাজিয়াছি আমরা কেহই ব্রাহ্মণ নহি। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বিজয়া, ১৩২১, আষাঢ়, ৯৮২ পৃঃ।

ছাত্রগণকেই সকলে কন্যাদান করিতেছেন। কন্যাও আর পূর্ব্বোক্ত বরের অনুরাগিনী নহেন। শতকরা ৮০ জন ব্রাহ্মণ সন্তান আপনাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন।) সুতরাং "যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ তিনি অপরকে কিরূপে সাধনার পথ দেখাইবেন ?"

"হিন্দু সমাজে এখন নায়ক ও পরিচালক নাই। সুতরাং বিষম দুর্দ্দিনে বাতাবর্ত্ত ও সলিলাবর্ত্তের সন্ধিস্থানে আমাদের কর্ণধারহীন বিপ্লবতরঙ্গ-তাড়িত, জীর্ণ সমাজতরি মগ্ন প্রায়। আরোহিগণ কেহ নিদ্রিত সংজ্ঞাহীন, কেহ 'আত্মবিস্মৃত', কেহ উন্মত্তের ন্যায় কলহমত্ত; আত্মরক্ষার চিন্তা ও চেষ্টা কাহারও নাই। সমাজের শিরোমুকুট ব্রাহ্মণ বর্ণে-তরের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিকার্য্যে দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। যে সকল বর্ণ লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত, তাহারা সকলেই আপন আপন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিতেছে। এই সময় দারুণ সমস্যার মীমাংসা করিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সহানুভূতি ও সুবিবেচনা লইয়া অগ্রসর না হইলে অচিরাৎ হিন্দুসমাজের শিরে অশনি পাত হওয়া অসম্ভব নহে।"

"বিপ্লবের সূচনায় যুগীজাতি উপবীত গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণযোগী' বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উত্থানের চেষ্টা ও সামাজিক অধিকার লাভের আশঙ্কা কেবল পশু বলে চাপিয়া রাখিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সাম্যবাদ এবং বিজয় কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের উদারনীতি কতক পরিমাণে হিন্দু সমাজের বিপ্লব তরঙ্গের গতিরোধ করিতে পারিয়াছে। ইঁহারা না থাকিলে ব্রাহ্মণের বজ্র আঁটুনিতে সমাজ গ্রন্থি একবারেই বা ফস্‌কিয়া যাইত। বৈদ্য ও যুগীদিগের উপবীত গ্রহণের যে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা ঐ খানেই শেষ

হয় নাই। কায়স্থগণও উপবীত গ্রহণ করিয়া পশ্চিম দেশীয় স্বজাতিদিগের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলের দ্বারবঙ্গাধিপ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সহানুভূতি থাকিলেও বঙ্গীয় তথা কথিত সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ তাহার ঘোরতর বিরোধী হইয়াছেন। রাজপুত, রাজবংশী, কুর্ম্মী, কাহার, আহীর, কর্ম্মকার, বণিক, তৈলী, মাহিষ্য প্রভৃতি সকল জাতি আপন ২ অধিকার ও উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অশুভ লক্ষণ নহে। সুচতুর দক্ষ পরিচালক থাকিলে এই সময় নিদ্রোত্থিত হিন্দু সমাজকে নূতন শক্তিতে, নূতন মন্ত্রে, নূতন ভাবে গঠন করিতে পারিতেন।” “ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত হইয়া নিম্ন শ্রেণীকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আইনের অভয় পাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সুদৃঢ় বৃত্ত গঠিত করিয়া স্ব স্ব জাতির ও বর্ণের ব্রাহ্মণ লইয়া নূতন শাখা হিন্দু সমাজ স্থাপন করিয়াছে। এখন প্রত্যেকেই বলিতে পারে আমরাই উচ্চবর্ণ। * * ব্রাহ্মণ মাহিষ্যের জল স্পর্শ করিবে না, মাহিষ্যও ব্রাহ্মণের জল অস্পৃশ্য বলিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে। ‘তাহারা জলচল’ জাতি হইবার জন্য সমাজে আবেদন করিয়া যদি ফল না পায়, তাহা হইলে এই মুমূর্ষু সমাজকে অক্ষম অযোগ্য ও পক্ষপাতী বলিয়া ঘৃণা করা তাহাদের পক্ষে অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না। * * এক মেদিনীপুর জেলার একপ্রান্তে মাহিষ্যগণ আচরণীয় এবং অপর প্রান্তে তাহাদের জলচল নাই। যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাহাদের জল ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা কি অপর প্রান্তবাসী স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের সহিত পান ভোজন ও বৈবাহিক আদান প্রদানাদি করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন? তাহাতে কি তাঁহাদের জাতি যাইতেছে না? এরূপ গায়ের জোরের দেশাচার ‘দুরাচার’ মাত্র; উহা যতশীঘ্র তিরোহিত হয় ততই আমাদিগের ও আমাদের উত্তর কালীয় বংশধরদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। ইহাপেক্ষাও অধিকতর রহস্যজনক কথা

এই যে অনেকস্থানে মাহিষ্য (চাষী-কৈবর্ত্ত) জাতি আচরণীয়, কিন্তু তাহাদের পুরোহিতের জল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অব্যবহার্য্য। মাহিষ্যগণ পুরোহিতের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া শুদ্ধজাতি আর তাহাদের গুরু পুরোহিত অশুদ্ধজাতি; বলিহারি দেশাচারের যৌক্তিকতার! বেলফুল (শেফালিকা, জবা প্রভৃতি) চণ্ডালে স্পর্শ করিলে তাহা দেবার্চ্চনার অযোগ্য, কিন্তু সকণ্টক মৃণাল হইতে চণ্ডাল কর্ত্তৃক আহৃত কমল (বা সকণ্টক বিল্ব পত্র) দেবতার পরম প্রিয়। গরজের বালাই লইয়া মরি। ব্রাহ্মণের ন্যায় অশৌচ পালনকারী কৃষিজীবী নমঃশূদ্রগণ হিন্দু সমাজের ভিত্তি। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিবাদে তাহারা ও মাহিষ্যজাতি হিন্দুর দক্ষিণ হস্ত যথা সর্ব্বস্ব ছিল। কায়স্থের এবং স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে তাহারা দৈহিক বল দ্বারা আততায়ীর দৈহিক বলের সম্মুখীন হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপালন করিয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তাহারা পতিত ও অস্পৃশ্য। এতকাল তাহারা সকল অনাদর উপেক্ষা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এখন ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা উচ্চবর্ণের 'বিদ্যা' টের পাইয়াছে। তাহাদিগকে যাহারা এতকাল ছোট লোক বলিত, এখন টেবিল ঘুরাইয়া তাহাদিগকে উহারা ছোটলোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থ বলে, শক্তিবলে, জন বলে ইহারা স্বাধীন ও প্রধান। কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণ সকল আপন লইয়া এতদূর ব্যস্ত যে পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। কাজেই তাহারা আপন আপন ভাবনা নিজেই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। * * আমাদের সহানুভূতির জন্য অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই। তাহারা দেখিতেছে—

(ক) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিক্ষায় অনুরক্ত হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর সহিত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আত্মীয় কুটুম্ব, পুত্র পৌত্র ও স্বজাতিগণ কলের

জল, হোটেলের অন্ন, বিদেশীয় অচল জাতির জল, চায়ের দোকানের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার ও গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

(গ) * * * *

(ঘ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের সন্তান, সন্ততি আত্মীয় কুটুম্বগণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতীয় যুবতীগণের সহিত ব্যভিচার করিতে ও গোপনে তাহাদের হাতের জল (ও তৈয়ারি পিষ্টকাদি) ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতেছেন না।

(ঙ) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণ গোপনে অখাদ্য ভোজন ও যবনান্ন গ্রহণ করিয়াও জাতিচ্যুত হইতেছে না।

(চ) * (ছ) * (জ) * * *

(ঝ) ক্ষমতাপন্ন পদস্থধনী ব্যক্তির নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্পর্শদোষ বিচার করিতেছেন না। (ঞ)

(ট) এক প্রদেশের অনাচরণীয় জাতি অন্য প্রদেশে আচরণীয়।

(ড) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সদাচার, সচ্চরিত্র এবং সৎবৃত্তি অবলম্বী হইলেও অনাচরণীয় জাতি অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ। কিন্তু নিতান্ত ভ্রষ্টাচার, দুশ্চরিত্র, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও হীনবৃত্তি পরায়ণ উচ্চ বর্ণজাত ব্যক্তি শুদ্ধ ও আচরণীয়।

নিম্নশ্রেণীর অনাচরণীয় হিন্দুগণ দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের কোন প্রকার সামাজিক সংশ্রব নাই। ব্রাহ্মণাদি শীর্ষস্থানীয় হিন্দুগণ সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধারূঢ় সেই বৃদ্ধের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের উপর অযথা সামাজিক অত্যাচার করিতেছেন। সে অত্যাচারের মূলে যুক্তি নাই, বিচার নাই, মায়া মমতা নাই, ধর্ম্ম নাই উদ্দেশ্য নাই—আছে কেবল অন্ধ দেশাচার—রাক্ষসের বিভীষিকা।

মুসলমান-যুগে বহু হিন্দু নানা কারণে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলকেই যে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল তাহা নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে সামাজিক অত্যাচারের ব্যতিক্রম হওয়াতে অনেক হিন্দু সমাজচ্যুত হইয়া মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে কাহারও পিরুলী অপবাদ হইয়াছিল। (আজকাল যাঁহারা মৌলবী মৌলানা সাজিয়া বক্তা লেখক হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই আমাদেরই ভাই ছিল, আমাদেরই অত্যাচারে তাহারা ইস্‌লামের শরণাপন্ন হইয়াছিল।) এতদ্‌-ভিন্ন পার্থিব সুবিধা ও লাভালাভের বিবেচনায়ও অনেকে স্বেচ্ছায় পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (নমঃশূদ্র, মালী প্রভৃতি জাতিগণ নাপিত, বেহারা ও ধোপা পাইবে না কিন্তু সে যদি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হয়, তবে সে তাহার সকল গুলিই পাইবে। সরলা নমঃশূদ্রানী বা বিমলা মালিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দু থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে নাপিত বেহারা পাইবে না কিন্তু যেই মাত্র সে মুসলমানের সহিত নিকা বসিয়া মুসলমানী হইবে বা বেশ্যা হইবে তখন সে সকলই পাইবে। কত নিম্ন শ্রেণী আছে যাহাদের গুরু পুরোহিত নাই। আর একটী প্রধান কারণ ব্রাহ্মণেতর শতকরা ৯৪ জন হিন্দুকে পূজা ও বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা। এই সব গুরুতর গুরুতর অবিচারে দলে দলে লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছিল— এবং এখন খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে।) "পরলোকের কথা, মুক্তির কথা, সাম্যরাজ্য স্বর্গের কথা, সাধন মার্গের কথা, ধর্ম্মের কথা তাহারা যাহার নিকট শুনিয়া চিত্তে শান্তিলাভ করিল, তাহারই চরণ প্রান্তে তাহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী, পীর, ফকীর, গাজি, সাধু, যিনি আদর্শ জীবন লইয়া আসিয়া প্রেম ও দয়া বিনিময়ে তাহাদের হৃদ্‌রাজ্য অধিকার করিলেন, তাহারা তাঁহারই চরণ তলে আত্ম বিক্রয় করিল! এইরূপে অনেক নিম্ন

শ্রেণীর হিন্দু জাতিভেদের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া (বৌদ্ধধর্ম্ম) ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের চরণ প্রান্তে জাতিভেদ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এখন ও দলে দলে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের সন্নিকটে বৃহৎ বৃহৎ খৃষ্টপল্লী স্থাপিত হইয়াছে। 'বুনো ধাঙ্গর' হিন্দুর দ্বারে ধর্ম্মের ভিখারী হইয়া ও রিক্ত হস্তে ফিরিয়া খৃষ্টমন্দিরের ক্রোড়ে সমাদর লাভ করিতেছে। রাঁচিতে শত শত "মুণ্ডা কোল" খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। (মান্দ্রাজের পারিয়াগণ দলে দলে খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে)। হিন্দু সমাজ আর কিছুদিন পরে ভীম কর্ত্তৃক নিহত কীচক কবন্ধের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হীন কুম্মাণ্ডাকার ধারণ করিবে। অথবা সকল যাইয়া কেবল সমাজ তুণ্ড ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * * * অনাচরণীয় জাতিদিগের পক্ষে অযোগ্য উচ্চবর্ণের অত্যাচার এতদূর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে এক্ষণে তাহারা বিদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা সামাজিক বিধি ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক আচরণীয় হইবার চেষ্টা করিতেছে। (তাহারা সংখ্যাতেও ত কম নহে—শতকরা ৭৪ জন হিন্দুই অনাচরণীয় অস্পৃশ্য,—অর্দ্ধেকের বেশীই তাহারা)। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" আরম্ভ হইয়াছে।"

"আমাদের তলে তলে সব চলে,' মুখপাত দুরস্ত করিয়া আর কতদিন সমাজের খোলস বজায় রাখা যাইতে পারে? মুসলমান দুধে জল দিলে তাহা ক্রয় করিতে ও সেই জল মিশ্রিত দুগ্ধ রন্ধন শালায় প্রবেশ করাইতে নিষেধ নাই, কিন্তু নমঃশূদ্রের জলে হাত পা ধুইতেও অব্যবহার্য্য। খেজুর রস জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে চিতই পিঠা ও পুঁটলীতে বাঁধিয়া চাউল সিদ্ধ করিয়া মুসলমানের জানানা ব্যক্তি বাল বাচ্চাকে খাইতে দেয়। সেই গুড় উচ্চবর্ণের হিন্দুর (ও দেবতা বিগ্রহের) অব্যবহার্য্য নহে। মুসলমান ও

নমঃশূদ্রাদি অনাচরণীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা ধান সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল উচ্চ নিম্ন সকলেই তাহা ক্রয় করিয়া সিদ্ধ চাউল দ্বিতীয়বার সিদ্ধ করিয়া তৎদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন। কিন্তু অপর জাতিতে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের পক্কান্নও অখাদ্য। গব্য বা মহিষ ঘৃতের সহিত কত জীব জন্তুর বসা *

---

* "সঞ্জীবনীতে প্রকাশ,...গোবিন্দ শীল নামে একব্যক্তি মানিকতলা মিউনিশিপ্যালিটীর এলাকায় একটী চর্ব্বির কারখানা খুলিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াছিল। সে দরখাস্তে লিখিয়াছিল যে, চর্ব্বির ব্যবসা অতি উত্তম, ইহাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, ইহা মানুষের খাদ্য ইত্যাদি। মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি মিঃ আসগর ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক কমিশনার মৌলবী খলিল আহম্মদকে কারখানার খবর জানিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব কারখানা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"The factory to be started is meant for manufacturing adulterated Ghee made up of ground-nut oil and fat of animals such as kine, goat, swine, sheep, even snakes and lizards and the applicant admitted that the product is made for human consumption.

"অর্থাৎ এই কারখানা ভেজাল ঘৃত প্রস্তুতের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ঘৃত চিনাবাদামের তৈল ও গরু ছাগল শূকর, ভেড়া এমন কি সাপ ও টিকটিকির চর্ব্বি সহযোগে প্রস্তুত হইবে। দরখাস্তকারী স্বীকার করিয়াছে যে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই উহা প্রস্তুত করা হইবে।" একথা শুনিলে কি কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয় না? মৌলবী সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

The process necessitates the accumulation of big pieces of large quantities of cattle bones for producing marrow which is mixed with the concoction to give it a granulated appearance of Ghee.

অর্থাৎ...প্রাণিসমূহের অস্থির অন্তর্বর্ত্তী মজ্জা মিশাইলে চর্ব্বির মধ্যে খাঁটী ঘৃতের মত দানা বাঁধে, সুতরাং কারখানার ভিতর অনেক হাড় মজুত রাখিতে হইবে। বুঝুন ব্যাপার

(চর্ব্বি) মিশিয়া হবিষ্য শুদ্ধ করিতেছে। ইহাতে আমাদের দৃক্‌পাত নাই। কিন্তু আমাদেরই—দেহের দেহ, প্রাণের প্রাণ নিম্নস্তরের হিন্দুর জল ব্যবহার করিতে আমরা ইতস্ততঃ করি। দোকানের কারি, চপ্‌, রোষ্ট কাট্‌লেট, কোর্ম্মা, কোপ্তা, ডিম মামলেট উচ্ছিষ্ট পাত্রে উচ্ছিষ্ট স্থানে ছত্রিশ জাতির সহিত একাসনে বসিয়া 'উড়াইতে' আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, যত দোষ কেবল পরিচয় পাইলে। "ডুব দিয়া জল খাইলে একাদশীর পিতামহও টের পায় না।"

"আমরা আর পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনে সামাজিক ব্যবহার, সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আজকাল এমন এক বাতাস বহিতেছে যে হিন্দু সমাজের হিতৈষী ক্ষমতাশালী পরিচালকগণ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রব্যবসায়িগণ সুবিচার করিয়া নিম্ন শ্রেণীকে কিছু কিছু অধিকার প্রদান না করিলে ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। এই সকল অধিকারের মধ্যে আমাদের মতে সর্ব্ব প্রধান অধিকার 'জলচল'।* (সুবর্ণবণিক, রাজবংশী, মাহিষ্য, সাহা, সচ্চাষী, যোগী কাপালী, নমঃশূদ্র, মালী, সূত্রধর, ঝালমাল প্রমুখ অনাচরণীয় ভ্রাতৃগণকে জলচল ও আচরণীয় করিতে হইবে।) সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একটা একতা বন্ধন স্থাপন করিতে হইলে, হিন্দু জাতির সাধারণ উন্নতির জন্য সকল শ্রেণীর

কিরূপ গুরুতর! আজ কাল কলিকাতার বাজারে সাধারণতঃ যে ঘৃত পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই এই জাতীয়, অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘৃতের নামে অসঙ্কোচে গরু শূকরের চর্ব্বি গলাধঃকরণ করিতেছেন। ২৯শে চৈত্র ১৩২১ সাল। বঙ্গবাসী।

* নিম্নস্থ জাতিব্যূহকে উন্নত করিতে হইবে। "মানুষের প্রদত্ত জল মানুষে পান করে না" এই প্রকার অনৈসর্গিক ব্যবহার আর কতদিন ভারত সহ্য করিবে। সকলকেই আমরা জলচল করিয়া লইব। কায়স্থ এই বিষয়ে অগ্রগামী হইবেন। অর্থাৎ কায়স্থ প্রতিভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেবশর্ম্মা বি, এ, লিখিত পাদটীকা...আষাঢ় ১৩২১।

সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইলে আচরণীয় ও অনাচরণীয়, উচ্চ নিম্ন সকল বর্ণের হিন্দুর মধ্যে উদ্যম, চেষ্টা, সাধনা, অভিপ্রায় ও ইচ্ছা শক্তির যোগ চাই। তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমিও তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি আমাকে ছোট লোক বল, আমিও তোমাকে ছোটলোক বলি। তুমি চরিত্র বলে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে ব্রাহ্মণ না হইয়াও আমার নিকট ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী কর এবং তৎপরিবর্ত্তে আমাকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখ আমিও তোমার চরিত্রহীনতার জন্য তোমাকে কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করি। যতদিন আমাদের সমাজে এই প্রকার দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষীর ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের একতা বন্ধন অসম্ভব। ততদিন কিছুতেই আমাদের মধ্যে একতা সার্ব্বজনীন সামাজিক জীবনের সঞ্চার হইতে পারিবে না। প্রয়োজনের তাড়নায় আমাদিগকে প্রকাশ্যে বা গোপনে অনেক বিধি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইতেছে। সময় থাকিতে সতর্ক হইয়া পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নের (ও জলচল অধিকার দানের) প্রতি মনোযোগী হইলে এবং অনাচরণীয় জাতির প্রতি সমবেদনা দেখাইয়া তাহাদিগকে সামাজিক অধিকার প্রদান করিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলে বোধ হয় পরকালে ভগবানের নিকট এবং ইহকালে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির নিকট আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব না।"*

আশার সংবাদ !

নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের যে চুম্বক দৈনিক কাগজ সমূহে বাহির হইয়াছে, তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

অস্পৃশ্যতা সমস্যা সম্বন্ধে মন্থর গতিতে দেশে একটী পরিবর্ত্তন আসিতেছে বলিয়া অনুভব করা যাইতেছে। যদিও সমস্যাটীর কঠিনতা ধর্ম্মবিশ্বাসের

* সমাজ সমস্যা...ভাদ্র ১৩২১ সাল : নব্যভারত।

সহিত জড়িত তথাপি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিরোধী মনোভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই ! ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে অসহযোগ প্রচেষ্টা আমাদের জাতির যত লোককে যতটা সজাগ করিয়াছে অন্য কোন রাজনৈতিক ও ধার্ম্মিক প্রচেষ্টা তাহা করে নাই।

বস্তুতঃ অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথার অঙ্গীভূত এবং উহার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অমানুষিক লক্ষণ বা উপসর্গ। অস্পৃশ্যতাকে বিনাশ করিতে হইলে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাকে ভাঙ্গিতে হইবে। তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথা পাশ্চাত্য দেশের শ্রেণীবিভাগের মত নহে। কারণ পাশ্চাত্য শ্রেণী বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একত্র আহার এবং ঔদ্বাহিক আদান প্রদানে ঐকান্তিক বাধা নাই। আমাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে বরং আমেরিকার শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের তুলনা করা যায়। যে কারণে আমরা আমেরিকাকে দোষ দেই, সেই কারণে আমাদের নিজেদেরও দোষ স্বীকার ও সংশোধন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। (অগ্রহায়ণ, প্রবাসী)

হিন্দু-মহাসভার প্রস্তাব

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ব্যবস্থা

বঙ্গীয়-হিন্দু-সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন :—

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে সাধুসন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রতিনিধি আগমন করিয়াছিলেন। কোহ্লাপুরের ও সারদামঠের শঙ্করাচার্য্যের সভাপতিত্বে ও উপস্থিতিতে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

সভায় অস্পৃশ্যদোষ বর্জ্জন আর শুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব পাশ পাইয়াছে। অনুন্নতগণ পাঠশালাতে ও দেব মন্দিরে প্রবেশে এবং কূপস্পর্শে যাহাতে কোনরূপে বাধা না পায়, তাহার জন্য হিন্দুসভা সকলকে অনুরোধ করিতেছেন।

বঙ্গদেশের হিন্দুসভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যাহাতে এই প্রস্তাবের রীতিমত আন্দোলন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বঙ্গদেশে যদিও দক্ষিণ ভারতের ন্যায় ভেদভাব নাই, কালী মন্দিরে, শিব মন্দিরে, সকলেরই প্রবেশ অধিকার আছে, কিন্তু যাহাতে সাধারণে বিষ্ণু মন্দিরেও প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। পূজারীরা ইহাতে বাধাপ্রদান করিলে সত্যগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। আশা করা যায় অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুসভাও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। (দৈনিক বসুমতী ২৫শে মাঘ ১৩৩০)

অস্পৃশ্যতা ও দিল্লীর হিন্দু সম্প্রদায়

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় দিল্লীর হিন্দু জন সাধারণের এক সভাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ উত্তরোত্তর কমিতেছে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সভায় বলা হইয়াছে যে, তথা কথিত নীচজাতিকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেওয়া ও এক মন্দিরে পূজা করিতে দেওয়া এবং তাহাদের ছেলেপিলেদের এক স্কুলে পড়িতে দেওয়ার সময় আসিয়াছে।

সাজাহানপুরে অপূর্ব্ব দৃশ্য
নিপীড়িত জাতির উন্নয়ন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর স্বামী জীবারাম প্রায় ২০০ চামার এবং অন্যান্য বহু হিন্দুর এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। চামারেরা শিব মন্দিরে উপাসনা করে এবং সাজাহানপুরেব কাচাকাটরা মহল্লার কূপ হইতে জল তোলে। গত ৬ই তারিখ বাহাদুরগঞ্জে চামারেরা মন্দিরে উপাসনা করে এবং কূপ হইতে

জল তোলে। ৭ই তারিখ বহু চামারের সম্মুখে পূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং চামারেরা "হর হর মহাদেব" ধ্বনির মধ্যে শিব পূজা সম্পন্ন করে। তাহারা মৃত জন্তুর মাংস আহার এবং মদ্যপান ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। (ইণ্ডিপেণ্ডেন্স)

অস্পৃশ্যতা ও গান্ধি-পুণ্যাহ

গঞ্জাম বহরমপুরের ১৯শে তারিখের খবরে প্রকাশ:—বিগত গান্ধি-পুণ্যাহে বহরমপুরের অন্ধ্র ও উৎকল জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক সভা আহূত হয়।

উৎকল কমিটী স্থানীয় অন্ত্যজ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া অস্পৃশ্য জাতিদের গ্রামে গমন করেন। সেখানে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভা হয়। উক্ত বিদ্যালয় এবং স্বরাজ্যাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জয়মঙ্গল রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। জয়মঙ্গল বাবু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও নিঃসঙ্কোচে অস্পৃশ্য জাতির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতীয় সাধু মহামণ্ডল

মাঘমেলার বিশেষ অধিবেশন

নিখিল-ভারত-সাধু মহামণ্ডলের মাঘমেলার বিশেষ অধিবেশন গত ২৯শে জানুয়ারী হইতে এলাহাবাদে আরম্ভ হইয়াছে। জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী ভারতীকৃষ্ণতীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রস্তাব হয়, যেহেতু ভারতীয় সাধুগণের বিবিধ সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না, সেই জন্য সাধুগণকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে।

ভারতের মধ্যে হিন্দুগণই সংখ্যা, জ্ঞান ও অর্থসম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দের অভাবে তাহাদের সমস্ত সদ্‌গুণই নষ্ট

হইয়া যাইতেছে। বিধর্ম্মীরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, এমন কি তাহাদের দেবমন্দিরাদিও অপবিত্র ও ধ্বংস করিতেছে। সেই জন্য মহামণ্ডল অনুরোধ করিতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে যেন সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

হদিদিগকে ক্ষত্রিয় করণ

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর অঞ্চলে হদি নামক এক জাতি বাস করে। ইহাদের নাক চেপটা, শরীর বলিষ্ঠ। কিছু দিন হইল ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় রাজা হৈহয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তবু হিন্দুসমাজ ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিতে ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, ময়মনসিংহে হিন্দুহিতৈষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিধবাদের বিবাহ দেওয়া, অবনত শ্রেণীকে উন্নত করা, অস্পৃশ্যকে আচরণীয় করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভার উদ্যোগে ময়মনসিংহ টাউনহলে ৫০০ হদিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহারা উপবীত ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ এই কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। হদিগণ যদি ক্ষত্রিয় হয়, তবে আর তাহারা মুটে মজুরের কাজ করিবে না, উচ্চ শ্রেণীর লোকের বড় অসুবিধা হইবে, এই হেতুতে ক্ষত্রিয় করণ কার্য্যে বাধা দেওয়া হইয়াছিল।

(২২শে চৈত্র ১৩২৯ সঞ্জীবনী)

অস্পৃশ্যদের জল তোলার অধিকার দান। দিল্লীর ১৩ই ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে দিল্লীর 'গাজী ভবনের' নিকটে হিন্দু-মুসলমানে একটা ছোটখাট রকমের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন হিন্দু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এক সভাতে স্থির হয় যে, বহুসংখ্যক অস্পৃশ্যকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেওয়া হইবে। এই নির্দ্ধারণানুসারে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ও 'তেজ' পত্রের সম্পাদক মিঃ ডি, গুপ্ত প্রমুখ একদল হিন্দু কতিপয় অস্পৃশ্যকে লইয়া দিল্লীর বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং তাহাদিগের দ্বারা কূপ হইতে জল তোলান। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত কালকিনি থানার প্রায় বিশ সহস্র নমঃশূদ্রের বাস। ঐ নমঃশূদ্র সমাজের কতিপয় নেতা তাহাদিগের ভিতরে কংগ্রেসের বাণী প্রচার নিমিত্ত শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস, রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন, ললিতমোহন সেন ও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে নিমন্ত্রণ করেন। সে মতে বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার মোহিনীবাবু প্রভৃতি চর ফতেবাহাদুর গ্রামে উপস্থিত হইলে স্থানীয় নমঃশূদ্রগণ তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন এবং একটি মিছিল বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ গ্রামের শ্রেষ্ঠ জোতদার শ্রীযুত রামমোহন মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যান। তথায় বহু নমঃশূদ্র উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া উপরোক্ত মণ্ডল মহাশয়ের গৃহপক্ক খাদ্য সামগ্রী দ্বারা আহারাদি সমাপন করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান সভায় যোগদান করিয়াছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই মাতব্বর নমঃশূদ্র। (আনন্দবাজার ৬।১১।১৩৩০)

সম্প্রতি দিল্লী, রাইসানায় বাল্মীকি (মেথর) আর্য্য সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে লালা লজপত রায়, স্বামী সত্যানন্দ প্রভৃতি নেতারা যোগ দিয়াছিলেন। সভায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর পার্শ্বে মেথরদিগকে বসিতে দেখিয়া লালাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি মেথরদিগকে কতকগুলি দোষের পরিহার করিতে উপদেশ দেন। বলেন, মেথররা তাহাদের দোষগুলি পরিত্যাগ করিলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা আর্য্য সমাজে যোগ দিয়া সহজেই অস্পৃশ্য উদ্ধারে সাহায্য করিতে পারিবেন। মেথরদের সমাজ সংস্কারের জন্য অনেক মেথর বক্তা বক্তৃতা দেয়। সভাশেষে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মেথরদের হাত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। (বসুমতী ৪।১১।৩০)

২০শে ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে আর্য্য সমাজের গণ্যমান্য সভ্য চেৎলানিবাসী শ্রীযুত তুলসীদাস দত্ত মহাশয়ের ৬৫নং আলীপুর রোডস্থিত বাড়ীতে তৎকর্ত্তৃক একটি সদনুষ্ঠানের সূচনা করা হইয়াছে। অস্পৃশ্য হিন্দুদিগকে জল-আচরণীয় করা ও ক্রমশঃ তাহাদিগকে সদাচারী করা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। শিবচতুর্দ্দশী আর্য্যসমাজের একটি স্মরণীয় পবিত্র দিন। পূর্ব্ব হইতেই নিকটবর্ত্তী কয়েকজন ভদ্রলোকের অনুমোদনে তুলসীবাবু স্থানীয় ধোপাদিগকে ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহ্বান করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাসময় ধোপীগণ বালকবালিকাসহ প্রায় ২৫জন সমবেত হইলে উপস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক ও নবশাখগণ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও সভায় একাসনে বসাইলেন। কালীঘাটের শ্রীযুত হরিদাস হালদার মহাশয় ও তুলসীবাবু শাস্ত্রসাহায্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। আমরা নিজেরা নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগকে সমাজে দাবিয়া রাখিয়াছি তাহার ফল যথেষ্ট ফলিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ ধোপীরা তুলসীবাবুর সদনুষ্ঠানের ও সদভিপ্রায়ের জন্য বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আহ্লাদে প্রতিশ্রুত হইল যে, তাহাদের স্বজাতীয়দিগকে নৈতিক উন্নতি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে এবং নিজেদের বৃত্তি রক্ষা করিয়া যাহাতে সমাজে সঙ্কোচভাবে না থাকিতে হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ইহাও ধার্য্য হইল যে, মধ্যে মধ্যে এরূপ মেলামেশা করিবার সুযোগ উভয় পক্ষ হইতে করা হইবে। তুলসীবাবুর বাড়ীতে প্রস্তুত পাকান্ন ধোপী-দিগের হাতদিয়া তাহাদের ও ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিতরিত হইলে সকলেই আনন্দ-সহকারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। (বসুমতী)

লালা লজপত রায় নিম্নলিখিত বাণীটী প্রচার করিয়াছেন :—ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সমূহের অন্যতম সমস্যা হইল নির্য্যাতিত সমাজের উন্নতি বিধান করা। অনুন্নত সমাজের উন্নতি বিধান ব্যতিরেকে স্বরাজ লাভ অসম্ভব না

হইলেও খুব যে কষ্টসাধ্য, তাহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি এই যে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের ভাব, নর নারায়ণের প্রতি এই যে নির্ম্মম অবিচার, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা-দানব ভারতের এক প্রধান অঙ্গকে নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে। অসাড় করিয়া একেবারে ভারতদেহ হইতে বাদ দিয়া রাখিয়াছে, ইহাই হইল সমগ্র হিন্দুজাতির তথা ভারতের অনপনেয় কলঙ্কের একমাত্র নিদর্শন; বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানকে সংগঠন-মূলক কার্য্যের অন্যতম অংশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে চেষ্টাও যথেষ্ট করিতেছেন। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতের হিন্দু মহাসভার কৃপাদৃষ্টিও সম্প্রতি এই নির্য্যাতিত সমাজ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধর্ম্মসংস্কারকগণও এ বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। যাহাতে এই মহাকার্য্য আরও বিস্তৃতভাবে সম্প্রসারণ লাভ করিতে পারে এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের সে বিষয়ে তৎপর হইতে হইবে। আমি এখন বিলাত চলিয়াছি, আমার এই ভারত ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপদেশ অনুসারে এবং পবিত্র হিন্দু মহাসভার শুভ ইচ্ছার প্রেরণায় আমি উক্ত মহাকার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে একটী কমিটি গঠন করিয়া যাইতেছি। এই কমিটি ১লা এপ্রিল তারিখে আম্বালা হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এবং প্রতি মাসেই লাহোরে ইহাদের একটী করিয়া অধিবেশন হইবে। এই মহাকার্য্য পরিচালনার জন্য কোন মহাপ্রাণ ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়াছি, এবং ইহাতেই আমার যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আমি আমার দেশবাসীর সর্ব্বসাধারণের নিকট এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। (হিন্দুস্থান)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ষ্টেট কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া তার পাঠান হইয়াছে।

অস্পৃশ্য জাতিদিগের যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য সত্যগ্রহ করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করিবার জন্য এবং কেবল রাস্তার বাধা নিষেধ নহে পরন্তু কূপ, জলাশয় ও দেব মন্দিরে যাহাতে ইহাদের উপর কোন বাধা-নিষেধ বজায় রাখা না হয়, তাহার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে। এই গ্রেপ্তারে হিন্দুধর্ম্মের উপরেই আঘাত দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু সভার ব্রাহ্মণগণ আশা করেন যে, অস্পৃশ্য জাতিদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজপরিবার সচেষ্ট হইবেন। অন্যথা হিন্দুধর্ম্মের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে। (হিন্দুস্থান)

ভগবৎ কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও জলচল আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। বাংলা দেশের পাবনা জেলার নানা স্থানে এই আন্দোলন বিশেষ ভাবে চলিতেছে। গত শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে (১৩৩০) চাটমোহরের নিকট-বর্ত্তী হাট-মোহিনীগঞ্জে রাজসাহীর জমিদার 'জন সেবক' সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ বিশী এম এ, বি এল মহাশয় উদ্যোগী হইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করেন। নমঃশূদ্র প্রতিনিধিগণের সংখ্যা সহস্রের উপর হইয়াছিল। সভা অন্তে স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এবং সভাপতি শৈলেশবাবু সমবেত নমঃশূদ্রগণের জল পান করেন।

গত ২৭শে মাঘ কাওরাইত ষ্টেসনে (ঢাকা) ময়মনসিংহ হিন্দু-হিত সাধিনী সমিতির চেষ্টায় এক সহস্রের উপর কোচ বা খস ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে এবং ময়মনসিংহের হিত-সাধিনী সমিতির পরিচালক ও নেতৃবর্গ তাহাদের জল পান করিয়াছেন ও শ্রোত্রীয় নাপিতগণ ক্ষৌরী কার্য্য করিয়াছেন। পাবনা জেলার সলপ গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারবর্গ হিন্দুসভা করিয়া নমঃশূদ্র ভ্রাতাদের বাটী গিয়া জল যোগ করিয়াছেন।

গত ৩রা চৈত্র রবিবার বৈকালে স্থল (পাবনা) শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী

সভা প্রাঙ্গণে স্থানীয় স্থলসমাজস্থ হিন্দুগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির পদে আসীন হইলে সিরাজগঞ্জে আগামী প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় সর্ব্ববঙ্গ হিন্দু সভার অধিবেশন আহ্বান করা সঙ্গত বিবেচিত হয়। অতঃপর স্থানীয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সমিতির নায়ক শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন রায় তামাই গোপালপুর অঞ্চলে প্রায় ২০০০ দুই হাজার নমঃশূদ্র খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত—এই বিষয় স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া তাহাদের রক্ষাকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সভ্যগণ কর্ত্তৃক উহা সাদরে গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুত ফণীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব কয়টি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য সমাজকে অনুরোধ করেন ও তাহা অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। অনাচরণীয় জাতি গৃহাদিতে প্রবেশানন্তর আহার্য্য স্পর্শ না করিলে তাহা নষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

২। যদি কেহ অনাচরণীয়গণের হস্তে জলপান করে, তবে তাহাকে সমাজে দণ্ডিত করিতে পারা যাইবে না।

৩। নরসুন্দরগণ সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে ক্ষৌরী করিবেন, ইহাতে তাঁহারা কোনওরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইবেন না।

৪। এক কূপ হইতে হিন্দুমাত্রেই জল ব্যবহার করিতে পারিবেন। সর্ব্বশ্রেণীকে পরস্পর জলচরণীয় করার প্রস্তাবটি নিখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার অনুমতি স্বপক্ষে স্থগিত থাকে ও একমাস কাল মধ্যে তাঁহাদের অনুমতি পাইবার প্রার্থনা করা হয়। সর্ব্বশেষে বিভিন্ন গ্রাম হইতে যোগ্য নেতৃস্থানীয় ২৫ জন ব্যক্তিসহযোগে একটি কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠিত হয়। ঐ সঙ্ঘ এক মাস মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার সভ্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন ও সেই সভায় জলাচরণীয় বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে। হিন্দুস্থান ১৬ চৈত্র ১৩৩০।

বহুদিন যাবৎ আমরা নমঃশূদ্রাদি জাতির মধ্যে একটা মহা চাঞ্চল্যের ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। তাহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তাহাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ও ঘৃণা। অশিক্ষিত পদদলিত অন্ত্যজ জাতি ব্রাহ্মণাদির মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিরাশ হইয়াছিল। পদে পদে তাহারা তিরস্কৃত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। কয়েকটি অন্ত্যজ হিন্দুসন্তান পাদ্রিদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ও প্রলোভিত হইয়াছিল, তাহারাই সমস্ত অন্ত্যজকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন অনুপ্রাণিত করিতেছিল। বিষয়টি ক্রমে জটিল হইতে থাকে। উপর্য্যুপরি আমরা ৩।৪ খানা পত্র পাইয়া গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ রওনা হই। বুধবারে প্রাতে সিরাজগঞ্জ পৌঁছাই। সেই দিন তিনটি সভায় ঐ সকল বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার চলে। উভয় পক্ষের নানা প্রকার শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেশাচার সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গের পর, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঐ সকল অন্ত্যজকে জলচল করা, ধোপা ও নাপিতের বন্দোবস্ত করা ও নানাপ্রকার সহানুভূতি প্রদর্শনই আমাদের উচ্চবর্ণের উপস্থিত কর্ত্তব্য! ঐ দিবস স্থির হয়, ১৩ই এপ্রিল রবিবার চৈত্র সংক্রান্তির দিবস গোপালপুর নামক নমঃশূদ্র প্রধান গ্রামে এক সভা হইবে। তথায় আমরা উক্ত প্রস্তাবের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করিব। পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামে পত্রপ্রেরণ ও লোক মারফতে খবর পাঠান হইল। চৈত্র সংক্রান্তির দিবস সদলবলে "জানতৈল" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম হইতে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের স্বাগত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার পতাকা হস্তে যুবক, বালক প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিল। আমরা সমস্বরে 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়', বলিয়া রওনা হইলাম। প্রায় ১২টার সময় আমরা উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া তাহাদের সকল প্রকার

অভাব অভিযোগ শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে হৃদয় বাস্তবিকই করুণ রসে ভরিয়া যাইতে লাগিল,—"আমরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের আমরা কিছুই জানি না, আমাদের কেহই সে বিষয়ে শিক্ষা দেয় না। একই কূপ হইত ব্রাহ্মণ মুসলমান জল লয়, কিন্তু আমরা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত। আমরা ধোপা নাপিত পাই না, কাহারও বাটিতে যাইলে ঘৃণাভরে তাড়াইয়া দেয়। আমাদের ছেলেরা বোর্ডিংএ স্থান পায় না, ব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট চাকরি পায় না, আমাদের ব্যথার ব্যথী কেহই নাই, আমাদের কোথাও আশ্রয় নাই। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। এই প্রকার নিরাশ্রয়ে সহানুভূতি শূন্য হইয়া কোন অশিক্ষিত জাত কতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আশায় আশায় মৎস্য প্রত্যাশী বকের ন্যায় বহুকাল চলিয়া গিয়াছে, আমাদের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইল না, তাই আমাদের মধ্যে এই চাঞ্চল্য।"

প্রায় বেলা ৩টার সময় সভা আরম্ভ হইল। শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বৈদ্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। অন্ত্যজ জাতিতে সভা পূর্ণ হইয়া গেল। সভায় প্রফেসর নাইডু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র দত্ত, শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বামী করুণানন্দ প্রভৃতি বক্তৃগণ মহাসমন্বয়ের প্রবাহ চালাইতে থাকেন। নমঃশূদ্রদের জনৈক প্রতিনিধি যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টান হইবার পক্ষে ছিলেন এবং যাঁহারা বাস্তবিই হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় ছিলেন, তাহাদের উভয়পক্ষের কথা শুনা হইল। তৎপরে রাত্রি ৯টার সময় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাঁহাদের হস্ত হইতে জল মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করা হইল এবং "জয়, গুরু মহারাজ কি জয়" শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেবল দুইটি ভদ্রলোক জলগ্রহণ করিতে অমত করিলেন, কিন্তু অভিভাবকদিগের অজুহত তুলিয়া জানাইলেন যে যাহারা জলগ্রহণ করিবে তাহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং তাহারা

ভবিষ্যতে কোন বিরোধী হইবেন না। স্বামী করুণানন্দ। (দৈনিক বসুমতী বৈশাখ ১৩৩১)

ভাই হিন্দু, আর ঘৃণা করিও না। সাত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার অপমান ভোগ করিয়াও—বুঝিবা গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। আর পাপ বাড়াইও না। সাত শত বৎসরের বিদেশী বিজাতি বিধর্ম্মীর লাথি জুতায় যাহাদের জাত যায় নাই—স্বদেশী স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী অনুগত সরল সেবক ভাইদের জল পানে সে জাত যাইবে না। গোলামের আবার জাতি বংশ বিদ্যা ধনের গর্ব্ব কিসের। জাতি কুল মান ইজ্জৎ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মিথ্যা সামাজিকতা ও ঝুটা ব্যবহারিকতা ত্যাগ কর। জাতির অভিমান মহাপাপ। এই মহাপাপ যতক্ষণ, যত দিন থাকিবে ভগবৎ ভক্তিতে ততদিন বঞ্চিত থাকিবে। এই জাতির মিথ্যা অভিমান ত্যাগ হইয়া সেই মাত্র সর্ব্বজাতিতে বা প্রাণীতে সমবুদ্ধি আসিবে—তখনই এ জাতির উদ্ধার তখনই তুমি দুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কলি পাবনাবতার প্রেমসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীমুখে বলিতেছেন :—

প্রভু বলে যে জন [redacted] অন্ন খায়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্ব থায়॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত খণ্ড।)

সমাপ্ত

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার

"—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা ;
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"—

রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ,

মহোদয় কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত।

"জাতিভেদ" "চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ", "জলচল ও স্পর্শদোষ-বিচার" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩২২।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা শাস্ত্র-সঙ্গত অধিকার আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক এই অংশ প্রথমে পাঠ করিবেন। দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রে অত্যুদার মতের অসদ্ভাব নাই। ইহাই প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, বহুতর অনুদার ব্যবহার ও পুরাকালোচিত ব্যবস্থা, হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থে ঢুকিয়া গিয়াছে। এই সকল অংশ ধর্ম্ম প্রতিপাদক নহে, ইহারা ব্যবহার শাস্ত্র মাত্র। এই সকলে শূদ্রাদির বহুতর নিন্দা আছে। সাধারণ লোকে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের এই দুই অংশকে পৃথক্ করিতে না পারিয়া মনে করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মই শূদ্রকে শালগ্রাম পূজা এবং বেদপাঠে অধিকার দেন নাই।

আজকাল বঙ্গদেশে যাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের দেব-পূজাদিতে অধিকার গোঁড়া হিন্দুদেরও অননুমোদিত হইবার কারণ নাই।

নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বড় অর্থাৎ দ্বিজ করিতে হইলে উহাদের জন্য সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত চাই। উহাদিগকে কেবল লেখাপড়া শিখাইলে অনর্থ বাড়িবে বই কমিবে না; উহারাও কেরানী হইয়া, অসন্তুষ্ট চিত্তে, রুগ্ন শরীরে, সমাজের বক্ষে নূতন ব্রণ রূপে বিরাজ করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেরই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা ভগবানের নিয়ম। জমীদার উকিল হাকিম ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমৃদ্ধগণের পুত্রদেরও রান্নাবাড়া, ঘরামির কাজ, ছুতারের কাজ

মাটিকাটা, কাঠ-ফাড়া, কোদলান প্রভৃতি অভ্যাস করা উচিত। উহাতে শরীর ভাল থাকিবে, মন সতেজ হইবে। আকস্মিক বিপদে এই অভ্যাস পরম সুহৃদের কাজ করিবে। দেশে যে সকল সরকারি ও বে-সরকারি পুরাতন বিদ্যালয় আছে, তাহাতে এইরূপ "গা খাটানর" রীতি প্রবর্ত্তন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু অন্ত্যবর্ণদিগের জন্য দেশ-প্রেমিকেরা যে সকল নূতন বিদ্যালয় খুলিতেছেন, তাহাতে প্রথম হইতেই এই মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণাদি জাতীয় শিক্ষকগণ যদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, অন্ত্যজ বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে, হাতে কলমে, পরিশ্রমের কাজ করেন, তাহা হইলে, ঐ সকল বালকের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ হইবে। স্কুল গৃহের নির্ম্মাণ ও সংস্কার ছাত্র শিক্ষকে একত্র হইয়া সম্পাদন করিবেন, একত্রে গোপালন করিবেন। স্কুলে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ও মহাপুরুষদিগের চরিত অধ্যাপিত হইবে। স্কুলে লাইব্রেরী, ম্যাপ, এট্লাস্, গোলক থাকিবে; খন্তা, কুড়াল, কোদাল, দা, করাত, বাটুল, হাতুড় থাকিবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের কৃত কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থে স্কুলের উন্নতি হইবে। এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে, অন্ত্যজেরা ক্রমে দ্বিজ হইয়া বেদপাঠে যথার্থ অধিকারী হইতে পারিবে। নতুবা সামাজিকেরা মুখে অধিকার দিলেও সে অধিকারের কেহ সদ্ব্যবহার করিবে না।

যখন বৈদিক ভাষা কথ্য ভাষা ছিল, তখন স্ত্রী শূদ্রে বেদ পড়িতে, এমন কি, মন্ত্রাদি রচিতেও পারিতেন (১০৯—১১১ পৃ)। বহু শতাব্দী পরে, ঐ বৈদিক ভাষা অচল হইয়া দাঁড়াইল। তখন ব্রাহ্মণেরা, বহুতর পরিশ্রম করিয়া, প্রাচীন বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতেন। আবার তখনই দয়ালু ঋষিগণ সাধারণ লোকের জন্য, লৌকিক সংস্কৃতে মহাভারত, রামায়ণ,

স্মৃতি, পুরাণ রচনা করিলেন। এই সকল গ্রন্থে বেদের সার উপদেশ সকল নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পড়িলে, বেদের সার কথা কিছুই অজানা থাকে না। এই যুগে স্ত্রী শূদ্রে বেদ পড়া ছাড়িয়া দিলেন। কিছুকাল পরে, সমাজের অনুদার মূঢ়চিত্ত নেতারা বলিলেন, স্ত্রী শূদ্রের বেদ পড়িলে পাপ হইবে। এটা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। এটা ব্যবহার শাস্ত্র। পরে যখন লৌকিক সংস্কৃতও সাধারণের অবোধ্য হইল, যখন সাধারণ স্ত্রী শূদ্রেরা নিজেই পুরাণাদি পাঠ ছাড়িয়া দিলেন, তখন আবার কতকগুলি অবুঝ লোকে রব তুলিল, স্ত্রী শূদ্রে গীতা চণ্ডী প্রভৃতিও পড়িতে পারেন না। এটাও শাস্ত্র নহে। অবশ্য অনুষ্টুভ্ ছন্দোবদ্ধ হইয়া এ সমস্ত অশাস্ত্রীয় কথা শাস্ত্র গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত বাক্য মাত্রই শাস্ত্র নহে।

সকল দেশেই সাব্‌মার্জড্ ক্লাস্ (Submorged class) আছে এবং সব দেশের সাবমার্জড্ ক্লাসই লেখা পড়ায় বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অন্যান্য দেশে তাঁহারা লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত কাহারও কাহারও চৈতন্য লাভ হইবে।

গৌহাটী কলেজ।
১০ই আশ্বিন ১৩২২

শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী

প্রথম সংস্করণের নিবেদন।

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অভিসম্পাৎ লইয়া—"শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার" প্রকাশিত হইল। শতকরা ৯৭ জন লোককে "স্ত্রী শূদ্র" বলিয়া কল্পিত নামে অভিহিত করতঃ দেবালয়ের মন্দির ও বেদ নামক জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে স্মরণাতীত কাল হইতে বঞ্চিত করিয়া আসা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সকল ঘৃণিত বৈষম্য ও ভেদ বুদ্ধির মুল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যাহা পাইয়াছি—তাহাই লইয়া বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। কোনরূপ নীচ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই,—সমাজের সেবা ও কল্যাণ সাধনা করার উদ্দেশ্যেই ইহার প্রণয়ন ও প্রচার। কে রুষ্ট হইবেন বা কে তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিলে আর পুস্তক প্রকাশ করা চলেনা। দেশের হিত চিন্তা, সমাজের কল্যাণোদ্দেশ্যে কাজ করিতে চেষ্টা করা বা দেশের সেবা করা কাহারও একচেটিয়া কার্য্য হইতে পারে না। আপামর সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। এখানে উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মুর্খ, যোগ্য অযোগ্য, সকলেরই অবারিত দ্বার। আমি ক্ষুদ্রশক্তি—নগণ্য হইলেও, মাতৃভুমির সন্তান; কাষ্ঠ বিড়ালীর কার্য্যে আমার নিশ্চিতই অধিকার আছে। সমাজের এই দুর্দ্দিনে এই পুস্তক লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সমাজের মনস্বীবর্গ একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিবেন, তার পর যাহা হয় কোটীকল্পকুম্ভিপাক বা গৌরবের ব্যবস্থা করিবেন। সে জন্য আমার অনুমাত্র ভয় বা দুঃখ নাই। "জাতিভেদের" তীব্র কষাঘাতে দেশবাসীর সাড়া পাইয়াছি। তীব্রভাষা তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রয়োগ ভিন্ন সমাজের বহু শতাব্দী-সঞ্চিত ও সঞ্চারিত নালিঘার দোষ বিনষ্ট হইবার নহে। রোগীর ক্ষণিক যন্ত্রণা ও বিষাদমাখা দুঃখ সন্তাপ সন্তপ্ত মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া কোনও বিজ্ঞ সুহৃৎ ও চিকিৎসক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের ক্লেদ

পুঁজ বদরক্ত মালিন্য দূর হইবার নহে। তাই ইহার ভাষাও মধুর করিতে পারি নাই। পাঠকগণ, উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া লেখককে তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

যাঁহাদের লেখনী হইতে আমি এ পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। এই পুস্তক প্রচারে একটী ভাইএরও যদি শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর হয় এবং একটী ভগবৎসন্তানও যদি শাল গ্রামাদি শ্রীবিগ্রহ পূজার ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে সপ্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সাহসী হন, শুনিতে পাই, তবেই আমার স্বজাতীয়গণ প্রদত্ত কালাপাহাড় উপাধি, অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইবে মনে করিব।

প্রুফ্ দেখার দোষে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণ দোষ ও ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের এ পুস্তক ভাল লাগিবে, তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক আপন আপন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচারে মনোযোগী হইয়া লেখকের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অভিমত লিখিয়া লেখককে পরবর্ত্তী পুস্তক গুলির প্রচারে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন। কিমধিকমিতি।

পোঃ—সিরাজগঞ্জ
গ্রাম—কাওয়াকোলা
শ্রীশ্রীবংশীবদন
কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গন
বৈশাখ—১৩২২

বিনয়াবনত—
শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

শ্রীভগবানের কৃপায় পরিবর্দ্ধিত আকারে 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর হইল ১ম সংস্করণের সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে ২য় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। ২য় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করার জন্য মূল্যও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকও পাঠক বর্গের তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হইবে। যাঁহাদিগের ভাল লাগিবে—তাঁহাদিগকে ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া এ পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয়ও ঋণের টাকায় নির্ব্বাহ হইল। ২য় সংস্করণের মুদ্রণেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল, পাঠকগণ সে দিকে লক্ষ না করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন—ইহাই অনুরোধ। স্থানাভাবে এবারও প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা বলিতে পারিলাম না; ভগবৎ কৃপায় তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে বিস্তৃত ভাবে সমুদয় বলিবার ইচ্ছা রহিল। যে সমস্ত হিতৈষী বন্ধুবর্গের উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও সহায়তায় পুস্তক প্রকাশিত হইল তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সিরাজগঞ্জ; শ্রাবণ ১৩৩১।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার।

অবতরণিকা।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" হে শূদ্ররূপ মনঃ কল্পিত আখ্যায় অভিহিত অমৃতের পুত্রগণ, স্বর্গচ্যুত দেবনন্দনগণ, দিব্যধামবাসী জ্যোতির তনয়গণ, কন্যাগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উঠ জাগ্রত হও। কুম্ভকর্ণের মত কতকাল আর তোমরা আপনার স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া মোহ-নিদ্রায়,—মূর্খতা ও অজ্ঞানতার ঘোর আলস্যে অচেতন থাকিবে? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, জগতের কি মহাপরিবর্ত্তন, কি বিচিত্র জাগরণের সঞ্চার হইয়াছে! উনবিংশ শতাব্দী জগতের সমুদয় আলস্য, জড়তা, নৈরাশ্য, মোহ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ক্লীবতা, কাপুরুষতা, ভয়, ডর লইয়া অপসৃত হইয়াছে। অমানিশার সুদীর্ঘ রজনীর অবসান হইয়াছে। নবযুগের বার্ত্তা লইয়া, নবীন প্রাণ-স্পন্দন লইয়া, নূতন সঞ্জীবনী শক্তি লইয়া, বিংশ শতাব্দীর সুপ্রভাত আগমন করিয়াছে। ইহাকে সাদরে হৃদয়-মন্দিরে বরণ করিয়া লও। জাগরণের নব-সূর্য্য বিগত শতাব্দীর তিমিরাবরণ ভেদ পূর্ব্বক প্রকাশমান হইয়াছেন। তাহার স্বর্ণকরোজ্জ্বলে সমুদয় জগত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের মঙ্গল মধুর কাকলী ধ্বনিতে, গিরিনিস্যন্দিনী স্রোতস্বিনী তটিনীর কুলু কুলু নাদে, মৃদুমন্দমারুত হিল্লোলে, সমুদ্র কল্লোলে নব-জাগরণের উচ্চ-কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে—কিন্তু তুমি শূদ্র কি এখনও তন্দ্রাবিজড়িত নেত্রে কালশয্যায় মোহ-ঘুম-ঘোরে অচেতনই থাকিবে? প্রাভাতিক সঙ্গীত এখনও কি তোমার

শ্রবণ যুগলে পঁহুছিবে না ? বিশ্বপিতা ভগবানের প্রেমের আহ্বান, স্নেহ-বিজড়িত "উঠ জাগ" ধ্বনি এখনও তোমার শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিবে না ? উষার আলোক সারা বিশ্ব আলোকিত করিয়াছে, সরোবরে মুদ্রিত নলিনী চক্ষু মেলিয়াছে, অরণ্যে বিবিধ প্রকার মধুপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সকলেই জাগ্রত হইয়াছে, উত্থিত হইয়াছে, আর তুমি ? তুমি শুধু সুষুপ্তির ক্রোড়ে এখনও অচেতন ! সকলেই জাগিয়াছে, সকলেই উত্থিত হইয়াছে, সকলেই আপন আপন সমাজের উন্নতি সাধনে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমার আলস্য জড়তা তন্দ্রা নিদ্রা এখনও ভাঙ্গিল না ! তোমার উত্থানের সময় এখনও হইল না। অথবা তুমি কি ব্রাহ্মণাদি অভিজাতবর্গের স্বভাবসুলভ বৃথা আস্ফালনে, ভ্রুকুটী-সঞ্চালনে ভীত হইয়া পড়িয়াছ ? ব্রাহ্মণগণের বিশ্বত্রাসী অভিসম্পাতের ভয়ে, কলির দেবতার ক্রোধ ও বিরাগ উৎপাদনের ভয়ে, পরলোকে অনন্ত নরকের ভীতি বাক্যে কিম্বা "আশা নাই" জাগিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারিবে না" মনে করিয়া তুমি কি হতাশ প্রাণে নিমীলিত নয়নে আপনি আপনার মৃত্যু-শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছ ? ঐ যে কায়স্থ উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সমাজের শরণাপন্ন হইল, ঐ যে বারেন্দ্র সাহা বৈশ্য হইতে যাইয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইল, সমস্ত জাতির সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িল দেখিয়া তুমি কি শরীর ছাড়িয়া দিয়াছ ? আর কিছুতেই সামাজিক অধিকার লাভের আশা নাই, শূদ্রত্ব পরিহারের সম্ভাবনা নাই, দ্বিজত্বলাভের ভরসা নাই, মনে করিয়া সত্যই কি তুমি হাল ছাড়িয়া দিয়াছ ? কিন্তু হে সর্ব্বশক্ত্যাধার হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত, পরন্তু অবজ্ঞাত মেরুদণ্ড শূদ্রজাতি, আমরা যে তোমার শক্তি সামর্থ্য বল বিক্রম তেজঃ বীর্য্য প্রভাব ধৈর্য্য ভালরূপেই বিদিত আছি। হে হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষ ! "তোমার

মস্তক উত্তোলনে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র কক্ষ পরিভ্রষ্ট, পদপরিচালনে ভূ-কম্পন ও বাহু প্রসারণে ত্রিদিবত্রাস হাহাকার উপস্থিত হয়। আমরা জানি, তুমিই বেদান্তের ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান অখণ্ড অদ্বৈত পুরুষ মর্ত্ত্যভূমে লীলাচ্ছলে জীবদেহ, মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছ। কে বলে তোমরা শূদ্র, হীন নীচ অবজ্ঞাত, কে বলে তোমরা অপবিত্র অস্পৃশ্য বেদ-বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী, কে বলে তোমরা ব্রাহ্মণ-সেবক, দাস, ঘৃণিত। ঐ যে আমার বেদান্ত বলিতেছেন—"তোমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান, তোমার মধ্যে সর্ব্ববিধ আনন্দ সর্ব্বব্যাপিত্ব শক্তি কল্পনাতীত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে তুমি কেন বৃথা ভয়ে বিচলিত হও? কস্তুরী-মৃগনাভির ন্যায় তুমি তোমার সৌরভ না জানিলেও আমরা তোমার সৌরভ, তোমার মূল্য বিলক্ষণই অবগত আছি। ভয় কি? তোমার যে "জন্ম নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, তোমাকে যে তরবারি ছেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না। তুমি যে অনাদি অনন্ত জন্ম কর্ম্ম রহিত অচল, অটল, অস্পার্শ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান।" তুমি যে অমৃতের সন্তান, অমৃতের অধিকারী। উঠ জাগ, কর্ম্ম-প্রাঙ্গণে প্রকৃত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হও। উঠ শূদ্র, একবার আত্মশক্তির বিকাশ কর, জীবাত্মার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভীমবলে সামাজিক দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেল। কেশরী সন্তান হইয়া মেষের ন্যায় অবস্থান করিতেছ কেন? একটি গর্ভবতী সিংহী ছিল, একদা শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া সে দেখিতে পাইল, একদল মেষ রহিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ সেই মেষদলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল, ঐ চেষ্টায় তাহার দেহ ত্যাগ হইল ও একটী মাতৃহীন সিংহ শাবক

জন্ম গ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনের ভার লইল এবং মেষপালের সহিত একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়া মেষগণের ন্যায় তৃণ গুল্ম লতা পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে ও মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হইবার পর যদিও সে একটী রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি নিজকে সে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন পর একদা আর একটী প্রকাণ্ড-কায় সিংহ শিকার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইল যে, ঐ মেষপালের মধ্যে একটী সিংহ রহিয়াছে এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখিবা মাত্রই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহটী উহার নিকটে যাইয়াও সে যে সিংহ, মেষ নহে, বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি মেষদলের সঙ্গে সঙ্গে মেষ-সিংহও পালাইয়া যাইতে লাগিল। সে দিন আর সে তাহাকে ধরিতে পারিল না, কিন্তু মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে কি করে, স্নেহপরবশ হইয়া লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। সিংহটী দেখিবামাত্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল ও বলিল, 'তুমি মেষ নও—সিংহ'। মেষ-সিংহটী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমি মেষ, সিংহ নহি।' সে কোনমতে বিশ্বাস করে না যে সে সিংহ, বরং সে মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া লইয়া একটী জলাশয়ের ধারে গমন করিয়া বলিল, "এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব"। তখন সে এই দুইটীর সহিত তুলনা করিয়া একবার নিজের ও একবার সিংহের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এই ধারণা জন্মিল যে 'আমি সিংহ'। তখন সে সিংহগর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার মেষবৎ

চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা অযথা ভ্রান্তিবশে নিজকে মেষ ভাবিয়া পড়িয়া আছ, নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু তোমরা মেষ নহ—"সিংহ স্বরূপ—তোমরা আত্মা শুদ্ধ স্বরূপ অনন্ত শক্তিধর ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতরে। হে বীর, কেন রোদন করিতেছ? তুমি যে মৃত্যুর অতীত, তোমার দুঃখ কষ্ট কিছুই নাই। তুমি অনন্ত আকাশ স্বরূপ, শ্বেত কৃষ্ণ ধূসর পীত নীল লোহিত নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, মুহূর্ত্ত মাত্র খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে, কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে। উহার আর পরিবর্ত্তন নাই।" অজ্ঞানতার কৃষ্ণমেঘ অপসারিত কর, জ্ঞানসূর্য্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তুমি যে জ্ঞানসূর্য্য, কে তোমাকে আবৃত করিয়া রাখিতে সমর্থ? দিবার আলো প্রকাশ কর, দুর্ব্বলতা কুজ্ঝটিকা-তিমির মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। জ্ঞানাগ্নি জ্বালাইয়া দাও, সে আগুনে ভীতি দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা ক্লীবতা মূর্খতা হীনতা প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক। অন্ধকার, অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিলে অন্ধকার দূরীভূত হইবে না। জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া দাও, সহস্র বৎসরের অন্ধকার গৃহ মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোকিত হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখ, বিদ্যা ও জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াই তোমাদের এদশা ঘটিয়াছে এবং এজন্য তোমরাই দোষী। ব্রাহ্মণগণ ঐহিক যাবতীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত ফল পত্র ও কাষায় কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে ঋষির আশ্রমে বেদ পাঠার্থ গমন করিলেন, আর তুমি, তুমি শূদ্র লাঙ্গল লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য ধন সম্পদ্ লইয়া মত্ত হইয়া পড়িলে! ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে, তবে কি তোমাদের এ দুর্দ্দশা

ঘটিত? জ্ঞানই শক্তি, সেই শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজের একচ্ছত্র সম্রাট, আর তোমরা সেই জ্ঞানশক্তিকে অনাদর করিয়াই জগতের পদসেবী দাস। কাঞ্চন ফেলিয়া কাচে মজিয়াছিলে, অমৃতবল্লী ত্যাগ করিয়া বিষবল্লী রোপন করিয়াছিলে। জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে অন্ধ হইয়া আঁধারে হাত বাড়াইয়াছ, পথ থাকিলেও পথ দেখিতে পাও নাই। যন্ত্র যেমন নিজে চালিত হইতে পারে না, অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তোমরা, হতভাগ্য অন্ধ শূদ্রেরাও তেমনি সব থাকিতে শক্তিহীন অবস্থায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছ। ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে যে দিকে চালাইয়াছে, তোমরাও সেইদিকে চলিতে বাধ্য হইয়াছ। অন্ধের শারীরিক বল কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির নৈপুণ্য থাকিলেও সে যেমন উহা খাটাইতে পারে না, তোমরাও তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞান অভাবে ঐ সব শিল্প-বিদ্যার উন্নতি ও উহাদ্বারা ভারতের কোনই কল্যাণ সাধন করিতে পার নাই। তবে প্রাণ-হীন যন্ত্রের মত কাজ চালাইয়া গিয়াছ মাত্র। সুতরাং যে বিদ্যা ও জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া জগতের অধম হইয়াছ—সেই বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীবন পণে লাগিয়া যাও। মনে জানিও, জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই বল। জ্ঞানই সর্ব্ব প্রকার দাসত্ব-রজ্জু ছিন্ন করিবার একমাত্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। এই অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের জন্য হে শূদ্র জাতীয় উন্নতিকামী যুবকগণ! তোমরা দলে দলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ কর, এবং নিজেরা শিক্ষিত হইয়া পুনরায় দলে দলে চারিদিকে ছুটিয়া পর। 'Be and make' ইহাই মূল মন্ত্র হউক। নিজে বিদ্বান ও শক্তিশালী হইয়া অন্যকে তাহার অধিকারী কর। সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা যাহাকে পাও তাহাকেই এই বিদ্যাধন অকাতরে দান করিয়া দাও। এ দানে পুণ্যের সঞ্চার, সমাজের উন্নতি, ভারতের কল্যাণ এবং একটা বিরাট জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থান

হইবে। এই বিদ্যা চর্চ্চাতেই জাপান কতিপয় বৎসরেই বরেণ্য জাতি রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই বিদ্যা চর্চ্চাতেই বৃক্ষত্বক-পরিহিত আম মাংস-ভোজী আজ ধরাতলে সুসভ্য বলিয়া পরিগণিত, এই বিদ্যার মহিমাতেই জর্ম্মাণ, আমেরিকা এত উন্নত। এই বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবেই ভারতবাসী একদিন জগতের সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ ছিল ও এই বিদ্যা চর্চ্চার অভাবেই আজ ভারতবাসী এত অবনত, এত ঘৃণাস্পদ। আবার যদি উঠিতে চাও, আবার যদি মানুষ হইতে বাসনা কর, তবে অচিরাৎ বিদ্যা চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর। বিদ্যা নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল, হতাশ্বাসের আশ্বাস, ভরসাহীনের আশা। এই বিদ্যার অভাবেই আজ সহস্র সহস্র বৎসর হইল তোমরা এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, এত পদাঘাত, এত নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছ। এই বিদ্যার অভাবেই ভাই-এ ভাই-এ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্ম্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় সূত্রধর তিলি তাম্বলি সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিয়াছ।

তোমরা মূর্খ বলিয়াই ত আজ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে সমুদয় জন-মণ্ডলীর খাদ্য রূপে পরিণত হইয়াছ! স্মরণাতীত কাল হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা, তোমাদের ধন ধান্য হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া আসিতেছে। তোমাদের প্রাণ অভিজাতবর্গের হস্তস্থিত ক্রীড়নকের ন্যায় কতই মূল্যহীন। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা এ জীবিত পুতুল ভাঙ্গিতে পারেন। গিরি গাত্রে কুঠারাঘাত করিলে সে যেমন তাহাতে বিন্দুমাত্র যাতনা প্রকাশ করেনা, তোমরাও তেমনি শত শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছ। তোমাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সত্যই মনে হয়, বুঝি বা শূদ্র জাতির প্রাণ নাই, বুঝি বা ইহারা পুতুলবাজির পুতুল মাত্র। অমৃতের

সন্তান এমন শবের মত পড়িয়া আছ। তোমরা জাগিয়া উঠিয়া একবার ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ কর, সে জ্যোতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে শূদ্রত্ব ও পশুত্বের ঘনান্ধকার শূন্যে বিলীন হইয়া যাউক। উঠ উঠ বিবেকানন্দের আশার সন্তান, ঐ যে তিনি স্বর্গলোক হইতে তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের কথা দৈববাণীরূপে বলিতেছেন—"Come up, Oh lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, best and eternal, ye are not matter; ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter" ঐ শুন স্বামীজি উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিতেছেন ঃ—"Hear ye children of immortal bliss, ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, ye are divinities on earth" উঠ জাগো—সমাজে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ কর! সাহসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠ, সাহসই পুণ্য, দুর্ব্বলতাই পাপ। সর্ব্বদা ভয়শূন্য হও, উচ্চ বর্ণের বিকট মুখ ভঙ্গী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিও না। "ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, সমুদায় ভয় আপনা আপনিই পলাইয়া যাইবে।" উপনিষদ অধ্যয়ন কর ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে উহার মৃতসঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ করাও, শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, ব্রাহ্মণগণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইওনা। উহারা চিরকাল তোমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, নিজেরা অমৃত খাইয়া তোমাদিগকে হলাহল পরিবেষণ করিয়াছে। উহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, উহাদের কথায় কথায় অনন্ত নরকের ভীতি-বাক্যে বিচলিত হইও না। শূদ্রগণকে সর্ব্ববিধ মনুষ্যোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখাই

উহাদের উদ্দেশ্য। তোমরা বিদ্বান হও, হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া উহা হইতে অমৃত উত্তোলন পূর্ব্বক স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। তাঁহারা নব জীবন লাভ করিবে, নূতন আলোকে হৃদয়-অন্ধকার বিদূরিত করিবে। ব্রাহ্মণগণের "অধিকারী অনধিকারীর বিচারের" ব্যাখ্যা শুনিও না। ওঁঙ্কার রবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তোল। উহার পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নাদে শূদ্র বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাউক। স্বজাতীয়গণ নব বলে বলবান্ হইয়া উঠুক। ভয়শূন্য হও, যিনি রাজার রাজা মহারাজা, তুমি তাঁহার সন্তান। তুমি সেই চিৎসিন্ধু ভগবানের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, আপনার স্বরূপ ভুলিয়া নিজকে নগণ্য ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ, নিজকে অধম শূদ্র ভাবিতেছ। যে কেহ তোমাদিগকে শূদ্র বলিয়া, অধম অস্পর্শীয় বেদবিদ্যায় অনধিকারী বলিয়া বুঝাইতে আসিবে, সয়তানের দূত বলিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দাও। যে শাস্ত্র তোমাদিগকে হীন শূদ্র বলে, উহা এই দণ্ডে ঘৃণার সহিত কর্ম্মনাশার গভীর জলে নিক্ষেপ কর। সর্ব্ব প্রকার মনঃকল্পিত বিধি ব্যবস্থার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, বক্ষ স্ফীত করিয়া সমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। তোমরা প্রত্যেকেই সাহসী হও, সাহসীর নিকট শাস্ত্র ও সমাজ উভয়েই অবনত। দুর্ব্বলের পীড়নের জন্যই হিন্দু শাস্ত্র আজিও জীবিত আছে। সাবধান! আর দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিও না. আর কোনরূপ সামাজিক দাসত্ব-পসরা মাথায় বহন করিও না। কোন কিছুতেই আপনাদিগকে হীন দুর্ব্বল অধম মনে করিও না। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ। কোন কিছুতেই ভীত ও বিচলিত হইও না। 'আমাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই প্রভৃতি হীন বাক্য কখনও মুখে আনিও না। বেদে অধিকার নাই, বেদান্তে অধিকার নাই,

ধর্ম্মে অধিকার নাই, কর্ম্মে অধিকার নাই, পূজায় অধিকার নাই, অর্চনায় অধিকার নাই, ধনে অধিকার নাই, বিত্তে অধিকার নাই, প্রভুত্বে অধিকার নাই, সম্মানে অধিকার নাই, ইত্যাদি নাই, নাই বাক্যে যে একেবারে কুক্কুর বিড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছ। আর নাই ভাব মনেও স্থান দিও না। তবে নাই কথা যদিও নিতান্তই না ছাড়িতে পার, তাহা হইলে উহার মোড় ফিরাইয়া বল "আমাদের ভয় নাই, ডর নাই, ভাই-এ ভাই-এ হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ব্যাধি নাই, শোক নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাদের উচ্চ নাই, নীচ নাই, পাপ নাই, প্রলোভন নাই, আমরা আত্মা স্বরূপ, আমরা ব্রহ্মস্বরূপ" বল বীর্য্যবান—সচ্চিদানন্দোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং। ডর? কার ডর, কাদের ডর, তোমরা যে সকলে ব্রহ্মময়ীর সন্তান, তোমরা সব অমৃতের অধিকারী। আপনাতে বিশ্বাসী হও, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও। বিশ্বাসে সাগর শুকায়, মরুভূ গলায়, বিশ্বাসে পাহাড় টলে, শিলা ভাসে, বিশ্বাসে স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ আবির্ভূত হয়, বিশ্বাসে অসাধ্য সাধিত হয়, বিশ্বাসে মানুষ দেবতা হয়। এই বিশ্বাস হারাইয়াই তোমাদের এ দুর্গতি। সহস্রকোটী দেবতাকে বিশ্বাস কর, তোমার কিছুই হইবে না, যদি তোমার উহার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস না থাকে। মানুষ আত্মবিশ্বাসের বলেই সকলের বরণীয় হয়। বিশ্বাস কর, তোমাদেরই ধর্ম্মবলে জীর্ণ অবসন্ন হিন্দু সমাজ আবার জাগিবে, আবার উঠিবে। পশু বলে নহে, আধ্যাত্ম শক্তিতে—সত্যের মহিমায়। তোমরা প্রত্যেকে ঋষি হও, আবার পল্লীজননীর শান্ত শীতল ক্রোড় হইতে, তটিনীতীর মুখরিত করিয়া প্রাচীন সাম গান উত্থিত হউক, আবার ভারত-গগন বৈদিক যজ্ঞীয় হোম ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া উঠুক। এ নব ধর্ম্মের নবীন জ্যোতিরালোকে কেবল ভারতের নহে জগতের পাপান্ধকার দূরীভূত, পশুবল

দমিত এবং পুণ্যপ্রভা আত্মমহিমায় সমুদ্ভাসিত হউক। উঠ জাগ নিদ্রিত বিরাট, মরণ-যাত্রী অবশিষ্ট হিন্দু সমাজ শেষ আশাটুকু লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। আর ঘুমাইও না। তোমার উত্থানের উপর জগতের পুণ্য-প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই মহাকার্য্য সাধনের জন্যই বুঝিবা ভগবান তোমাকে এত দিন জীবিত রাখিয়াছেন, উঠ, উঠ আর বিলম্ব করিও না। ত্বরায় ভগবদাদিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হও। ঐ যে ভগবান স্নেহ-বিজড়িত অমিয়কণ্ঠে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, ঐ যে পথ-পার্শ্বে তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। উঠ, জগতে সত্যযুগের শান্তি প্রতিষ্ঠার-জন্য ঐ যে তিনি পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন। তোমরাই পৃথিবীতে পুনরায় সত্যযুগ আনয়ন করিবে, মর্ত্তে সাম্য প্রীতি ভালবাসার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিবে। উঠ জাগ, মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন জীবাত্মার চৈতন্য সম্পাদন কর, আত্মা জাগরিত হইলে শক্তি আসিবে সামর্থ্য আসিবে, জ্ঞান আসিবে বিদ্যা আসিবে, মহিমা আসিবে তেজ আসিবে এবং এমন কি যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। তোমাদের মধ্যে যে ঘোর আলস্য জড়তা মোহ নৈরাশ্য আসিয়াছে, উহা দূর করিয়া দাও। প্রবল ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা দ্বারা নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর। ইচ্ছা শক্তির অসাধ্য জগতে কোন কার্য্য নাই। এই ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা দ্বারাই শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন—নিমাই চৈতন্য হইয়াছিলেন, এই ইচ্ছা শক্তির বিকাশেই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, নরেন্দ্র বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। এই ইচ্ছা শক্তির বলেই বৃটনজাতি আজ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি। নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত কর—আর্য্য নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। মহারাজাধিরাজ পরম

মঙ্গলময়ের সন্তান হইয়া জগজ্জননী ভগবতীর তনয় হইয়া তোমরা কেমন করিয়া অধমের মত জীবনযাপন করিতেছ? বঙ্গের সমাজ গগনের সামাজিক অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি অপসারিত হইয়া উন্নতির সুখসূর্য্য সমুদিত প্রায়। এ সময় আর কেহই অধমের মত পড়িয়া থাকিওনা। উঠ উঠ, ঐ যে শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ সুমধুর কণ্ঠে তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। সমাজপতিগণের অত্যাচারের অবসান হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ক্রীড়নক স্বরূপ অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজার তোমরা হতভাগ্য প্রজা নহ। ব্রিটিস রাজত্বে অবাধ বিদ্যা প্রচারে সত্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে সামাজিক অত্যাচার প্রভাত কালীন চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। আর ভয় নাই—"জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদ" রূপ শূদ্র যোগ্য "ন্যায় ও দয়াল দণ্ডের" অবসান হইয়াছে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-হস্ত শ্রীভগবান সে অত্যাচারিগণের হস্ত হইতে ভারতকে চিরমুক্ত করিয়াছেন। শূদ্র নিগ্রহে তাহাদের রাজত্ব রসাতলে গিয়াছে। ঐদেখ অদূরেই সাফল্যের মণি মাণিক্য-খচিত হীরক-মণ্ডিত স্বর্ণমন্দির পরিদৃষ্ট হইতেছে। নিদ্রার অবসাদ পরিহার পূর্ব্বক মন্দির লক্ষ্য করিয়া যাত্রা কর। সিদ্ধিলাভে বহুবিঘ্ন ঘটিলেও পরিণামে সত্যাদর্শে উপনীত হইবেই হইবে: যে কার্য্যের রাজা সহায়, যাহাদের পরিচালক স্বয়ং শ্রীভগবান, সত্যলাভই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের কোন কালে ব্রাহ্মণাদি অভিজাতবর্গ, অত্যাচারী সমাজপতিগণ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও।

অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥

এই পরপীড়ন—শূদ্র পীড়ন রূপ মহাপাপে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসসাগরে বিলীন হইয়াছে। অত্যাচার, অবিচার সমদর্শী বিধাতার রাজ্যে কত কাল চলিতে

পারে? সর্ব্বজীবের যিনি স্নেহময় পিতা, সর্ব্বজাতির যিনি করুণাময়ী জননী, সর্ব্বজগতের যিনি প্রাণস্বরূপ, তাঁহার নিকট কি ব্রাহ্মণ শূদ্র উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র দ্বিজ চণ্ডাল ভেদ আছে! বিশ্বপতির রাজ্যে কোন প্রকার ভেদ বুদ্ধি নাই। ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞান স্থূলদর্শীর নরক-হৃদয়ে। সেই প্রেমময় পরমপিতার রাজ্যে সকলেই সমান, সকলেই এক মানব পরিবার ভুক্ত। তিনি কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড়, কাহাকেও চণ্ডাল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ধনবান্ ঐশ্বর্য্যশালীর একচন্দ্র, আর দীনহীন পদ-দলিত গরীবের জন্য আর এক চন্দ্র প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের জন্য এক সূর্য্য, আর অধম চণ্ডাল, মুচি ম্যাথরের জন্য আর এক সূর্য্য প্রেরণ করেন নাই। এক অখণ্ড বিরাট নীল চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট মানব পরিবার। এখানে আর্য্য ম্লেচ্ছ হিন্দু যবন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উত্তম অধম নাই। তাঁহার পবিত্র রাজ্যে কোন বৈষম্য, কোন ভেদবুদ্ধি নাই। মানুষ আপনাপন কার্য্য দ্বারাই দ্বিজ চণ্ডাল ক্ষুদ্র মহৎ হইতেছে, আপনার কর্ম্ম অনুসারেই মানুষ রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র উত্তম অধম হইতেছে। সত্য-যুগের সেই পুণ্য দিনে, সৃষ্টির আদিম অবস্থায় জাতিভেদ ছিল না,* গুণ কর্ম্মঅনুসারে পরে জাতিভেদ হইয়াছে মাত্র। শাস্ত্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেব নারায়ণোনান্য একাগ্নির্বর্ণ এবচ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

* সৃষ্টির প্রথম সত্যযুগে একজাতি ছিল; পরে গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হইয়াছে।

পূর্ব্বে এক বেদ, সর্ব্ব বাঙ্ময় এক প্রণব ওঁকার, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও এক মাত্র বর্ণ অর্থাৎ জাতি ছিল। বেদান্ত বলিতেছেন :—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ তচ্ছে্‌য়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।

"অগ্রে এক মাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।"

পদ্মপুরাণ ও মহাভারত সমস্বরে বলিতেছেন :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

(পদ্মপুরাণ, স্বর্গ খণ্ড, ২৫ অধ্যায়, শান্তি পর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)

সংসারে বর্ণের ইতরবিশেষ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।

স সর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্মুখঃ।
সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে ॥৪৪

(উৎকল খণ্ড, ৩৮ অধ্যায়)

ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়া ছিলেন। তৎপরে পৃথক পৃথক সমস্ত বর্ণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র) তাঁহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং—

তথাৎ বর্ণাঋজবো জ্ঞাতি বর্ণাঃ সংসৃজ্যতে তস্য বিকার এব।
এবং সাম যজুরেক মৃগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৬০ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক।)

যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তখন ঐ তিন বর্ণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র) ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি স্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্ যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

এক বর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষেণ চতুর্ব্বর্ণং প্রতিষ্ঠিতম্।

হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই বিশ্বে কোন বর্ণ বা জাতি ভেদ ছিল না সকলে এক জাতীয় ছিল। পরে কর্ম্ম ও গুণের বিশেষত্ব নিবন্ধন একই মানব, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়েছে।

বায়ু পুরাণ বলিতেছে :—

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ।
* * * *
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তম বর্জ্জিতাঃ।

"* * * তখন বর্ণ বা জাতি, আশ্রম ব্যবস্থা কিম্বা সঙ্কর বর্ণ ছিল না। * * * সকলেরই রূপ ও আয়ু সমান ছিল। এ ছোট, এ বড়, এ অধম ও উত্তম, এরূপ কোন ভেদাভেদ ছিল না।"

ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতি স্বরূপ, সেই ক্ষত্রিয় ভারত সম্রাটগণের জ্ঞাতিস্বরূপ বৈশ্য শূদ্রকে ভাই বলিয়া স্বীকার করা বা বলা ত দূরের কথা, আজ তাহাদিগকে পঙ্‌ক্তি নির্ব্বাসিত করিয়া অতি দূরে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞাতি ভাই আজ অচল অস্পৃশ্য অনাচরণীয়! ভ্রাতৃত্বের পবিত্র প্রেমবন্ধন—জ্ঞাতিত্বের দুশ্চেদ্য বন্ধন, ঘৃণায় বিদ্বেষে, অপমান লাঞ্ছনায়, নির্ম্মমতায় নিষ্ঠুরতায় ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একই মাতৃ-

ভূমির প্রিয়তম সন্তানগণ, একই বিশ্বপিতা বিশ্বজননীর স্নেহপালিত পুত্রগণ, একই ভারতীয় আর্য্য জাতির রক্ত মাংসে পরিবর্দ্ধিত তনয়গণ, আজ পরস্পর ভালবাসা বর্জ্জিত, পরস্পর দূরে অবস্থিত। প্রেম ভালবাসা প্রীতি প্রণয় স্নেহ মমতা পরস্পরের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছে—

এক দেশ এক ভগবান। এক জাতি এক মনঃ প্রাণ॥

আজ ভাই ভাইকে আলিঙ্গন করার পরিবর্ত্তে, আজ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে মিথ্যা জাত্যভিমানে অন্ধ হইয়া আভি-জাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া লাথি মারিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ। "তুই নীচ আমি উচ্চ, তুই ক্ষুদ্র আমি মহৎ, তুই মূর্খ আমি পণ্ডিত, তুই অধম আমি উত্তম, তুই চণ্ডাল আমি ব্রাহ্মণ, বলিয়া আজ ভাই ভাইএর রক্ত পান করিতেছ, ভাইএর বুকে ভাই লাথি মারিতেছ! জাতীয় প্রেম জাতীয় একতা জাতীয় মিলন দেবতা আজ পদদলিত, বিতাড়িত। বিন্দুমাত্র সামাজিক অধিকার, বিন্দুমাত্র ধর্ম্মের অধিকার আমি আমার অনুন্নত ভাইকে দিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু ইংরেজ রাজের নিকট আমরা তাহাদের সম অধিকার লাভে দাবী করিয়া থাকি। তাঁহারা উন্মাদ বোধে, প্রলাপ বাক্য বলিয়া হাস্য করেন। যে নিজে অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, অসম্মত সে কিছুতেই অধিকার পাইবার যোগ্য নয়। অধিকার দিব না, অধিকার পাইব? আমাদের যদি লজ্জার লেশমাত্র থাকিত, তবে আর আমরা ইংরাজের দ্বারে অধিকার লাভের জন্য গমন করিয়া প্রহসনের অভিনয় করিতাম না। যাহারা আপনাদের স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে জল-টুকু স্পর্শ করিতে দিতে অসম্মত, দেবালয়ের পবিত্র মন্দিরেও যাহারা অপর ভাইকে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক, বেদনামধেয় একখানা পুস্তক

ওঁকার নামক একটা শব্দকে পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রাণ ধরিয়া অন্যকে পাঠ ও উচ্চারণ করিতে দিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারাই আবার বড় গলায় উচ্চকণ্ঠে সভা সমিতি করিয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য দাবী করিয়া থাকেন? হা ধিক, তাঁহাদের লজ্জাহীনতাকে, আকাঙ্ক্ষাকে, হা ধিক, তাঁহাদের চেষ্টাকে পণ্ডশ্রমকে। তাহাদের এ আকাঙ্ক্ষার উপর কি বিধাতার অলক্ষ্য অভিসম্পাত-অগ্নি বর্ষিত হয় না? যাহারা আপনার স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাইকে এমন করিয়া দাবাইয়া রাখিতে উৎসুক, তাঁহারা রাজ জাতির নিকট অধিকার লাভের কিছুতেই যোগ্য নহেন। "দেওয়া পাওয়া" ইহাই হইতেছে জগতের নিয়ম। তুমি কিছুই দিবে না, কিন্তু অনেক পাইবে, এরূপ আশা কি নিতান্তই অশোভন নহে? যে নিজে ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে একবিন্দু জল দানে, একমুষ্টি অন্নদানে, একটু আশ্রয় দানে কুণ্ঠিত, সে কি কখন আতিথ্য-সৎকার লাভ করিতে পারে? না—তাহার সে আশা করা উচিত? আমি আমার কোনই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব না, কিন্তু তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছ না, তাহা বড় গলায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিব? কি রহস্য! কি প্রহেলিকা! জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, সমাজের যাহারা শক্তি, এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুন্নত দেশবাসীকে—অগণ্য ভ্রাতৃবৃন্দকে শ্রমজীবি-নিম্নশ্রেণী বলিয়া আমরা জাতীয় যজ্ঞক্ষেত্র হইতে বহুদূরে তাড়াইয়া দিয়াছি। ঘৃণায় ঘৃণায় তাহারা যে মানুষ, একথা প্রায় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সামাজিক সর্ব্ব-প্রকার উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা বুঝিয়াছে—জল তুলিবার জন্য—কাঠ কাটিবার জন্য, ভার বহন করিবার জন্য, আদেশ পালন করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির সেবা করাই তাহাদের একমাত্র জীবন-ব্রত।

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার।

সংহিতাকার রূপী নিষ্ঠুর নির্ম্মমগণই শ্লোক রচনা দ্বারা এই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। ঐ শুনুন, মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।

দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩

(অষ্টম অধ্যায় ; মনু সংহিতা।)

"পরন্তু শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি (রাজা) দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্য নির্ব্বাহার্থই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন!" ধর্ম্ম শাস্ত্রের নামে—স্বয়ং ভগবান বিধাতা পুরুষের নামে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনা অত্যাচার! নিষ্করাত আইনে কানুনে রাজবিধানে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবেই, আবার তাহার উপর মঙ্গলময়ের বিধান বলিয়া প্রতারণা করিয়া অত্যাচার করা হইয়াছে। দাসের কার্য্য করিবার জন্যই ভগবান শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন! হায়! ঋষিবাণী, হায় ধর্ম্ম—শাস্ত্র! মনে হয়, ইউরোপ আমেরিকার দাসত্ব প্রথা অপেক্ষা ভারতের সভ্য যুগের শূদ্র দাসত্ব প্রথা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলনা, বরং কোন কোন অংশে নিকৃষ্টই ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসিগণকে বিক্রেতার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া দাসগণকে ক্রয় করিতে হইত, কিন্তু এই শূদ্র দাসগণকে টাকা পয়সা দ্বারা ক্রয় করিতে হইত না। বলা হইত, ইহারা প্রকৃতিদত্ত দাস। পরমা প্রকৃতি ভগবতীই দাসত্ব করা উহাদের প্রকৃতিগত করিয়া দিয়াছেন! সংহিতার নামে বলা হইতেছে—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।

নিসর্গজং হিং তংতস্য কতস্মাৎ তদপোহৃতি॥ ৪১৪॥

(মনু সংহিতা, ৮ম অধ্যায়।)

"শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে ?"

এক্ষণে কথা হইতেছে যে—দাস শূদ্রের দেহ মনঃ প্রাণই যখন ব্রাহ্মণাদির প্রকৃতি দত্ত সম্পত্তি, তখন তাহার ধনাদির ত কথাই নাই।

মনু তাহাও বলিতেছেন—

বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদান মাচাদৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ ॥ ৪১৭

(অষ্টম অধ্যায়, মনুসংহিতা।)

"ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধ চিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারে ; যে হেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণ স্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥ ১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতেহীতরে জনাঃ ॥ ১০১

(মনু সংহিতা ; প্রথম অধ্যায়।)

"ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদয় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থান—জাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব ; যে হেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।"

এই ত গেল শূদ্রদিগের আপনাদের ধনের উপর অধিকারের কথা। এক্ষণে ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেন ন কার্য্যোধন সঞ্চয়ঃ
শূদ্রোহি ধন মাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥১২৯

"অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিৎ নহে; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।"

বর্ত্তমান কালের ন্যায় মনুর সময়ে যাহারা যে ব্যবসা ইচ্ছা, সে সেই ব্যবসা করিতে পারিবে, এরূপ নিয়ম ছিল না। বৈশ্য শূদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসাই করিতে হইত; বৈদিক সময়ের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

মনু বলিয়াছেন :—

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মানি কারয়েৎ।
তৌহিচ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ॥৪১৮

"রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, যে হেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।"

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥৯৬

(দশম অধ্যায়; মনুসংহিতা)

"যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য।"

শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দয়ালু ব্রাহ্মণগণ ও ন্যায়বান ক্ষত্রিয় রাজগণ বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই।

নবম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥২৪৮

"শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবে।"

চোর অধিকাংশই শূদ্র ছিল—বৈশ্যের মধ্যে ও ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত। রাজন্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের পক্ষে চুরি করার প্রয়োজন মনুর সময়ে কিছুই ছিল না। সেই সমুদয় বুভুক্ষিত দরিদ্র অজ্ঞান শূদ্রাদি তস্করাদির প্রতি মনু কি কঠোর বিধানই না করিয়া গিয়াছেন! মনু বলিতেছেন:—

যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্র জ্ঞাতি বান্ধবান্ ॥২৬৯

(নবম অধ্যায়; মনুসংহিতা)

"চার প্রেরিত হইয়াও শঙ্কা বশতঃ যাহারা (যে সমস্ত চোর) আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বান্ধবাদির সহিত বধ করিবেন।"

একজন অপরাধীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নিরপরাধিনী স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতি বান্ধবাদির জীবন নাশ করা যে কতদূর নৃশংসতার পরিচায়ক, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। পুনরায় পরের শ্লোকে বলিতেছেন :—"ধার্ম্মিক রাজা" মাল না থাকায় চোর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবে না;

কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই বধ করিবেন ।।২৭০ শ্লোক ।"

শূদ্র বৈশ্য জাতীয় চোরদিগের দণ্ড সম্বন্ধে অন্য এক শাস্ত্রকার কৃপা পূর্ব্বক বলিয়াছেন:—"রাজা অপহৃত বস্তু চৌরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন।" বলা বাহুল্য, একরূপ দণ্ড ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের জন্য নহে। শাস্ত্রকার আপনার পক্ষে ডিগ্রি দিয়া ভগবান বিষ্ণুর নামে দোহাই দিয়া বলিতেছেন :—

ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ ॥২॥ পঞ্চম অধ্যায় বিষ্ণুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই।" ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ আপনাদের নিজেদের ঘর সামলাইয়া রক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই বিধিমতে বিষ্ণুসংহিতার নামে করিয়া রাখিয়া যদিচ্ছাক্রমে চাবুক চালাইতেছেন—শুনুন মনুর চাবুক :—

মনু বলিতেছেন :—

এক জাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবোহি সঃ ॥২৭০
নামজাতি গ্রহস্ত্বেষাভি দ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুজ্বলন্নাসে দশাঙ্গুল ॥২৭১

(অষ্টম অধ্যায়; মনুসংহিতা)

"এক জাতি (অর্থাৎ শূদ্র সমষ্টিকে এক জাতি বলা হইয়াছে) শূদ্র যদি দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) দিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহার জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে। জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর

আক্রোশ করে, তবে একগাছা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।"

শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥২৭২

(অষ্টম অধ্যায় ; মনু সংহিতা)

"দর্পিত ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্তভৈল নিক্ষেপ করাইবেন।"

মনু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন :—

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্ ॥২৭৯
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদন মর্হতি।
পাদেন প্রহরণ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥২৮০
সহাসন মভি প্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥২৮১
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌচ্ছেদনয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্ ॥ ২৮২
কেশেষু গৃহ্ণতোহস্তৌচ্ছেদয়েদাবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥ ২৮৩

"অন্ত্যজ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন (অর্থাৎ যদি নাও মারে, কিন্তু যদি মারিবার জন্য

হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলেই রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন ; পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকার অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন ; অথচ যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাদর ছেদন করিবেন * * * * শূদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসাজন্য তাঁহার পাদদ্বয় * * * * গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।" আবার ঐ শুভঙ্কর গৌতমের চাবুক—

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধ্যায়াভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোহ বিকোহ্যাহাস্ত বেদ নুপশৃন্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শোত্র প্রতিপূরণ মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়ন-বাক্ পথিষু সম প্রেপ্সদণ্ড্যঃ শতম্।

"শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য)র প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে কঠোর ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গের দ্বারা আঘাত করিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। * * শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ (কররূপ মহাপাপ কার্য্য) করে তাহা হইলে রাজা সীসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির

সহিত সমান ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে।" * * * * "কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না।"* চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্র হয়? শূদ্রকে মানুষ বলিয়াই মনে করা হয় নাই, উহাদিগকে সয়তানের বংশধর বলিয়া জ্ঞান করা হইয়াছে। যত অপরাধ নিরাশ্রয় হতভাগ্য শূদ্রদের জন্য। শূদ্রেরা নাম মাত্র অপরাধ করিলেও সে অব্যাহতি পাইবে না, তাহা প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয়, শ্রবণ করুন :—

কামকারেণা স্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকং শনস্পৃবধ্যঃ ॥ ১০২
(পঞ্চম অধ্যায় ; বিষ্ণুসংহিতা।)

"অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

* * * * চণ্ডালশ্চোত্তমান্ স্পৃশন্ ॥ ২৩৭ ইত্যাদি

শুধু কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শেই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মহানী? না—তাহা নহে! উহাদের দর্শনেও অমঙ্গলের সম্ভাবনা!

কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন :— (ঊনবিংশ খণ্ড)

* * * * * *

প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥১০ "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া * * * অন্ত্যজ * * প্রভৃতিকে অবলোকন করে, সে কলিযুক্ত হয়।"

ইহা হইতেই বোধ হয়, আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে,

* অনুবাদ—দ্বাদশ অধ্যায়

কোনও মাঙ্গলিক কার্য্যে—নর-সুন্দর তৈল-বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে! শাস্ত্রের এই সমুদয় বচন হইতেই বোধ হয় মান্দ্রাজের পারিয়া মেহ—বোম্বাইয়ের মহার জাতির প্রতি অভিজাতবর্গের এতাদৃশ পৈশাচিক ব্যবহার ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে। এদেশেও নিষাদ, মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদগু, ক্ষত্ত, উগ্র, পুক্কশ, বিগ্বন এবং বেন জাতির প্রতিও মনু ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন! মনু পতিত চণ্ডাল মূর্খের সহিত এক ছায়াতে বসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন—আশঙ্কা পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজটুকু যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়! তাই বলিতেছেন :—

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥ ৭৯

(চতুর্থ অধ্যায়—মনু)

"পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত ব্যক্তি রজকাদি নীচ জাতি এবং অন্ত্যাবসায়ী, ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও এক ছায়াতে বাস করিবে না।"

শূদ্রকে বেদস্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোহপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধা স্বাহা বষট্কারাদিভির্বিনা॥ ৬

(প্রথম অধ্যায়, ব্যাস সংহিতা)

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য; এই তিন বর্ণই শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী, অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্র চতুর্থবর্ণ, এইজন্য ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র, স্বাহা, স্বধা ও বষট্ কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।" শূদ্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঋষি অত্রি বলিতেছেন :—

অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।
এতে স্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৮

(অত্রি সংহিতা)

"দ্বিজোত্তমগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র, এবং খল স্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবে না।"

শুধু কি বেদাদি শাস্ত্রশিক্ষা দানই নিষেধ? বেদ শ্রবণ করানও নিষেধ। উশনঃ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥

"যে গ্রামে অন্ত্যজ জাতি (নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ, কায়স্থ, মালাকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, ইহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া ব্যাসসংহিতায় ১০।১১।১২ লিখিত হইয়াছে) বাস করে, সেই গ্রামে বহুলোক সমাগম স্থলে বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।"

শূদ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ, তাহা লৌকিকই হউক আর পারমার্থিকই হউক, দেওয়া হইবে না। মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন:—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥ ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না, অদাস শূদ্রকে

উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতশেষ দিবে না,—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।"

যদি দাও, তবে—

যোহস্য ধর্ম্ম মাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব মজ্জতি॥ ৮১

"যে ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।"

শূদ্র দূরে থাকুক, আজকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির নরনারীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্য কত কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আর্য্যসমাজের পূতহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণ, ব্রাহ্মসমাজের উদারহৃদয় প্রচারকগণ দলে দলে পার্ব্বত্য, অশিক্ষিত জাতিগণের হৃদয় মন্দিরে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের মনোমন্দিরে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিবার জন্য, এক কথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য সমুদায় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন, আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু—তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে নিষেধ করিয়া এবং নরকের ভয় দেখাইয়া ঋষিত্ব প্রকাশ করিতেছেন! এই জন্যই না দেশের আজ এই দশা—সমাজের এই অবস্থা।

শূদ্রগণের প্রতি ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ সংহিতাকারগণের অপার ভালবাসা, অনন্ত স্নেহ প্রীতির এই ত সব জাজ্জ্বল্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে শূদ্রগণের জীবন ব্রাহ্মণ-বিধিদাতৃগণের নিকট কিদৃশ মূল্যবান

ছিল—তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক। মনু একাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
স্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৩২

"জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুক্কুর, গোধা, পেচক—ইহাদের একটীকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

আরও বলিতেছেন :—

অস্থিমতান্তু সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থনস্থান্তু শূদ্র হত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৪২

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা)

"কৃকলাশ প্রভৃতি (কুল্লক ভট্টকৃত অর্থ) অস্থি বিশিষ্ট সহস্র প্রাণিবধে এবং অস্থিহীন এক শকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণিবধে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

অত্রি ও তদীয় সংহিতায় মনুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন :—

"শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহ শার্দ্দূল গর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ২২২

(অত্রি সংহিতা)

"শরভ (অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

চৌর শ্বপাক চাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরা ত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ১৯

(৬ষ্ঠ অধ্যায় ; পরাশর সংহিতা)

"ব্রাহ্মণ কর্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই—প্রমাণিত হইতেছে যে—শূদ্রের জীবন ধন প্রাণ ব্রাহ্মণ সংহিতাকারগণের নিকট কতদূর হেয়—তুচ্ছ সামান্য ও মূল্যহীন ছিল! ফলতঃ শূদ্রকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

সর্ব্বশেষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম সাধন—দেবতা আরাধন—সম্বন্ধে শূদ্রদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন দেখা যাউক। শূদ্রগণের ধর্ম্মজীবন প্রসঙ্গে—অত্রি বলিতেছেন :—

জপস্তপস্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্র সাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পততানিষট্ ॥ ১৩৫

(অত্রি সংহিতা)

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা আরাধন, এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যজনক।" মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা —সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা। এবং উপরিলিখিত ছয়টী উপায় বা পথকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভগবল্লাভের পরমোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছয়টী কেন উহার যে কোন একটী উপায় অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ অনায়াসে ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। একটী মাত্র আশ্রয় করিতে পারিলে মানুষ দুশ্চেদ্য মায়া পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে—পরমধামে প্রেমময় মঙ্গলাস্পদ শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর শাস্ত্রকারগণ, সংহিতাকাররূপী শূদ্রকল্পিত কোটি কোটি জীবাত্মাঘাতি ধর্ম্মব্যাধগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি কতকগুলি অনর্থক শব্দ সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্রের নামে সংহিতার নামে ধর্ম্মের নামে কোটি

কোটি নরনারীকে তাহা হইতে এমনি করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শত শত শতাব্দী ধরিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মানব-সন্তানকে শূদ্ররূপ মনঃকল্পিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া বেদ বেদান্ত বিদ্যা হইতে—ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চা হইতে—প্রণব ওঁকার হইতে জপ তপ সাধন ভজন—মন্ত্র সাধন দেবতা আরাধনা পূজা অর্চ্চনা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে ও হইতেছে। ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষি নহেন—ইহারা কোটি কোটি নরঘাতী ভারতের হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ সাধনকারী ধ্বংসকারী দানব। এই শূদ্র কথিত নরনারায়ণ রূপী মানব জাতির প্রতি দারুণ অবিচার ও অত্যাচারের পাপেই হিন্দুরাজ্য ডুবিয়া গিয়াছে। মানবপ্রেম ইহারা পদতলে দলিত করিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বড় বড় বচন শুধু কেতাবেই নিবদ্ধ রহিয়াছে ব্যবহারিক জীবনে ঐ বচনের সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় নাই তেত্রিশ কোটি দেবতা ও ইঁহারাই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া কোটি কোটি শূদ্ররূপ সয়তানের সৃষ্টিও উঁহারাই করিয়াছেন। অন্যধর্ম্মে একজন ভিন্ন ভগবানও নাই—শূদ্ররূপ হীন কল্পনাও নাই। আমাদের ধর্ম্মে শাস্ত্রে যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দেব দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে—কোটি কোটি নারায়ণের কল্পনা হইয়াছে, ঠিক তদ্রূপ কোটি কোটি হীন শূদ্রও শাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের শাস্ত্রে তুলসীগাছ, বটগাছ, বেলগাছ, পাহাড় পর্ব্বত নদী সাগর দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই কি না—মানুষের বুকের রক্ত পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোটি কোটি লোককে শূদ্র অন্ত্যজ হীন অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা অবজ্ঞা করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কি প্রহেলিকা! কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকারের ও টীকাকারের অভাব নাই। হীন

নীচ অধম অস্পৃশ্য ছোটলোক ইতরলোক প্রভৃতি রূপে বলিতে বলিতে কোটি কোটি লোকের মনুষ্যত্ব অপহরণ করা হইয়াছে। মানুষকে পশু অপেক্ষা হীন করা হইয়াছে। দেবমন্দির হইতে, মনোমন্দির হইতে দেবতা তাড়াইয়া দিয়া নিজেরা ব্রাহ্মণ রূপে গুরু পুরোহিত রূপে দেবতার পূজা লইতেছেন। দেববাদ উঠাইয়া দিয়া গুরুবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভগবৎপূজা বাদ দিলে মানুষের কি অবশিষ্ট থাকে? মানুষে পশুতে যে পার্থক্যই লোপ হয়! গুরুবাদে, পুরোহিত-বাদে, ব্রাহ্মণ-দেবতা-বাদে দেশ পরিপূর্ণ, সমাজ আচ্ছন্ন। হিন্দু সমাজে ভগবানের দাঁড়াইবার স্থান নাই; ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই ভগবান সাজিয়া উহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই এক কথা "শূদ্রের গুরু ব্রাহ্মণ" "শূদ্রের নারায়ণ ব্রাহ্মণ" "কলির দেবতা ব্রাহ্মণ।" এই মিথ্যা প্রতারণায়, এই অসত্য মতবাদে, এই পাপ ধারণায়, এই মহা অপরাধে হিন্দু সমাজ ডুবিয়াছে, দিন দিন ডুবিতেছে। ভগবানের উপর ও প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা—চালাকী। প্রতারণা প্রবঞ্চনা কতদিন চলিতে পারে? সেই সব পুঞ্জীভূত প্রতারণা প্রবঞ্চনার এখন প্রতিশোধের কাল উপস্থিত। বৈদেশিকের লাথি "যবন "ম্লেচ্ছের" লাথিতে সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। দর্পণে যেমন দেখাইয়াছ, তেমনি দেখিবে। চেঁচাইয়া ফল নাই, ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মিলনীতে সে পাপ ধৌত হইবে না। কি দারুণ অবিচার। দেবতা আরাধনা, ভগবৎ আরাধনা হইতে কোটি কোটী শূদ্র ভ্রাতৃগণকে—ভগবতীর অংশকলা-সম্ভূতা সমুদয় মাতৃজাতিকে আইন করিয়া বঞ্চনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রকার শূদ্রগণকে জপ তপস্যা সন্ন্যাস দেবপূজা মন্ত্র সাধন—তীর্থ যাত্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তাহাদিগকে রীতি মত প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহর্ষি

অত্রি তদীয় সংহিতার উনবিংশ শ্লোকে শূদ্রের পক্ষে ঈশ্বরাধনা জপ তপ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে নিম্ন লিখিত প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ।

ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চশূবৈ জলম্॥ ১৯

"জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্মনিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জল ধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপ হোম তৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।" এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই দয়ার সাগর দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা-যুগে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের নিষ্পাপ মস্তক শাণিত খড়্গে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই শোচনীয় মর্ম্মবিদারক করুণ উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাল্মীকি তপোবনে সীতা নির্ব্বাসনের পর অযোধ্যা নগরী মহাশোকে আচ্ছন্ন। সাধ্বী সতী জনক নন্দিনীর প্রিয় বিরহে দুর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের লোচন যুগলে অবিরত ধারা বহিতেছে। মুখে কেবল—"হা সীতা! হা সীতা! রামময়ী জীবন! হা জনকনন্দিনী! তুমি কেন হতভাগ্য রামের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলে! লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন প্রমুখ সকলেই শোকে মুহ্যমান! কাহারও প্রাণে শান্তি নাই, এমন অবস্থায় একদিন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি একটী মৃত শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আগমন পূর্ব্বক শিরে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন—"মহারাজ রামচন্দ্র! রাজার পাপে রাজ্যে অকাল মৃত্যু রোগ শোক মহামারী অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। তোমার পাপেই আমার শিশুপুত্রের অকাল মরণ, শীঘ্র আমার বাছাকে বাঁচাইয়া দাও, নতুবা এখনি সূর্য্যবংশ সহিত অযোধ্যা নগরী অভিসম্পাতে ভস্মীভূত করিব! সীতাশোকোন্মত্ত

রামচন্দ্রের বিপদের উপর আর এক দারুণ বিপদ উপস্থিত। তিনি গললগ্নী-কৃতবাসে সজল নেত্রে ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করতঃ কুলগুরু বশিষ্ঠকে ইহার তথ্য অনুসন্ধানে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, শম্বুক নামক একটী শূদ্র তপস্বী দণ্ডকারণ্যে দারুণ তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন আছে! শূদ্রের পক্ষে তপস্যা. ভগবৎ আরাধনা ঈশ্বর উপাসনারূপ গুরুতর পাপেই রাজ্যের অমঙ্গল, অকাল মৃত্যু দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ শূদ্রের ছেলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির গোলামী করিবে, ইহাই তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন জাতির পদসেবাই তাহার চরম উপাসনা। তাহা ত্যাগ করিয়া সেই দুষ্টবুদ্ধি শূদ্র কি না ভগবানের গোলামীতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে, ভগবানের শ্রীপাদ পদ্ম সেবায় আরাধনায় নিমগ্ন হইয়াছে। সুতরাং আর কি রক্ষা আছে? শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন ভগবানের পূজায় শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে তখন ত এই গুরুতর পাপে রাজ্যে অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইবেই! সুতরাং রামচন্দ্র তুমি শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে নিজে গমন করিয়া ঐ দুষ্ট শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিয়া আইস।” দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্র তখন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি লইয়া শূদ্র তপস্বীর প্রাণ দণ্ড করিতে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদিন পর্য্যটনের পর অবশেষে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর একদিন হঠাৎ দেখিলেন, তপঃপ্রভা-জনিত শরীরের দিব্য কান্তিতে, ঔজ্জ্বল্যে বনভূমির চারিদিক আলোকিত করিয়া যোগাসনে পরম তপস্বী মহাত্মা শম্বুক উপবিষ্ট—ব্রহ্মধ্যানে সমাসীন। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র। অন্তরে ব্রহ্মানন্দ প্রেমামৃত ধারা পান করিতেছেন, আর দুই চক্ষু হইতে অবিরল প্রেমাশ্রু ধারা পতিত হইতেছে।

তাহার আরাধ্য ধন গোলকবিহারী হরি শ্রীরামচন্দ্র তখন সম্মুখীন হইয়া স্নেহ-বিজড়িত করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বৎস! নয়ন উন্মীলন কর এই যে আমি এসেছি—ভক্ত শম্বুক নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে আপনার হৃদয়ের ধনকে আরাধ্য নিধিকে দর্শন করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ মূলে ছিন্ন তরুর মত পড়িয়া গেল, আর নয়নজলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিতে লাগিল। বাক্‌স্পন্দনের শক্তি নাই। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র পুনর্ব্বার তেমনি করুণ স্বরে অমিয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার বড় দুর্দ্দৈব, তোমার শিরচ্ছেদ করিতে আসিয়াছি।" তখন ভাবাবেগে আকুল শম্বুক ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"প্রভু, আমার যদি দুর্দ্দৈব—দুর্ভাগ্য তবে সৌভাগ্য কাহার? যে তোমাকে ভব-বিরিঞ্চি সুরেন্দ্রাদি দেবতাগণ, কত বিপ্রর্ষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি মুনিগণ যুগ যুগান্ত কোটী কল্পান্ত আরাধনা করিয়া দর্শন করিতে পারেন না—অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারেন না—সেই তুমি জগদারাধ্যধন সুর-মুনি-নর-বন্দিত দুর্ব্বাদল শ্যাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নিজে অযোধ্যার স্বর্ণ সিংহাসন—রাজছত্র—মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার অনুসন্ধানের জন্য, আমাকে দেখিবার জন্য কত জনপদ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়াছ,—প্রভু ইহা অপেক্ষা অধম শূদ্র শম্বুকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। যাহা কখন হয় নাই, আমার ভাগ্যে তাহাই হইল—অসম্ভব সম্ভব হইল!! তারপর—তারপর যাহা ঘটিল, তাহা লিখিবার নয়, বলিবার নয়। তারপর দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কোষিত শাণিত তরবারি পরম ভক্ত শম্বুকের তপঃপ্রভাজনিত উষ্ণ রক্ত পান করিয়া ভারতে ব্রাহ্মণ অত্যাচারের পবিত্র কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিল!

যে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বৈশ্য ঔরসোৎপন্ন শূদ্রাগর্ভ জাত সিন্ধু মুনিকে (১) বধ করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ অর্জ্জিত হইয়াছিল; সেই রামায়ণেরই উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র-তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়া অতুল কীর্ত্তি, অসীম কর্ত্তব্য, অপার পুণ্য সঞ্চয় করিলেন! কি প্রহেলিকা! এই ত গেল শূদ্র নামধেয় হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের অপার ভালবাসার পরিচয়। তার পর খুটিনাটি ধরিয়া যে কত দয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। কোন স্থানে শূদ্রের ঘৃণিত ও নিন্দিত নাম রাখিবার কথা বলিয়াছেন।" কোন স্থানে "ধোপাকে একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইতে নিষেধ করিয়া বিধি করিয়াছেন"। (২)

ফলতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্যকে আকাশ পাতালের সহিত তুলনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বলা হইতেছে, ব্রাহ্মণের যাহাতে পুণ্য, শূদ্রের তাহাতে পাপ। যথা—

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্য দোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্ ॥ ২৯৪

(অত্রিসংহিতা)

"পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে।" অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে ব্রাহ্মণ গুরুতর পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায় সেই পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্র চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয়। একজনের পাপ ক্ষয়, অপরের পাপ

(১) শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শূন্যজানপদাধিপ।
(২) মনু, অষ্টম অধ্যায়, ৩৯৬।

সঞ্চয়। এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টীপ্পনীর প্রয়োজন নাই। শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র বৃহৎ পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সেরূপ পুস্তক লিখিবারও ইচ্ছা রহিল। মনু, যম প্রভৃতি সংহিতকারগণ শুধু শূদ্রগণের প্রতি এই সব গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্র ভাবে কশাঘাত করিয়াছেন—চাবুক মারিয়াছেন। তাঁহাদিগকে শূদ্রের ন্যায় ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

মনু একাদশ অধ্যায়ে [illegible]০ শ্লোকে, আপস্তম্ব নবম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণকে গোহত্যাকারী, চোর, স্ত্রীহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামীর তুল্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোন জাতি বা সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে উদ্যত হয়, তবে তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই অগ্রে অগ্রে তাহার বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। মনু যে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণের নাক কাণ মলিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের লজ্জা বা ঘৃণা বোধ নাই। মনুর নামে তাঁহাদের জিহ্বায় জল আইসে! শুধু শূদ্রযাজক পুরোহিতকুলকেই নহে শূদ্র দীক্ষা-দাতা গুরুকুলকেও বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যে নিমন্ত্রণের অযোগ্য বলিয়া বিধিদান করিয়াছেন। ফল কথা শূদ্র শয়তান-গণের ত কথাই নহে—তাহাদের সঙ্গে যাঁহারা কোন না কোন প্রকারে আদান প্রদান প্রীতি প্রণয় রাখিয়াছেন তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশেও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ চাবুক মারিয়াছেন। বেদান্ত ভাষ্যকার পর্য্যন্ত শূদ্রকে "চলমান শ্মশান" এই সংজ্ঞা দান করিয়া শূদ্রবিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্মশান ভূমি যেমত সাধারণতঃ অশুচিকর অস্পৃশ্য

ছাই ভস্মে পরিপূর্ণ অপদার্থ স্থান বলিয়া বিবেচিত, শূদ্রগণও ঠিক তদ্রূপ। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই টুকু যে শ্মশানভূমি অচল আর এগুলি চলমান। ঘৃণার চরম বিশেষণ "চলমান শ্মশান!" একদিকে শূদ্রগণকে যেমন ঘৃণিত ভাবে বিচিত্র করা হইয়াছে, অপরদিকে ব্রাহ্মণগণকে ঠিক তদনুরূপ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোক সমুদয় গুণ কর্ম্ম মাহাত্ম্য চিবাইয়া খাইয়া দাম্ভিকতার চরম পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যথা :—

দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্ ॥৩২

অষ্টম অধ্যায়—পরাশর সংহিতা।

অর্থাৎ "দুঃশীল (দুশ্চরিত্র) হইলেও দ্বিজ পূজ্য হইবে, আর শূদ্র বিশেষরূপে জিতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হইবে না। কারণ বল দেখি, কে দুষ্ট দুষিত শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়?" এইরূপ শ্লোক হইতেই বোধ হয় নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য রচিত হইয়া থাকিবে যে,—

"হা গা কারী বামুন শূদ্রের দুনা।"

ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বের এই খানেই শেষ নয়, পরে আরও বলা হইতেছে—

ক্রীড়ার্থ মপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্ম পরমঃ স্মৃতঃ ॥৩৩ ঐ

"ব্রাহ্মণগণ ক্রীড়া বা খেলাচ্ছলে কিম্বা পরিহাসচ্ছলেও যদি কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

পাঠকগণ! দেখিবেন, কিরূপভাবে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম—মহা সাম্যবাদ সাংহিতিক যুগের যুগাচার্য্য স্মার্ত্তচূড়ামণিগণের পাল্লায় পড়িয়া কিরূপ পূতিগন্ধময় আকারজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংহিতাকাররূপী রাক্ষসগণের হিংসার কবলে পড়িয়া ধর্ম্ম হজম হইয়া গিয়াছে,—বিনষ্ট

হইয়াছে। ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে? ধর্ম্ম নাই আছে উহার বাহ্য আবরণ খোসা ভূষি, বাহিরের চটক। বৈদিক ও বেদান্ত ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে। আছে মাত্র স্মৃতির ধর্ম্ম। তাহা আবার যোগ তপস্যা যাগ যজ্ঞে পূজার্চ্চনায় নাই—আছে কেবল রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িতে—শুদ্ধাশুদ্ধ স্পর্শাস্পর্শের বিচারে—ছুঁৎমার্গে! কিন্তু হায়! এ ধর্ম্মও মনু প্রাণ ধরিয়া শূদ্রশয়তানদিগকে দিতে কুণ্ঠিত, নারাজ, অসম্মত! ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন জাতির সেবার জন্যই যখন মনুর দয়াল ঈশ্বর উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ সেবাই তাহাদের একমাত্র চরম পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের ধর্ম্ম যে এরূপ হইতে পারে, তাহা জগতে অবিদিত। ইহা ধর্ম্মের নূতন অভিনব সংস্করণ। এমন ধর্ম্মের সংবাদ কোন অবতার, কোন যুগাচার্য্য, কোন ধর্ম্মাচার্য্য পরিজ্ঞাত নহেন। ইহা মহর্ষি মনুর নবাবিষ্কৃত ও পেটেণ্ট করা ধর্ম্ম। ঐ শুনুন মনুর ঋষি কণ্ঠ বলিতেছেন—

"স্বর্গার্থ মুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণ শব্দস্য সা হ্যস্য কৃত কৃত্যতা ॥ ১২২
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যাদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্ ॥ ১২৩

(দশম অধ্যায়; মনুসংহিতা)

অর্থাৎ "স্বর্গলাভার্থ অথবা স্বর্গ ও নিজ জীবিকা এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক"—এই শব্দ বিশেষণ মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন যে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল।"

মহাপ্রাণ মার্টিন লুথারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের গুরু রোমের পোপ খ্রীষ্টীয় নর নারীগণের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ অর্থাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের মৃত পিতামাতা আত্মীয় স্বজনগণের নিমিত্ত স্বর্গের চাবি খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে পাঠাইতেন—ঠিক সেইরূপই, প্রতারণাময় ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ঋষিগণের নামে সরলপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞানানভিজ্ঞ মূর্খ শূদ্রগণকে স্বর্গে পাঠাইবার প্রলোভন দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নামে—ধর্ম্মের নামে, দেবতার নামে, ঋষিগণের নামে, এমন কি স্বয়ং ভগবানের নামে নিজেরাই দেবতা ঋষি ভগবান্ সাজিয়া গুরুরূপে, দেবতারূপে সেবা পূজা ভোগ নৈবেদ্য অর্থ বিত্ত গ্রহণ করিবার শঠতাপূর্ণ বিধি দান করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্দর্শন কিম্বা ভগবানকে প্রদর্শন করান ত দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ভগবত্তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়াও মানবের আরাধ্যতম ভগবানের একমাত্র প্রাপ্য পূজা অর্চ্চনা সেবা আরাধনা কত নরাধম কুলগুরু গ্রহণ করিতেছে। মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ-গুরুই যে ভগবান,—শিষ্যের একমাত্র আরাধ্য ভব পারের কাণ্ডারী, তাহাই প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য গুরুগীতায়ও কত শ্লোকে চেষ্টা করা হইয়াছে। সামান্য ২।৪টী টাকার লোভে, বার্ষিকের প্রলোভনে কত নরাধম গুরু, নরোত্তম ভগবানের পূজা গ্রহণ করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিতেছে। ক্ষুদ্র নগণ্য সৃষ্ট কীটও নাকি আবার স্রষ্টা হইতে পারে? মানুষও আবার ঈশ্বর হইতে পারে? ক্ষুদ্র নগণ্য ধূলিকণা স্বরূপ—মানুষকীটও নাকি সেই দেবাদিদেব নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর স্রষ্টার পূজা গ্রহণে সাহস করিতে পারে? হায় ব্রাহ্মণ! তোমার কি না পতনই হইয়াছে? তিন জাতিকে ছোট করিয়া একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান পূর্ব্বক সেই পরম দেবতার আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিবার

তাধৃষ্ট করিতে যাইয়াই না তোমার আজ এই পরিণাম—এই অধঃপতন ?

হে বঙ্গের শূদ্রসংজ্ঞক আর্য্য সন্তানগণ ! দিব্যধামবাসী দেবনন্দনগণ ! তোমাদের মন হইতে ঘৃণা লজ্জা অপমান লাঞ্ছনা কি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে ? তোমাদের মনুষ্যত্ব কি একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে ? নতুবা কেমন করিয়া আজিও স্মৃতি সংহিতা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের পা চাটিয়া পশুর মত কুকুরের মত পড়িয়া আছ ? ধিক্ তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য্যকে, ধিক্ তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও উপাধিকে, ধিক্ তোমাদের কাপুরুষোচিত আন্দোলন আলোচনাকে ? তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে যাইতেছ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পা চাটিয়া, তৈল মাখাইয়া ঘুঁসদিয়া একখানা ব্যবস্থা পত্রের চোতা সংগ্রহ করিয়া কয়দিন হট্টগোল করিতেছ—এবং জন কয়েক টিকিধারী মুণ্ডমালার দাঁত খেঁচুনি দেখিয়াই ভয়ে ডরে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোবরজল খাইয়া মাথা মুণ্ডন ও ঘোল ঢালিয়া আবার যে মুষিক, সেই মুষিকই সাজিতেছ। যদি সাহসেই না কুলায় ত অমন বড় হইবার সাধ কর কেন ? অমন বড় হওয়ার সাধকে শতবার ধিক ! যে শাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ তোমাদিগকে কুক্কুর, বিড়াল অপেক্ষাও হীন করিয়া, হেয় অবজ্ঞাত অপদার্থ করিয়া রাখিয়াছে—সেই শাস্ত্রের সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট আবার প্রতিকার প্রার্থনায় গমন কর ? যে শাস্ত্র তোমাদিগকে শয়তান অপেক্ষাও ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে—সেই শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আবার গৌরবান্বিত হও। দেখিলে ত শাস্ত্রকারগণ শূদ্রগণকে কি বলিয়াছেন। তবুও মায়া, তবুও শাস্ত্রানুরাগ,—শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধারের চেষ্টা ! হায়রে বিষ্ণুমায়া !! ফেলে দাও শাস্ত্র ফাস্ত্র স্মৃতি সংহিতা, ফেলে দাও বিধি নিষেধ ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্ত !

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া—বচনের শক্তিতে কে কবে বড় হইয়াছে? কোন্ জাতি কোন্ সমাজ কবে উন্নত হইয়াছে? মনঃপ্রাণে আচার ব্যবহারে শূদ্রত্ব পরিহার কর। মুখে বড় বলিলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হইতে অনেক তৈল মসল্লা লাগে। অনেক অর্থ-ব্যয় শরীর ক্ষয় হৃদয়-শোণিত-দান স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ দরকার। স্মৃতি সংহিতা গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দাও। যে শাস্ত্র মানুষকে দেবতা করে না, হিংসাই যাহার মূল মন্ত্র, বিদ্বেষ যাহার পত্রে পত্রে, ভেদ বুদ্ধি যাহার ছত্রে ছত্রে—তাহা কি আবার শাস্ত্র—ধর্ম্মবিধি? শূদ্রকে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদির দাস—সেবক—গোলাম! তোমরা কি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর দাস বলিয়া চিরকালই—চারিযুগই পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে? শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ভগবতীর অংশ কলা মাতৃদেবীকে কি চিরকালই দাসী বলিয়া মন্ত্র পড়িবে? ওরে নির্ব্বোধগণ! মা যাদের দাসী, তারা কি কখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা বড় হইতে পারে? মাতৃদেবীকে যে শাস্ত্র দাসী, পিতৃদেবকে যে শাস্ত্র দাস বলে—ফেলে দাও সেই শাস্ত্র যমুনার জলে! এইটুকু সাহস ও হৃদয় বল লইয়া বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে চাও? শূদ্রত্ব যে হাড়ে হাড়ে রক্তে রক্তে প্রবেশ করিয়াছে! সাধনার পবিত্র জলে মনের ময়লা, চিত্তের কুসংস্কার, হৃদয়ের অবসাদ ধৌত করিয়া ফেল। সৎশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হও—বেদের শরণ লও, বেদান্ত চর্চ্চায় মনোযোগ দাও। স্মৃতি সংহিতার খোসা ভূসি ফেলিয়া দিয়া বেদের শিক্ষা গ্রহণ কর। অসার স্মৃতি, ভূষা সংহিতা ফেলিয়া দিয়া বেদের ও উপনিষদের সার তত্ত্ব এবং বেদ বেদান্তানুমোদিত সার শাস্ত্র আশ্রয় কর। বেদবেদান্ত গীতা ভাগবতের সহিত যাহার ঐক্য আছে, সামঞ্জস্য সমতা আছে, তাহাও গ্রহণ কর। হউক না যদিও তাহা স্মৃতি সংহিতা পুরাণ তন্ত্র। বেদ-প্রামাণ্য শাস্ত্রই শাস্ত্র এবং বেদ অপ্রামাণ্য শাস্ত্রই

অশাস্ত্র। শুধু হিন্দু শাস্ত্র কেন, বেদের সঙ্গে বাইবেল কোরাণ ধর্ম্মপদ ত্রিপিটকের যে টুকু মিলে, তাহাও গ্রহণ কর।

শুন তবে শূদ্র কথিত দেবাংশগণ! আশায় বুক বাঁধিয়া বৈদিক ধর্ম্ম শ্রবণে অবহিত হও। সংহিতাদি শাস্ত্র তোমাদিগকে হীন নীচ অধম অস্পৃশ্য বলিলেও প্রকৃত পক্ষে তোমরা অধম অস্পৃশ্য হীন নীচ নহ। তোমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের সন্তান। জীব মাত্রেই তাঁহার সন্তান—অংশ। শুধু তুমি আমি ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, দ্বিজ চণ্ডাল, আর্য্য ম্লেচ্ছ, হিন্দু যবন বলিয়া নহে—জীব মাত্রেই—এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সন্তান—অংশ। অবিদ্যা বশে—ভ্রান্তি বশতঃ আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বৈরভাব, বিদ্রোহাচরণ করিতেছি, ঘৃণা অবমাননা আপন পর শত্রু মিত্র বোধ করিতেছি। এক স্নেহময় করুণাময় ভগবানই আমাদের স্রষ্টা জনক জননী পিতামাতা। শুধু ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, শুধু হিন্দু বলিয়া নহে—পৃথিবীর সমুদয় নর নারীই এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর আবদ্ধ। যে গৃহে, যে পরিবারে পুত্র কন্যাগণ, ভাই ভগিনীগণ পরস্পর ভালবাসায় প্রেম প্রণয়ে আবদ্ধ, সে গৃহ কেমন আনন্দময়! সেই গৃহেই গৃহ দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ সতত বিরাজ করেন। আর যে গৃহে পরস্পর ভালবাসা, প্রেম প্রণয় স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ অভিমান গর্ব্ব বিরাজ করে, সে গৃহের গৃহস্বামী পিতা মাতা কত কষ্টই—কত মনোবেদনাই না পাইয়া থাকেন। এই বিরাট বিশ্বে আমরা সকলেই বিশ্বেশ্বর ভগবানের সন্তান, জগজ্জননী ভগবতীর পুত্রকন্যা—এক মানব পরিবারভুক্ত। এখানে কি আমাদের ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ করা কখনও উচিত। যে পরিবারে ভাই ভগিনীগণের মধ্যে পরস্পর

মধুমাখা স্নেহ ভালবাসা নাই, সে পরিবার যে শ্মশান তুল্য ভয়ঙ্কর স্থান! পিতা মাতার কত কষ্টের কারণ। ব্রাহ্মণ! তুমি নীচ আভিজাত্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, অন্ধ হইয়া অন্য ভাইকে হাড়ি ডোম চণ্ডাল বলিয়া, পারিয়া মেঘ পঞ্চম বলিয়া কি দারুণ ঘৃণাই না করিতেছ? কিন্তু একবার তুমি বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করিয়া অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তাহাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ দেখি—যাহাদিগকে তুমি ঘৃণা কর, তাহারা তোমার কে? তাহাদের সঙ্গে তোমার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই না রহিয়াছে? ইহারা যে সকলেই তোমার জগজ্জননী ভগবতীর স্নেহের সন্তান—দয়াল হরির প্রিয়তম পুত্রকন্যা—তোমার বড় আপনার—ভাই ভগিনী আত্মীয় সুহৃৎ! এমন ভাই ভগিনীগণকে যাহারা বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করে—তাহারা পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে। হে সন্তানের জনক জননীগণ! একবার ভাবিয়া দেখ, যদি কেহ তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে অপমান ঘৃণা কি পদ দলন করে, প্রহার করে—আঘাত করে—তবে তোমাদের মনে কি ভাব হয়? আর যিনি তোমাদিগের সন্তানদিগকে আদর ও স্নেহ করেন, তাহাদের প্রতিই বা কিরূপ ভাব জন্মে? পুত্রকন্যাদিগকে ভালবাসিলে পিতামাতার ভালবাসা পাওয়া যায় এবং পুত্র কন্যাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিলে পিতামাতার অসন্তোষ ও বিরাগভাজন হইতে হয়। ইহা বুঝিয়া চণ্ডাল পারিয়া কথিত তাঁহার দীন সন্তানগণের প্রতি, তোমার অভাজন অজ্ঞ অনুন্নত অবজ্ঞাত ভাই ভগিনীগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ কর। ইহারা যে সকলেই তোমারই পরম পিতার স্নেহের সন্তান। ইহাদিগকে ভাল বাসিলে, আদর যত্ন ও সেবা করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—নতুবা তাঁহার দীনার্ত্ত সন্তানগণকে ঘৃণা করিয়া পদতলে দলিত করিয়া চাল কলার নৈবেদ্য লুচি পরমান্নের ভোগ দিয়া নারায়ণের

প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না। (১) পুত্রের নিগ্রহে যে পিতারই নিগ্রহ করা হয়—পুত্রের দেহ যে পিতারই দেহ। পুত্রের নাম যে আত্মজ অঙ্গজ। আত্মাই যে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র ও পিতা কি আবার পৃথক—ভেদ? যেই পুত্র সেই পিতা? মালদহের আম্রবীজ যদি অন্য দেশে রোপণ করা যায়—তবে সে বীজ হইতে আম্রবৃক্ষই এবং আম্রই জন্মে—কাঁটাল কিম্বা জাম, আতা বা পেয়ারা জন্মে না। তবে হাঁ, জল বায়ু মাটীর গুণে, যত্নের গুণে আম ছোট বড় বা টক হইতে পারে, এইটুকু মাত্র পার্থক্য। যদি বাস্তবিক ভগবানই আমাদের স্রষ্টা হন—জনক হন—পিতা হন, তবে আমরা কেহই হীন নই, মানুষ বা পশু নই, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র নই, দ্বিজ বা চণ্ডাল নই। এ গুলিকে আমরাই পৃথক পৃথক ভাবে চিনিবার জন্য ঐরূপ সংজ্ঞা দিয়াছি বা নামকরণ করিয়াছি মাত্র। আর যদি ভগবান্ সৃষ্টি না করিয়া গাধিরাজ নন্দন বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় আর কোন মুনি শূদ্রদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে ত কোন কথাই নাই। বিশ্বামিত্র বা তৎতুল্য কোন মুনি সৃষ্ট শূদ্র অপেক্ষা ভগবানের সৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই গৌরব করিবার বা বড় বলিবার অধিকার আছে। হিন্দুসমাজ না ক্ষেপিলে ক্ষুদ্র নগণ্য সৃষ্ট পদার্থকে স্রষ্টা ভগবানের আসন দিয়া 'আশু ধান্য সবার কলায় সমস্যা' সমাধান করিতে চেষ্টা করিত না। যাহা হউক, শ্রীভগবানই যে লীলাচ্ছলে জীব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অদ্বৈতবাদী হিন্দুর পক্ষে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। শাস্ত্রকার কি বলেন, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন তাঁহারা যখন কোন কথা

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)
"জগতের পিতা শ্রীকৃষ্ণ এবং মাতা শ্রীরাধিকা।"

কাণে তুলিতে চাহেন না, তখন শাস্ত্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলা যাই-তেছে। ভরসা করি, বিজ্ঞ ধীর দয়ালু পাঠকগণ অবিরত শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ নীরস করার অপরাধে লেখককে কৃপা পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

জীবরূপে ভগবান্।

জীব যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, অবিদ্যা ও মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যে মানুষাদি নানাবিধ ইতর যোনি প্রাপ্ত হন—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিতেছেন—

অন্ত্যপক্ষি স্থাবরতাং মনোবাক্কায় কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রয়াতি জীবোঽয়ং ভবং যোনি শতেষু চ॥ ১৩১

৩য় অধ্যায়; যাজ্ঞ-সংহিতা।

"এই জীব বস্তুতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহরোগাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম্মজনিত দোষে চণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হন, আর অন্যান্য শত শত জন্মে ও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন।"

পূর্ব্বোক্ত কথা আরও ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তিনি পুনরায় বলিয়াছেন :—

যদাহি ভরতো বর্ণৈর্ব্বর্ণয়ত্যাত্মন স্তনুম্।
নানারূপানি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মদাস্তনূঃ॥১৮২ ঐ

"যেমন নট নানাপ্রকার রূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানা বর্ণে বিচিত্র করে, সেইরূপ আত্মা (আত্মারূপী ভগবান্) কর্ম্মফল ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন"

"সেই অনাদি পরমপুরুষই, শরীর ধারণ দ্বারা আদিমান্ ও কুজত্বাদি বিকার সম্পন্ন হন।"

অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপঃ স বিকার উদাহৃতঃ ॥১৮৩

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :—

"হে রাজন্! মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি ও দেবতারূপ শরীর সকল ভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি সেই সকল পুরে জীবরূপে শয়ন করেন, এই জন্য ইনি পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল শরীরেই হরি তারতম্য ভাবে অবস্থিত। * * * কিন্তু পুরুষ (জীব) দ্বেষিগণকে প্রতিমা, পূজিত হইয়াও ইষ্টফল দান করেন না।" (১)

ভগবান স্বয়ংই স্রষ্টা ও সৃজিত। শ্রীমদ্ভাগবতকার পুনরায় বলিতেছেন :—

"এই প্রভু ঈশ্বর আত্মাই এই বিশ্বরূপে সৃষ্ট হন ও স্রষ্টারূপে সৃষ্টি করেন—পালিত হন ও পালন করেন—লীন হন ও লয় করেন।" (২) আর্য্য ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলা ত দূরের কথা, ভগবান বলিতেছেন—ভূমণ্ডলের যত সৃষ্ট পদার্থ আছে, সকলই আমি। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বত্রই আমি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "একমেব অদ্বিতীয়ং।" জলে আমি স্থলে আমি,—স্বর্গে আমি মর্ত্ত্যে আমি, ঊর্দ্ধে আমি, অধোদেশে আমি, চন্দ্রে আমি, সূর্য্যে

(১) অনুবাদ—সপ্তম স্কন্ধ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

(২) উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, একাদশ স্কন্ধ; ২৮ অধ্যায়।

আমি, গ্রহে আমি, উপগ্রহে আমি, নক্ষত্রে আমি, উল্কায় আমি। ওহে আমি আমি, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনলে আমি, অনিলে আমি, মেঘে আমি, বিদ্যুতে আমি, আকাশে আমি, পাতালে আমি, গৃহে আমি কান্তারে আমি, বেশ্যালয়ে আমি, দেবালয়ে আমি, পর্ণকুটীরে আমি, অট্টালিকায় আমি। আমি নই কোথায়? আমিই যে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া আছি। ব্রাহ্মণে আমি, চণ্ডালে আমি, রাজায় আমি, ভিখারীতে আমি, আর্য্যে আমি, অনার্য্যে আমি, ম্লেচ্ছে আমি, যবনে আমি, বিষ্ঠায় আমি, চন্দনে আমি, চোরে আমি, সাধুতে আমি। আমিই সব। অন্নে আমি, বস্ত্রে আমি, খাদ্যে আমি, অখাদ্যেও আমি, মানুষে আমি, পশুতে আমি, কীটে আমি ক্রিমিতে আমি, বৃক্ষে আমি লতিকায় আমি, ফুলে আমি ফলে আমি। তথাপি হায় তুমি ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া মরিতেছ। তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, আর্য্য মনে করিয়া অন্যকে আমাকে পদদলিত করিতেছ, আমারই মস্তকে ক্ষুদ্র জীব তুমি পা উঠাইয়া দিতেছ! শূদ্ররূপী শিষ্যরূপী সেবকরূপী আমাকে পাদোদক খাওয়াইয়া স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছ!”

অনেকে অদ্বৈতবাদ শুনিয়া হয় ভ্রম করিয়া বসেন নয় শিহরিয়া উঠেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ অদ্বৈত বাদটুকু একেবারে একচেটিয়া করিয়া লইয়া বলিতেছেন, ‘আমরাই ভগবান নারায়ণ কলির দেবতা কল্কিঅবতার। গুরুদেব রূপে দাস শূদ্রকে দীক্ষা মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেই, ভয়ানক ভব-সমুদ্র পার করিতেই আমাদের মর্ত্তে আগমন! আমাদের জন্মগ্রহণ নয় অবতীর্ণ হইবার ইহাই একমাত্র কারণ!’ ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি বৈরাগী ও বাবাজি মহাশয়গণও একখানি ঠাকুরঘর তুলিয়া ২।৪টী ঠাকুর কিনিয়া বা কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া দিব্য ভবকর্ণধার সাজিয়া লক্ষ

লক্ষ লোককে দীক্ষা শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবীগণ সহ সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ লালসা চরিতার্থ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের অদ্বৈতবাদ হইতেছে—নিজেদের বেলায় নিজেদের লইয়া—অন্যের বেলায় শূদ্রদের বেলায় নহে। শূদ্রদের ত দূরের কথা, সহধর্ম্মিণী ব্রাহ্মণীগণের বেলায় পর্য্যন্ত নহে। কেননা, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের মধ্যে গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণীগণেরও শূদ্রগণের ন্যায় ওঁঙ্কার উচ্চারণে, বেদমন্ত্র পাঠে, শালগ্রামাদি বিগ্রহ পূজায় অনধিকারিণী করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের হাতে যখন কলমরূপী চাবুক ছিল, তখন তাঁহারা যে শূদ্রদের পিঠে নির্ম্মম ভাবে মারিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আর ব্রাহ্মণী-গণের সম্বন্ধে ? সেটা কিছু বিস্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নহে—কারণ তাহারা অবলা নারী জাতি, তা হৌক না কেন মাতা ভগ্নী, স্ত্রী কন্তা ; পুরুষত নয়, নারীত বটে ? ধিক ব্রাহ্মণ তোমাদের ! এইটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ নীচ প্রবৃত্তি লইয়া আবার আর্য্য হইতে সাধ ? প্রণামের দাবী, ভগবান হইবার আকাঙ্ক্ষা ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পরে বলিতেছেন—"যেমন সুবর্ণ সমুদয় সুবর্ণ নিৰ্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বেও ছিল পরেও থাকিবে ; তাহা সুন্দর রূপে গঠিত ও নানা নামে (বলয়, অনন্ত, মাকড়ি, সিঁথি—হার,নথ) ব্যবহৃত হইলে ও তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে ; সেইরূপ আমিও এই বিশ্বের হেতুভূত,—পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে অবস্থিত। * * * যে কার্য্য ও প্রকাশিত পদার্থ পূর্ব্বে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ছিল না, পরেও থাকিবে না,—তাহা মধ্যেও নাই ;—কেবল নাম মাত্র। কারণ, যাহা যাহা অন্তদ্বারা জাত ও প্রকাশিত, তাহা তাহাই হইবে—আমার এই ধারণা। এই যে বিকার সমূহ, (নাম রূপাত্মক জগৎ) ইহা পূর্ব্বে ছিল না ; ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রজোগুণ দ্বারা (ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে) ইহা সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রকাশক ; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মোট দশ ইন্দ্রিয়), তন্মাত্র (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইহারা পঞ্চ তন্মাত্র); মন ও পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম বা মাটি জল তেজ বায়ু আকাশ) ইত্যাদি (১) নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমুদয় জগৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক তদীয় অংশ ও অঙ্গ হইতেই সৃষ্ট জাত ও প্রকাশিত। তিনি সমুদয় জীব-জগতের জন্মদাতা জনক পিতা। তিনি জগতের, প্রতি জীব জন্তুর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার অন্তরে বাহিরে ও মধ্যে বিরাজমান আছেন। সুতরাং জগতের প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর যোগ সম্বন্ধ জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা আছে। আমরা তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিলেও আছে। এই বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞান লাভই মুক্তি—নির্ব্বাণ। মহাকাশে ঘটাকাশ লয়,—মহাসাগরে জল বিম্বের লয়। এক মহাকাশের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ঘটাকাশ ঘটের বাহিরেও আকাশ ভিতরেও আকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া দাও—ঘটাকাশ মহাকাশে ডুবিয়া লয় হইয়া যাইবে। একই আকাশ ভিতরে (ঘটের

---

(১) অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক যে এই দেহ ; ইহা ভগবান হইতেই উদ্ভূত সৃষ্ট ও জাত। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরবয়ব ও উপাধি-বিহীন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য তিনি সগুণ, সোপাধি ও অবয়বধারী। ব্রহ্ম রজঃগুণে সৃষ্টি সত্ত্বগুণে পালন ও তমঃ গুণে সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। দর্শন শাস্ত্র মতে এই ত্রিগুণ গুণ পদার্থ কিন্তু সাঙ্খ্যাচার্য্যের মতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সূক্ষ্ম পদার্থ বা মহা অণু। এই তিন জাতীয় মহা অণুর নানাভাবে সংযোগ বিয়োগ হেতু ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), অহঙ্কার, সূক্ষ্ম তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভিতরে) ও বাহিরে। ঘটের মাটির আবরণই উহাকে মহাকাশ হইতে পৃথক করিয়াছে—পৃথক ঘটাকাশ নাম দিয়াছে। আবরণ—আচ্ছাদন টুকু ভাঙ্গিয়া দিলেই এক হইয়া যায়। বহু ঘটত্ব এক মহাকাশত্বে বহুত্ব এক মহান্ একত্বে, শান্ত মহা অনন্তে,খণ্ড মহা অখণ্ডে, রূপ অরূপে মিলিয়া যায়। দ্বন্দ্ব শুধু বাহিরের ঘট লইয়া, আবরণ লইয়া—খোসা লইয়া। পাখী যেমন ঘটনাচক্রে মানুষের হাতে পড়িয়া কখন স্বর্ণ পিঞ্জরে কখন লৌহ-পিঞ্জরে কখন বা বাঁশ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়ব বিশিষ্ট পিঞ্জরে আবদ্ধ হয় এবং সময়মত খাঁচা ভাঙ্গিয়া এক দৌড়ে দূর বৃক্ষস্থিত পিতা-মাতার নিকট আপনার বাসায় ছুটিয়া পলায়;—জীব ভগবান সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ উপমা প্রয়োগ করা যাইতে পারে! আত্মারূপী ভগবান-পাখী ভগবদিচ্ছাশক্তি প্রভাবে মানুষ পশু পক্ষী ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি মনুষ্য কথিত কতকগুলি জীব দেহরূপ বিভিন্ন জাতীয় পিঞ্জরে বাসনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং নিয়মিত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে আবার এক দৌড়ে আনন্দময় স্ব আবাসে ছুটিয়া গিয়া থাকে। ভিতরে সেই একই পাখী, তফাৎ কেবল বিভিন্ন আকৃতির খাঁচা লইয়া—পিঞ্জর লইয়া। খাঁচার, বরং সোণা লোহা বাঁশ কাঠের ভেদ আছে; কিন্তু বিভিন্ন জীব-দেহ সম্বন্ধে কোন্ ভেদ নাই। সমুদয় চৈতন্যশালী প্রাণীর দেহ কিন্তু এক উপাদানে—ঐ ২৪শতি তত্ত্বে নির্ম্মিত। উহাতে মনুষ্য পশু পক্ষী ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোন পার্থক্য নাই; আর ভিতরের সকলেরই সেই একই আত্মা—ভগবদংশ। আত্মাতে লিঙ্গ বয়স জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের একই উপাদান; একই জাতীয় পিঞ্জর। পিঞ্জরের তফাৎ মানুষে পশুতে—পক্ষীতে কীটেতে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। একজন লোক যেমন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইল। প্রথম তাহাকে থানায়

আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, পরে বিচার অনুযায়ী তাহার ক্রমে সব-ডিভিসনের জেল—জেলার কারাগার ও কলিকাতা আলিপুরের জেল হইয়া কিছুদিন তথায় আবদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মদেশের পঞ্জাবের বা একেবারে আণ্ডামান দ্বীপের জেলে তাহাকে পাঠান হইল। সেখানে নিয়মিত ২০ বৎসর অবস্থান করার পর সে মুক্ত হইয়া দেশে আপন বাটীতে পিতামাতার নিকট আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। জীবদেহ ও আত্মারূপী ভগবান সম্বন্ধে ইহা দ্বারা একটু বুঝিবার সুবিধা হইতেছে। ভগবানরূপী আত্মা যেন দণ্ডিত কয়েদী; থানা—সবডিভিসন, জেলা আলিপুর ও আণ্ডামানের কারাগারগুলি যেন এক একটি জীব দেহ। কোনটী মানুষ, কোনটী পশু, পক্ষী কোনটী কৃমি কীট, কোনটী স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা ইত্যাদি জেল বিভিন্ন বটে—উহাদের আকৃতিও বিভিন্ন বটে; কিন্তু ভিতরে সেই একই লোক একই কয়েদী। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব আরও একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। যেমন বালিস! লাল নীল সাদা কাল ডোরা ডুরি খোলের জন্য বালিসেরও ঐ রূপ সাদা বালিস; কাল বালিস; লাল বালিস প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে মাত্র। নতুবা ভিতরে সকলেরই এক সাদা শিমুল তুলা। তফাৎ কেবল বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রংএর খোল লইয়া। খোল ও এক সুতারই নির্ম্মিত; তবে লাল নীল সবুজ রংএর রঞ্জিত হইয়া উহারও নাম পৃথক্ হইয়াছে। ভগবানও ঐরূপ—তিনি যেন ভিতরস্থ শিমুল তুলা আর বিভিন্ন জীব দেহ যেন বিভিন্ন আকৃতির; বিভিন্ন রংএর খোল। একটা খোল পুরাতন জীর্ণ হইয়া ফাঁসিয়া বা ছিঁড়িয়া গেলে গৃহস্থ যেমন উহার তুলা লইয়া আর একটা খোলে ভরিয়া অন্য একটা বালিস তৈয়ার করে, সেইরূপ, আত্মারূপী ভগবানও এক জীর্ণ দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক আর এক নূতন দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য একটি

জীব নাম ধারণ করেন। পূর্ণ ভগবান যেন শিমুল গাছ—আর অংশরূপী আত্মা যেন শিমুল তুলা। বলা বাহুল্য, এসব উপমা দ্বারা জীব ও ভগবান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে মাত্র। জীব যে ভগবানেরই অংশ এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে আত্মা রূপী ভগবানের অংশ বিরাজমান আছে, ইহাই বুঝাইবার জন্য আমার এই চেষ্টা।

"ধর্ম্মেরও প্রথম ও প্রধান শিক্ষা এই যে, আত্মা এক এবং আমাদের বহুত্ব জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার অংশ এবং সেই একেতেই চির প্রতিষ্ঠিত। আত্মা এক এবং পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা সকল সেই একই আত্মার অংশ বা অংশুমালা; সুতরাং তাহারা সর্ব্ব সাকল্যে এক। গীতা বলিতেছেন :—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪

(১৩শ অধ্যায়)

"এক সূর্য্য প্রকাশয়ে সকল ভুবন।
ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন॥"

বেদান্ত বলিতেছেন :—

একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ঃ

(শ্বেতাশ্ব ৬; ১১)

"এক অদ্বিতীয় দেব বিশ্ব প্রাণ।
সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান॥

সর্ব্বব্যাপী তিনি আত্মা সবাকার।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতে স্থিতি তাঁর ॥
সাক্ষী তিনি সকলের চেতন কারণ!
কেবল, নির্গুণ তিনি জগত জীবন ॥"
"যেমতি মেঘের এক সুনির্ম্মল বারি।
ভিন্ন দেশে পড়ি হয় ভিন্ন রসাধারা,
তেমতি অদ্বৈত এক-রূপ নির্ব্বিকার

* * * *

হইয়াছে গুণ ভেদে ভিন্নরূপ ধারী ॥"
স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু সূক্ষ্ম নিরাকার।
সপ্তলোকাশ্রয় একা তুমি নারায়ণ ॥"

(ধর্ম্ম প্রচারক—শ্রাবণ, ১৩২০)

"এক সূর্য্য স্বপ্রভায় ভাস্বর হইয়া জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক খণ্ড প্রতিভাসিত করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীরবেষ্টিত সহস্র উদ্যান যেরূপ একই সূর্য্যের তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হয় (ঐ তাপ ও আলোক একই সূর্য্যের অংশ) সেইরূপ জড় প্রকৃতির প্রাচীরে পরিবেষ্টিত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহবদ্ধ জীবাত্মা সকল পরমাত্মারূপ একই সূর্য্যের অংশুমালা একই মহাপাবনের বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ, একই অদ্বয় আত্মার অংশ (কিন্তু) যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হই, ততদিন আমরা এই গুহ্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিব না।" আর একটী উপমা দেওয়া যাউক—

ভগবান্ যেন এক বিস্তৃত অসীম জলাশয়, আর আত্মা যেন তন্মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থ জল আর দেহ যেন ঐ জল মগ্নস্থ ও জলপূর্ণ ঘট। জলাশয়ের জল ও ঘটস্থ জল একই কিন্তু ঘটের আবরণে উহা পৃথক বোধ হইতেছে।

ঘট ভাঙ্গিয়া দাও, ঘট মধ্যস্থ জলাশয়ের জল জলাশয়ে মিশিয়া লয়—এক হইয়া যাইবে।

"একই আত্মা সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত আছেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সুতরাং সর্ব্বভূতই এই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ।"

বস্তুতঃ ভগবান কি মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ দেখিতে পারেন? তাঁহার চক্ষে যে সবই সমান। তিনি যে সকলের অন্তরে বাহিরে সমান ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তিনি গীতায় বলিতেছেন :—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

(ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায় ;)

"হে গুড়াকেশ! পরমাত্মা স্বরূপে আমি সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিতি করি। এবং আমিই সমস্ত ভূতের আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সংহার কারণ। ফলতঃ ভূত সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণই আমি!"

তৎপরে তিনি আপনাকে সূর্য্য চন্দ্র পর্ব্বত গো অশ্ব পক্ষী সর্প প্রভৃতি সর্ব্বময় বলিয়া শেষে আবার ঘোষণা করিতেছেন :—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহর্জ্জুন!
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরং ॥

"সর্ব্বভূতে যাহা বীজের স্বরূপ
আমি সে অর্জ্জুন তাই
চরাচর মাঝে আমারে ছাড়িয়া
কভু কোথা কিছু নাই॥"

পুনঃ পুনঃ ভগবান এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
"বিনাশী সকলি এই বিশ্ব চরাচরে ।
অবিনাশী তার মাঝে কেবল ঈশ্বর ॥
তাঁরে যেই হেরে সর্ব্বভূতের অন্তরে ।
তাঁরি সেই দেখা, দেখা, শুন অতঃপর ॥"
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং ॥

"পরমেশ্বর সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন, লোকে ইহা অবলোকন করিয়া আত্মার দ্বারা আর আত্মার (আত্মরূপী ভগবানের) হিংসা করেন না এবং তজ্জন্য পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।" ২৮

যদা ভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

(গীতা, ১৩শ অঃ)

"যখন পৃথক ভূত এক দৃষ্ট হয় ।
একেরই বিস্তার সব জানেন নিশ্চয় ॥
তাঁহার দেখাই দেখা, সত্যজ্ঞান তাঁর ।
ব্রহ্মপদ লাভ হয় তখন তাঁহার ॥

গীতায় পুনরায় বলিতেছেন :—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামাচরং চরমেবচ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচতৎ ॥ ১৫

১৩শ অধ্যায় ।

"তিনি (শ্রীভগবান্) চরাচর সর্ব্বভূতের বহির্ভাগ ও অন্তরে স্থিতি করিতেছেন, আর সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত তিনি বিজ্ঞেয় নহেন, তিনি অতি দূরবর্ত্তী অথচ সন্নিকটে আছেন।"

হায়! আমরা সর্ব্বভূতে অবস্থিত শ্রীভগবানকে ম্লেচ্ছ শূদ্র চণ্ডাল শ্বপচ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া দিন দিন কি সর্ব্বনাশের পথেই না চলিয়াছি? আমাদের কি মোহ ভাঙ্গিবে না? পাছে তাঁহার লীলা-সহায়ক জীবকে লোকে ঘৃণা করে, এই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "আমিই জীব আমিই বিশ্ব, জীবেতে আর আমাতে কোন পার্থক্য নাই—আমি যে অনন্ত, আমিই যে এ বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছি—আমারই মধ্যে যে সকলে রহিয়াছে—সুতরাং বিশ্বকে বা জীবকে ভাল বাসিলে আমাকেই ভালবাসা হয় এবং জীবকে ঘৃণা করিলে আমাকেই ঘৃণা করা হয়।" কিন্তু আমরা এই ভগবদ্বাক্য শুনিতে প্রস্তুত আছি কি? আমরা ইহা বিশ্বাস করি কি? এই বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্তই ত তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই সব কথা বলিয়াছেন।

ফলতঃ সকলকেই যে সমান চক্ষে দর্শন করা উচিত—কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড়, এরূপ বৈষম্য ভাব হৃদয়ে স্থান না দেওয়াই যে কর্ত্তব্য এবং জগতের যাবতীয় মহাপুরুষ ও জ্ঞানিগণ যে সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়াছেন ও দেখিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়! পণ্ডিত জ্ঞানী মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ধরাধামে কীর্ত্তি মন্দির স্থাপন করতঃ অন্তে অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন—আমাদেরও কি সেই পথ অবলম্বন করা ও তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে? আমরা কি জ্ঞানিগণের সত্য-

পথ পরিত্যাগ করিয়া অশাস্ত্রীয় ঘোর নরকের পথে যাইবার জন্য সকলে দলবদ্ধ হইব ? মানুষকে ঘৃণা করিয়া—অপরকে আপনাপেক্ষা নীচ বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বত্র ছোট বড়, এই ঘোর বৈষম্য অবলোকন করিয়া কোনও মানব সন্তান জগতের সম্মানার্হ হইয়াছেন—বা পরম জ্ঞানী বলিয়া পৃথিবীর চক্ষে পরিচিত হইয়াছেন—এমন কথাত কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই বা কল্পনা করিতে পারেন না। আর্য্য শাস্ত্রেত জ্ঞানী ও পণ্ডিতের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে!

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ॥'

যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখেন, শুধু দেশবাসী নহে যিনি পৃথিবীবাসী নরনারীকে আপনার প্রিয় মনে করিয়া সকলকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করেন—তিনিই পণ্ডিত তিনিই জ্ঞানী। যিনি সর্ব্বভূতকে ঘৃণা করেন তিনি পণ্ডিত নহেন—তিনি মহামূর্খ মহা অজ্ঞান, তাঁহাকে নরক রাজ্যের ভাগ্যহীন ক্ষমার্হ প্রজা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি। জ্ঞানীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম দর্শিনঃ"॥১৮

গীতা, ৫ম অধ্যায়।

"জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কাহাকেও ছোট বড় দেখেন না বা কাহাকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না।"

এইরূপ কথা আর্য্যশাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বিশেষতঃ স্থানাভাব। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ শুধু

উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই অপিচ স্পষ্টতঃ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান ও সমদৃষ্টি ব্যতীত পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রিয় মনুসংহিতার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। মহাভারতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি শ্লোক নিবদ্ধ আছে। বেদান্ত বা উপনিষদেও প্রমাণের অভাব নাই। তবু ও মনুর উক্তি যাঁহারা সবিশেষ বিশ্বাস করেন তাঁহাদের জন্য মনুসংহিতা উদ্ধৃত হইতেছে। যখন সর্ব্বশাস্ত্রকারগণই একযোগে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন তখন মনুও বাধ্য হইয়া বলিতেছেন :—

"সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তি মুত্তমেষ্বধমেষু চ॥ ৬৫
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্ম কারণম্॥ ৬৬

মনু, ষষ্ঠ অধ্যায়।

"যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং কি উত্তম কি অধম সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিবে। যে কোন আশ্রমের আশ্রমীই আশ্রম বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দুষিত হইলেও "সর্ব্বভূতে সমদর্শী" হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিবে।"

সকলকে সমান চক্ষে দেখিলে শুধু মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ হয় এমন নহে পরন্তু ইহার উপর ব্রহ্মত্ব লাভ পর্য্যন্ত নির্ভর করে। মনু দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমঃ পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্য মধিগচ্ছতি ॥৯১

"আত্মযাজী সমুদয় ভূতে আত্মাকে (আত্মারূপী ব্রহ্মকে) সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।"

এই প্রকারে বেদান্তের সারভূত মহান্ সত্য "সর্ব্বজীবে ভাল বাসা জীবব্রহ্মে অভেদ অনুভূতি" সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে গ্রন্থের উপসংহারে চরম শ্লোকে প্রাণ খুলিয়া—হৃদয় ভরিয়া বলিতেছেন। সত্যের বিমল আভায় বৈষম্য বাদের ঘনীভূত তমসা বিলীন ও হৃদয় দ্বার উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে—সরলতা মনঃমুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন :—

"এষ সর্ব্বানি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥১২৪
এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
ন সর্ব্বসমতা মেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥ ১২৫

দ্বাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা ; উপসংহার।

"এই পরমাত্মারূপী ব্রহ্মই পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া বৃদ্ধি ও নাশদ্বারা চক্রবৎ এই সংসার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এইরূপে যিনি আত্মাদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ ব্রহ্মলাভ করেন।"

এটী নিশ্চয় যে মানুষ সাধনার পথে যতই অগ্রসর হয়—যতই ভগবানকে আপনার বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে থাকে ততই সমুদয় বস্তুর ভিতর তাঁহাকে ও তাঁহার ভিতর সমুদয় বস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষ এই সাধনা ও প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হয়, তখনই এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যেযে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে প্রেমিক সাধকের দৃষ্টিতে সে সব সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না

ভগবান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্ব্বভূতই তাহাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া প্রেমিক ও জ্ঞানীব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তিপ্রয়োগ করা উচিৎ। ঐ শুনুন শাস্ত্রকার উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিতেছেন :—

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূত ময়ং হরিং॥ প্রহ্লাদ বাক্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীংচ
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরে শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী নক্ষত্রাদি ভূতগণ (প্রাণী সকল) দিকসকল নদী সাগর যাহা কিছু দৃষ্টপদার্থ সমস্ত ভগবান হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে। শুধু প্রণাম নহে সর্ব্বভূতে সর্ব্ব পদার্থে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের বিকাশ প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া নানা প্রকারে সম্বর্দ্ধনা ও সকলের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

* * * * স্থূণায়াং ধ্রুবায়াং শ্রিয়ৈ। হিরণ্যকেশ্যৈ বনস্পতিভ্যশ্চ॥ ৯॥ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্দ্বারে মৃত্যবে চ ॥ ১০॥ উদধানে বরুণায় ॥ ১১॥ বিষ্ণব ইত্যুলুখলে॥ ১২॥ মরুদ্ভ্য ইতি দৃষদি॥ ১২॥ উপরিশরণে বৈশ্রবণায় রাজ্ঞে ভূতেভ্যশ্চ॥ ১৪॥ ইন্দ্রায়েন্দ্র পুরুষেভ্য ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে॥ ১৫॥ যমায় যম পুরুষেভ্য ইতি দক্ষিণার্দ্ধে॥ ১৬॥ বরুণায় বরুণ পুরুষেভ্য ইতি পশ্চার্দ্ধে॥ ১৭॥ সোমায় সোমপুরুষেভ্য ইত্যুত্তরার্দ্ধে ॥ ১৮॥ ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য

ইতিমধ্যে ॥ ১৯ ॥ ঊর্দ্ধমাকাশায় ॥ ২০ ॥ দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতি স্থণ্ডিলে ॥ ২১ ॥ নক্তঞ্চরেভ্য ইতি নক্তম্ ॥ ২২ ॥

গৃহধারক সকর্ণ স্তম্ভে শ্রীহিরণ্যকশী বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের, গৃহদ্বারে মৃত্যুর, জলাধারে বরুণের, উলূখলে বিষ্ণুর, শিলাতে মরুদ্গণের, অট্টালিকার উপরে রাজা বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র পুরুষদিগের; দক্ষিণ ভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিম ভাগে বরুণ ও বরুণ পুরুষ দিগের, উত্তর ভাগে সোম ও সোম পুরুষ দিগের, মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম পুরুষদিগের, ঊর্দ্ধে আকাশের, স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূতগণের, রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশ্যে বলি দিবে।

সাধক ও ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন:—

জলে হরি স্থলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি।
অনল অনিলে হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল॥

শ্রীভগবান তদীয় প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিতেছেন:—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভি বন্দনং
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥" শ্রীমদ্ভাগবত।

আমার পরিচর্য্যায় আদর, সমুদয় অঙ্গদ্বারা আমার অভিনন্দন আমার ভক্তদিগের বিশেষ ভাবে পূজা ও সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা ভক্তিলাভের উপায়।"

ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই রাজর্ষি জনক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম ভাগবত ঋষভনন্দন হরি উত্তম ভক্তের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনিবা ভিদা
সর্ব্বভূত সমঃ" শান্ত "সবৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ একাদশস্কন্ধ।

"যাঁহার আত্মপর ভেদ নাই, ধনৈশ্বর্য্যে আমার এবং পরকীয় বলিয়া ভেদ জ্ঞান নাই যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযত করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভক্ত।"

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

একাদশস্কন্ধ।

"যিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য দেখিতে পান এবং সমুদয় পদার্থ ভগবানে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান তিনি উত্তম ভক্ত।"

আরও বলিতেছেন :—

ন যস্য জন্ম কর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়াঃ॥

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম এবং জাতি উপলক্ষ করিয়া যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি হয় না, তিনি হরির প্রিয় এবং উত্তম ভক্ত।"

তিনি আরও বলিতেছেন:—

ময়ি নিবদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

"যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎ পতীকে বশীভূত করেন; সেইরূপ "সমদর্শী সাধুগণ" আমাতে হৃদয় বাঁধিয়া আমাকে বশ করেন।"

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শনাঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

"সাধুপুরুষগণ কিছুরই অপেক্ষা করেন না; তাঁহারা আমাগত চিত্ত, প্রণতঃ, "সমদর্শন," নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ।"

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

গীতা।

"যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য—যাঁহার কাহারও প্রতি কোনরূপ হিংসার ভাব নাই * * * * * এমন যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।"

পিতা পুত্রে ভ্রাতা ভগিনীতে স্বামী স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ ও অনুরাগ যে প্রীতি ও ভালবাসা ইহার কারণ ও মূলও হইতেছে ব্রহ্মের একাত্ম ভাব। ভগবানের অংশরূপী আত্মার সম্বন্ধেই পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ। নতুবা কোন সম্বন্ধ নাই। যেহেতু আত্মারূপী ভগবান পরিত্যক্ত মৃত দেহের প্রতি,—মৃতস্ত্রী পুত্র স্বামীর প্রতি কেহ কোন প্রকার প্রীতি বা ভালবাসা প্রকাশ করে না। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীকে এই কথাই বলিতেছেঃ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

বৃহদারণ্যক। ২অঃ। ৪ ব্রা।

"হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভাল বাসে না, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

ঐ বৃহদারণ্যক। ২অঃ। ৪ ব্রা।

"হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্নীর অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।" এবং শুধু পত্নী পতি বলিয়া নহে, শুধু মাতা পুত্র বলিয়া নহে, বিশ্বের সমুদয় বস্তুর সহিতই সমুদয়ের যোগ আছে! কেননা বিশ্বাত্মা ভগবান সকলের মূলে।

ভগবান্ আর কি ভাবে জীবের সহিত আছেন। যেমন—

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ং
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

সেই বিজ্ঞান আনন্দময় ব্রহ্ম দুগ্ধ মধ্যে নবনীতের মত বা ননীতে ঘৃতের মত অতি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তঃকরণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বাত্মা ভগবান দ্বারা সমাচ্ছন্ন জানিয়া মায়া পাশ ছিন্ন করিবে।

স্কন্দোপনিষৎ বলিতেছেন :—

জীবঃ শিবঃ শিবোঃ জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ ॥ ৬
এবং বদ্ধস্তথা জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ।
পাশ বদ্ধস্তথা জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৭
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোহহম্ভাবেন পূজয়েৎ ॥ ১০

জীবই শিব এবং শিবই জীব। জীব যখন জীবভাব নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন তখনই তিনি শিব। যেমন তুষ বদ্ধ অবস্থার নাম ব্রীহি বা ধান্য আর তুষ মুক্ত অবস্থার নাম তণ্ডুল বা চউল। বস্তু একই কেবল বদ্ধ মুক্ত অবস্থা ভেদে—আবৃত ও আবরণ হীন অবস্থা ভেদে ভিন্ন বোধ হয়—ভিন্ন নাম হয়।

এইরূপ কর্ম্মবদ্ধ অবস্থার নাম 'জীব' এবং কর্ম্মনাশ ঘটিলে নাম হয় সদাশিব। অষ্টপাশ বদ্ধ শিবই জীব এবং পাশমুক্ত জীবই শিব। দেহই

দেবালয়; এই দেবালয়ে জীবরূপ শিব সদা বিরাজমান। অজ্ঞান রূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোঽহং ভাবে—আমিই সেই ব্রহ্ম এই ভাবে জীব রূপ শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকার আরও বলিয়াছেন :—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিনম্।

"ভগবানের অংশরূপী দেহী পরমাত্মাকে (জীবকে) দেহে পূজা করিবে।"

ফলতঃ দেহ যদি ব্রহ্মপুর হয়—দেবালয় হয়, দেহই যদি মন্দির হয় তবে ইহার অবমাননায় কি ইহার অধিস্বামী ভগবানেরই অবমাননা করা হয় না?

কিন্তু মহাত্মা সেণ্ট পল ও বলিয়াছেন :—

"Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

অর্থাৎ তোমরা কি জাননা যে তোমরাই—তোমাদের দেহই শ্রীভগবানের মন্দির এবং সেই মন্দিরে তাঁহার অংশ—পরমাত্মা—চৈতন্য শক্তি বাস করেন। যদি কোন গর্ব্বিত পামর সেই মন্দিরের অবমাননা করে ভগবান্ তাহার পাপ মস্তক চূর্ণীকৃত করিবেন। কারণ ভগবানের অধিবাস মন্দির অতিশয় পবিত্র—এবং সে মন্দিরও আর কোথায় নহে, তোমরাই—তোমাদের দেহই।

আমাদের জীব দেহপুরীর তিনিই পুরস্বামী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন :—

মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ গীতা ১৫

"জীবের যে জীবাত্মা তাহা ভগবানেরই অংশ।" পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ। ঐ ১০।২০

হে অর্জ্জুন! সকল ভূতের অন্তরস্থিত আত্মা আমিই।"

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত। ঐ ১৩।২

"হে অর্জ্জুন সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।" ভক্তি শাস্ত্রের আকর শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে:—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।

ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩।২৯।২৯

"এই সকল ভূতকে (প্রাণীকে) বহু মান সহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।"

ভগবানই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্যত্রও দেখিতে পাই—

উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥১৩।২২

"এই দেহে পরমপুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।"

জীব ব্রহ্মাংশ। ব্রহ্ম যেন অগ্নি জীব বিস্ফুলিঙ্গ। বেদান্ত বলিতেছেন—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

—মুণ্ডক ২।১।১

"যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতেই বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—২।১।২০

"যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা ভগবান হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত—প্রাণী—নির্গত হয়।

শুধু যে ব্রহ্মের অংশই, আত্মারূপে, জীব-দেহ-পুরে বাস করিতেছেন এমন নহে—সেই ব্রহ্ম স্বয়ং ও অন্তর্য্যামী রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন :—

"হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" গীতা ১৩।১৭

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" ঐ ১৫।১৫

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ঐ ১৮।৬১

"ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট; ঈশ্বর সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজিত। ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবগণের স্মৃতি শাস্ত্র—কণ্ঠের হার। "জীব ভগবানের অংশ" শুনিয়া ত আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ চমকিয়া উঠেন! সেই শাস্ত্র বলিতেছেন :—

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ॥

"আমি ভগবান্ শ্রীহরির অংশ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার দাস, আমি নিয়ত তাঁহার কৃপা প্রার্থী ;—এইরূপে আত্ম সমর্পণ করিবে।"

এইত জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ নানা শাস্ত্র হইতে প্রদর্শিত হইল। পাঠকগণ দেখুন—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন পার্থক্য আছে কিনা ? ক্ষত্রিয় রাজগণ গায়ের জোরে আইন করিয়া শূদ্র বৈশ্য প্রজাগণকে শাসন করিয়াছেন। উহা কখন ধর্ম্মবিধি বা শাস্ত্রবিধি হইতে পারে না। উহা প্রজা শাসনের রাজ আইন, ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা কুশল মস্তিষ্ক প্রসূত রাজবিধি, রাজোচিত অত্যাচার মাত্র! কিন্তু আমাদের সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ উহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। প্রথমে যে অত্যাচার মূলক শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়াছি—উহাই সেই রাজ আইন। নতুবা প্রাচীন যুগের আর্য্য ঋষিগণ যে ঐরূপ বিধি ধর্ম্ম বিধি বলিয়া প্রচার করিতেন তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

যাঁহারা পশু পক্ষী তরু গুল্ম জল স্থল অন্তরীক্ষ ভূতল সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পাপী পুণ্যবান সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন, যাঁহাদের অহিংসা দ্বেষবিরহিত বিশাল হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রভাবে ঋষির আশ্রমে মার্জ্জার মূষিক, অহি নকুল, মেষ শার্দ্দুল, সিংহ মৃগ একত্র আহার বিহার পান ক্রীড়া সম্পাদন করিত, যাঁহারা নির্জ্জনে গহনবনে কোটীকল্প আরাধনা করিয়া "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" "জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ" এই মহান্ সত্য, 'জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে' এই মহান্ তত্ত্ব স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় সমগ্র জগতে ছড়াইয়া ও ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা যে তুমি শূদ্র আমি ব্রাহ্মণ, তুমি নীচ আমি উচ্চ, তুমি ক্ষুদ্র, আমি

মহান্, তুমি ম্লেচ্ছ আমি আর্য্য, এইরূপ হীন পূতিগন্ধময় স্বার্থপর ভাব হৃদয়ে স্থান দিতেন বা পোষণ করিতেন, তাহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শূদ্রকে অধিকার দানে বঞ্চিত করা ত দূরের কথা, যাঁহারা সমভাবে আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একসঙ্গে একতারে, বিশ্বের সমগ্র জনমণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী, তখন তাঁহারা কখনও স্বার্থপর হীন হইতে পারেন না।

শূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার।

শূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে কি না, আমরা অতঃপর তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মানব মাত্রেরই শালগ্রামশিলা পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কেননা, ভক্ত হিন্দুর বিশ্বাস, শালগ্রামে শ্রীহরির নিত্য অধিষ্ঠান এবং শালগ্রাম পূজায় শ্রীহরি নিত্য প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে এই শালগ্রাম পূজায় শূদ্রনামধেয় কল্পিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সন্তান কেন বঞ্চিত হইবে? যাহা ধর্ম্ম, যাহাতে দেহ মন আত্মার উন্নতি ও উর্দ্ধগতি হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। শূদ্র-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ গায়ের জোরে "অধিকার নাই" বলিলে এই বিংশ শতাব্দীতে —এই স্কুল কলেজ জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনার যুগে লোকে তাহা শুনিবে কেন,—মানিতে চাহিবে কেন? ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের ক্রীড়নক স্বরূপ শূদ্র প্রজাপীড়ক ক্ষত্রিয় রাজগণের আমলেই ঐ সব "অধিকার অনধিকারের" ব্যাখ্যা শোভা পাইত। এখন উহা বলিতে গেলে বাতুল বলিবে মাত্র। পাঠকগণ! শ্রবণ করুন,—ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ শাস্ত্রের নামে কি জঘন্য কথা লিখিয়া রাখিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সন্তানকে শালগ্রাম পূজা হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজেরা পূজা করতঃ, দক্ষিণাদি গ্রহণের দিব্য সুযোগ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শুনুন তাঁহাদের ফাঁকি দিবার শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রী-শূদ্র কর সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ ॥

ভগবান বলিতেছেন—

"শুচি বা অশুচি ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী, স্ত্রী বা শূদ্রের হস্ত স্পর্শ আমার পক্ষে বজ্র অপেক্ষাও অত্যন্ত দুঃখদায়ক।" অর্থাৎ মদ্যপায়ী গঞ্জিকাসেবী, ঝি-রূপিনী বেশ্যা রক্ষক হোটেলওয়ালাই হউক আর ৪।৫ টাকা বেতন ভোগী রসুয়া পাচকই হউক, তিনিই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। কেন না, তিনি ব্রাহ্মণ—পৈতাধারী। অন্যত্র—

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ ॥

প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ, শালগ্রাম শিলার পূজা এবং ব্রাহ্মণী গমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মূর্খ গোঁয়ার-গোবিন্দ শূদ্রগণের পক্ষে ভগবানের উপর বজ্র নিক্ষেপ করা আশ্চর্য্য নয় বুঝিয়াই পরবর্ত্তী শ্লোকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির প্রমোশন দিবার ভয় দেখাইয়া বারণ করিয়াছেন। যে দেশের ব্রহ্ম-ধ্যান-মগ্ন তত্ত্ববিদ্, সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ভগবানের বুকে লাথি মারিতে পারেন, সে দেশের তমঃগুণ-সম্পন্ন শূদ্রকে শুধু বজ্রাঘাতের ভয় দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তাই দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। এই অজ্ঞ দেশে শাস্ত্র বচন লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের মনুষ্যত্ব ও তেজঃবীর্য্য অপহরণ করিয়া এ দেশকে ও হিন্দুসমাজকে ডুবাইয়া দিয়াছে। বহু অজ্ঞ সরল শূদ্রের মুখে শুনিয়াছি—"ওঁকার" উচ্চারণ করিলে বংশ থাকে না—পরকালে মহা রৌরব নরক হয়। এই সব ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রকৃত শাস্ত্রের আলোচনা করা যাউক। "ভক্তমাল" বলেন—

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিম্বা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

শাস্ত্রে বলেন—

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাসুবৎ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বৈষ্ণবগণ প্রাণের ন্যায় যত্ন সহকারে শালগ্রামশিলা ধারণ করিবেন।

বৈষ্ণব কে? বৈষ্ণব কেবল ব্রাহ্মণই নহেন। বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ও বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব মাত্রেরই শালগ্রাম-শিলা ধারণে অধিকার আছে।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু পূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস।

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণব দ্বিজঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

বায়ুপুরাণ।

শূদ্রই শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণাদি যে জাতিই হউক, শ্রীভগবানে ভক্তি না থাকিলে, সেই অভক্ত জনই শূদ্র এবং ভক্তি থাকিলে শূদ্রও শূদ্র পদবাচ্য নহেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।

ঐ মধ্যলীলা।

অতএব ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বজাতিই শালগ্রামশিলার অর্চ্চনার অধিকারী।

শূদ্রের বৃত্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥

বায়ুপুরাণ।

শূদ্র যাচ্ঞা করিবেনা—দান করিবে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কৃষি কর্ম্ম করিবে এবং নিত্য পুরাণ শ্রবণ ও শালগ্রামশিলার পূজা করিবে।

এ স্থলে শূদ্রের পক্ষে শালগ্রামশিলার পূজা করা একান্ত বিধি হইতেছে!

শালগ্রামশিলা পূজাং বিনা যোঽশ্নাতিকিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পাং জায়তে কৃমিঃ॥

পদ্ম পুরাণ।

শালগ্রামশিলার পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে।

গৌরবাচাল শৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥

স্কন্দ পুরাণ।

শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনায় যাহার মতি না হয়, পর্ব্বত শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ করে।

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

গৃহীত-দীক্ষ ব্যক্তি শ্রীভগবানের পূজায় ইচ্ছুক হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্ত্রী শূদ্র সকলেই শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীভগবানের পূজা করিবেন।

অন্যত্র—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সচ্ছূদ্রাণা মথাপি বা।
শালগ্রামঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

স্কন্দপুরাণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য এবং সংশূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে—অপরের নাই। তাত বটেই,—সৎ না হইলে—সাধু না হইলে কে আর পূজা অর্চ্চনা করিবে? তা কেবল শূদ্রের সম্বন্ধে কেন—সকলের সম্বন্ধেই। অসৎ শূদ্রেও করে না, অসৎ ব্রাহ্মণও করে না। এই যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ চাকরী করিতেছেন, দোকান হোটেল খুলিয়াছেন—পাচক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহারা কি শালগ্রাম পূজা করেন? সংব্রাহ্মণ যে সেই করে।

সৎশূদ্র কি, না—ভগবদ্ভক্ত—ধার্ম্মিক সাধুশূদ্র। ভগবদ্ভক্ত ধার্ম্মিক না হইলে কেইবা পূজার্চ্চনা করে?

শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাং সংযাতি নরকং ধ্রুবং॥

ইতিহাস সমুচ্চয়।

শূদ্র, এমন কি, নিষাদ (ব্যাধ) শ্বপচ (চণ্ডাল) ও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাহাদিগকে সাধু—সৎ বলিয়া বিবেচনা করিবে,—সামান্য জাতি বলিয়া হেয়জ্ঞান করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হইবে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকাঃ।

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্বপচও (চণ্ডালও) দ্বিজাধিক।

নারদীয়ে।

চণ্ডালোঽপি ভবেদ্‌বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও বিপ্রতুল্য ; আর হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণও চণ্ডালের অধম।

"মুচি হ'লেও হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যব সিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

হে অর্জ্জুন! "আমাকে যে অনন্যচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে যদি 'ভজনা ও' ভক্তি করে, সেও শীঘ্র ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শান্তিলাভ করে। স্কন্দ পুরাণ পুনরায় বলিতেছেন :—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥

স্ত্রী হউন, শূদ্র হউন বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে বর্ণই হউন, শালগ্রাম শিলা পূজা করিলে শাশ্বত পদ লাভ করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই, স্ত্রী শূদ্র সকলেই যে শালগ্রাম শিলা পূজায় অধিকারী, তাহা স্থিরীকৃত হইল। তবে এই যে শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইল, এসম্বন্ধে বৈষ্ণবচূড়ামণি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ মহোদয়গণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় যে ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, তাহা এই—

মহা পুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পুজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাদস্যাংসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ

যুক্ত্যাসিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈ স্তাদৃশিভিশ্চ স্ত্রীভি স্তৎ পূজা ন:কর্ত্তব্যা যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণু দীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থা পনীয়ং ॥

ভাবার্থ—"কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারাই আমি পূজিত, এই বচনের সহিত মহাপুরাণের বচন গুলির সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ হয়, কিন্তু মাৎসর্য্যপর কোন ব্রাহ্মণ স্মর্ত্ত কল্পিত মন্তব্যে উহা বলিয়া গিয়াছেন। ঐ যে বচন, উহা অবৈষ্ণবের জন্য কথিত। গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষ ও বিষ্ণুভক্ত শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি শালগ্রামশিলা অর্চ্চনে অধিকারী এবং পূজাকরা তাহাদিগের কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা।

অতএব এ বচন সামান্য উপর।
নিষেধ, যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর ॥
কিংবা কেহ দম্ভক্রমে বচন গড়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল ॥

* * * * *

স্ত্রীশূদ্র শালগ্রাম পূজা অধিকারী।
ইহাতেই এবচন কৃত্রিম বিচারি ॥
এ বচন যদ্যপি প্রামাণ্য হইত।
অত্র শাস্ত্রমতে বিধি না থাকিত ॥ (বাঙ্গালা ভক্তমাল।)

শূদ্রের পূজাধিকার সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"আমার উপাসনা সকলের ধর্ম্ম।" (১) ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে বলিতেছেন :—

---

(১) অনুবাদ—১৮শ অধ্যায় একাদশ স্কন্ধ। ভাগবত।

"আমি বিবেচনা করি, সদ্বংশে জন্ম, রূপ, তপস্থা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ প্রভাব, শারীরিক বল, পৌরুষ প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সকল গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনে উপযোগী নহে। সেই ভগবান কেবল ভক্তিদ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশগুণভূষিত বিপ্রও যদি ভগবান পদ্মনাভের পাদপদ্ম পরাঙ্মুখ হন, তবে—যে চণ্ডালের মনঃ, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত, সে চণ্ডালকেও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। কারণ ঐ চণ্ডাল কুল পাবন করিতে পারেন; কিন্তু প্রভূত গর্ব্বশালী ঐ ব্রাহ্মণ পারেন না।" (২) উক্ত প্রহ্লাদই দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন—"ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধুভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ঈশ্বরারাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকলের দর্শন পূজনাদি দ্বারা কামাদি জয় করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করিবে * * * সুর অসুর মনুষ্য যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব যেই কেন হউক না, মুকুন্দ চরণ ভজনা করিলে সকলেই আমার ন্যায় মঙ্গল লাভ করিতে পারে। হে অসুর তনয়গণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ শৌচ এবং ব্রত—মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে; নির্ম্মল ভক্তিদ্বারাই ভগবান প্রীত হন। * * হে দৈত্যেয়গণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রীশূদ্র, * নীচ জাতি এবং পশু পক্ষী ইত্যাদি পাপী (কথিত) জীবও অচ্যুত সাযুজ্য পাইয়াছে।" (৩)

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ

(২) অনুবাদ—নবম অধ্যায়; সপ্তমস্কন্ধ। ভাগবত।

(৩) অনুবাদ—সপ্তম অধ্যায়; সপ্তমস্কন্ধ। ভাগবত।

তিতিক্ষা, সদসৎ বিচার, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব সন্তোষ, সমদর্শী সাধুগণের সেবা-প্রবর্ত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মনুষ্য কৃতকর্ম্ম সকলের নিষ্ফলতা জ্ঞান, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, আত্মবিচার, যথোচিতরূপে প্রাণীগণকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া, সর্ব্বভূতে আত্মা ও দেবতা জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার সেবা পূজা প্রণাম ও দাস্য, তাঁহার সহিত সখ্য ও তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ,—হে রাজন্! এই ত্রিংশৎ লক্ষণাক্রান্ত পরম ধর্ম্ম "সকল মনুষ্যদিগের পক্ষে" কথিত হইল। ইহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর তুষ্ট হন"। (১)

"তবে আর নিশ্চেষ্ট কেন,—ধূপ ধুনার সুগন্ধধূমে পূজাগৃহ সৌরভিত করিয়া, তুলসী চন্দনে নারায়ণ শীলার অর্চ্চনা করিয়া সকলে—মানব মাত্রেই জন্ম জীবন সার্থক কর।"

ফলতঃ ভগবৎবিগ্রহ বা শালগ্রাম শিলা পূজা করা ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষে অনেক শূদ্র সন্তান আপনাপন নামে, শ্রীচৈতন্য রামানুজ নিম্বাদিত্য বল্লভাচার্য্য মাধবাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় এক এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামাৎ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রামানন্দের দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে চামার জাতীয় শিষ্য রয়দাস বা রুইদাস, রাজপুত জাতীয় শিষ্য পীপা, জাট জাতীয় শিষ্য ধন্না, নাপিত জাতীয় শিষ্য সেন এবং জোলা জাতীয় শিষ্য কবীর প্রধান। এই রামানন্দ সামান্য ব্যক্তি নহেন! রামানুজ শিষ্য দেবাচার্য্য, দেবাচার্য্যের শিষ্য রাঘবানন্দ, ইনি রাঘবানন্দের শিষ্য। এতদ্ব্যতীত রামানন্দের আশানন্দ নামে যে শিষ্য ছিলেন, তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণদাসের শিষ্য কীল। এই কীলের শিষ্য মলুক দাস

(১) অনুবাদ—একাদশ অধ্যায়; সপ্তমস্কন্ধ। ভাগবত।

মলুকদাসী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক এবং কবীরের অন্যতর শিষ্য অগ্রদাস—ডোম জাতীয় হিন্দী ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজির গুরুদেব। কবীরের আবার শিষ্য পরম্পরা ক্রমে কমাল, যমাল, বিমল, বুদ্ধন ও দাদু; ষষ্ঠ এই দাদু, দাদু পন্থী প্রবর্ত্তক। ইনি আহমেদাবাদের একজন ধুনুরি ছিলেন। তা ছাড়া আগরা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরের তুলসীদাস নামক এক অন্ধ বণিক কুড়াপন্থী, এবং আগরা নগরের আর এক বণিক্ ঘুহড় পন্থী সম্প্রদায় স্থাপন করেন। পশ্চিমাঞ্চলের ডোম জাতীয় ব্যক্তিগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামে হরিশ্চন্দী; সধ্ন নামক এক মাংসবিক্রয়ী সপন্থী, দ্বিতীয় আলমগির বাদসাহের সময়ে দিল্লী নগরে চরণ দাস নামে এক ধূসর জাতীয় বণিক চরণ দাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বাঙ্গালা দেশেও ঘোষপাড়া হইতে রামশরণ পাল-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তাভজা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর সন্নিকটস্থ মালো পাড়ার বলরাম হাড়ি বলরামী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করে। এইরূপে ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ লোকরঞ্জনে—ভক্তিতে ও মনস্বীতায় ইহাদের অনেকে শ্রীচৈতন্য দেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কথিত, প্রচারিত ও পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দখল করার দরুণই ও আক্রোশেই এই সব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভক্ত রুইদাসের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে জনৈক চামারের গৃহে রুইদাস জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই, শিশু ভগবৎ প্রেমিক। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক রুইদাসের ভগবদ্ভক্তি ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে লাগিল। সাধু সজ্জনগণের সেবায় বাল্য কাল হইতেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। সাধু সেবার জন্য বাপ মার নিকট চাহিয়া না পাইলে তিনি নিজের ভাগ লইয়া

সাধুসেবা করিতেন। রুইদাসের গৃহকার্য্যে, সংসারে মন নাই; পরন্তু দিবারাত্র কেবল সাধু সজ্জনের সেবায় ও ভগবৎভজনে নিবিষ্ট মন দেখিয়া পিতামাতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রচুর ধনের এক কপর্দ্দকও রুইদাসকে দিলেন না। রুইদাস সস্ত্রীক তাড়িত হইয়া সমধিক আয়োজনে ও নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ-ভজনে মগ্ন হইলেন এবং অতি ক্ষুদ্র আকারে নিজ জাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর একখানি সামান্ত তৃনাচ্ছাদিত কুটীর মন্দিররূপে তৈয়ার করিয়া তাহাতে ভগবৎ মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক নিজ মনোমত সেবায় নিরত হইলেন। ইষ্টদেবকে একমাত্র কুটীরে রক্ষা করিয়া আপনারা অনাচ্ছাদিত বহিঃপ্রাঙ্গণে বাসকরিতে লাগিলেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, বর্ষা বাদল, শীত গ্রীষ্মের দিকে লক্ষ্য মাত্র নাই। দুঃখ দারিদ্র্য হাসি মুখে বরণ করিয়া প্রভুর পূজায় ও সেবায় দিন রজনী পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতা হওয়াতে ভগবান তাঁহার ক্লেশ দর্শন করিয়া সাধু বৈষ্ণবের রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক খণ্ড স্পর্শ মণি লইয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। রুইদাস তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সমাদর না করিয়া কহিলেন—

"সেকি বস্তু জ্ঞান করে পরশ-রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥"

বাঙ্গালা ভক্তমালা।

অনন্তর ত্রয়োদশ মাসান্তে ভগবান বিষ্ণু আপনার ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন—তাহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ এ প্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা বিকীর্ণ করিয়া

রাখিলেন যে, তাহা অবশ্যই কোন না কোনরূপে রুইদাসের দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু ভক্ত রুইদাস ইহাতে বড়ই ভীত, শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি স্বীয় ইষ্টপূজায় ও সেবায় এই ধন ব্যয় কর"। রুইদাস ইষ্টদেব কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম-শিলা স্থাপন পূর্ব্বক অতিশয় সমারোহের সহিত তাহার সেবা পরিচর্য্যায় ও সাধু সজ্জনগণের সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। চর্ম্মকার রুইদাসের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দিন দিন গ্রাম হইতে দূর গ্রামান্তর—নগর হইতে কানন, সমগ্র রাজ্যময় রাষ্ট্র হইয়া উঠিল। "মুচির ছেলে শালগ্রাম পূজা করে" "ধর্ম্ম রসাতলে গেল" "ঘোর কলি উপস্থিত" প্রভৃতি জনরব ও কোলাহল তুলিয়া ব্রাহ্মণগণ ঘোর বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের এই বিদ্রোহাচরণের ফলে তাঁহার সুখ্যাতি ও নাম আরও বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। ত[illegible]লেন,—বিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ ধার্ম্মিকের গূঢ় গৌরব প্রকাশের প্রধান উপায়, এ নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে বিদ্বেষ অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা তদ্দেশীয় নরপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিলেন—"মহারাজ !

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্য পূজাব্যতিক্রমঃ।
তত্র ত্রীণি প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ং ॥

"যে স্থানে অপূজ্য ব্যক্তির পূজা ও পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটে, সে স্থানে ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।" সম্প্রতি রাজধানীর একজন চামার শালগ্রাম অর্চ্চনা করিতেছে, তাহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া নগর বিষময় করিতেছে; তাহাতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জাতিভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব প্রজাগণের ধর্ম্ম রক্ষণার্থ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দিন।"

রাজা রুইদাসকে আনিবার জন্ত দূত প্রেরণ করিলেন এবং রুইদাসও সভায় আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীও তথায় একত্রিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বজাতি-গৌরব উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রুইদাস বলিলেন—"জাতি লইয়া এত গণ্ডগোল কেন ? ভক্তিই ভগবানের প্রিয় ; জাতীয় গৌরবে ভগবৎ লাভ হয় না।" ব্রাহ্মণগণ ক্রমে বাদ বিসম্বাদ বাড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে সম্মুখস্থ দেব-মন্দিরের সিংহাসনে যে নারায়ণ মূর্ত্তি রহিয়াছেন, তিনি প্রসন্নতা পূর্ব্বক যাঁহার নিকটস্থ হইবেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ একে একে তিন প্রহর কাল পর্য্যন্ত বেদ উচ্চারণ ও মন্ত্র জপ করিলেন। কিন্তু ভগবানের পাষাণ মূর্ত্তি পাষাণের ন্যায় অচল রহিল। রুইদাস নিজ পর্য্যায় কালে, সাশ্রু লোচনে গদ্‌গদস্বরে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক [illegible] বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! জগতে পতিতপাবন নাম যদি প্রচার করিতে হয়, তবে এই দীন দুঃখী পতিত চামারের প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, বেদ নাই, মন্ত্র নাই, জাতিকুল-গৌরব কিছুই নাই, তুমি বই আর আমার কিছুই নাই। তুমি দীনবন্ধু পতিতপাবন, তাই আমার আশা ভরসা। তুমি নাকি অনাথের নাথ, তাই তোমাকে ডাকিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে রুইদাস দুই একটি পদও কীর্ত্তন করিলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্য্যামী ভক্তের ভক্তিপূর্ণ ডাকে স্থির থাকিতে পরিলেন না। অচল পাষাণ মূর্ত্তি সচল হইল। মূর্ত্তি বালচপল গতিতে রুইদাসের ক্রোড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে রাণী ও বিদেশীয় বহু রাজা মহারাজা রুইদাসের ভক্তি-মন্ত্রে বিমোহিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

যে রঘুনাথ দাস আপনাকে—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে"

আর "তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল"

প্রভু কহে "এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এক কুঁজা জলে আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"
শ্রীহস্তে শীলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥

* * *

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

* * *

জলে তুলসী সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥
এই মত কত দিন করেন পূজন।*

---

*ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহা প্রভু শূদ্র (কথিত) রঘু নাথ দাসকে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিয়া স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা ও উপদেশ না দিয়া তাঁহাকে শাল গ্রাম শীলা দান করিয়া উহাই পূজা ও অর্চ্চনা করিতে উপদেশ দিলেন। "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার কি ইহা দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছিলেন? মহাপ্রভুর কি ইহা অব্যবস্থা হইয়াছিল? তিনি কি শাস্ত্র জানিতেন না? সুতরাং বলুন দেখি, আমরা মহাপ্রভুর আচরণ ও উপদেশই গ্রহণ করিব, না,—বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পাদসেবা করিয়া জন্ম জীবন ধন্য করিব?

শূদ্রের বেদাধিকার।

"নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করেন যে, বেদ অপৌরুষের। কাম-ক্রোধাদি রিপুপরবশ, হিংসাদ্বেষাদি সংকীর্ণতা পরিপূর্ণ কোনও মানব বেদের প্রণেতা নহেন। যাঁহার নিকট বর্ণের পার্থক্য নাই—জাতির পার্থক্য নাই—যিনি হিংসা দ্বেষাদির অতীত—কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি সকলেরই পিতা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—সকলেই যাঁহার সন্তান—সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরই সৃষ্টজীবের উপকারের নিমিত্ত—বেদ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা কেবল হিন্দুর জন্য প্রেরিত হয় নাই—কেবল ব্রাহ্মণের জন্য প্রেরিত হয় নাই,—কেবল মুসলমানের জন্য প্রেরিত হয় নাই বা কেবল খ্রীষ্টানের জন্যও প্রেরিত হয় নাই—এই সনাতন সত্যপূর্ণ বেদ সকলের জন্যই প্রেরিত হইয়াছে; সকলেই এই জ্ঞান লাভে অধিকারী। তাই যজুর্বেদে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "আমি এই যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি, তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দাস দাসী এবং অতিশূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতিকেও উপদেশরূপে বেদ প্রদান করিবে" অর্থাৎ সকলেই—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাতে সকলের প্রয়োজন—সকলেরই হিত—সকলেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। যাহাতে সকলের হিত হয়, সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে; তাহাতে

অধিকার অনধিকার কল্পনার অবকাশ নাই। অধিকার—অনধিকার একমাত্র সামাজিক ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার, অনধিকার বোধ হয়। আমার পরিধেয় বস্ত্রখানিতে আমার স্বার্থ আছে বলিয়াই আমার অধিকার ; অপরের অধিকারে আমার স্বার্থ-হানি হয় বলিয়াই অপরের তাহাতে অনধিকার। কিন্তু জগতে এমন কে আছে, ঈশ্বরে যাহার স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছে, জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে যাহার স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছে যে, তাহার অনুমতি ব্যতীত অপর কেহ ঈশ্বরের নিকটে আসিতে পারিবে না, বা জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিবে না ?

বেদ অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের জন্য। জ্ঞানলাভে শূদ্রের অধিকার নাই কিম্বা শূদ্র জ্ঞানলাভ করুক—ইহা কি ভগবানের অভিপ্রেত নহে ? যদি তাহাই হয়, তবে তিনি নিশ্চই শূদ্রকে জ্ঞানোপার্জ্জনের শক্তি দিতেন না—তাহার মানসিক শক্তি এরূপভাবে গঠিত করিতেন, যাহাতে শূদ্র কোনমতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋষিতুল্য জ্ঞানী লোক রহিয়াছেন—শূদ্রের প্রতিভার সমুজ্জল আলোকে ভারত উজ্জল হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ভগবান্ সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, শূদ্রকেও ততটুকু শক্তি দিয়াছেন। জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যেই মানুষ, শূদ্রও সেই মানুষ ; শূদ্রের দুটী চক্ষু আছে, ব্রাহ্মণেরও দুটী চক্ষু আছে—তিনটী নাই। ব্রাহ্মণ মানুষের যে অধিকার আছে, শূদ্রমানুষেরও ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে। নিত্য সত্যের চর্চ্চায় সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার কল্পনা করাও পাপ—সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী"। (১) কিন্তু স্মৃতি সংহিতাদি শাস্ত্র যে এমন বেদকে

(১) সমাজ—১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৭।

শূদ্রের পাঠ ও আলোচনা হইতে বঞ্চিত ও অনধিকারী করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের অধিকার দান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও বেদান্ত সূত্রের (৩৮সূত্রের) ভাষ্যে ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনিও অদ্বৈতবাদী হইয়া. জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রচারক হইয়াও শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করিবার সমর্থন করিয়াছেন। যথাঃ—

* * * শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ। বেদ পূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।" অর্থাৎ "স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।" ফলতঃ ইতিহাস পুরাণই বা কি আর বেদ বেদান্তই বা কি? মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত। সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা কিন্তু আবার উপনিষৎ বা বেদান্ত সমূহের সার সংগ্রহ স্বরূপ। কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। (১)

"এই ভগবদ্গীতাকে সর্ব্বশেষ উপনিষদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। * * * গীতায় প্রতিশ্লোক কোন না কোন উপনিষদ হইতে সংগৃহীত— যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্ম্মিত হইয়াছে।" (২) সমগ্র বেদান্ত গীতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তারপর এই গীতাকে বেদান্তের সার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) কঠোপনিষদ—দ্বিতীয়বল্লী ১৮শ শ্লোক ও গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২০শ শ্লোক

(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত জ্ঞানযোগ, আত্মার মুক্ত স্বভাব।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সমস্ত উপনিষদ—গাভী স্বরূপ, গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দোহনকারী, বৎস স্বয়ং নরনারায়ণ অর্জ্জুন, সুধীগণ ইহার ভোক্তা—এবং গীতারূপ অমৃত ইহার দুগ্ধ স্বরূপ।

গীতা যে সর্ব্বশ্রুতি সার সংগ্রহ—তাহা সুধী ও পণ্ডিতগণ মাত্রই জ্ঞাত আছেন। অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত ও ব্যবস্থিত রহিয়াছে! ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি সমূহ সমন্বিত গীতা তবে কি প্রকারে বেদ অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্ত সূত্রের ও ভাষ্যকারের মতে তাহা হইলে গীতা অধ্যয়ন ও গীতা পাঠ শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। গীতার মধ্যস্থ বেদ বেদান্ত শূদ্রাদির স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করিতেছে, জিনিষ একই কেবল বেদ বেদান্ত না বলিয়া "পুরাণ—ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র। কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান ও তাহার কতকগুলি শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত হইয়াছে; আর সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মূল কঠোপনিষদ কিন্তু স্ত্রী শূদ্রের অধিকারাতীত! আর শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ! শাস্ত্রপ্রণেতা, বেদ বিভাগকর্ত্তা স্বয়ং বেদব্যাস বলিতেছেন—"ভাগবত নিখিল বেদার্থের সার ভাগ স্বরূপ।" (১)

"ব্যাসদেব, যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক নিখিল

(১) অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত।

বেদতুল্য * * * এই ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত রচনা করেন।" (১)

"বেদব্যাস সরস্বতী তটে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, * ভারত (মহাভারত) রচনাচ্ছলে সমুদয় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে।" (২)

শুকদেব বলিতেছেন—"আমি যে পুরাণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। উহা নিখিল বেদের তুল্য।" (৩) "নৈমিষারণ্যে বলদেবের আগমনে শৌনকাদি ঋষিগণ সকলেই প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার আর্চ্চনা করিলেন'—কিন্তু মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ উঠিয়া দাড়াইলেন না। তিনি জাতি সূত (সারথী—সূত্রধর জাতীয়)। ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়াও, অনেক ইতিহাস পুরাণ এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও অবিনীত অপরাধে বলরাম সূতকে বধ করিলেন। মুনিগণ হাহাকার রবে বলিয়া উঠিলেন—আমরা ইহাকে ব্রহ্ম আসন * * * দান করিয়াছি। আপনি না জানিয়া ব্রহ্মবধের ন্যায় ইহাকে সংহার করিলেন। * * * যদি আপনি স্বয়ংই এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন—তবেই লোক শিক্ষা পাইবে। * * * বলদেব বলিলেন—'বেদে এই উপদেশ আছে যে, আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। অতএব ইহার পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগের

---

(১) অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) " " চতুর্থ অধ্যায় " ।

(৩) দ্বিতীয়স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় " ।

বক্তা হইবেন। আর আমার অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্তের জন্ম চিন্তা করুন।" (১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"সংক্ষেপে ও বিস্তার পূর্ব্বক দেবগণেরও দুর্গম এই ব্রহ্মবাদ সমগ্ররূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। * * * তোমার এই যে সনাতন বেদেও গুপ্ত, পরম প্রশ্নের উত্তর হইল। * * * ইহা শ্রদ্ধালু শূদ্রও স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।" (২)

"দেবর্ষি নারদ সর্ব্বপুরুষার্থ সাধন বেদরূপ কল্প বৃক্ষের পরমানন্দ রসপূর্ণ এই ভাগবত ফল বৈকুণ্ঠধাম হইতে আনিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।" (৩)

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃত দ্রব্য সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩

প্রথম অধ্যায়; প্রথম স্কন্ধ,—ভাগবত।

হে রসজ্ঞ ভক্তগণ! শুক-মুখ-কমল-নিঃস্রিত (শিষ্যগণ পরম্পরায়) পৃথিবীতে প্রচারিত ভক্তিরস-সম্বলিত বেদরূপ কল্প বৃক্ষের পরমানন্দ-রস পূর্ণ এই শ্রীমদ্ভাগবত ফল প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বার বার পান কর (অর্থাৎ সাদরে শ্রবণ কর)।

সূত বলিতেছেন—* * "* ত্রয়ারুণি কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন এবং হারীত—এই ছয়জন পৌরাণিক, ব্যাসের শিষ্য আমার

(১) অনুবাদ— ৭৮ অধ্যায়; দশমস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
(২) " ২৯ " দশমস্কন্ধ, " ।
(৩) " প্রথম অধ্যায়; প্রথমস্কন্ধ, " ।

পিতা রোমহর্ষণের মুখ হইতে এক এক পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি ইহাদিগের ছয়জনেরই শিষ্য। সুতরাং সমুদয় পুরাণ সংহিতাই অধ্যয়ন করিয়াছি। কশ্যপ, সাবর্ণি, রামের শিষ্য অকৃত-ব্রণ এবং আমি,—আমরা ব্যাসের শিষ্যের নিকটে চারিমূল সংহিতা (চারিবেদ সংহিতা) অধ্যয়ন করিয়াছি।" (১)

"শৌনক কহিলেন—হে সাধো সূত! * * * অপার সংসারে ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের তুমি পথপ্রদর্শক।" (২)

বেদের সমতুল্য এতাদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ—অবাধে শূদ্রাদির অধীত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদ পাঠের আর বাকী কি রহিল। বিশেষতঃ এই ভাগবতে অনেক ঔপনিষদী শ্রুতির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না। এখানেও ইহাকে "নিখিল বেদতুল্য"—"বেদের সার" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রেমাবতার শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মানারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ॥

---

(১) অনুবাদ—সপ্তম অধ্যায়; দ্বাদশস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
(২) " অষ্টম অধ্যায়; " " ।

চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ ॥

মধ্যলীলা ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আর ইতিহাসরূপী মহাভারত কিরূপ শাস্ত্র, তাহাও উহার প্রণেতা ব্যাসদেবের মুখ হইতেই শ্রবণ করুন। "পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্য দিকে ভারত-সংহিতা রাখিলেন কিন্তু পরিমাণ কালে ভারত-সংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল। তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।" (১)

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, স্ত্রী শূদ্রাদি বেদ ও বেদান্ত নামে শাস্ত্র পাঠ না করিলেও, রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত অগ্নি পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের নামে ঐ বেদবেদান্তই পাঠ করিতেছেন। নাম পৃথক—মাত্র বস্তু একই। ৬৪ পয়সা—বা ৪টী সিকিও যাহা, একটি রৌপ্যমুদ্রা বা টাকাও তাহাই। নাম বিভিন্ন, বস্তু বা আকৃতি বিভিন্ন হইলেও মূল্য—সমান। গরুকে গরুই, গো-ই বলি কিম্বা cow বলি, উহাকে গোত্ব নষ্ট হয় না। নাম পৃথক হইলেও বস্তু একটাই। ঋষিগণ বেদের সার গীতা

(১) মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতে, আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায় অনুক্রমণিকাধ্যায়।

ভাগবত পাঠে শূদ্রের অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু বেদের অধিকার দেন নাই, ইহাপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে। "প্রকৃত পক্ষে ইহা সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশ-দর্শীতার কুফল মাত্র। কতকগুলি ঋষি নামধেয় ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে এই বেদরূপ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে অনিচ্ছুক, অসম্মত ও বিরোধী হইয়া এইরূপ সঙ্কীর্ণ নীতির, বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে প্রকৃত ঋষিগণ সকলেই জ্ঞান বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শাস্ত্র দ্বিবিধ প্রকারের শ্লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একদল ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে জ্ঞানদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন, অন্য দল আচণ্ডালের ঘরে ঘরে জ্ঞানদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য শাস্ত্রে পরস্পর বিপরীত দুই মতের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নতুবা ব্রাহ্মণেতর সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম শাস্ত্রের পবিত্র শিক্ষায় দীক্ষায় চির বঞ্চিত রাখা কখন সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি শুদ্ধ মুক্ত পবিত্রাত্মা ঋষিগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না। ঋষিগণ কদাচ এই বিদ্বেষ বিষকলুষিত স্বার্থপরতা মণ্ডিত জঘন্য মতের পরিপোষণ করিতেই পারেন না। তাঁহাদের নামে পরবর্ত্তী সময়ের হীনবুদ্ধি মানুষ স্বীয় প্রকৃতিসুলভ শ্লোক রচনা করিয়া শাস্ত্রকে জাতি বিদ্বেষ-কলুষ-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বরং এই ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন বেদবেদান্তবিদ্ ক্ষত্রিয় রাজ-গণ ব্রাহ্মণ সন্তানকে বেদান্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তৎকালিক অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ-তনয়ও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদবিদ্যা লাভার্থ গমন করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ উক্ত শ্বেত কেতু আরুণি এবং পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণের আখ্যানে দেখিতে পাই। শ্বেত-কেতুর পিতার প্রশ্নোত্তরে রাজা কহিয়াছিলেন—"কোন ব্রাহ্মণই ইহা

পূর্ব্বে জানিতেন না, পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষা দানে সমর্থ।"

"তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২ পরিচ্ছেদে ঐরূপ আর একটী আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ 'আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি' এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা আপনারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উদ্দালক সমীপে গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত উত্তর দানে অক্ষম হইলেন, সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন; রাজা অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পর দিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্য পালন সম্বন্ধীয় কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন, এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, আমার রাজ্যে ত কোন দস্যু তস্কর নাই, কোন কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, মূর্খ নাই, ব্যভিচারিণীও নাই? ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, "তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আইসেন নাই; তাঁহারা ধনের প্রার্থী নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী।" এতচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "আমি আগামী কল্য এ বিষয় আপনাদিগকে বলিব।" তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষা লাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম সমিধাদি সহকারে রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয় সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র নহে, পরন্তু পুরাণাদি

সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্ত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদবিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য! শূদ্রজার-পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ-কর্ত্তা এবং তাঁহারই প্রামাণিক নায়কত্বমতে শূদ্রগণ বেদাধিকারে বঞ্চিত! যাহা হউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্যকার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যাধিকারের জয় অপ্রতিহত, এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্ম ব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে। ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক সমাজের উক্ত বিষায়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।"

"যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার বিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতেও বস্তুতঃ শূদ্র নহে, অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ-বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে যাহারা বাস্তবিক শূদ্র-অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদাধিকার নিশ্চিত অবারিত; স্মৃতি শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদবিরোধিতায় তাহা অপ্রামাণ্য, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অথবা অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়, যথা—স্মৃতি শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু গুণকর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে! এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্ট-কল্পিত, যুক্তিযুক্ত, ন্যায়-বিচার-পূত ও

বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতি সমূহের উক্ত নিষেধোক্ত আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবিতর্কিত ভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচ প্রকৃতিধারী ও হীনকার্য্যকারী (তমঃ গুণাচ্ছন্ন মূর্খ জ্ঞান বিদ্যাবিহীন) অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় স্বতএব অনধিকারী সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষা শাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব জন্ম ও জাতিগত হইয়া পড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে; এমন কি শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।"

"এক্ষণে শাস্ত্রমতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য ও অপর আধ্যাত্মিক গুণনিচয় অধিকার করিয়াছেন, এবং বেদাধ্যয়ন করেন, সত্যগুণ-সম্পন্ন তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা বীরধর্ম্মের সাধক ও তদানুসঙ্গিক গুণাবলীধারক এবং বেদাধ্যয়নশীল তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা কৃষি বাণিজ্য পশু পালনকারী এবং আনুসঙ্গিক অপর কতিপয় গুণাধিকারী, বেদাধ্যয়নশীল তাহারা বৈশ্য। কিন্তু যাহারা একেবারে বেদবিদ্যা-বিমুখ ও বিবর্জ্জিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যশুদ্ধ-বর্জ্জিত, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রের একটী বিশেষণ "ত্যক্ত বেদঃ" অর্থাৎ ত্যক্ত হইয়াছে বেদ যৎ কর্ত্তৃক, অর্থাৎ বেদধ্যয়নে বিমুখ, কিন্তু বেদ অধ্যয়নেই অনধিকারী উক্ত পদের এরূপ অর্থ কদাচ সরল ও সঙ্গত হইতে পারে না। শ্লোকটী এইরূপ :—

"সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতিস্মৃতঃ॥

"বেদোঽখিল ধর্ম্ম মূলম্" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থ বেদাধ্যয়ন! অতএব যে অন্তর্ব্বাহে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতঃই ধর্ম্ম বিমুখ, বেদাধ্যয়নের তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সেই "ত্যক্ত-বেদ" শূদ্র! সে আপন স্বভাব দোষে স্বেচ্ছায় স্বয়ং বেদাধিকার হারাইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল শাস্ত্র বোধের ভুলক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া "আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যা জাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতিয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত। ফলিতার্থে তাহারই তিক্ত বিষাক্ত ফল।

আমরা যে দিবারাত্রি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করিয়া উচ্চ চীৎকার করিতেছি, তাহার মূলে কি আছে, দেখা যাউক। বজ্রশুচি উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটী আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে, কারণ জীব বহুবিধ দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ একপ্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না।

জন্ম জাতিগত ভাবেও ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই, যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ ও অপরাপর অনেক মনুষ্যও বিশিষ্ট বিদ্বান এবং জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্মও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে,

কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্য দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে, ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকা-ভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশুচি প্রকৃতই এক দুর্ভেদ্য সমস্যা স্থাপন করিয়াছেন।"

প্রাচীনকালে সত্যবাদিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের উপরই ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করিত। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মনোরম উপাখ্যান আছে—নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

বহু গৃহের পরিচারিকা—দাসী জবালার পুত্র খেলার সাথী ঋষিবালকগণকে মহর্ষি গৌতমের নিকট পাঠ অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া তাহারও বিদ্যাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল। মাকে আপনার বাসনা জানাইল—মা সম্মত হইলেন। পুত্র সঙ্গিগণের সহিত গৌতম-আশ্রমে উপনীত হইয়া আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিল। গৌতম বালকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া তাহাকে তাহার পরিচয়, পিতৃনাম, বংশ ও গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক নিরুত্তর—একমাত্র মার নাম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন গৌতম তাহাকে মার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-গুলির উত্তর শুনিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষা-সমুৎসুক শিশু পুত্র বাটী আসিয়া মাতাকে বলিল—"মা! কোন্ বংশে, কোন্ কূলে আমার জন্ম ও আমি কোন্ গোত্রীয়? আমার পিতা পিতামহেরই বা কি নাম, তুমি সত্বর বল, গুরুদেব আমাকে তাহাই শুনিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন শুনিয়া মাতৃদেবী মাথা হেট্ করিলেন—আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। পরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে ভগ্নকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"বৎস! বলিব কি? যৌবন কালে আমি বিভিন্ন লোকে দাসীবৃত্তি করিতাম। আমি যখন বহুজনের সেবা করিয়াছি—সেই সময় তুমি হইয়াছ—কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম, তাহা আমি জানি না। তোমার প্রকৃত জনক যে কে, তাহাও আমার বলিবার সাধ্য নাই। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি আজ হইতে সত্যকাম জাবাল বলিয়া আত্ম পরিচয় দিও। তখন সরলহৃদয় সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল অবিকল তাহাই আবৃত্তি করিল। সত্যকামের এবম্বিধ—সারল্যে ও সত্যনিষ্ঠায় পরম জ্ঞানী গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

তং হোবাচ নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।
সমিধং সম্যাহরোপত্বা নেষ্যেন সত্যাদগা॥

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৪র্থ-অঃ)

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্যকথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিয়া আমাদের মধ্যেই গ্রহণ করিতেছি। সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইলেন। এবং শুধু ব্রাহ্মণ হওয়া নয়—পরে তিনি মহর্ষি হইয়া বেদমন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ সন্তানগণের বেদশিক্ষা দানে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। দাসীপুত্র অজ্ঞাতপিতা সত্যকাম কেবল সত্যনিষ্ঠার প্রভাবেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। পিতামাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই

সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাতপিতৃগোত্র সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্যনিষ্ঠা প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে ও ব্রাহ্মণ সমাজে পরিগৃহীত হইল। বেদান্ত সূত্রের ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষা দানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদি ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তাহা হইলে উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণকথিত একচেটিয়া শ্রেণী বিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্য-পরায়ণ সেই ব্রাহ্মণ, তবে ত বর্ণভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম জাবালের ঘটনায় ইহাই হইয়াছে। এই আখ্যানটীতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণদ্বয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন, এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। বরং ইহার মাতার বর্ণিত বিবরণে তাহাকে নীচ জাতি বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি নির্ণয় হইল না; পরন্তু তাহার আভ্যন্তরিক—চরিত্রগৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়—তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেন না, শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সংগুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। বেদান্ত সূত্রের ৩৬ সূত্রের

সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাব ও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডীযুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি তাৎপর্য্যের বিষয় মনু বলেন :—

বাগ্‌ দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ কায়মনঃ ও বাক্য যাহার শাসিত ও সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী। যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকারত্ব কোন স্থূল বাহ্য লক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনূক্ত সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্রের অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িক ভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটী স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র। বস্ত্রোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্রসংজ্ঞিতগণেরও দেব পিতৃকার্য্যে স্কন্ধদ্বয়ে লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির অপেক্ষা রাখেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে সে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে।"

"অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িনী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়।" বেদ স্বয়ং উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,

স্ত্রী শূদ্র দাস দাসী সকলেরই সমান অধিকার আছে—কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ গায়ের জোরে অধিকার নাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন—অধিকার আছে—ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন, অধিকার নাই। অর্থাৎ 'যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।' বেদ ত আর দেশে নাই—যে তাঁহারা পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন—বেদ কি বলিয়াছেন। এমন কোন বামুণ পণ্ডিতের নাম শুনি নাই—যিনি চারিখানা বেদ পাঠ করিয়াছেন ত দূরের কথা—বেদ দেখিয়াছেন। বেদ না দেখিয়াই—পিতৃপুরুষপরম্পরা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। অর্থাৎ না দেখিয়াই—শুধু শুনিয়াই চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "কখনও তারে চোখে দেখিনি—শুধু বাঁশী শুনেছি—মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছি—" গোচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এই কথা পরস্পর পরস্পরের মুখে শুনিয়াই সকলের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উহার মূলে কোন প্রকার সত্য নাই। "ঘোড়ার ডিম কথাটা যেমন সকলেই বলে—শোনে, কিন্তু উহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—ইহাও তেমনি শোনাকথা মাত্র—মূলে এ কথার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং তৎবিপরীত কথাই শাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ যে যজুর্ব্বেদ মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া সমভাবে আপামর—আচণ্ডাল সকলের জন্য বিদ্বেষ বৈষম্যের ঘনীভূত তমসা বিনষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"

॥ যজুঃ।২৬।২॥

বেদকর্ত্তা ভগবান স্বয়ং বেদে বলিতেছেন,—"আমি যেমন সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই পরম কল্যাণকরী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দাস দাসী ও অত্যন্ত নীচ চণ্ডাল ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে,—অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে।"

পাঠকগণ! এখন বলুন, আপনারা কাহার আদেশ পালন করিবেন? বেদের আদেশ পালন করিবেন, না ব্রাহ্মণগণের ব্যাখ্যা শুনিবেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয়,—স্ত্রী শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করা ত দূরের কথা, অনেক স্ত্রীলোক ও শূদ্রসন্তান বেদ প্রণয়ন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। "প্রথমে বিশ্ববারার কথা বলি। ইনি অত্রি মুনির গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাবিংশ সূক্ত ইহার রচিত। এই সূক্তে ছয়টী ঋক্ আছে—ঋক্গুলি এক একটী মাণিক; ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।" ২য়তঃ—"ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের পাঁচটী ঋক্ ইন্দ্রমাতৃগণ দ্বারা প্রণীত। ইন্দ্রঋষির পিতা বহু বিবাহ করেন; তাঁহার যে পত্নীগণ একত্রে মিলিয়া ঐ ঋক্গুলি রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহারা ইন্দ্রমাতৃগণ নামে প্রসিদ্ধা—ইহারা কশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং অদিতিদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩য়তঃ—"অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটী মন্ত্র রচনা করেন—এই মন্ত্রগুলি দেবীসূক্ত নামে প্রচলিত।" ৪র্থতঃ—"অপালাও বিশ্ববারার ন্যায় অত্রি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের আটটী ঋক্ রচনা করিয়াছেন।" ৫মতঃ—"কশ্যপপত্নী ইন্দ্রাদি আদিত্যগণের মাতা অদিতি দেবী ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ও সপ্তম ঋক্

প্রণয়ন করেন।" ৬ষ্ঠতঃ—ব্রহ্মবাদিনী যমী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, ৫ম, সপ্তম ও একাদশ ঋকৃগুলি এবং ১৫৪ সূক্তের পাঁচটী ঋক্ প্রণয়ন করেন।" ৭মতঃ—"বিদর্ভ রাজার কন্যা লোপামুদ্রা অগস্ত্য মুনির পত্নী ছিলেন। ইনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৯৭ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ সঙ্কলন করেন।" ৮মতঃ—"অত্রি ঋষির পুত্র চন্দ্র, তৎপুত্র বুধ,—বুধের পুত্র পুরুরবার পত্নী অপ্সরা কন্যা উর্ব্বশী। ইনি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটী ঋক্ প্রণয়ন করেন।" ৯মতঃ—"পরম পণ্ডিত মিত্রের কন্যা মৈত্রেয়ী ভারতবিখ্যাত বিদুষী ছিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য ইহার স্বামী। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক পৃষ্ঠা ইহার জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। মিত্ররাজ-প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের ইনি শিক্ষকতা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।" ১০মত—বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী—ইনি রাজর্ষি জনকের সভায় পর্য্যন্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন।" ১১শতঃ—"লোমশা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্ত প্রণয়ন করেন।" (ভারতীয় বিদুষী)।

আর শূদ্রগণ কর্তৃক বেদ প্রণয়ন সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ১। দাসী-পুত্র কবষ। ইনি ঋষিত্ব লাভ করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন। ইহার পুত্র তুর পরীক্ষিত তনয় মহারাজ জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ইহার প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, একবার সরস্বতীতীরে যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন—

"দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।"

(কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ১১১)

অর্থাৎ—তুমি দাসী পুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২।১৯) ইহার প্রসঙ্গ আছে। "

২। কুক্ষীবানের বিষয় মহাভারতে, মৎস্য পুরাণে ও বায়ু পুরাণে লিখিত আছে,—কলিঙ্গ রাজ বলি সন্তান কামনায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহা দ্বারা পাঁচ সন্তান উৎপাদন করাইয়া লন এবং পরে দাসী উশিজকে প্রেরণ করেন। মুনি উশিজের গর্ভে কুক্ষীবান (ও চক্ষুঃ) নামে সন্তান উৎপন্ন করিলেন। কুক্ষীবান্ (ও চক্ষুঃ) কালে প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্ত হইতে ১২১ সূক্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে;—রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতি (রাজা) কে শূদ্র জানিয়াও বারংবার তাঁহাকে শূদ্র শব্দে সম্বোধন করিয়াও পশ্চাৎ বেদবাক্য দ্বারা সম্বর্গ বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইঁহাদিগের এবং "সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারান্ধতা ও স্বমত মত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি,তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। আর তত্তৎ শাস্ত্রগত অনেক শ্রুতি বাক্য সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহত ভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যে ও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিল না এবং এখনও নাই।"

"আর যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্য জাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ে বেদবারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে ; যে হেতু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ ঘটনায় বহু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তার পর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণাপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সেহেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমান যে সমস্ত জাতি শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত এবং অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ববিচারে, কি মানসিক সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষাসাধনায়, কি কর্ম্মমর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদবারণ বিধি তাহাদের প্রতি- প্রযোজ্য হইতে পারে না।"

"যাঁহারা শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদারনীতি ও হীন বিদ্বেষ-দূষিত স্বভাবের ফল। বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ব বিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণ্যে বেদ বিদ্যা বিস্তারিত হইলে তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে, এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্রাহ্মণের দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক! যে ব্রাহ্মণেরা বেদবারণ বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাঁহাদিগকে তাহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা ভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলে, তাহাতেও সমাজের সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া

পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ জ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদ বিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পতিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন; কিন্তু যিনি সেই পতিতের চির পতিতাবস্থারই প্রয়াসী, তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ তাহা সহজেই অনুমেয়।"

"অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্রগ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থনীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদার ভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামির হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না—অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞান ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয় বিধান, অপক্ষপাত বিচার ও যুক্তি প্রমাণ, এ সমস্তই "সমাজের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক" এই অভিমতি বা নীতির উপর নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার

স্থাপিত। বেদান্ত সূত্রের ২৫ সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত বা পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না।" (১)

পাঠকগণ একটু স্থিরচিত্তে উপরের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে শূদ্রের বেদাধিকার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে এবং ইহার ছত্রে ছত্রে যুক্তির গভীরতা পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শূদ্রকে বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যে একমাত্র বৈষম্য নীতি ও স্বার্থপরতারই বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং এ আইন যে একমাত্র ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই আবিষ্কৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে, তৎবিষয়েও অন্য মত নাই। উপনিষদ্-লেখক ক্ষত্রিয়গণ এ বিষয়ে সর্ব্বদাই উদার নীতির পরিচয় দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যখনই ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন, তাঁহারা জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মের অধিকার দিয়াছেন। বেদান্তের সারভূত যে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, সেই গীতা মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়াছেন।

* * * "এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ব বুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। * * প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার

---

(১) হিন্দু পত্রিকা—সম্পাদক লিখিত, "বেদান্ত সূত্র ব্যাখ্যা—শূদ্রের বেদাধিকার" ৯ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

মূল কারণ ঐটী, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া—অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। * * * শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে—অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সবরকম উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। * * * পুরোহিতগণ * * * তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। পৌরোহিত্যক, সামাজিক, অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। * * * ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক আর নাই খাক্, তারাই হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ দেখতে পাচ্ছ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন,—আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁহা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড়, অথবা আর কারু ঠেঁয়ে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন, আর ব্যাস

গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করছেন।" (১)

"প্রথম, সমাজের স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন। ব্যক্তিগত স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ন্যায় সমাজশরীরেরও স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন সাময়িক অবস্থার অধীন। সুবিস্তৃত ভূখণ্ডব্যাপী একপ্রকার রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়ম বা আইনকানুন পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়মের বশে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কয়েকটী উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রজাবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার—সকলেরই পক্ষে একরূপ হওয়াতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের—ব্যবহার মার্গে—সমতারূপ ফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নহে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে একাসনে উপবেশনাদি নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে এক গাড়ীতে (রেল বা ট্রাম) একই ক্লাশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ডোম চামার প্রভৃতি সকলেই উপবেশন করিতেছে। আভিজাত্যাভিমানী গুরুঠাকুরের পক্ষে এই প্রকার উপবেশন ক্লেশকর হইলেও তাঁহার সে অভিমানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমাদের ব্রাহ্মণপ্রাধান্য পরিচালিত সমাজশরীরে এই পরিবর্ত্তনটি বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থানুসারে স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন; সহস্র চেষ্টা করিলেও এই পরিবর্ত্তনে বাধা দিতে পারেন, এরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাদের সমাজে কেহই নাই।

আমাদের সমাজে চিরপ্রচলিত নিয়ম ছিল যে, দ্বিজাতিগণই বেদ পাঠে অধিকারী। শূদ্রের বেদ পাঠ করা ত দূরের কথা, সে যদি বৈদিক

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী ১ম ভাগ।"

মন্ত্র কর্ণে শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ণে অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া তাহার ঐহিক জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিধি চলিতে পারে না এবং চলিতেছেও না, তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান স্বর্গগত রমেশচন্দ্র শূদ্র হইয়াও বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সেই অনুবাদের সাহায্যে আংশিক ভাবেও বেদার্থের উপলব্ধি করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের খাতিরে অসম্ভব গোঁড়ামীর পক্ষপাতী অশিক্ষিত সম্পাদিত দুই একখানা খবরের কাগজের পলিসি প্রণোদিত কটূক্তিরূপ কদুষ্ণ তৈলবিন্দুপাত ব্যতিরেকে হিন্দু সমাজ সেই রমেশ-চন্দ্রের দণ্ডের জন্য কটাহপূর্ণ তৈল উত্তপ্ত করিবার জন্য তখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। প্রত্যুত সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার চিন্তা এখনও উন্মত্ত ব্যক্তিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন—যথা এতদিন পর্য্যন্ত দুর্নীতিপরিচালিত ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বশে যে সকল জাতি সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিকারী হইয়াও দাসরূপে, অস্পৃশ্যরূপে ও অনাচরণীয় জল রূপে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে সেই সকল হিন্দু সমাজের অধঃপতিত এবং নিপীড়িত জাতিগণের—সমাজের চক্ষে উচ্চবর্ণের সহিত সমতালাভের সাগ্রহ অনুষ্ঠান, নমঃশূদ্রগণের অদম্য অধ্যবসায়, তাম্বুলজীবিগণের নীতিপূর্ণ একতাবন্ধন, কায়স্থগণের অর্থ ও মনস্বিতা-পরিচালিত সম্প্রদায় গঠন প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়োচিত কার্য্যগুলি এই সামাজিক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের অন্তঃপাতী। জাত্যভিমান ও অহমিকার স্বার্থ-প্রণোদিত সহস্র চেষ্টা সহস্র কেন্দ্র হইতে উত্থিত হওয়াও

এই—এতদিন পর্য্যন্ত অন্যায় ভাবে নিপীড়িত জাতিবৃন্দকে আত্মোৎকর্ষ স্থাপনের নৈসর্গিক পথ হইতে কখনই বিমুখ করিতে পারিবে না, তোমরা তাহাদিগকে দল বাঁধিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পার বা নাই পার, তাহাতে তাহাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না—তোমার ন্যায় জাত্য-ভিমানদৃপ্ত উপবীতধারী হইতে ব্যবহার জগতে তাহারা যে কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের সাহায্যে ব্যবস্থাপিত করিবেই করিবে। তাহাতে বাধা দিতে তুমি কে ? তুমি তাহার সম্মুখে প্রলয়ঝটিকার মুখে তৃণ, প্রতিপদের কোটালের মুখে জীর্ণ তরণী ছাড়া আর কি হইতে পার, বল দেখি।" (১)

সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদশাস্ত্র প্রকাশ না করিতেন, তবে আমরা কেহ কখনই কোন বিষয়শিক্ষা করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে আদিতে কেহ শিক্ষা প্রদান না করিলে, আমরা কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারি না, এবং তজ্জন্যই পরম পিতা পরমেশ্বর, জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, জীবকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দিবার জন্য, সৃষ্টির প্রথমেই বেদরূপ সত্যশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর দূরদর্শী এবং সূক্ষ্মদর্শী, তজ্জন্য তাঁহার নিয়ম বা আজ্ঞা একরস অর্থাৎ বারংবার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান মধ্যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রকাশিত রহিয়াছে, অতএব পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি সমস্ত অবগত আছেন। পরমেশ্বরের আজ্ঞা বা তত্ত্ব এক সময়, এক প্রকার মনুষ্যের উপযোগী ও অপর সময়, অন্য প্রকার মনুষ্যের রুচি অনুসারে প্রকাশ করিতে হয় না। বেদশাস্ত্র ত্রিকাল সত্য ;

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত "সমাজ ও সংস্কার"—উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩১৭।

ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অতি শূদ্রাদি অর্থাৎ জীবমাত্রেরই জন্য, ঈশ্বর দয়াপুর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে ২৬ অঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাওয়া যায় যথা :—

যথে মাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাংশূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥ যজুর্ব্বেদ .

অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন, যে আমি সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের সুখকর, যেরূপ চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করিতেছি, তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ! তোমরাও মনুষ্য মাত্রকেই, এই বেদরূপ বাণীর উপদেশ করিবে। (কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই মন্ত্রে "জন" শব্দে দ্বিজ বুঝায়, কারণ কোন কোন স্মৃতিতে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই এরূপ লেখা আছে ; ইহার মীমাংসা উক্ত মন্ত্রের শেষভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়) যথা—এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অরণায় অর্থাৎ অতি শূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। এখন দেখা কর্ত্তব্য, যে যখন স্বয়ং পরমেশ্বর বেদশাস্ত্রে জীবমাত্রকে সত্যজ্ঞানের উপদেশ দিতে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন যে বেদশাস্ত্র সকলের জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইস্থলে কেহ কেহ এরূপ শঙ্কা করিতে পারেন, যে কোন কোন শাস্ত্রে "স্ত্রী শূদ্রোনাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ এবং স্ত্রীশূদ্রদ্বীজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোক তথা শূদ্রাদি বেদ পড়িবে না। বেদশাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে, অতএব বেদশাস্ত্রে কিরূপে শূদ্রের অধিকার সম্ভব হয় ? এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যে বাস্তবিক উপরোক্ত বাক্যটী বা এই বাক্যের অনুযায়ী কোন মন্ত্র চারি বেদের মধ্যে কোন স্থলে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত ও অন্যান্য কল্পিত

বাক্যগুলি কেবল অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য আধুনিক স্বার্থী ও মিথ্যাচারী লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত মিথ্যাচারী মহাশয়দিগের পুস্তক পাঠ করিয়া আধুনিক অনেকেই, বাস্তবিকই বেদ, দ্বিজ ব্যতীত অপর কাহারও পড়িবার অধিকার নাই, এইরূপ সরল বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি কেহ চারি বেদ মধ্যে এরূপ বাক্য বাহির করিতে পারেন, তবে, তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে, পরন্তু যে বস্তু যাহাতে নাই তাহা কেহই দেখাইতে পারে না। উপরোক্ত যজুর্ব্বেদের মন্ত্রদ্বারা আমি স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছি যে বেদশাস্ত্রের মতেই বেদ সকলের জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে। বেদের প্রমাণের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত প্রমাণ। এ বিষয় এই প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিত আছে। বিশেষতঃ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে "নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ" অর্থাৎ যিনি বেদকে অবমাননা করেন বা নিন্দা করেন, তিনিই নাস্তিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাহাকেই নাস্তিক বলে, এরূপ লেখা আছে। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে, যে মহাত্মা জাবাল অজ্ঞাতকুল হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ঋষিত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারত গ্রন্থে চণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান্ বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গার্গী ঋষিকাকে বেদোপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে অপালা ও লোপামুদ্রা নামক স্ত্রীগণ বেদমন্ত্রের প্রকাশক ছিলেন। অধিক কি লিখিব স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি যাহার জন্মবিষয় সকলেই অবগত আছেন,* উক্ত মহাত্মা যে কেবল

* জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকাস্তু পরাশরঃ।

মহর্ষি হইয়াছিলেন এরূপ নহে, সাক্ষাৎ বেদশাস্ত্রকে ব্যাস অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বেদের-প্রকৃতার্থ ব্যাস অর্থাৎ বিস্তার করিয়া, এবং যিনি নিজে বেদশাস্ত্রকে পাঠ করিয়া তাহার সারমর্ম্ম অবগত হইয়া জগৎবিখ্যাত বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত প্রকার উদাহরণ ও প্রমাণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসঙ্গ বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলাম। ফলকথা এই, উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে দ্বিজ ব্যতীত অন্য বর্ণে, এবং স্ত্রীলোকেও বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কেহ কেহ এমন কি মহান্ ঋষিত্বপদকেও লাভ করিয়াছিলেন।* বেদাদি সত্যশাস্ত্রের উপদেশ সকলকেই দেওয়া যায় এ বিষয়ে বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রেও অনেক প্রমাণ আছে, উদাহরণ স্বরূপ একটী উল্লেখ করিতেছি যথা—

"ব্রাহ্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।" "স্বীয় মন্ত্রং

বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তায়েপূর্ব্বমদ্বিজাঃ॥ এবং
গণিকা গর্ভ সম্ভূতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ সংস্কার স্তত্র কারণম্॥

মহাভারত।

অর্থাৎ ব্যাস কৈবর্ত্ত জাত ও পরাশর ঋষি চাণ্ডালোৎভব হইলেও অন্যান্য নীচ কুলোদ্ভব লোকে যেরূপ নিজ সুকৃতি বশতঃ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও প্রাপ্ত হন। এইরূপে গণিকাগর্ভসম্ভূত বশিষ্ঠ ঋষি তপস্যা বলে বেদাদি সত্যশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* মৎপ্রণীত স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠনামক পুস্তকে এ বিষয় অনেক প্রমাণ আছে।

গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যোহবিচারয়ন্।" "পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতি স্ত্রিয়ম্।" "মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোপি চ॥"

অর্থাৎ হে মাহেশ্বরী! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না করিয়া গুরু আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা দান করিবেন। পরমেশ্বর সত্য-জ্ঞান-রূপ, বেদশাস্ত্রে কখন পরস্পর বিরোধী বাক্য বা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি চ বেদ ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে, পরস্পর বিরোধী বাক্য পাওয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু বেদ ঈশ্বর বাক্য, এজন্য ইহাতে কখনই পরস্পর বিরোধী বাক্য থাকিতে পারে না। বেদই মানবজাতির যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র; অতএব যাহা কিছু বেদ, বা বেদানুকূল তাহাই গ্রহণীয়, এবং যাহা কিছু বেদপ্রতিকূল, তাহাই অসত্য ও অগ্রাহ্য। অর্থাৎ বেদ শব্দে, বেদের জ্ঞান, তথা বেদের শব্দকে বুঝায়, কারণ সৃষ্টির প্রথমে বেদের শব্দ হইতে সমস্ত ভাষা গঠিত হইয়াছে, অতএব বেদের জ্ঞান, শব্দ ও ছন্দাদি সমস্তই বেদ। বেদ ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, অতএব ইহা নিত্য ও সত্য।

দ্বিতীয়তঃ বেদশাস্ত্র যে নিত্য ও সত্য, তাহা আর্য্যশাস্ত্রকার মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মহামুনি পাণিনি ও পতঞ্জলি ঋষির মত এইরূপ, যে শব্দমাত্রই নিত্য, কারণ শব্দে যত অক্ষরাদি অবয়ব আছে, তাহা সমস্তই কূটস্থ, অর্থাৎ নাশ রহিত ও তাহার কদাচ অভাব হয় না। কর্ণদ্বারা যাহা কিছু শ্রবণ করা যায়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, বাক্যের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় ও যাহা আকাশ মধ্যে থাকে, তাহাকেই শব্দ বলা যায়। বেদ সমস্ত শব্দের আদি কারণ, অতএব বেদ নিত্য। যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন, যে শব্দ উচ্চারিত হইবার পশ্চাতে নষ্ট হইয়া যায়, ও উচ্চারণ

করিবার পূর্ব্বেও শুনা যায় না, অতএব যেরূপ উচ্চারণক্রিয়া অনিত্য তদ্রূপ শব্দও অনিত্য ; ইহার উত্তর এই, যে শব্দ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র একরসে পরিপূর্ণ, পরন্তু যে সময় শব্দ উচ্চারিত না হয়, তখন শব্দ প্রসিদ্ধ হয় না, পুনরায় যখন প্রাণ ও বাণীর ক্রিয়া দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখনই শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব বাণীর ক্রিয়া ও উৎপত্তির নাশ হয়, বাস্তবিক শব্দের নাশ হয় না, অতএব শব্দ নিত্য।

জৈমিনি মুনি তাহার পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে বলিয়াছেন "নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" পূর্ব্বমী অ ১ পা ১ সূ ১৮ অর্থাৎ শব্দের দ্বারাই শব্দের অনিত্যতা শঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে। শব্দ নিত্য ও নাশ রহিত, কারণ উচ্চারণ ক্রিয়া দ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, তাহা উক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞাত হইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। শব্দ অনিত্য হইলে, শব্দের অর্থ জ্ঞান প্রতীতি হইতে পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে লিখিত আছে—

"অথ শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণম্" এবং "বিরোধেত্বনপেক্ষ্যংস্যাৎ, অসতিহ্যনুমানং"

পূর্ব্ব মী অ ১ পাদ ৩ সূ ৩।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদ বা শ্রুতিপ্রমাণ সর্ব্বোপরি প্রধান ; যখন শ্রুতি ও স্মৃতির কোন বিষয় অনৈক্য হয় তখন স্মৃতি অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য, এবং যদি শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না ঘটে তবে সেই মূল শ্রুতির অনুমান করা (প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা) কর্ত্তব্য।

আমাদিগের জানা উচিত, যে আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফল জন্য কষ্ট পাইয়া থাকি ; বিশেষতঃ ঈশ্বরের ন্যায়ানুসারে আমরা যে কষ্ট প্রাপ্ত হই তাহাও, আমাদিগের হিতার্থে ঘটিয়া থাকে, কারণ কষ্টভোগ দ্বারা আমাদিগের পাপশান্তি হয়। পাপ ভোগ ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে নষ্ট হয়

না। ঈশ্বর পরম দয়ালু, আমরা যাহাতে সুখী হই, পরমাত্মা সদা তাহাই ইচ্ছা করেন, এজন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সামান্য অপরাধ জন্য, অনন্ত নরক রূপ কষ্ট ভোগ করাইবেন না। আরও দেখ, কারণের অনুরূপই কার্য্য ঘটিয়া থাকে, এজন্য স্বল্পগুণযুক্ত জীবের কর্ম্মফল, কখন অনন্তফলযুক্ত হইতে পারে না। মনুষ্যদিগের ধর্ম্মাধিকরণেও, প্রথম অপরাধে প্রায়ই অত্যন্ত অধিক বা শেষ গুরুদণ্ড দেওয়া যায় না; তখন পরম কারুণিক পরমাত্মা যে এরূপ অন্যায় বিচার করিবেন তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ ন্যায়বিহীন কঠোর আজ্ঞা লিখিত আছে, তাহা কখনই ঈশ্বর প্রত্যাদেশ হইতে পারে না। পুনশ্চ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ লোক মাত্রেরই জন্য পরমেশ্বর কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী, ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলে কাহারও সুপারিস্ লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই; অতএব যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপারিসের আবশ্যক, তাহা কখনই পরমাত্মার আজ্ঞা বা তাহার নিত্য জ্ঞান হইতে পারে না।

৯। ঈশ্বর প্রত্যাদেশ মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণ জন্য হওয়া উচিত, এবং ইহাতে সকলেরই অধিকার থাকিবে; অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ মনোনীত জাতি, বা বিশেষ বর্ণ জন্য হইতে পারে না। ইহাতে পক্ষপাত থাকিতে পারে না।

সম্প্রতি বেদশাস্ত্র যে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা প্রধান, তাহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছি যথা—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাম্ বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

ব্যাস সংহিতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৪।

অর্থাৎ যে স্থানে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হয়,

তথায় বেদ কথিত বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও প্রামাণিক ; এবং যেস্থলে স্মৃতির সহিত পুরাণের অনৈক্য হয়; তথায় স্মৃতি বাক্যই গ্রহণীয়।

উপরোক্ত ব্যাস সংহিতার শ্লোক দ্বারা বেদ যে সর্ব্বশাস্ত্রোপরি গ্রহণীয় তাহা প্রমাণিত হইল।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে যথা—

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥

মহাভারত।

অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের পক্ষে বেদই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ ও দেশাচার ও লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। এস্থলে বেদ যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার আদি হইতে প্রবল ও প্রমাণীয়, তাহা সিদ্ধ হইল।

পুনশ্চ মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা।
শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ॥"
"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"
"অর্থ কামেম্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥"

মনু অধ্যায় ২, শ্লোক ৮, ১২ ও ১৩।

অর্থাৎ সংসারে যত প্রকার শাস্ত্র আছে, বিদ্বানগণ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, বেদ প্রমাণক ধর্ম্মকে, একমাত্র অবলম্বন করণের উপযুক্ত বোধে, স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। বেদ, স্মৃতি, সদাচার

অর্থাৎ সাধুদিগের আচার, অথবা সদা প্রাচীন কাল হইতে যে যে উত্তম আচার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এবং আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ যাহা অন্তরাত্মা ইহা উত্তম কর্ম্ম এরূপ বলিয়া দেন সেই কার্য্যটী, এই উপরোক্ত চারিটী ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া আর্য্য ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যগণ অন্তর হইতে অর্থ এবং কামনায় আসক্তি শূন্য না হইলে, কদাচ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন না, এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে বেদশাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান উপায় ও প্রমাণ। উপরোক্ত মনু-সংহিতার শ্লোক দ্বারা বেদ যে সর্ব্বোপরি প্রমাণীয় গ্রন্থ তাহা দর্শিত হইল, এখন বেদ-বিরুদ্ধ গ্রন্থ যে অগ্রাহ্য ও অসত্য তাহাই বলিতেছি যথা—

"পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্যতমোনিষ্ঠাহিতাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তেচ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাকালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥"

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯৪, ৯৫ ও ৯৬।

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই পিতৃ, দেব ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষুস্বরূপ। ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়, ইহা স্থির মীমাংসা। যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-বহির্ভূত, এবং যে সকল শাস্ত্র কুদৃষ্টি প্রেরিত, পরকাল সম্বন্ধে সেই সমুদায় শাস্ত্রকে নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্রগুলি তমগুণ কল্পিত, অতএব যথার্থ হইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু মনুষ্য কল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে—আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানা উচিত।

যখন দেখিতেছি যে বেদশাস্ত্রই ধর্ম্মের একমাত্র আকর স্বরূপ, তখন যে সকল লোকের বেদে অধিকার নাই, তাহার বাস্তবিক ধর্ম্মে অধিকার থাকিত না, অতএব তাহারা "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" হইবে সন্দেহ নাই। সমানা কেন, পশু অপেক্ষা অধমও হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মের অধিকার যখন মনুষ্যমাত্রেরই আছে, তখন বেদশাস্ত্রের পঠন পাঠনের ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার অধিকার যে মনুষ্যমাত্রেরই আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ পাইয়া পরমপদ লাভ করাই, জীবের বিশেষতঃ মনুষ্যের এক মাত্র পরম পুরুষার্থ বা প্রয়োজন। এক্ষণে দেখিতেছি যে বেদোক্ত রীত্যনুসারে কার্য্য করিলেই জীব পরামুক্তি প্রাপ্ত হন, অন্য কোন উপায়ে পাইতে পারেন না, তজ্জন্য মনুষ্যমাত্রেরই বেদানুকূল কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা রত থাকা কর্ত্তব্য। ভগবান মনু বলেন "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং" অর্থাৎ বেদই একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের মূল।

এখন বেদ যে সমস্ত বিদ্যাকে প্রকাশ করিয়াছে, ও বেদে যে সমস্ত বিদ্যার বীজ নিহিত আছে, তাহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছে, যথা— "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যম্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি ॥
শব্দ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাবেদ প্রসূয়ন্তে প্রসূতি গুণকর্ম্মতঃ ॥
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎপরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্ ॥

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোঃ ৯৭, ৯৮, ৯৯।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি চারি জাতি, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়, তথা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ইহা সমস্তই বেদ হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমুদায়ই বেদপ্রসূত। গুণ কর্ম্মানুসারে বেদই সকলের প্রসূতি। সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিয়া আছেন। জ্ঞানীলোকেরা বেদকে মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় বলিয়া স্বীকার করেন। ইত্যাদি।

"বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকাল মতন্দ্রিতঃ।
তংহ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোহন্য উচ্যতে॥
বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
আদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিস্মরতি পৌর্ব্বকীম্॥
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিতং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাংগতিম্॥

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯।

অর্থাৎ অবসর পাইলেই আলস্য রহিত হইয়া বেদশাস্ত্র মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন বা অভ্যাস করিবে, কারণ বেদাধ্যয়ন ও বেদের যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কার্য্য করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অপর যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা যায়। সতত বেদাভ্যাস, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব, এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণ জাতিস্মর হন, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান লাভ করিয়া, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রম বিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। যথাশক্তি এই সমুদায় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেই, মনুষ্যগণ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ—

"বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোক ১০২।

বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে বাস করুন না কেন, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

এখন বেদকে অগ্রাহ্য করিলে মনুষ্যকে নাস্তিক হইতে হয় তাহারই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি যথা—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।"

মনু অধ্যায় ২ শ্লোক ১১।

যিনি বেদ এবং বেদানুকূল আপ্তপুরুষ কৃত শাস্ত্রের অবমাননা করেন সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণের নিকট হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত। অতএব মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে সকলেই যেন বেদোক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। *

আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রাদির বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠনের অধিকার নাই, এমন কি প্রণব বা বেদমন্ত্রাদি শূদ্রের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে; এবং যে স্থানে প্রণব বা বেদ-মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়, তথা হইতে শূদ্রের প্রস্থান করা বা কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কর্ণদ্বার রুদ্ধ করা উচিত; যদি দৈবাৎ কোন শূদ্র হঠাৎ বেদমন্ত্র শ্রবণ করে, তবে সীসক গলাইয়া তাহার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক বেদশাস্ত্র উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন ও হৃদয় বিদীর্ণ করা কর্ত্তব্য, ও এরূপ কর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ইত্যাদি, নচেৎ

* শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত প্রণীত—বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়।

মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। কোন কোন নবীন গ্রন্থে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" অর্থাৎ স্ত্রীলোক শূদ্র ও দ্বিজ বন্ধুগণ বেদাদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহেন ইত্যাদি প্রমাণ লিখিত আছে। এখন বক্তব্য এই যে যদি কেহ চারি বেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে উক্ত রূপ মর্ম্মের মন্ত্র বাহির করিতে পারেন, তবে তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে। পরন্তু চারি বেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে, কোন স্থানেই এরূপ মর্ম্মের মন্ত্র নাই, বরং ইহার বিপরীত অর্থের মন্ত্র ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ বেদাদি শাস্ত্র দ্বিজ ব্যতীত অপর পঠন ও পাঠনের অধিকার আছে, এক্ষণে তাহাই বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চারি বেদ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বা উপনিষদের কোন স্থলেই শূদ্রাদির বেদ পাঠ নিষেধ করিয়াছে এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে যদি বেদের সংহিতা ভাগ হইতে শূদ্রাদিকে বেদাদি শাস্ত্র পাঠের অধিকার সম্বন্ধে কোন মন্ত্র দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র যে সকল বর্ণের জন্যই প্রকাশিত করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যথা—

ব্রহ্ম বৈ স্তোমানাং ত্রিবৃৎ ক্ষত্রং পঞ্চদশোবিশঃ সপ্তদশঃ শূদ্রো বর্ণ একবিংশঃ।

৪ ঐতরেয় পং ৮ অং ১

অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম প্রকরণে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ নয়টী অগ্নিষ্টোম করিবে, ক্ষত্রিয় ১৫টী বৈশ্য ১৭টী ও শূদ্র ২১টি করিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রের যখন যজ্ঞাদি সম্পাদনে অধিকার আছে, তখন তাহার বেদশাস্ত্র উচ্চারণেরও তৎসঙ্গে অধিকার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ যজ্ঞ কালে বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি দিতে হয়। পুনশ্চ

বৈদিক কোষরূপ নিরুক্তগ্রন্থে পূর্ব্বষট্ক্ অধ্যায় ৩ খ° ২ স্থানে লিখিত আছে যে স্তোম শব্দের অর্থ বেদমন্ত্র, অতএব শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রা পা ৪ খ ২ এ "হীরেত্বাশূদ্র" ইত্যাদি বচন দ্বারা জানশ্রুতি নামক শূদ্রকে মহর্ষি রায়িক বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, পুনশ্চ ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদের প্র° ৪ খ° ৪ স্থানে অজ্ঞাতকুল জাবল নামক বালককে গৌতম ঋষি উপনয়ন সংস্কার করাইয়া বেদাদি বিদ্যা পাঠ করাইয়াছিলেন। তৎপরে ঋগ্বেদের মণ্ডল ১০ অনুবাক্ ৩সূক্ত ৩০ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত চারি সূক্তের ঋষি কবষ এলুষ ছিলেন, এরূপ লেখা আছে। এই কবষএলুষ শূদ্রজাতি ছিলেন, যাহার প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চিকা ২ অ° ৩ স্থানে লিখিত আছে। কৌশীতকীয় ব্রাহ্মণের ১২-৩এ লিখিত আছে যে পূর্ব্বোক্ত সূক্তের কবষএলুষ ঋষি বেদ প্রচারক ছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রবণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কতকগুলি নবীন ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে যে শূদ্র যদি বেদ মন্ত্র শ্রবণ করে, তবে তপ্ত সীসক গলাইয়া তাহার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিবে, যদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন ও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিবে ইত্যাদি। পুনশ্চ বেদ শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান উপদেশ দিয়াছেন

সত্যমহং গভীরঃ কাব্যেন সত্যঞ্জাতেনাস্মি জাতবেদা, ন মে দাসো ন মেআর্য্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহং ধরিষ্যে।

৩ অথর্ব্বকা° ৫ অ২। ব্ ১১

অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন হে মনুষ্য! আমি সত্য স্বরূপ মহাগম্ভীর এবং নিত্য বেদবিদ্যাকে প্রকট করিয়াছি এজন্য আমাকে জাতবেদ বলিয়া জানিবে। আমি কোন দাস অর্থাৎ শূদ্র বা অনার্য্য বা আর্য্যে

পক্ষপাত করি না, পরন্তু যেজন আমার কথিত ন্যায়াচরণ স্বরূপ সত্য ব্রতাজ্ঞা পালন করিবে আমি তাহাকেই উদ্ধার করিব।

এখন আপনারা গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন, যে যখন স্বয়ং পরমেশ্বর বেদ বচন দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন, যে দ্বিজ ও শূদ্রাদির বিষয় আমি পক্ষপাত করি না, যে কেহ বেদানুকূল ন্যায়াচরণ রূপ মার্গে বিচরণ করিবে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করিবেন, তখন যে উপরোক্ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বেদের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে না, এজন্য যদি ঐরূপ শ্লোক ভগবান মনুর নিজেরও কথিত হইত, তথাপি বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া উহা কখনই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পরন্তু ঐ গুলি বাস্তবিক মনুর কথিত নহে, ঐ গুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে যে সকলেরই অধিকার আছে, ও যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রাদির ভেদ নাই, ইহা প্রতিপাদনার্থ জৈমিনী ঋষি বলিয়াছেন।

"ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।

৪ পূমী অ০ ৬ পা ১

অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম মনুষ্য মাত্রকেই ফল প্রদান করে, এজন্য বিদ্যাভ্যাস ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। পুনশ্চ সকল প্রকার শুভকার্য্য যে মানব মাত্রেরই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাহাই জৈমিনী ঋষি আদেশ করিতেছেন যথা।

কর্ত্তৃবা শ্রুতি সংযোগাদ্বিধিঃ কার্ত্স্নেন গম্যতে।

পূ০মী অ০ ৬ পা ১

অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে যিনি সমর্থ হইবেন, তাহার শ্রুতি সংযোগে উক্ত কর্ম্ম করিবার সর্ব্বথা অধিকার আছে। উপরোক্ত জৈমিনী বচন দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শ্রৌত যজ্ঞ, অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞ, যাহাতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এরূপ যজ্ঞে শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পুনশ্চ শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

এহীতি ব্রাহ্মণস্যাগহ্যাদ্রবেতি বৈশ্যস্য চ রাজন্য বদ্ধোশ্চাধাবেতি শূদ্রস্য।

শ০ কা ১ প্র ১ অ০ ১ ব্রা০ ৪ কং ১৯

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই, বেদ মন্ত্র পাঠদ্বারা যজ্ঞের হবিকে শুদ্ধ করিবে। আপস্তম্ব সূত্রেও এইরূপ লেখা আছে।

হবিষ্‌ কৃদেহীতিঃ ব্রাহ্মণস্য হবিষ্কৃদাগহীতি
রাজন্যস্য হবিষ্‌ কৃদা দ্রবেতি বৈশ্যস্য হবিষ্‌
কৃদাধাবেতি শূদ্রস্য প্রথমং বার সর্বেষাম্‌

আপস্ত শ্রৌ সূ প্র ১কং ১৯

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞ করিবার সময়, পূর্ব্বোক্ত পৃথক পৃথক মন্ত্র দ্বারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি হবিঃ শুদ্ধ করিবে; অথবা প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়াই, চারি বর্ণের সকলেই হবিকে শুদ্ধ করিবে। এখন এই সূত্রের দ্বারা শূদ্র যে বেদ মন্ত্র পাঠ করিতে পারে তাহা সিদ্ধ হইল।

সম্প্রতি শূদ্রজাতিদিগের মধ্যে নাপিত অর্থাৎ নরসুন্দর ও অতিশূদ্র নিষাদ পর্য্যন্তও বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারই শ্রৌত সূত্রের প্রমাণ দিতেছি।

গোভিল গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে—

আচান্তোদকায় গৌরিতি নাপিত স্ত্রীর্ব্রূয়াৎ। মুঞ্চগা বরুণ পাশাৎ।

১৯ গোভি সূপ্র ৪ কং ১০ টীং তমেব নাপিতং মুঞ্চ গামিতি মন্ত্রং ব্রূয়াৎ।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র নাপিতকে শ্রবণ করাইবে ইহার দ্বারা নাপিতের বেদাধিকার সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে লিখিত আছে—

তথৈবাবৃতা নিষাদস্থপতিংযাজয়েৎ॥ ১২ আপ শ্রৌ সূ প্র ৯ কং ১৪

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে যাহা প্রতিপাদন করা হইল, তাহা সমস্ত নিষাদ দ্বারা সম্পন্ন করাইবে, অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রে, অনুবাক সহিত সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র যে অতি শূদ্র নিষাদ পর্য্যন্তেরও অধিকার আছে তাহা সিদ্ধ হইল।

পুনশ্চ মহাভারতেও লিখিত আছে, যে চারি বর্ণকেই বেদোপদেশ করা কর্ত্তব্য যথা—

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বাব্রাহ্মণে মগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম॥

মহা-শা-প অ ৩২৮

অর্থাৎ বেদব্যাস জৈমিনীকে উপদেশ দিতেছেন, যে তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে ক্রমশঃ বেদের উপদেশ করিবে, কারণ বেদাধ্যয়ন করা মনুষ্যের মুখ্য কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। এই শ্লোকের কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন, যে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া চারিবর্ণকে বেদোপদেশ করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে ও অপর বর্ণে তাহা শুনিবে; এরূপ অর্থ যদিচ যথার্থ নহে, পরন্তু ইহাতেও সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রদিগকে বেদ মন্ত্র শুনান কর্ত্তব্য, ও যদি শূদ্র বেদমন্ত্র হঠাৎ শ্রবণ

করে, তবে তপ্ত সীসক তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, বরং শূদ্রকেও বেদোপদেশ করা কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা মহাভারত দ্বারা প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ "চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি!" মহাভারত

অর্থাৎ জ্ঞান যজ্ঞ * যাহা সকল যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তাহাতেও চারিবর্ণকে মহাভারতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে কেহ কেহ এরূপ শঙ্কা করেন, যে শূদ্রের বেদাধিকার থাকিতে পারে না, কারণ তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য ও উপনয়ন সংস্কারের অধিকার নাই; বিশেষতঃ দ্বিজদিগের সন্তানের উপনয়ন সংস্কার হইলেই, তাহারা বেদারম্ভ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন। ইহার উত্তর শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ সর্ব্বেষাং পালনে গৃহী।

অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই অর্থাৎ চারিবর্ণেরই বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য ব্রহ্মচারী হওয়া কর্ত্তব্য। এবং সকল প্রকার আশ্রমীর প্রতিপালনার্থে লোকের যথা সময় গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

তৎপরে বেদের পারস্কর গৃহ্যসূত্রে লেখা আছে

শূদ্রাণামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়ন্।

অর্থাৎ যে শূদ্র দুষ্টকর্ম্মাণুরত নহে, তাহার উপনয়ন সংস্কার করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ দুষ্টকর্ম্মযুক্ত শূদ্রেরই উপনয়ন সংস্কার নিষেধ জানিবে। †

---

* শ্রেয়ান্ দ্রব্য ময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। গী অ ৪ শ্লো ৩৩

† আপস্তম্ব সূত্রের প্র ১ প ১ মে সূত্রে দুষ্টকর্ম্মযুক্ত ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত উপনয়ন নিষেধ লেখা আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেন—

শূদ্রাণাং ব্রহ্মচর্য্যত্বংমুনিভিঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।

এই বচন দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যব্রতাধিকার সিদ্ধ হয়।

পুনশ্চ "শূদ্রা বাজসনেয়িনঃ" এবং "শূদ্রোবা চরিত ব্রতঃ" ইত্যাদি বশিষ্ঠ ও গৌতমের প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধিকার শাস্ত্রানুমোদিত। আমরা এবিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারি, পরন্তু উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে শূদ্রের বেদাধিকার, বেদ ও বেদানুকুল শাস্ত্রের অনুমোদিত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মন্ত্রের ঋষি শূদ্রোকুলোদ্ভব কবষ এলুষ ছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আর অনেক এ বিষয়ের প্রমাণ আছে, পরন্তু পুস্তক অনর্থক বাড়িয়া যাইবার ভয়ে নিরস্ত হইলাম। ফল কথা উপরোক্ত বিষয় বিচার করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বেদ শাস্ত্রে স্ত্রী শূদ্রাদির কেবল যে পঠন পাঠনাধিকার আছে তাহা নহে, পরন্তু, উপরোক্ত ও অন্যান্য স্ত্রী শূদ্রাদি ঋষিগণ, বেদমন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ প্রচারক ও উপদেশক পর্য্যন্ত ছিলেন। ইহাপেক্ষা অধিক আর কি বেদাধিকারের প্রমাণ হইতে পারে? এজন্য বুঝা উচিত, যে ব্রহ্মবিদ্যা ও বেদাদি সত্য শাস্ত্র, সকলের জন্যই ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন। যে কেহ চেষ্টা করিবেন, তিনিই অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে জাতি বর্ণ আদির কোন বিধি নিষেধ নাই। একজন সাধু বলিয়াছিলেন—"জাঁতি পাঁতি নহি পুছত কোই, জো হরিকে ভজে সোই হরিকে হোই। অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভজনা সম্বন্ধে জাতি পাঁতি নাই, যে কেহ একান্ত মনে তাহাকে বৈদিক রীত্যনুসারে উপাসনা ও ভজনা করিবে, ঈশ্বর তাহাকেই দয়া করিয়া থাকেন।

আমি যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রের বচন দ্বারা ও অথর্ব্ব বেদ ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা শূদ্র ও অতিশূদ্রাদিরও যে বেদপাঠে অধিকার আছে তাহা সিদ্ধ করিয়াছি। যুক্তি মতেও, বেদে যে সকলের অধিকার আছে, তাহাও বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যখন বেদ সদুপদেশে পরিপূর্ণ, তখন যে শূদ্র, সদুপদেশ পাইবার জন্য সেই বেদ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল স্বার্থপর মনুষ্যদিগের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। দেখ স্বার্থের বশীভূত হইয়া পতিত অনার্য্য ব্রাহ্মণগণ

"পতিতোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়।"

ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

পুরাকালে শূদ্রে যে বেদ পাঠ করিত, তাহার প্রমাণ কবস ঋষি। ইনি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান্ বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। নারদ ঋষি দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহা বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল ঋষি অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও মহান্ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। এরূপ প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যাহা হউক উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে বেদাদি, যে কেহ পড়িতে ইচ্ছা করে, সেই তাহার অধিকারী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বেদশাস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই জন্য পরমেশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন, কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য প্রকাশ করেন নাই। বলিতে কি বেদ শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও তদনুযায়ী আচরণ না করাই, আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অধোগতির একমাত্র কারণ। যত দিন আমরা বেদের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিতাম, তত দিন

এদেশে ধন, ধান্য, যশ, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্য বিরাজমান ছিল। সে সময় আর্য্যেরা ইহকালে ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার বলে, সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়া, দেহান্তে নিঃশ্রেয়সরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ ছিলেন। বেদাজ্ঞা পালন ভিন্ন মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। সে সময় এদেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়েই মুক্তির অধিকারী ছিলেন। *

বেদ পাঠে অধিকার

কোন কোন সামাজিক হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদ পাঠ ওঁকার মন্ত্র বা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শান্তচিত্তে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক এ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ কর যাহাতে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে। যাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নির প্রয়োজন; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহারই জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহাতে তাহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানমুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, ইহাই অভিপ্রায়।

* শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত প্রণীত স্ত্রী-শূদ্রাদির বেদ পাঠ।

জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রায়াজন নাই। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য অতএব বেদপাঠ অজ্ঞান ব্যক্তির জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিষ্প্রয়োজন। যদি শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে। যেহেতু শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জগৎময় আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নতুবা অন্য কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তিনি অজ্ঞান তাঁহাতেই শূদ্র সংজ্ঞা হয়। তাঁহারই জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য বেদপাঠ ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন। এবং তিনিই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে। যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে, আর

যদ্যপি আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের ইন্দ্রিয় ও আত্মা শূদ্র ও স্ত্রী। যতদূর পর্য্যন্ত জীবের বোধাবোধ বা মনের গতি আছে এবং যাহার দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে শাস্ত্রে তাহাকে প্রকৃতি, শক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে ভাবে বোধাবোধ ও মনের গতি নাই অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে শাস্ত্রে চৈতন্য বা পুরুষ বলে। অতএব শক্তিবিহীন পুরুষ অনধিকারী, কেননা অক্ষম এবং চেতন স্ত্রী অধিকারিণী, কেননা সক্ষম। স্বরূপ কিছুই পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণ পরব্রহ্মই, কারণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত কর্ম্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও শাস্ত্রে লিখা আছে যে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাতা পিতার রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সৎ সংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য। এবং যখন সেই জীব বেদপাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শক্তি আছে। এবং যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তিনি জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয়েন সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লিখা আছে :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য

করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যথা :—

বিপ্রাদ্দ্বি ষড়্গুণযুতাদর বিন্দনাভ পাদারবিন্দ
বিমুখাৎ শ্বপচো বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি
সকুলং নতু ভুরিমানঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণুভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠাভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম। এবং যিনি চণ্ডাল হইয়াও আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সকল বিষয়ের অধিকারী। তিনি আপনাকে ও নিজ কুলকে পবিত্র করিয়া জগতের মঙ্গল করেন। পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বহন করিতে আনন্দ পান।

যজুর্ব্বেদে লিখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়চারণায় ॥

অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম এই যে কল্যাণকর বাক্য

কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আত্মীয় অনাত্মীয় প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠে বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি—স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুকে উপাসনা করিবে। তাহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে, যিনি সত্য বলেন তাঁহাকেই বেদ জানিবে। সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবে। দ্বিতীয় কেহ সত্য নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনা ও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ।

পরমার্থে অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমাত্মাকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম-রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তিনি অন্য নামরূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই তাহাদিগকে নাস্তিক, পাষণ্ড, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলেই ইষ্টভ্রষ্ট ও পরস্পর শত্রু হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। কারণ এক সত্য হইতেই স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহের উৎপত্তি। এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার স্বার্থ ও পক্ষপাতপরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট? পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জলজন্তুর জলে বাস করিবার

অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেননা তাঁহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর একটি কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মার বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থবশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া

জান, তাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদর্শী জ্ঞানী নহেন— স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।

ভাবিয়া দেখ এক মাতাপিতার দশ পুত্রকন্যার মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে বা তাঁহাদিগকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মাতাপিতা প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল সাধন করেন, না, অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুত্র কন্যা ইহা দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হন যে, "আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আপন মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।" কেবল কুপাত্র পুত্র কন্যাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে। পুত্র কন্যারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাতা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ সাকার, নিরাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতাপিতা। এই বিরাট পুরুষ ওঁকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রী-পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত

হইয়া ওঁকার রূপই রহিয়াছেন এবং অন্তে ইহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। তোমরা জগদ্বাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে এবং "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র যে তাঁহার নাম তাহা সর্ব্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে দ্বিধাশূন্য হইয়া ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক প্রাণ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মনে মনে জপিবে। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

রামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বী বধ

রামচন্দ্র বা ঈশ্বর শূদ্র তপস্বীকে হত্যা করিয়া মনুষ্যকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।' ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকে স্বার্থবশতঃ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, এক পক্ষে হিন্দু আর্য্যগণ রামচন্দ্রকে পূর্ণপরব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন ও অপর পক্ষে তাঁহারাই বলেন যে রামচন্দ্র শূদ্রজ্ঞানে তপস্বীকে বধ করিলেন; তাহাতে দেশে অকাল-মৃত্যু বন্ধ হইল। আরও বলেন যে, তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ স্থাপন, সীতা দেবীর জন্য ক্রন্দন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিলেন।

এস্থলে বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম শূদ্র সংজ্ঞা কি তাঁহার অন্তর্গত নহে। এক পূর্ণ বা সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য শূদ্র তাঁহার অন্তর্গত-না বহির্ভূত কোথা হইতে আসিল? এ জ্ঞান রামচন্দ্রের

কি ছিল না, যে আমারই কল্পিত নাম শিব অথবা স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহেরই নাম শিবলিঙ্গ ? কারণ লিঙ্গ, সূক্ষ্ম লিঙ্গ, স্থূললিঙ্গ, স্ত্রী, পুরুষ জীবসমূহ চরাচরকে লইয়া অনাদি পূর্ণলিঙ্গ যাঁহার উদ্দেশ্যে "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হয় তাঁহাকে কি তিনি চিনিতেন না যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করিবেন ? সতী যে সীতা সাবিত্রী জগজ্জননী সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী পরব্রহ্মের স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমতী, এ জ্ঞান কি তাঁহার ছিল না ? তিনি কি জানিতেন না যে, শক্তি ছাড়া পরব্রহ্ম নাই ও পরব্রহ্ম ছাড়া শক্তি নাই ? পরব্রহ্মই শক্তি ও শক্তিই পরব্রহ্ম, যাঁহারা চরাচর কোন স্থানে ছেদ নাই। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্য নাই যে একটী রামচন্দ্র সত্য, দ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য, তৃতীয় সত্য তাঁহার শক্তি সতী সীতা সত্য ও চতুর্থ রাবণ ও সীতা হরণ সত্য ও শূদ্র সত্য হইবেন। এ বিষয়ে রামচন্দ্রের কি জ্ঞান ছিল না যে, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া ছিলেন ? সত্যের জন্য সত্য কাঁদিয়াছিলেন, না, মিথ্যার জন্য মিথ্যা কাঁদিয়াছিলেন ? তিনি যদি সত্য পরব্রহ্ম হন তাহা হইলে এই সকল কার্য্যগুলি অজ্ঞান স্বার্থপর লোকের কল্পিত রচনা জানিবে। রামচন্দ্র কখনও এরূপ অজ্ঞানের কার্য্য করেন নাই, করিবেন না—ইহা অসম্ভব। ইহা সমদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য্য নহে। যদি তিনি এরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি অবতার, পূর্ণপরব্রহ্ম, সমদর্শী বা জ্ঞানী ছিলেন না। তিনি মূর্খ জীবসংজ্ঞক হইয়া মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের উৎপন্ন সামান্য মনুষ্য সমদর্শী জ্ঞানী এইরূপ কার্য্য কখনও করিবেন না ও এসমস্ত কথায় বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, সমস্তই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ।

তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়া কি প্রকারে এইরূপ অজ্ঞানের কার্য্য করিবেন ? সমদর্শী জ্ঞানী যদি জীব বধ করেন তাহা হইলে জীবসমূহকে সমভাবে বধ করিবেন ও যদি রক্ষা করেন তাহা হইলে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া রক্ষা করিবেন। তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখেন যেরূপ কোটী কোটী পিপীলিকাকে বধ করিলে পাপ পুণ্য হয় বা হয় না সেইরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী গুরুর গুরু কোটী কোটী বধ করিলেও হয় বা হয় না। কেননা জীব সমূহ চেতন, আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ।

রামচন্দ্রের বিষয় কোন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপরোক্ত ভাবে লিখিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, লোকে জানিবে যে যখন অত বড় অবতার হইয়া তপস্বী শূদ্রকে বধ করিলেন তখন আমরাও শূদ্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিব।

আধুনিক কোন শূদ্র যদি সংধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন তাহা হইলে জ্ঞানলাভে মুক্তস্বরূপ হইয়া স্বাধীন হইবেন। তখন জ্ঞান চক্ষে দেখিবেন যে, আমরা শূদ্র নহি, আমরা পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছি পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, শূদ্রাদি নাম কল্পনা মাত্র। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মধ্যে যিনি সমদর্শী জ্ঞানী তিনিই ব্রাহ্মণ, আর্য্য শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও যে স্ত্রীপুরুষ সত্য হইতে বিমুখ সেই পরনিন্দুক, প্রপঞ্চী, অজ্ঞানাবস্থাপন্ন শূদ্র, অনার্য্য জানিবে। এইরূপ বুঝিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভাব গ্রহণ কর। সমদর্শী রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা অহংকার প্রপঞ্চ স্বার্থপরতা পরনিন্দা অজ্ঞান শূদ্রসংজ্ঞক তপস্বীকে বধ করিয়া জীব ব্রহ্মের ভেদরূপ মৃত্যু হইতে জীবকে রক্ষা করেন বা করিয়াছিলেন।" *

বহু অজ্ঞান ব্রাহ্মণের, এবং তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত শূদ্র ভ্রাতাগণের

---

* পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী প্রণীত—সার নিত্য ক্রিয়া।

ধারণা—শূদ্রের গায়ত্রী উচ্চারণে ও জপে অধিকার নাই। আমরা ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আমি বলি, তোমরা প্রাণ ভরিয়া বল—

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ভর্গোদেবস্য ধীমহী ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

কে গায়ত্রীর অধিকারী ?

পশু-ভাবকে বিদলিত করিয়া দেবত্বে উপনীত হওয়া যখন গায়ত্রীর উদ্দেশ্য, নীচপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া যখন কর্ত্তব্যবোধকে উজ্জ্বল করা ইহার কার্য্য, তমঃ ও রজোগুণকে খর্ব্ব করিয়া সত্ত্বভাবের প্রাধান্য সংস্থাপন করা যখন গায়ত্রীর লক্ষ্য, তখন কে যে ইহার উপযুক্ত অধিকারী, তাহা নির্ণয় করা অধিক দুরূহ নয়। আর্য্য-শিশু, পবিত্রচেতা ধীশক্তিপ্রভ আচার্য্যের পবিত্র সংস্পর্শে জ্ঞানোদ্গমের প্রারম্ভেই গায়ত্রীর উপকারিতার উপলব্ধি করিতে পারিত সত্য, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সে আচার্য্য নাই, সেরূপ নিষ্কলঙ্ক আর্য্যশিশুও নাই। সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈষয়িক, নানা বিঘ্নবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যহৃদয়ও এখন অনেক পরিমাণে স্বভাবচ্যুত হইয়াছে। এই স্বভাব-চ্যুতিবশতঃ গায়ত্রী-দীক্ষা এখন অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। বৈদিকযুগের সহিত বর্ত্তমানযুগের তুলনাই হয় না। তখনকার লোক যোগী, এখনকার লোক ভোগী। তখনকার ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানী, এখনকার ব্রাহ্মণ আত্মাভিমানী। তখনকার ক্ষত্রিয় স্বদেশ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, এখনকার ক্ষত্রিয় স্বদেশ বা স্বদেশী লোকের মঙ্গলের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ষড়রিপুর পরিপোষণের জন্য অম্লানবদনে আর্য্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। তখনকার বৈশ্য দেশের শ্রী সৌন্দর্য্যের উন্নতিকল্পে—বাণিজ্য ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এখনকার বৈশ্য দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার

জন্য সততই উন্মুখ। এখনকার আর্য্যকুলের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, যেন মুক্তিদায়িনী গায়ত্রীর আর তাঁহারা অধিকারী নন। যে ধীশক্তিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য গায়ত্রীর প্রয়োজন, সেই 'ধীশক্তি'টুকু সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বৈষয়িক বিপ্লবের মধ্যে যেন আর্য্যহৃদয় হইতে চিরকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক শাসনেই হউক, চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই হউক, সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা অব্যাহত থাকিবে এই প্রত্যাশায়ই হউক—অধিকাংশ লোক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন দুই চারি মিনিট গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধির উপর কপটতা ও আত্মাভিমানরূপ আর একখানি অশুদ্ধির আবরণ পড়িতে দেখা যায়। ভোগাসক্ত কপটা-চারী, যেমন মনের মধ্যে ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া দিনান্তে একবার পতিতপাবন ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইতে চায়; শতপাপে অপরাধী ব্যক্তি যেমন সমস্তদিবানিশি পাপাচরণ করে ও প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতঃ পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, বর্ত্তমানযুগের গায়ত্রী পাঠকেরা সেইরূপ দোষে খালাস হইবার জন্য এক এক বার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে গায়ত্রী পাঠকের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইলে চলিবে না। তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন, যে, বৈদিক-যুগের মত তাঁহারা ত আর গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই, যে, গায়ত্রীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক গায়ত্রীর প্রদর্শিত নিয়মাবলীর অধীন হইতে পারি-বেন। এখন বিষম সমস্যা! এই দোষটি কাহার ঘাড়ে চাপান যায়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে দোষটি চাপাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলেও নিস্কৃতি নাই; কারণ

সকলেরই 'গাঝাড়া' দিবার অধিকার আছে ; সুতরাং এ অবস্থায় দোষীর অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া দোষ নিরাকরণের চেষ্টা করাই আবশ্যক বোধ হইতেছে। আর্য্য হৃদয়ে যাহাতে আবার ধীশক্তি পুনর্জীবিত হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। যে সত্যালোক পরিচালিত হইয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সমুদয় ভূমণ্ডলের শিক্ষাগুরুপদবাচ্য হইয়াছেন, সেই সত্যালোক অন্বেষণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইতেছে। যে কর্ত্তব্যবোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অমর হইয়াও মর্ত্তলোকের মঙ্গলের জন্য দিবানিশি খাটিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যবোধের অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই আর্য্যজাতির পুনরুদ্দীপনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইবার প্রয়োজন হইতেছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক সকলকেই বৈদিক যুগ স্মরণ করিয়া—বৈদিক ঋষির নাম লইয়া "জয় সত্যের জয়" বলিয়া ভারতে পুনরায় বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইতেছে। বেদ-শিক্ষা-প্রভাবে আর্য্য হৃদয় সংস্কৃত হইলে, বেদের সত্যালোক, বহুকালপোষিত ভোগেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা আর্য্যের অন্তর হইতে বিদূরিত করিলে ক্রমে আবার আর্য্য হৃদয় গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণে অধিকারী হইবে। নিরাশ না হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই উপস্থিত-দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইতে পারিব, এই আশা করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এক একটু করিয়া আমাদের ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এক একটু করিয়া অহঙ্কার ও অভিমান ছাড়িতে হইবে। এক একটু করিয়া ভারতের গৌরব—সমুদায় ভূমণ্ডলের ও সভ্যজগতের ভক্তিভাজন আর্য্যাবর্ত্তের মহর্ষিগণের সত্যানুরাগ ও বিশ্বপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বেদ কুসংস্কারের পরম শত্রু, অজ্ঞানতা, অসত্যতা ইহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না! সমুদয় দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি

যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র বেদের আলোকেই আলোকিত; সুতরাং বেদের অনুমোদিত অর্থেই আর আর আর্য্যশাস্ত্রের পবিত্রতা ও উপকারিতা। আধুনিক যাবতীয় উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারপূর্ণ নীতি ও ধর্ম্মমতের সহিত সনাতন কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় যে বেদের নামে ভীত হ'ন তাহার কারণ এই যে তাঁহারা জানেন বেদের অনন্ত সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্ব প্রচারিত হইলে, তাঁহাদের স্বার্থের ও মান সম্ভ্রমের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা এবং অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোক তাহাদের সৃষ্ট নানা বিভীষিকার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যতে অর্থাগমের অসুবিধা। ঋষিবংশীয় হইয়াও যদি স্বার্থের জন্য তাহাদের ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে মতি হয়, তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যেন তাঁহারা একবার ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও প্রাচীন ভারতের সহিত তুলনা করেন। তাহাদের হৃদয়ে যদি কণামাত্র দয়া মায়া থাকে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই অনুতপ্তচিত্তে আপনাদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া বেদের সত্যপ্রচারে সহায়তা করিবেন। বেদপাঠ না করিলে আর্য্যভাব লাভ হয় না, সুতরাং সত্যের প্রকৃত আদর করিতে সক্ষমতা জন্মে না। অজ্ঞান লোক, বেদে অগ্নি ও ইন্দ্র পূজা বই আর কিছু খুঁজিয়া পান না। ইহার ছত্রে ছত্রে যে গভীর ভৌতিক, জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে, সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে—হিন্দুসন্তানকে ভারতে পুরাতন যুগকে পুনরানয়ন ও পুনরুত্থান জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; এরূপ করিলে আশা করা যায়, ভারতে আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে এবং ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।" *

---

* শ্রীঋষিকুমার ঘোষ, শাস্ত্রী। তপোবন, মাঘ, ১৩২১।

* * * * পরমার্থ সাধনের পক্ষে বেদাধ্যয়নের নিষেধ কাহারও প্রতি নাই। যগুপি "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" এই শাস্ত্র আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা নয়। ঐ বচনের অভিপ্রায় এই স্পষ্ট জানা যায়, যে স্ত্রী, শূদ্রাদি, কেবল বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করণে অশক্ত প্রযুক্ত বেদপাঠে অনধিকারী হইয়াছে, ইহা ভিন্ন স্বভাব সিদ্ধ কোন দোষ তাহার কারণ নহে। অস্মদ্ বিবেচনায় ঐ নিষেধ শুভকর বোধ হয়, কেননা শাস্ত্রে যাহার ব্যুৎপত্তি নাই, সে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, যাদৃশ কোন মূঢ়জনে চিকিৎসকাভিমানী হইয়া স্বল্প রোগে বিষ প্রয়োগ করিলে হয়।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শন করাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বেদ বলিয়া দেন "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্ব দেবতা, আত্মাতিরিক্ত দেবতা নাই। শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ শ্রুতি শ্রবণ করিলে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ অক্ষমতা হেতু বেণ রাজার ন্যায় স্বদেহকেই পূজ্য জ্ঞান করা ব্যতীত আর কিছু সম্ভব হইতে পারে না। ভারতবর্ষে সভ্যতারম্ভে মনুষ্যের গুণ ভেদে তাহাদিগের বৃত্তি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইয়া, সেই সেই বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তদনুসারে তমোগুণ প্রধান অর্থাৎ মূঢ়জনগণ শূদ্রজাতি বদ্ধ হইয়া, অপর তিন বর্ণের দাস্যোপজীবি প্রাপ্ত হওন পূর্ব্বক সেই কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিত, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কঠিন বিদ্যাভাসের প্রথা কখনই নাই, অপিচ বেদপাঠ ও তপস্যাদি যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম তদকরণে বর্জ্জিত যে ব্রাহ্মণ সন্তান তিনিও বেদার্থ বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তির প্রতি বেদাধ্যয়ন ও বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ যে হইয়াছে, তাহা উচিত কার্য্য বটে, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোন স্ত্রী বা শূদ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠতা এবং

সাধারণ বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা দ্বিজগণের তুল্য বেদার্থ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে ঐ নিষেধ বলবান নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ পুরাণে আছে। বিদুর শূদ্র এবং গার্গী ও দেবহূতি স্ত্রীলোক হইয়াও ঋষিদিগের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ মানব-দেহে দাসীপুত্র থাকিয়া ঋষি চতুষ্টয়ের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে লিখিত আছে। আমি বোধ করি যে এতৎকথনের প্রয়োজনাভাব যে শ্রুতি পাঠ ব্যতীত ব্রাহ্ম জ্ঞানোপদেশ সম্ভবে না, তথাপি ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উক্তি করিয়াছেন তদুল্লেখ করিতেছি যথা "বেদাধ্যয়নেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।" (১)

কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন শূদ্র স্বীয় উপ-জীবিকার নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন, কেননা তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবিকা হরণ করা হয়। শাস্ত্রার্থ প্রচার, যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং উপাসনাদির উপদেশ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিসমূহের নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের সাংসারিক ব্যয়োপযোগী অর্থেরও আবশ্যক। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে রাজব্যবস্থা ক্রমে প্রতি ব্যক্তিকে স্ব স্ব উপার্জ্জনের দশমাংশ ধর্ম্মোপদেশকবর্গের বেতনার্থ প্রদান করিতে হয়, অস্মদাদির মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থাই নাই, তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান হইয়াছে যে একবর্ণে অন্যের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে (২) ও ব্রাহ্মণ সত্বে যজ্ঞের হোত্রাদি কর্ম্মে অন্যবর্ণের অধিকারাভাব এবং যজ্ঞের যে দ্রব্যসামগ্রী এবং দক্ষিণা তাহা ঐ হোত্রাদির প্রাপ্য, অতএব যে স্থানে এই বিধির উল্লঙ্ঘনে ধর্ম্ম লোপের

(১) সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র
(২) ভগবদ্গীতা ৩অঃ ৩৫ শ্লোক

সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে তাহাতে প্রত্যবায় না হওয়ার বিষয় কি? সুতরাং বিত্তার্থে শূদ্রাদি বেদোচ্চারণের অনধিকারী স্বীকার করিতে হইবে। *

আমরা বেদান্তের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম জীব শিব অভেদ ভুলিয়া গিয়া কাঁচা আমি লইয়া মারামারি—হিংসাহিংসি করিতেছি। এ বড় ও ছোট, আমি ব্রাহ্মণ, সে চণ্ডাল, আমি উচ্চ তুই নীচ, আমি শ্রেষ্ঠ তুই নিকৃষ্ট, আমি পবিত্র তুই অপবিত্র, আমি মানুষ সে পশু ইত্যাকার ভ্রান্ত উক্তি করিতেছি। প্রকৃত কে যে আমি ভুলিয়া গিয়াছি। "আমি" কে? এই সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করা গেল :—

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শঙ্করাচার্য্য একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যখন যে প্রশ্ন করিতেন, তিনি দ্বি ভাবে তাহার উত্তর দিতেন। একদিন একজন পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—মহাত্মন্, আপনি কে, তাহা কি স্থির করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, 'স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপো মহাত্মা।' পণ্ডিতবর পুনরায় বলিলেন, সে কি রূপ? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, যেমন বহু সংখ্যক সরাব স্থিত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বহু সংখ্যক সূর্য্য পরিদৃশ্যমান হন, আমিও সেই রূপ ঈশ্বরাত্মার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। যেমন কুম্ভকারেরা মৃত্তিকার সরাব প্রস্তুত করিয়া থাকে, স্বভাব আমার এই শরীরটিও সেইরূপ পঞ্চভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর আত্মারূপে এই দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। যেমন জল পরিপূরিত সরাবগুলি একটি যষ্টি দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট

* শ্রীলোকনাথ বসু প্রণীত ১২৬৩ সালে মুদ্রিত হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম।

গোচর হয় না, এবং সরাবের উপর যে আঘাত পড়ে, তাহা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ এই নশ্বর শরীর যখন বিনষ্ট হয়, তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্যাংশও ঈশ্বরে লয় হইয়া যায়। মনুষ্যশরীর ধ্বংস দ্বারা আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তিনি যেরূপ সেইরূপেই থাকেন।

অবিনশ্বর আত্মাই বা কে? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংশয়শূন্য বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই আত্মা বলা যায়। সেই আত্মা সামান্য বুদ্ধির অগোচর, অথচ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে, অথচ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, কেবল ত্বক্ দ্বারা অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব কেবল তত্ত্বদর্শী মহাত্মা লোকেরা মনে ধারণা করিতে পারেন; এতদ্ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আর উপায়ান্তর নাই। যদি কোন তার্কিক লোক বলেন যে, আমি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না; তাহা হইলে, প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। আত্মার অস্তিত্ব যিনি স্বয়ং না বুঝেন, তাঁহার সে বিষয় প্রতীতি করান কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব উভয়ই সহজে কাহারও বোধগম্য হয় না। ঈশ্বর কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান কোন্ কালে কাহার হইয়াছে? তর্ক দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় কখনই হইতে পারে না। বিশ্বাস ব্যতিরেকে সেই বিশ্বপতিকে প্রাপ্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই। এই জগতের সৃষ্টি কৌশল আলোচনা করিয়া যাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের অবশ্য একজন সৃষ্টি কর্ত্তা আছেন—তিনি অনাদি, সর্ব্বব্যাপী, তুলনা রহিত, পবিত্র ও চৈতন্য স্বরূপ, এবং তিনিই আত্মারূপে প্রত্যেক

জীবের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, এবং তাহা হইলেই তাঁহার আপনা আপনি আত্মজ্ঞান হইবে। তখন তিনি জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, এই সংসারের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সেই পরমাত্মার অংশ মাত্র। আমরা নিরন্তর মায়া মোহে বিমোহিত হইয়া নানা রূপ কল্পনা করিতেছি, নানা পথের পথিক হইতেছি; যে সকল বস্তু আমার নহে, সেই সকল বস্তুই 'আমার আমার' করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছি; কিন্তু আত্মার আমি, ও আত্মা আমার, ইহা ভিন্ন আমি কাহারও নহি, এবং আমার ও কেহ নহে।

জগৎ আত্মাময়, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, মন নির্ম্মল হয়, এবং কিছুই অপবিত্র বলিয়া বোধ হয় না। আত্মপর বিবেচনাই মনোমালিন্যের ও শান্তি ভঙ্গের একটী প্রধান কারণ। যাঁহাদিগের সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ গুণের প্রভাবে ইহ সংসারের কাহাকেও পর দেখেন না। আপন সন্তানের প্রতি যে রূপ স্নেহ করেন, একটি নিকৃষ্ট প্রাণীকে স্পর্শ করিলে, পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে পাপ স্পর্শ হয়, তাহাকেও সেই রূপ স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুক্কুর কর্দ্দমে পড়িয়া রহিয়াছে, কর্দ্দম হইতে আত্মোদ্ধার করিবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। তদ্দৃষ্টে দয়ার্দ্র চিত্ত শঙ্করাচার্য্য সেই কর্দ্দম পূরিত দুর্গন্ধময় স্থানে গিয়া কুক্কুরটিকে ক্রোড়ে লইয়া শুষ্ক ভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং তথা হইতে স্কন্ধে তুলিয়া একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলাশয়ে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয়কে এরূপ

নিকৃষ্ট পশুর সেবা করিতে দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, ওহে অবোধ ব্রাহ্মণ! তুমি কি করিতেছ? যে কুক্কুর স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হয়, তুমি সেই কুক্কুরের গাত্রের কর্দ্দম ধৌত করিতেছ? তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই। তৎশ্রবণে শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া বলিলেন, "আত্মজ্ঞানপথি বিচরিতাং কো বিধি কো নিষেধঃ।" শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থপূরিত বাক্যটি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই ব্রাহ্মণ ত সামান্য ব্যক্তি নহে; এই সামান্য একটি কথায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সারাংশ সঙ্কলন করিল। ব্রাহ্মণ নীর হইতে তীরে উঠিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ তুমি কে, আমাকে পরিচয় দাও। শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, আমি কুক্কুরের ন্যায় ঈশ্বরের একটি সৃষ্ট পদার্থ। আমি কুক্কুর স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি পূর্ব্বে যে ভৎর্সনা করিলেন, সেটি নিতান্ত অমূলক। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, যে তত্ত্ব পথের পথিক হইয়াছে, তাহার পক্ষে কিছুরই বিধিও নাই, কিছুরই নিষেধও নাই। শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অজ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ, আমাদিগের এই শরীর ভূত সমষ্টির দ্বারা সৃষ্ট, ইহা আপনি অবশ্য স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং "যত্র জীব তত্র শিব" বোধ হয় এ মহাবাক্যেরও অবমাননা করেন না; তবে কুক্কুর স্পর্শে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হইবে কেন, আপনাকে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ, পড়িয়া শুনিয়া কি তোমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে? ব্রাহ্মণ শরীরে ও ঘৃণিত পশু কুক্কুরে কি প্রভেদ, তাহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, মহাশয়, পড়িয়া

শুনিয়া যত দূর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে কুকুরের সহিত আমার কি প্রভেদ এরূপ কথা কিছুই লিখিত নাই ; তবে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, "যত্র জীবঃ তত্র শিবরূপেণ নারায়ণঃ" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমিও নারায়ণ, আপনিও নারায়ণ, এবং এই কুকুরও নারায়ণ। মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কুকুর কর্দ্দমে পড়িয়া প্রায় গতাসু হইয়াছিল, বহু যত্নে আমি ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই কার্য্যের দ্বারা পুণ্য না হইয়া কুকুর স্পর্শজনিত আমাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করাতে ধর্ম্ম আছে, এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার করি ; তাহা বলিয়া কি কুকুরকে অস্পৃশ্য পশু বলিয়া স্বীকার করিব না ? কুকুরের সেবা শুশ্রূষা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সকল নিয়ম আছে, তৎ সমুদয় অগ্রে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট জাতিরাই কুকুরের সেবা করিবে, ব্রাহ্মণের পবিত্র হস্ত দেবসেবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব হে বিপ্র তনয়, তুমি কুকুরের প্রাণ রক্ষা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, কুকুর স্পর্শজনিত পাপ তাহা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া জানিবে। অতএব ঐ ঘৃণিত পশুকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে গঙ্গা স্নান করিয়া আইস, ও শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কর ; নচেৎ সন্ধ্যা বন্দনাতে তোমার কোন অধিকার থাকিবেক না, তোমার এক্ষণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, এক কুকুর স্পর্শেই আমার ব্রাহ্মণত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে আমি চণ্ডাল হইয়াছি ? এক্ষণে সুরধুনী সলিলে এই পাপ দেহ ধৌত করিলে, পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইব ? সুরধুনীর পবিত্র সলিল যখন চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিতে পারেন, তখন অদ্য আমি শতাধিক চণ্ডাল সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইব, এবং আমার

সহিত তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ করিয়া আনিব। স্নানে যাইবার সময় এই কুক্কুরকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, গঙ্গাজলে ধৌত করিলে ইহারও কুক্কুরত্ব থাকিবে না।

শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি উন্নত স্বরে বলিলেন, রে অবোধ বালক! তুই আমার সহিত কি সাহসে তর্ক করিতেছিস্? তুই কি জানিস্ না যে, জন্মজনিত দোষ কি গঙ্গা জলে ধৌত হইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া করিয়া কহিলেন, তবে জন্মজনিত উৎকৃষ্টতাও কুক্কুর স্পর্শে নষ্ট হইতে পারে না। আমি যখন ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন কুক্কুর স্পর্শে সে ব্রাহ্মণত্বের হানি হইবে কেন? অনুমানে বোধ হইতেছে, আপনি এক জন পৌরাণিক। পৌরাণিকদিগের অসংলগ্ন কথাতেই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ভাল, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি জন্ম-জনিত দোষ কিছুতেই ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে, অষ্টাদশ পুরাণ কর্ত্তা বেদব্যাস ধীবর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হই-লেন? মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবীর্য্যে সমুদ্ভূত হইয়াও কি জন্য মাতৃজনিত দোষে দূষিত হইয়া রহিলেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, বেদব্যাস সাক্ষাৎ নারায়ণ, তিনি বেদার্থ প্রচার করিবার জন্যই অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্ম বিষয় লইয়া তর্ক করিলে, আমরা পাপ পঙ্কে নিপতিত হইব। তুমি নিতান্ত বালক, শাস্ত্রের ভাবার্থ কিছুই বুঝ না; এই জন্য অনর্থক তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিবে-চনা করিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি জন্য ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়াছিলেন? স্বয়ং নারায়ণ সংসারের উপকার সাধন জন্য যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, সে সকল বিষয় লইয়া তর্ক করার

কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার কার্য্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বেদব্যাস যে সামান্য মনুষ্য নহেন, অষ্টাদশ পুরাণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই কুক্কুরের এমন নীচ জন্ম কেন হইল? ব্রাহ্মণ সদর্পে বলিলেন, পূর্ব্ব জন্মে কঠোর পাপ করিয়াছিল, তাহাতেই এই জন্মে কুক্কুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে। তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক পুণ্য করিয়াছিলে, সেই পুণ্যেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, মহাশয়, কি পাপে কুক্কুর জন্ম হয়? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাহারা দেবদ্রব্য অপহরণ করিয়া খায়, ব্রাহ্মণের অগ্রে ভোজন করে, তাহারাই কুক্কুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু আদিতে কি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন নিকৃষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি করেন নাই? যদি তাহা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, পাপ ব্যতিরেকে কি জন্য কুক্কুরের সৃষ্টি হইল? বিষ্ঠাভোগী কীটানু-কীটেরও আদি কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। পাপ ব্যতিরেকে এই সকল নিকৃষ্ট প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া কি আপনার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আদিতে সকল প্রাণীই পবিত্র ছিল, কেবল কালের প্রভাবে প্রাণীপুঞ্জের পুণ্য ধ্বংস হইয়া পাপের বৃদ্ধি হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, আপনার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি বিস্তারে বুঝাইয়া দিন মহাশয়, পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঈশ্বর এক, আত্মময় ও সর্ব্ব ভূতের আশ্রয় স্থল। এই পরিদৃশ্যমান

জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, এবং তাঁহাতেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আত্মতত্ত্বদর্শী লোকেরাই একেবারে ভয়শূন্য হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের রাজ ভয় নাই, দস্যু ভয় নাই, জাতি ভয় নাই। অন্য কি কথা, তত্ত্বদর্শী লোকেরা মরিতেও ভয় করেন না; কেবল সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে কাল হরণ করেন। যাঁহারা এই সংসারকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহারা এই কুক্কুরকে কি বলিয়া অপবিত্র জ্ঞান করিবেন? যাহার মন অপবিত্র, সে এই সংসারে নানা অপবিত্র বস্তু দর্শন করে। যাঁহার মন নির্ম্মল হইয়াছে তিনি জগতের কোন বস্তুই অপবিত্র জ্ঞান করেন না। মহাশয়, আপনার বয়স অধিক হইয়াছে, মৃত্যুর অধিক কাল বিলম্ব নাই, এক্ষণেও আপনার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আপনি কি জানেন না যে, মহাপ্রলয় কালে এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বরে লয় হইবে? সে সময় কি তিনি অপবিত্র বস্তুগুলি আপনাতে লয় হইতে দিবেন না? বাছিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করিবেন? মহাশয়, যত দিন আপনার অহং তত্ত্ব না উদয় হইতেছে; ততদিন আপনি তত্ত্বদর্শী লোকের কার্য্য দেখিয়া বিরক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।" *

ভক্ত ভেদ রতি ভেদ পঞ্চপরকার।
শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদ কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ॥

---

* বিজ্ঞান শান্তিকুসুম—আত্মতত্ত্ব।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম ।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৯পঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৫
শ্রীমদ্ভাগবতঃ ; ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ; ১৪শ অধ্যায় ।

"মহারাজ পরীক্ষিত বলিতেছেন—হে মহামুনে ! যাঁহারা মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ কোটি ব্যক্তির মধ্যে হরিভক্তিপরায়ণ প্রশান্ত-চেতা মনুষ্য অতীব দুর্ল্লভ ।"

* * *

শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর । (১)
দাস্য ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার । (২)

---

(১) "নব যোগেন্দ্র অর্থাৎ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন, এই ৯ জন ঋষি । ইহারা ক্ষত্রিয় ভরত নৃপতির সহোদর ভ্রাতা এবং ক্ষত্রিয় রাজা ঋষভের তনয় । ইহারা অখিল বসুন্ধরা পর্য্যটন ও ঈশ্বরারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । সনকাদি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমান পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎ-কুমার ইহারা ব্রাহ্মণ—ঋষি ।

(২) (ক) ব্রহ্মার মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ,—যিনি তৎপূর্ব্ব জন্মে কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং হরি আরাধনার ফলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী জন্মে ঋষি হইয়া-ছিলেন ।

তারপর কোন কোন শাস্ত্রে যদিও আছে—পাপ পুণ্য ইতর বিশেষ অনুযায়ী মানুষ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হয়, কিন্তু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইহার প্রতি আমরা কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। নিম্নে আমরা আমাদের কথার যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র এক বাক্যে বলিয়াছেন—ভগবৎভক্তি ও ভক্ত-জন্ম লাভ সুদুর্ল্লভ ও বহু পুণ্য-ব্যঞ্জক। তাই শ্রীকৃষ্ণের গোপ সখাগণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিয়াছেন—

সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্য জুঞ্জাঃ ॥ ১১

ভাগবত, ১২শ অধ্যায়, ১০ স্কন্ধ।

গোপ-শিশুরা যে ভগবান কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফল সন্দেহ নাই।

ভক্ত-জন্ম ও ভক্তি যে কত কোটি জন্মের ভগবৎ আরাধনা ও তপস্যার ফল, তাহা নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করুন—

* * *

ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

* * *

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

* * *

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥

*   *   *

সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। (৩)
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা গুরুজন। (৪)

(খ) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদ, (গ) ক্ষত্রিয় রাজা উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, (ঘ) বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় শকল্ক-পুত্র মহাত্মা অক্রুর, (ঙ) কপিপতি হনুমান, (চ) দৈত্য রাজ বলি, (ছ) মহারাজ পরীক্ষিত (জ) ম্লেচ্ছরমণী শুকীর গর্ভজাত শুকদেব গোস্বামী (ঝ) শূদ্রা-গর্ভজাত শূদ্রবিদুর (ঞ) ব্রাহ্মণ বিভীষণ (ট) মহারাজ অম্বরীষ, (ঠ) বাল্মীকি মুনি (যিনি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন) (ড) পৃথুরাজা, (ঢ) মিবারের রাণা কুম্ভসিংহের রাজ্ঞী মীরাবাই ; (ণ) জোলার পুত্র কবির ; (ত) কৃষকের সন্তান তুকারাম, (থ) ডোমজাতীয় হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থপ্রণেতা নাভাজি, (দ) কুম্ভকার জাতীয় ভক্ত কেবল কুবা ; (ধ) কসাই জাতীয় ভক্ত সজন (ন) চর্ম্মকার জাতীয় ভক্ত রবিদাস ; প্রভৃতি প্রভৃতি।

(৩) বৈশ্য গোপ—গোয়ালাজাতীয় শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক কৃষ্ণ, মধুমাদল ; ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডব, ক্ষত্রিয় জাতীয় পরম ভক্ত উদ্ধব, ত্রেতা যুগের চণ্ডাল জাতীয় মিত্র গুহক, সুদাম বিপ্র, কপি জাতীয় সুগ্রীব প্রভৃতি !

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান শ্রীদামানং পরাজিতঃ। ১৪

দ্বাদশ স্কন্ধ ১৮অঃ, ভাগবত।

মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। (৫)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া শ্রীদামকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন।

স্কন্ধে চড়ে স্কন্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।

কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ চৈঃ চরিতামৃত—মধ্যলীলা

(৪) ক্ষত্রিয় জাতীয় দশরথ কৌশল্যা, বসুদেব দেবকী প্রভৃতি, ব্যাধ রমণী শবরী (ইনি শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ হস্তে কুল খাওয়াইয়াছেন) শূদ্রাবিদুর পত্নী প্রভৃতি।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং।

গোপি কোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥১২

দশমস্কন্ধ; নবম অধ্যায়; ভাগবত।

যশোদা নরদেহ ধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্কে আত্মজ জ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

মমতাধিক্যে তারণ ভর্ৎসন ব্যবহার।

আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।

চারি রসে গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।

সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে ॥

চৈঃ চরিঃ মধ্যলীলা

৫ মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজ গোপীগণ।

মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্যগণন ॥

* * *

মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।

সখ্যে অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক হয় ॥

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ব্রজগোপীকাগণ, নন্দ যশোদা কে ? কোন্ পুণ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণকে বল্লভ ও পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

গোপ্যস্তু "শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া" "ঋষিজা" গোপকন্যকাঃ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন ॥

"হে রাজেন্দ্র ! গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদ চতুষ্টয়, কেহ বা ঋষিগণ সাধন বলে গোকুলে গোপকন্যা রূপে অবতীর্ণা, কেহ বা দেবকন্যাগণ, স্বরূপতঃ কেহই মানুষী নহেন।

কন্দর্প কোটি লাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসিনঃ।
কামিনী ভাবমাসাদ্য স্মর ক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ।
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্যাহজনিনস্তথা। (বৃহদ্বামন পুরাণ।)

পুরাকালে নিখিল-মন্ত্র শক্তিস্বরূপিনী চতুষ্টয় শ্রুতি স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে নারায়ণের ভুবন মোহন মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শনে কামকাতর বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "ভগবান্ ! কোটি কন্দর্প লাবণ্য সম্পন্ন তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদের মন সকল কামিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া অসংশয় কামসংক্ষুব্ধ হইয়াছে, তোমার নিত্যধাম গোলোকবাসিনী নিত্য চিন্ময়ী গোপিকাগণ যেমন তোমাকে ভজনা করেন, আমাদিগেরও সেইরূপ তোমাকে ভজনা করিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছে।" দ্বাপরের শেষে ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

"ঋষিজা"—যথা পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে।—

কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ ॥ চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুং ঐচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং অপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

অর্থাৎ "পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি সকল সুন্দর বপু শ্রীহরি রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা স্ত্রী হইয়া গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কামের দ্বারা হরিকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

আর শ্রীনন্দ, যশোদা! তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে দ্রোণ ও ধরাদেবী নামে অভিহিত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে সহস্র বৎসর কঠোর ভাবে নারায়ণের আরাধনা করেন—এবং তাহারই ফল স্বরূপ গোলকবিহারী হরি দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

আর ক্ষত্রিয় বসুদেব দেবকী। ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যথা ক্রমে সুতপা নামক প্রজাপতি ও পৃশ্নি ছিলেন—তারপর প্রজা সৃষ্টির মানসে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করায় ফলে পৃশ্নি পুত্র নামে ভগবান্ হরি তাঁহাদের সন্তান রূপে জন্মিয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে তাঁহারা কশ্যপ নামে মুনি ও অদিতি নামে ঋষি-পত্নীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নারায়ণকে বামন রূপে লাভ করেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারাই যথা ক্রমে ক্ষত্রিয় দশরথ রাজা এবং কৌশল্যারূপে শ্রীরামচন্দ্রের জনক জননী হন এবং দ্বাপরের শেষে তাঁহারাই আবার ক্ষত্রিয় বংশে বসুদেব দেবকী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহা বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

এতাবত আমরা দেখিতে পাইলাম, ব্রাহ্মণ ও ঋষি কশ্যপই বহু সাধনার

পর ক্ষত্রিয় দশরথ ও ক্ষত্রিয় বসুদেব হইলেন। পাপের আধিক্য অথবা পুণ্যের অল্পতায় ক্ষত্রিয় হইলেন না, বহু তপস্যার ফলেই ক্ষত্রিয় হইলেন। নন্দ যশোদার গোপবালাগণ ও ব্রজগোপিনীগণ সম্বন্ধে ঐ একই কথা। ইঁহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী পার্ষদ—কেহই পাপী নহেন বা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অল্প পুণ্যবান নহেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধ্য প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের পুত্র সখা বল্লভ প্রাণনাথ। সুতরাং আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারিনা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অনেক অল্প পুণ্যের ফলে হীন জাতীয় বৈশ্য গোয়ালার ঘরে ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বরং ব্রাহ্মণগণ যে ভগবানের কোটি কোটি জন্ম আরাধনা ও ভূরি ভূরি যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, ইঁহারা ভক্তি ও প্রেম বলে সেই ভগবানকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিয়াছেন—দর্শন স্পর্শন ও শাসন পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

ঋষিগণ ও দেববালাগণ আরাধনা করিয়া বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়া স্বেচ্ছায় বৈশ্য গোপকুলের কুলাঙ্গনা হইয়াছিলেন। পাপের ফলে ব্রাহ্মণ Dogradation নয়, অশেষ তপস্যা ও পুণ্যের ফলেই বৈশ্য কুলে Promotion, সুতরাং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করাটা হীনত্বসূচক, ইহা প্রতিপন্ন হইল না।

পাদটীকার (ফুটনোটের) উদ্ধৃত শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তগণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ২।৪ জন ব্যতীত উহাদের সকলের জন্মই ব্রাহ্মণকথিত হীনকুলে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি--কর্ম্মবন্ধনই যত অনর্থের মূল। এই বন্ধন—শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং আত্মজ্ঞান লাভের উপরই মুক্তি লাভ নির্ভর করে। এইরূপ কোটী মুক্ত জীবের মধ্যে একজন মাত্র ভক্তিলাভ করিয়া ভক্তগণ মধ্যে পরিগণিত

হন। সুতরাং পাঠকগণ দেখিবেন—পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তগণের নীচ কুলে জন্মগ্রহণ পাপের ফলস্বরূপ নয়, বরং অশেষ পুণ্যের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান নারায়ণের বুকে লাথি মারিয়া ভৃগুমুণি হওয়া, ডোমকুলের নাভাজি হওয়া, যবন কুলের হরিদাস হওয়া,—শূদ্রকুলের বিদুর হওয়া, কপি কুলের হনুমান হওয়া, চণ্ডাল কুলে গুহক হওয়া কিম্বা গোয়ালা কুলের শ্রীদাম হওয়া কি অধিক শ্লাঘ্য অধিক বাঞ্ছনীয়—প্রার্থনীয় নয়? আমাদের ত তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয়। বহু বহু জন্মের পুণ্য ও সাধনার বলে ইহারা ভগবৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পাপের ফল যদি শূদ্র জন্ম হয়, তবে সেই পাপের ফলে ভগবৎ ভক্তি ও ভগবৎ দর্শন লাভ হইতে পারে কিরূপে? বরং ভগবানের ঐ পঞ্চবিধ ভক্ত (শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের উপাসক) গণের মধ্যে "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, জুগুপ্সা, কুল, শীল, ও জাতি এই জীবনের বন্ধন স্বরূপ ভগবৎ ভক্তি ও মোক্ষ দ্বারের অর্গল স্বরূপ অষ্ট পাশ বদ্ধ গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্পই ছিলেন। চারিযুগের মধ্যে খুঁজিয়া তাঁহাদের নাম বাহির করিতে পারা যায় না। যাহা আছে তাহাও ভক্তির নিম্নস্তর শান্তভাবের ভক্তগণের সংখ্যার মধ্যে। পরবর্ত্তী ক্রমোন্নত ৪ চারিভাবের ভক্তের মধ্যে তাঁহাদের নাম নাই বলিলেই চলে!

এইত "শূদ্রের পূজার ও বেদে অধিকার" আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে সঁ-উদাহরণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-পদানত কুসংস্কার ও হিন্দুয়ানীর বেড়া জালে আবদ্ধ শূদ্র কথিত ভগবৎ সন্তানগণ,—অমৃতের পুত্রগণ, দিব্যধামবাসী জ্যোতি কিরণকণাগণ তোমাদের জন্য সমাজের দারুণ নিপীড়ন শ্লেষ বিদ্রূপ নিন্দা টিট্‌কারী হাসিমুখে সহ্য করিয়া শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক এই অমৃত উত্তোলন করিয়াছি।

তোমরা ইহা সাদরে গ্রহণ কর—পান কর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কে কবে বড় হইয়াছেন, কোন্ সমাজ কবে উন্নত হইয়াছে—ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ? লোকে এক্ষণে জাহাজে করিয়া শ্রীক্ষেত্র,চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ,মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল এবং চীন, জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ যাইতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে নানা জাতি (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, ঢুলি, মালি, বেহারা, বাগ্দি, হাঁড়ি, মুচি) একত্র হইয়া বিদ্যালয়ে একত্র পাঠ করিতেছে—বিদ্যাজ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে—সংসারে একত্র হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে—অনেক স্থানে—হোটেলে রেলে ষ্টিমারে মিঠাইর দোকানে একত্র পান ভোজন আহারাদি করিতেছে —সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে বহু বিবাহ গৌরীদানের ফল স্বরূপ বাল্য বিবাহ ত্যাগ করিতেছে পুত্রগণের ন্যায় কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছে, বাল্য বিধবাদিগের বিবাহ দিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে নানা জাতি একত্র হইয়া কংগ্রেস কন্ফারেন্স করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন করিতেছেন, বিলাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেলিগেট বা প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন—নগরে নগরে অনাথাশ্রম সেবাশ্রম বিধবাশ্রম স্থাপন করিতেছেন—গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন করিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিক্রম করিয়া—বিদ্যাজ্ঞান বহুদর্শিতা লাভ করিতেছে, বিভিন্ন দেশ হইতে তত্তৎ দেশের জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক মাতৃভূমিকে সম্পৎশালিনী করিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? বৈদ্য-কথিত স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্ম

প্রচার করিতে, বৈশ্যজাতীয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনকে পরিব্রাজক বেশে নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে কি তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন? ইউরোপ আমেরিকা মুগ্ধকারী নবভারতের যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দকে কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়া চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসমিতিতে হিন্দুধর্ম্ম —বৈদিক—বেদান্ত ধর্ম্ম ঘোষণা ও প্রচার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন!

ভগিনী নিবেদিতা—ক্রিশ্চিয়ানা, জায়া মাতা, ধীরা মাতা সেভিয়ার দম্পতি, ব্রহ্মচারী গুরুদাস—গুড্‌উইন—আলেকজেণ্ডার-প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশীয় নরনারীকে বেদান্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কি কোন ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিত মহাশয় ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন? লেপ্টন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস—ভূপর্য্যটক চন্দ্রশেখর সেন—যামিনী মোহন ঘোষ প্রভৃতিকে বিশ্ব পর্য্যটনে কি পণ্ডিতগণ পাঁতি লিখিয়া দিয়াছিলেন? রামায়ণ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে ও বেদ অনুবাদে স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত কোন্ বাক্যচূড়ামণির ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন? সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত-প্রমুখ মনস্বীবর্গ কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার জোরে এত বড় হইয়াছেন? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্র শীল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদা মিত্র, লালমোহন সাহা কি ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা পত্রের সহায়তায় এত বড় হইয়াছেন? ক্ষত্রিয় রাজ্যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের আমলে পড়িলে ইঁহাদের কি ব্যবস্থা হইত? শূদ্র শম্বুকের মত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে ইঁহাদের শিরশ্ছেদ হইত না কি? অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাসত্ব বা গোলামী ত্যাগ করার অপরাধে এই সব শূদ্র-কথিত মহাত্মাগণকে ভারত-গৌরব রত্নগুলিকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দেওয়া হইত না কি? শ্রীকৃষ্ণ

প্রসন্ন, কেশবচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের জিহ্বা সর্ব্বাগ্রে তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইত! মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কি ব্রাহ্মণের ব্যবস্থায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন? ব্রাহ্মণগণের সে প্রতিবাদের কথা দেশবাসী কখন ভুলিবে কি? ব্রাহ্মণ ও তাঁদের লিখিত শাস্ত্র কথিত ম্লেচ্ছ ইংরাজ রাজের অধীনে জজিয়তি করা, ওকালতি মোক্তারী কেরাণীগিরি ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারীং কণ্ট্রাক্টারী করা কোন্ স্মৃতির কোন্ পংক্তিতে লেখা আছে? তথাপি সহস্র সহস্র লোক ঐ ব্যবসা করিতেছেন? তাঁহারা এ বিষয়ে বাক্যরত্নের তর্কসিদ্ধান্তের ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন কি? পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন,—কোন কালে কোন জাতি বা সমাজ পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রের জোরে উঠিতে পারে নাই—পারিবেও না। ব্যবস্থাপত্র লাভের আশা ও মায়া পরিত্যাগ কর। আপন আপন গ্রামকে সমাজকে তুলিবার জন্য সকলে অগ্রসর হও। দেবালয় হইতে পুরোহিতকুলকে পেন্সন দিয়া নিজেরা পূজা অর্চ্চনায় ব্রতী হও। ভোজনে পানে, শয়নে গমনে, উপার্জ্জনে ব্যয়ে, বিবাহে, পুত্রোৎপাদনে কৈ কেহ ত প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিতকে ডাক না,—তবে পূজা অর্চ্চনা উপাসনা ভজনার বেলায় প্রতিনিধি পুরোহিতকে ডাকিবে কেন? অন্য কেহ আহার করিলে তোমার পেট ভরে কি? তা যদি না ভরে—তবে অন্য কেহ পূজা করিলে তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে কেন? এস, ভয় কি? আর জিহ্বাচ্ছেদ, তপ্তকটাহে নিক্ষেপের ভয় নাই। প্রাণ খুলিয়া ওঙ্কার রবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তোল, শিশুগণের কোমল কণ্ঠ হইতে প্রাতঃসন্ধ্যায় সামবেদের মধুর সঙ্গীত উদ্গীত হউক।

নিজে পুষ্প চন্দন তুলসী দূর্ব্বা ধূপ ধূনা সজ্জিত করিয়া প্রাণেশ্বর হরির পূজায় ব্রতী হও। নিজ হস্তে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করাও—নানাবিধ

কুসুম-ভূষণে সজ্জিত করাও—পূজা কর, অর্চ্চনা কর, ভোগ দাও, শয়ন দাও, পঞ্চপ্রদীপে আরতি কর। তাঁহার কাছে জাতি বিজাতি—ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। তিনি সকলেরই স্রষ্টা পিতা। ভক্তি পূর্ব্বক—মন্ত্র তন্ত্রের ধার না ধারিয়া আপনার মাতৃভাষায়—প্রাণের ভাষায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও,—তোমার ভক্তির নৈবেদ্য শ্রদ্ধা-প্রদত্ত ভোগ (ভোজ্য সামগ্রী) তিনি বিপুল আনন্দে গ্রহণ করিবেন। তিনি কি ভক্ত পুত্র প্রদত্ত উপহার গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন? তিনি যে ভক্তবৎসল। তিনি যে দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের বিষ মিশ্রিত অন্ন, গুহক চণ্ডালের সাদরোপহার, ব্যাধ কন্যা সবরীর ফল, ভক্ত শূদ্র বিদুরের ভক্তির অন্ন—মুচি রুইদাসের প্রদত্ত ভোগ, কসাই সাবর নৈবেদ্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তুমি কেন ভীত হইবে! কে কবে নিজে না ভজিয়া—পরকে দিয়া পুরোহিত দ্বারা ভজনা করিয়া পূজিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছে। শত শত শতাব্দীর ভ্রান্তি হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার আশায় বসিয়া থাকিলে—হরিৎবর্ণ রম্ভা লাভ হইবে মাত্র—অথবা মৃগ শিশুর মত মরীচির আশায় প্রাণ হারাইবে। কোন ফল পাইবে না। অধিকার ভিক্ষায় মেলে না—অর্জ্জন করিতে হয়। আর তোমাদেরও,—গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বলি হে কলির সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! অধিকার দাও—অধিকার দাও। অধিকার না দিয়া কিছুতেই উপায় নাই। শত করা ৯৭ জনকে বেদে বঞ্চিত করিতে যাইয়া তোমরাই বঞ্চিত হইয়াছ, তোমাদের মধ্যে কয়জন বেদ পড়িয়াছে? বেদ পড়া ত দূরের কথা, বেদ দেখিয়াছ কি? টোলে বেদ ২।১ খানা আছে কি? ক্ষান্ত হও, আর আর প্রবল বন্যায় তৃণতুল্য হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইও না। প্রহসনের অভিনয় করিয়া আর দিন দিন হাস্যাস্পদ হইও না, ভয় নাই,—বেদ ও

পূজার অধিকার পাইলে শূদ্রগণ বিদ্রোহী হইয়া তোমাদের পৈতা বা শ্রাদ্ধের বিরাট গীতা কাড়িয়া লইবে না। মূর্খের দ্বারাই অধিক ভয়—বিদ্বান দ্বারা সমাজের ভয়ের কারণ ঘটে না, বরং মঙ্গল হয়। শূদ্রগণকে ধর্ম্মের অধিকার দিলে, বেদ ও পূজার অধিকার দিলে ধর্ম্ম আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—তোমাদের প্রতি তাহারা অধিক শ্রদ্ধাবান্ হইবে, মনে করিও না, তোমাদের ব্যবস্থার অপেক্ষায় তাহারা বসিয়া আছে? তোমাদের ব্যবস্থা লইয়া বা অনুমতি পাইয়া হীরেন্দ্র দত্ত বেদান্তরত্ন এবং বারুই জাতীয় যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি হন নাই। নিজের ক্ষমতায় আত্মশক্তিতে হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনার ব্রাহ্মণ্য তেজ প্রকাশ কর, ভূমণ্ডলের সকলের মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। উহা কি—ভক্তি শ্রদ্ধা কি আবার সভাসমিতি করিয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী করিয়া উচ্চ চীৎকার, বক্তৃতা প্রদান ও রেজলুউসন করিয়া পাওয়া যায়? সে আশা ত্যাগ কর! প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া দূরের কথা, প্রকৃত মানুষ হও দেখিবে, তোমাদের চরণতলে কোটি কোটি শূদ্র আপনা আপনি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, সরস্বতী দয়ানন্দ, লোকনাথ, জগদ্বন্ধু হইতে চেষ্টা কর, প্রণাম ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া ভক্তি পাওয়া যায় না। অন্যকে ঘৃণা অবজ্ঞা করিয়া শূদ্রগণকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের অধিকার ও সামাজিক উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া,—ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়া কখনও তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না! বৈদ্য খসিয়াছে—কায়স্থও খসিবার পথে, নমঃশূদ্র যায় যায়, রাজবংশীরাও ঐ

কথা। অনাচরণীয় শত করা ৫৮ জন পূর্ব্বেই গিয়াছে। আর কাহাদের লইয়া স্মৃতি-সংহিতার বিধান চালাইবে। ব্রাহ্মণ বংশ—হিন্দুজাতি দিন দিন ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। আর ঘৃণা বিদ্বেষের কথা,—আর পরিত্যাগ পরিবর্জ্জনের কথা, মুখেও আনিও না। পার যদি যোগ দাও,—বিয়োগ দিয়া শক্তিহীন হইও না। তোমার পায়ে পড়ি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ হও, আচণ্ডাল আপামরে সমদৃষ্টি হও, ঘৃণা বিদ্বেষ, হিংসা স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিই ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ। পৈতার বল বড় বল নহে,—যোগবল, তপোবল, মনোবল, ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হও। ভ্রাতৃত্বের পবিত্র মন্দাকিনী জলে সকল মালিন্য ধুইয়া ফেল। বাহু পাশে আচণ্ডালকে টানিয়া লও—। শিক্ষা দীক্ষায় তাহাদিগকে মানুষ কর—আর্য্য করিয়া লও। আর্য্যধর্ম্মের আর্য্য জাতির বৈজয়ন্ত পতাকা আবার ভারত-গগনে পৎপৎ রবে উড্ডীন হউক—ভারতের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হউক।

সমাপ্ত

মুদ্রাকর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীসরস্বতী প্রেস
২৬-১ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা।

জাতিভেদ।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার,
চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগ, দেবীপূজায় জীববলি, প্রেমাবতার
শ্রীগৌরাঙ্গ, বিদেশী বর্জ্জন, বিধবার নির্জ্জলা
একাদশী, স্বাধীনতার বাণী, কোরবাণি বা
আত্মবলি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, স্বরাজে
কারাবাস প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাভূষণ
প্রণীত ও প্রকাশিত
সিরাজগঞ্জ

লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, ডি, আই, এম্, এস্
মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা।
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৩১

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত] [মূল্য ২৲ ও কাপড়ে বাঁধাই ২।০

উৎসর্গ।

বহুশত বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে

যাহারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক

সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে

চিরবঞ্চিত,

সমাজের সর্ব্বস্ব হইয়াও যাহারা হেয়, অবজ্ঞাত,

নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত,

ভগবানের দীন-প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ

সেই কোটি কোটি ভ্রাতৃবর্গের

শ্রীকরকমলে

আমার

বহু সাধনার

"জাতিভেদ"

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

আজ বেশী দিনের কথা নয়, আমাদের দেশের মধ্যে খ্যাতনামা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ একজন ভদ্রলোকের গৃহে গিয়াছিলাম। তথায় সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সমাজে গণ্যমান্য, দেশে আদৃত জনকয়েক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে যে সকল হিন্দু সম্প্রদায় সমাজ মধ্যে নানা কারণে পশ্চাৎ পতিত অবস্থায় আছে তাহাদেরই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথায় কথায় নবশাখ শ্রেণীর কথা উঠিল। একজন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "নবশাখ কাহাদের বলে ?" প্রশ্নকারী আমাদের সমাজের একজন অলঙ্কারস্বরূপ। বিদ্যায় অর্থে পদমর্য্যাদায় বাঙ্গালী সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি চিরকালই দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন, আর দেশের লোকের নিকট একজন বিশিষ্ট অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন, নবশাখ কাহাদিগকে বলে ?

কথাটা হাসিবার উপযুক্ত নয়। প্রশ্ন শুনিয়া দুঃখিত হইবারও কিছুই নাই। এইরূপ প্রশ্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে—বিশেষ যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আজ ত্রিশ বৎসর হইতে দেশমধ্যে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের কথা ভাবেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেন, বিচার করেন, আন্দোলন করেন। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নিজে চেষ্টা করেন, পরকে উপদেশ দান করেন, সকলকে লইয়া একত্রে কার্য্য করিবার পরামর্শ দেন। কিসে দেশের অবস্থা ভাল হইবে, কিসে দেশের উন্নতি হইবে, কি করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই সব বিষয় লইয়া নিরন্তর চিন্তা করেন। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা

আছে, ইঁহারা দেশ দেশ করেন অথচ দেশের লোক চিনেন না! দেশ হিতৈষিতা ইঁহাদের জীবনের মন্ত্র অথচ দেশের লোকের সঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় নাই। দেশের লোকদের সম্বন্ধে কথা হইলে ইঁহারা কিছুই বুঝেন না। কাহারা প্রধানতঃ দেশের লোক, তাহারা কি করে, কি ভাবে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতের আশা, তাহাদের সুখ, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের উৎসব, তাহাদের বিপদ, তাহাদের গৃহ, তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের নীতি, তাহাদের সংস্কার, তাহাদের চরিত্র,—এ সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অজ্ঞাত প্রহেলিকা, এ সকল সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কখন চিন্তাও করেন না। তদপেক্ষা আক্ষেপের কথা এ সকল বিষয় যে চিন্তা করিবার উপযুক্ত তাহাও তাঁহাদের মনে হয় না। অথচ দেশ দেশ করিয়া ইঁহারা ব্যাকুল, দেশের জন্য ইঁহাদের বাস্তবিকই প্রাণ কাঁদে, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় তাহাই ইঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

অনেক সময় অধ্যাপক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত দেশ সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে একমত প্রকাশ করেন। সকলেই বলেন, আমাদের সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। যখন কথাটা প্রথমে শুনি তখন মনে আশা হইয়াছিল। সমাজদেহে ব্যাধি আছে এই কথা স্থির হইল। তাহা হইলে রোগের প্রতিকার সম্ভব। হয়ত, পণ্ডিত মহাশয় নিদান ও লক্ষণ স্থির করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলা হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক লক্ষণ। তাঁহাদের মতে রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে যেদিন লোকে অন্য পথে গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আমরা পুনরায় নব্য স্মৃতিমতে চলিতে পারি তবেই আমাদের বাঁচিবার আশা আছে, নতুবা আমাদিগের 'মরণং ধ্রুবং'। রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দেশপর্য্যটন, বাণিজ্য,

শিল্প, বিজ্ঞান—এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য হয়েন। প্রসঙ্গকারীও নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেন। এ সকল বিষয় লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করা, আর কোনও অজ্ঞাত ভাষায় তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা একই কথা। দেশের কথা পাড়িলে কিন্তু ইঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত চুপ করিয়া থাকেন না। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাস; এক শত জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ, আর বাকী ৯৪ জন শূদ্র। বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় মহাশয়গণ বিরক্ত হইলে কি করিব? শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই বলিলাম। আমার কথায় প্রত্যয় না হয় একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোন বর্ণ নাই। যেখানে এক শত লোকের মধ্যে ৯৪ জন শূদ্র বলিয়া অধ্যাপক মহাশয়দের ধারণা, সেখানে দেশের লোক প্রায় সকলকেই শূদ্র বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা কথা বলিবার কি আছে? "সেবা কর্ম্ম শূদ্রানাং"—এ কথা সকলেই জানেন। ইহারা স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে ইহাতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে—ইহাই সকল অনর্থের মূল। এই রোগেই আমরা মরিতেছি। এই নিমিত্তই আমরা লোপ পাইব।

কেহ যেন না মনে করেন, আমি শ্লেষ করিয়া এ কথা লিখিতেছি। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি, সমাজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মনে বাস্তবিকই দুঃখ হইয়াছে। তাহাতে কৃত্রিমতা কপটতা কিছুই নাই। যাহাতে সমাজের উপকার হয় তাহার জন্য তাঁহারা প্রকৃতই ব্যাকুল। সরল মনে, অকপট চিত্তে যাহা বিশ্বাস করেন তাহাই বলেন। তাঁহাদের সংস্কার শিক্ষা, জ্ঞান এইরূপ। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা দেশবাসী সকল হিন্দুই শূদ্র ও তাহাদিগের ধর্ম্ম শূদ্রের ধর্ম্ম। এইরূপ নির্দ্ধারণ কিম্বা এইরূপ

আচরণ যে নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায় ও অনুচিত, এইরূপ করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। আমার বিশ্বাস, মনে এই প্রকার ভাব আসিলে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের লোকের পরিচয় নাই, ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় আছে, দেব ও দাসে যে পরিচয় সেই পরিচয়।

আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে (United States) যে গৃহযুদ্ধ (Civil war) হয় তাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণ অনেকে জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকাদেশবাসী কাফ্রিদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহাদিগকে লইয়া ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গরু বাছুর যেমন কেনাবেচা হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ কেনাবেচা করিত। দক্ষিণ যুক্তপ্রদেশে—জর্জ্জিয়া, কেরোলিনা, ভার্জ্জিনিয়া এই সকল স্থানে তামাক ও ধান্যক্ষেত্রে এই ক্রীতদাসেরা প্রধানতঃ কাজ করিত। আমেরিকা-বাসীদিগের মনে ক্রমে জ্ঞান হইল যে এই দাস-প্রথা, মনুষ্যকে গরু ঘোড়ার ন্যায় দাস করিয়া কাজ করান অন্যায় ও অনুচিত। এইরূপ করিলে অধর্ম্ম হয়। ক্রমে এই ধারণা লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যুক্তপ্রদেশে আর দাস থাকিবে না। সকলেই—কি কাফ্রি, কি শ্বেতাঙ্গ—সমভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। অপর দিকে যাহাদের এই ব্যবসায়ে লাভ হইত তাহারা ঘোর আপত্তি তুলিল। সমস্ত দেশে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল, দেশে দুই দল হইল। একদল দাসত্ব উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প, অপর দল এই প্রথা রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; পরিশেষে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। চারি বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলে। তখন যুক্ত-প্রদেশে তিন শত বিশ লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক এক বা অপর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। পরে যে পক্ষ দাসত্ব উঠাইবার

জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহাদেরই জয় হয়। সেই দিন আমেরিকার সকল দাসই মুক্তি পায়। কথাটা একটু ভাবিবার উপযুক্ত। কতকগুলি কাফ্রি ক্রীত-দাসের দাসত্ব বিমোচন করিবার জন্য ৪০ লক্ষ আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ চারি বৎসর ধরিয়া অনবরত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীতে এমন ভীষণ গৃহবিবাদ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। উভয় পক্ষে বহু লোক হত ও আহত হয়। প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এ যুদ্ধে যোগদান করে নাই। যুদ্ধের কারণ কি, না জনকতক ক্রীত-দাস কাফ্রির দুঃখ বিমোচন। তাহার তলে আর এক গূঢ়তর কারণ ছিল। দাসত্ব-প্রথা নীতি-বিগর্হিত, মনুষ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে দাস করা অধর্ম্মের কার্য্য—পাপের কার্য্য। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার—তথাপি এ অধর্ম্ম, এ অন্যায়, এ পাপ দেশ হইতে দূর করিতেই হইবে। এই কারণে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

আমাদিগের নিকট এইরূপ আখ্যান অলীক বলিয়া মনে হয়। যে ভাবে আমরা আরব্য উপন্যাস পড়ি, সে ভাবে এই সব ইতিহাস পাঠ করি। ঘটনাগুলি যে কল্পনা প্রসূত নয় তাহা বুঝি। তবে কেমন করিয়া যে এই সব ঘটনা সম্ভব হয়, গোটা কতক কাফ্রির স্বাধীনতার জন্য যে প্রাণ দিব, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না। ইহা বোধ হয়—সাধারণের মত।

এখন আমাদের দেশে জন কয়েকের মনে উদয় হইতেছে যে, আমাদের মধ্যেও এইরূপ অন্যায়, অবিচার, অধর্ম্ম আছে। কেন দেশের লোককে দাস বলি, কি কারণে তাহাদিগকে ঘৃণা করি, কি দোষে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করি, অপমান করি, নির্য্যাতন করি এই সব প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে উদয় হইতেছে। যাঁহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, আমাদের দেশে যে প্রচলিত দাসত্ব প্রথা আছে, তাহা অন্যায় ও অনুচিত। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা—

পশু অপেক্ষা ঘৃণা করা, অধর্ম্ম ও মহাপাপ। ইহা ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয়।

এই পুস্তকখানির লেখক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য একজন এই শ্রেণীর লোক। এ দাসপ্রথা কতদিন আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইল, কিসে ইহার উৎপত্তি, কেন ইহা স্থায়ী হইয়াছে, কি ইহার ফল— এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার মনে লাগিয়াছে যে, এই প্রথা অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক। ইহা কখনও ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। ইহার স্থিতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহার পরিণাম হিন্দুজাতির ধ্বংস। গ্রন্থকার কেবলমাত্র মনের আবেগে পুস্তকখানি রচনা করেন নাই। ধীর ও সংযতভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য প্রমাণ দিয়াছেন। দুই এক স্থানে মনের আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নিন্দার কথা নয়। পুস্তকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার দেশের উপকার করিয়াছেন। এই সময় এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে পড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক সামগ্রী আছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলে যে একমত হইবেন তাহা বোধ হয় গ্রন্থকারও আশা করেন না; তাহার প্রয়োজনও নাই। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ সংস্কারের অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আর নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসার দেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আজি হউক, কালি হউক, মীমাংসা করিতেই হইবে। যাঁহাদের এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

কোটি কোটি শূদ্র-ভ্রাতৃগণের প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ লইয়া জাতিভেদ প্রকাশিত হইল। কেহ বা ইহাকে কুসুম মাল্যে সম্বর্দ্ধনা করিবেন, কেহ বা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে ঋষি নামধেয় কতিপয় পুরুষের প্রতি সুতীব্র আক্রমণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন—আর যাঁহারা আপনাদিগকে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের রক্ষক বলিয়া মনে করেন—তাঁহারা এই পুস্তকে প্রচলিত সমাজবিধি ও সমাজ-নেতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভীষণ আঘাত দর্শনে বিচলিত হইয়া উঠিবেন এবং গ্রন্থকারকে উন্মার্গগামী সমাজ-দানব বিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়রূপে অভিহিত করিয়া তৎপ্রতি অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উন্মাদের ন্যায় সমাজে যথেচ্ছাচারের তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় বিজ্ঞ পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত ঋষি ও ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া হইয়াছে এরূপ অভিযোগ লেখকের স্কন্ধে কেহই চাপাইতে পারিবেন না। এই পুস্তকের এক পংক্তিও ঋষি এবং ব্রাহ্মণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই। প্রাণসম হিন্দু সমাজের শতকরা চুরানব্বই জন সন্তানকে "শূদ্র" "দাস" আখ্যায় আখ্যাত, মানবের প্রাণপ্রদ চিরন্তন পরম অধিকার ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উপহসিত ও পশুজীবন যাপন করিতে দেখিয়া প্রাণে যে ক্ষোভ এবং বেদনার দারুণ জ্বালা অনুভব করিয়াছি, বেদনা কম্পিত বক্ষে, অক্ষম অনভ্যস্ত লেখনীতে "হিজি বিজি" ভাষায় উহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বাল্যকাল হইতে সমাজপতি মহাশয়গণের মুখে এবং শ্লোকমালায় শুনিয়া আসিলেও বিশ্বাস

করিতে পারি নাই—ভারতের কোটি কোটি মানব-সন্তান চিরকালের তরে ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও পতিত। গুরুজনের বাক্য ও ব্যবহারে সায় দিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই, প্রাণ তাহা মানিতে চাহে নাই। মানবের পথনির্দ্দেশক মোক্ষদায়ক ধর্ম্মশাস্ত্র অসাম্যের প্রচারক এবং অসূয়ামূলক—তাহা মানবকে সরল ও মুক্তভাবে ধর্ম্মদান না করিয়া বিবিধ উপায়ে পাকে প্রকারে ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতেই তৎপর—বিবেক ইহা কিছুতেই অনুমোদন করে নাই। তাই বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত প্রাণে 'শূদ্র' খ্যাত কোটি কোটি মানব সন্তানের কলঙ্কের যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনায়—শাস্ত্রের মূলদেশ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার ফলে আবাল্যের সাধনায় যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই প্রাণপ্রিয় শূদ্র ভ্রাতৃগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তিরস্কার পুরস্কারের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই।

আমার ঐকান্তিক নিবেদন, হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনকালে সুধী সমাজ এই পুস্তক ধীরভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। সমাজের এই মুমূর্ষু দশায় এরূপ গ্রন্থের প্রচার উচিত কি না সে বিচারের ভারও পাঠকগণের উপর। এই পুস্তক হিন্দুজাতির এই আসন্নকালে বিষক্রিয়া করিবে, কি মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় জীবনপ্রদ কল্যাণজনক হইবে তাহা শ্রীভগবানই জানেন। কেহ বলিতেছেন, এরূপ অসার জঘন্য পুস্তক অগ্নির মুখে অথবা আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; আবার অনেকের মত এরূপ গ্রন্থ প্রচারে হিন্দুসমাজ মরণ-মুখ হইতে জীবনলাভের দিকে অগ্রসর হইবে। এই আশা ও নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ইহার উৎপত্তি। জানি না ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে। তবে সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়াই এ পুস্তক লিখিয়াছি; সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই ইহার প্রচার। কর্ম্মে আমাদিগের অধিকার—ফলে নহে। প্রভুর মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ

হইবে। লোকের প্রশংসা নিন্দা বা গালাগালির মূল্য কতটুকু? কৃতকার্য্য হই বিলক্ষণ, না হই তাহাতেও ক্ষতি নাই।

কপটতায় হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। এখন আর লজ্জা করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। সত্যের মন্দাকিনী-জলে ইহার আপাদমস্তক বিধৌত করার প্রয়োজন। এরূপ পুস্তক প্রচারে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা পলে পলে, লেখক তাহা অবগত আছে। খৃষ্টের ক্রুশ, লুথরের প্রাণাহুতি, নিত্যানন্দের নিগ্রহ—তা ছাড়া মহাত্মা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতি কঠোর অত্যাচারের কথা লেখকের মানসক্ষেত্রে সদা জাগরূক। জানি সংস্কারকের পথ কুসুমসমাকীর্ণ নহে—ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। এ পথে পলে পলে বিঘ্ন বিপদ,—নির্য্যাতন লাঞ্ছনা পদে পদে। তবে এই অবিচার অত্যাচার, অন্যায় ও যথেচ্ছাচারের যুগে কোটি কোটি পতিত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত,—শ্রীভগবানের স্নেহের সন্তান—শূদ্র ভ্রাতৃগণের প্রতি যে একবিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলাম—তাহাদের পক্ষ হইতে যে আজ দু'টি কথা বলিতে পারিলাম—ভবিষ্যৎ-নির্য্যাতন-কল্পনার মধ্যে তাহা মনে করিয়া আমার বুক আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমার মত অকিঞ্চনের এই সামান্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমার বহু ভাই ভগিনীর হৃদয়ে নীরবে অজ্ঞাতে আমার নিমিত্ত যে কল্যাণ-মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহাই আমার সান্ত্বনা, তাহাতেই আমার তৃপ্তি!

হিন্দুসমাজের যাহা কিছু গৌরব—ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ধন রত্ন মণি মাণিক্য ছিল, সে সমুদয়ই নানাপ্রকারে অপহৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও কপটতা, স্বার্থপরতা, নীচ আর্য্যামী-রূপ তস্কর অপহরণে উদ্যত। লেখক চোর তাড়াইতে বা দণ্ড দিতে অক্ষম, তবে কুক্কুররূপে উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে নিদ্রিত গৃহস্থকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

ইহা ভিন্ন অন্য কোন নীচ উদ্দেশ্য নাই। তীব্র যাতনার প্রতিকার চেষ্টা আরব্ধ হয়। সামান্য ক্ষতের চিকিৎসার জন্য কেহ চিকিৎসক ডাকে না। পাপে তাপে অত্যাচার অবিচারে বিধাতাপ্রদত্ত ন্যায়দণ্ডে হিন্দুসমাজ-দেহ ক্ষত বিক্ষত; ক্ষত সামান্য বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিতেছেন না। তবে এই ক্ষতে শক্ত আঘাত লাগিলে বা একখণ্ড তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিলে তখন সকলে ইহার বিষয় একটু চিন্তা করিতে অগ্রসর হইবেন— এই আশা ও ভরসায় বহুস্থলে সুতীব্র বাক্যদণ্ড প্রহার করিয়াছি। সামান্য আঘাতে এই জড়পিণ্ডপ্রায় সমাজ-চক্ষু মেলিবে না মনে করিয়া আঘাতের উপর তীব্র আঘাত দিয়াছি। বিশ্বাস, তীব্র যন্ত্রণায় যদি প্রতিকারের জন্য সকলে সচেষ্ট হন!

আশা করি এই পুস্তক প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্য হইতে ইহার বহু প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইবে এবং হিন্দুসমাজের দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে বহু আলোচনা ও আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্গে বহু সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষী পুরুষ আছেন; এবম্প্রকারের পুস্তক রচনার ভার তাঁহাদিগের হস্তে পড়াই সঙ্গত ছিল। * * * অশিক্ষিত শূদ্র ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য যথাশক্তি সরল ভাষায়, কোন কোন স্থলে কথার ভাষায় এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ এ পুস্তক পাঠ করিবেন বা ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, এরূপ আশা করা স্পর্দ্ধার কথা। আমার ন্যায় অযোগ্যের পক্ষে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থরচনায় ও সঙ্কলনে পদে পদে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে—বরং বিশেষ সম্ভব। বিশেষতঃ সমাজতত্ত্বরূপ দুরূহ বিষয়ে। আমি স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পথ বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যোগ্য ব্যক্তি অগ্রসর হউন। বঙ্গভাষার শোভাবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য

সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার দুরাশা লইয়া এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। এই পুস্তক পাঠে একজন পাঠকের মনেও যদি ধ্বংসোন্মুখ সমাজের কল্যাণ-কামনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রণয়নে "হিন্দু পত্রিকা"য় প্রকাশিত অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, মহোদয় লিখিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধ হইতে আমি প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহার প্রবন্ধই এই পুস্তকের আরম্ভ ও ভিত্তি। এতদ্ভিন্ন স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় প্রদত্ত "জাতিভেদ" নামক বক্তৃতা, লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"—"হিন্দু পত্রিকা" প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতর পত্রিকা, পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। "সংহিতাদির" অনুবাদ অংশ, পণ্ডিত-প্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত "বঙ্গবাসী কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং বলিতে কি, এই সমস্ত পুস্তকের সাহায্য না পাইলে "জাতিভেদ" প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। অলমিতি * * * * * * *

পোঃ সিরাজগঞ্জ
কাওয়াকোলা শ্রীশ্রীবংশীবদন
কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গন।
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

মুদ্রণ ব্যয় বহনে অসমর্থতা হেতু প্রায় এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত 'জাতিভেদ' নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্বেও উহা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারি নাই। পরম করুণাময় শ্রীহরির অপার করুণায় পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত কলেবরে সম্প্রতি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নাটক নভেল ও উপন্যাস প্লাবিত দেশে জাতিভেদের ন্যায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ক নীরস গ্রন্থ যে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের প্রয়োজন হইবে, ইহা কখনও মনে করিতে পারি নাই। ভগবৎ কৃপায়, জাতিভেদ সাহিত্যে ও সমাজে আশাতীত আদৃত হইয়াছে। ইহার প্রচারে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে,—অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্ম্মস্থল হইতে বিপুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এত অধিক আবেগভরা ও হৃদয়োচ্ছাসপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা একত্র করিলে ছোটখাট একখানা মহাভারত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য ঐ সঙ্গে জনকয়েক স্বয়ং নির্ব্বাচিত, জাতিকুল বিদ্যাভিমানী সমাজপতি—'ও (গ্রন্থকার) মূর্খ, উন্মাদ, ব্রাহ্ম,—ছোট লোকদের নিকট প্রচুর টাকা খাইয়া বই লিখিতেছে, প্রভৃতি তিরস্কার বাক্যে পুরস্কৃত ও গাত্রদাহ নিবারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই কটুক্তি, তিরস্কার ও র্ভৎসনা আমি "গুরুগঞ্জন, চন্দন, অঙ্গভূষা" করিয়া—আশীষকুসুমজ্ঞানে সাদরে শিরে বহন করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

মক্ষিকার ন্যায় যাঁহারা সতত পরদোষানুসন্ধান-তৎপর এবং যাঁহারা আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভাষার দোষ অন্বেষণে, শ্লোকের অনুস্বর বিসর্গের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে, কূটার্থ নিরূপণে শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছেন—তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই,—আমার গ্রন্থাবলী তাঁহাদের ন্যায় হৃদয়হীন, স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহী, সবজান্তা, অহং সর্ব্বস্ব, হামবড়াদের জন্য লিখিত হয় নাই। ইতি বৈশাখ ১৩২৫

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন।

বৎসরাধিক কাল 'জাতিভেদ' দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি ১৬০০ ষোল শত টাকা ঋণ করিয়া জাতিভেদাদি (শূদ্রের বেদাধিকার, জলচল ও চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ প্রভৃতি) গ্রন্থ চতুষ্টয় পরিবর্দ্ধিত আকারে তৃতীয় ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পাঠকগণের প্রতি আমার নিবেদন—আমার গ্রন্থাবলী যাঁহাদের প্রাণে লাগিবে এবং পাঠে যাঁহাদিগের হৃদয়ে নব আশা উদ্দীপনা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সুরতরঙ্গিণী প্রবাহিত করিবে, তাঁহারা শুধু মিথ্যা স্তুতি, বাহ্যিক ভক্তি ও মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া যাহাতে আপন আপন সমাজে, আত্মীয় স্বজনে ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ঋণমুক্তির সহায়তা হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইবেন।

এই সংস্করণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের 'সৃষ্টিতত্ত্বে বিভিন্ন মত' বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায় অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত এবং দশম ও ত্রয়োদশ অধ্যায় নব সংযোজিত হইল। দশম অধ্যায়টী সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, কবিভূষণ প্রণীত 'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এজন্য গ্রন্থকারের নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অন্যের উদ্ধৃত অংশের—শাস্ত্র ও শ্লোক নির্দ্দেশে, দ্রুত সম্পাদন ও প্রুফ্ পরিদর্শনের ত্রুটী বশতঃ এবারও অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। সুধীগণ এসব অনিবার্য্য ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে সমুদয় দোষ যথাসাধ্য সংশোধন করা হইবে। ইতি ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩১।

সূচীপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অবতরণিকা	...	১—১২
প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ		১৩—৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ		৩১—৫৫
তৃতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ		৫৬—৬৭
চতুর্থ অধ্যায়—বিবাহ	... ...	৬৮—৭৮
পঞ্চম অধ্যায়—আহার	... ...	
ষষ্ঠ অধ্যায়—জাতিভেদ উৎপত্তির কারণ	...	৮৯—১১২
সপ্তম অধ্যায়—সঙ্কর বর্ণ	... ...	১১৩—১৩৪
অষ্টম অধ্যায়—শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার	...	১৩৫—১৬৫
নবম অধ্যায়—নিম্নশ্রেণী	... ...	১৬৬—২০০
দশম অধ্যায়—জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা	...	২০১—২৩৫
একাদশ অধ্যায়—নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ	...	২৩৬—২৫১
দ্বাদশ অধ্যায়—পরিণাম ও প্রতিকার	...	২৫২—২৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়—জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন		২৬৩—২৮৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন		২৮৬—৩৫৯

অবতরণিকা।

এই সেই পবিত্রভূমি, যথায় সহস্র সহস্র ঋষি তটিনীতট মুখরিত করিয়া সামবেদের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতপ্রবাহে হিংস্র পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতেন; এই সেই প্রাচীন ভূমি, যে স্থানে হিমালয়-তুষার-শুভ্র-কিরিট-প্রবাহিনী জাহ্নবী-যমুনা, গোদাবরী-সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু, কাবেরী-নর্ম্মদা প্রভৃতি পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীকুল, কুলকুলনাদে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা গাইয়া গাইয়া এখনও অবিরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছে; এই সেই দেশ, যেখানে মান্ধাতা-হরিশ্চন্দ্র, দিলীপ-রঘু, নিমি-শিবি, শ্রীরাম-যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রজাবৎসল নরপতিগণ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রকৃতিপুঞ্জকে লালনপালন ও শাসনসংরক্ষণ করিয়া ধরা হইতে অপসৃত হইয়াছেন; যেস্থানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-জামদগ্ন্য, পৃথু-ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ অজেয় বাহুবলে ধরাতলে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন; যেস্থানে ভ্রাতৃ-স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদর বিষয়সুখ পরিত্যাগ এবং জটাবল্কল পরিধানপূর্ব্বক দণ্ডীবেশে চতুর্দ্দশ বৎসর নিবিড় অরণ্যে জীবন যাপন করাই জীবনের সর্ব্বার্থ মনে করিতেন; ভ্রাতৃস্নেহে বক্ষে শেলাঘাত পর্য্যন্ত স্মিতমুখে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যে স্থানে পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যৌবরাজ্যে অভিষেকের পরিবর্ত্তে গহনারণ্যে গমন করিয়াছিলেন, যেখানে রাজনন্দিনী রাজবধূগণ রাজ্যপরিভ্রষ্ট স্বামীর সহিত অনাথিনী কাঙ্গালিনী বেশে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষতদেহে রক্তাক্তচরণে পরিভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যে দেশের নরপতি সসাগরা ধরিত্রী দান করিয়া দক্ষিণার জন্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও এমন কি নিজকে চণ্ডালকরে, বিক্রীত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; যে দেশের

নরপতি এবং অধিবাসিগণ অতিথি সৎকারের, শরণাগতের জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিজের মাংস প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানের মাংস দান করিয়াছেন, যে দেশের নারীগণ পতিনিন্দায় সতীত্ব রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে দেহত্যাগ ও জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন আহুতি দান করিয়াছেন, যে দেশের ঋষিগণ কাঞ্চনে কাচে, মণিতে লোষ্ট্রে, বিষধরে হারে, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান করিতেন, সেই সব ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর সত্যবীর দানবীর সমদর্শী বিশ্বপ্রাণ আর্য্যজাতির চির আদরের বাসভূমি, সসাগরা ধরিত্রীর বরেণ্য ভারতবর্ষের কি শোচনীয় পরিণাম! যে দেশে সর্ব্বপ্রথম সামগান উচ্চারিত হইয়াছিল, যে দেশে সর্ব্বপ্রথম মহাসাম্যবাদের বিজয়-দুন্দুভি-ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব যে দেশের মনীষিবৃন্দের মস্তিষ্কে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং" ধ্বনি যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যে দেশের ঋষিগণ "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন" করিয়া ভগবানের অনন্তত্ব জগৎ সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, জীব ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ব্রহ্ম ব্যতীত এ জগতে অন্য কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ পাতাল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই,—যে দেশের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দেশে—সেই মহাসাম্যবাদের উৎপত্তিস্থান পুণ্যভূমি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, বর্ত্তমান সময়ে, "ভেদের" ভীষণ বৈষম্যবাদ আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে ঋষিগণ জীবমাত্রকে সচ্চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাণীমাত্রকে সূর্য্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মের রশ্মিরূপে প্রচার করিয়াছেন—সেই দেশে আজকাল মহাভেদ বুদ্ধির রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে আর্য্যগণের ভক্তিপ্রবণহৃদয় জলস্থলে, অনল-অনিলে সর্ব্বত্রই বিশ্বময় প্রভু ভগবান্

শ্রীহরির মঙ্গলময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেন; ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ শার্দ্দূলকে যাঁহারা পদ্মপলাশনেত্র নারায়ণের বিভূতিজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইতেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রতি বস্তুতে বিশ্বনাথ ভগবানের চিৎ শক্তির অপূর্ব্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন; যে আর্য্যঋষিগণের বিশ্বপ্রেমিকতার মনোমোহিনী শক্তিতে পবিত্র মুনি-কাননে ব্যাঘ্র হরিণ, ভেক সর্প, মূষিক মার্জ্জার পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া আনন্দে বিহার করিত, যাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রাণী-হিতরত-বিশাল হৃদয় মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ দৈন্য শোকতাপ ঘুচাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রতিকার কল্পে নিয়োজিত থাকিত, সেই পবিত্র হৃদয়-রক্তে পরিবর্দ্ধিত আমরা, কি পাপ সঙ্কীর্ণতা লইয়াই না লিপ্ত রহিয়াছি? যে দেশে এমন সব মহান্ ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশে কিনা জাতিভেদতর্ক উপস্থিত! বেদান্তকেশরী গভীর গর্জ্জনে বলিতেছেন "এক মহান্ গুণাতীত পরমেশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র অনন্ত। মহাসমুদ্রে জলচর জীবের ন্যায় অথবা মহাকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় এ জগৎ তাঁহাতে মগ্ন হইয়া আছে। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়। জড়বুদ্ধি মানব ভ্রমবশতঃ তাঁহাতে উপাধি আরোপ করিয়া স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন। অজ্ঞানতাবশতঃই জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিতেছে। এমন প্রাণপ্রদ মৃত সঞ্জীবন-মন্ত্র ত্যাগ করিয়া কেন আমরা এদিকে ওদিক ছুটাছুটি করিয়া থাকি। শ্রুতি বিগর্হিত মতবাদে কেন আমরা আত্মহারা হইয়া অন্ধের ন্যায় কুপথে বিপথে পদচালনা করিতেছি। জাতি আবার কি? জাতি বলিতে আমরা বুঝি একমাত্র মানবজাতি। এই মানবজাতির জন্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অবতারকুল, ঋষিগণ ও ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেইগুলিই

মানবমাত্রের চিন্তনীয় বিষয়—আলোচনার যোগ্য এবং ভাবিবার সামগ্রী। নেশন (Nation) বলিতে যেরূপ জাতি বুঝায়, তাহা এ হতভাগ্য দেশ হইতে বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে, আর কাষ্ট (Caste) বলিতে যে জাতি বুঝায়, তাহাই এ হতভাগ্যদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নেশন (Nation) বলিতে আমাদের একটীও নাই; কিন্তু কাষ্ট (Caste) বলিতে আছে ছত্রিশটী বা ততোধিক। হায় ভারতের কর্ম্মভোগ! হিন্দুজাতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা আর আমরা নহি। হিন্দু বা আর্য্যজাতি অনেকদিন লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন যাহা আছে তাহা তাঁহাদের কঙ্কালাবশেষ মাত্র। হিন্দুজাতি অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায় বলাই বর্ত্তমানে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যে জাতির একটা জাতীয়ত্বই নাই, তাহার আবার ভেদাভেদ কি? হিন্দু-সম্প্রদায়ের জাতিভেদকে বর্ণবিভাগ বা সম্প্রদায়-বিভাগ আখ্যা দেওয়াই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবিভাগ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝা যায় না। এই সম্প্রদায়বিভাগ ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকিবে। যেমন অভিজাত সম্প্রদায়, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, ধনী সম্প্রদায় প্রভৃতি সভ্যদেশে আজকাল নানা সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে অভিজাতজাতি শ্রমজীবী জাতি বা ধনিজাতি বলা ঠিক নহে। কেননা আজ যে শ্রমজীবী—চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কাল সে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশেও কি সেইরূপ জাতিভেদ বিদ্যমান? আজ যে শূদ্র কালি সে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে? না, তাহা নহে, এ জাতিভেদের গ্রন্থি সেরূপ শিথিল নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিভেদের ইহাই রহস্য, ইহাই পার্থক্য। অনেকে ভ্রমবশতঃ উভয় দেশের জাতিভেদকে একই স্থানে আসন প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্বপতির রাজ্যে ভেদবুদ্ধি নাই—ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের নরক-হৃদয়ে। সেই পরম পিতার রাজ্যে সকলেই সমান, সকলেই এক মানব-পরিবারভুক্ত। তিনি কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—তিনি ধনীর জন্য এক চন্দ্র, আর দীনহীন পদদলিত গরিবের জন্য আর এক চন্দ্র প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের জন্য এক সূর্য্য আর চণ্ডালের জন্য অন্য সূর্য্য পাঠাইয়া দেন নাই। এক নীল বিরাট চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট মানবপরিবার, একই সূর্য্যের উত্তাপ ও একই পবনের নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, এক চন্দ্রের শীতলকরস্পর্শে সকলেই সমভাবে চিত্তবিনোদন করিতেছে। তাঁহার রাজ্যে কোন বৈষম্য নাই—কোনও ভেদাভেদ নাই। ছোট বড় অভিমান তাঁহার পবিত্র বাজ্যে স্থান পায় না। সমস্ত পুত্র কন্যা তাঁহার সমান স্নেহের অধিকারী। ব্রাহ্মণকে তিনি ভালবাসেন আর চণ্ডালকে তিনি দুর দূর করিয়া তাঁহার স্নেহের ক্রোড় হইতে তাড়াইয়া দেন অথবা ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া ভগবান তাঁহারই কথা শুনিয়া থাকেন আর সহায়সম্পদবিহীন গরীবের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদেও একটু আশ্বাসের অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে কৃপণতা করিয়া থাকেন, ইহা হইতে পারে না। তবে অনেকে এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও পশু কাহাকেও পক্ষী, কাহাকেও কীট, কাহাকেও পতঙ্গ এবং কাহাকেও নরনারী অন্ধ খঞ্জ সুখী দুঃখী করিয়া কেন এ সংসারে পাঠাইলেন! তিনি না সমদর্শী! ইহার উত্তরে শাস্ত্রকার বলেন— শ্রীভগবান লীলাচ্ছলে বিভিন্ন আকারের জীবদেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে পরমাত্মারূপে অংশ কলায় অবস্থানকরতঃ তৎ তৎ দেহ দ্বারা স্বকীয় লীলারস ও এই বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রীর মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেছেন। কেবলমাত্র রাজা রাজড়া, মুনি ঋষি বা ইন্দ্রচন্দ্র দ্বারা যেমন কোন নাটক অভিনয় হইতে পারে না; অভিনয়ের জন্য রাজা প্রজা, দেবতা মানব,

পুরুষ নারী, পাপী পুণ্যবান, ভক্ত ভগবান, অন্ধ খঞ্জ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সাজিবার প্রয়োজন হয়, এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের বিরাট অভিনয় ব্যাপারেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন জাতির মানব এবং বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব জন্তু সৃষ্টির প্রয়োজন। শুধু একই জাতীয়,—একই সাজসজ্জায় সজ্জিত, একই আকার ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবগণের দ্বারা কখন অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। অভিনয়ে বৈচিত্র্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীবিশ্বেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, নরনারী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পশু পক্ষীর সমাবেশ প্রয়োজন। এখানে বড় ছোট, উচ্চ নীচ, উত্তম অধমের কোন প্রশ্ন নাই। ইহা অভিনয় মাত্র।

বিধাতার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষম্য থাকা অসম্ভব। তিনি মানবকে বিভিন্ন বংশে পাঠাইয়া দিলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি সকলকেই সমান শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। শিল্পীর হৃদয়ে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে, ধনীর তাহা নাই, আবার ধনবানের যাহা আছে, শিল্পীর তাহা নাই। শ্রমজীবির শরীরে যে শ্রমশক্তি আছে তাহা হয়ত একজন শিক্ষকের নাই; আবার শিক্ষকের যে ধীশক্তি আছে শ্রমজীবির তাহা নাই। একজন বিশ্ববিখ্যাত বলিষ্ঠ পালোয়ানের যে শারীরিক শক্তি আছে একজন বিচারপতির তাহা নাই এবং বিচারপতির যে সূক্ষ্মদর্শিতা আছে ঐ বলীর তাহা নাই। একজন চর্ম্মকারের বা একজন চিত্রকরের যে কর্ম্মশক্তি আছে, সে শক্তি কি কোনও বড় বৈজ্ঞানিকের কি বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আছে? তাহা নাই—আবার অন্য পক্ষেও ঐরূপ। একজন কৃষক বা একজন মুটে রবিকর-উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন-সময়ে যেরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে বা দুই মণ আড়াই মণের যে মোট বহিতে পারিবে, একজন

রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ বা একজন দার্শনিক কি তাহা কখন পারিবেন? না কখনই পারিবেন না। সুতরাং আমরা বেশ দেখিতে পারিলাম সাংসারিক স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বহু বিষমতা বা পার্থক্য দেখিলেও বিচারসিদ্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক মহান্ সমতা বিদ্যমান। কাজেই বলিতে হইতেছে, ঈশ্বর সমান শক্তি দিয়া সকলকে এ সংসারে পাঠাইয়াছেন। ছোট বড় ভেদ করিবার আমাদের কি শক্তি বা অধিকার আছে? ভগবান কি কোনও ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন "হে কলির ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগকে শূদ্রাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ করিয়া, সমাজের সম্রাট করিয়া সংসারে পাঠাইলাম; তোমরা যথা ইচ্ছা ছলে বলে কৌশলে, শাস্ত্রের বচন দিয়া, বেদের দোহাই দিয়া, শূদ্রদের ধনরত্ন আত্মসাৎ কর, তাহাদের হৃদয়শোণিত মহাসুখে মনের আনন্দে পান কর, তাহাদিগকে কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে না, তাহারা অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া মরুক—তাহারাই সয়তান স্বরূপ নিত্য ঘৃণার্হ। উহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার নাই—উহারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ। 'যেন তেন প্রকারেন' উহাদিগকে পদদলিত করিয়া ধরা হইতে অপসৃত কর। উহাদিগকে দাবাইয়া মার, উহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা কিছুমাত্র লঙ্ঘিত হইবে না। জগতের যাবতীয় অত্যাচার লাঞ্ছনা নির্য্যাতন উহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষণ কর। যে পর্য্যন্ত একটী মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরস্ত হইও না।"

বাস্তবিক সমদর্শী পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান মানবজাতিকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপে সংসার রঙ্গশালায় পাঠাইয়া দিয়াছেন কিনা সে বিচার আমরা পরে করিব ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ কি লিখিয়াছেন তাহাও যথাক্রমে পরে লিপিবদ্ধ করিব। সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই দশাধরা আমাদের এ দুর্ব্বল প্রাণহীন জাতির একটা রোগের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আর তাহাদের দোষই বা কি—বহুদিন ব্রাহ্মণগণের

কৃপার অপেক্ষায় থাকিয়া, জ্ঞান বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা একরূপ মনুষ্যাকার পশুবৎ হইয়া গিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অবাধ বিদ্যা প্রচারে দেশের নরনারীর তথাকথিত শূদ্রজাতির বিশুষ্ক বদনমণ্ডলে হাসিরেখা দেখা গিয়াছে, মনুষ্যত্বের পুনরধিকার পাইবার আশা, তাহাদের বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে বহুলোকের বহুভ্রান্ত ধারণা আছে, আমরা এসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাই। শুধু বর্ত্তমান যুগের দুই দশজন সমাজ বিপ্লবকারী নহে, যাবতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ও সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অবতারকুল দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জগৎ সমক্ষে পুনঃ পুনঃ এই সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই মহাসাম্যবাদের প্রেম-মন্দাকিনী নীরে স্নান করিয়া জগতে কতজন স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যঝুলি স্কন্ধে লইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে এই স্বর্গীয় বাণী অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব এক পিতার সন্তান"। এই স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া এক সময়ে বৈদিক ঋষিগণ এই পৃথিবীতে সত্য যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাসাম্যবাদের অমৃত আস্বাদ পাইয়া একদিন ঈশা মুসা শঙ্কর বুদ্ধ মহাবীর রামানুজ প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ পৃথিবীতে কি এক স্বর্গের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষমভাবে যখন ভারত দগ্ধ হইতেছিল—যখন নীচ জাতি সকল কুক্কুর শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যজ্য হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতমবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় মহাপ্রাণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস, সাম্যভাব-

বিহীন ও হৃদয়ের পরিপুষ্টিবিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার প্রেম-সংকীর্ত্তনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিরণপ্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারিধারা পতিত হইল। সেই আহ্বানে সেই প্রেমসংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল—"আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।" ভারতে যত যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন সকলেই সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহই জাতিভেদ মানিতেন না—অথবা ভগবান্ কর্ত্তৃক জাতিভেদ হইয়াছে ইহাও বিশ্বাস করিতেন না। কি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, কি আর্য্যসমাজ, কি খৃষ্টসমাজ, কি মুসলমান সমাজ, সর্ব্ব সমাজের প্রচারকগণই জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদেও ঐ একই সাম্যভাব বিদ্যমান। অদ্বৈতবাদে সবই ব্রহ্ম সুতরাং সকলেই সমান, ছোট ব্রহ্ম বা বড় ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রব্রহ্ম এরূপ শব্দ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মে ছোট বড় লিঙ্গ বয়ঃ ভেদ নাই। সবই তিনি। এ মতের প্রধান প্রচারক ও আচার্য্য শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য। আর দ্বৈতবাদ বলিতেছেন আমরা সকলেই তাঁহার দাস, তাঁহার সন্তান, তাঁহার কৃপার্থী, তাঁহার সেবক, তাঁহার অনুচর—সুতরাং জাতিভেদ বা বড় ছোট ভাব কোথায় ? এ মতের পরিপোষক কলিকলুষনাশন—শ্রীভগবানের প্রেমাবতার শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দেব। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণ সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন ও জাতিভেদরূপ মহাবৈষম্যবাদ শাস্ত্র ও নীতিবিগর্হিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী

রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বারদীর যোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন।

ঐ যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন—

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদ
পিতানৈব মে মাতা চ জন্ম
নবন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যং
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

যদি বল 'আমরা কলির দুর্ব্বল জীব আমাদের পক্ষে অদ্বৈতানুভূতি অসম্ভব, দ্বৈতবাদই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর পথ। তাহাতেই বা আসে যায় কি? দ্বৈতবাদ বল, অদ্বৈতবাদ বল, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বল, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বল, সর্ব্বত্রই সমদর্শন, খুঁজিয়া কোথাও ভেদবুদ্ধি পাইবেনা। দ্বৈতবাদেও একই ভাব, ভাষা পৃথক্‌মাত্র। আত্মপরিচয়দানচ্ছলে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"মাতামে পার্ব্বতী দেবী পিতাদেবোমহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিবভক্তামে ভবনং ভুবনত্রয়ম্॥"

দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমার পিতা, "জগজ্জননী ভগবতী" ঐশীশক্তিই আমার মাতা, জীব মাত্রেই আমার পরিবার, ত্রিভুবন আমার গৃহ। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" চরাচর বিশ্বই আমার পরিবার,—এই উদার উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন :—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

"একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাংসুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

ঐ যে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষের পবিত্র কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে :—

"ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীব ভেদোহখিল বিশ্বমেকম্।
ধরাতলে তেন বিঘোষিতেয়ং
প্রেম্নো মহাগীতিরনর্ঘ্যনীতিঃ।"

"এক ব্রহ্ম, এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ
নাহি উচ্চ নাহি নীচ, সবি একাকার ;
এ অমূল্য মহা নীতি বিশ্ব প্রেম-মহা গীতি,
চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার।" (১)

যাঁহারা বলিতেন :—

"ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" (২)

সেই দেশে এমন জঘন্য ভেদবুদ্ধির কি ভয়াবহ রাজত্ব!

জগতের এমন কোনও মহাপুরুষের নাম শুনি নাই যিনি মানব-জগতে জাতিভেদ স্বীকার করিতেন বা জাতিভেদ বিধাতার সৃষ্টি এরূপ মত প্রকাশ

(১) শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত "সমাজ সংস্কার"।
(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "বীরবাণী"।

করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত. আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ-বেদান্ত—বৈদিক জ্ঞানময় বপুঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি, শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া তদীয় মতবাদ ও শিক্ষা দীক্ষাই গ্রহণ করিব, অথবা শ্রুতিবিগর্হিত তন্নিম্ন স্থানাভিষিক্ত ভীষণ বৈষম্যবাদপরিপূর্ণ পৌরহিত্যশক্তি সংরক্ষণে প্রাণপণে দোহাই সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর, পরন্তু শূদ্রশোণিত পিপাসু পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতি ও সংহিতা এবং বর্ত্তমানকালের কতিপয় যজ্ঞসূত্র সম্বল ব্রাহ্মণ্য-শক্তিবিহীন বৈদিকক্রিয়াকলাপবর্জ্জিত ম্লেচ্ছান্ন ও শূদ্রান্নপরিপুষ্ট উপাধিব্যাধিমণ্ডিত নামমাত্র ব্রাহ্মণ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যুক্তিহীন অসার মতবাদই গ্রহণ করিব ইহাই হইতেছে বুঝিবার বিষয়। তত্ত্বজ্ঞ অনায়াসেই স্বীয় কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। অন্ধ যে সেই ভ্রান্ত মতে মজিবে। দ্বাবিংশতি কোটী নরনারী-সমন্বিত বিরাট হিন্দু জাতির জীবন মরণ সমস্যা প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের সমক্ষে উপস্থিত। এ সময় জাতি হিংসা, জাতি গর্ব্বে মগ্ন থাকিলে চলিবে না। ভারতের বড় দুর্দ্দিন। সপ্ত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতের প্রাণশক্তি বিগত প্রায়। এ সময় কাহারও আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। ভারতীয় হিন্দু মহাজাতি সংগঠনে—প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়-রুধির দান প্রয়োজন। কোন বড় কার্য্যই বড় ত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হইবার নহে। আমরা ভারত জননীর সুধী সন্তান বর্গের উপর ধ্বংসোন্মুখ ভারতের গুরুভার অর্পণ করিয়া গ্রন্থ প্রতিপাদ্য পরবর্ত্তী বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম। কুল-দেবতা বংশীবদন কালাচাঁদ এই অকৃতি অধম দাসের লেখনীকে সার্থক ও জয় মণ্ডিত করুন।

জাতিভেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য হিন্দুজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ।

—:০:—

আর্য্য হিন্দুজাতি।

আর্য্য হিন্দুজাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা যথার্থভাবে নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বহু আলোচনা, বহু যুক্তিতর্ক বহু গবেষণামূলক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ, বাল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশকেই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ অভিমত যে, মধ্য এসিয়াই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ভূমি! আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী যে সকল যুক্তি সহায়ে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"প্রথমতঃ, আর্য্যজাতির দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং আর একটি

ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে। এই দুইটী প্রবাহের সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতনকালের সভ্যদেশসমূহ এসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং এসিয়া খণ্ডের মধ্যে এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য এশিয়া হইতে বারবার অনেক পরাক্রান্তজাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগলজাতি তাহার উদাহরণস্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।"

চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশুবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।" (১)

এই ত গেল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। হিন্দু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কিন্তু অন্য মত। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষেরই কোন স্থানে আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন।

তৎকালের সেই আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহারা অধিবাস করিত, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, অধর্ম্মশীল, নীচ, ম্লেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবিশিষ্ট এবং আমমাংসভোজী ছিল।

---

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

"They (the Aryans) called their adversaries (the aboriginal tribes) "Dasyus' "Rakshas" &c. They are described as irreligious, impious, and lowest of the low; they are also in some texts contemptuously called black-skinned. Thus, during the Rigvedic period, there were, if we may so express ourselves, two 'colors'—the fair (Aryan) and the black (Dasyu or Dasa.)" (1)

অর্থাৎ আর্য্যগণ তাঁহাদিগের শত্রুদিগকে (আদিম অধিবাসীদিগকে) "দস্যু", "রাক্ষস' প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারা নীচ হইতে নীচ, ধর্ম্মবিহীন ও অধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা কোন কোন স্থলে অবজ্ঞাভরে কৃষ্ণকায় বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের সময়ে দুই জাতি ছিল—শ্বেতকায় বা (আর্য্য), এবং কৃষ্ণকায় (দস্যু অথবা দাস)।

"The Dasyus sre contrasted with the Aryans and are represented as people of dark complexion who were unbelievers, *i e* did not worship the gods of the Aryas and perform the sacrifices, but followed another law. The Aryan gods Indra and Agni are frequently praised for having driven away the black people, destroyed their strongholds and given their possessions to the Aryas." (2)

অর্থাৎ দস্যুদিগকে আর্য্যজাতির সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে

(1) "Hinuu Civilization under British Rule." By r. P. N. Bose, B. SC., F. G. S, M. R. A. S. &C., &C.

(2) "Social History of India,"—By Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., PH. D. C. I. E.

কৃষ্ণকায় জাতি বলা হইয়াছে। তাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই অর্থাৎ আর্য্যগণের দেবতাগণকে তাহারা পূজা করিত না এবং তাহারা অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বলিদানক্রিয়া সম্পাদন করিত এইরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণকায়দিগকে বিতাড়িত করা, তাহাদের দুর্গ সকল ধ্বংস করিয়া দিয়া আর্য্যদিগকে উহা অধিকার করিয়া দেওয়ার জন্য আর্য্যগণের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নিকে বহুস্থলে প্রশংসা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করিলে দস্যু ও আর্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যগণ গৌরবর্ণ সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও পক্কমাংসভোজী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমুদয় আদিম আর্য্যগণ প্রথম প্রথম প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষিকার্য্য হইতেই কর্ষক ধাত্বর্থমূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের নাম তাঁহাদিগের ভাষায় পাওয়া যায়। (১) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন :—

"প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইতেন। সেই সকল অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ তাঁহাদিগের সরল কোমল হৃদয়মধ্যে এমন সুন্দর সুশোভন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিত এবং এমন স্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত যে, তাহাতেই তাঁহাদিগের 'কবিত্ব শক্তির উন্মেষ' এবং ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য

(১) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় এক মন্ত্রের কতকাংশ প্রদত্ত হইল :—"লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর; আর্য্যদিগের স্তবের সহিত আর্য্যদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক ও শৃণিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক।"

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ ঋগ্বেদ সংহিতা।

মেঘ, বজ্র, ঊষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি এ সকলেরই তাঁহরা উপাসনা করিতেন। তখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিল—তখন পর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই আদিম আর্য্যজাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই এসিয়া-যাত্রিক-আর্য্যেরা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পাঞ্জাবকে তখন সপ্তসিন্ধু বলিত। সপ্তসিন্ধুদেশে আসিয়াও সেই হিন্দু ও ইরানীজাতি এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিবাদ হওয়ায় সেই একই জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। "দেবোপাসক হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন; আর "অসুরোপাসক" ইরানীরা পারস্থে গমন করিলেন। এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যই বেদে স্রষ্টা।

ঔপনিবেশিক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে খর প্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিতেন। ক্রমে যতই ঔপনিবেশিক-গণের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা ততই নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখা তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আর্য্য হিন্দু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল। নবীন উৎসাহ, অসীম বিক্রম, অদম্য সাহস, অজেয় বাহুবল ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অনুরূপ মুক্ত স্বাধীনচিত্ত হইয়া আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ যুদ্ধে মনযোগী হইলেন। হিন্দুর দুর্জ্জয় বাহুবলের নিকট অনার্য্য দস্যুদিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া লইলেন। অন্যান্য দস্যুগণ কেহ পলায়ন করিল কেহ বা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। (১)

(1) "Those who submitted were reduced to slavery and the rest were driven to the fastnesses of mountain."

"Social History of India"—By R G. Bhandarkar, M. A.

আর্য্যদিগের বিজয়পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহারা এই নূতন শত্রুর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্মৃত হইতে পারিল না। দলে দলে আসিয়া আর্য্যদের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের লাঙ্গল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে লাগিল—আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। হয়তঃ কখনও অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীররজনীতে একদল অনার্য্য দস্যু আসিয়া নিশ্চিন্ত, সুপ্ত আর্য্যদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া খাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়া পলায়ন করিত।

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতী শতদ্রুর শ্যামলতীরে শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্য্যগণ ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। যখন গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিনিবেশের সূত্রপাত দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্য্যগণ আসিয়া দোয়ার প্রদেশে বসতি করিতে লাগিলেন।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতিবিচার ছিল না। কিন্তু 'আর্য্য' ও 'অনার্য্যের' মধ্যে যে প্রভেদ, 'আর্য্য'র ও 'দস্যু'র মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তখন ছিল—'কৃষ্ণ' এবং 'গৌরের' ভিতর যে প্রভেদ তাহাও তখন ছিল।" (১)

"In the very early times the system of castes did

---

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, লিখিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধ হিন্দু পত্রিকা—৯ম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৯

not prevail, and it seems to have developed about the end of the Vedic period." (1)

অতি প্রাচীনকালে জাতিভেদ প্রথা ছিল না এবং এইরূপ অনুমান হয় যে, বৈদিক যুগের শেষ সময়ে ইহা গড়িয়া উঠিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় পুনরায় বলিতেছেন :—"কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামলশস্যভরা প্রভূত ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম আত্মজীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষাও করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেবমূর্ত্তিও ছিল না, দেবগৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না।"

ঋগ্বেদ ও জাতিভেদ।—"জগতের সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে আদি গ্রন্থ বেদ—ঋগ্বেদ তন্মধ্যে আদিতম। এই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই দুইটী কথা বলা আবশ্যক। এই ঋগ্বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ এমন এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণ মালার সৃষ্টি হয় নাই এবং লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন ঐ সকল মন্ত্র মুখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত এবং মুখে মুখে বিচরণ করিত। লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্র গুলি সর্ব্বদা শুনিত, কিন্তু কেহ কখনও তাহা লিখিত দেখে নাই। এই জন্য ঐ সকলের নাম শ্রুতি হইয়াছিল। তৎপরে বর্ণমালার সৃষ্টির পরে সময়ে

(1) Dr. R. G. Bhandarkar, Ph. D, on "Social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Reform Association."

সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি হইতে ও লোক মুখ হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগকে মণ্ডল, অধ্যায়, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত বেদব্যাস নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ঋগ্বেদের কোন একটী সূক্ত পাঠ করিতে গেলেই দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বাগ্রেই অমুক্ দেবতা, অমুক ঋষি, অমুক্ ছন্দ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই, সংগ্রহ কর্ত্তা সংগ্রহ করিবার সময় যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া শুনিয়াছেন সেই মন্ত্রের অগ্রে সেই নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা মোট ১০২৮। "যে সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরুষ সূক্ত। এই সূক্তটীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি-সম্পন্নপুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলেন। সেই পুরুষের দেহ হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইল। নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদাতঃ। গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাজ্জাতা অজাবয়। * * * * "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

অর্থ—"সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহণ করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব সকল ও দুইপাটী দন্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী এবং গো মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। * * * * *

* * * ইহাঁর মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত

হইল; বৈশ্য যাহা দেখিতেছ, ইহাই তাহার উরু এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" (১)

৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—"ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও আধুনিক সংস্কৃত। উক্ত সূক্তটীর ভাষা দেখিলেই মনে হয়, উহা আধুনিক সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রগুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মত নহে। তাহা অতিশয় কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র; শুধু ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্যরূপ।" এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার স্থানে লিখিত হইয়াছে,—"There can be little doubt, for instance, that the 90th hymn of the 10th Book is modern both in its character and its diction." অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় "European critics are able to show that even this verse is of latter origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda. (Vide chips from a German workshop Vol. II) ফলতঃ মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার বহুপূর্ব্বে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল, মহাভারত প্রভৃতিতে এবং মন্বাদি গ্রন্থে এই সূক্তের ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ। মনু ১।১৩

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত বক্তৃতা "জাতিভেদ"।

অর্থাৎ "পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ সৃষ্টি করিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার ছায়া এইরূপ ভাবে পড়িয়াছে।

পুরুরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ।
কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি।

মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাহ্মণোমুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ,
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।

অতঃপর আমরা জন্মগত জাতিভেদের সমর্থনসূচক তাবদীয় শ্লোক প্রদর্শন করিয়া পরে তাহার যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। জাতিভেদ জন্মগত সম্বন্ধে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে,—বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্রশিরা পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভূজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদ। পুনশ্চ একাদশ স্কন্ধে—সপ্তদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও আছে,—

বিপ্র ক্ষত্রিয়-বিটশূদ্র মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাতা য আত্মচার লক্ষণাঃ।

(শ্রীমদ্ভগবত ১১।১৭।১১)

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ;—

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতা॥
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ব্রহ্মা চকার বৈ।
চতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগং যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ; (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬)

পুরাণান্তরেও আছে,—মুখতো ব্রাহ্মণো যজ্ঞে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।
উরুভ্যামুদ্ভূতে বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত ॥

মন্বাদি-সংহিতা শাস্ত্র ও পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সে সমস্তই জন্মগত রূপে সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ত গেল জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের দোহাই বা অনুকূল মত। এখন আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ঋগ্বেদে বর্ণ বিচার সম্বন্ধে স্থূলতঃ কিছু বলা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়টির বিশদ আলোচনা আবশ্যক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদের কেবলমাত্র একটী স্থক্তের একটী ঋকে জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে, আলোচ্য স্থক্তে বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যজ্ঞীয় পশুর স্বরূপ যজ্ঞীয় বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা শ্চ ঋষয়শ্চযে।

অর্থাৎ যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।

যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা, সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া যে বলি দেওয়ার কথা আছে, সেই স্থত্রে ঋগ্বেদের পুরুষ স্থক্তের বর্ণ-ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনুবাদ সহ সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

যৎপুরুষং বদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে।

অর্থাৎ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয়েক খণ্ড করা হইয়াছিল। উহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত দুই উরু দুই চরণ কি হইল।

উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

(ঋগ্বেদ ১২।১০।১৯)

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বা জাতিভেদের মূল ভিত্তি। এই কথার উপরই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ নির্ভর করে। এখন এই সূক্তের আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য এই একটীমাত্র সূক্ত অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সংহিতা ও পুরাণকারগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্লোক রচনা ও জাতিভেদ সমর্থন করিয়াছেন। এই বিরাট পুরুষের বলি সম্বন্ধে রমেশ বাবু বলেন,—"বিশ্বনিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা অনুভবটী ঋগ্বেদের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব।" মুয়ার সাহেবও বলেন—It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed...........penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rites, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purush himself as forming the Victim." (Muir's Sanskrit Texts—Vol—V.)

অর্থাৎ বলিপ্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্ত্তমান কল্পনা সম্ভব

হয়, নতুবা নহে। এই বলি প্রথার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু সেইরূপ পুরোহিত কবিই কল্পনা করিতে পারেন যে, পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্মবিগর্হিত।

ঋগ্বেদ আর্য্য-জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ও সমগ্র জগতের আদি পুস্তক। এই আদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী লেখকগণ অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতিভেদ" সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম এই ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করাই বিধেয়। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—কি প্রকারে মানব-হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানাস্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদ না পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক কেন ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দু-সমাজের অবস্থা জানিবার জন্য ঋগ্বেদই একমাত্র পথ। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদ হইতেই প্রামাণ্য। ঋগ্বেদে তাৎকালিক সমাজের সকল কথাই বিশেষ ভাবে লিখিত রহিয়াছে। কেমন করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরস প্রস্তুত হইত, কি উপায়ে যবাদি পেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইত প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনুটি পর্য্যন্ত যে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—জাতিভেদের কথাও নিশ্চয়ই সেই স্থানে থাকিবে কিন্তু ঋগ্বেদের

১০২ এবং ঋকসংখ্যা ১০৪০২ অথবা ১০৪২২ সেই ঋগ্বেদে জাতিভেদ সম্বন্ধে মাত্র একটী ঋকে অতি সামান্য কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে।” (১)

“পাঁচ কি ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রণয়ন কার্য্য চলিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে আর্য্যদিগের আচার, নীতি, ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতির ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। আর্য্যদিগের গার্হস্থ্য নীতি, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ, আর্য্যদিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তেমন ভাবে লিখিত হয় নাই। ইহাও কি সম্ভব? এই স্থলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে! তিনি বলিতেছেন,— “পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণ শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।” (২)

ভাষা ও শব্দ শাস্ত্রদ্বারা বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই ভাষার সাহায্যেই ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণের সহিত আর্য্য জাতির সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য শ্লোকের ভাষা ও প্রকৃতির সহিত তুলনা করিলে এই সাধারণ ছন্দের শ্লোকটীকে অনায়াসেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাচীন যুগে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শব্দই এখন অপ্রচলিত। নিম্নে ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা শুধু আধুনিক সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাঁহারা যে

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ লিখিত “জাতিভেদ” প্রবন্ধ।

টীকাকারের সাহায্য ব্যতীত উক্ত মন্ত্রটীর অর্থ গ্রহণে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ মনে হয় না।

মন্ত্রটী এই,—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমম্"। (ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের সর্ব্বপ্রথম ঋক)

বিশেষতঃ ঋগ্বেদ প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। 'আমরা মৎস্য পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারাই ঋকসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।' (মৎস্যপুরাণ ১৩২ অধ্যায়)

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয় সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা ঋষির প্রণীত বলিয়া কথিত আছে (১)! যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা যেন সেই মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন। এই সূক্ত হইতে তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ সমাজিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্যতম অংশ।" (১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে ৺রমেশ বাবু বলিয়াছেন,—"আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতার নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়। অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,—"যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে। সেই সময়ই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বলেন,—"বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্য-চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঋষিদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত, আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত। এই সকল হইতে বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহকর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী কাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্বপ্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষা বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিল না, সেই প্রচীন গ্রন্থ

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, লিখিত "জাতিভেদ"।

ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর যিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকের পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি) এবং যিনি যখন যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা সেই ঋগ্বেদেরযুগের প্রাচীন আর্য্যদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নব রচিত শ্লোক সমূহে নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষা ও ভাব সেই হৃদয়ের অধিকৃত চিত্র। আর এক কথা, ঋগ্বেদ প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে-ভঙ্গে উত্তোলিত হইয়া গ্রামে গ্রামে, জনপদ জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্টমোক্ষমূলের, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোলব্রুক, ৺মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু ও মুয়ার সাহেবের মত ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে এত ভূরি ভূরি শ্লোক স্থান পাইয়াছে, যাহা আলোচনা বা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে একখানা পুস্তক রচিত হইতে পারে। এসব বহু শ্লোক বহু শাস্ত্র গ্রন্থে আছে, যাহার মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই এবং ভীষণ সামঞ্জস্য বিরহিত। এ সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থান্তরে আমাদের বক্তব্য আলোচনা করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে

যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজীরের মূল্য কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি। এলফিনষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে বলেন,—"In the Rigveda the caste system of latter times is wholly unknown" (Apendix VIII page 280), অর্থাৎ আধুনিক কালের জাতিভেদ প্রথা ঋগ্বেদের সময় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

ফলতঃ "সৃষ্টির আদিম কালে বা সত্যযুগে লোকের রূপ গুণ পরমায়ু ও চেষ্টা এক ছিল কেহই বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। সকলেই যদৃচ্ছা লব্ধ ফল মূল ও আম মাংসাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পাপ পুণ্য কার্য্য কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তখন বর্ণ বা জাতি বা বর্ণ সঙ্করের কথাও অজ্ঞাত ছিল। কেহ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষও ছিল না। সকলেরই রূপও ভেদাভেদ ছিল না। পরে ত্রেতাযুগে বা পরবর্ত্তী সময়ে গুণ কর্ম্মের বিভেদ বশতঃ চাতুর্ব্বর্ণং প্রতিষ্ঠাপিত হয়।" * শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতা, ভৃগু, বশিষ্ট, নারদ এই দশ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। এই দশ প্রজাপতি হইতেই পরে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। ফলকথা জন্মতঃ কেহই বড় ছোট হয় নাই। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই বড় ছোট বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

* বায়ু পুরাণ, ৮ম অধ্যায়।

—o—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ।

এক্ষণে আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না—তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রকারগণ এবিষয়ে আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারেন—সর্ব্বপ্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান বিষয়ে আমরা দেখাইব—আর্য্যগণ কত উদার ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের অন্তঃকরণে ভ্রমেও বৈষম্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাকে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করা হয় নাই। পঞ্চমবেদ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে বর্ণভেদের আলোচনা আছে—আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভৃগুরুবাচ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাবর্ণান্তরং গতাঃ
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

ইহার অর্থ এই যে,—ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়, মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া—ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগে প্রিয় ক্রোধপরতন্ত্র, রক্তবর্ণ সাহসী ও হঠকারী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব ও যে ব্রাহ্মণগণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণলাভ করিয়াছেন।”

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—“জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা ভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্যার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।” (১)

সুতরাং ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে এক বর্ণ ছিল কিন্তু কার্য্যের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিয়াছেন :—

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ।
তচ্ছে্রয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং”।

(১) ভারতে বিবেকানন্দ, ১১৩ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ "অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।" এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বেদ ও স্মৃতি পাঠকই জানেন যে, ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ—ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা—ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ জাতি, বেদমন্ত্র, দেব, তপঃ, ব্রহ্মতেজ, বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন তাঁহারা। 'ভূমণ্ডলে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে কার্য্য প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণগণই অন্য বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

যথা,—

বাক্য সংযমকালে হি তস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ।
প্রথমং প্রাদুর্ভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষবর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩৪২ অধ্যায় ২১ শ্লোক)

"সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণগণ, নারায়ণের বাক্য সংযমকালে, মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য সমুদয় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।"

সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥
(উৎকলখণ্ড, ৩৮ অ, ৪৪ শ্লোক)

"ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়াছিলেন। তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাঁহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে।"

অপিচ—

তস্মাৎ বর্ণাঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব।
এবং সাম যজুরেকমৃগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

"যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ, ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে।"

গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "সমাজ সংস্কার" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন—সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

তিনি বলিতেছেন :—

"* * * * * এ সময়ে মানবের প্রকৃত জাতিত্ব বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বজনোপজীব্য শাস্ত্রকার ভগবান্ মনু ও মহর্ষি বেদব্যাসের উক্তি আলোচিত হইলেই যথেষ্ট হইবে। মহাভারতের ও মন্বাদি শাস্ত্রের নানা স্থানে এ বিষয় সংক্ষেপে এবং বিস্তারে কথিত হইয়াছে। মূল কথা—প্রকৃত জাতিত্ব জন্মাধীন নহে, উহা সংস্কারাধীন।—"সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে"। সংস্কার অর্থাৎ সদ্গুরুসঙ্গজনিত, লোকপাবন সদাচার লাভ করিয়াই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে। যেমন মলিন অঙ্গার অগ্নিসংযোগে অগ্নি হইয়া যায়। পতিতপাবনী ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে উচ্চ পদবী লাভ করা বিচিত্র নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যাজনিত শ্রেষ্ঠজাতিত্বই অজর ও অমর। * * *

এই জাতিতত্ত্বের মীমাংসা সর্ব্বোপজীব্য মহাভারতাদি গ্রন্থের নানাস্থানে

প্রসঙ্গক্রমে নিরূপিত হইয়াছে। সে মীমাংসা সর্ব্বত্রই অভিন্ন। মহাভারতের বনপর্ব্ব, অজগর পর্ব্ব হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে;—পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে, একদা ভীমসেন একাকী ফলাদি সংগ্রহে বহির্গত হইয়া এক মহাকায় ভুজঙ্গ দর্শন করিলেন। ভুজঙ্গ ভীমকে ভোগবেষ্টনে বদ্ধ করায়, ভীম, নাগাযুতবলশালী হইয়াও স্পন্দনহীন হইলেন। তখন সেই মহানাগ ভীমকে কহিলেন,—"আমি সামান্য নাগ নহি। আমি পূর্ব্বজন্মে মহারাজ নহুষ ছিলাম। পুণ্যবলে স্বর্গের অধীশ্বর হইয়াছিলাম। তথায় ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের অপমান করায়, তদীয় শাপে এই বিকৃত নাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি কহিয়াছেন,—যিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তোমার গ্রাস হইতে অগ্রজকে ও তোমাকে এ পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। নহিলে, তোমারও উদ্ধার নাই, এবং তোমার কবলে পতিত ব্যক্তিরও উদ্ধার নাই।" ভীম তদীয় প্রশ্নের উত্তরপ্রদানে অক্ষম হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক কবলিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভীমের আগমনবিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক ভ্রাতাকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন। অনন্তর ভীমের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, সেই নাগের নিকট ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। নাগ কহিলেন,—"তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিব, নহিলে আমার কবল হইতে রক্ষা নাই"। যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে চাহিলে নাগ কহিলেন।

নাগ।—"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্! বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির!'

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? এ জগতে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু কি?

যুধিষ্ঠির। বেদ্য বস্তু—সেই সুখদুঃখাতীত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাঁহাকে লাভ করিলে, জীব শোক মোহের অতীত হয়। আর আপনি যে ব্রাহ্মণের

কথা জিজ্ঞাসিলেন, সে বিষয়ে আমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিয়া বলিতেছি ;—

"ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণো স্মৃতঃ॥
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

———শূদ্র হইয়াও শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ শূদ্র বংশে বা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, শূদ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। 'বৃত্ত' অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও।

এই কথা শুনিয়া নাগ কহিলেন, যদি—একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয়, তবে সেই চরিত্রের অভাবে, তাহার জন্মাধীন জাতিত্ব বৃথা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ;—

"জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে!
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্ মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—হে মহানাগ! হে মহামতে! সর্ব্ববর্ণমধ্যে সঙ্করতা জন্য মানবের জন্মাধীন জাতিত্ব সুদুর্জ্ঞেয়। উদ্দাম ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া, মানবগণ সকল যোনিতেই অপত্যোৎপাদন করিতেছে। যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য জলচরের গতিবিধি নির্ণয় হয় না, তেমনি মানবের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ, এই কয়টী নির্ণয় হয় না। অতএব যাঁহারা যজ্ঞশীল অর্থাৎ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি জ্ঞান-পুণ্যের অধিষ্ঠানেই সদা নিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

—"ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়, গলায় পৈতা বামুণ নয়।" কপর্দ্দক মূল্যের কয়েকগাছি সূত্র স্কন্ধে ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এ জগতে একমাত্র পুরুষকারেই লোকের আত্মপরিচয়।

একটী কৌতুকাবহ পৌরাণিক কথা মনে হইল, তাহা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি লোমভারে বড়ই অসুখী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। লোমশ করযোড়ে কহিলেন,—"ভগবন্! আমি আর কিছুই চাহি না, কাশ্মীরী ভেড়ার ন্যায় এ লোমভার হইতে আমাকে মুক্ত করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন—"বৎস! তুমি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই এ লোমসঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে।" লোমশও তদবধি নানাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার গাত্রের একগাছি লোমও স্খলিত হইল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া, পুনরায় বিরিঞ্চির শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন,—"ভগবন্! আমার অদৃষ্টে ব্রহ্মবাক্যও বিফল হইল! আমি আপনার আদেশে বহু ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিলাম; কৈ? আমার ত একটী লোমও পতিত হইল না!" ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছ। প্রকৃত পক্ষে উহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, সেই স্থানে হরিদাস নামে এক চণ্ডাল সপরিবার বাস করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফল মনোরথ হইবে। তখন মুনিবর সেই চণ্ডালের ভবনে গিয়া হরিদাসের নিকট অন্ন চাহিলে, সপরিবার হরিদাস ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া কাতরস্বরে কহিল,—"ঠাকুর! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ।—এ অস্পৃশ্য, নীচাধম, পাতকী চণ্ডাল আপনাকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইবে? ক্ষমা করুন, অতিথি সেবায় আমরা সপরিবার আমাদের ধনপ্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহি। কিন্তু

চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইব ?" মহর্ষিকে তখন অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদা ঐ চণ্ডাল ভোজনে বসিয়াছে, ইত্যবসরে লামশ অলক্ষ্যভাবে গিয়া তদীয় পাত্রস্থ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ নির্লোম ও নির্ম্মল হইল।

চণ্ডালোঽপি ভবেদ্ বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
—"মুচি হ'লেও, হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে ;
শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥"

যদি কেহ কঠোর সাধনাবলে উচ্চ জ্ঞান ধর্ম্মাদি অধিকার করে, তবে সে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের জাতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নির্বর্ণ এব চ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে একবেদ, সর্ব্ববাঙ্ময় এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল।

অন্যত্র—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৫ অধ্যায়ে আছে,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্।

পুনশ্চ মহাভারতে,—

একবর্ণমিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ॥ ১৮শ অঃ।

অর্থাৎ স্বভাবসম্ভূত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তদুপযোগী কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিতেছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া স্সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই অংশই সমুদয় সংশয় বিনষ্ট করিতেছে।

অত্রি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥৩৬৪
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩৬৫
শাকে পত্রে ফলেমূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥ ৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ ৩৬৭
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ ৩৬৮

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ ৩৬৯
লাক্ষালবণসম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৩৭১
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭২
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭৩
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৭৪
বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং, শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি, ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥ ৩৭৫
জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীরপৌরাণ পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন॥ ৩৭৬

"দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ (দশ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল ধর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ, দেবসংজ্ঞক)। শাক-পত্র-ফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হন। যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও

পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা। কৃষিকার্য্যের গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য-তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন। যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চৌর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য-মাংস লোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। ৩৬৪—৩৭১। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, (তত্তৎ স্থলে ব্যবহার বন্ধ করে), সেই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য। বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে; তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত হয়; তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে, ভাগবত (ভণ্ডবৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। জ্যোতির্ব্বিদ্ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী), অথর্ব্ববেদী, শুকবৎ পুরাণ পাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া, যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না।"

অত্রি আরও বলিতেছেন,—

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র পাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥ ৩৭৮
মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকামলৌ।
পঞ্চবিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥ ৩৭৯

"অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র-পাঠক (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে। মাগধ (মগধদেশীয়), মাধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কটুব্যবহারী, কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।"

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণং॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ হইয়াই, কি ক্ষত্রিয় হইয়াই, কি বৈশ্য হইয়াই, অথবা কি শূদ্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করে নাই। জন্ম সকলের একরূপেই হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিম্নস্তরে উপনীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যথাক্রমে সত্যগুণ, সত্যরজঃ উভয়বিধ মিশ্রিত গুণ, রজঃ ও তমঃ ভাবাপন্ন এবং তমঃ ভাবাপন্ন মানব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥

মনুও

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ভগবদগীতা বলিতেছেন,—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

মনু বলিতেছেন,—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ॥

বিষয়েষু প্রসক্তিং চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

কৃষিজীবী, গো-পালক ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী আর্য্য-সম্প্রদায় বৈশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—ভগবদগীতা:—

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।

অন্যত্র—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

আর শূদ্র হইতেছে তমোগুণ প্রধান; অলস, নিরুৎসাহ এবং অজ্ঞান ব্যক্তির কেবল দাসত্ব-বৃত্তিই স্বাভাবিক কর্ম্ম।

এই জন্য,—

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্মশূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। (ভগবদগীতা)

অপিচ,—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্মসমাদিশন্।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন আর্য্যগণ এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ গুণ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ প্রথা তৎকালে এরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল যে, সত্যগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পুত্রে যদি রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় লক্ষণ অথবা রজো ও তমোগুণ প্রধান বৈশ্য লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত, কিম্বা তমোপ্রধান শূদ্র-গুণ যদি তাহাতে প্রকাশ পাইত, তবে সে ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইত। এইরূপে চারি সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে সমাজে উচ্চ বা নিম্নস্তরে গমন করিত।

শাস্ত্রকারগণ এরূপ প্রথা অনুমোদন এবং দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। সমুদয় বর্ণের লক্ষণ বলিয়া, যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পরে ভাগবতকার বলিতেছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত—৭ম স্কন্ধ)

"যে বর্ণের যে লক্ষণ বলা গেল, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাকে তদ্দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইবে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজ ব্যক্তিতে যদি ক্ষত্রিয় কর্ম্ম বা ক্ষত্রিয়গুণ, বৈশ্যকর্ম্ম বা বৈশ্যগুণ, শূদ্রকর্ম্ম বা শূদ্রগুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় পুত্রে যদি ব্রাহ্মণ গুণ এবং ব্রাহ্মণ কর্ম্ম, বৈশ্যগুণ ও বৈশ্যকর্ম্ম অথবা শূদ্রগুণ ও শূদ্রকর্ম্ম দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন। বৈশ্য শূদ্রের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপই নিয়ম।

সৎকার্য্য দ্বারা উচ্চ বর্ণত্ব ও অসৎ কার্য্য দ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

ভগবান্ গৌতম বলিতেছেন—

বর্ণান্তর গমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং।

"অর্থাৎ সৎগুণ ও সৎক্রিয়া এবং অসৎ গুণ ও অসৎ ক্রিয়া দ্বারা বর্ণান্তর গমন হয়।"

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্!
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥ ৫৭

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায়।

"বর্ণ-বহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত সঙ্করজাতি-সম্ভূত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতি-নির্ণয় করিবে।"

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোক কলুষযোনিজম্। ৫৮

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায়।

"অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান—এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে।"

অত্রি বলিতেছেন,—

"সদ্যঃ পতিতমাংসেন লাক্ষয়া লবণে ন চ।
ত্র্যহেনশূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥ ২১

"ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়।"

"পরনিপানেষপঃ পীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি॥ ৩৮

বিষ্ণুসংহিতা,—চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

"পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে, জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ, আর জলাশয়স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি।"

"যস্য কায়গতং ব্রহ্মমদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ ৯৮

মনুসংহিতা,—একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

"যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

"ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরং।
ইহজন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি॥ ৭
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৮

আপস্তম্বসংহিতা,—অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

"যে সকল ব্রাহ্মণ একমাস নিরন্তর শূদ্রান্নভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে।" ফলতঃ কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ পূজ্য ও হেয়,—জন্ম দ্বারা নহে।

মনু বলিতেছেন,—

চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥ ১৭৬

মনুসংহিতা,—একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

"অজ্ঞানতঃ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, উহাদিগের অন্ন ভক্ষণ এবং উহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল আচরণ করিলে, সমানতা অর্থাৎ তত্তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণস্য সদাকালং শূদ্রপ্রেষণকারিণঃ।
ভূমাবন্নং প্রদাতব্যং যথৈব শ্বা তথৈব সঃ॥ ৩৩

আপস্তম্বসংহিতা,—নবমোঽধ্যায়ঃ।

"সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুক্কুর যেমন অস্পৃশ্য, সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে।"

মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধুর্দুশ্চারিত্রো যশ্চ ধর্ম্মদপেতঃ।
বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্ত্তনশ্চ রাজপ্রেষ্যো যশ্চ ভবেদ্বিকর্ম্মা॥
জপন্ বেদাজপংশ্চাপি রাজন্ সমঃ শূদ্রৈর্দাসবচ্চাপি ভোজ্যঃ।
এতে সর্ব্বে শূদ্রসমাভবন্তি রাজন্নেতান্ বর্জ্জয়েদ্দেবকৃত্যে॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৩ অঃ, ৪।৫ শ্লোক)

"যে সকল ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রাম্যদৌত্য প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া, শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেবকার্য্যানুষ্ঠান সময়ে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" এই ত গেল কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বে অপনয়নের কথা। এক্ষণে শূদ্র যে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা দেখান যাইতেছে।

ঐ মহাভারতে আছে,—

যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দিজঃ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২৫ অধ্যায়)

"যে শূদ্র, দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ), সত্য ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ব্যবহারেই দ্বিজ হয়।"

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি র্ন কুলং নৃপ॥
শূদ্রেচৈতল্লবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব)

"সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থ সাধক। জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। যদি কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রবৎ আচরণ করে, তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্ম লইয়া আচারনিষ্ঠ হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।"

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত অনুকূল শ্লোক নিবদ্ধ আছে, যাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এই অধ্যায়টিই স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আবার শাস্ত্র না দেখাইতে চেষ্টা পাইলেও সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী, আমাদের কথায় মোটেই কর্ণপাত করিবেন না বা তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিবেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনর্থক কতকগুলি পত্রাঙ্ক অপব্যয় করিতে ও অযথা লেখনী সঞ্চালন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে মাত্র।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥ ৪৮
স্বভাব কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥ ৪৯
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন স্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ ৫০

সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥ ৫১

"ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার (শিবের) মতে শূদ্র সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মান্বিত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। সদাচার দ্বারা, সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। সদাচারী শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন,—

শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণ শ্বপচাধমঃ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪ উ, ৪২ শ্লোক)

"অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আচারবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

মনুও বলিতেছেন,—তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥

(মনুসংহিতা—দশম অধ্যায়ঃ ৪২ শ্লোক)

"অর্থাৎ উক্ত কয়েক প্রকার জাতি যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্য মধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে।" এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ পরে উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিব। আমরা দেখাইব, কত জাতি ও কত পুরুষ সৎকর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-স্তরে সম্মানিত হইয়াছে ও অসৎ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণেরাও কিরূপ অধোগতি লাভ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারিণী এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

"সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ॥ ১৯৯
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥২০০

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা)

"কর্ম্ম এবং জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট, তাহার মধ্যে কর্ম্মিগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তম আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ। কেবল বিদ্যা, কেবল তপস্যা, (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার কর্ম্ম এবং বিদ্যা-তপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ তাহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলিয়াছেন।"

পুনশ্চ মহাভারতে—ভরদ্বাজঃ উবাচ—

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব্রূহি বদতাম্বরং॥ ২১॥

ভৃগুরুবাচ—

জাত কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্‌সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ ২২॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিবসাশী গুরুপ্রিয়ঃ॥
নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ২৩॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ অনৃশংস্যংত্রপ ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ২৪॥

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥ ২৫॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ॥ ২৬॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥ ২৭॥

শান্তিপর্ব্ব, ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ।

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রই বা কিরূপে হয় আমাকে বলুন—ভৃগু কহিলেন, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্‌কর্ম্মশালী (সন্ধ্যাবন্দনা জপ হোম দেবপূজা অতিথি সৎকার এই ছয়টী অথবা যাজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী ষট্‌কর্ম্ম) যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্য ব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান অদ্রোহ, অনৃশংসতা লজ্জা (কুকার্য্য করিতে লজ্জা), ঘৃণা (নিন্দনীয় কর্ম্মে ঘৃণা) ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্যকর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, যাহার ভাল মন্দ কর্ম্মের বিচার নাই এবং যে বেদত্যাগী আচার-রহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।

যোঽধীত্যবিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে॥ ২৮॥ উশনঃ সংহিতা

"যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষদ্) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে এবং পাদ প্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। (ঐ)

"এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

ততো বেদাঙ্গানি ॥ ৩৫।

যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি ॥ ৩৬

মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতাত্বাচার্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥

এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রাঙ্মৌঞ্জীবন্ধনাদ্দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি ॥ ৪০ ॥

এইরূপে একবেদ দুইবেদ বা তিনবেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয় পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এই জন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্বে দ্বিজ শূদ্রতুল্য থাকে।

এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মগত ভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। যদি গুণকর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণভেদের কারণ পাওয়া কঠিন এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ বৃথা। মানব স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারেই যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে কি ছিল? সৃষ্টির আদি অন্ত নাই, সুতরাং বলিতে হইতেছে, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণত্বাদি

লাভ করিয়াছে এবং তাহা পরবর্ত্তী সময়ের সামাজিক নির্দ্দেশ মাত্র। সমাজে সম্মান, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণ অনুসারে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লাভ, দোষের প্রশ্রয় না দিয়া বরং দোষীকে অবনত করিয়া শাসন করা ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ সমাজে সমর্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, —

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥ ১০

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট। কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বাস্তবিকও একপ্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা লাভ করিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের জন্য সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। নচেৎ সমাজে উৎশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে। সমাজের মজ্জাগত দোষ দুর করিতে হইলে উত্তম অধম বিভাগ আবশ্যক হয়। মহাভারত ও ভাগবতের মতে বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বর্দ্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এরূপ মনে হয়। ক্রমে এই গুণ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ, জাতিগত বা বংশানুক্রমিক হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

গুণগত জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ শ্লোক নিবদ্ধ আছে। এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

বনপর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরই জন্ম মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহার চরিত্র পবিত্র তিনিই ব্রাহ্মণ।

যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে, জন্ম বংশ বা জটাজুট দ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাহাতে সততা ও ধর্ম্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ।

যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গাহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিও বলিতেছেন,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥

(মনু দশম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

"এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়,—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ন জাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ। (শুক্রনীতি)

সর্ব্বে চোত্তরোত্তরং পরিচরেয়ুরার্য্যানার্য্যয়ো-
র্ব্বতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্।

(দশম অধ্যায়ঃ, গৌতম-সংহিতা।)

"বর্ণগণ আপনার আপনার ঊর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে, কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

অন্যত্রও উক্ত আছে—

জ্ঞানকর্ম্মোপাসনাভির্দ্দেবতারাধনে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ। (শুক্রনীতি)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভাবদ্বাক্য).

ভট্টমোক্ষমুলর—ধৃত ধর্ম্মসূত্র বচনে আমরা দেখিতে পাই,—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি নিষ্ঠুর বিধি প্রণয়ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

মনু অন্য এক স্থলে বলিতেছেন,—

জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।

"আর্য্য পিতা অনার্য্য মাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে।" বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্‌।

সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্বং ন বিদ্যতে॥ ১১৪॥

(দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ, মনুসংহিতা)

"যাহাদের কোন ব্রত নাই,—যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতি-মাত্রে ব্রাহ্মণ এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ব নাই জানিবে। সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

তৃতীয় অধ্যায়।

গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ।

গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ব্যবস্থা-শাস্ত্রকার অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নযুক্ত ও অনিত্য সংসার-মোহমুক্ত সেই ব্রাহ্মণ। যে বীরধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয় কর্ম্মা সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী সেই শূদ্র। আর যে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, মহামূর্খ ও সর্ব্বপ্রাণী হিংসাপরায়ণ, সেই চণ্ডাল। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ঘৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্মভেদে বিভক্ত করিলেন।

যথা—বায়ুপুরাণঃ—

"পুত্রো ঘৃৎসমদস্য শুনকে যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ,—

"ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।"

হরিবংশ বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। যথা,—

পুত্রঘৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

(হরিবংশ ২৯ অধ্যায়)

ঘৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণকর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘৃৎসমদ বা গৃৎসমিত একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ ও হরিবংশে ইহাঁর বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইনি বংশগৌরবে পুরাকালে সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইহাঁর পিতৃপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ; বিতথের পঞ্চপুত্র—সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃহসমিত। ফলতঃ একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত লইয়াছে;—ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্মতন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২)

"ঋগ্বেদে সরলভাবে একজন ঋষি বলিতেছেন,—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে তৃণকামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনকামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। তাই রমেশ বাবু বলিতেছেন—যাহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিলেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারের পুত্র মন্ত্র প্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য এবং মাতা ময়দাওয়ালী তাঁহারা কোন জাতিভুক্ত?" বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, আর্য্য রীতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলেও প্রাচ্য জাপানে বর্ত্তমান সময়ে ইহার অত্যন্ত সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। একটী পরিবারে ৬টী সন্তান, সকলেরই কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কেহ হয়ত

চর্ম্মকার, কেহ হয়ত ক্ষৌরকার, কেহ হয়ত অধ্যাপক, কেহ হয়ত সূত্রধর, কেহ হয়ত চিত্রকর, কেহ হয়ত দর্জ্জি এবং কেহ হয়ত বস্ত্রবয়নকারী ; প্রাতে ছয় ভাই এক সঙ্গে আহরাদি করিয়া, যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে সে সে চলিয়া গেল। সারাদিন অতিবাহিত হইবার পর আবার পুনরায় সন্ধ্যাবেলায় ৬ ভাই একত্র হইল ও একত্রে পান ভোজনাদি করিল। বিবাহ প্রথাও তথায় ঐরূপ। কিন্তু পুরাণ সংহিতা, বেদবেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের জন্মভূমি বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল ভারতে এ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায়।

মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গতঃ অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে ;—শূদ্র বংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র। পূর্ব্বে কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না। ভৃগুবংশাবতংশ ক্ষত্রিয়কুলারি পরশুরামের সাহায্যে কেরল দেশীয় ধীবরগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অব্রাহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্ত্যান্‌প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
* * * যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ।
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
যামদগ্ন্য স্তদোবাচ সুপ্রীতে নান্তরাত্মনা। (স্কন্দপুরাণ)

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্য জাতীয়া—তাহার নাম ওলকা ছিল। এই জন্যই কণাদ দর্শনের অন্য নাম ঔলক্যদর্শন। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রা হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছরমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা কুমারীকালীন পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করে, তিনিই সাধনা ও ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা যযাতি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির গর্ভে যে দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারত বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশের আদিপুরুষ।

আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তিনি তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"করুষাৎ মানবাৎ আসন্ করুষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২)

"মনুর পুত্র করুষ হইতে কারুষ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, ইহারা ক্ষত্র-জাতীয়। ইহারা উত্তরা ও পথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল।

"পৃষধ্রো হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং জনমেজয়।
শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নঃ। (হরিবংশ ৯ম অধ্যায়)

মনুর পুত্র পৃষধ্র রাজা গুরুর গোহত্যা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২য় অধ্যায়)

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

(হরিবংশ ১১।৬৫৮)

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২ অধ্যায়)

মৌদ্গল্য ও কাম্বায়ন গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।২১)

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভূবঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ)

মুগ্দলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানো ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাভয়ঃ॥

ভর্ম্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল, মুগ্দলের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)

পুরুরবার বংশে রম্ভ নামক নৃপের রভস নামক পুত্র, তাহার বংশে গভীর জন্মিয়াছিলেন, সেই গভীরের বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন।" (ভাগবত)

শুধু গুণ ও কর্ম্মদ্বারাই বশিষ্ঠ ব্যাস নারদ শুকদেব মন্দপাল কণাদ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহাদের মাতৃগণ সকলেই নীচ জাতীয় শূদ্রকুল-সমুৎপন্না।

গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হয়েন। শিনির পুত্র গার্গ্য। "গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়)

গর্গাৎ শিনিঃ ততোঃ গার্গ্যাঃ শৈনেয়াঃ
ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভুবঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্য হইতে দুরিত ক্ষয় উৎপন্ন হন। দুরিত ক্ষয়ের তিনটী পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুনি, তিন জন্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দুরিত ক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ।
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিং গতাঃ॥ (ভাগবত)

যযাতি বংশীয় ঋতেষুর সন্তান রন্তিনার, তাঁহার পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ এবং ধ্রুব। অপ্রতিরথের বংশে কণ্ব জন্মগ্রহণ করে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তং সুং
অপ্রতিরথাং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।

যতঃ কণ্বায়না দ্বিজাঃ বভূবুঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। রন্তিনারের সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ,—এই তিন পুত্র। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। (ভাগবত—নবম স্কন্দ)

আর্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে, দশ প্রজাপতি হইতে সমুদয় মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যবংশের আদি রাজা ইক্ষ্বাকুর পিতৃপিতামহাদির অনুসন্ধান করিলে মরীচির বংশোদ্ভব প্রমাণ হয়। মরীচির পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান, তাঁহার পুত্র সাবর্ণি মনু, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু এবং সেই ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্যবংশীয় রাজন্যগণ জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশ সম্বন্ধেও ঐ একরূপই। চন্দ্রবংশের আদি রাজা পুরোরবা, তৎপিতা বুধ (ইক্ষ্বাকু রাজভগিনী ইলা তাঁহার মাতা), বুধের পিতা চন্দ্র, চন্দ্র আবার অত্রির পুত্র। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, প্রজাপতিগণ হইতেই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সমুদয় ক্ষত্রিয় রাজাগণের উৎপত্তি।

স্বায়ম্ভুব মনু হইতে প্রিয়ব্রত ও ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবের পিতা উত্তানপাদ নামক দুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়ে আছে,—মনুর পুত্রগণ মধ্যে পৃষধ্র শূদ্র, নেদিষ্টের পুত্র বৈশ্য, অঙ্গীরা ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ। যুবনাশ্ব রাজার পুত্র হরিত, তৎপুত্র আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ। যবনাদি ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত। মেধাতিথি ক্ষত্রিয় তৎপুত্রেরা ব্রাহ্মণ, গর্গ ক্ষত্রিয় তৎপুত্র শিনি ও তৎপুত্রগণও ব্রাহ্মণ। উরুক্ষয় ক্ষত্রিয়, তাঁহার তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণ হয়। মুদ্গল ক্ষত্রিয় তৎপুত্রগণ ব্রাহ্মণ।

হস্তিনাপুর নির্ম্মাতা হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অপিচ,—রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথুসেন। পারের নীপ নামে যে আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার একশত পুত্র হয়। ঐ নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপন্ন করেন। সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ—২১শ অধ্যায়)

"কক্ষিবান্ বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত।"

কবজ ঐলুষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। যে হীন বাচক শূদ্রের পক্ষে বেদ প্রণয়ন দুরে থাকুক, বেদ পাঠ বা শ্রবণের অধিকারও ছিল না বলিয়া বর্ণিত অছে, সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা। এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (কৌষতকী ব্রাহ্মণ);

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত এবং হীনকর্ম্মদ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহ সমর্থ সোম পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদ্বংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, রাজাকে কর প্রদান করিত এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত তাহার সন্তানেরা

শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র শ্রেণীর যোগ্য হইত।" (৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই)

"বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ্-তত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে জনক রাজা বলিলেন,—'আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি আমাকে তাহা প্রদান করুন।' তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।" (শতপথ ব্রাহ্মণ)

"ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও অনেকে বিদ্যা জ্ঞান কর্ম্ম ও যশঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনক তাহার অন্যতম উদাহরণ। পরন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইবে।' এই বলিয়া ঋষিগণ ইলুষের পুত্র কাকষকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাকষও দেবতাদিগকে জানিতেন ; তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে,—"এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন। অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশলোপ পাইবে।"

বিষ্ণু পুরাণের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে সিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও সৈবদেবের জন্ম। গার্গ্য ও সৈবেরা ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

উক্ত পুরাণের অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র ত্রয়ারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"মৎস্যপুরাণে ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে "এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা ঋষিদিগের সন্তান, ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিগণের সন্তান।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মনো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয় তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

তির্য্যগজাতিসম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গ বেদবিজ্ঞনাদি দ্বারা কিরূপে ঋষিত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বজনের অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন তাহা শাস্ত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

মনুসংহিতাই পুনরায় গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—শ্রবণ করুন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

"যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়!"

ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯২।১৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ধৃষ্টার্দ্ধাষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।"

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"বিনানুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান এইরূপে বর্ণিত আছে,—বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতাকর্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলায়ন করতঃ মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতর্দ্দন তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন—, "এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই।" প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন।"

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

'বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাজাতা বংশেঽথভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

বৎস্য হইতে বৎস্যভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

মনু ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব লাভের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রবিড়া কাম্বোজাজবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥

মুখবাহূরুপাজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ” ॥ ৪৫ ॥

১০ম অধ্যায়, মনুসংহিতা।

বক্ষমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ৪৩। “পৌণ্ড্রক” ঔড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং ‘খশ’ এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে।৪৪। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়া লোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়,—সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

প্রাচীন কালে সত্যপ্রিয়তা, বিদ্যাবত্তা ও তত্ত্ব জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ নির্ভর করিত। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী মনোরম উপখ্যান আছে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে বলিল “মা! আমি ব্রহ্মচারী হইব, কোন্ বংশে আমার জন্ম ও আমি কোন্ গোত্রীয়?” মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন “যৌবন কালে আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্যবৃত্তি করিতাম তুমি সেই সময় হইয়াছিলে—কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম তাহা আমি জানি না। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি এখন হইতে সত্যকাম জাবাল বলিয়া আত্মপরিচয় দিও।

সত্যকাম গৌতমের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার সঙ্কল্প জানাইল। কিন্তু গৌতম কর্ত্তৃক বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল—তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্য নিষ্ঠায় পরম জ্ঞানী মহর্ষি গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—

"তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্ত মর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যেন সত্যদগা। ইত্যাদি
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪র্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব। সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে সত্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায় ছিল। সত্যকামের জাতি বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। বালক সত্য কথা বলিল, অমনি তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া লওয়া লইল। পরে তিনি একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল দাসী পুত্রও যখন ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফলতঃ যাহাদের পিতৃনির্ণয় না হয়, তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারাই কেবল বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে। যথা মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায় ৪০ শ্লোকে আছে,—

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

এইরূপে আমরা ভুরি ভুরি উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক গুণকর্ম্মানুযায়ী জাতি বিভাগের সমর্থন করিতে পারি; কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র। কেননা বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কে না জানে, গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী সূত পুত্র কর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি না। অতঃপর বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথা আর্য্য শাস্ত্রে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু অনুলোম বিবাহের বিধি ছিল। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই প্রতিলোমজ রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৮।১৩, ১৪)

পূর্ব্বে ভারত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নানা শাস্ত্র হইতে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

"তিস্রস্তু ভার্য্যা বিপ্রস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু ॥ ৬
একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥৮

* * * *

পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদলে তু দ্বিজন্মনঃ ॥ ১৪। চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতি কন্যা ও বৈশ্যের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে।

ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, এই দুইজাতীয়া, বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যা মাত্র, শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র।"

মহর্ষি ব্যাসও ঐ কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

"উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।"

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যাসসংহিতা।)

"সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।"

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইতেছে :—

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ॥ ১ ॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ২ ॥ দ্বে বৈশ্যস্য ॥ ৩ ॥ একা শূদ্রস্য ॥ ৪ ॥
তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণি গ্রাহ্যঃ ॥ ৫ ॥
অসবর্ণা বেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া ॥ ৬ ॥
প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ॥ ৭ ॥ বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া ॥ ৮

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় বলিতেছেন,—

"সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু
জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১
মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ॥ ২
সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ ॥ ৩

"সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুবিধা থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমানবর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সহিত ইত্যাদি।)

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ যে অবাধে প্রচলিত ছিল তাহা বহু প্রকারেই দেখান যাইতে পারে। অসবর্ণা ও হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে কিরূপভাবে সম্বর্দ্ধনাদি করিতে হইবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্ ॥ ৫
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

"হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে। পাদস্পর্শ করিবে না।'

অন্যত্রও দৃষ্ট হইতেছে,—

"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৭
তৃতীয় অধ্যায়, উশনঃসংহিতা।

দায়ভাগ সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা সেই অধ্যায়টী পাঠ করিতে অনুরোধ

করি। তবে প্রমাণস্বরূপ আমরা উহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎপুত্রাভবেয়ুস্তে
পৈত্রিকমৃক্‌থং দশধা বিভজেয়ুঃ ॥ ১
তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্ ॥ ৩ ॥
দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ ॥ ৪ ॥
শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্ ॥ ৫
* * * দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্দ্ধহরঃ ॥ ৩২

"ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয়া স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈত্রিক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যা পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রা পুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্ব্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ ॥
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেক ভাগা বিড়্‌জাস্তুদ্ব্যেকভাগিনঃ।
দ্বিতীয় অধ্যায়, দায়ভাগ প্রকরণ।

"চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ; তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ, এইরূপ দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্যপুত্র দুই ভাগ এবং এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে।

গৌতম বলেন,—

"ব্রাহ্মণস্য রাজন্যা পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্ন
স্তুল্যাংশভাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্যৎ
রাজন্যা বৈশ্যা পুত্রসমবায়ে স যথা
ব্রাহ্মণী পুত্রেন ক্ষত্রিয়াচ্চেৎ শূদ্রাপুত্রোঽপ্যনপত্যস্য
শুশ্রূষুর্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসবিধিনা।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ—গৌতমসংহিতা।

অতঃপর দাহাদির কথা উল্লিখিত হইতেছে,—

"পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেষুঃ॥ ৩
ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।

"পুত্রগণ পিতামাতার নির্হরণ (শববহন দাহনাদি) করিবে। কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্র পুত্র তাহা (নির্হরণ) করিবে না। অর্থাৎ শাস্ত্রকার ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্র দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ পিতার শববহন দাহনাদি করিতে পারিবে;—শুধু শূদ্র পুত্র দ্বারা এ কাজ চলিবে না, এইরূপে নিষেধ বিধি করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাও অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে। দাহাদির পর অশৌচাদির কথা বলা হইতেছে—

রাজন্য বৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু।
ষড়্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি॥ ৩৬
বৈশ্য ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমেব তু।
অর্দ্ধমাসেঽথ ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৩৭
শূদ্র ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং বৈশ্যেধ্বাশৌচ মিষ্যতে।
ষড়্রাত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৩৮

শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়াণাস্তু ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি।
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৩৯

উশনঃসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

"সপিণ্ড শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম মরণে শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ১৫—৬—৩ দিন অশৌচ। সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র ও দ্বাদশাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে—দশ দিন) অশৌচ হইবে।" এইত গেল অশৌচের কথা।

এক্ষণে আমরা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের কথা উভয় শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে চাহি।

তাঁহারা বলেন,—

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।"

প্রথম অধ্যায়—ব্যাসসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্ন কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাতসন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্র কন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে।

সর্ব্বশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণস্বরূপ আর একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব।

কাত্যায়ন-সংহিতা বলিতেছেন,—

"বর্ণ জ্যৈষ্ঠ্যেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেবাভিঃ স্বাধ্বীভির্ম্মথনং পুনঃ॥ ৫

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

"ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহুপত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশ্যে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমন্থন করিতে পারিবে।"

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥

(৩য় অঃ মনু)

"শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে; শূদ্রা এবং বৈশ্যা, বৈশ্যের বিবাহ যোগ্য। শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্য হইবে।"

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব (Mr. Elphinstone) তৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসেও লিখিয়াছেন :—Men of the three first classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place

in their family. But not marriage is permitted with woman of a higher class.

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে ॥ ৪৪

(মনু তৃতীয় অধ্যায়)

"শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমাণ বিধিই প্রশস্ত। শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ সমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রেবদ্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত।"

এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥ ৬৪ ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥

(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

"স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নীকন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্রমে যেরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়— ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। আমরা কেবল এতদ্বিষয়ক কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হইব।

ক্ষত্রিয় যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেশে ঐরূপ প্রথা না থাকিলে কখনই এরূপ বিবাহ হইতে পারিত না। "যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গবেত্তা সর্ব্বগুণান্বিত ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত এক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, বাসুদেবের তুষ্টির জন্য পঞ্চশত ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচ শত মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণ, এক শত ক্ষত্রিয়া, এক শত বৈশ্যা ও এক শত শূদ্রা। * * * দুর্ব্বাসার সেবা করায় তিনি বর দেন, প্রত্যেক ভার্য্যাতে, একটী করিয়া পুত্র ও একটী করিয়া কন্যা জন্মিবে, অধিকাংশ কন্যা যদুবংশীয়দিগকে সম্প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কন্যাগুলি অন্যান্য নরপতির সঙ্গে বিবাহ দেন। (১)

হিন্দু জাতির শীর্ষস্থানীয় চন্দ্রবংশোজ্জ্বল পাণ্ডবগণ যেমন পঞ্চাল ও যদুবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অনার্য্য নাগ বংশীয়া উলুপী এবং রাক্ষসী হিড়িম্বারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ এক নাগ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনেক জাতীয়া বহুবিধা স্ত্রী ছিল বলিয়া প্রকাশ। চন্দ্রগুপ্ত যবনরাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজপুত বংশীয় ললনাগণের সহিত দিল্লীর মোগল সম্রাটগণের বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে রাজপুত জাতির জাতি নষ্ট হয় নাই।

মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদত্ত গণিকা বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিয়াও জাতিভ্রষ্ট হয়েন নাই এবং ব্রাহ্মণ শর্বিলক অন্যতর গণিকা

(১) "৺প্রতাপ রায়ের অনুবাদ (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৬৪৪ পৃষ্ঠা)।"

মদনিকাকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই। কাব্য বা নাটকের বিষয় উড়াইয়া দিবার কাহারও অধিকার নাই। বরং পুরাণ সংহিতা অপেক্ষা নাটকে তাৎকালিক যুগের সামাজিক আচার ব্যবহার স্ফুটতর রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। সমাজের নিখুঁত চিত্রই নাট্যকার তদীয় নাটকে সুরঞ্জিতরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন। তৎসময়ে এরূপ বিবাহ কোন দোষাবহ ছিল না এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। ফলতঃ পূর্ব্বযুগে বিবাহ ব্যাপার এ কালের ন্যায় বাঁধাবাধি রীতিতে নিবদ্ধ ছিল না।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন ঃ—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্ ॥২৩॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ॥২৪॥

(মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়)

"নিকৃষ্টাকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিনী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট বংশীয়া বা অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও ভর্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।"

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২৩৮॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥২৪০॥

(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে ।২৩৮। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে ।২৪০।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আদিতে প্রাচীন-কালে একই পিতা কশ্যপ ঋষির সন্তান ছিলেন এবং নিজদিগকে পরস্পর সহোদর ভাই বলিয়াই জ্ঞান করিতেন,—পরস্পরের মধ্যে বিবাহ, আহার ও আদানপ্রদান স্বচ্ছন্দে চলিত। পরে যখন এই চারি শ্রেণীর মধ্য হইতে প্রেম ও ভালবাসা, প্রীতি ও মমতার ভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল—তখনই পরস্পরের মধ্য হইতে আহার, পান ও বিবাহাদি প্রথা উঠিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। জ্ঞাতিত্ব ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ চলিয়া যাওয়াতেই এবং পরস্পর স্নেহ ভালবাসা, মায়া মমতার অভাব হওয়াতেই এই সব সামাজিক ও জাতিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিবাহাদি না হইবার আর কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের মধ্যে যে ভেদ ও ব্যবধান দেখা যাইতেছে—এ সবই কৃত্রিম ও মিথ্যা। এই মিথ্যা, অশাস্ত্রীয় কুলাচার ও দেশাচার ভাঙ্গিতে হইবে। বিবাহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আদানপ্রদানের সীমা বাড়াইতে ও প্রশস্ততর করিতে হইবে। আবার বৈদিক যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিবাহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে চারি বর্ণকে বাঁধিতে হইবে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলিন, কাপ শ্রোত্রীয় প্রভৃতির মিথ্যা বেড়া ও কুসংস্কারের সনাতন প্রাচীর এই দণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

আহার।

পরাশর স্মৃতিই কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

"যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্‌ এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্যে কব্যে" ভোজন করিবে।"

মনু আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ভারত গৌরব পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, এম, এ; পি, এইচ, ডি; সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার বিখ্যাত "ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—But in the olden times we see trom the Mahabharat and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas couid eat the food cooked by each other, Manu lays down generally that a twice-born should not eat the food coocked by a Sudra (IV 223);, but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV 253). The implication that lies here is that the

three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriyas or Vaisyas) who observes his religous duties (17, 1,). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, except with the Sudra. But even here there is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent (1-18. 9. 13. 14.)

বর্ত্তমান সময়ে আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ আঁটাআঁটী ভাব দেখা যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ভাণ্ডারকার মহাশয়ই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এলফিনষ্টোন সাহেব তৎকৃত "ভারত ইতিহাসের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—But there is no prohibition in the code against eating with other classes or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days (Ch. XI, 153)

পুনর্ব্বার ভাণ্ডারকার মহাশয় মান্দ্রাজের হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছেন—"Even in the time of the epics, the Brahmans dined with the "Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic—sage Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas,

প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখনও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও সেই সকল যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে বৈশ্য সুপকার ছিল। বিরাট রাজভবনে ভীম নিজকে সুপকার বলিয়া পরিচয় দান করতঃ উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময় বলিয়াছিলেন, "রন্ধনাদির কার্য্য কেন ব্রাহ্মণের হইতে যাইবে। রন্ধনের কার্য্য হইতেছে চাকর-বাকরের কার্য্য।" বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির যদি কোনও গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা খাদ্যাখাদ্য বিচার ও স্পর্শদোষ ভীতি। পৃথিবী পূজিত কোনও মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন,—"জ্ঞানমার্গ কর্ম্মমার্গ ভক্তিমার্গ সব পলায়ন এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, কেবল আমায় ছুওনা আমায় ছুওনা—পৃথিবীর সব অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র। হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই—মুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই, উপাসনা তপস্যাতে নাই, ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।" হিন্দুসমাজ রসাতলে গিয়াছে, পাপে যে ডুবিয়াছে তবুও কপটতা ছাড়িতে পারিতেছে না। কত সমাজশিরোমণি নেতা মহাশয়কে দেখিতেছি, যাঁহারা নিশাকালে নিম্নশ্রেণীর রক্ষিতা নারীর গৃহে গোপনে স্বচ্ছন্দে তাহার তৈয়ারী খাদ্য আহার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন ও বাটী আসিয়া বিলাতযাত্রীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন। কত সমাজপতিকে দেখিতেছি যাঁহারা ষ্টীমারে স্বচ্ছন্দে বাবুর্চ্চির প্রস্তুত মুরগীর মাংস দিয়া আহার করিতেছেন ও বাটী আসিয়া মুখ মুছিয়া দুর্ব্বল স্বজাতীয়

ভ্রাতাকে সামান্য অপরাধের জন্য সকলে মিলিয়া এক ঘরে করিয়া রাখিতেছেন এবং বিলাত ফেরতের কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। এমন ভদ্রলোক বা তথা কথিত বিদ্বানের নাম শোনা যায় না, যাঁহার শুড়ির অন্নে প্রস্তুত সুরা দেবীর আরাধনায় তৎপর নহেন।

যাঁহারা মদ্যপান করেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট ভদ্র আখ্যাধারীই নহেন। শতকরা দশজন ভদ্রনামধারী লোককে আমরা এ কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত দেখিলেই সমাজকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। অথচ ইহাঁরাই দেশনেতা, সমাজপতি, বিধি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদাতা, সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা। চরিত্রবান্ ব্যক্তি যে সমাজে একেবারেই নাই, ইহা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা আছেন তাঁহারা দেবতা-স্থানীয়, তাঁহাদের জন্যই সমাজ জীবিত আছে। কিন্তু হায়! সংখ্যায় ইহারা কত সামান্য কত অল্প! সাধে কি হিন্দুসমাজের এই দুর্দ্দশা? উপরে একজন আছেন, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিবার উপায় নাই। তুমি বড় লোক, তোমার ধন আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, সুতরাং তোমার আর ভয় কি? ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তোমার অখণ্ড মণ্ডলাকারং রজত খণ্ডের দাস; মনু স্মৃতি তোমার অর্থের লালসায় তটস্থ। আর আমি দীনহীন, যত বিধি ব্যবস্থা সব আমার জন্য, পান থেকে চুন টুকু খসিয়া গেলে আর আমার নিস্তার নাই, সকলে মিলিয়া আমাকে এক ঘরিয়া করিয়া রাখিবে। দুর্ব্বলের প্রতি যে জাতির প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা ও বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে যে জাতির আগ্রহ, সে জাতির পতন হইবে না ত কোন্ জাতির পতন হইবে? দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য যাহারা কর্ত্তব্যের গুরুভার ও মনুষ্যত্ব লাভাশার বিজয় মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া উত্তাল-তরঙ্গমালা-বিক্ষুব্ধ সাগরাম্বু রাশির গভীর গর্জ্জনের মধ্য দিয়া বিদেশে অজানিত রাজ্যে উপনীত হইয়া বিদ্যা:জ্ঞান

অর্জ্জনপূর্ব্বক মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহাদিগকে আমরা কোল পাতিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে সমাজে টানিয়া লইবার পরিবর্ত্তে দূর দূর করিয়া সরাইয়া দিতেছি আর যাহারা ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বারবণিতালয়ে মদ্যপান ব্যভিচারে অস্পর্শীয়াগণের স্পৃষ্ট খাদ্য আহারে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—সমাজের আদর্শ ধ্বংস করিতেছে, কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা পরম সমাদরে সমাজপতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। পুণ্যকে তাড়াইয়া দিয়া পাপকে ডাকিয়া আনিতেছি, ধর্ম্মকে বিদায় দিয়া অধর্ম্মকে গৃহে তুলিতেছি, দেবতাকে ত্যাগ করিয়া দানবকে পূজা করিতেছি। এ সমাজের পতন হইবে না ত কোন্ সমাজের পতন হইবে। কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, দেশের জলবায়ু ফিরিয়াছে, ভগবান্ বহুকষ্ট দিয়া—বহুশিক্ষা দান করিয়াছেন। দেশের সৌভাগ্য, দেশবাসী এখন তাহাদের কল্যাণ অকল্যাণ ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছে। দিন দিন নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে, রঘুনন্দনকে রম্ভা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকগণ বিদেশ গমন করিতেছেন ও যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেশের আশাস্থল যুবকগণ তাঁহাদিগকে আদরে হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে টানিয়া লইতেছে। এ মতের পরিবর্ত্তনে বৃথা শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ নাই, হিমালয় হইতে যে নদী সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে অর্দ্ধপথে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা মূর্খের কার্য্য ভিন্ন কিছুই নহে। হিন্দুসমাজপতিগণ! আপনাদিগকে করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতেছি আর বিলম্ব করিবেন না—দ্রুতবেগে ভগবৎআদিষ্ট পথে রওনা হইয়া আসুন—পুষ্প চন্দন লইয়া বিদেশ প্রত্যাগমনকারিগণকে গৃহে তুলিয়া লউন, নচেৎ দেশের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভগবানের আদেশ লঙ্ঘনরূপ মহাপাপে পাতকগ্রস্ত হইবেন, প্রতি পদে অপমান লাঞ্ছনা

ভোগ করিতে হইবে, যতই বিলম্ব করিবেন মুখ দেখান ততই ভার হইয়া উঠিবে। মনে হয় শুধু আহার বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির উন্নতি মার্গের অর্গলস্বরূপ হইয়াছিল। খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে করিতেই দেশটা অধঃপাতে গেল। শাস্ত্রে কত উদার মত আছে কিন্তু সমাজ শাস্ত্রানুমোদিত পথে পরিচালিত হইতেছে না বলিয়াই সমাজের এ দুরবস্থা। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াও বৃথা। লোকাচারের অনুকূল মত যে কোন সংস্কৃত ছন্দেও কবিতায় আছে—উহাই শাস্ত্র উহাই বেদ উহাই ধর্ম্ম উহাই পালনীয়। যিনি উহার প্রতিবাদ করিবেন, তিনিই ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক পাষণ্ড সমাজ বিপ্লবকারী বলিয়া অভিহিত হইবে। মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে :—

আৰ্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

২৫৩ শ্লোক, মনু।

"যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে,—শূদ্রের মধ্যে ইঁহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্ম সমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ কথাই বলিতেছেন :—

শূদ্রেষু—দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিত স্তৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১৬৮। যাজ্ঞবল্ক্য।

পরাশর এবং যমসংহিতাও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন :—

"দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

২০ শ্লোক যমসংহিতা। পরাশরসংহিতা ২০ শ্লোক।

এইত শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে হিন্দুসমাজ কি এই বিধি মানিতে প্রস্তুত আছেন? ইহাদ্বারা বেশ অনুমিত হয় হিন্দুসমাজ আর শাস্ত্র কথিত পথে চলিতেছে না—লোকাচার স্ত্রীআচার দেশাচার তাহাকে যেমন চালাইতেছে—যেমন নাচাইতেছে সে তেমনি চলিতেছে, তেমনি নাচিতেছে। শাস্ত্রীয় মত অধিক প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। অধিক দিনের কথা নহে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাত্মা নিত্যানন্দ দেব সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক বংশীয় উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। এসম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিয়াছেন—"উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অম্বিকানগরে উপনীত হইয়াছেন। তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধাদেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয়—আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্ন :—"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ?

উত্তর :—প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥

প্রশ্ন :—তারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম, কোথায় বসতি॥

উত্তর :—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি, করিনু স্বীকার॥

বৈশ্য কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি॥

*   *   *

সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

পুরাণ সংহিতা মহাভারত ও ইতিহাস হইতে আমরা এইরূপ প্রমাণ আরও প্রদর্শন করিতে পারিতাম কিন্তু বাহুল্যভয়ে নিবৃত্ত থাকিলাম। আপনাদের মধ্যে সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ত্রৈলিঙ্গস্বামী বিশুদ্ধানন্দস্বামী ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিম্ন-শ্রেণীস্থ হিন্দুজাতীর অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক কালের দয়ানন্দ সরস্বতী, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারক স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমৎ প্রেমানন্দভারতী প্রভৃতি ভারতের উজ্জ্বল মণি স্বরূপ মহাপুরুষগণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে সঙ্কীর্ণমত পরিত্যাগপূর্ব্বক উদার মতই পোষণ করিয়া গিয়াছেন। জগতের কোন মহাপুরুষই বলেন নাই যে, "অমুকে নীচ জাতীয়—অমুকের হাতে অন্ন পানীয় গ্রহণ করিলে আমার জাত যাইবে ও স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিবে।"

ফলতঃ বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিবাহ আহারাদি ও খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে এরূপ আঁটাআঁটি ও গোঁড়ামি ভাব এবং সঙ্কীর্ণ নীতি প্রাচীন আর্য্যদিগের

সময়ে কখন ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, যখন পরস্পরের মন হিংসার হলাহলে জর্জ্জরীত হইয়া উঠিল, বিদ্বেষের ভীষণ বহ্নি যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন হইতেই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি ও আহারাদির নিয়ম উঠিয়া গেল। (১) বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই ? নিতান্ত শত্রুতাভাব দ্বেষাদ্বেষী হিংসা-হিংসি না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধ রচিত হয় না! দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে যখন মনান্তর উপস্থিত হয়, যখন কোন কারণে প্রবল বৈরভাব জন্মিয়া উঠে তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দেয়। পরস্পরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ বিশেষ প্রণয় ও সদ্ভাবের চিহ্ন। যেখানে সদ্ভাব নাই ভালবাসা নাই প্রণয় প্রীতি নাই বন্ধুত্ব অনুরাগ নাই, সেখানে কেহ আহারাদি ও বিবাহাদি করে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, দুইখানি গ্রামের মধ্যে বিরোধ—দলাদলি বা অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ উঠিয়া যায়। প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্য্যদিগের পরবর্ত্তী সময়ে বা সংহিতাদিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেও এই কারণেই আহার বিহার ও বিবাহাদি আদান প্রদান রহিত হইয়া গিয়াছিল। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ঘৃণা অসূয়া বিদ্বেষ অসদ্ভাব বিরোধ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, পরে আমরা তাহা বিষদরূপে আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ সপ্তম অধ্যায়ে তাহা দেখিতে পাইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—"এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র

---

(১) বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত "জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই, আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই।" (১)

যাঁহারা শুচি-ধর্ম্মের নামে স্বীয় পরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর হাতে পর্য্যন্ত খান না—তাঁহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাঁহারা সংসারের বাহির, সমাজের বাহির। তাঁহারা মনে করেন, খাদ্যদ্রব্য অন্যকে ছুঁইতে না দেওয়ার মত ধর্ম্ম নাই। ইঁহারা ছুঁৎরোগগ্রস্ত। কিন্তু যাঁহাদিগকে জীবনসংগ্রামে কর্ম্মের তাড়নায় সারা ভারতবর্ষ বা সমগ্র বিশ্ব পর্য্যটন করিতে হয়—তাঁহাদিগকে ত ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাড়াবাড়ি করিলে চলে না। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ধর্ম্ম বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলিতে পারে। সমাজপতিনামক শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের কর্ত্তব্য—খাদ্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করা। অনুদার ব্যবস্থাদাতাকে এ যুগে আর কেহ মানিবে না। যাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন—তাঁহারা কেহই পাঁতি লইবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দুয়ারে ধন্না দিতেছেন না। দেখিতে হইবে—খাদ্যবস্তুগুলি যেন হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস না করে; অখাদ্য যেন কোন হিন্দু না খান। সব জাতিই যেমন খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে, হিন্দুকেও তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? ভারতে মুক্তির হিল্লোল বহিয়াছে। এ সময় কোন প্রকার অনুদার বিধি নিষেধের দোহাই দিলে কেহ তাহা মানিবে না। ভারত তর তর বেগে উন্নতির পথে ছুটিয়াছে—এ সময় পশ্চাৎ দিক হইতে ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিধি নিষেধ দিলে কেহই তাহা শুনিবে না—লাভের মধ্যে শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িবে মাত্র।

(১) উদ্বোধন; ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতিভেদোৎপত্তির কারণ।

জাতিবিভাগের কারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষসম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"এ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সফলা শস্য-শ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহার সামগ্রী যোগাইতেন, হিংসা দ্বেষ লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফল-মূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই সুখ শান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোনও প্রয়োজন হয় নাই।

সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—"বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।"

"যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থেই স্বীকার করিতে হইবে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন।"

"যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ, হিমালয়ের তুষার শিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার, বলবীর্য্য সঞ্চার ও সাত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন তাঁহারাই শেষে "ক্ষত্রিয়" উপাধি লাভ করিলেন। পুরাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে। ওজঃ বা বীর্য্য রজোগুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।

"ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই বিশ্‌ বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল স্থানে বিশ্‌ শব্দের অর্থ প্রজা সাধারণ;—উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিকই বেদ সংহিতার পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, যে সময়ে সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল তখনও বৈশ্য নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি গোরক্ষা সুজল ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিত তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। বেদস্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তি প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাঁহারা নিরত থাকিতেন তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজ্য ও জনপদের অধিকারী ও বলবীর্য্যশালী, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখ শান্তির জন্য যাঁহারা কৃষি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ

বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পূর্ব্বভাগে ৮ম অধ্যায়ে বৈশ্যবর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হইয়া কেবল মাত্র সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশস কর্ম্মে নিযুক্ত কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য। বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। শস্য পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

"ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয় ত্রেতাযুগের শেষ ভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বৈশ্য সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোক—জীবিকার হেতু বৈশ্য (বৈশ্যের লোক জীবিকার হেতু কৃষি আদি), উরুই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট পুরুষের উরুদেশজাত এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।"

"পুরাণে ইতিহাসে বৈশ্যসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন"—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে শান্তচিত্ত, তেজস্বী-কর্ম্মী ও দুঃখী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্রগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেন।”

“দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম—তাই শূদ্র বিরাট পুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন।”

চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ সম্বন্ধে আগ্রার নিম্ন আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর লালা বৈজিনাথ বি, এ, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ “Fusion of subcastes in India”য় লিখিয়াছেন :—

The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally by Brahma, men have in consequence of their acts, become fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship * * * * * those Brahmans possessing the attribute of Rajas (passion) became possessed of the attributes of goodness (satwa) and passion and took to the practice of rearing of cattle and agriculture, became Vaisyas. Those Brahman again, who were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessing the attribute of darkness (tamas) became Sudras. Separated by occupation, Brahmans became members of the other three orders (Mahabharata, Mokha Dharma, Chap. 118). "Neither birth, nor study nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata,—Van Parva—Chap. 313 Vers 103.)

জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত মনে ধারণা হইয়াছে—আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বে আর্য্যগণ একবর্ণ ও এক জাতীয় ছিলেন। আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদিগের বহুবর্ষব্যাপি সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহাদের প্রায় সকলেই অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দিবাবসানে ক্লান্তশ্রান্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ সমাধা করণান্তর গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন।

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও ক্লান্তি অপনোদনকারী কোনও দাস দাসী বা চাকর বাকর তখন ছিল না—কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন জাতিভেদ হয় নাই সকলেই একজাতীয় ছিলেন। কেবা হস্তপদ প্রক্ষালনের জল, বসিবার আসনাদি প্রদান করিবে, কেবা তাল বৃন্তে ব্যজন করিয়া ক্লান্তি আপনোদন করিবে, কেবা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবে, রন্ধনের উপাদানাদিই বা কে প্রস্তুত করিয়া দিবে, বহুবর্ষব্যাপি যুদ্ধের খরচ পত্রই বা কিরূপে নির্ব্বাহিত করিবে, বিজিত ভূমিখণ্ড চাষ আবাদ করিয়া কেই বা শস্য উৎপাদন করিবে, যুদ্ধের ও দৈনন্দিন জীবনের অস্ত্রশস্ত্র আসবাব আদিই বা কে প্রস্তুত করিবে—অধিকৃত জনপদই বা কিরূপে শাসিত হইবে—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হন। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গুণ, কর্ম্ম ও শক্তি অনুযায়ী তাঁহারা নিজেরাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী মন্ত্রণাকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল ও যুদ্ধকার্য্যে অপটু ছিলেন তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীর নাম হইল ব্রাহ্মণ।

ইঁহারা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত ও অন্য তিন বর্ণের পরামর্শদাতা হইলেন। অবশিষ্ট আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ মহাবলশালী কষ্টসহিষ্ণু অনলস মহাবীর্য্য সম্পন্ন তাঁহারা

পৃথক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করা, অধিকৃত জনপদ শাসন করা, অপর তিন শ্রেণীকে রক্ষা করা ইহাঁদের কার্য্য হইল ইঁহারা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। অবশিষ্ট আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রচুর বলশালী নহেন, যুদ্ধে ভীত অথচ শিল্পকার্য্যে ও ব্যবসা-বুদ্ধিতে সুনিপুণ, কৃষিকার্য্যে দক্ষ, বাণিজ্যপটু তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—ইঁহাদের নাম হইল বৈশ্য। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন, ধন সম্পদ যুদ্ধোপকরণ টাকাকড়ি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন, গোরক্ষা, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা ইঁহাদের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা স্বভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি সামর্থ্যহীন, যুদ্ধে অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ উপার্জ্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে অক্ষম তাঁহারা আর কি করিবেন,—উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পরিচর্য্যা ও সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শূদ্র বলিয়া কথিত হইলেন।

এইরূপ ভাবে সর্ব্ব জাতির সুখ সুবিধা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাতি বিভাগ করিয়া আর্য্যগণ অত্যল্পকাল মধ্যেই এক অমিত পরাক্রমশালী জাতিরূপে পরিগণিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববিষয়ে উক্ত তিন শ্রেণীর পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আরাধনা নানা প্রকার যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণকে সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়-গণ আবার অপর পক্ষে নিশ্চিন্তচিত্তে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক দিন দিন নব নব রাজ্য স্থাপন এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সর্ব্বপ্রকার বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রক্তদান ও জীবনদান করিয়া তিন শ্রেণীকে রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিলেন। বৈশ্য শ্রেণীও খাদ্য, ধনৈশ্বর্য্য, যুদ্ধোপকরণ,

অস্ত্র, শস্ত্রাদি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য বাণিজ্যাদি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রগণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তিন শ্রেণী দ্বিজবর্ণান্তর্গত হইলেন। পরবর্ত্তী শূদ্র সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের রক্ষার ভার আহারাদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার প্রতিপালনের ভার ভরণ-পোষণের ভার উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণী গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা কোনও শ্রেণী কোনও শ্রেণীকে ঘৃণা বা বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। কেননা ইঁহারা নিজেরাই এমন ভাবে বিভক্ত হইয়াছিলেন যে ইঁহাদের কোনও শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত কোনও শ্রেণীর চলিবার উপায় ছিল না।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণকে বাদ দিয়া ব্রাহ্মণের জীবন বা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব ছিল, বৈশ্যেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রগণের সাহায্য ভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় ছিল না এবং শূদ্রগণেরও উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপায় ছিল না। ইঁহারা প্রত্যেক শ্রেণী অপর তিন শ্রেণীর দ্বারা উপকৃত হইতেন এবং তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় জাতিভেদ তৎকালে ছিল না ও কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নানা শ্রেণীতে গমনাগমন করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকর্ম্মা হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীভূত হইয়া যাইতেন। এইরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র, বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এবং শূদ্র সন্তান যথাক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী ভুক্ত হইয়া যাইতেন। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান

কালের ন্যায় ব্রাহ্মণের পুত্র—যে ব্রাহ্মণ হইবেন তা তিনি বৈশ্যকর্ম্মাই হউন বা শূদ্রকর্ম্মাই হউন,—এরূপ অদ্ভুত যুক্তি বা শাস্ত্র তৎকালে ছিল না।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস দেবকে বলিতেছেন ঃ—

"পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্রঋক, গাই সামগান,
আসিল ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য বা কেহ;
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন—
কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ বা মস্তক;
আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ—মূরতি প্রীতির,
করিতেছে চারিখণ্ড প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে শোণিত প্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?
নাহি দিবে যারা প্রভো, ভবিষ্যৎব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূদ্রে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবি রাখিবে যাহারা
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,

বি, এল; পি, আর, এস্; মহোদয় জাতিভেদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথা কবিকপোল কল্পিত উপমাত্মক মাত্র। দোষগুণ অনুসারে ব্যবহার ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে পুরাকালে বর্ণ নির্ণয় হইয়াছিল।" (১)

"ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ" শ্লোকটীর একটী সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা কাব্যসুন্দরী দেবসুন্দরী সাহিত্যচিন্তা কাব্যচিন্তা সমাজচিন্তা সমাজতত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ৺পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—"যাহা বিরাটের মুখ তাহাই ব্রাহ্মণ, যাহা বাহু তাহাই ক্ষত্রিয়, যাহা উরু বা মধ্যভাগ তাহাই বৈশ্য, যাহা পাদ তাহাই শূদ্র। এস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিতে একজন ব্যক্তি মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি অর্থে বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব যুক্ত লোক সমষ্টিই ব্রহ্মার কায়া। যাহা ব্রহ্মার কায়া, তাহা শুধু আর্য্য জাতিতে নহে, শুধু অনার্য্য জাতিতে নহে, সমস্ত লোক-মণ্ডলীতে যাহা আছে, তাহাই ব্রহ্মার কায়া। ব্রহ্মা শুদ্ধ জাতি বিশেষে আবদ্ধ নহেন; সর্ব্বজাতিতে তিনি বিদ্যমান।"

শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ ভারতী মহোদয় উক্ত শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—তবে তাঁহার ব্যাখ্যা আরও বিষদ আরও সংস্কৃত আরও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সুধীবৃন্দের বিচারের জন্য তাহাও এস্থলে লিখিত হইল।

তিনি বলিতেছেন :— * * * * "পুরুষ সূক্ত রূপকে পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উহা বিরাট পুরুষের বর্ণনাও নহে, প্রজাপতির বর্ণনাও নহে, রাষ্ট্র পুরুষের বর্ণনা মাত্র। সমাজের বর্ণনাই এই ঋকের অর্থ।

(১) নমঃশূদ্র সমস্যা:—বসুমতী।

ব্রাহ্মণ তখনকার সমাজে মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ। জ্ঞান প্রকাশ ব্রাহ্মণে, সুতরাং তদভাবে সমাজ নীরব; বল ক্ষত্রিয়ে তাহা না হইলে সমাজের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পায়। কৃষি-বাণিজ্য বৈশ্য বল, তাহা না থাকিলে সমাজ ভগ্ন-উরু, দাঁড়াইতে পারে না। পরিচর্য্যা শূদ্র কার্য্য, তাহা না থাকিলে, সমাজের হস্ত পদ মস্তিষ্ক সবই অপরিষ্কৃত রুগ্ন ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, তাহার সেবা শুশ্রূষা চাই। এইত গেল ঋকের প্রকৃত অর্থ, এখন টীকাকার ভাষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, এ ঋক্ আধুনিক। সকলেই ব্যাখ্যা করিতে গোঁজামিল দিয়াছেন। বেদের বর্ণিত বিরাট পুরুষ জিনিষটা কি, এ বিষয় যাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই বলিবেন, ব্রাহ্মণ জাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারে না। কেবল ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি মানবের দ্বারা যদি বিরাট মূর্ত্তি কল্পিত হয় তবে স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত কাহার বাটী যাইবে? অতএব ব্রাহ্মণ মুখরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এরূপ অর্থও দর্শন শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিরাট পুরুষের বর্ণনা বহু পুরাণে আছে, বেদান্তাদি দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ হইতে বড় বিভিন্ন। ঐ মন্ত্র—পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত নয়, উহা কোনও মতে জাতিভেদের প্রমাণ রূপে পুরুষ সূক্তে প্রক্ষিপ্ত। বিরাটের সহিত উহার সম্বন্ধ বলিতে গেলে বিরাট বহুবিধ হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ যদি টীকাকারদিগের মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলেও উহা অর্থাৎ মুখ দিয়া, হাত দিয়া, অপূর্ব্ব জীবোৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব-শরীর-নির্ম্মাণ-প্রণালী ও জগতের পূর্ব্বতন অবস্থা বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যজাতির জ্ঞান এত তিরস্কৃত, এরূপ বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়।" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, মহাশয় বলেন—

"আমাদের বেদে আছে যে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ যখন ভারতবর্ষের বাহিরে নাই এবং বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত যখন ভারতবর্ষেই শেষ হইল, তখন আর পৃথিবীর অপরাপর জাতির জন্য অন্য কোন অঙ্গ বাকী রহিল না। এ যুক্তি নিতান্ত অসার নিতান্ত ভ্রমাত্মক।" মেদিনীপুরের অত্যুজ্জ্বল রত্ন কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষ "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার" স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ; জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমিই জাতিভেদের কর্ত্তা, কিন্তু আমাকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না"। * * * * * * * * "আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় নাই, যখন আমি সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তবে আমি হিন্দুসমাজে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম সেই শক্তি প্রভাবেই কাল সহকারে সমাজ মধ্যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্ত্তা।" * * * * * কাল সহকারে হিন্দু সমাজের কলেবর ও আয়তন বর্দ্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে যেগুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যত দিন কৃষি কার্য্যে আর্য্যগণের সুবিধা থাকে, তত দিন সকলেই কৃষক হয়, আবার অধিক লোকে কৃষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন

আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করে। এইরূপে যুদ্ধ বা বিগ্রহের সময় কৃষকদের বিনাশ হইয়া গেলে কে কৃষিকার্য্য করিবে তাহার নির্ণয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ঘটে। অন্য অন্য দেশেও এইরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে। সর্ব্ব দেশেই এ অসুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোক বলবান্ হইয়া অন্য অন্য শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাখে। যখন যুদ্ধজীবিগণ বলবান্ হয়, তখন শ্রমজীবিদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। হিন্দু সমাজেও বোধ হয়, অনেক বার এইরূপ এক শ্রে র উন্নতি ও অন্য শ্রেণীর অবনতি হইয়াছিল। বহুবার এরূপে বহু প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া হিন্দু সমাজ দেখিল শ্রেণী বা জাতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও সীমা না থাকিলে, সকল শ্রেণীরই অবনতি ও অসুবিধা হয়। এজন্য সকলের সম্মতি ক্রমে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমান রূপে বণ্টন করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার করা হইয়াছিল।

প্রথমে ব্রাহ্মণ। ইহার সুবিধা কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, সকলের নিকট পূজা ও সম্মাননা গ্রহণ; শাস্ত্র পাঠে অধিকার। ইহার অসুবিধা কি কি? অহোরহঃ মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র্য, সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিতৃষ্ণা; এক বেলা ভোজন; পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস। তাহার পর ক্ষত্রিয়;—ক্ষত্রিয়ের সুবিধা কি কি? রাজ্য ভোগ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার। ক্ষত্রিয়ের অসুবিধা কি কি? সর্ব্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা, রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক সঞ্চালনা ও চিন্তা, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস।

তাহার পর বৈশ্য, বৈশ্যের সুবিধা কি কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার। ইহার অসুবিধা কি কি? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস।

তাহার পর শূদ্র। শূদ্রের সুবিধা কি কি? নির্ভাবনা, গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে ভাবনারাহিত্য; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক স্বচ্ছন্দতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্ভবপর। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন। বৈশ্য বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ দুর্ব্বিপাক একবারেই অসম্ভব। শূদ্র চিরকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন। শূদ্রের অসুবিধা কি কি? দারিদ্র্য, অন্যের সেবা, শারীরিক পরিশ্রম। একটি তালিকা এই চারি বর্ণের সুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছি।

বর্ণ	শারীরিক সুখ	মানসিক সুখ	সুখের সমষ্টি
ব্রাহ্মণ	০	২	২
ক্ষত্রিয়	১	১	২
বৈশ্য	১	১	২
শূদ্র	২	০	২

ইহাদের মধ্যে শূদ্র সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণের সুবিধা ও অসুবিধা যে সমান অংশে বণ্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। * * * * * * এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সেই তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম। দয়া, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য সত্বগুণের ফল। পরদ্রোহ, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন, রজোগুণের ফল। হিংসা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমোগুণের ফল। সত্বগুণে লোক সকল পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন। রজোগুণে লোক সকল সদুপায় বা অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস

পান। তমোগুণে লোক সকল অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময়।

রজোগুণের কার্য্যমালা কখনও বা পুণ্যময় কখনও বা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। তমোগুণের কার্য্যমালা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণ প্রধান ইঁহাদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের মধ্যে রজো গুণ প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুইটী শ্রেণী থাকিতে পারে যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্ত্বগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে, এবং যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের মনে তমোগুণ প্রধান। ইঁহাদের মনে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ থাকিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যদিগের (শুধু হিন্দু জাতিকে নহে) চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সত্ত্ব প্রধান, সত্ত্বরজোময়, রজস্তমোময় ও তমঃপ্রধান। এই চারি প্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসা অবলম্বন করিবে। সত্ত্ব প্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিবে। যাহারা সত্ত্ব রজঃ প্রধান তাহারা শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধ্যয়ন, প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্তমঃ প্রধান, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য অবলম্বন করিবে।

আর যাহারা তমোগুণ প্রধান, তাহারা ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অন্য সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অন্যের প্রভুত্বে থাকিবে। এইরূপে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, যাঁহারা সত্বরজোগুণ প্রধান তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা রজস্তমোগুণ প্রধান তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা তমঃপ্রধান তাহারা শূদ্র হইবেন।" (১)

এতৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ; মহাশয় বলেন :—* * * * "এখন একবার কল্পনাতে তৎকালীন আর্য্য সমাজের অবস্থা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করুন। একদিকে দেখুন, একদল দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট বিদেশী লোক আসিয়া পঞ্চনদের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্ব বাহুবলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করিয়া আপনাদের গ্রাম জনপদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন, কৃষি বাণিজ্যের আয়োজন করিতেছেন, অরণ্য সকল নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র সকল বিস্তার করিতেছেন; উপনিবেশের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্য ভূমি সকলে মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতেছেন; এবং আপনাদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আর এক দিকে দেখুন পরাজিত আদিম অধিবাসিগণ পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপর উপদ্রব করিতেছে। আর্য্যেরা যাহাতে বিরক্ত হইতেন এই সকল অসভ্য দস্যুগণ তাহাই করিতেছে। আর্য্যেরা ইহাদিগকে আমমাংস ভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন সুতরাং ইহারা দুষ্টামি করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ ভূমিতে আমমাংস প্রভৃতি বর্ষণ করিতেছে; হঠাৎ বনাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাদের রমণীদিগকে পথে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা প্রাচীন যে সকল পৌরাণিক

(১) গীতারহস্য।

কথাতে ঋষিদিগের উপর রাক্ষসদিগের উপদ্রবের বিবরণ শুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক যখন প্রতিনিয়ত দস্যুগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল এবং তাহাদের ভয়ে সুখশান্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা আর্য্যদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তখন আর্য্যগণের আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা লোক বাছিয়া আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইঁহারা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ক্ষত্র শব্দের অর্থ—যাহারা ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনার চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্র প্রভৃতি প্রভেদ ছিল না, কর্ম্মভেদ বশতঃ এই সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে একমাত্র জাতি ছিল, তাহা হইতে ক্ষত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল ইহার একটী প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া হইয়াছে। আর একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসিৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।

অর্থ—"অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না—সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।" যাঁহারা বেদ বা স্মৃতি কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ব্রহ্ম শব্দ ব্রাহ্মণ অর্থে ভূরি ভূরি স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে; এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। উপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এতদ্দেশে উহা বেদ বলিয়া আদৃত, সুতরাং দেখুন আমি জাতিভেদের যে বিবরণ দিতেছি তাহার প্রমাণ বেদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেখুন তবে কেমন করিয়া প্রাচীন আর্য্য সমাজের শূদ্র ও ক্ষত্র জাতির সূত্রপাত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবশিষ্ট আর্য্যগণ কি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোককে একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। সে কার্য্যটী কি? আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, যে সময় বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল, সে সময় ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত। আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহার পূর্ব্বাবধিই তাঁহাদের মধ্যে সোম যজ্ঞ ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান পারসীকদিগের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা প্রভূত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান হিন্দুগণের ও বর্ত্তমান পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে একত্রে বাস করিতেন। সুতরাং অগ্নির উপাসনাদি সেই সময়কার ধর্ম্মানুষ্টান হইবে। যাহা হউক অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অগ্নির উপাসনাদি ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয়। আর্য্যেরা যখন অত্যুন্নত গিরিমণ্ডিত, বহুনদ পরিধৌত ও শস্যশ্যামলক্ষেত্র-পূর্ণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন এখানকার প্রকৃতির গম্ভীর ও মনোহর ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্তে কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা ঊষাকালে নবোদিত সূর্য্যের তরল কিরণচ্ছটা দ্বারা অনুরঞ্জিত নীলাকাশ দেখিতে লাগিলেন, যখন নিদাঘের প্রখর তাপের পর প্রাবৃট কালের নব মেঘমালার ঘন নীলিমা প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ বন্যাসমূহের কল্লোলিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়সাগরে অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল এবং মন্ত্রের পর মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল।

ঋগ্বেদ এই সকল কবিত্ব-রসপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমষ্টি মাত্র। ইহার স্থানে স্থানে কবিত্ব কি সুন্দর! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের

শক্তি! কি হৃদয় মুগ্ধকর মানব প্রাণের স্বাভাবিক ছবি! বেদমন্ত্রকার কবিগণ বর্ষাকালের ভেকের ক্রো কা ধ্বনির মধ্যেও এক প্রকার অপূর্ব্ব মাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল বেদমন্ত্রকে কবির কবিত্ব বল, বিহঙ্গমের স্বাধীন কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি বল, সৌন্দর্য্য-মোহিত মানবহৃদয়ের উচ্ছলিত ভাবরাশি বল, তবে ঠিক বলা হইল; কিন্তু শাস্ত্র বল, ধর্ম্মোপদেশ বল, লৌকিক কি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা বল, ঠিক বলা হইল না। যাহা হউক আর্য্যগণ পুণ্যারণ্য ভারতক্ষেত্রে যখন তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন—তখন তাঁহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং এক শ্রেণীর লোককে যত্নসহকারে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত। ইহাঁরা বালককাল হইতে ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতেন। যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্যের সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আপনার পল্লীগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান দেখিয়া থাকিবেন, ইঁহারা বর্ণজ্ঞান বিহীন, সংস্কৃত ভাষা বিন্দুবিসর্গ জানেন না—অথচ ইহারা দশকর্ম্মান্বিত, অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়—তাহার সমুদয় প্রকরণ ইঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করুন পিতৃশ্রাদ্ধ কিরূপে করিতে হয়? অমনি ইঁহারা শ্রাদ্ধের মন্ত্র সকল অনর্গল বলিয়া যাইবেন। 'মধুবাতা ঋতায়তে' প্রভৃতি মন্ত্র সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক যেরূপ শিখিয়াছেন অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশকর্ম্মান্বিত লোক দৃষ্ট হয়, প্রাচীন আর্য্য সমাজের বেদমন্ত্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই উত্তরকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ যিনি ব্রহ্মকে জানেন—বা ধারণ করেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ—এক অর্থ ঈশ্বর, দ্বিতীয় অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি, তৃতীয় অর্থ বেদমন্ত্র। এখানে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ।

মনু বলিয়াছেন—

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

মনু, ১ম অধ্যায়।

"উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদমন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু।"

এইরূপে যখন প্রাচীন আর্য্যসমাজের একাঙ্গ সশস্ত্র হইয়া সমাজ রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইলেন—এবং অপরাঙ্গ বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সমাজের অপর সকল লোক——ইঁহাদেরই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল,——কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া অর্থোৎপাদনে রত হইলেন। বেদে ইঁহারা "বিশ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতে "সাধারণ" এই শব্দ ব্যবহার করিলে যেরূপ অর্থ বোধ হয়, বেদমন্ত্র সকলে "বিশ" শব্দে সেই প্রকার অর্থ। বিশ অর্থাৎ প্রজাবর্গ। এই কারণে "বিশাম্পতিঃ" শব্দের অর্থ রাজা, যিনি প্রজাদিগের প্রভু।

দেখুন তবে কেমন অপরিহার্য্য কারণে আদিম আর্য্যসমাজ মধ্যে চারি প্রকার জাতির সূত্রপাত হয়। প্রথম যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের যে তিনটী প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয়। (১ম) নিম্ন জাতীয়দিগের অন্নপান গ্রহণ নিষেধ, (২য়) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ, (৩য়) জাতির প্রভেদ

অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা। আদিম আর্য্য-সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটীই লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রবল দলাদলি ও বৈর ভাবের ফল-স্বরূপ, সুতরাং এগুলি সামাজিক নিয়মরূপে পরিগণিত হইতে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল। বরং শাস্ত্রে এমন ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণগত নয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি, এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণত্ব প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। * * *

এখন একটী কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য-সমাজে সাধারণ শিক্ষার যেমন রীতি দৃষ্ট হয়, আদিম আর্য্য সমাজে তাহা কখনই ছিল না। অর্থাৎ এখন যেমন একটী বিদ্যালয়ে তুমি আমি দশ জন আপনাপন অবস্থা ও শক্তি অনুসারে আমাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে পারি, দশ দিক হইতে দশ শত বালক বালিকা আসিয়া প্রতিদিন শিক্ষা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত-সমাজে এরূপ বিদ্যালয় ছিল না। তখন বিদ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত এবং গুরুদিগের প্রতি কঠোর শাসন ছিল, তাঁহারা ভৃতি বা বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, পরন্তু শিষ্যগণকে অন্ন দিয়া পুষিতে হইত। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস ও গুরুগৃহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। বিশেষ তখন বর্ত্তমান সময়ের মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না; মুদ্রাযন্ত্র না থাকাতে অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম সহকারে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত সুতরাং ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না। যে সকল ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইতেন, বহুদূর হইতে শিষ্যগণ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিত। এইরূপ অবস্থায় যাঁহার যে বিদ্যা ছিল তাঁহার নিজ বংশীয় বালকদিগকে শৈশব অবস্থা হইতেই শিক্ষা দেওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে

তাহা নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়। এই সকল কারণেই দেখিতে পাই এ দেশে সকল প্রকার বিদ্যাই কৌলিক হইয়া যায়। এখানে নৈয়ায়িকের ছেলে নৈয়ায়িক, স্মার্ত্তের ছেলে স্মার্ত্ত, দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদ্যের ছেলে বৈদ্য। যিনি যখন যে বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহা নিজ বংশধরদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আপনারা এই বিষয়টী স্মরণ রাখিলেই কিরূপে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দেশ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাতে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাদের বংশ পরম্পরাতে থাকিল,—যাঁহারা বেদমন্ত্র সকল রক্ষা ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কার্য্য তাঁহাদের কৌলিক কার্য্য হইল,—যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা আপন আপন সন্তানদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এমন কি আপনাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে বিদ্যা এ প্রকার কৌলিক হয়, লোকে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ও তদুপরি অপরকে সহজে অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না? আপনারা সমাজ মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, সুতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য আর ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। যখন বেদমন্ত্র রক্ষকগণ আপনাদের কর্ম্মের জন্য গৌরব ও স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষক ক্ষত্রগণ স্বীয় কার্য্যের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন অল্পে অল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান কঠিন নিয়ম সকল দেখা দিল।”

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন:—“আদিম কালে কৃষি যাজন যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা

রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামল শস্য ভরা প্রভূত ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম, আত্ম-জীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্ররচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেব মূর্ত্তিও ছিল না, দেব গৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না।"

তারপর আর্য্যগণ শক্তি ও সুবিধা অনুযায়ী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এক এক শ্রেণী এক এক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই কার্য্য বা ব্যবসায় বংশগত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সাধারণতঃ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি; ক্ষত্রিয় পুত্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি; বৈশ্য পুত্রগণ কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্যাদি ও শূদ্র পুত্রগণ তিন বর্ণের সেবাদি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর সাধারণ লোক অর্থাৎ বৈশ্য শূদ্রগণ পুরোহিতদিগের চরণে বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করিয়া জ্ঞানালোচনা, বিদ্যাচর্চ্চা এবং ধর্ম্মচিন্তার হস্ত ও কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিল। আবার দেহ ধন ঐশ্বর্য্যাদির ভার ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কাজেই সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঈদৃশলোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিতেরা সাধারণ লোকদিগকে মূর্খ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন, আর ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ কাপুরুষ বণিক ও কৃষকদিগের রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহার বৈশ্য ও শূদ্র সাধারণ দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ক্রমবিকাশ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত Hindu civilisation under British Rule গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"Blind followers are always the most thorough going and the most zealous, outside the narrow and secret precincts of an interested group of Brahmans, there was no one now to dispute or even question their authority ....Whatever the Brahmans now uttered or wrote was accepted as an infallible truth. If any Brahman wanted to countenance a particular tribe, he had only to declare that it was sanctioned by the Sastras. But whether he was right or wrong, whether he had mis-interpreted or not, very few were in a position to judge..........Thus sprang up an infinity of caste rules and regulations, chiefly local, some universal, but mainly something more than merely conventiona. or customary."

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে সমাজ চলিবে, রাজ্য শাসিত হইবে, সেই শক্তি তখন ব্রাহ্মণের হস্তে; তাই ক্ষত্রিয় যখন রাজা হইলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার পরামর্শ দাতা হইলেন। ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাহ্মণ মস্তক; ক্ষত্রিয় শক্তি ব্রাহ্মণ বুদ্ধি। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যে দিন দিন নিরঙ্কুশ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাই তাঁহারা তখন ব্রাহ্মণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য লোলুপ হইলেন।

শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় বলেন:—But the extravagant

pretensions of the Brahmanic priesthood were, as we also saw shortly after disputed by the other members of the Aryan community, especially the Kshatriyas."

পরে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে একটা সংঘর্ষের পরিচয় ইতিহাস সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, পরশুরাম শ্রীরাম, বেন নহুষ নিমি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম পদে বৃত হইয়াছিলেন—এবং পরে সময় সময় বৈশ্য শূদ্রও কখন কখন শক্তি ও সাধনা বলে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সম্মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সমুদ্রে বারিবিন্দু প্রায় নিতান্তই সামান্য! নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষি পরিবৃত পরিষদে শূদ্র সুত পুরাণ বক্তার পদ অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিগণকে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণাধিকার বিস্তৃত ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সাম্যভাব জলাঞ্জলী দিয়া—নিরপেক্ষ সমদর্শন ডুবাইয়া দিয়া—মনু আদি সংহিতা পুস্তকে ব্রাহ্মণেতর জাতি সম্বন্ধে সুকঠোর অনুশাসন চালাইতে লাগিলেন। শূদ্রদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

সঙ্কর বর্ণ।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আদিযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল। 'এক বর্ণ আসীৎ পুরা'। পরে গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন; এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বা সঙ্করজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে তেমন কোনও উল্লেখ নাই। মনু বলিতেছেন:—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্র নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি। ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।" সুতরাং বর্ণ-সঙ্করের কথা যাহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মনুসংহিতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে উহা অতি আধুনিক। আধুনিক না হইলে ইহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হইত। মনুসংহিতা যে অত্যন্ত আধুনিক, ইহা সুধী মাত্রেই বিদিত আছেন। এই মনুসংহিতায় যাহাদিগকে সঙ্করজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই সঙ্করজাতীয় কি না সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আমরা যথাশক্তি বিস্তারিতরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। "শুক্ল যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত হইলেও, ইহা যে আদিম কালেরই অন্যতম গ্রন্থ, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা জানা যায়। ইহার শত রুদ্রীয় নামক ষোড়শ অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু

কোনও জাতিবিভাগের উল্লেখ নাই। আদিম অধিবাসী নিষাদদিগেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরবর্ত্তীকালে এই নিষাদেরাই ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"পুরুষ মেধ" নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময়ে তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্নজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসায় ও আদিম অধিবাসীর নাম দেখিতে পাই ঃ—স্থপতি, স্তেন, স্তায়ুঃ, তস্কর, মুষ্ণঃ, কুলঞ্চঃ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের নাম), সারথি, তক্ষার (সূত্রধর), রথকার, কুলাল, কর্ম্মকার, নিষাদ। এই সমুদয় ব্যবসায়ীরা স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুত বা সারথিকে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে, তক্ষার বা সূত্রধরকে করণ পিতা বৈশ্যা মাতা হইতে, কর্ম্মকারকে শূদ্র পিতা ও অব্যক্ত মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর্য্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ প্রণয় করিবার পূর্ব্বে কুলাল, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায় আদৌ ছিল না ?

"পুঞ্জিষ্ঠের (আদিম অধিবাসী), শ্বনিন (অনার্য্য জাতি বিশেষ), মাগধ (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পুরাণে এই জাতি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতও সঙ্কর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কোন স্থানে ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণী মাতা ও কোন স্থানে বৈশ্য পিতা ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে কার্য্যকারী), পুংশ্চলু (পরদার অভিমর্ষকা), শৈলুষ (নট), খনিকার, বপ (কৃষক);* ইষুকার, ধনুষ্কার, ভিষক, জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিৎসক

ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্যা মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বলা হইয়া থাকে)। নক্ষত্রদর্শ, হস্তিপ, (মাহুত), অশ্বপ (সহিস), গোপাল, সুরাকার, গৃহপ (দ্বারবান), বিত্তধ (খাজাঞ্চী), অমুক্ষত্তা (চাকর), দার্ব্বাহার (কাঠুরিয়া), অগ্ন্যেধ (আলোওয়ালা), অভিষেক্তা (পাচক), পরিবেশনকর্ত্তা, পেশিত (চিত্রকর), প্রকরিতা (খোদাইকর), উপসেক্তা (স্নানকারক), উপমন্থিতা (তৈল মর্দ্দনকারী), বাসপুলালী (রজক), রজায় স্ত্রী (রঙ্গদার), স্তেনহৃদয় (নরসুন্দর), ক্ষত্তা (সারথী), চর্ম্মম্ন (চর্ম্মকার), ধৈবর, কৈবর্ত্ত (ইহাদিগকেও পুরাণে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। কিরাত (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পৌল্‌কস (অনার্য্য জাতি বিশেষ), দুর্মদ, ভিমল (অনার্য্য জাতি বিশেষ)। আভির বা গোপাল, রজক, নরসুন্দর, সারথী, চর্ম্মকার, ধীবর, কৈবর্ত্ত ইত্যাদিদিগকেও পুরাণে ও সংহিতায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরিউক্ত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আভিরকে গোপ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে, চর্ম্মকারকে আভির পিতা বৈশ্য মাতা হইতে, ধীবরকে গোপ পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে, নটকে মালাকার পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অনার্য্য জাতি এবং কতকগুলি ব্যবসায়ের নামমাত্র ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক, বোবা, অন্ধ, কালা এবং কতকগুলি অন্যান্য নানারকম নামোল্লেখও আছে। মাগধ, নিষাদ, ভীমল, মৃগয়ু, এবং শ্বনিন্ প্রভৃতিরা অনার্য্য জাতি। যজুর্ব্বেদের ঐ দুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্য্যজাতির ঐ সময়ে সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। কিন্তু সঙ্করজাতি-বিভাগের সহিত উল্লিখিত জাতিদিগের কোনও সংস্রব

নাই। সঙ্করজাতি উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মকার কুম্ভকার সূত্রধর সারথি রত্নাকর চিত্রকর চর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও অন্যায়। বৈদিক সময়ে যে কেবল কোন জাতি-বিভাগ ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ও ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন তথাপি তখনও বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যেরা একই জাতি ছিলেন। স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধ ব্যবসায়িগণ অবশ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে সেরূপ কোন জাতি-প্রথা প্রচলিত ছিল না; অনেক ব্যবসা বংশগত হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জানিত যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত, একই ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইত; তাহারা একই জাতীয় ইতিহাসে ও একই পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত"। (১)

"বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতাই প্রধান পুস্তক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপস্তম্ব, বৌদ্ধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অব্দের ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। পদ্য মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মনুসংহিতা অনুষ্টুপ্ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্রশাস্ত্র রচনাকালে,

(১) হিন্দু পত্রিকা।

অনুষ্টুপ্ছন্দে, বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না। এই পদ্যময় স্মৃতিগুলি প্রাচীন সূত্রশাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপরিভাগ মানব সূত্রচারণের ধর্ম্মসূত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে মনু-সংহিতা বলিয়া যে গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা ভৃগুর রচিত; কিন্তু তাহা মনুর রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।”

আমরা এক্ষণে মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণসম্মত কতিপয় প্রধান প্রধান বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ	করণ	বৈশ্য	তক্ষা বা সূত্রধর এবং রজক।
ঐ	শূদ্র	নিষাদ বা পারশব।	ব্রাহ্মণ	অম্বষ্ঠ	আভির।
ঐ	ঐ	বারুজীবী।	গোপ	শূদ্র	ধীবর ও শুণ্ড়ি
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।	মাগধ	ঐ	শেখর, জালিক।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত।			
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ, গোপ।	আভীর …	বৈশ্য …	তক্ষ বা চর্ম্মকার।
ঐ	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ।			
শূদ্র	বৈশ্য	অযোগব।	রজক …	ঐ …	ঘটজীবী।
বৈশ্য	শূদ্র	করণ।	তেলকার …	ঐ …	দোলাবাহী।
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।	নিষাদ …	শূদ্র …	পুক্কস।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	কুম্ভকার ও তন্তুবায়।	ব্রাহ্মণ …	অযোগব…	ধীগ্বান।
			শূদ্র …	ক্ষত্রিয় …	ক্ষেত্রি।
অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক।	ক্ষত্রিয় …	শূদ্র …	নাপিত, মোদক।

পিতার বর্ণ	মা‌তার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ঐ	ব্রাহ্মণ	মালাকার।	দেবল …	বৈশ্য …	গণক।
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	তাম্বুলি ও তৈলিক।	বৈদেহিকা	করবর …	অন্ধ্র।
			ঐ …	নিষাদ …	মেদ।
মালাকার…	ঐ …	নট, শাবক	বিপ্র …	ক্ষত্রিয় …	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
দস্যু …	অযোগব…	সৈরিন্ধ্র।			(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)।
স্বর্ণকার …	অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য	মলগ্রাহী (মেথর)	ক্ষত্রিয় …	বৈশ্য …	মাহিষ্য। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

"সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, অবন্ত্য, বাতধান, পুষ্পথ এবং শৈখ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝল্ল মল্ল, লিচ্ছিভী, নট, করণ, পাশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে। এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে শুধন্বান, আচার্য্য, কুরুশ, বিজানমান মৈত্র জাতি হইয়াছে।

"নীচ ক্ষত্রিয় জাতি—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, প্লভ, চীন, কিরাত, দরদ। মনু বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে জাত জাতিদিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য করা হয় নাই তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, কি আর্য্যভাষীই হউক, দস্যু নামে পরিচিত।

"মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যবসায়ের উল্লেখও আছে। সুতগণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের ভার থাকিত। অম্বষ্ঠের প্রতি চিকিৎসার ভার থাকিত। বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করিত। মাগধেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। নিষাদেরা মৎস্য ধরিত। অযোগবেরা সূত্রধরের কার্য্য করিত। মেদ, কুঞ্চু, অন্ধ, মদ্‌গুগণ বন্যজন্তু ধরিত। ক্ষত্রী, উগ্র, পুক্কশগণ গর্ত্তস্থ জন্তু ধরিত। ধীগ্‌বানেরা চর্ম্মব্যবসায়ী ছিল; বিন্‌রা

ঢাক বাজাইত। চণ্ডাল ও শ্বপচদের ধন সম্পত্তি স্বরূপ কুকুর ও গর্দ্দভ ছিল; শ্মশানে শবের কার্য্যাদি করিত। উপরি উদ্ধৃত তালিকার মধ্যে আমরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অনেকে করণ ও কায়স্থ এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে একই সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে আবার তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। কায়স্থ জাতির উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে আছে। কায়স্থ সম্বন্ধে Hindu Civilisation under British Rule এ এইরূপ আছে —"Towards the close of the Buddhist Hindu period, the term Kayastha was applied not to a distinct caste but to men who were employed as scribes and taxgatherers men who in all likelihood, belonged partly to the Vaisya and partly to the Kshatriya caste." বৈদ্যগণের সম্বন্ধেও প্রাচীন সংহিতাদি গ্রন্থে তেমন উল্লেখ নাই। মনু মাংসবিক্রেতা সুরাবিক্রেতা প্রভৃতির সহিত বৈদ্য (চিকিৎসক) সম্প্রদায়কে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

"The Modern Vaidya or physician caste does not also appear in the more ancient Sanhitas such as those of Manu and Yanjnavalka. Physicians are mentioned in those books but nowhere as distinct caste, ... Manu mentions Physicians in the same category as meat-sellers and liquor-vendors."

(Hindu Civilisation under British Rule)

"নিষাধ জাতি—ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল। মৎস্য ও মৃগাদি শিকার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। মনু তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। নিষধ নামে একটী দেশ ও একটী জাতিও ছিল।

নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন। নিষাধ ও নিষধ একই জাতির বিভিন্ন নাম বলিয়া বোধ হয়।

"উগ্র বঙ্গদেশের আগুরীরা এই উগ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল অর্থাৎ অধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র। মনু বলেন যে উগ্রেরা উগ্র-স্বভাবান্বিত ও নির্দ্দয়। যে দেশের লোকেরা উগ্রস্বভাববিশিষ্ট তাহাদিগকে আর্য্যেরা এই উগ্র নাম দিয়া থাকিতে পারেন। গহ্বরস্থ জন্তুদিগকে 'বধ করাই তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু আগুরীদের অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবসায় নাই।

"সুত—জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায় জাতি বিভাগে ঐরূপ আখ্যা পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রথচালক কেহই ছিল না এরূপ অনুমান করা কি মূর্খতা নয়?

"অযোগব—যজুর্ব্বেদে অযোগের উল্লেখ আছে। তাহারা খনিতে লৌহখননকারী অনার্য্যজাতি বিশেষ ছিল। কিন্তু মনুর অযোগবেরা সূত্রধর।

"ক্ষেত্রী—আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুতেরা যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন গোড়া হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকায়, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁহা-দিগকে সমাজে নীচ অবস্থাপন্ন করিয়া সেইরূপ একটী নামও দিয়াছিলেন। পঞ্জাবে বহুতর ক্ষেত্রী আছে। বীর শিখজাতিদিগের গুরুকুলও ক্ষেত্রী। গুরু নানক ও তৎপরবর্ত্তী অন্যতম নয়জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ

যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন।

"চণ্ডাল—অনার্য্য জাতি বিশেষ—বড়ই পরিতাপের বিষয়—সরল শান্ত ধর্ম্মশীল নমঃশূদ্রগণকে তাহাদিগের স্বজাতীয় অজ্ঞ হিন্দুভ্রাতৃগণ অযথা অন্যায়রূপে চণ্ডাল আখ্যায় অভিহিত করিয়া—তাহাদের প্রাণে গভীর বেদনা দিয়া থাকেন। কাজেই ভিন্ন ধর্ম্মী গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে চণ্ডাল সংজ্ঞাতেই গণনা করিয়া থাকেন। ১৮৯১ সালের আদমসুমারী বিবরণীতে তাহাদের সংখ্যা ১৭৬১৩৬৪ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কয় জেলাতেই অধিকাংশ বাস করে। তাহারা কঠিন পরিশ্রমী। এ প্রদেশে জমি, তাহারাই চাষ করে। মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'Ancient India' নামক গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"(শববহন ও দাহনকারী) চণ্ডালদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটী শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। প্রাচীন কালে দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হইবে না; এরূপ অবস্থায় ঐ সব জেলাতে ১৭ লক্ষাধিক চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? (১) আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী

(১) কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"তে যুক্তবঙ্গে ব্রাহ্মণ সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ এবং নমঃশূদ্রের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ বলিয়া উক্ত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শূদ্র সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন? আমরা কি অনুমান করিব যে স্ফূর্ত্তিবান্ শূদ্রেরা একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডালদিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানগুলিও যেরূপ অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্করজাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক।"

'আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইটী অসুর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদিগের দলপতি ছিল।"

"হিন্দুদিগের মধ্যে 'চণ্ডাল' এই শব্দটী বড়ই ঘৃণাব্যঞ্জক। আজকাল নমঃশূদ্রগণের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষা সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদিগের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং নানারূপে উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য ইহার ফল ও পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।"

শাস্ত্র ও কলমের খোঁচা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি। শাস্ত্রকার যদি মানব সাধারণকে হীন ভাবে চিত্রিত না করিতেন তবে কি সমাজে উচ্চ নীচ আর্য্য ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বৈষম্য উপস্থিত হইত? সে শাস্ত্রেও আবার কত গোলযোগ ও গরমিল। এই চণ্ডাল সম্বন্ধে ব্যাস সংহিতায় লিখিত আছে :—

* * * *

কুমারী সম্ভবস্তেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ ॥৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

"চণ্ডাল তিন প্রকার (১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত; (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত।"

পরাশরনন্দন ব্যাস পুনরায় বলিতেছেন :—

* * * * *

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ ॥১০
বণিক-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ ॥১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২

ব্যাস সংহিতা।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি, আর যাহারা গো-মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।"

আপনাদের সাধের সংহিতাকারগণ নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ, মালী, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ প্রভৃতিকে অন্ত্যজ জাতীয় গণ্য করিয়া বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণকেও উহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শুধু এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শাস্ত্রকার অব্যাহতি দিলেও ক্ষতি ছিল না, ইহার উপর ইহাদিগকে গোখাদক জাতির জ্ঞাতি গোত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া ন্যায়ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। অন্ত্যজ জাতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অত্রি বলিতেছেন :—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥১৯৫

অত্রি সংহিতা।

"রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী) বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে।"

"কৈবর্ত্ত—উহারা সঙ্কর জাতি নহে। যজুর্ব্বেদে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে। বঙ্গ দেশের কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা দুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্দু-দিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে। মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাবড়ায় তাহাদের অধিকাংশের বাস। এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশ্চন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, "মনুর মতে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং একই নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহস্র সহস্র অযোগব স্ত্রীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিষাদ পুরুষের সহিত মিলিত হওয়ায় যে সব সন্ততি হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একথা কি কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন?"

এইরূপে আরও কতকগুলি জাতিকে অযথা সঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বাস করা নিবন্ধন সেই সেই দেশের নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়া যায়। অভিরা দেশের লোককে আভির, উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগকে পুণ্ডরক, উড়িষ্যা দেশবাসীকে উড়, দক্ষিণ ভারতের লোককে দ্রাবিড়, কাবুলবাসীকে কাম্বোজ, ব্যাকট্রীয়ান গ্রীকদিগকে যবন, টিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারস্তবাসীকে প্লভ, চীনবাসীকে চীন, আদিম পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্ব্বতবাসীকে খস জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকট বর্ত্তমান দার্দিস্থানবাসীকে দারদ, পশ্চিম মালববাসীকে অবন্ত্য, দক্ষিণ নেপালবাসীকে লিচ্ছিভি এবং

নেপালবাসীকে মাল্ল বলা হইত। বর্ত্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ্র দেশ। অন্ধ্রগণ ঐ দেশবাসী ছিলেন।”

চারি বর্ণ ব্যতীত যে সকল সঙ্কর জাতির উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং ঐ সকল শঙ্কর জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যাহা আছে, তাহা যে যুক্তিসিদ্ধ তাহাও প্রদর্শিত হইল। উহার সকল অংশই প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্ত্তী লেখকগণের চতুরতার নিদর্শন, ইহা বেশ অনুমান করা যায়। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে সেই সঙ্গজাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। অসবর্ণ বিবাহ তৎকালে সমাজে যে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ সহ প্রদর্শন করিয়াছি এবং মনুসংহিতারও অনুকূল মত দেখাইয়াছি সুতরাং যখন অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন পিতা ও মাতার বর্ণ—পৃথকই থাকিত, কিন্তু সন্তান অন্য জাতি হইবে কেন? অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসোৎপন্ন এবং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে না, ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিতে বা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতে পারিবে না ইহা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিলে, সন্তান হইবে—নিষাদ ও বারুজীবী বা বারুই; ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎসঙ্গজাত সন্তান হইবে সুত বা মালাকার; ক্ষত্রিয় শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিলে সন্তান হইবে উগ্র, নাপিত, মোদক ইত্যাদি। অর্থাৎ মনু স্পষ্টতঃ বলিতে চাহেন যে অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান—পিতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না, মাতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না; সে ভিন্ন এক বর্ণ প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে ও ইতিহাসগ্রন্থে তো এরূপ বিধান কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। এ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত ও সম্পূর্ণ নূতন কথা।

মহাভারতে কথিত আছে, মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নুতনয়া বরবর্ণিনী

দিব্যরূপা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী ক্ষত্রিয়বংশাবতংশ মহারাজ শান্তনুর ঔরসে অমিতপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-বংশোজ্জ্বল দেবব্রত ভীষ্মকে প্রসব করিয়াছিলেন। এটী অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান, মনুর মতে পিতৃ ও মাতৃ বর্ণ না হইয়া তৃতীয় কোন পিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্য হওয়া উচিত ছিল। পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় পুত্র ক্ষত্রিয় হইলেন। ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষি যাঁহাকে জন্মদান করেন তিনিও পিতৃ সম্পর্কে ভারত-বিখ্যাত ঋষি—মহর্ষি বেদব্যাস। এটিও অসবর্ণ-উৎপন্ন সন্তান। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভারতবংশের রক্ষার নিমিত্ত বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং অপ্সরোপমা এক দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে জন্ম প্রদান করেন। এগুলিও অসবর্ণোৎপন্ন ও মাতৃ সম্বন্ধে ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ও শূদ্র হইয়াছিলেন। যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মও অসবর্ণ সম্পর্কিত, মাতৃ বর্ণে সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা গর্ভজাত যুযুৎসু নামক এক মহারথ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় দেবমীঢ় রাজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করেন। ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে বসুদেব পিতা শূর সেন ও বৈশ্য-কন্যার গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণ পিতা) নন্দগোপ জনক পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। পর্জ্জন্য মাতৃবর্ণানুসারে ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াও বৈশ্য হন। মাহিষ্য হন নাই। কাহারও কাহারও মতে দশরথ রাজমহিষী সুমিত্রা বৈশ্য-কন্যা। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকর্ম্মা বৃকোদর অরণ্যমধ্যে রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাদের উভয়েই অসবর্ণোৎপন্ন, ও পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। মনুর মতানুযায়ী ইহারা সকলে অসবর্ণোৎপন্ন বিধায় পিতৃ মাতৃ বর্ণ-ভুক্ত না হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণান্তর্গত হওয়া উচিত ছিল। মনুর মতে বিদুরকে নিষাদ বা বারুই বলা সঙ্গত ছিল।

ভৃগুর পুত্র ঋচিক, ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ

করেন। জমদগ্নি সেই সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত। জমদগ্নি, প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম উৎপন্ন হয়েন। অতএব ক্ষত্রিয় সত্যবতীর গর্ভজাত জমদগ্নি এবং ক্ষত্রিয় কন্যা রেণুকার গর্ভজাত পরশুরাম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সত্বেও উভয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—পিতৃ সম্বন্ধে; এবং সেই পরশুরাম পৃথিবীকে বহুবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পূর্ব্বে অনেক রাজকন্যার সহিত মহামুনিদিগের বিবাহ হইত ও ঐ রাজপুত্রীদিগের গর্ভে সেই সকল মহামুনির সন্তানগণ বীর্য্য প্রভাবে প্রায়শঃই ব্রাহ্মণ হইতেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভৃগু মুনির পুত্র চ্যবনের সঙ্গে রাজকন্যা সুকন্যার বিবাহ হয়। পুত্র প্রমতি ক্ষত্রিয় হন। প্রজাপতি পুলস্ত্য ঋষি তৃণ বিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করেন—পুত্র বিশ্রবা মুনিই হন। গৌতম ঋষির সঙ্গে ভর্ম্ম্যাশ্ব রাজকন্যা অহল্যার বিবাহ হয়,—পুত্র শতানন্দ ব্রাহ্মণ হন। অপুত্রক বলি রাজার স্ত্রীর ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি—ভারত বিখ্যাত অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্ম দান করেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হন। মহাবল কর্ণ সূর্য্যদেবের ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতা কুন্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অসবর্ণোৎপন্ন সত্বেও মাতৃ সম্পর্কে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু সুত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় সুত পুত্র বলিয়া অভিহিত ছিলেন। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি, মনুর তপস্যালব্ধ তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রগণ, সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মনু স্বকৃত পুত্রকেই অসবর্ণ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করিয়া সঙ্কর বর্ণ উৎপাদনে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই, তা আবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন।

জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতির পুত্র আস্তিক ঋষিই আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন।

"রামায়ণের আদি কাণ্ডে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান সিন্ধু-মুনিকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। "শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শৃণু জানপদাধিপ।" (রামায়ণ)। পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন বিশ্রবা মুনি রাক্ষস-কন্যা নিকষা সুন্দরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিনটি রাক্ষস পুত্র উৎপন্ন করেন। ইহাও অসবর্ণোৎপন্ন এবং মাতৃ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

মহারাজ যযাতি অসবর্ণ বিবাহের ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিলোম বিবাহ অনুযায়ী দৈত্যগুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হন নাই অথবা তৎপুত্রগণ পিতৃ মাতৃ বর্ণ ব্যতীত অন্য এক পৃথক বর্ণান্তর্গত হইয়াছিলেন বলিয়াও কেহ শ্রবণ করেন নাই বরং 'ইন্দ্র ও উপেন্দ্র', সদৃশ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যদু ও তুর্ব্বসু নামধেয় দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়া মহারাজ যযাতি বিখ্যাতই হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে ইঁহারা দুই ভাই অসবর্ণেরও নিকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহানুযায়ী ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে সমুৎপন্ন নিবন্ধন সঙ্কর বর্ণভুক্ত সুত বা মালাকার জাতীয় হইয়া যান নাই। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র। মনু নিজেই বীজোৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন আবার তিনিই উহা অস্বীকার করিতেছেন। বীজোৎকর্ষ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হইলে 'ক হইবে, বীজের অপকর্ষতার জন্যই শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভজাত সন্তান অতি অধম চণ্ডালের জন্ম। তিনি বলিতে চাহেন, ভূমিতে সরিষার বীজ বপন করিলে—সরিষাই জন্মিবে—তিল বা তিসি, আম বা কাঁঠাল হইবে না। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বৈশ্য কন্যা, শূদ্র কন্যা, অযোগব কন্যা বা অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভ সম্ভূত সন্তান কেন অম্বষ্ঠ নিষাদ বারুই ধীগ্‌বান বা আভির হইতে যাইবে? এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর গর্ভে বা শূদ্রার গর্ভে

উৎপন্ন সন্তানই বা কেন সূত, মালাকার, উগ্র, নাপিত বা মোদক এবং বৈশ্য-ঔরস জাত—ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা বা শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান কেনই বা বৈদেহ, তাম্বুলি, গোপল, করণ হইতে যাইবে? শূদ্রের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর সন্তান অতি নীচ চণ্ডাল হইল, কিন্তু শূদ্রের ঔরস জাত ক্ষত্রিয় কন্যার বা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান জলাচরণীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ক্ষেত্রী এবং নবশাখভুক্ত কুম্ভকার ও তন্তুবায় জাতি হইল কিরূপে? এসব ক্ষেত্রে বীজ মাহাত্ম্য গেল কোথায়?

সঙ্কর জাতির বৈজ্ঞানিকত্ব এইত প্রদর্শিত হইল। তবুও যাঁহারা ভাষ্য টীকা টিপ্পনীর দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন, বুঝিব তাঁহাদিগকে কথা দ্বারা বুঝাইবার আর উপায় নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে অসবর্ণজাত সঙ্করজাতীয় বলিয়া অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণকে জারজ বলিতে শুনিয়াছি।

তাঁহারা শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ—"ব্যভিচারেণ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" যদি তাহাই ধরা যায়, তবে বলা বাহুল্য ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে লইয়া ভারতগৌরব পঞ্চপাণ্ডব, বশিষ্ঠ নারদ শুকদেব ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ সত্যকাম, দাসীগর্ভ সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক রাজকন্যা হেলেনায় জাত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক প্রভৃতি এবং বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর সমুদয় ছত্রিশজাতি তাঁহাদের এ জারজ সংজ্ঞা হইতে নিস্তার পান নাই। অর্থাৎ তাঁহারা কলমের জোরে স্পষ্টতঃ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই জারজ সন্তান। বাপ পিতামহগণও ইঁহাদের হাতে নিস্তার পান না। ইঁহাদের পিতৃ পিতামহ শাস্ত্রকার আর্য্যঋষিগণ যদি সশরীরে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন— তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধরগণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা দর্শনে নিরতিশয় লজ্জিত হইতেন না কি? ধীবরকন্যা সত্যবতী নন্দন বেদব্যাসের বর্ত্তমানশুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুসমাজে কি নিগ্রহ ও লাঞ্ছনাভোগই না হইত, ভাবিতে কষ্ট হয়।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ব্রাহ্মণেতর সমুদয় সঙ্করবর্ণ কি বিবাহিত দম্পতির সন্তান? যদি বিবাহিতা বনিতা না হইয়া উপপত্নী হয় তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান সমাজে স্থান লাভ করিবে কেন? যে সময়ে ব্যভিচার ভয়াবহ দোষজনক, যাহার দণ্ড ক্ষত্রিয় রাজবিধানে প্রাণদণ্ড ছিল, সে সময় ব্যভিচারজাত কোটী কোটী সন্তান জীবিত থাকা কি সম্ভব? শুধু জীবিত থাকা নহে, প্রতিপত্তির সহিত সমাজের অঙ্গীয়রূপে প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে। সমাজে কি এখনও ব্যভিচার নাই? সে সকল সন্তান কি কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে? বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদি পিতা বা মাতার জাতীয় না হইল তবে অসবর্ণ বিবাহ কি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্যেই আরব্ধ হইয়াছিল?

সঙ্কর বর্ণ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ঊনবিংশ সংহিতার অনুবাদ স্থানে—সঙ্করবর্ণকে বিবাহিতা ভার্য্যা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (ঊনবিংশ সংহিতা ১৪২ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে—অনেক রাজা ব্রাহ্মণ কন্যা ও অনেক ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন—তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু নূতন কিছুই হন নাই। পিতৃ বা মাতৃ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলায় শুনিয়াছি বৈদ্য কায়স্থে বিবাহ প্রচলিত আছে—তাঁহাদের উৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবাহ প্রথাই যদি শাস্ত্রসম্মত, দেশাচারগত ও সমাজ প্রচলিত থাকে তবে সে বিবাহ-উৎপন্ন সন্তান কেন অন্য এক পৃথক বর্ণভুক্ত হইতে যাইবে? ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তিন সমাজ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক, ইহাঁদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই। কিন্তু যদি কাল ধর্ম্মে বিবাহ প্রথা আরম্ভ হয় তবে কি রাঢ়ী বারেন্দ্র উৎপন্ন সন্তান মালাকার কি কুম্ভকার হইবে? সুধিগণ, একটু চিন্তা করিলেই শাস্ত্রকারের প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। সবর্ণ বিবাহই হউক আর অসবর্ণ বিবাহই হউক

উৎপন্ন সন্তান যে অধিকাংশ স্থানেই (কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃবর্ণও প্রাপ্ত হয়) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অত্রি সংহিতায় আছে ঃ—

* * * * * * * * *

কামতস্তু প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ।

স এব পুরুষ স্তত্র গর্ভোভূত্বা প্রজায়তে ॥ ১৮৪

"যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রী (চণ্ডাল ম্লেচ্ছ শ্বপচ প্রভৃতির স্ত্রী) গমন বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে ; সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি নীচ বর্ণীয়া অবিবাহিতা স্ত্রী গমন করিলে জনক ও তজ্জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন কালের অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান কেন পিতৃ বা মাতৃবর্ণভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র আর এক বর্ণীয় (সঙ্কর বর্ণীয়) হইবে ?

"ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির সবর্ণ বিবাহজাত অসংখ্য সন্তান কি দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। শোণিত-সম্মিশ্রণ সংঘটিত নূতন জাতি না গড়াইলে বুঝি আর পারা যাইত না। * * * * * হিন্দু সমাজের বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বোধে অনার্য্য সংসর্গ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; সেই সকল অনার্য্য কুটুম্ব ও তৎসংসর্গজাত আর্য্য সন্তানেরা যাহাতে জাতিভেদের মধ্যে স্থান পান, তাহাই করিতে গিয়া এই সকল গোঁজামিল দিতে হইয়াছে। ম্লেচ্ছ যবন খশ প্রভৃতিকেও হিন্দু সন্তান করা হইয়াছে। ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতির অদ্ভুত উৎপত্তি বলিলেই উহারা আর্য্য সন্তান হইবে, তাহার অর্থ কি ? যেখানে আর স্ত্রী পুরুষ দুটী মিলান যায় নাই, সেখানে পুরুষের হস্ত পদাদি হইতেই কত জাতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের

বেনের বৃত্তান্তগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বচনেও বেণাঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছাদির উৎপত্তি বর্ণিত যইয়াছে। ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া মনু বলিতেছেন :—

শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রহ্মণা দর্শনে ন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ খরদাঃ খশাঃ॥

ক্রিয়ালোপের জন্য এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, চীন, কিরাত ইত্যাদি কি সত্যই আর্য্য জাতি? চীন কি আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি? হিন্দুর গণ্ডিতে যবন, ম্লেচ্ছ, চীনকে স্থান দিতে হইয়াছে,—গোঁজামিল আর কাহাকে বলে! কতকগুলি জাতির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ বোধ হয় তাঁহাদের ব্যবসায় অনুযায়ী করা হইয়াছিল। গোপ অর্থ গোপালক। ঐ কার্য্যটী বৈশ্যের, কিন্তু লক্ষপতি বৈশ্য কি আপনি গোপালন করিবে? কাজেই গোপালনের লোক চাই; যিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নাম গোপ। সহদেবকে ত বিরাট পুরে "গোপাল" বলা হইত। এখনকার গোয়ালের নূতন জন্ম না হইলে শাস্ত্রের মহিমা থাকে কি? শঙ্খকার তাম্বুলি, তিলি ইত্যাদির মূলও ঐরূপ। এই সকল জাতির বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসায় বাদ দিলে, অনেকাংশে একরূপ হইয়া যায়। এদেশের অনেক জাতি ব্যবসায়ে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষাদি না করায় স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি জাতির অপেক্ষা তাহারা—সুশিক্ষা দিলে, বিশেষ কোনও অংশে ন্যূন না থাকিতে পারে। এই সকল ব্যবসায় দ্বারা পৃথগ্‌ভূত জাতির জন্মতত্ত্ব শাস্ত্রানুরূপ হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ফলতঃ ব্যভিচার দ্বারা এই সমাজ সংবৰ্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অযৌক্তিক। আৰ্য্য এবং অনাৰ্য্য শোণিতের সংমিশ্রণে অধিকাংশ জাতি উৎপন্ন, উহা আৰ্য্যদের একরূপ অপরিহার্য্য বলিয়াই করিতে হইয়াছিল। অনাৰ্য্যদেশে আসিয়া অধিকাংশ আৰ্য্য তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (১)

যখন আৰ্য্যজাতির জীবনীশক্তি ছিল তখন এইরূপ কত কত জাতিকে যে সে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। "পারসীক গ্রীক হুন তক্ষক শক পারদ তুরস্ক জাঠ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক নানা সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহারা দু' একটী আসে নাই, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়াছিল। তাহারা কোথায়? যদি গায়ের জোরে বলিতে চাও যে, তাহারা সকলেই লোপ পাইয়াছে, তবে আর কথা নাই। কিন্তু এতগুলি জাতি এবং যে জাতিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি কালে ভারতের অদৃষ্ট-নেমির বিধাতা হইয়াছিল, যে জাতিগণের মধ্যে কলিষ্ক, শালিবাহন এবং সম্ভবতঃ শিলাদিত্য প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই সব জাতি সংখ্যায় বা শক্তিতে নিতান্ত অল্প ও হীন ছিল না। তাহারা কি সকলেই লোপ পাইয়াছে না তদানীন্তন জীবিত হিন্দুসমাজের মধ্যেই লীন হইয়া হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে? আবার বৌদ্ধ যুগের কথা স্মরণ করুন। বৌদ্ধ সময়ে—দুই এক বৎসর নয়, সহস্র বৎসরেরও অধিককাল যখন ভারতের অধিকাংশ লোক জাতিভেদ মানিত না, তখন সকলের সঙ্গেই সকলের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিত। শঙ্করাচার্য্যের পর যখন হিন্দুধৰ্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধৰ্ম্ম ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখন বৌদ্ধদেরই বংশধরেরা আবার হিন্দু হইয়া গেল।

(১) শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ ভারতী লিখিত—"বর্ণভেদতত্ত্ব।" হিন্দুপত্রিকা ১০ম বর্ষ, আষাঢ় ৩য় সংখ্যা।

সমুদয় বৌদ্ধগণকে সমূলে আগুনে পোড়াইয়া কি জলে ডুবাইয়া কিম্বা তরবারি সাহায্যে নিপাত করা হয় নাই—অথবা তাহাদিগকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করা হয় নাই। সেই সব বৌদ্ধদের বংশধরেরা এক্ষণে কোথায়? তাহারা নির্ব্বংশ হয় নাই—সকলেই আমাদের মধ্যেই আছে। ভারতের তখন জীবনীশক্তি ছিল—পরিপাক শক্তি ছিল—তাই এতগুলি জাতিকে তাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য এইরূপে বহুবিধ বিভিন্ন জাতিকে সে তাহার কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল।"(১)

পাছে এ সম্বন্ধে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ, উচ্চবাচ্য উপস্থিত হয় বা পরবর্ত্তীগণের মধ্যে কোনও কথা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবতঃ মনু ঐরূপ সময় বর্ণের নবাবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ, লিখিত—নব্যভারতে 'ডুবিতেছি না ভাসিতেছি'।

অষ্টম অধ্যায়।

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার।

কলিকালের কর্ণধার মহর্ষি মনু শূদ্রের প্রতি কিরূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এ অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

শূদ্রের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইতেছে :—

মঙ্গল্য ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম॥ ৩২। মনু, ২য়, অঃ।

"ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক নাম রাখিবে; ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে। ৩১। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্ম উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মাদি কোনও রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোন প্রেষ্যবাচক উপপদ যুক্ত করিবে। যেমন শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি এবং দীনদাস ইত্যাদি॥ ৩২॥"

বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যেষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥ ১৫৫
২য় অধ্যায়, মনু।

"জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে; অধিক বীর্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয়; যিনি ধনধান্যে বড় বৈশ্যদিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ; আর অগ্র পশ্চাৎ জন্ম বিবেচনায় যে জ্যেষ্ঠত্ব, সে কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে।" ১৫৫।

যে অতিথিকে পূজ্যপাদ আর্য্যগণ সর্ব্বদেব স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন, অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতিথি সেবায় যাঁহারা ধনপ্রাণ তুচ্ছ মনে করিতেন—যে অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আর্য্য পিতামাতা স্বহস্তে অম্লান বদনে পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে পারিতেন, অতিথির ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া ও গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় পুণ্য ধ্বংস হওয়া যে আর্য্যগণ একই মনে করিতেন—সেই অতিথির কথায় মনু কি বলিতেছেন শুনুন্।

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটম্বেঽতিথি ধর্ম্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈ স্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্॥ ১১২

তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

"ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্যশূদ্রও যদি অতিথি-ধর্ম্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে দয়ার অনুরোধে তাহাদিগকেও ভৃত্যবর্গের সহিত ভোজন করাইবে।"

চণ্ডালাদি শূদ্রজাতিকে শূকর কুক্কুট কুক্কুর প্রভৃতির সহিত গণনা করা হইয়াছে। যথা :—তৃতীয় অধ্যায়ে—

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্॥ ২৩৯

"ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন—এমন সময় চণ্ডাল, শূকর, কুক্কুট, কুক্কুর, রজস্বলা স্ত্রীলোক এবং ক্লীব যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায় এমন উপায় করিবে।" ৩২৯। পরাশরও বলিয়াছেন :—

"শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ"॥ ৬৪॥

কুকুর বা চণ্ডাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে।"

লোকে আহারের পর কুকুর বিড়ালকে উচ্ছিষ্টান্ন দিয়া থাকে—কিন্তু মনু শূদ্রকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া উচ্ছিষ্টান্ন দিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্‌শিরাঃ ॥ ২৪৯

তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

"শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দেয়, সেই মূর্খ কালসূত্র নামক নরকে অধোমুখে পতিত হয়।"

হায়! অভুক্তকে অন্ন, অন্ন নয়, উচ্ছিষ্টান্নটুকু দিলে পরকাল নষ্ট হয় এমন কথা জগতের কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোনও নীতিশাস্ত্রে বোধ হয় এযাবৎ লিখিত হয় নাই—মনু তাহাও লিখিয়াছেন। এইত গেল শ্রাদ্ধের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদানের কথা।

এখন নিতান্তই যদি কেহ চারিটী খাইতে দিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি—

অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৪৫

দশম অধ্যায়; মনুসংহিতা।

"ইহাদিগকে অর্থাৎ চণ্ডাল, শ্বপচদিগকে (যাহাদিগের বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, কুক্কুর এবং গর্দ্দভ যাহাদিগের একমাত্র ধন, মৃতের বস্ত্র পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহ নির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ, সাধুদিগের বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় যাহাদিগের দর্শন নিষেধ।—৫১-৫২ শ্লোক) অন্নপ্রদান করিতে হইলে ভদ্রলোকেরা ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রাম বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—অন্নংভূমৌ শ্বচাণ্ডাল বায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ অর্থাৎ "গৃহস্থ বৈশ্বদেবের হোম করিয়া অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে

বলি প্রদানপূর্ব্বক—‘অনন্তর কুক্কুর চণ্ডাল বায়স ও পতিতদিগকে ভূমিতে অন্ন দিবে।”

শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধা স্বাহা বষট্কারাদিভির্বিনা॥ ৬

ব্যাস সংহিতা।

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য ; এই তিন বর্ণই শ্রুতিস্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী ; অপরজাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্র জাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষট্কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।”

শূদ্রকে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঋষি অত্রি বলিতেছেন :—

অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠেদ্বিজে।
এতে স্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ॥

৮ অত্রি সংহিতা।

“দ্বিজোত্তমগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র এবং খল-স্বভাব দ্বিজ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবেন না।”

শুধু কি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই নিষেধ ? বেদ শ্রবণ করাও তাহাদের পক্ষে নিষেধ।

উশনঃসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

অন্ত্যানাং সঙ্গতেগ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ॥ ৬৫

“যে গ্রামে অন্ত্যজজাতি (নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ,

কায়স্থ, মালাকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ব্যাস-সংহিতা ১০।১১।১২।) বাস করে সেই গ্রামে, বহুলোক সমাগম স্থলে বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।"

শূদ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ—তাহা লৌকিকই হউক আর পারমার্থিকই হউক দেওয়া হইবে না। মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ন শূদ্রায়মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না, অদাস শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতশেষ দিবে না,—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না॥ ৮০।"

যদি দাও তবে :—যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্।
সো ঽসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব মজ্জতি॥ ৮১

"যে ব্রাহ্মণ ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।"

শূদ্র দূরে থাকুক আজকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি অসভ্য নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্য কত মহাপ্রাণ নরনারী যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আর্য্যসমাজের পূতহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টীয় নরনারীগণ, ব্রাহ্ম-সমাজের উদারহৃদয় প্রচারকগণ দলে দলে নিম্নজাতিকে শিক্ষাদানের জন্য, পার্ব্বত্য-অসভ্য জাতিগণের হৃদয় মন্দিরে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিবার জন্য, এক কথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য সমুদয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন, আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু

কিনা—তাহাদিগকে অন্ধকারে কাদার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবার উপদেশ দিতেছেন। হায় রে শাস্ত্রকার। হায় রে ধর্ম্ম !

আবার বলিতেছেন :—ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।

ন মুর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥ ৭৯

"পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ. ধনাদিমদে গর্ব্বিত ব্যক্তি, রজকাদি নীচ জাতি এবং অন্ত্যাবসায়ী ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও এক ছায়াতে বাস করিবে না।"

(ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ হইতে শূদ্রাতে জাত যে পুত্র তাহাকে পুক্কশ বলে এবং নিষাদ পত্নীতে চণ্ডালজাত পুত্রের নাম অন্ত্যাবসায়ী। মনু, পতিত চণ্ডাল মুর্খের সহিত এক ছায়াতে বসিতে নিষেধ করিতেছেন—কেননা পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতড়িৎ যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয় !

আমরা বলি কি—পতিত চণ্ডাল মুর্খ অধমের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগের অশ্রুবারি মোচন করিবার জন্য যাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য যাহাদিগের বাহু আগ্রহের সহিত প্রসারিত না হইয়াছে—তাঁহারা আবার মানুষ ? তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণ ? তাঁহারা আবার ধার্ম্মিক ? পতিত মূর্খকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে যাঁহারা এমন করিয়া ঘৃণা করিতে পরামর্শ দেন—তাঁহারা কি ঋষি ? ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নের যোগ্য ব্যক্তি ?

শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া ত দূরের কথা বেদ শ্রবণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে :—যথা "ন শূদ্রজন সন্নিধৌ"। (৯৯ চতুর্থ অধ্যায়) অর্থাৎ শূদ্র ও জনতা সমীপে বেদ পড়িবে না।

শূদ্রকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ও পাপহীনতার প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য কিরূপ কঠোর কর্ম্ম করিতে হইত নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

মনু অষ্টম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

"সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গো বীজ কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বেস্তু পাতকৈঃ॥ ১১৩
অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥ ১১৪
যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্ত্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ॥ ১১৫

"ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্তাশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা; বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। ১১৩। অথবা শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। ১১৪। অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রী পুত্রাদির মস্তক স্পর্শে—উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ সম্বন্ধে যে ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে।" ১১৫।

অগ্নিতে দগ্ধ না হওয়া রূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় যে কত লক্ষ লক্ষ শূদ্র ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া হিন্দু বিচারকের করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছেন—তাহা কে বলিতে পারে? কয়টী শূদ্র এ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পাপশূন্যতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? হায়! শূদ্রজীবন বালির গৃহের ন্যায় না জানি কতই ভঙ্গপ্রবণ—কতই তুচ্ছ ছিল?

এক্ষণে শূদ্রের শারীরিক কঠোর দণ্ডের কথা লিখিত হইতেছে। অষ্টম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

"শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি ॥ ২৬৭
পঞ্চাশদ্‌ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ ॥ ২৬৮

*   *   *   *   *

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং 'জঘন্য প্রভবোহি সঃ' ॥ ২৭০
নামজাতিগ্রহংত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ ॥ ২৭১

"ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যের দেড় শত বা দুই শত পণ দণ্ড হইবে; শূদ্রের তাড়নাদির শারীরিক দণ্ড হইবে। ২৬৭। ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। ২৬৮। একজাতি (অর্থাৎ শূদ্র সমষ্টিকে একজাতি বলা হইয়াছে) শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের / প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদনরূপ (দয়ালু!) দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহার জন্ম 'জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে।' বিরাট পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইল জঘন্য স্থান! ২৭০। নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছা জলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।" ২৭১। পুনরায় বলিতেছেন।—

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিব ॥ ২৭২

অষ্টম অধ্যায়, মনু।

"দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন। ২৭২।

মনু ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন :—

"যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥ ২৭৯
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥ ২৮০
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥ ২৮১
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌচ্ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্॥ ২৮২
কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌচ্ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাড়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ॥ ২৮৩

"অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন। ২৭৯। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন, (অর্থাৎ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে নাও মারে কিন্তু মারিবার জন্য শুধু হস্ত উত্তোলন করে; তাহা হইলেই তাহার হস্ত রাজা ছেদন করিয়া দিবেন।) চমৎকার বিচার! এমন ন্যায় বিচার বর্ত্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না। স্বর্ণলতায় পড়িয়াছিলাম একদিন শ্যামাদাসী রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া 'গদাধর চন্দ্রকে' বটিদা লইয়া নাক্ কাটিতে গিয়াছিল, গদাধরচন্দ্র অমনি একদৌড়ে থানায় যাইয়া শ্যামার অত্যাচার কাহিনী বলিয়া দারোগাকে অনুরোধ করিয়াছিল যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া শ্যামাকে গ্রেপ্তার ও তাহাকে শাস্তিপ্রদান

করেন। দারোগা বাবু ইহাতে হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন "শুধু নাক কাটিতে চাহিলে বা উদ্যত হইলে ত মোকদ্দমা হয় না। নাক কাটিলে তবে মোকদ্দমা, অতএব তুমি আবার যাও, বিবাদ কর, নাক কাটিয়া দিলে, তবে আসিও তখন বিচার করিব।"

আমি আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং জানিনা দারোগার উক্তি ঠিক হইয়াছিল কিনা। এই ত গেল সংহিতা যুগের বিচার পদ্ধতি। পরে বলিতেছেন, "আর পদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। ২৮০। শূদ্র যদি দর্প বশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে, (কেন না, মরিয়া গেলে ত আপদ চুকিয়াই যায়—শাস্তি ভোগ করিতে হয় না) এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে অর্থাৎ বায়ু নিঃসরণ করিলে গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন। ২৮২। শূদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে, বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।" ২৮৩।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, ইহা মানবধর্ম্ম শাস্ত্র না আর কিছু? টীকা টীপ্পনী ও ভাষ্যকার কি বলেন? ইহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র নাম না দিয়া ব্রাহ্মণাধিপত্য নাম দেওয়াই কি সঙ্গত নহে? যদি বলেন ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে তৎকালিক হিন্দু আইন গ্রন্থ, তবেত কোন কথাই নাই। তৎকালের আইনগ্রন্থ তৎকালেই শোভা পাইত, এখন আর তাহার

কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং এখন আর মনুস্মৃতি মনুসংহিতার দোহাই দিবার কি প্রয়োজন? মনু স্মৃতি বা ঐরূপ যে কোন স্মৃতিকে গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দিলেই ত সব গোলযোগ চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বরং যাহাতে মনুসংহিতার বিধানাদি সমাজে প্রচলিত হইয়া দেশ ধর্ম্মময় হইয়া যায় তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের "জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদাদি" পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে"?

দাসত্ব করিবার জন্যই যে শূদ্রের জন্ম—তাহারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি মনু বলিতেছেন ঃ—

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩ অষ্টম অধ্যায়, মনু।

"পরন্তু শূদ্র ক্রীত হউক আর অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি (রাজা) দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" মনুর ঈশ্বর ত তাহা হইলে ভারি দয়াময়—ভারি ন্যায়বান্। ব্রাহ্মণ আদি উচ্চ তিন বর্ণের সেবার জন্যই শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আহা, অভিজাত সম্প্রদায়ের কষ্ট কি তিনি প্রাণে থাকিতে দেখিতে পারেন? আর শূদ্র! শূদ্রেরা ত সয়তান, তাহাদের আবার সুখ দুঃখ কষ্ট যাতনা কি? খাটিবার জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উচ্চ তিন বর্ণের সুখ সুবিধার জন্যই তাহাদের উৎপত্তির প্রয়োজন। এইত গেল ভগবানের দিক হইতে শূদ্রের প্রতি অপার করুণা! এখন মানবদিগের দিক হইতে করুণার পরিমাণ করা যাউক। পূর্ব্বে যে, ইউরোপ আমেরিকায় দাস ব্যবসায় ছিল—মনে হয় তাহাও ভারতের এ দাস ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কেন না

দাসদিগকে তাঁহাদের অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হইত ; দাস, অতিরিক্ত খাটুনীতে মরিয়া গেলে কিম্বা কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে তাঁহাদের মুদ্রা অর্থ সবই নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু ভারতের শূদ্র দাস দ্বারা সেরূপ ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নাই, কেন না—তাহাদিগকে টাকা দ্বারা ক্রয় করিতে হয় না। এ দাস অতি সুলভ—বিনামূল্যে লাভ—প্রকৃতিদত্ত দাস।

কেননা মনু বলিতেছেন :—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রোদাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥ ৪১৪

"শূদ্র স্বামী কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে ?"

দাসের দেহ মনঃ প্রাণই যখন ব্রাহ্মণাদির প্রকৃতিদত্ত সম্পত্তি তখন তাহার ধনাদির ত কথাই নাই।

মনু তাহাও বলিতেছেন :—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচাদং।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ ॥ ৪১৭

অষ্টম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধ চিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ ক'রিতে পারেন ; যে হেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"

অন্যত্র বলিতেছেন :—

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্ম্মিকে সতি রাজনি ॥ ১১
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্দ্রব্যমাহরেদ্যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ১২

আহরেৎ ত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
নহি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ ॥১৩

"যাগকারী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যাভাবে একাঙ্গ আটকাইয়া থাকে, তবে ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বাস করিলে, উক্ত ব্রাহ্মণ—যে বৈশ্যের বহু ধন আছে, কিন্তু যাগ যজ্ঞ হীন ও সোম পান করে না, তাহার নিকট হইতে যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বা অপহরণ করিয়া উক্তাঙ্গ পূরণ করিবেন। ১১।১২ বৈশ্যের অভাবে, শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটী যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, যেহেতু শূদ্রের কোনও যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই। ১৩।"

ব্রাহ্মণ যজ্ঞকারীকে, অভাব হইলে ধনবান্ বৈশ্য ও শূদ্রদের বাটী হইতে ঐ সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক অথবা চুরি করিয়া লইয়া কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বে—মনু এই শাসন রক্ষা করিতে গেলেই এই অনুশাসন বাক্যের দর কি পরিমাণ, তাহা ভালরূপেই অনুভব করিতে পারা যায়। একেই বলে 'গরু মেরে জুতা দান।' চুরি করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য সমাধান!! হায় রে হিন্দুশাস্ত্র, হায় ঋষিবাক্য!

বর্ত্তমান কালের ন্যায় মনুর সময়ে যাহার যে ব্যবসা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা করিতে পারিবে এরূপ নিয়ম ছিল না। বৈশ্য শূদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসাই করিতে হইত। বৈদিক সময়ের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

মনু বলিতেছেন :—

বৈশ্য শূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ॥ ৪১৮

"রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন—যেহেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।" ৪১৮

শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দয়ালু ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্রও ক্রটী করেন নাই—তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দান করিয়াছি; আরও কিঞ্চিৎ প্রদান করিব।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥২৪৮

"শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন।" চোর প্রায়ই শূদ্র হয়—বৈশ্যের মধ্যেও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। রাজন্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের পক্ষে চুরি করার প্রয়োজন মনুর সময়ে কিছুই ছিল না। সেই সমুদয় নিম্নশ্রেণীস্থ অজ্ঞান তস্করাদির প্রতি মনু কি কঠোর বিধানই না করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে এইরূপ আইন প্রচলিত হইলে সমুদয় সভ্যজগৎ তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না।

মনু আরও বলিতেছেন :—

যে তত্র নোপ সর্পেয়ুর্মূল প্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্ ॥২৬৯

নবম অধ্যায়, মনু।

"চার প্রেরিত হইয়াও শঙ্কা বশতঃ যাহারা (যে সমস্ত চোর) আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বধ করিবেন।" একজন অপরাধীর জীবনের সঙ্গে অন্য অবশিষ্ট

নিরপরাধা স্ত্রী পুত্রের জীবন নাশ করা যে কত দূর নৃশংসতার পরিচায়ক তাহা বলিবার নহে। পরের শ্লোকেই বলিতেছেন:—"ধার্ম্মিক রাজা" মাল না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না; কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছু মাত্র বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন।" ২৭০

শূদ্র চোরদিগের দণ্ড সম্বন্ধে অন্য এক শাস্ত্রকার কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছেন:—"রাজা অপহৃত বস্তু চৌরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন।" বলা বাহুল্য এরূপ দণ্ড ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জন্য নহে। শূদ্রদের প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারের কি স্নেহ!

মনুসংহিতার ন্যায় বিষ্ণুসংহিতাতেও শূদ্রের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে যথা:—

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণ বর্জ্জং সর্ব্বে বধ্যাঃ॥ ১॥

ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ" ॥ ২ ॥

পঞ্চম অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের মহা পাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই।" গৌতম সংহিতাও ঐ একই সুরে তান ধরিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌতম বলিতেছেন:—

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোঽধিকোঽথাহাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়নবাক্পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতম্।

"শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ

করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। * * * * শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করা রূপ "মহাপাপ কার্য্য" করে তাহা হইলে রাজা সীসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ডবিধান করিবে। * * * * কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না।" চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্র নাম দেওয়া যায়? ধর্ম্মরাজ যেন ব্রাহ্মণের দোস্ত, তাঁহাদের বেলায় কোনই দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত নাই, যত দোষ যত অপরাধ যত দণ্ড যত বিধি নিষেধ আইন কানুন সব হতভাগ্য শূদ্রদের জন্য। শূদ্রদিগকে পিসিয়া মারিবার জন্যই যেন সমুদয় সংহিতাকার একযোগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কলম ধরিয়াছিলেন।

শূদ্রেরা নামমাত্র অপরাধ করিলেও যে নিস্তার পাইবে না তাহা ত দেখাইলাম, এখন স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয় শুনুন :—

কামকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকংশন্ স্পৃবধ্যঃ॥ ১০২

পঞ্চম অধ্যায় ; বিষ্ণুসংহিতা।

"অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

* * * * চণ্ডালশ্চেত্তমান্ স্পৃশন্॥ ২৩৭ ইত্যাদি।

অর্থাৎ "* * * যে চণ্ডাল হইয়া উত্তমবর্ণকে স্পর্শ করে; যে, শূদ্র প্রব্রজিত যতিদিগকে দৈব পিত্র্য-কার্য্যে ভোজন করায় * * * * যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়নাদি) * * * তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ২৩৭—২৪০।"

শুধু কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শেই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মহানী? না তাহা নহে। তাহাদের অবলোকনেও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন :—

পাপিষ্ঠং দুর্ভগামন্ত্যং নগ্নমুৎকৃত্তনাসিকম্।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥ ১০

কাত্যায়ন-সংহিতা।

"যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, * * * * অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ননাসিকা ব্যক্তিকে অবলোকন করে সে কলিযুক্ত হয়।"

ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে, কোনও মাঙ্গলিক কার্য্যে নরসুন্দর, তৈল-বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। ক্রমে এইভাবে বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে।

মান্দ্রাজের পারিয়াজাতির প্রতি তথাকার অভিজাত সম্প্রদায় যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এদেশে নিষাদ, মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদগু, ক্ষত্র, উগ্র, পুক্কস, ধিগ্বণ এবং বেণজাতির প্রতিও মনু সংহিতা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুধিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমরা উহার মূল উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম—

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিতেছেন :— * * * * * * "পূর্ব্বোক্ত

ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করতঃ চৈত্যবৃক্ষমূলে, পর্ব্বত সমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। ৫০। চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, এবং ইহাদিগকে পাত্র-রহিত করা কর্ত্তব্য * * * * * * * * * * একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। ৫২। সাধুরা যখন বৈধ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ। * * * * * ইহাদিগকে অন্নপ্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা (?) ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রি-কালে ইহাদের যাতায়াত একবারে নিষেধ। * * * * রাজনির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে।"

শূদ্রদের প্রতি তৎকালিক ব্রাহ্মণগণের অপার স্নেহ প্রীতির এই ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে শূদ্রদের জীবন ব্রাহ্মণগণের নিকট কিরূপ মূল্যবান্ ছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। মনু একাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
স্ব গোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।১৩২

"জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুক্কুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" ১৩২

তৎপরে পুনরায় শ্লোক বলিতেছেন :—

অস্থিমতাস্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থনস্থ্নাস্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৪১

একাদশ অধ্যায়।

কৃকলাশ প্রভৃতি (কুল্লুকভট্ট) অস্থিবিশিষ্ট সহস্র প্রাণিবধে এবং অস্থি-হীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীবধে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৪২। মহর্ষি অত্রি তদীয় সংহিতায় মনুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন :—

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দ্দূলগর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। ২২২

অত্রি সংহিতা।

"শরভ (অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পরাশর ঋষি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন—

চৌরঃ শ্বপাকচাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ১৯

পরাশর সংহিতা।

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে, সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে—'শূদ্রের জীবন,' সংহিতাকারগণের নিকট কতদূর হেয় ও তুচ্ছ ছিল! ফল কথা শূদ্রকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। জপ তপ সাধন ভজন ধন উপার্জ্জন, ধন সম্পদ ভোগ, উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক মানসিক সুখ সুবিধা ও উন্নতি হইতে হতভাগ্য শূদ্রগণকে তাঁহারা বঞ্চিত করিয়াছেন। স্থূলতঃ ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। শূদ্রদিগকে ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া মনু বলিতেছেন :—

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥ ১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ। ১০১

মনু, প্রথম অধ্যায়।

"ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদয় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্টস্থানজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র। ১০০। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব; যে হেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।" ১০১।

এইত গেল শূদ্রাদিগণের ধনের উপর আপনাদের অধিকারের কথা— ধনোপার্জ্জনের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন। দশম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯

"অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত নহে; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।" ১২৯।

শূদ্রাদি তথাকথিত অধম জাতিগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন করা মহা অপরাধের কার্য্য। দাসত্ব করা ব্যতীত শূদ্রের আর অন্য উৎকৃষ্ট বৃত্তি নাই।

ঐ দশম অধ্যায়েই মনু বলিতেছেন :—

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৬

"যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য" । ৯৬। এইরূপ বিধি যদি বর্ত্তমান কালে রাজাজ্ঞায় প্রচলিত থাকিত তবে যাঁহাদের উৎপত্তিতে ভারতবর্ষ ও এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত ধন্য হইয়াছে,—যাঁহাদের উৎপত্তিতে সমাজ দেশ জাতি উন্নত হইয়াছে—তাঁহাদিগের অস্তিত্ব কেহ আশা এবং অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন কি ? খৃষ্ট, পার্কার, নানক, মহম্মদ প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ এবং কেশবচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, কৃষ্ণলাল, লুথার, মহেন্দ্রলাল সরকার, মনোমোহন, লালমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, পরাঞ্জপে, আনন্দমোহন প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত এক একটী উজ্জ্বল মণিকে পৃথিবী কখনও অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থা হইত না। কারণ ইহারা সকলেই মনুর মতে ব্রাহ্মণেতর জাতীয়। ব্রাহ্মণেতর শূদ্রজাতির পক্ষে দ্বিজাতিগণের দাসত্ব করা ভিন্ন আর কোনও বৃত্তি ছিল না—আর কোনও গতি ছিল না। অতঃপর শূদ্রগণের ধর্ম্মজীবনের প্রসঙ্গে অত্রি বলিতেছেন ঃ—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ১৩৫

অত্রি সংহিতা।

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা আরাধন, এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্যজনক"। মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভগবান্‌কে লাভ করা। কিন্তু ভগবল্লাভের যে ছয়টী উপায়কে পূর্ব্বাচার্য্যগণ পরমোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, যাহার একটি মাত্রকে আশ্রয় করিয়া মানুষ কঠিনতর দুচ্ছেদ্য মায়াপাশ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া পরম ধামে উপনীত হইতে পারে, পরম প্রেমময় মঙ্গলাস্পদের অভয় দরবারে কটিকল্লান্ত

পর্য্যন্ত আশ্রয় পাইতে পারে, নিষ্ঠুর শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি কতগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়া কোটী কোটী নরনারীকে তাহা হইতে এমন করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নারায়ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ স্বরূপ যে সর্ব্ব-বিদ্যা সর্ব্ব জ্ঞানাশ্রয় সর্ব্ব শক্ত্যাধার প্রণব ওঁঙ্কার ধ্বনিতে পাপাশূর দল ও কামক্রোধাদি প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্যদানব ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া উঠে, যে মধুর শব্দ উচ্চারণে হৃদয় মধ্যস্থ সচ্চিদানন্দময় প্রভু আনন্দে তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া উঠেন—সেই বেদবেদান্তের সারভূত প্রণব উচ্চারণে—কোটী কোটী নর নারায়ণকে শূদ্ররূপ কল্পিত নামে অভিহিত করিয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে ও হইতেছে। অত্রি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শূদ্রগণকে জপ, তপস্যা মন্ত্রসাধন ঈশ্বরাধনা হইতে শুধু নিবৃত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাহাদিগকে রীতিমত প্রাণ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

অত্রি তদীয় সংহিতার উনবিংশশ্লোকে শূদ্রের ঈশ্বরারাধনা জপ তপ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে নিম্নলিখিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

"বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্॥ ১৯

"জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্ম-নিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জলধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।" সম্ভবতঃ এইরূপ মত প্রদর্শনের নিমিত্তই রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্রক তপস্বীর শিরচ্ছেদের উপাখ্যান রচিত হইয়া থাকিবে ও পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইত গেল শূদ্রনামধারী হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের অপার ভালবাসা ও দয়ার নিদর্শন। তার পর খুঁটী নাটী ধরিয়া যে কত প্রীতি-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন

স্থানে শূদ্রের ঘৃণিত ও নিন্দিত নাম রাখিবার কথা বলিয়াছেন। কোনও স্থানে "ধোপাকে একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইতে নিষেধ করিয়া বিধি করিয়াছেন।" (মনু অষ্টম অধ্যায় ৩৯৬)। শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ করার প্রসঙ্গে অঙ্গিরঃ সংহিতা বলিতেছেন :—

অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ
শূদ্রোঽপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোঽপি তথৈব চ ॥ ৫০

"শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে।" ৫০। শূদ্রের কি ভাগ্য! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টুকরা পাইতেও শূদ্রের গলদ্‌ঘর্ম্ম! প্রণাম দিলে তবে আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদটুকু দিয়া শূদ্রকে কৃতার্থ করিতেও ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ কুণ্ঠিত! হা শূদ্রজন্ম!!

ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্যকে আকাশ পাতালের সহিত তুলনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণের যাহাতে পুণ্য, শূদ্রের তাহাতেই পাপ। ধর্ম্মশাস্ত্রের এ অদ্ভুত কারণ নির্দ্দেশ করিতে, একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই সমর্থ। প্রমাণ স্বরূপ একটী মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই সুধীবৃন্দ অনায়াসে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অত্রি সংহিতা বলিতেছেন :—

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্যদোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্ ॥ ২৯৪

"পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্যপাপী; এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে।" অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে ব্রাহ্মণ মহা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্র চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয়। একজনের যাহাতে পুণ্য অন্যের

তাহাতেই পাপ ও নরক। এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টীপ্পনীর প্রয়োজন নাই। শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের কথা লিখিতে গেলে বৃহৎ একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। মনু, যম প্রভৃতি সংহিতাকারগণ শূদ্রের প্রতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন—তাঁহাদিগকেও শূদ্রের ন্যায় ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

এ অধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত ত আমরা শূদ্রদের প্রতি ঘোর অত্যাচারের প্রমাণই প্রদর্শন করিলাম। তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য, সে কথা একটি-বারও উল্লেখ করি নাই, বিধি নিষেধের কথা অনেক বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাদের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, কোন্ পথ অবলম্বনীয় ও শ্রেষ্ঠ, কোন্ পথে যাত্রা করিলে তাহারা স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে পারিবে তাহাই সরল সহজ কথায় উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনু শূদ্রদের প্রতি বড়ই দয়ালু। সুতরাং তিনি তাহাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া বহু চিন্তার পর একটী উত্তম ধর্ম্ম বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাহাই শূদ্রদের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম। এমন সোজা সরল ধর্ম্মের কথা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অবগত ছিলেন না। মহর্ষি মনু বহু শত বৎসর তপস্যার পর তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এ অদ্ভুত অচিন্তিত অলৌকিক আবিষ্কারে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে—শূদ্র জাতি ধন্য হইয়াছে। সে আবিষ্কৃত ধর্ম্ম হইতেছে—দ্বিজ সেবা—অনন্যমনে নিষ্কাম প্রাণে—দ্বিজ সেবা। তাহাদের আর ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই যাগ নাই যজ্ঞ নাই পূজা নাই অর্চ্চনা নাই—আছে কেবল দ্বিজ সেবা। ঐ শুনুন—মনু পবিত্রকণ্ঠে বলিতেছেন :—

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥ ১২২

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।

যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥ ১২৩। ১০ ম, অঃ

অর্থাৎ "স্বর্গলাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজজীবিকা—এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক"—এই শব্দবিশেষণ মাত্রই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। ১২২। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষেই বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন যে যাহা কিছু করে তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল"। ১২৩

আমরা কি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, হে ভারতের 'চলমান শ্মশান,' তথা কথিত হতভাগ্য শূদ্র জাতি, তোমরাই কি মনু অত্রি কথিত সেই ঘৃণিত পদদলিত লাঞ্ছিত, বেদবেদান্ত উচ্চারণে অনধিকারী শিক্ষা দীক্ষা হইতে চিরবঞ্চিত, স্বোপার্জ্জিত ধনৈশ্বর্য্য ভোগে অসমর্থ, 'জঘন্য স্থান হইতে উদ্ভূত,' দাস সংজ্ঞায় অভিহিত শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই পৌরাণিক যুগের অত্যাচার জর্জ্জরীত ব্রাহ্মণ কর-কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর ভীষণ পৌরহিত্য শক্তি সংরক্ষণের সহজলব্ধ উপাদান—আশাউদ্যম বিহীন মৃত প্রায় শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই পরবর্ত্তীযুগের ব্রাহ্মণ্য-শক্তি কর্ত্তৃক জিহ্বোচ্ছেদ শরীর ভেদাদি দয়াল দণ্ডে উৎপীড়িত জাতির ঘৃণিত বংশধর শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই সর্ব্বশক্তির আধার ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ অথচ মহামোহাচ্ছন্ন আত্মশক্তি অবিদিত নিদ্রিত সিংহতুল্য অবমানিত শূদ্রজাতি? হে বঙ্গের বৈদ্য কায়স্থ বারুজীবি সৎগোপ কর্ম্মকার কুম্ভকার স্বর্ণকার তিলি তাম্বুলি নরসুন্দর সাহা তন্তুবায় মালাকার শুঁড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কথিত হীনজাতীয় শূদ্রগণ! তোমরা কি মনু কথিত অত্যাচার নিপীড়িত হতভাগ্য শূদ্রজাতির বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস কর? তোমরা কি বিশ্বাস কর, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবার জন্যই পরম মঙ্গলময় দয়ার জলধি পরমেশ্বর তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

তোমরা কি আরও বিশ্বাস কর, ভগবান্ তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা বিদ্যাজ্ঞান হইতে চির বঞ্চিত করিয়া জগতের চরণাবনত দাস করিয়াই তোমাদিগকে এ সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন? শূদ্রের বেদাধিকার নাই—শূদ্রের জপ তপ সাধন ভজন ঈশ্বর আরাধনা নাই—সেবা করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম—দাস করিয়াই প্রকৃতি শূদ্রকে প্রসব করিয়াছেন, ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই—ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের উপর যে কোন অত্যাচার করিলেও তাহাদের কথাটী বলিবার অধিকার নাই ইত্যাদি মনুর নিষ্ঠুর আদেশগুলিকে কি তোমরা প্রকৃতই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর? তোমরা কি আপনাদিগকে এইরূপ শূদ্রান্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব কর? তোমরা কি মনুকেই প্রকৃত কলির ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া বিশ্বাস কর? মনুর এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ইহ পরকালের একমাত্র অবলম্বন ও গতি বলিয়া কি তোমরা বিশ্বাস কর? মনুর আদেশ পালনই ধর্ম্ম মোক্ষ স্বর্গ—আদেশ অপালনই—পাপ বন্ধন নরক বলিয়া কি তোমরা প্রকৃতঃই বিশ্বাস কর? মনুর মতই কি তোমরা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের সারভূত—প্রকৃত ব্রহ্মবাণী—ঋষিবাণী বলিয়া প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর? শুধু মুখে বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না—তোমরা কি কায়মনোবাক্যে উহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছ?, ধন জন তৃপ্তি শান্তি সুখ সুবিধা স্বার্থ কল্যাণ এবং এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমরা কি তোমাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছ? মোটের উপর হিন্দুর—আর্য্যজাতির বেদ বেদান্তাদি সমুদয় শাস্ত্রীয় মত পদদলিত করিয়া,—অশাস্ত্রীয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া—তোমরা—হে ভারতের—হে বঙ্গের হতভাগ্য শূদ্রজাতি! তোমরা কি মনুর নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সাম্য বর্জ্জিত কতিপয় আদেশ বাণীকেই একমাত্র কলির ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস কর? যদি বিশ্বাস কর, তবে এইস্থানেই লেখনীর চির

বিশ্রাম হউক, এইখানেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যাউক, এইটুকু আসিয়াই অন্ন বিদায় গ্রহণ করুক। যদি বিশ্বাস কর, তবে আর কিছু বলিবার নাই—আর কিছু লিখিবার নাই। বুঝিলাম তোমরা মৃত—চির নিদ্রিত। চির নিদ্রিত ব্যক্তিকে কে জাগাইতে পারে? কে উঠাইতে পারে? বুঝিলাম অজ্ঞানতার ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন নিবিড় তমসায় তোমরা নিমজ্জিত, বুঝিলাম তোমাদের কর্ম্মবন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শেষ একটী কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি শুধু বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না. কায়মনোবাক্যে তাহার পরিচয় দাও। যদি বিশ্বাস কর, তবে এই মুহূর্ত্তে—এই দণ্ডে, যাহাদের জ্ঞান বিদ্যা তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, যাহাদের ধন ঐশ্বর্য্য তাহাদিগকে প্রদান করিয়া,—(কেন না শূদ্রের ধনাদিতে তাহার নিজের কোনই অধিকার নাই, ব্রাহ্মণাদিরই সম্পূর্ণ অধিকার) যাহাদিগের আধিপত্য তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, যাহাদিগের প্রাধান্য গৌরব তাহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া, জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক গললগ্নি কৃতবাসে করজোড়ে দীনের দীন, দাসের দাস সাজিয়া ব্রাহ্মণের চির আশ্রয় অভয় চরণ তলে পড়িয়া যাও,—"না জানিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি—আপনাদের ন্যায্য অধিকার দানে প্রতারণা করিয়াছি" বলিয়া—চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। "প্রভু কৃপা কর, এ দীনহীন মূর্খ শূদ্রগণের অপরাধ মার্জ্জনা কর" বলিয়া, ব্রাহ্মণগণের (তা তিনি যেমনই হউন না কেন—শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের বিচারের অধিকার নাই) চরণ তলে পড়িয়া যাও, শূদ্রের সাধন ভজন তপ জপ সার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ-চরণে 'নশ্চিত ক্ষমা পাইবে। হে ধর্ম্ম বিশ্বাসী শূদ্রগণ, যাও—এই মুহূর্ত্তে গিয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে শরণাপন্ন হও গে,—আর বিলম্ব করিও না। বিলম্বে ধর্মভ্রষ্ট—ইহকাল যাই, ধর্ম কর্ম রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যাও—সে যাবার পূর্ব্বে কার্য ত্যাগ করিয়া,

এই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণের দাসত্বে ব্রতী হও গে। উকীল ওকালতি—মোক্তার মোক্তারী—ডাক্তার ডাক্তারী—জমিদার জমিদারী—রাজা রাজত্ব—মন্ত্রী মন্ত্রণা—বণিক বাণিজ্য—বিচারক বিচারাসন—জোতদার জোত জমি এবং সর্ব্বশেষে শিক্ষক ছাত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক—হে বিশ্বাসী শূদ্রগণ! যে যাহার দাসত্ব কার্য্যে ব্রতী হও গে। শূদ্রের কর্ত্তব্য দাসত্ব করা,—উপরি লিখিত কার্য্য করা শূদ্রের শাস্ত্রসম্মত নহে। তোমরা যদি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল সুবোধ বালকের মত নিজ নিজ দাসত্বে ব্রতী হও—তাহা হইলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না—সংস্কারক আপনা হইতেই নীরব হইয়া যাইবে। একদিক্ হও,—যদি শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর,—মনুসংহিতাকেই কলির একমাত্র পালনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া—কাণ্ডারী বলিয়া মনে কর, তবে—বিশ্বাসীর মত শূদ্র কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির পদ সেবায় ব্রতী হও। অন্য কাজ কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য ধনোপার্জ্জন ধন সঞ্চয়াদি কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। নতুবা কাজ করিবে, ব্যবসা করিবে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, আর পরিচয় দিবে শূদ্র বলিয়া! ইহলৌকিক কার্য্য কর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের, আর পারলৌকিক কার্য্য করিতে বসিলেই নিজকে শূদ্র করিয়া বস, প্রণব উচ্চারণে নিজ হইতেই বঞ্চিত হও, ঈশ্বরের পূজায় পুরোহিতের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও। মন মুখ এক করাই ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা এ কি করিতেছ? মুখে পরিচয় দাও শূদ্র বলিয়া—কাজ কর ব্রাহ্মণাদির। এই কি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ধর্ম্ম জ্ঞান! এই না তোমরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেছ—মনুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ? এই কি সেই বিশ্বাসের কার্য্য? এই কি শূদ্রের কর্ম্ম? হা ধিক! তোমাদিগের বিশ্বাসকে? ধিক তোমাদিগের কপটতাকে—কাপুরুষতাকে!!

আর যদি বিশ্বাস না কর, তবে কোটী দ্বিযুক্ত মন্ত্রে অজ্ঞানারী

হিন্দুসমাজ শরীর কম্পান্বিত করিয়া মহাবেগে উত্থিত হও। "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদেব কেশরী" ভীম বলশালী কেশরীর ন্যায়, হে সর্ব্ব শক্ত্যাধার শূদ্রজাতি! তোমরা শূদ্রত্বের পিঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া—পদতলে দলিত করিয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হও। বঙ্গের বা ভারতবর্ষের এমন কোনও সামাজিক শক্তি নাই যে উহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ? এ বিরাট শক্তির নিকট কোন শক্তিই তিষ্ঠিতে পারিবে না। এই দণ্ডে শূদ্রের কলঙ্ক অঙ্কিত চিহ্ন সকল মুছিয়া ফেলিয়া,—সংস্কারের জলে বিধৌত করিয়া, তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হও। এই দণ্ডে শূদ্রত্বের ক্ষুদ্র কূপ মণ্ডূকের ক্ষুদ্রতম গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের অনন্ত প্রবাহ নদ নদী ও সুবিশাল সাগরাম্বুরাশিতে মিশিয়া পড়, এবং ক্রমে সুকঠোর সাধনা ও তপস্যাবলে চরম আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের মহা সিন্ধুতে ভাসিয়া গিয়া জন্ম জীবন সার্থক কর। স্বপ্নেও ভাবিও না, ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তোমাদিগকে দয়া ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কখনও সামাজিক মুক্তি প্রদান করিবে, স্বপ্নেও ভাবিও না—তোমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকৃতির নিয়মে আপনা আপনিই সামাজিক স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করিও না—যত শীঘ্র পার স্বাধিকার লাভের জন্য সকলে দলবদ্ধ হও। শূদ্রত্বের সর্ব্ব প্রকার বন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া ফেল। আচার ব্যবহারে কাজ কর্ম্মে মনঃ প্রাণে শূদ্রত্বের ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ কর। শূদ্রত্ব—পশুত্ব ও ক্লীবত্ব ভিন্ন কিছুই নহে। যত সত্বর পার এই শূদ্রত্ব রূপ পশুত্ব ও ক্লীবত্ব হইতে মুক্ত হও। তোমরা ভীত হইও না, কায়মনোবাক্যে ভয়শূন্য হও। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিকট মুখভঙ্গী তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিও না; উঁহাদের স্বভাব চিরকালই এইরূপ। উঁহারা কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী নহে, পরন্তু সর্ব্ব প্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরোধী এবং শত্রু।

উঁহারা চিরকালই সংস্কারক দল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উঁহাদের হাম্বি তাম্বিতে ভীত ও বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। এ জীবন যুদ্ধে ঐ দেখ পার্থ সারথি তোমাদের সারথি হইতে প্রস্তুত হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আর কাল বিলম্ব করিও না—আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিও না। তোমাদের ঘৃণা লজ্জা মান অপমান বোধ কি অন্তঃকরণ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে! যাহারা শৃগাল কুক্কুরের ন্যায়,—ঘৃণায়—অবমাননায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, যাহাদের ঘর দুয়ার ত দূরের কথা—দেবমন্দিরেও তোমাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দেয় না, পাছে তোমাদের স্পর্শে দেবতার সহিত দেবমন্দির পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায় এই অশঙ্কায় সর্ব্বদা সর্ সর্—ছুবি ছুবি করে,—তাহাদের বাটীতে যাইয়া পাত্‌রা মারিতে—নিমন্ত্রণ খাইয়া কৃতার্থ হইতে তোমাদের ঘৃণা হয় না। যাহারা তোমাদের জলটুকু খাইতে নারাজ,—তোমাদের কূপের জল যাহাদের নিকট অস্পৃশ্য—সেই সব হৃদয়-হীন দাম্ভিকগণের পা চাটিয়া তাহাদেরই ভাত খাইতে তোমাদের বিবেকে একটুকুও আঘাত লাগে না? মনুষ্যত্ব কি একেবারে লোপ হইয়াছে! শাস্ত্রের নামে অত্যাচারিগণের ঘৃণা অবমাননা—অত্যাচার অবিচার—আর কত কাল নীরবে ভোগ করিবে? পিতা মাতার শ্রাদ্ধে দাসদাসী বলিয়া সেই স্বর্গগত পিতৃমাতৃগণকে আর কত কাল অপমানের বোঝা বহাইবে। বাপ মা যাহাদের—দাস দাসী—তাহারা কি কখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতে পারে? বাবা মা যাহাদের দাস দাসী—তাহাদের সন্তান কি কখন বড় বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে—না বড় হইতে পারে? ধিক্ ধিক্—সাম্যবাদী ইংরেজ রাজত্বেও এমন পশুর মত—দাসের মত—অত্যাচারী উচ্চ জাতিগণের পদতলে পড়িয়া আছ! ভগবানের সন্তান এমন হীনের মত পচিয়া মরিতেছ? উঠ উঠ—বক্ষ স্ফীত করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াও।

তোমরাও যে মানুষ? ভয় কি—তোমাদের পশ্চাতে ব্রিটিশ আইন সতত রক্ষার জন্য নিয়োজিত আছে। যাহারা কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করে, গৃহ স্পর্শ করিতে দেয় না, তোমরা ছুঁইলে যাহাদের কুয়ার জল অপবিত্র অস্পৃশ্য হইয়া যায়,—তোমাদের পূজিত দেবতাকেও যাহারা তোমাদের মতই ঘৃণা করে,—তোমাদের ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যন্ত যাহারা পশুবৎ ঘৃণা করে—সেই সব জাতির বাটীতে যাইয়া—কুকুরের ন্যায় প্রসাদ পাইতে তোমাদের বিন্দুমাত্রও ঘৃণা বোধ হয় না? ধিক্ তোমার বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধিক্ তোমাদের ধন সম্পদে, ধিক্ তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষায়! যাহারা বলে—তোরা হীন নীচ, অস্পৃশ্য ইতর,—যাহারা বলে তোরা ছোট লোক—পতিত, অনাচরণীয়; সয়তানের দূত তাহারাই! কে বলে তাহারা সমাজপতি। অমৃতের পুত্রকন্যাগণ, এমন মৃতের মত পড়িয়া আছ—সামাজিকগণের নির্ম্মম নিদারুণ অপমান প্রতিদিন মাথা পাতিয়া কেমন করিয়া বহন করিতেছ! হে বিরাট—হে হিরণ্যগর্ভ—হে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম—একবার স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জাগ্রত হও—জাগ্রত হও।

নবম অধ্যায়।

নিম্নশ্রেণী।

পাঠক! ঐ যে শীর্ণদেহ জীর্ণবাস, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যথিত বদন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দীপ্তিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি, আশা উদ্যমবিহীন পরিশ্রমসহিষ্ণু, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু, বলবানের পদলেহক শ্রমজীবি দেখিতেছ উহারা কে বলিতে পার? উহারাই ভারতের নিম্নশ্রেণী। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বসন নাই, গৃহের ছাদ নাই, মুখে উৎসাহ নাই, উহারাই নিম্নশ্রেণী। ব্রাহ্মণাদি অভিজাত জাতির যুগযুগান্তরের পেষণের ফলস্বরূপ আজি ইহাদের এই দশা—এই শোচনীয় পরিণাম! প্রাণের বল নাই, মনের সাহস নাই, জীবনোন্নতির আকাঙ্ক্ষা নাই; স্বাধীনতার স্পৃহা নাই। নাই, কিছুই নাই। তবে আছে কি? আছে কতকগুলি ছাই আর ভস্ম, কতকগুলি শ্মশানক্ষেত্র। এই জন্যই বুঝিবা ভাষ্যকার ইহাদিগকে চলমান শ্মশান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঘৃণার চরম বিশেষণ—চলমান শ্মশান! ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা বিশেষণ প্রয়োগ স্বার্থকই হইয়াছে। চলমান শ্মশানই বটে! ইহাদের বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই অভিজ্ঞতা নাই, উৎসাহ নাই উদ্যম নাই, ঘৃণা নাই লজ্জা নাই, আছে কতকগুলি ছাই আর ভস্ম। শ্মশানক্ষেত্র নিশ্চল আর এগুলি চলমান এইটুকু পার্থক্য! প্রকৃত যোগী সাধক ভিন্ন যেমন অধিকাংশ লোকই শ্মশানকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, শ্মশান স্পর্শে স্নান করে, শ্মশানক্ষেত্রকে নিতান্ত হেয় অবজ্ঞ মনে করে—এই চলমান শ্মশানগুলিকেও সাধারণ লোকে এইরূপ দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত পরন্তু অবজ্ঞাত মেরুদণ্ড, ভারতীয় জাতীয় জীবনের অজানিত শক্তি, জীবন-তরুর লুক্কায়িত মূলদেশ, হিন্দুর জাতীয় জীবন অট্টালিকার দৃঢ় নির্ম্মিত ভিত্তি—নিম্নশ্রেণীর কি দুরবস্থা, কি অধঃপতন! লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার অবিচার, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পদাঘাত কষাঘাত, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ঘৃণা অবমাননা, লক্ষ লক্ষ বৎসরের দৌরাত্ম্য উৎপীড়নে উহাদের দেহ মনঃপ্রাণ ক্ষত বিক্ষত, জর্জ্জরিত। ইহাদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার চালাইতে কোন ক্ষত্রিয় রাজা, কোন ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ কবি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যুগ-যুগান্তরের অত্যাচারে ইহারা এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে অনেক সভা সমিতি আছে কিন্তু ইহাদের প্রতি উহার কয়টীর সহানুভূতি? ঘৃণায় ঘৃণায় উহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। আর অত্যাচার? অমন প্রজাবৎসল রামচন্দ্রকেও শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। যেখানে যত ঘৃণা যত তাচ্ছিল্য সেখানে তত পশুত্ব তত দাসত্ব। ঘৃণায় মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের লোপ, দাসত্বের পূর্ণ বিকাশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন:—"যে নিজ্‌কে অধম ও বদ্ধ বদ্ধ মনে করে সে বদ্ধই হ'য়ে যায়, আর যে মুক্ত মুক্ত করে সে মুক্তই হ'য়ে যায়।"

"He who thinks himself weak shall become weak"

'তোরা নীচ হীন, তোরা মহা অপবিত্র ঘৃণীত, তোদের ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়'—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের সত্য সত্যই ঐরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহারা হীন নীচ। তাহারা মানুষ—তাহারা যে ভগবানের সন্তান, জগজ্জননী ভগবতীর স্নেহের তনয়, ঋষির বংশধর—একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে কাঠ কাটা, জল তোলা, গরু রাখা, ক্ষেত্রে কাজ করা, গোলামী

করা, দাসত্ব করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তাহাদের আর কিছুই করিবার নাই। তাহারা যে অতি ছোট অতি ঘৃণীত অতি হেয় অবজ্ঞাত মহাপাপী এ বিশ্বাস তাহাদের অস্থি মজ্জায়—রক্তের প্রতি কণায় মিশিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে যে মহাপাপে তাহাদের নীচ কুলে জন্ম; উচ্চ শ্রেণীর গালিগালাজ দুর্ব্বাক্য কুকথায়, উচ্চ শ্রেণীর অনবরত পদাঘাত ও অত্যাচারে তাহাদের পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। একদিন একটী চর্ম্মকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দেখ—তোমরা কত কাজ কর্ম্ম করিতে পার, দোকানদারী মুটেগিরি মাটী তোলার কাজ, মৎস্যের ব্যবসা ইত্যাদি কিন্তু তাহা না করিয়া তোমরা বিনা আহ্বানে ব্যাপারাদির বাড়ীতে সপরিবারে কেন যাও? সারাদিন গালাগালিই বা কেন খাও; শেষে সন্ধ্যা বেলা চিড়ামুড়ি লইয়া কোথাও বা ভগ্নমনোরথে গৃহেই বা ফিরিয়া যাও কেন?" এই কথার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা কি মর্ম্মস্পর্শী—কি নিদারুণ!!

সে বলিল—"ঠাকুর মশায়! আমরা কি চারটী খাইবার প্রত্যাশায় যাই? আমরা যাই আমাদের মহাপাপ ক্ষালনের জন্য—মুচি জন্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য। আমরা চারিটী খাইবার আশায় যাই না। এই দেখুন, মহামহা পাপের ফলস্বরূপ আমরা অতি নীচ মুচি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ভোগ! আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দণ্ড ভোগের জন্যই স্বেচ্ছায় আগ্রহ করিয়া যাইয়া থাকি। আমাদের উপর যতই গলাগালি, অত্যাচার, মারপিট্‌ হইবে, আমাদের পাপ—মহাপাপ ততই দূর হইবে। দণ্ড গ্রহণ করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে খাইতে যাইয়া থাকি?" আহা কি মর্ম্মভেদী বাণী, কি ভয়ানক বিশ্বাস? এই সর্ব্বোন্নতি ধ্বংসী সংস্কারের ফলেই নিম্ন শ্রেণীর এই শোচনীয় পরিণাম! এক সমাজের বিশ্বাসের

কথা বলিলাম, এইরূপ ভাবে প্রায় সমুদয় নিম্ন শ্রেণীর নিকট হইতে ঐ একই জবাবই পাইয়াছি।

তাহারা যে মানুষ—একথা তাহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। কথকের মুখে, যাত্রাগানে, গুরু পুরোহিতের বাচনিক, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলীর বক্তৃতায়, তীর্থক্ষেত্রে টোলে বিবাহবাসরে শ্রাদ্ধস্থলে সর্ব্বত্র তাহারা হীন ছোট অপবিত্র এই কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের ঐ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষা দীক্ষায় তাহারা চির বঞ্চিত, পিতৃপিতামহ গত বংশানুক্রমিক গুণাবলীও তাহারা কিছু পায় নাই। যাহা শোনা—অম্‌নি শেখা, অম্‌নি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া। কি ঘৃণা! নিম্ন শ্রেণীদিগকে উচ্চ শ্রেণীরা কি ভয়ানক ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করা হইয়া থাকে। ঘরে বিড়াল গেলে, দুগ্ধ মৎস্য মাংস প্রভৃতিতে মুখ দিলে, কিয়দংশ আহার করিয়া ফেলিলেও উহা নষ্ট হয় না; আর একজন সাহা বা সুবর্ণ বণিক ঘরে গেলেই কিংবা বাহির হইতে একখানা হস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলেই খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়? শুধু কি তাই, বিড়াল হয় ত বাহিরে কোন নীচ (?) শূদ্রভৃত্যের ভুক্তাহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া আসিল—পরক্ষণেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের পাত চাটিতে লাগিল, অসাবধানে রক্ষিত দুগ্ধের বাটীতে চুমুক দিল বা খোকার পাত্র হইতে থাবা দিয়া মাছখানি লইয়া গেল, ইহাতে কাহারও আহার নষ্ট হইল না, খাদ্য নষ্ট হইল না।

শুধু কি বাঁচিয়া থাকিতেই অশুচি—"মরিলে কি সকল দোষ ঘুচিয়া যাইবে? নিশ্চিত নহে। গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাঁধে করিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিবে, কারণ তাঁহারা জানেন, স্নান করিলেই শুচি হইবেন, কিন্তু বাগ্‌দীর মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বাগ্‌দীর শব দেহ সৎকারার্থ বহন করিয়াছেন কেহ শ্রবণ করিয়াছেন কি ?” (১)

কুকুর বিড়াল স্পর্শ করিয়া কয়জন লোক, কয়জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি, শূদ্র, যাহা স্পর্শ করিয়া স্বচক্ষে পুরোহিত ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে দেখিয়াছি। মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও হেয় ঘৃণীত ? মানুষ কি কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অধম অস্পর্শীয় ? শূদ্র স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়, কি ভয়ানক কথা ? যাহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গ আদি অবতারগণ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিতেন, যাহাদিগকে অবতারপ্রতিম মহাপুরুষগণ বুকের ভিতরে টানিয়া লইতেন, যাহাদিগের উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষগণ সংসার স্ত্রী পরিজন ধন-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যঝুলি স্কন্ধে করিয়াছেন, যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

“আয়ান্তু মূর্খ-বুধ-পাতকি-পুণ্যবন্তঃ
চণ্ডাল-বিপ্র-ধনহীন-সমৃদ্ধিমন্তঃ।
নানাদরো ন চ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা
সর্ব্বে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরঙ্কে ॥
—“আয়রে চণ্ডাল-বিপ্র-পাপি-পুণ্যবান্ !
আয়রে-দরিদ্র-ধন জ্ঞানী-বা অজ্ঞান !
নাহি তথা লজ্জা-ভয়-মান-অপমান,
মার কোলে অধিকার সবারি সমান।” (২)

(১) কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জি প্রণীত “ধ্বংসোন্মুখ জাতি”।
(২) পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত “সমাজ সংস্কার”।

যে মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন :—

"ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সর্ব্ব পাপিগণ।
আমার নিকটে এস পাবে পরিত্রাণ॥"

সেই মহাপুরুষগণের চির স্নেহের—চির আদরের জনগণকে আমরা কি ভীষণ ঘৃণার চক্ষেই না দেখিয়া থাকি? ইহার উত্তরে বলা হয়, "আমরা কি মহাপুরুষ যে উহাদিগকে আলিঙ্গন করিব?" চমৎকার উত্তর! এমন না হইলে কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সমাজপতি হওয়া যায়? মহাপুরুষ নহেন, পুণ্যবান্ নহেন, তাই বলিয়াই ঘৃণা করিতে হইবে? মহাপুরুষ নও—পুণ্যবান্ নও, তবে কি পাপী? পাপী হইলে ত ঘৃণা করিবার কিছুই থাকে না! তাহারাও যাহা তোমরাও যদি তাহাই হও তবে আর ঘৃণা কেন? তোমরা বড়; কেন—কিসে বড়? তোমাদের যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত, নিম্নশ্রেণীদের দেহও কি উহা দ্বারাই নির্ম্মিত নহে?—তোমাদের যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের তাহাই, তোমাদের যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এবং গন্ধ এই পঞ্চ বুদ্ধিন্দ্রীয়, তাহাদেরও তাহাই, তোমাদের যে হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রীয় তাহাদেরও তাহাই—আর তোমাদের যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি তাহাদেরও তাহাই—তার পর সর্ব্বোপরি—তোমাদের যে আত্মা তাহাদেরও তাহাই। আত্মাতে লিঙ্গ বয়স বা জাতিভেদ নাই। আত্মারূপী শ্রীভগবান্ সর্ব্ব দেহে সর্ব্ব স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তবে বল তোমরা বড় কিসে? শারীরিক বলে? দেহের বল ত তোমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর অনেক বেশী। তবে কি মানসিক বল? তাহা তোমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক থাকিতে পারে এবং নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক আছে। বরিশালের কোন সভায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত

একবার নিম্ন জাতীয়গণের মধ্যে একটী জলন্ত ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিষয়টী এইরূপ, একটী জেলের ছেলে নরহত্যা করে, উহার মাতা তাহা জানিত, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জেলেনীকে (আসামীর মাকে) সাক্ষী নির্ব্বাচন করা হয়। উহার মা হলপ পড়িয়া কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া পুত্রের অপরাধের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া আসামী পুত্র কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"মা! তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে না? আমার জীবন কি তোমার অভিপ্রেত নহে?" মাতৃদেবী তখন উত্তর করিলেন, "বাবা—আমি তোকে ভালবাসি, কিন্তু ধর্ম্মকে যে আমি তোর অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি; তোর জন্য কেমন করিয়া সেই ধর্ম্মকে নষ্ট করিব?" জানিনা—এরূপ ধর্ম্ম-প্রাণা মহিলা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির গৃহে কয়টী আছেন? তারপর বিদ্যা, বিদ্যাতেই বা তাহারা কম কিসে—? শিশুকাল হইতে সুযোগ এবং অর্থ সাহায্য পাইলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেও রত্ন জন্মিতে পারে। যদি বল—তাহাদের বিদ্বানগণের সংখ্যা কত অল্প কত সামান্য? এটীও অতি অযৌক্তিক কথা, যে সুবিধা লাভ করিয়া ইহাদের অনেকে বিদ্বান ও উন্নত হইয়াছেন, সেই সুযোগ ও সুবিধা যদি অধিকাংশ সন্তানগণ লাভ করিতে পারিত, তবে আরও অনেকে তাঁহাদের মত উন্নত হইতে পারিত। জ্ঞানহীন মূর্খ পরন্তু ধনাঢ্য অভিভাবকগণের অজ্ঞতায় এবং দারিদ্র্যের জন্য নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তাহারা শিক্ষিত হইতে পারে। বরং অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর সন্তান ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর সন্তানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বিগত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, বহু নিম্ন শ্রেণী ছাত্র প্রতিযোগীতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সন্তানগণকে পরাজিত করিয়াছে ও

করিতেছে। পিতৃ পিতামহ-অর্জ্জিত বংশানুক্রমিক বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ের ফল কোথায় দেখিতেছি ও কোথায় পাইতেছি? সংস্কৃত ভাষা ত ব্রাহ্মণ-গণের তথা কথিত একচেটিয়া বিদ্যা? বহু দিন হইল দেখিয়া আসিতেছি সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় শূদ্র নন্দন প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। শূদ্র ত দূরের কথা মুসলমান সন্তান পর্য্যন্ত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে! কৈ তোমার বংশানুক্রমিক বিদ্যার ফল? তবে বল—তোমরা কিসে বড়? তবে কি পৈতাবলে তোমরা বড়? যদি বল হাঁ তাই বটে, তবে তদুত্তরে বলা যায়—তাহাতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। ইতিমধ্যে অনেকে পৈতা লইয়াছেন ও অনেকে লইবার জন্য যোগাড়াদি করিয়াও তুলিয়াছেন।

অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছ। নিম্ন শ্রেণীর উপর দিয়া যে অত্যাচার গিয়াছে, ইউরোপের দাসত্ব প্রথা ভিন্ন, প্রাচীন ভারতে শূদ্র নিপীড়নের ন্যায় এরূপ অমানুষিক অত্যাচার কস্মিন্‌কালে কোনও দেশে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান কালেই কি সমুদয় অত্যাচার লোপ পাইয়াছে? পতিতা বেশ্যাকে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দরগণ ক্ষৌরী করে কিন্তু মালী নমঃশূদ্র পাটনীর কন্যাকে নাপিত ক্ষৌরি করিবে না পরন্তু সে যদি ধর্ম্মভ্রষ্টা চরিত্রহীনা হইয়া বার-বিলাসিনী হয়, তখন তাহাকে ক্ষৌরী করিতে আর আপত্তি নাই? কি ভয়ানক কথা! রামচন্দ্র মালীকে ক্ষৌরী করিতে দিলাম না কিন্তু সে যদি কল্য হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মালা ছিঁড়িয়া কল্মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ এবং মহম্মদ রোমজান খাঁ নাম ধারণ করে তবে আর তাহার নরসুন্দরের অভাব থাকিবে না। উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দর নন্দন তখন তাহাকে সেলাম দিয়া ক্ষৌরী করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, আজ মুক্তা মালিনী বা সরলা নমঃশূদ্রাণী নাপিত পাইল না কিন্তু কাল যদি জনৈক মুসলমান

যুবকের সহিত নিকাহ্ বসে এবং বিবি খাতেমন্নিসা বা গহরজান বিবি নাম পরিগ্রহ করে, তবে আর নরসুন্দর মহাশয় ক্ষৌরী করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবে না। এই ত হিন্দু-সমাজের অবস্থা। যত দিন সে হিন্দু ছিল, হিন্দুর দেবদেবী আরাধনা করিত, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের চরণ ধূলি লইত, যথাসাধ্য হিন্দু-আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া চলিত, ভগবানের নাম কীর্ত্তন, গঙ্গা স্নান, তীর্থ দর্শনাদি করিত—তত দিন সে নাপিত পায় নাই, কিন্তু যেই সে মুসলমান হইল বা কুলে কালী দিয়া বারবনিতালয়ে ঘর তুলিল অমনি নাপিত ক্ষৌরী করিবার জন্য হাজির। এইরূপ অত্যাচারের ফলেই ভারতে ছয় কোটী মুসলমানের উদ্ভব। তোমার প্রতিবাসী মুসলমান মহম্মদালী খন্দকার ত আর আরব পারস্য বা আফগান দেশ হইতে আইসে নাই, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ তোমারই ধর্ম্মাবলম্বী তোমারই জাতি ভাই তোমারই হিন্দু আত্মীয় ছিল, সামাজিক কঠোর অত্যাচারে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সে আজ তোমার পর তোমার শত্রু (?) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠান মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের সহিত কয় সহস্র স্বজাতীয় মুসলমান সৈন্য আসিয়াছিল? কয় সহস্র? আর আজ তাহাদের সংখ্যা কত? সমাজপতিগণ! একবার এদিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? অত্যাচারে জর্জ্জরীত হইয়া—অসহ্য বোধ করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতৃগণ দলে দলে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের একই পথে ব্রাহ্মণ ও পারিয়ার চলিবার উপায় নাই। ময়মনসিংহ জেলাস্থ কোন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাটীতে একবার একজন কায়স্থ ভদ্রলোক আহার করিতে চাকরের অসাবধানতায় প্রদত্ত নিষ্ঠাবান্ উক্ত জমিদারের কাংসনির্ম্মিত গ্ল্যাসে জল পান করেন। ব্রাহ্মণের কাঁসার গেলাসে শূদ্র এঁটো হাতে জল পান করিয়াছে, সুতরাং সে গ্লাস কি আর পুনরায় ব্যবহার চলে? তিনি বাটীর চাকর চাকরাণীদের না দিয়া

অন্য একটী লোক ডাকিয়া ঐ গ্লাস দান করিয়া দিলেন। বাটীতে থাকিলে যদি ভ্রম ক্রমে তিনি কখন উহার জল পান করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কা। এই ঘটনায় তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, কায়স্থ, শূদ্র উহাতে জল পান করিয়াছেন জন্য উহা দূষিত, নষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইল। বাসনপত্র থালা ঘটি বাটী প্রভৃতি বাগ্দী চাকরাণীরা মাজিয়া যখন বাহিরে রাখিয়া দেয় এবং কুকুরাদি যখন উহা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া থাকে তখন তাহা জল দিয়া ধুইয়া লইয়া কিরূপে ব্যবহার চলে? কায়স্থের জলপানের পর ত উহা বালী ছাই ইত্যাদি দ্বারা মার্জ্জিত হইয়াছিল—তাহা যখন অব্যবহার্য্য হইল তখন কুকুরচাটিত হইবার পর জল দ্বারা ধুইয়া ঐ বাসনপত্র কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? তবে কি কায়স্থাদি শূদ্রজাতি কুকুর অপেক্ষাও হেয়, ঘৃণীত ও অস্পৃশ্য?"

এইরূপ ভাবে শূদ্র সাধারণের ঘৃণা করিয়া করিয়া হিন্দুজাতি জগতের সর্ব্বজাতির ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে লিখিয়াছেন "যে দিন হইতে হিন্দুজাতি ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি ঘৃণাসূচক শব্দাবলী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল সেই দিন হইতেই হিন্দু-জাতির মরণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল।" পূর্ব্বেও বলিয়াছি ঘৃণায় মনুষ্যত্বের অপলাপ ধর্ম্মের অপলাপ, ঘৃণায় উন্নতির অপলাপ দেবত্বের অপলাপ। এইরূপ ভাবে নিজেদিগকে ঘৃণা করিতে করিতে হিন্দুসমাজ-পতিগণ হিন্দু-সমাজকে ধ্বংসের মুখে আনিয়া উপনীত করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর কোন প্রকার বিদ্যা নাই, বোধ-শক্তি নাই, জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়াছিল, সমাজপতিগণ যেরূপ ভাবে উঠাইয়াছে নামাইয়াছে তাহারাও সেইরূপ ভাবে উঠিয়াছে নামিয়াছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র ছিল না। যেরূপ চালাইয়াছেন সেইরূপ ভাবে চলিয়াছে। পরন্তু সংখ্যায় ইহারা কোন কালেই অল্প ছিল না—আজিও নহে।

"প্রত্যেক এক শত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ছয় জন ব্রাহ্মণ আছে। মোটামুটি হিসাবে ইহাদিগের সংখ্যা একাদশ লক্ষ হইবে। প্রত্যেক শতে পাঁচ জন কায়স্থ পাওয়া যায়। প্রত্যেক দুই শতে একজন ক্ষত্রিয় দেখা যায়। ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কাজেই কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইঁহারাও এক্ষণে বাঙ্গালী হইয়াছেন। বৈদ্যের সংখ্যা রাজপুতদিগের অপেক্ষাও অল্প। সমগ্র বঙ্গে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১২·৮ উচ্চ জাতি আছে।

"ইহাদিগের পর নবশাক ও অন্যান্য সৎশূদ্র আছে। ইহাদিগের জল উচ্চ শ্রেণীর আচরণীয়। ইহাদিগের মধ্যে বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্বুলী, তন্তুবায়, তিলি প্রভৃতি জাতি আছে। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ হইবে, বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ইহারা শতকরা ১৬·৪ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সৎগোপের সংখ্যাই অধিক এবং মালাকারের সংখ্যা কম। সৎগোপ ছয় লক্ষ হইবে, মালাকর মোটে ৩৬ হাজার। নবশাকদিগকে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আছেন। তবে ইহাদিগের ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ এবং ইঁহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তেমন ভাবে আদান প্রদান বা আহারাদি করেন না। ইহাদের স্পৃষ্টজল অনাচরণীয় নহে।

"তাহার পরের দল সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১৩·৪ হইবে। মাহিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। ইহাদের মধ্যে কতক আচরণীয় ও কতক অনাচরণীয়। ব্রাহ্মণও পৃথক্। গোয়ালাদিগের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। ইহাদিগেরও ব্রাহ্মণ আছে এবং তাহাদিগকেও নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। গোয়ালার স্পৃষ্টজল

ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পর বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি শ্রেণী। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮·৮ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক অবস্থার বিশেষ তারতম্য আছে। ধনবান্ সাহা বা সুবর্ণ বণিক ধনাধিক্য হেতু উচ্চশ্রেণীর ন্যায় আদর ও সম্মান পাইয়া থাকে। বৈষ্ণব ও যোগী হিন্দু সমাজের সহিত যেন দূর সম্পর্কিত। ইহাদিগের ব্রাহ্মণ নাই। অন্য জাতির ব্রাহ্মণ আছে এবং তাঁহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদিগের সকলেরই স্পৃষ্ট জলই কিন্তু অব্যবহার্য্য।

"ইহাদিগের পর পরবর্ত্তী শ্রেণীর হিন্দু আছে। ইহারা চাষাতী, ধোবা, কালু, কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী। তৎপর পলিয়া, পাটনী, পোদ, শুক্লী, টিপ্‌রা, তেওর, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতি। ইহাদিগের সংখ্যা ৭৬ লক্ষ এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩৯·৭ জন ইহারা হইবে।

"হিন্দুদিগের মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা খুব অধিক। ইহাদিগের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে,—তাহা হইলেই শতকরা ১১ জন হিন্দু এই জাতিভুক্ত। ইহাদিগের পরই নমঃশূদ্র। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ হইবে। বাগ্দীরও সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে—১১ লক্ষ হইবে। উত্তর বঙ্গে রাজবংশী জাতি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদিগের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাগ্দীজাতি সর্ব্বত্রই সমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারা সর্ব্ববাদী সম্মত নীচজাতি। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতি, নবশাক, সূত্রধর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণকে লোকে পতিত বলিয়া গণ্য করে। এই সকল জাতির জল অস্পৃশ্য।

"ইহাদিগের অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর লোক আছে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, ভুঁইমালী, কেওরা, কোরা, মুচি প্রভৃতি। ইহাদিগের সংখ্যা ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮।৯ সংখ্যা হইবে। মুচির সংখ্যা ৪ লক্ষের অধিক, হাড়ির ২।৷ লক্ষ, ডোম প্রায় দুই লক্ষ এবং চামার প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হইবে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে। * * * ইহারা যে জল স্পর্শ করে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর তাহা অব্যবহার্য্য। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে ঘরে বসে, ইহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেও দেওয়া হয় না।

"এক্ষণে উপরোক্ত তালিকাগুলি একত্রিত করা যাউক। যুক্ত বঙ্গে ১ কোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু আছে। প্রত্যেক শতে ১৩ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি, কিঞ্চিদধিক ১৬ জন করিয়া নবশাক ও সৎশূদ্র, ১৩ জন করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি—যাহাদিগের জল আচরণীয় নহে—বাকী ৪৮ জন করিয়া এরূপ নীচ জাতি যে, তাহাদিগের পূজাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।" (১)

নবশাক ও মাহিষ্য জাতির ধর্ম্মাদি কার্য্য যে সকল ব্রাহ্মণ সম্পন্ন করাইয়া থাকে, তাহারা হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই নবশাক ও কৈবর্ত্ত জাতি বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইবে। বাকী হিন্দুর যজন যাজন করিতে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই সম্মত হইয়া থাকে। যাহারা স্বীকৃত হয়, তাহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। শতকরা যে ১৩ জন উচ্চ জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা শতকরা ৩০টী ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে উপবেশন অপমানজনক

---

(১) "ধ্বংসোন্মুখ জাতি।"

বলিয়া বিবেচনা করেন, বাকী জাতির সহিত সংস্পর্শও ইহাদিগের নিকট দোষাবহ হইয়া থাকে। শেষোক্ত জাতি যে জল স্পর্শ করে, অন্যান্য জাতি তাহা গ্রহণ করা—ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করে।

অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, যে জাতিগত পার্থক্য কেন ঘটিয়া থাকে? কেন একজাতি উচ্চ এবং অন্য জাতি নীচ বলিয়া বিবেচিত হয়? অনেকের বিশ্বাস শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ঐরূপ হয়, কিন্তু এই বিধি ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেই অবগত নহে। শাস্ত্রবিধি কি, তাহা জানিতে পারিলে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে। গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় পূর্ব্বাপর ইহা চলিয়া আসিতেছে, অনেকে ইহাই মাত্র জানে। সাধারণতঃ বিশ্বাস বৃত্তি অনুসারে জাতি গঠিত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক হাড়ি ও কেওরা শূকর পালকের কার্য্য, ডোমেরা শবদেহ বহনাদি, চর্ম্মকার ও মুচি চামড়ার কাজ এবং রজকেরা বস্ত্রাদি ধৌত করে। কিন্তু নমঃশূদ্র, পোদ বা রাজবংশীরা কেন নিম্নজাতি বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।”

এক্ষণে ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহক বৃত্তি আদির উল্লিখিত হইতেছে। “যুক্ত বঙ্গে একশত ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪৮ জন কৃষিকার্য্য, ৩৪ জন বিদ্যাচর্চ্চা অথবা শিল্প বাণিজ্য এবং ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকেন বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা কখনই স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করেন না। এ সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য আছে। তথাপি অনেকের নিকট ইহা বিশেষ অভিনব সংবাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ কৃষিজীবী। অতি নীচ জাতি বাগদীদিগের কথাই ধরুন না কেন! পশ্চিম বঙ্গে ইহাদিগের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন

কৃষিকার্য্য, ২০ জন খাদ্যাদি বিক্রয়, ১৮ জন দৈনিক মজুরী এবং ১২ জন অন্যান্য রূপ কার্য্য করে।

"বাউরি আর একটী হীনজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও শতকরা ৩৬ জন কৃষিজীবী, ৪৩ জন দৈনিক শ্রমজীবী, ৭ জন গো মেষাদি পালক এবং বাকী অন্যরূপ ব্যবসায়ী। একশত জন চামার ও মুচির মধ্যে ৩৩ জন শিল্পী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গে ১০০ জন নমঃশূদ্রের মধ্যে শতকরা ৮২ জন চাষের উপর নির্ভর করে, এবং অবশিষ্ট ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করে। ১০০ জন রজকের মধ্যে শতকরা ৬০ জন জাতি ব্যবসায় এবং ৩১ জন কৃষকের কাজ করে। ১০০ জন কর্ম্মকারের মধ্যে ৩০ জন চাষ, ৪৭ জন লৌহাদির কার্য্য এবং ২৩ জন অন্যান্য কার্য্য করে। ১০০ জন কায়স্থের মধ্যে ৬৬ জন চাষ, ৮ জন বিদ্বজ্জনোচিত বা শিল্পাদি কার্য্য করে। শতকরা ৮৫ জন পদ্মরাজ এবং ৯২ জন রাজবংশী কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

"উপরিলিখিত তালিকা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ব্যবসা বা বৃত্তির সহিত জাতি নির্ণয় বা জাতি বিচারের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই।" (১) * * *

১০০ জন হিন্দু জাতির মধ্যে ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আছে ইহারা "দেব" উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, বাকী ৯৪ জন "দাস" বলিয়া পরিচিত। নিম্ন জাতির লোক ব্রাহ্মণ দেখিলে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে। এই দণ্ডবৎ অর্থে কাষ্ঠগুচ্ছের ন্যায়; জীবিত জীবের ন্যায় ত নহেই—মানুষ ত দূরের কথা;—ভূমিতে আপতিত হওয়া।

* * * * "ইতর বা অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে থাকিতে

(১) কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি।"

হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল স্থানে সকলের সঙ্গে সমবেত হইতে পারে না। * * * * পূজা কথকতা প্রভৃতি জাতীয় উৎসবে সকল জাতি উপস্থিত হইলেও জাতি-বিচারের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন হাড়ি অথবা ডোম, ইহারাও হিন্দু—পূজার দালানে উঠিলে কুক্কুরাদির ন্যায় বিতাড়িত হইয়া থাকে। পূজাদি ব্যাপারে জাতি বিচার পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইতর জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। যে সামান্য শিক্ষালোক তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চজাতির নিকট ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার পাইলেও তাহারা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় না ;" * * *

"সমগ্র সাঁওতাল পরগণা এবং ছোট নাগপুর বিভাগ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়া মিশনারীদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবং ঐ সকল লোককে যে ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইতেছে তাহাতে অতি সত্বরই সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুর বিভাগ—যাহা আয়তনে আসামের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং যুক্ত বঙ্গের প্রায় তুল্য হইবে—খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে গাড়ো ও নাগারাও খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত হইতেছে।"

"ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের প্রতি কিরূপ ভাবাবলম্বন করেন ? কেহ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বানও করেন না, কেহ প্রতিবন্ধকতাও প্রদান করেন না। উহারা হিন্দু বলুক আর নাই বলুক, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই অসভ্য জাতিরা হিন্দু হউক আর নাই হউক, ব্রাহ্মণদিগের নিকট সমভাবে অস্পৃশ্য। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণেরা সম্মত হইবে না। যদি কোন ব্রাহ্মণ উহাদিগের পুরোহিত হয়, তাহা হইলে সে অমনি "পতিত" বলিয়া গণ্য হইবে এবং এমন কি উহাদিগের অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর

ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সেই ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল কেহ গ্রহণ করিবে না।" * * * *।

"শুদ্ধ যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের সংস্পর্শে আইসে না তাহা নহে, কায়স্থ বৈদ্য এমন কি নবশাক পর্য্যন্ত ইহাদিগকে (হাড়ি ডোমকে) স্পর্শ করে না; ইহাদিগের সহবাসেও দোষ ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণেরা যে পথ প্রদর্শন করেন, অন্যান্য জাতি তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে।"

* * * "ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইতর জাতির যেরূপ সম্বন্ধ সাহেব-দিগের সহিত দেশীয়দিগের তদ্রূপ সম্বন্ধ! তুলনাটা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ না হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ইতর জাতি এদেশে যতকাল আছে, সাহেব ও দেশীয় ততকাল নাই, কাজেই কতক বিষয়ে তুলনা না হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইতর জাতিকে যেরূপ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যেরূপ অবমাননাকর ব্যবহার, সহবাস পরিহার প্রভৃতি করিয়া থাকে, সাহেবেরাও তদ্রূপ করে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক অগণিত লোকের সহিত যুগযুগান্তর একদেশে বাস করিয়া কিরূপে স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন।"

"উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ স্বধর্ম্মীর সহিত একত্র যোগদানে একান্ত অনিচ্ছুক। সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা এই সমস্ত সমধর্ম্মীর সহিত সম্মিলিত না হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। যতক্ষণ না উচ্চনীচ ভাব পরিস্ফুট হয়, যতক্ষণ না আমরা অন্য বর্ণের সহিত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে সমর্থ হই, ততক্ষণ আমাদের মনে আনন্দ হয় না। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বার জন হিন্দু বর্ণগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া সমভাবে সমক্ষেত্রে একযোগে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। অনৈক্য যেন আমাদিগের

জাতিগণ ধর্ম্ম হইয়াছে—যেন আমাদিগের সামাজিক অবয়বের অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতর জাতি বাগ্দীর কথাই ধরুন। বাগ্দীর সংখ্যা কায়স্থের অপেক্ষা কম নহে। প্রত্যেক জাতির শারীরিক ও মানসিক অভাবপূরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু বাগ্দীর পারত্রিক মঙ্গলের এবং মানসিক উন্নতি সাধনের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আছে কি? সে কালের কোন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নিম্নজাতি বাগ্দীর উপকারার্থ তিনি কি করিয়াছেন? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। "বাগ্দী কি একটা মানুষ"—যে তাহাদের জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন আছে? সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের মনে ইহাই উদিত হইবে। বাগ্দী যে হিন্দু, ম্লেচ্ছ বা যবন নহে তাহা ব্রাহ্মণ স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহাতে কি হয়? সে যে বাগ্দী—হীনজাতি। বাগ্দীর কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণের যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনোমধ্যে কখন উদয় হয় নাই, কেননা ব্রাহ্মণের অন্যান্য অনেক কাজ আছে ত?

"বাগ্দীর যে ধর্ম্ম বা নীতি জ্ঞান শিক্ষা দিবার গুরু নাই, আমি তাহা বলিতেছি না। বাগ্দীজাতির পারত্রিক মঙ্গল সাধনার্থ কোন না কোন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে বটে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা "পতিত" বলিয়া গণ্য করেন। অপরাধ তিনি বাগ্দীদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা কেন, অন্য জাতিও তাহাকে বাগ্দীর ন্যায় অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বাগ্দীর ব্রাহ্মণ বাগ্দীদের ন্যায় অজ্ঞ ও দরিদ্র হইয়া থাকে। তিনি যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন তাহা উচ্চ নীতি বা ধর্ম্মমূলক নহে। বস্তুতঃ, নিজের অজ্ঞতাবশতঃ তিনি কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। বাগ্দীরা কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পাইয়া "হাতে স্বর্গ" পাইয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই

অবিসংবাদিতরূপে ইতর জাতির শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত তাহা হইলে ইতর জাতির কোনরূপ ধর্ম্মজ্ঞানই হইত না! সুখের বিষয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, চৈতন্যের শিক্ষা হিন্দুর নিম্ন স্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ১ কোটি ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি ৫০ লক্ষ চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

"বস্তুতঃ বাগ্দীর ধর্ম্মগুরু গোস্বামী বা ঠাকুর—মনুষ্যসমাজের হীন আদর্শ স্থল। এই বৈষ্ণব গুরু সকল জাতির লোকই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই। ইহাদিগের শিক্ষা বা সঙ্গতি শিষ্যদিগের অপেক্ষা বিশেষ অধিক নাই। শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাদি লাভের প্রত্যাশায় দরিদ্র বাগ্দীর গৃহে গুরুর পদার্পণ হইয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে গুরুর ইহাই পেশা। এই ব্যবসা যে ভাল চলে না এবং ইহাতে অর্থলাভও যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। বাগ্দীশিষ্যের বাটীতে গুরু আহার করেন না, এমন কি একত্রে উপবেশন পর্য্যন্ত করেন না। আর ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষাদানের কথা? গুরুর নিজেরই তাহার বিশেষ অভাব, সুতরাং শিক্ষা দান করিবেন কি? ইতর জাতিদিগের মধ্যে যে দয়া দাক্ষিণ্য সম্পন্ন ধার্ম্মিক ও নীতিবান্ লোক নাই, আমি তাহা বলিতেছি না, তবে উহা গুরুদত্ত শিক্ষার ফল নহে। নিজেদের পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিণাম।"

"ইতরজাতীর আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক হিন্দুই তাহা বলিতে পারিবেন না। ভদ্রলোকে এ বিষয়ে কখনই মস্তিষ্ক চালনা করেন না। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুলেপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া আছে, সম্ভ্রান্ত লোকে এ পল্লীতে প্রায়ই গমন করেন না। কারণ বাগ্দী প্রভৃতি জাতির সমস্তই অস্পৃশ্য, তাহাদিগের দেহ, তৈজসাদি, আহার্য্যাদি, এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য ও সংক্রামক। ইহাদিগের জাতিগত কার্য্য

লইয়া সম্ভ্রান্ত জাতিরা অতি সামান্যরূপ সংস্পর্শে কথন কথন আইসেন,—তদ্ব্যতীত ইতরদিগের সহিত বিশেষ সংস্রবই রাখা হয় না। উৎসবাদিতে সকলের শেষ ভাগে—যেখানে কাহারও সহিত সংস্রব নাই—ইহারা উপস্থিত হইতে পারে। বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে কোন নীচ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে দূরে কদর্য্যস্থানে অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতরজাতিরাও পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানাদি জানে—কাজেই কোনরূপ গোলযোগ ঘটে না! * * * * ইতর জাতির যদি কোন লোক পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাসী স্বজাতিই তাহার পরিচর্য্যায় রত হইয়া থাকে। কে কবে শুনিয়াছেন, ভদ্রলোকে ইতরজাতির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া রোগীর সেবাদি করিয়া থাকেন।" * * * * * * * * * *।

বিদ্যাচর্চ্চার কথা আর কি বলিব—। "বাগ্দীদিগের মধ্যে হাজার করা ১৭ জন পুরুষ লেখা পড়া জানে। যাহাদিগের শিক্ষাদির পরিমাণ এরূপ, তাহারা কিরূপ লোক হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা যে অধঃপতিত জাতিভুক্ত অধঃপতিত লোক, তাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারাই বুঝিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের চিত্র গভীর—মর্ম্মস্পর্শী। ইহারা আবহমানকাল হইতে দরিদ্র—ভীষণ দরিদ্র। উদর পূর্ণ আহার কদাচ ঘটিয়া থাকে। ইহারা অলস, অমিতব্যয়ী ও অবিশ্বাসী। ইহাদিগের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাদিগের মস্তকাচ্ছাদনের স্থান—জীর্ণ শীর্ণ কুটীর—কখন পড়িয়া যায় স্থির নাই। এরূপ দরিদ্রতা সত্বেও ইহারা অত্যন্ত অলস। যদি ঘরে দিনান্তে আহার যুটিবার সংস্থান থাকে, তাহা হইলে ঘরের বাহির হইবে না। যদি দৈনিক-মজুরী পেশা হয় এবং কাজ করিতে যাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কেহ কাজ করাইবার জন্য ডাকিতে আসিলে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে,

পরিবারকে বলে—"সে গৃহে নাই—কর্ম্মদাতাকে যেন এই কথা বলা হয়।" "কাজে লাগিলে" যতদূর ঠকাইতে পারে, নিয়োগকারীকে ততদূর ঠকাইবার চেষ্টা করে। কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। কেহ দেখিলে তাম্রকুট সেবন বা কথোপকথন করিতে থাকিবে। তাহার পর নিজের দুঃখের গল্প, কার্য্যের কাঠিন্যের কথা এবং নানারূপ পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করিবে।"

ইহারা যেমন অলস, তেমনি অমিতব্যয়ী। যদি দৈনিক তিন আনার পয়সা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে স্ত্রীকে ছয় পয়সা দিবে এবং ছয় পয়সার তাড়ি পান করিবে। মত্তাবস্থায় ঘরে আসিয়া যদি মনোমত আহার্য্য না পায়, তাহা হইলে স্ত্রীর মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে। যখন অনশনে বিশেষ ক্লিষ্ট হয় এবং "হাতে কাজ কর্ম্ম" কিছুই থাকে না, তখন তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। উচ্চ জীবনের কল্পনাও তাহার মনোমধ্যে কখন উদিত হয় না। আত্মসম্মানের কথা? সে কথার অর্থও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ সে যে জাতিতে বাগ্দী, ইতরজাতি ভুক্ত। যাহা কিছু পাপজনক—নীচ, তাহারই প্রতি শব্দ ইতর জাতি। তাহার স্বজাতির লোক ছাড়া সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। স্বজাতির মধ্যে "বেরাদারী" আছে,—অন্য জাতির সহিত বেরাদরী ভাব ও থাকিতেই পারে না। সে যখন বাগ্দী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই উচ্চাভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মান, স্বাবলম্বন প্রভৃতির অর্থ তাহার কাছে কিছুই নাই। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য সে কলিকাতায় যায় না কেন? ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সে বলিবে কলিকাতা অনেক দূর—রেলগাড়ীর ভাড়া নাই, সেখানে থাকিবার খরচ চাই; জানা শুনা লোক কেহ নাই,—সুতরাং সেখানে গিয়ে কেমনে কাজ পাইবে? কতক পরিমাণে কথা সত্য, কোন হোটেল প্রভৃতি স্থানে গিয়া সে জাতির পরিচয় দিলে তাহাকে কেহ

খাইতে বা থাকিতে স্থান দিবে না। ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকরেরা যদি জানিতে পারে সে বাগ্দী, তাহা হইলে তাহারা তাহার সম্পর্কে কোন কার্য্যই করিবে না। কাজেই যেখানে পূর্ব্বপুরুষ কাটাইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই থাকাই শ্রেয়ঃ। সত্য বটে, দিন ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উপায় কি ?

"গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাঁধে করিয়া ফেলিয়া আসিবে কিন্তু বাগ্দীর মৃত দেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না।"

এখন দেখুন বাগ্দীর জীবন কিরূপ ? শারীরিক অবস্থায় সে রুগ্ন; অভাব, অনাহার, পান-দোষ ও অন্যান্য দুষ্কার্য্য তাহার স্বাস্থ্যকে একেবারে ভঙ্গ করিয়া ফেলে। মানসিক অবস্থায় পশ্বাদির অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ কিসে ? শতকরা ৯৮ জন নিরক্ষর। নীতিজ্ঞানও তথৈবচ; ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত—বিধ্বস্ত। বহু বৎসরের অবনত অবস্থা ইহাদিগের হৃদয় হইতে সদ্বৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিয়াছে। *

---

* ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের অবজ্ঞাত জাতিদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—ভগবৎ কৃপায়, দেশে শিক্ষা বিস্তার সংবাদ পত্রাদি প্রতিষ্ঠার ফলে—তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অবজ্ঞাত ভ্রাতাদের উচ্চ শিক্ষিত নেতৃমণ্ডলী স্ব স্ব সমাজে জাতীয় সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় গ্রন্থ প্রচার ও সংবাদপত্র, মাসিক পত্রাদি পরিচালন দ্বারা সমাজে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছেন। হাওড়া নিবাসী, ভারতবন্ধু সপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের ২০ লক্ষ বাগ্দী বা ব্যগ্রক্ষত্রিয় ভ্রাতাদের পরিচালনা ও নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তৎসমাজে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"বাগ্দী বা ব্যগ্রক্ষত্রিয় জাতি,—পশ্চিমবঙ্গে এই জাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়; তথায় ইহারা প্রায় বিশ লক্ষাধিক। ইহারা শক্তিমান, তেজস্বী ও সরল প্রাণ জাতি। কৃষি

যে সকল কথা বাগদীদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নিম্নশ্রেণীর সকল জাতির পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। মুচি, কেওড়া, বাউড়ি, তেওর * * * * * * চণ্ডাল চামার, ডোম, হাড়ি, প্রভৃতি জাতি—যাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দু সমাজে শতকরা ৫৮ জন হইবে—সমাবস্থাপন্ন। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেবল ধর্ম্ম ব্যতীত আব কিছুরই সৌসাদৃশ্য নাই: এমন কোন উৎসব বা সামাজিক ব্যাপার নাই—যে উপলক্ষে ইহারা পরস্পরে মিলিত হইতে পারে। যদি কখন কোন ঘটনায় ইহারা সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে এক জাতি অন্য জাতির সহিত বসে না, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পৃথক ভাবে স্থানাধিকার করে। কখন কখন এক জাতির কোন লোকে অন্য জাতির পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে

বৃত্তি ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। ইহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি অধুনা ব্যবসা এবং শিল্প কার্য্যাদির দ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। অনেকে এজাতিকে পশ্চিম বঙ্গের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিয়া থাকেন। ইহারা না থাকিলে তথায় তথাকথিত উচ্চ জাতিদিগের দিন চলা ভারস্বরূপ বোধ হইত এবং দক্ষিণ হস্তের কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিজেদিগকে গুরুতর শ্রমসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইত। দেশীয় মল্লের আবশ্যক হইলে এখনও এই জাতির মধ্যে হইতে উহা সংগৃহীত হয়। ইহারা ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করে, কোন কোন স্থলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেনাপতি, সিংহ, দলপতি, পাত্র, মিত্র, মহাপাত্র, মালিক প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে। এ কারণ অনেকে মনে করেন ইহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর।

গত দুই বৎসর কাল ইহারা সমিতি আদি সংস্থাপন করিয়া পূর্ণ ঐক্য বলে দিন দিন বলীয়ান্ ও শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে। মদ্যাদি পান হইতে একেবারে বিরত হইয়া দিন দিন আচার ও নিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে এবং দ্রুত শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। বহুল পরিমাণ পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় এবং হরিসভা আদি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। সন্ধ্যার সময় ইহাদের পল্লীতে গমন করিলে হরিনাম শ্রবণে কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয়।"

বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াও ঈর্ষা দ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এবংবিধ ঈর্ষাদি প্রদর্শনের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অন্য কিছু নাই, এই সকল জাতির একত্রে সমাবেশ প্রায়শঃ ঘটে না। তথাপি এই ইতর জাতির মধ্যে এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই ভাব বিদ্যমান আছে—বেশ বুঝা যায়।"

"ধোপা, মাহিষ্য, (জেলে কৈবর্ত্ত) কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণীর আপনাদিগের মধ্যেই আবার প্রাধান্য ও হীনতা আছে। কোন কারণবশতঃ কোন লোক জাতি বিগর্হিত কোন কার্য্য করিলে—তাহার স্বজাতি তাহাকে অধঃপতিত ভাবে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব আদৌ বিচার করে না। পূর্ব্ব বঙ্গে সে দিনের হাঙ্গামায় রাজবংশীরা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রহৃত হয়। যাহারা নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অন্য রাজবংশীরা জাতিচ্যুত করে। নীচ জাতির সহিত একঘাটে স্নান করিলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। বিগত জামালপুরের হাঙ্গামায় যে সকল হিন্দু রমণী মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়াছিল, তাহারা জাতিচ্যুতা হয়—পিতৃকুল ও পতিকুল হইতে পরিত্যক্তা হয়,—অবশেষে নিরাশ্রয় অবস্থায় খৃষ্টানদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উচ্চ স্তরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, পরামাণিক, সদ্গোপ, তন্তুবায়, তিলি অথবা মাহিষ্য অস্পৃশ্য নহে। ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—কাজেই স্থানও আছে, ইহাদিগের ব্যতীত সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, কাজেই ইহাদিগকে পরিবর্জ্জন অসম্ভব। তথাপি ইহারা 'দাস' অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য আখ্যাভুক্ত। অস্পৃশ্য জাতি অপেক্ষা ইহারা অধিকতর সুবিধা বা ক্ষমতা পাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে থাকিতে

বাধ্য। ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্রে আহার বিহারের কথা ত দূরে—উপবেশন পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ভিন্ন শ্রেণীর নবশাকেরা কদাচ একত্রিত হয়। ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশা আছে। অস্পৃশ্য জাতির প্রতি ঘৃণা ইহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের যজনাদি ব্রাহ্মণ করে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাজকও অন্যান্য ব্রাহ্মণের চক্ষে হীন ও অবনত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণী স্বতন্ত্র, স্বাধিকৃত। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত একত্রে আহারাদি অথবা কার্য্যাদি করে না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখে না, পরস্পরের মধ্যে সাহায্যাদি বা সহযোগিতা তিল মাত্র নাই, প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণী অপেক্ষা এরূপ স্বতন্ত্র যে ভিন্ন দেশবাসী হইলেও এতদপেক্ষা অধিকতর স্বাতন্ত্র্য বা সংস্রব শূন্যতা পরিলক্ষিত হইত না। স্বজাতির মধ্যেও একতা পরিলক্ষিত হয় না। সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণার্থ ব্যস্ত, অন্যের ইষ্টানিষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। জাতিগত ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ইহাদিগের আবশ্যক মত মূলধন নাই—শিক্ষাও নাই। ব্রহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বিষয় এ অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, নিম্নশ্রেণীর শোচনীয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত তুলনা করিয়া তাঁহাদের কথাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

"তাহার পর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতির কথা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ হইবে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় এক-অষ্টমাংশ। মনে করুন, দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদিগের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে—যথা রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র। উভয়েই যদি রাঢ়ী শ্রেণীর লোক হয়েন, তাহা হইলেও গোত্রের কথা উত্থাপিত হইবে। গোত্রও প্রায় ধার প্রকার আছে। তাহার পর গোত্রের মিলন হইলেও 'মেলের' বিচার

আছে। মেল প্রায় বিংশতি প্রকার আছে। 'মেল' এক হইলেও কাহার সন্তান, কি গাঁই, এ সকল প্রশ্নও উপস্থাপিত হইতে পারে। 'স্বভাব' কি 'ভঙ্গ' ইহাও জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ভঙ্গ হইলে পুরুষ নির্ণয় করিতে হয়।

বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যেও ঐরূপ বিভাগ আছে। কলিকাতার সান্নিধ্যে হাড়িদেরও তিন শ্রেণী হইয়াছে। এক শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে, এক শ্রেণী শূকর চড়ায় এবং এক শ্রেণী সাহেবদের বাবুর্চ্চির কার্য্য করে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ রাঢ়ী, বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণী সকলেই স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়া থাকেন, হাড়িরাও তদ্রূপ স্ব স্ব শ্রেণীকে প্রধান বলিয়া গণ্য করে।" "আরও একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। একশত জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে, একশত জন বৈদ্যের মধ্যে ৬৫ জন লেখা পড়া জানে। কায়স্থদিগের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে বলিয়া উহার অপেক্ষা কম লোকে লিখিতে পড়িতে জানে, এরূপ অনুমান হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রেণীর ইষ্টানিষ্ট সেই শ্রেণীর লোকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর শুভাশুভ সম্বন্ধে চিন্তা করিত না। এক্ষণে আর সে ভাব নাই—উচ্চ বর্ণের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

"পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রাহ্মণদিগের জাতিগত ব্যবসা যজন যাজন। শতকরা ৮০ জন আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। বৈদ্য ও কায়স্থদিগের জাতিগত ব্যবসা কি একথা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ২টী বিষয় সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে দেখা যায়। প্রথমতঃ বিদ্বৎজনোচিত ব্যবসা ইহাদিগের এক চেটিয়া; দ্বিতীয়তঃ যে বৃত্তি অবলম্বন করিবার ইহাদিগের ইচ্ছা, সেই বৃত্তিই ইহারা গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহা সংস্কার বা আচার অনুমোদিত হউক আর নাই হউক। কোন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ

মহিলা কোন ধাত্রী কার্য্য নিপুণা অশিক্ষিতা মালী নমঃশূদ্র বা হাড়ি জাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসিবেন না কিন্তু তাঁহার পুত্র যদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়—তবে তিনি নিজেকে ধন্যা মনে করেন এবং কতদূর সুখী হন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের অনেক পিতামাতা অভিভাবক নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত ম্লেচ্ছরাজ্যে ম্লেচ্ছ (!) সংসর্গে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারাই আবার আপনাদিগের সন্তানগণকে স্বদেশে নিজের গ্রামে নবশাকের সন্তানগণের সহিত একত্রে বসাইয়া শিল্পশিক্ষা করিতে দিতে সম্মত হন না ! কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে আস্তে আস্তে এ ভাব দেশ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে ৪৫টী ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ—উচ্চজাতির বালক।

এক্ষণে শিক্ষাগত সংস্কারের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

“বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু উপাধিধারীর সংখ্যা দশ হাজারের অধিক হইবে না। বারজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট হয়। এই হিসাব ধরিলে গ্রাজুয়েটের সংখ্যার দশগুণ অধিক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, স্থির করিতে হইবে। ইহার উপর গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা যদি ৪০ সহস্র যোগ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক পাওয়া যায়। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটী ৯০ লক্ষ হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক ১২৭ জনের মধ্যে ১ জন লেখা পড়া জানা লোক আছে। ১৮১৭ সালে বাঙ্গালীদিগের দ্বারা বঙ্গের প্রথম বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। সুতরাং এক শত বৎসরের শিক্ষাফলে যে উহা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

"একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এক সহস্র বৈদ্যজাতীয় পুরুষের মধ্যে ৬৪৮ জন লেখা পড়া জানে, এক সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৩৯ জন, এক সহস্র প্রকৃত কায়স্থের মধ্যেও ঐরূপ সংখ্যক লোক লিখিতে পড়িতে পারে। ইহারা উচ্চ জাতি। গন্ধবণিক জাতীয় নরনারীর মধ্যে হাজার করা ৩১৮ জন, কাঁসারীর মধ্যে ২১৮ জন, ময়রার মধ্যে ২৪৮ জন, সুবর্ণ বণিকের মধ্যে ৩২৩ জন লেখা পড়া জানে। ইহারা প্রধানতঃ নবশাক। নবশাকের মধ্যে সকল জাতি ঐরূপ উন্নত নহে, কুমারদিগের মধ্যে হাজার করা ৩৪ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে।

"তার পর অধম জাতির কথা ধরুন। জেলিয়াদিগের মধ্যে হাজার করা ৪৩ জন, ধোপাদিগের মধ্যে ২৬ জন, তেওরদিগের মধ্যে ২৮ জন, নমঃশূদ্রের মধ্যে ৩৩ জন, কাওরাদিগের মধ্যে ৩১ জন, বাগ্দীদিগের মধ্যে ১৬ জন, ডোমদিগের মধ্যে ১২ জন, হাড়িদিগের মধ্যে ১০ জন, চামারদিগের মধ্যে ৬ জন এবং বাউরিদিগের মধ্যে ৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। হিন্দু মুচিদিগের মধ্যে হাজার করা ৮ জন।"

"এখন মোট হিসাব দেখা যাউক। বাঙ্গালী হিন্দু ৫০টি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণ * * * * ইহারা যে কেবল অবশিষ্ট শতকরা ৮৭ জন হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে, তাহা নহে, সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমেও ইহারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির প্রতি ইহাদিগের যে কোনরূপ কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তাহা ইহারা স্বীকার করে না।

"তাহার পর নবশাক বা শিল্পী জাতি বা চাষী গোয়ালা ও মাহিষ্যের কথা। প্রত্যেক জাতি সামাজিক ও ব্যবসায় হিসাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানাধিকার করে। তাহারা যে ব্রাহ্মণেতর জাতি, তাহা স্বীকার করে এবং উচ্চবর্ণের

ন্যায় ইতর জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে। দেশের শিল্পাদি কার্য্য এক সময়ে ইহাদিগের হস্তেই ছিল। এখন ইহাদিগের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই আপনাদিগের বৃত্তি পালন করিয়া থাকে। ইহারা উচ্চ জাতির সহিত মিশিতে পারে না। আপনাদিগের মধ্যে কদাচ মিলিত হয়; নিম্নজাতির সহিত ত একেবারেই মিলিত হয় না।

"তৎপরে নিম্নশ্রেণীর কথা—ইহার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি আছে। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮·জন এই জাতির অন্তর্গত। ইহারা আবার ৩০টী পর্য্যায় ভুক্ত—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে দুইটী জাতি (সুবর্ণ বণিক ও সাহা) অর্থশালী ও ক্ষমতাবান, এমন কি উচ্চবর্ণ অপেক্ষা এই দুই জাতি কোন অংশে হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; অবশিষ্ট ২৮টী জাতির সংখ্যা ১ কোটী ২০ লক্ষ হইবে। বাকী ৪২টী জাতি সহায়সম্পত্তিহীন, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

তবে কি কোন বিষয়েই এই জাতিসমূহের মধ্যে সমতা নাই? হাঁ আছে বই কি? "প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রত্যেক লোকই স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত। অজ্ঞতা, অসূয়া ও অবিশ্বাস-পরবশ হইয়া সকলেই আপনাকে অন্যের সহিত সংস্রবশূন্য বিবেচনা করে, প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষাহেতু একজন অন্যের সহিত সম্মিলিত হয় না। (১)

দারিদ্র্যই নিম্নশ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূলীভূত কারণ। এই দরিদ্রতার জন্যই তাহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না। "সমুদয় অনর্থের মূল এই দারিদ্র্য। নির্ধন অবস্থায় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সঙ্ঘশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বাহু বলের

(১) ধ্বংসোন্মুখ জাতি।

হ্রাসের সহিত পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি বৃত্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হয় না, অধ্যাপক হক্স্‌লি, কিড্‌ ও রোমানিস্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধন ঐশ্বর্য্যের সহিত ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধপ্রাণে কোন শিষ্যকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। * * * * * "দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক'জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্‌ আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর; আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি কর্‌ছেন? খালি বল্‌ছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।" (১)

(১) পত্রাবলী—১ম ভাগ।

স্বামীজি বলিতেন, আয়র্লণ্ডের ক্ষুধাতুর কৃষক যখন আমেরিকার স্বাধীন মাটীতে পদার্পণ করে, তখন তাহার কেমন ভয় ভয় চাহনি, বাধ বাধ কথা, যেন চলিতে বলিতে তাহার কেমন একটা আড়ষ্টভাব। কেন এমন হয়; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, আইরিশ কৃষক দেশে থাকিতে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের নিকট শুনিয়াছে যে, সে গরীব নীচ আইরিশ কৃষক; তাহার জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই; শুধু দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উচ্চশ্রেণীর সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম। জীবনের প্রথম হইতেই এই সকল উৎসাহহীন কথা শুনিয়া শুনিয়া আইরিশ কৃষকের জীবন শুকাইয়া গেল; সে আর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিল না, স্বদেশে বসিয়া সে শুধু এই লাভ করিল যে, তাহার জীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ থাকিতে পারে না।

তাই সে যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইল, তখন সে ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতার লীলাভূমিতে কে তাহার নিকট হইতে মুক্তির বারতা গোপন করিয়া রাখিবে? আমেরিকার মাটিতে পা দিয়াই সে শুনিল—জগদীশ্বর মানবের পিতা এবং পৃথিবীর নরনারী সকলেই তাঁহার সন্তান! কেন তবে আইরিশ কৃষক তুমি ভয়ে ভয়ে চল? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ; আমার ন্যায় তুমিও শিক্ষালাভ কর এবং পরিশ্রমী হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের নিশ্চয় অবসান হইবে। যেই সে এই সহানুভূতির বাক্য শুনিল, সেই তাহার চেহারা ফিরিয়া গেল; তাহার আড়ষ্ট ভাব দূরে চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে সে একজন সাহসী কর্ত্তব্যপরায়ণ পরিশ্রমশীল অমেরিকান হইয়া গেল;—দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সেও জীবন দিতে শিক্ষালাভ করিল। সহানুভূতি এবং প্রেম এমনি করিয়াই মানুষকে বড় করিয়া তুলে।

"এই আইরিশ কৃষককে যেমন এতদিন আয়র্লণ্ডের উচ্চশ্রেণী মাথা

তুলিতে দেয় নাই, আমরাও তেমনি আমাদিগের দেশের অগণ্য লোক-দিগকে আজ বহু শতাব্দীর মধ্যে মানুষ হইতে দিই নাই। নিরক্ষর শ্রম-জীবী যদি তাহার প্রদত্ত টাকার রসীদ অথবা দাখিলাখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে, অমনি আমরা—ভদ্রলোকেরা রুক্ষস্বরে তাহাকে বলিয়াছি—"এ্যাঃ—কৈবর্ত্তের পো আবার লেখা পড়া শিখেছে।" মুচি যদি ভুলক্রমে আমার ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, অমনি আমার ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে এবং সেই হতভাগ্য মুচিকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

"চামার যদি পেটের জ্বালায় বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ক্ষুধাতুর কণ্ঠে বলিয়াছে—'মা! আমি অভুক্ত, উপবাসী, আমাকে দু'মুঠা খাইতে দাও'—অমনি আমরা আমাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই মুচি, এখান হইতে দূর হইয়া গিয়া ঐ দূরে বাগানের কাছে গাছ তলায় যাইয়া অপেক্ষা কর। ঐখানে এঁটো কাঁটা যাহা কিছু দিবার দেওয়া যাইবে"। (১)

বিগত ১৩২৪ সনের ৩২তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা য়্যানি বেসান্তও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"* * * উপেক্ষিত জাতি-গণকে অবহেলা করা হইয়াছিল। তাহারা দেখিতেছে যে খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক। তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর বিপদ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। * * * মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্ত সন্তানের এখন এই সমুদয় উপেক্ষিত সন্তানগণকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য।"

(১) "নিগৃহীতের অভ্যুত্থান," সঞ্জীবনী, ১০ই চৈত্র ১৩১৪।

"আর এক ঋণ দেশের অনুন্নত শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে। এই Depressed class এর কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। মানুষের বিধি ব্যবস্থা মানুষকে কত হীন করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সকল সুফল হইতে বঞ্চিত। ইহাদের সেবা ছাড়া সমাজ চলিবে না,—অথচ পদাঘাত ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও প্রাপ্তি নাই। মানুষের ঘৃণিত স্বার্থপরতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাদিগের শিক্ষা দানের বিরুদ্ধে যখন যুক্তি শুনি—'তাহা হইলে আমাদিগের চাকর মিলিবে না'—তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে হয়—'ছোট' নাগপুর অপেক্ষা 'বড়' নাগপুরেই—এই সব হামবড়াদের মধ্যেই—ধর্ম্ম প্রচারের কত বড় ক্ষেত্র রহিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণের নীচে একি অমানুষিক হীনতা!

* * * প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিবার অবকাশ খুঁজিতেছেন, মানবাত্মায় যে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যে রীতি নীতি আচার পদ্ধতি সেই প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করে তাহার বিরুদ্ধে অনন্তকালব্যাপী সমর ঘোষণা করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে,—মানুষ এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহার চাপে অন্তরস্থ ব্রহ্ম নিষ্পেষিত। ইহাই বাস্তবিক ব্রহ্মহত্যা। যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে,—মানুষকে তাহার ব্রহ্মসন্তানত্বের দাবী হইতে বঞ্চিত করে, তাহার বিপক্ষে—'দেশভক্ত' কখনও সংগ্রাম করিতে বিরত হইতে পারে না। মানুষকে মানুষ হইতে দাও—"(১) তাহাদের হাত ধরিয়া তোল,—উঠাও। তাহাদের পদদলিত করিয়া—আত্মহত্যা ও স্বদেশহত্যা করিও না।

---

(১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, লিখিত "জাতীয় জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সিদ্ধি" বৈশাখ, ১৩২০ নব্যভারত।

অবজ্ঞাত শ্রেণীর প্রতি উচ্চ জাতির দারুণ অত্যাচারের শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া এবং "ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করা উচিত" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ। যত দিন না ভারতের সর্ব্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যত দিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। ঐ সকল জাতিরা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর রূপে) পয়সা দিয়াছে—আমাদের ধর্ম্ম লাভের জন্য শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে।" (১)

আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ জাতিরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন,—"যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার ৪ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি, যাহারা দেশের সারবস্তু; যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্য উৎপাদন করে; যাহারা ঘোর দারিদ্র্য মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও

(১) উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

শুদ্ধচিত্তে সবল প্রাণে জন্মে জন্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়; মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্ত বাঙ্গালী বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে স্থানে কি অস্থানে সাগ্নিক অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজানা ন্যায় কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্ত, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্তমাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই! এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি!— বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইবে! ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান।” (১) ভরসা করি ক্ষমতালোলুপ, জাত্যভিমানী, দাম্ভিক, স্বার্থপর “উচ্চবর্ণের” কর্ণকুহরে সভাপতি মহাশয়ের বাণী প্রবেশ করিবে। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, যদি আমরা জগতের অগ্রগামী জাতিসমূহের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি, তবে সর্ব্বাগ্রে দেশের কোটি কোটি অস্পৃশ্য নরনারীকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিতে হইবে। কাহাকেও বঞ্চিত করিলে চলিবে না। জনসাধারণের অভ্যুদয়ই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।”

(১) ১৩২২ সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

দশম অধ্যায়।

জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা,—'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের' জীবন্ত শিক্ষা।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী। ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীর বৃদ্ধ অধিপতি অপুত্রক অনঙ্গপাল দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে রাজ্য সিংহাসন অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গিয়া ইষ্টদেব আরাধনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। নৃপতির দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা কনোজ রাজমহিষী সুন্দরী, কনিষ্ঠা আজমীর রাজ্ঞী কমলা। জয়চন্দ্র সুন্দরীর ও পৃথ্বীরাজ এই কমলার পুত্র। অনঙ্গপাল প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া পাত্র-মিত্রের সমক্ষে নিজ করে পৃথ্বীরাজকে আপনার সিংহাসনে বসাইলেন। ইহাতে অত্যন্ত কোপাবিষ্টা হইয়া জয়চন্দ্রের জননী হঠাৎ সভামধ্যে আসিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি পিতার এই প্রকার স্নেহাধিক্য দর্শনে অতিশয় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

শুনিনু একি সংবাদ ? কি করিনু অপরাধ ?
না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে ;
জ্যেষ্ঠের না রাখি মান, কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান
করিলেন কি হেতু কি দোষে।

রাজা বলিলেন—বৎসে! দুরন্ত তুরুকগণ আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের আয়োজন করিতেছে। এই সময় রাজ্য ভাগ করিয়া দিলে অনিবার্য্য কলহানি এবং প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইবে।

মণি, মুক্তা মোর কাছে যা'কিছু সঞ্চিত আছে
জয়চন্দ্রে করিব প্রদান ;
কুবের-সম্পদতুল্য রাজ্য হ'তে গুরুমূল্য
নিরখিলে পাইবে প্রমাণ।
এত শুনি নৃপসুতা কহিলেন রোষযুতা,
"বিস্মৃত কি হেতু নৃপবর !
ভিক্ষুক, যাচক জন রাজদ্বারে চাহে ধন,
পুত্র মম রাজরাজেশ্বর।
প্রসন্না শ্রীহরিপ্রিয়া রাজ্য যা'র বিভূষিয়া
রেখেছেন বৈকুণ্ঠ সমান,
সে আসি অর্থের তরে ভিক্ষা পাত্র ল'বে করে !
কেন তা'রে হেন অপমান ?
ক্ষত্রকুলে জন্ম তা'র, থাকে যদি তরবার,
ল'বে রাজ্য নিজ ভুজ বলে ;
সে আশা পূরিবে যবে, আবার আসিব তবে
কানোজে ফিরিয়া যাই চলে।
পৃথ্বী ! তুমি পুত্রসম, মনে রেখো কথা মম,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত যেই ধন ;
কভু নাহি ভোগ হয়, ভোজ্য, ভোক্তা সমুদয়
ধ্বংস পায় শাস্ত্রের বচন।
এই অবিচার ফলে যা'বে দিল্লী রসাতলে,
লুপ্ত হবে, তোমর চৌহান ;
যদি আমি কায়মনে পূজে থাকি নারায়ণে
বাক্য মোর না হইবে আন।"

জয়চন্দ্রের পরবর্ত্তী দেশদ্রোহিতার বিষ-বীজ আজ এইখানে সঞ্জাত হইল। এই হিংসানলে শুধু পৃথ্বীরাজ নহে — বিরাট বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ যে ভবিষ্যতে দগ্ধ হইবে এই তাহার সূত্রপাত হইল।

"ওদিকে গজনী নগরীতে বীরবর মহম্মদ ঘোরী
নিজ পাত্র-মিত্র লয়ে, দক্ষিণে কুতব
নবীন যৌবন কান্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর দর্পে ভরা।
বামে বসি' হামজবী, গম্ভীর মূরতি,
ললাটে চিন্তার রেখা। মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন, করে জপমালা,
বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদন কান্তি! দাঁড়ায়ে অদূরে,
সম্ভ্রমে বিনত শির, রাজদূতত্রয়।
সম্বোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে;—হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে এতদিন; কি দেখিলে সেথা?
কেমন সে দেশ বল; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা' কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে, অগ্রে বল, আলি!"
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি',
আরম্ভিলা আলি;—কি কহিব, "জাঁহাপনা"!
অদ্ভুত অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরুপম করি,

গড়েছেন ধরাধামে। সুনীল আকাশ,
সমুজ্জল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে;
জ্যোতির্ম্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে;
দীপ্তিমান চন্দ্রালোকে। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে কেহ। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর; স্রোতস্বতী যত
অমৃত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ
ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ; কোথা গিরি সুমহান,
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত;
কোথা বনভূমি, পূর্ণ-ভীষণ শ্বাপদে;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন—যোজনব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ-শ্যাম
শোভে কোথা; কোথা নদী বহে কলকলে।
খনি-গর্ভে জন্মে মণি; সাগরে মুকুতা;
নারী সেথা অনুপমা। সমৃদ্ধা নগরী;
ফলে শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি ক'ব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ, হিন্দুস্থান।"
কহিলেন ঘোরী;—
"কহ দূত! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
দেখিয়া এসেছ তুমি।" নিবেদলা দূত;—
"এসেছি হেরিয়া প্রভো! যমুনার তীরে

প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে ;
জয়স্তম্ভে দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরা মাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে ; নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজমীর,
মরু সিন্ধু-বক্ষে রম্য, শ্যাম দ্বীপ সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর ;
আর (ও) কত শত স্থান। হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"
"কি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্!"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী ;—
"কোন্ বেশে ছিলে সেথা ?" উত্তরিলা দূত ;-
"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে। করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে ;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি' কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর ;
শুনিয়াছি শাস্ত্র পাঠ। হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু জাঁহাপনা! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে,
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,
ধর্ম্মহীন জ্ঞানহীন! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি' পরমেশে আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে।

অদ্ভুত তা'দের ধর্ম্ম ; কেহ পূজে শীলা,
কেহ নদী, কেহ তরু। কেহ আঁখি মুদি'
করে মহা শূন্য ধ্যান। বিচিত্র তা'দের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন
'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা ;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিন দেবে।
নাহি হিতাহিত জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে
কেহ ডুবে নদী জলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া, রথচক্র তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত ; বক্ষে বিঁধে শূল ;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর ;
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে ;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি' চিতা কাষ্ঠে, তা'র মৃত পতি সনে ;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।
বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতি ধর্ম্মদ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে ;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ, যদি,
চামার, চণ্ডাল আদি হীন জাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি শুচি হয় তবে।
নহে বুদ্ধিহীন তা'রা ; তর্কে সুনিপুণ ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,

কেন হেন মতিভ্রান্ত ! ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর দুর্ম্মতি হেরি'। * * * নীরবিলা দূত।
* * কহিলেন ঘোরী ;—
"কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাঁহান্দর !"
কহিলা তৃতীয় দূত ;—"সত্য, জাঁহাপনা।
হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তা'র বিষে ভরা। নিরখি' তা'দের
বল বীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর (ও)
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তা'র তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দু নামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝি', না ভাবি'
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক,
বট নামে ; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
আবরিয়া রাখে গ্রাম ; শাখা হ'তে তা'র
সূক্ষ্ম সূত্র সম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দু জাতি ধরে, জাঁহাপনা !

অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া।
কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সহ?
কি ফল প্রতিমা ভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে?"
"পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল
কিরূপ হিন্দুর? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ
কোন্ অস্ত্রে পটু তা'রা? উত্তরিলা দূত;—
"নহি যোদ্ধা আমি প্রভো! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা; হিন্দু বলী গজ বলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযুথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর। নাহি শক্তি কা'র (ও)
রোধিতে তা'দের বেগ; প্রতিদ্বন্দ্বি সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর (ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ-সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে। দ্বিতীয় রুস্তম
জাঁহাপনা! করুন্ তা' উচিত যা' হয়।"
ইঙ্গিতে বিদায় করি' রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী;—"শুনিলে ত সবে,
যা কহিলা দূতগণ? কিবা যুক্তি বল?"
* কহিলা কুতব, হিন্দু নহে বীর্য্যহীন
সত্য; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।

কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
ঘোষণা করিল হিন্দু; মন্দির চূড়ায়
যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে।
কৌশলী কাসিম, শুনি', ধ্বজ লক্ষ্য করি,'
হানিলা অজস্র অস্ত্র; ছিঁড়িল পতাকা;
নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত।
ব্যবহারে শিশু তা'রা। আলোর-ভূপতি.
দাহির দৈবজ্ঞে ডাকি' জিজ্ঞাসিলা তা'রে;
কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি?
কি হ'বে যুদ্ধের ফল?' দৈবজ্ঞ কহিল;
'সম্মুখে তোমার শুক্র, পশ্চাতে তা'দের,
যুদ্ধে তা'রা হবে জয়ী। কহিলা ভূপতি;
'কর কিছু প্রতিকার।' ডাকি স্বর্ণকারে
শুক্রের সুবর্ণ মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
রাজার পশ্চাতে বাঁধি' অশ্বের পর্য্যাণে,
দিল পাত্রমিত্রগণ; কহিল বুঝায়ে;—
'পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হ'বে জয়।'
নির্ব্বোধ দাহির, নাহি বুঝি' নিজ বল,
পশিল সমরে; যুঝি সিংহের বিক্রমে
মুসলমান—অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে।
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু; কিন্তু নাহি জানে
শৃঙ্খলা, সমরনীতি; স্বভাবে সরল;
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ যোগ।

নাহি বুঝে, ব্যাধি—বহ্নি—সমর—সঙ্কটে,
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি,
নয়ন থাকিতে অন্ধ; হোঁচটে, হাঁচিতে,
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদ।
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল; নায়ক অভাবে,
ভাঙ্গি ব্যূহ, মেষ সম করে পলায়ন।
আস্থাহীন নিজ বলে; চিনে মাত্র রাজা;
নিরাশ নির্জ্জীব হয় রাজার পতনে।
দাহির, অনঙ্গপাল হস্তী আরোহিয়া
এসেছিল যুদ্ধে দোঁহে; তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
জলন্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেষে।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,
মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে,
হ'বে তারা পরাজিত; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
আছে চিন্তান্বিত হ'য়ে; প্রবেশিলে মোরা,
হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত।"

এইরূপ আশা উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া

* * কহিলেন ঘোরী;—

"নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম,
ঝটিকার বেগে পড়ি', ঝটিকার প্রায়,
হ'তে পুনঃ অন্তর্হিত। বাঞ্ছা সংস্থাপিতে

স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব! তোমারে
দিনু এ কার্য্যের ভার; কর আয়োজন;
দেশ দেশান্তর হ'তে আনো সেনাদল।
শুনেছ ত জাঁহান্দর যা' কহিল এবে?
গজসৈন্যে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্;
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। সুবিদিত তব,
রণক্ষেত্রে মত্ত গজ ঘটায় বিপদ,
শত্রু মিত্র উভয়ের; পায় যদি ত্রাস,
না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত; না পারে সহিতে
দূর পর্য্যটন-ক্লেশ, লৌহ বর্ম্মভার;
চালনায় শ্লথ গতি। অশ্ব আমাদের,
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্লাহারে;
উল্লম্ফনে, সন্তরণে, গিরি অরোহণে
সুদক্ষ, অভ্যাস গুণে। অশ্ববলে মোরা
গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয়।
কর আয়োজন তুমি; বুঝিলে সময়,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে,
পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তা'দের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তা'রা; ধরে বহু গুণ।
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে নিত্য জর্জ্জরিত,
ভ্রষ্ট সত্য ধর্ম্ম হ'তে; পতন তা'দের

অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর,
রোধ করে স্রোতবেগ, তরঙ্গ উত্তাল ;
কিন্তু অনাবদ্ধ হ'লে, উলটি' পালটি,'
হয়, ক্রমে, রেণু শেষ ; হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যথা
ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন, মিলন হবে ? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির
আজ্ঞাধীন ; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তা'রা।
আর (ও) শুন গূঢ় কথা ; মূঢ় হিন্দু জাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি ;
যখন (ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে,
স্বদেশ—স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি, পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর
পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্যসনে শিবিরে তাঁহার
পাঠাইয়া দিল দূত। সুল্‌তান মামুদে,
লয়ে অশ্ব সৈন্য, দুষ্ট শিবানন্দ রায়
করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হ'বে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে

অগ্রগণ্য দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষ-বীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে,
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায়, ভ্রাতায়;
একে করি' হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইস্‌লাম প্রভুত্ব হ'বে স্থাপিত ভারতে॥"

এদিকে মাতামহ পৃথ্বীরাজকে দিল্লী বা হস্তিনাপুরীর সিংহাসন দান করার জন্য জয়চন্দ্র ক্ষোভে রোষে হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া কেমন করিয়া পৃথ্বীরাজকে জব্দ ও তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন এই চিন্তা করিয়া এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— এ যজ্ঞে ভারতের সমুদয় নরপতিই আগমন করিবেন, শুধু পৃথ্বীরাজ দিল্লীর প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন না। এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া গুরু তুঙ্গাচার্য্য জয়চন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

জয়চন্দ্র! করিনু শ্রবণ
সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ আয়োজনে;
ছিলাম প্রবাসে, বৎস! যুদ্ধ কার সনে?
"যুদ্ধ হ'বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সনে,
তাই, সেনাগণ মম বড় আয়োজনে।"
কহিলেন গুরু,—"কিবা অপরাধ তা'র?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার?"
উত্তরিলা জয়চন্দ্র;—"ক্ষত্রিয়ের মান
ক্ষতি হ'তে বড়; তুচ্ছ তা'র কাছে প্রাণ।

মাতামহ, বসি' দিল্লী-রাজসভাতলে,
বলেছেন ;—দিনু রাজ্য সমর্থ, সবলে।
অধম ভিক্ষুক প্রায় গণি' মোরে মনে
চাহিলেন তুষিবারে অর্থ বিতরণে।
এর চেয়ে কিব', দেব! হ'বে অপমান?
রাঠোর দুর্ব্বল হ'ল, সবল চৌহান?
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
করি নাই, এত দিন, কৃপাণ গ্রহণ।
তাই, দেব! করেছি মন্ত্রণ,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি' উদ্‌যাপন
লব সার্ব্বভৌম পদ। ভারত মাঝার
কলিযুগে রাজসূয় হয় নাই আর।
পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমন্ত্রণ,
কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন।
রাঠোর প্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
না রহিবে তা'র প্রতি বিদ্বেষ আমার।
কিন্তু শুনি লোকমুখে, দগ্ধ ঈর্ষানলে,
না আসিবে দুরাচার রাজসূয়-স্থলে।
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মোর যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে
দিবে বাধা; তাই আমি ভাবিয়াছি মনে,
দ্বারপাল-মূর্ত্তি তা'র করায়ে গঠন
বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন।
হেরি' তা'রে অন্ত দুষ্ট লভিবেক বোধ,
শক্তি থাকে, আসিয়া, সে ল'বে প্রতিশোধ।

বিনা প্রতিবাদে যদি সহে অপমান,
কে দুর্ব্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ।

তখন ব্যথিতচিত্তে তুঙ্গাচার্য্য বলিলেন—এই ঘোর সঙ্কটসময়ে ভ্রাতৃভেদ, জাতিদ্বেষ কি কখনও কল্যাণকর হইবে। তীর্থপর্য্যটন উদ্দেশে হিঙ্গলাজে গিয়া যে সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। ভারতবর্ষে তুর্ক-রাজ্য স্থাপন উদ্দেশ্যে গজনীরাজ মহম্মদ ঘোরী মহা আয়োজন করিতেছে।

* * গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ,
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি' দুইজনে
রাঠোর-চৌহান-দলে। যদি হুতাশন
মিলে বায়ু সনে, তা'রে কে করে দমন ?
ঝটিকার বেগ যথা রোধে মহীধর,
তেমতি দাঁড়াও দোঁহে বদ্ধপরিকর।
প্রতিপদে যবনেরে বাধা করি' দান,
দাও বলি সুখ, স্বার্থ, বলি দাও প্রাণ।
নিরখিয়া যবনের হউক বিদিত,
হিন্দুত্ব ধূলায় নয়, শিলায় গঠিত।
রুদ্ধ হ'ক তুরুকের পূর্ব্বমুখী গতি,
মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পা'ক অব্যাহতি।
শত্রু করগত প্রায় জন্মভূমি যা'র
সাজে কি এ তুচ্ছ দ্বেষ, অভিমান তা'র ?

কি লাঞ্ছনা পর সেবা বুঝিবে তখন,
দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠ পীড়িবে যখন।
আত্মীয়-কলহে যদি তৃপ্তি এত হয়,
করিও পশ্চাতে ; এবে, উপযুক্ত নয়।
হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন।
দিল্লীশ্বরে অপমান করি' অকারণ
কেন জ্বালাইবে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন ?
কি করিলা যুধিষ্ঠির পড়ে নাকি মনে ?
সমাপিলা যজ্ঞ, তুষি' রাজা দুর্য্যোধনে।
অগ্রে যদি হ'ত কুরুক্ষেত্র আয়োজন
তা' হ'লে কি হ'ত রাজসূয় উদ্‌যাপন ?
ভ্রাতৃভেদে কভু কার (ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরম হিতৈষী গুরুর উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইল। জয়চন্দ্রের মন একটুকুও নরম ও পরিবর্ত্তিত হইল না। কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর ও রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দকে নিমন্ত্রিত করিলেন এবং পূর্ব্বকথিতমত পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সমস্ত সংবাদ গুপ্তচরমুখে অবগত হইয়া পৃথ্বীরাজ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর ও সহচরগণ সহ আসিয়া ছদ্মবেশে নিজ প্রতি-মূর্ত্তি-পাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে নানালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া রাজকন্যা সংযুক্তা সভামধ্যে আনীতা হইলেন। ভাট একে একে সমস্ত রাজপুত্রগণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সংযুক্তা কাহারও কণ্ঠে মাল্য অর্পণ না করিয়া

যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে,
দ্বারপাল-বেশী নিজ প্রতিমূর্ত্তি পাশে,
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ, আসিলা কুমারী।
* * * * সখী-কর হ'তে
ল'য়ে অর্ঘ্য, লয়ে মাল্য নৃপতিনন্দিনী
পূজি দ্বারপাল-মূর্ত্তি, অর্ঘ্য সমর্পিয়া,
কণ্ঠে পরাইয়া মাল্য, নমিলা সম্ভ্রমে।
আতঙ্কে বিস্ময়ে লোক নিরখে নয়নে,
'পাণ্ডু রাজ্যেশ্বর', ধরি' সংযুক্তার কর,
তুলি' অশ্বপ'রে তাঁরে, পার্শ্বে বসাইয়া
কশাঘাত করি বাজি দিলা ছুটাইয়া
গঙ্গাতীর পানে। আসিলেন গঙ্গাতীরে।
সান্ত্বনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি' বীর
তুলিলেন তরী'পরে। অমনি ইঙ্গিতে
লৌহ-দৃঢ় শত বাহু আকর্ষিলা বলে
বহিত্র, ছুটিল তরী ঝটিকার বেগে।
অনুকূল স্রোত, বায়ু হইল সহায়,
অদৃশ্য হইল তরী মুহূর্ত্তের মাঝে।

একে জলন্ত অনল, তাহাতে ঘৃতের আহুতি। জয়চন্দ্রের পৃথ্বীরাজ-বিদ্বেষ-বহ্নি দাবাগ্নিতে পরিণত হইল।

চল, হে পাঠক! তবে, ত্যজি' আর্য্যভূমি,
যাই পুনঃ ফিরি' সেই গজনী নগরে,
নিরখি সেথায় ঘোরী, ল'য়ে মন্ত্রিগণে,
চূর্ণিতে হিন্দুরে রত কোন্ আয়োজনে।

কহিলেন ঘোরী—

"ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায়;
হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র দ্বেষানল;
অনভ্যস্থ বৌদ্ধ রণে, অস্ত্র ব্যবহারে,
মরিবে সহজে; হিন্দু না রক্ষিবে ত'ারে।
উচ্চবর্ণ জন কত শত্র হিন্দুস্থানে,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র শুনি অগণন;
লাঞ্ছিত, দলিত এই নীচ জাতি যা'রা
বুদ্ধিহীন, বীর্য্যহীন মেষ সম তা'রা।
না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস,
শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে;
পদাঘাত ভয়ে আসি' অসি ধরে রণে;
কি শক্তি তা'দের যুঝে আমাদের সনে?
শাস্ত্র, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে বহু;
কিন্তু এই স্থূলতত্ত্ব ভাবে নাই তা'রা;
দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
সে দেহ বলিষ্ঠ, দৃঢ় কখন (ও) কি হয়?
পঙ্গু, জড়প্রায় রাখি' অসংখ্য মানবে
কেমনে সমাজবপু হ'বে বলবান?
ভগ্ন যা'র মেরুদণ্ড হ'ক না সে বীর,
পারে কি দাঁড়াতে কভু উচ্চ করি শির?
হ'ক দীন, হ'ক দাস তবু মুসলমান
জানে রাজা, মন্ত্রী হ'তে অধম সে নয়;
প্রতিপদে হীন নীচ করিয়া শ্রবণ

নহে ভগ্নোৎসাহ, নহে সঙ্কুচিত মন।
আজ যে দারিদ্র্য-বশে নীচ কার্য্যে রত
অশ্বপাল, চর্ম্মকার, ভৃত্য, ভারবাহী ;
সেও ভাবে যদি তা'র গুণ কিছু রয়,
রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব তা'র অসম্ভব নয়।
বীর্য্য, বুদ্ধি নীচজনে মস্‌লিম-সমাজে
করে উচ্চ ; আত্মাদরে দৃপ্ত তাই তা'রা ;
হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
হতমান, স্বল্পায়াসে হইবে অধীন।
মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান,
অন্য যা'রা রাজতন্ত্রে অজ্ঞ, উদাসীন ;
কোথা পাবে স্ফূর্ত্তি তা'রা, কোথা পাবে বল ?
পলা'বে সঙ্কটকালে ত্যজি রণস্থল।
আছে রাজপুত জাতি বটে বীর্য্যবান,
সম্মিলিত হ'লে তা'রা অজেয় সমরে ;
কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'রা রাজা জনে, জনে ;
সর্ব্বে সার্ব্বভৌম, হবে মিলন কেমনে ?
নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে ;
অল্পে রুষ্ট, হানে অসি বক্ষ পরস্পর ;
ক্ষতিগ্রস্ত, ঈর্ষাপন্ন, লাঞ্ছিত বিজিত,
বহু শত্রু চৌহানের আছে হিন্দুস্থানে ;

* * * *

শত্রুর যে শত্রু তা'রে মিত্র ভাবি' মনে
পৃথ্বীরাজ-শত্রু সনে হইবে মিলিত ;

উচ্চ, নীচ যে যা' হ'ক, পুরুষ কি নারী,
যথাযোগ্য কার্য্যে সবে কোরো সহকারী।
থাকে শত্রু রাজা, তা'র যাইবে সভায়,
থাকে শত্রু সাধু, তা'র যাইবে আশ্রমে;
শ্মশানে; শুনি শত্রুধ্বংস তরে
ভ্রান্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা করে।
পৃথ্বীরাজ শত্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ দুইজন,
কনোজের রাজা আর জম্মু-অধিপতি;
হয়েছে নৃসিংহদেও পদে মোর নত,
তুমি গিয়া জয়চন্দ্রে কোরো হস্তগত।

কত দিন যায়—একদিন চৌহানের রাজপুরী আজমীরে পাত্রমিত্র গুরুদেব সহ পৃথ্বীরাজ রত্নখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। এমন সময় গজনী হইতে ঘোরীর দূত তাহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। অন্যান্য বহু কথাবার্ত্তা বাক্‌বিতণ্ডার পর গজনীর দূত—

নতশিরে হামজবী কহিলেন তবে;—
* * * জানাইব আমি
বলেছেন প্রভু যাহা; কর্ত্তব্য নির্ণয়
করিবেন হিন্দুরাজ। আদেশে প্রভুর
কোরাণ, কৃপাণ আমি আনিয়াছি সাথে;
রাখিনু উভয় এই। লইলে কোরাণ
মদিনানিবাসী এই সেখ মহামতি
করিবেন দীক্ষাদান। লইলে কৃপাণ
লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ,
ঘিরিবে আজমীর, দিল্লী;—যথা অভিরুচি।

*　　*　　*　　*

কহিলেন পৃথ্বীরাজ ; আষাঢ় প্রথমে
নবীন নীরদ যেন গর্জ্জিল গগনে ;—
"শুন, দূত ! লহ গ্রন্থ, দাও তরবারী।
কহিও প্রভুরে তব, জন্ম জন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য, নরজন্মে হিন্দুকুলে ;
পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।
হেন ধর্ম্মত্যাগ আমি করিব স্বেচ্ছায় !
ধিক্ মোরে ! শত ধিক্ এ হেন প্রস্তাবে !
না ছাড়িব ধর্ম্ম আমি। কহিলে যে দূত,
আছে বহু শত্রু মোর, মিথ্যা তা'হা নয়।
কিন্তু প্রাণাত্যয়ে আমি দণ্ডিতে হিন্দুরে
না ডাকিব মুসল্মানে। মূষিক যদ্যপি
করে উপদ্রব, তবে, কোন্ গৃহী, বল,
ডাকে কালসর্পে তা'র বিনাশের তরে ?
　　এই ধনুর্ব্বাণ, এই মহাখড়্গ মোর
অক্ষম কি শত্রু জয়ে ? তাই তুরুকের
লইব আশ্রয় আমি ? ব্যর্থ বাহুবল !
কহিলে যে তুমি, দূত ? প্রভু তোমাদের
না চা'ন অপর কিছু, চাহেন কেবল
প্রভুত্ব-স্বীকার ; কিন্তু প্রভুত্ব পরের
করে যে স্বীকার, কিবা রহে তার মাঝে ?
কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বৃষভে ?
করি রজ্জুবদ্ধ প্রভু চালায় উভয়ে।

যতক্ষণ র'বে শ্বাস স্বধর্ম্ম, স্বদেশ,
স্বাধীনতা ছাড়িব না, ছাড়িব না কভু।
এই মোর জন্মভূমি, মাতৃস্বরূপিনী
রাজোয়ারা, সুখধাম, নন্দন সদৃশ
আজমীর দিব আমি তুরুকের করে?
পুণ্যতীর্থে, তপোবনে বৈকুণ্ঠ সদৃশ
যে দেশ, সে দেশ আমি করিব অর্পণ
শত্রুভয়ে? নিজ দেশে পরদাস হয়ে
করিব জীবন পাত? ধিক সে জীবনে!
লইলাম তরবারী, কহিও প্রভুরে,
হইবে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-প্রাঙ্গণে।
নির্ভয়ে কহিও দূত প্রভুরে আপন,
বিনা দোষে বক্ষে কার (ও) হানিলে ছুরিকা
শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বুকে;
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিধাতার। (১)"

তারপর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ঘোরীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহম্মদ ঘোরী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন। ইহাই বিখ্যাত থানেশ্বর বা তিরোরীর যুদ্ধ। যুদ্ধে হারিয়া—

বসিয়াছে মন্ত্রসভা ঘোরীর শিবিরে;
ভূপতির মূর্ত্তি হেরি' ত্রস্ত, অধোমুখ
দলপতি কয়জন। কঠোর ভাষায়
কহিছেন ভূপ সম্বোধিয়া তা' সবায়;—

(১) মহম্মদ ঘোরীর সম্বন্ধে এ কথা ব্যর্থ হয় নাই। গক্করদিগের হস্তে তিনি অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

* * *

সত্যধর্ম্ম হিন্দুজাতি শিখে নাই কভু ;
বুঝে নাই মানবের স্রষ্টা ভগবান ;
তাই, রচি জাতিভেদ, মোহে অন্ধপ্রায়,
একে অন্যে পশুসম লাঞ্ছে অবজ্ঞায়।
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি যা'রা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জ্জরিত তা'রা ;—
মোরা গিয়া ভাই বলি' করিলে আহ্বান
দলে দলে আসি' সবে হ'বে মুসল্‌মান।
শুনেছি ধর্ম্মের নামে মূঢ় হিন্দুগণ
পাপাচার, কদাচার করে শত শত ;
বুঝাইলে শাস্ত্রবাক্য করে যুক্তিদান,
আমাদের প্রতিযুক্তি করাল কৃপাণ।

* * * *

কহিলা কুতব ;—"প্রভো! সন্দেহ কি তায়?
পাপ বিনা, হ'য়ে তা'রা, বীর, বুদ্ধিমান্‌,
হ'বে কেন মতিভ্রান্ত? কেন আকরণ
করিবে স্বজাতি ধ্বংসে অন্যে নিমন্ত্রণ।
মুসল্‌মানে মুসলমানে সত্য ঘটে বাদ,
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ;
অন্য ধর্ম্মী শত্রু কভু না করি আহ্বান ;
হিন্দু ডাকে 'ভায়ে মোর কাটো, মুসল্‌মান!'
কহিলেন ঘোরী ;—'সত্য বুঝেছ, কুতব!
জাতিবৈর-পাপে ধ্বংস হ'বে হিন্দুজাতি ;

এদিকে তারা গিরি-শিরে রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য শিষ্যসহ উপবিষ্ট। বিশাল হিন্দুজাতির ভাবী পতনের আশঙ্কায় অতিশয় চিন্তান্বিত—

আচার্য্য, উন্মীলি' নেত্র, জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;—
"কহ, বৎস ! গজনীর কি সংবাদ এবে।"
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ; মহা আয়োজন
করিছে তুরুকদল নানাদেশ হ'তে
সৈন্য, অস্ত্র, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ।
কঠোর প্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদ ঘোরী
তীব্র অপমানে
করেছে প্রতিজ্ঞা তা'রা মরিবে এবার,
তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ।" কহিলেন গুরু ;—
"দেখ বৎস ! কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে।
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
পশিলা অনলে ; আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে !
* * * *
"বল এবে, অন্য যাহা পেয়েছ সংবাদ ?"
নিবেদিলা শিষ্য ;—"দেব ! করিনু শ্রবণ,
ছদ্মবেশে আসি বহু যবনের চর
আমাদের বলাবল লয়েছে সন্ধান।
শুনিলাম, বহু রাজা হিন্দুস্থানবাসী,
চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,
করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে
বলেছেন জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ যবে

পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠোর সৈনিক,
হ'য়ে সম্মিলিত জম্মু সেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী।

এই সমস্ত শুনিয়া গুরু তুঙ্গাচার্য্য বলিতে লাগিলেন—

তথাপি ভরসা আছে, হিন্দুগণ যদি
রহে সম্মিলিত, এই তুরুক ঝটিকা
চ'লি যা'বে, শক-হূন ঝটিকার প্রায়।
দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাঝড়,
কত তরু কত শাখা যায় ভগ্ন হ'য়ে,
কিন্তু বেণুপুঞ্জ, বদ্ধ প্রেমে পরস্পর
অভিন্ন অচ্ছিন্ন রহে। হিন্দুও তেমতি
রহিবে অভেদ্য, যদি বাঁধা থাকে প্রেমে।
বল বৎস! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি
গিয়াছিলে; মনোভাব কি বুঝিলে কা'র?"
কহিলেন শিষ্য;—"দেব; হইল বাসনা,
বুঝিতে, প্রথমে, যত সাধারণ লোক
কি ভাবে দেশের কথা, কি চাহে তাহারা।

এই উদ্দেশ্যে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা দিবসে গঙ্গা-গণ্ডকী সঙ্গমে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত যোজনান্তব্যাপী প্রকাণ্ড মেলাস্থলে উপনীত হইয়া—কহিলাম আমি—

"শুন, দেশবাসি! মহা শঙ্কট সময়
উপস্থিত প্রায়। ম্লেচ্ছ তুরুকের সেনা,
শুনিয়াছ, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যারা,
আসিছে আবার। যথা পড়ে পঙ্গপাল,

পত্র, পুষ্প, ফল কিছু না রহে যেথানে।
তেমতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায়
উচ্ছিন্ন করিবে দেশ। এ সময় কেহ
রহিও না উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে
করিও সাহায্য দান। রাজার বিপদে
প্রজার বিপদ সদা রাখিও স্মরণে।
ডাকিবেন যবে রাজা সাহায্যের তরে
দাঁড়াইও অস্ত্র ল'য়ে। দেবী দেশমাতা,
বাস্তুভূমি বলি' যাঁরে পূজা কর সবে,
ডাকি'ছেন নির্ব্বিশেষে রাজা, প্রজা সবে।
আসি' যদি তুর্কদল বসে সিংহাসনে,
ম্লেচ্ছ-পদ-সেবা ভাগ্যে ঘটিবে সবার।
(কহে তারা পরস্পরে—)
"কে তুরুক ? কেন আসে ?" কৃষি একজন,
গ্রামের মণ্ডল বলি·বোধ হ'ল তারে,
কহিলা সে নমি মোরে—
"সন্ন্যাসী ঠাকুর !
কি বলিছ ? কেন হেন দেখাইছ ভয় ?
আসিবে তুরুক-সেনা, কি ক্ষতি মোদের ?
সেবায় না ডরি মোরা ; অভ্যস্ত সেবায়।
রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-গুরু-পুরোহিত,
সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্ব-হস্তিপাল,
সৈনিক, প্রহরী সেবা নাহি করি কা'রে ?
সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা ;

কি লাজ তুরুক-রাজে সেবি যদি তবে ?
জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি,
ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর,
এই মাত্র ভেদ ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে।
পিতৃ পিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক সে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের ?
নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস ;
বহি ভার, কর্ষি ভূমি। রাজার প্রহরী
ধরে আসি', যা'ব যুদ্ধে যা' জানি করিব।
হন জয়ী মহারাজ, দিব পূজা, বলি ;
জয়ী হ'য়ে তুর্করাজ বসে সিংহাসনে,
দিব কর ; বাস্তু মাতা থাকুন মস্তকে।"
ব্যথিত অন্তরে,
উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা, আসিলাম আমি
পুষ্পপুরে (পাটলীপুত্র—পাটনা)
হেরিলাম শ্রীহীনা, মলিনা
এবে পুরী। নেত্রে ধারা বহিল স্মরণে.
কোথা সে যবনজয়ী চন্দ্রগুপ্ত ভূপ,
কোথা সেই সার্ব্বভৌম অশোক নৃপতি।
দেখিলাম বৌদ্ধধর্ম্মী, পালবংশোদ্ভূত
নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে।
জিজ্ঞাসিলা ভূপ ;—
"বিপ্র ! কি প্রার্থনা তব ?"

কহিলাম আমি ;—

"নৃপ ! দেবী দেশমাতা,
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া
রহেছেন যিনি ল'য়ে আমা সবাকারে,
বিপন্না, ব্যাকুলা এবে। আসিছে তুরুক
চির-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাহারে।
ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ ভুলি' এ সময়
পশুন সংগ্রাম ক্ষেত্রে। বীর পৃথ্বীরাজ
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে প্রাণ আপনার
করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু, বৌদ্ধ সবে
হয় যদি সম্মিলিত, কখন (ও) যবন
না পারিবে প্রবেশিতে আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।
কিন্তু যদি পরাজিত হন দিল্লীশ্বর,
কনোজ, মগধ, বঙ্গ না র'বে স্বাধীন।
পাষাণ-প্রাচীর যদি ভাঙ্গে স্রোতবলে
বালুবন্ধ সেথা কভু পারে কি রহিতে ?
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী সিংহাসনে,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'বে আর্য্য ভূমি ;
তাই দেশমাতা মোরে দেছেন পাঠায়ে।"
হাসিয়া কহিলা রাজা ;—

"বুঝেছি ব্রাহ্মণ !
চৌহানের চর তুমি ; এসেছ কৌশলে
সেনা, অর্থ বল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রু জয়ে ; বরিতে আমারে

দিল্লীর সামন্তপদে ; বৃথা এ প্রয়াস।
নহি অর্ব্বাচীন আমি, নহি অবিবেকী,
না আছে বিবাদ মোর তুরুকের সাথে,
চৌহানের পক্ষ ল'য়ে, তবে অকারণে,
কেন ঘাঁটাইব তায় ? ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণ। আছে মর্ম্মে গাঁথা
বোধি-দ্রুম উৎপাটন, পদাঙ্ক ভঞ্জন,
সঙ্ঘারাম ধ্বংস। তবে, লজ্জাহীন হ'য়ে,
বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ?
কেমনে ভুলিলে, বিপ্র ! সঙ্ঘারাম হ'তে
শম-গুণান্বিত মহাস্থবিরে কতই
ডাকি' তর্কযুদ্ধে তব সমধর্ম্মিগণ,
ন্যায়, সত্য অতিক্রমি' লভিয়া বিজয়,
করিয়াছে বিদলিত হস্তিপদতলে,
বধিয়াছে অঙ্গচ্ছেদি' কুঠার আঘাতে,
চূর্ণিয়াছে উদূখলে ? স্মরিলে সে কথা
ঝরে নেত্রে অশ্রুধারা, বহে তপ্ত শ্বাস।
নীরবে সহেছে বৌদ্ধ ; কিন্তু বিধাতার
ন্যায়দণ্ড, এতদিন, ছিল উত্তোলিত,
পড়িবে এবার ; তাই আসিছে তুরুক।
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে,
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? সমান উভয়,
পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, তুরুকে।

আসিলাম আমি দেব ! পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে
কহিলাম একদিন ;—
"নমঃ সাধুগণ !
আসিছে তুরুক সেনা। এ সঙ্কট কালে
কাতরা ভারত-মাতা ডাকেন সবারে,
দীনা, অশরণা হয়ে। আপনারা সবে
মাতার সুপুত্র ; নিজ নিজ শিষ্যগণে
বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
হইবারে সম্মিলিত। বসিলে তুরুক
আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্যধর্ম্ম না থাকিবে আর।"
রহিলা নীরবে সবে। সাধু একজন,
শিরে কুণ্ডলিত জটা, ভস্মাবৃত তনু,
জিজ্ঞাসিলা ডাকি' মোরে ;—
"কে ভারত-মাতা ?
কা'রে উদ্ধারিতে তুমি কহিছ সবায় ?"
কহিলাম আমি ;—
"তিনি দেবী দেশমাতা ;
যাঁর অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা,
মিলিবে অন্তিমে ভস্ম যাঁ'র দেহ সনে,
বক্ষজাত-শস্যরসে জীবন মোদের
বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি
স্তন-দুগ্ধ দানে সুতে, শুন, সাধুগণ !
তিনিই ভারত-মাতা ; রক্ষুন তাঁহারে।"
কহিলেন সাধু ;—

"মোরা সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে;
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্ক সেনা?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তা'রা? মোরা রয়েছি যেমন
রহিব তেমন (ই)। রবে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
রবে তরুমূল, রবে পর্ব্বত কন্দর;
তৃপ্ত, সুখী র'ব তাহে। শিষ্য, ভক্তজনে
রক্তপাতে উত্তেজনা করিব কি হেতু?
কোন্ পন্থী সাধু তুমি? শুন নাই কভু
বন্ধমূল কর্ম্ম? হয়ে মুক্তি মার্গগামী
লব কি বন্ধন বৃথা কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে?
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র অনিত্য সকল,
ধর্ম্মমাত্র নিত্য; ত্যজি' পূজা, পাঠ, যোগ
বিসর্জ্জিব নিত্য কিসে অনিত্যের তরে?"
কহিলা সম্বোধি মোরে সাধু অন্য জন;-
"মায়া বিজৃম্ভিত বিশ্ব; কেবা রাজা, প্রজা?
কেবা জেতা, কেবা জিত? অভিন্ন উভয়।
মোহবশে মাত্র নর করে ভেদ জ্ঞান,
দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে; জয়, পরাজয়,
অসত্য, অনিত্য এই জগতের মাঝে,
তুল্য দুই; না বিচারি' মূঢ় তব গুরু
বৃথা শিক্ষা-দীক্ষা-দানে বঞ্চিয়াছে তোমা'।"
ব্যথিল হৃদয় মম। 'সাধু সাধু' বলি,

সমবেত সর্ব্বজন প্রশংসিলা তাঁরে ;
বুঝি' অভিপ্রায়, আমি লইনু বিদায়।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,
মানব মানবহিতে উদাসীন যদি।
অজ্ঞতার হীনতার দুর্ভেদ্য তিমিরে
কোটি কোটি নর, নারী সমাচ্ছন্ন যথা,
সে দেশে কি আত্মত্রাণ মন্ত্র মাত্র লয়ে
নিষ্কর্ম্মা রহিবে জ্ঞানী ? নিজে নারায়ণ,
অবতরি' নররূপে, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
প্রচারিলা কর্ম্মযোগ যে দেশের মাঝে,
প্রণোদিলা মহারণে বীর ধনঞ্জয়ে,
হায় রে দুর্ভাগ্য ! সেথা নাহি বুঝে লোক
কর্ম্মে, ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ ! থাকে ধর্ম্ম যদি
পূজা পাঠে, আছে ধর্ম্ম রণে প্রাণদানে
স্বদেশ, স্বজাতি তরে। বিধির আদেশে
করে কর্ম্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম্ম হীন ?
রাজা পালে প্রজা, ভূমি কর্ষে কৃষিজন।
যুদ্ধে যোদ্ধা, মলাকর্ষী বহে মলভার ;
দেখ ভাবি' কা'র কর্ম্ম পারো বর্জ্জিবারে।
হ'ক গুরু, হ'ক লঘু, যে কর্ম্মের মাঝে
জীবের কল্যাণ, তাই বিধাতৃ-বিহিত ;
তা'ই ধর্ম্মমূল। হায় ! অনিত্য সংসার,
এ অসত্য, প্রচারিত কি অশুভক্ষণে ;

অস্থি, মজ্জা মাঝে পশি' ভারতবাসীর,
হরিতেছে মনুষত্ব! এই যে সংসার,—
রূপ রস গন্ধময়ী এই বসুমতী,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, পূর্ণ জীবে, জড়ে;
স্নেহে পূত, প্রেমে স্নিগ্ধ, সমৃদ্ধ সংযমে;
নহে মায়া মরীচিকা—পুণ্য কর্ম্মভূমি।
লভি' কর্ম্মেন্দ্রিয় নর, বিধির বিধানে,
প্রেরিত এ কর্ম্মভূমে কর্ম্ম সাধিবারে;
বহে বন্ধমূল কর্ম্ম; কর্ম্ম মুক্তিপ্রসূ।
আসি' এ সংসার মাঝে, যুগ যুগান্তের
হ'য়ে কর্ম্মফলভোগী, উচিত কি কভু
ধর্ম্মালম্বে কর্ম্মত্যাগ? দেখ বিচারিয়া
ভ্রষ্ট ধর্ম্ম, লুপ্ত বিধি এ ভারত হ'তে;
আছে মাত্র স্বাধীনতা; বীর্য্যের প্রসূতী,
মনুষ্যত্ব সহচরী। কু-শিক্ষার বশে,
কর্ম্মে দোষারোপ করি', তা'ও যায় যদি
কি আর রহিবে তবে? ভ্রান্ত আর্য্যসূত,
বুঝিল না মোহবশে জাতি-পরিণাম,
তাই হেন উদাসীন। কি কহিব আর?
বল, এবে, অন্য কোথা গিয়াছিলে তুমি।"
নিবেদিলা শিষ্য;—
"আমি দেবের আদেশে,
ত্যজি আর্য্যাবর্ত্ত, লঙ্ঘি' বিন্ধ্যাচল ভূমি,
প্রবেশিনু দাক্ষিণাত্যে। কি বলিব, দেব!

শতগুণ ঔদাসীন্য হেরিনু তথায়।
তুর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষ
না ভাবে, না বুঝে লোক। হয়েছে বিস্মৃত
সোমনাথ-ধ্বংস। গর্ব্বে কহে কোন জন ;-
'কা'র শক্তি বিন্ধ্যগিরি পারে লঙ্ঘিবারে ?
মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এ দেশে'।
কেহ কহে ;—'জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যজনে ;
কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বলি' করে উপহাস।
যদি হয় নিগৃহীত তুরুকের করে
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? ভাঙ্গুক গরব।'
এইরূপে নানাজন কহে নানা কথা ;
উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূরব, পশ্চিম
সর্ব্বদেশে সমভাব ; উদাসীন সবে।
স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার ;
স্বজাতি বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায় ;
সীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ দু'এর মাঝে ;
ভারত সন্তান বলি' নাহি বুঝে কেহ।
রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ
শস্যক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসায়।
আসমুদ্র-হিমাচল স্বদেশ সবার,
আচণ্ডাল-দ্বিজ সবে স্বধর্ম্মী, স্বজাতি,
একের বিধ্বংসে হ'বে ধ্বংস সকলের,
সে কথা বারেক কা'র(ও) না পড়ে স্মরণে।

দেশমাতা শব্দ আমি কহিতাম যবে,
নির্ব্বাক্, বিস্মিত লোক রহিত চাহিয়া।
একদিকে তুরুকের সঙ্কল্প কঠোর,
ধর্ম্মোৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন,
অন্য দিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা,
ধর্ম্মালস্য, অপকর্ষ সময় প্রলয়
দেখি', শুনি' সদা মোর শঙ্কা হয় মনে,
অনিবার্য্য দাস্য, দৈন্য ভারত-মাতার।"
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বুঝিলাম, বৎস ! দৈববলে প্রতিকূল।
যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয় ;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্যে হিন্দুর।"

একাদশ অধ্যায়।

নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ।

যুগ যুগান্তের নিপীড়িত, পদদলিত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্ম্মস্থল হইতে এক অভিনব আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—"আমরা আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিব না"। সে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ মানবের কি কথা—দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রেমময় ব্রহ্মাণ্ডপতির স্বর্গ সিংহাসন পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিয়াছে, সে তপ্ত বক্ষের করুণ আর্ত্তনাদ বিশ্বস্রষ্টার হৃদয় টলাইয়া তুলিয়াছে, সে তপ্ত অশ্রু শ্রীহরির প্রাণ গলাইয়া দিয়াছে। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে—তথা কথিত অভিজাতবর্গের ও উন্নত শ্রেণীর শ্রীচরণ-পাষাণযন্ত্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পশুর মত পড়িয়া থাকিত; নীরবে তপ্ত বক্ষের উষ্ণ অশ্রুধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া দিত, নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিধাতাপুরুষের কেবলই নিন্দা করিত, নবযুগের প্রাণ স্পন্দনে, নবীনযুগের সঞ্জীবন সুধাপূর্ণ মলয়ানীলের সুখস্পর্শে তাহারা আজ অত্যাচারী হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর জাগরণের আহ্বান, চৈতন্য লাভের বার্ত্তা আজ তাহাদেরও কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়াছে। তুই ছোট আমি বড়, তুই নীচ আমি মহৎ, তুই অধম আমি উত্তম, তুই ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ, তুই অস্পৃশ্য আমি পবিত্র, তুই শূদ্র আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া এতদিন যাহাদিগকে অবিচার ও অত্যাচারে নিপীড়িত করিয়া পদতলে দলিত করিয়াছি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের ভুয়া কথার প্রলোভনে এতদিন যাহাদিগকে পোষা কুকুরের মত পায়ের তলে দাবাইয়া রাখিয়াছি, ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ঋষিগণের নামে, এমন কি স্বয়ং প্রেমময় ভগবানের নামে পর্য্যন্ত নিজেরা

শাস্ত্র ও শ্লোক রচনা করিয়া অত্যাচারে অত্যাচারে যাহাদিগকে চলমান শ্মশান সদৃশ করিয়া তুলিয়াছি—আজ তাহারা সমুদয় অত্যাচার অবিচার বুঝিতে পারিয়া—ভগবৎ কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া—জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার গতিরোধ করিতে পারে। বেদ বেদান্ত পুরাণ সংহিতার নামে আমরা যাহাদিগকে পশুচিত অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়াছি—আজ তাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজেরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছে, কে আর তাহাদিগকে শাস্ত্রের কূটার্থ করিয়া অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সক্ষম। সমাজ জননীর সমুদয় সন্তান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উত্তম অধম নির্ব্বিশেষে চতুর্দ্দিক হইতে—সমাজের প্রতি কেন্দ্র হইতে—প্রতি অন্ধকার কোণ হইতে—নূতন নূতন অধিকার লাভের আকাজ্ক্ষায়, নব নব শক্তি সঞ্চয়ের বাসনায়, নূতন নূতন আশার উদ্দীপনায় উৎকুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানেই বাধা পাইতেছে সাগরাভিমুখিনী তটিনীর ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ভীমবলে জাগিয়া উঠিতেছে। বাধা যত গুরুতর হইতেছে জাগিবার আকাজ্ক্ষা, উত্থানের কামনা ততই বলবতী হইতেছে। এ বিশ্বই ভগবানের পবিত্র লীলাক্ষেত্র। এখানে অবিচার অত্যাচার অন্যায় অসত্য কত কাল চলিতে পারে? তাই অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যকরসঞ্জাত অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজ্য অকালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম অঘটন ঘটাইতে চিরদিনই সিদ্ধহস্ত। এই যে অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণ, ইহাও যুগধর্ম্মের অন্যতম কারণ। এই যে সমাজব্যাপী আন্দোলন—এই যে সমাজব্যাপী আলোড়ন, আলোচনা—যুগধর্ম্মই ইহার মূলীভূত কারণ। সুতরাং ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করিবার অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বারুদের ক্ষণস্থায়ী আগুন বলিয়া ইহাকে আর বিদ্রূপ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ইহা অন্ধকার রজনীর ক্ষীণ বিদ্যুৎঝলক নহে। বসন্ত ঋতুর আগমনে যখন মলয় মারুত সারা

দেশের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়—তখন যে শুধু ঐশ্বর্য্যশালী ধনবানের কুসুম উদ্যানের পুষ্প তরু গুল্ম লতামঞ্জরীই মঞ্জরিত হইয়া উঠে—তাহা নহে—ছাই ভস্ম শবাস্থিপূর্ণ শ্মশানেও তখনও কুসুমগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং নানাবিধ জঞ্জাল পরিপূর্ণ ঘৃণিত আস্তাকুড়েও তরু গুল্ম লতা পল্লব গজাইয়া উঠে। প্রকৃতির ইহাই সনাতন নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। যে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানব উন্মত্তের মত জ্ঞান বিজ্ঞান মথিত করিয়া সারা বিশ্ব ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—পরিব্রাজকরূপে কত দেশ-দেশান্তর পাহাড় পর্ব্বত সাগর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ধরিত্রী দেবীকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন—সে আকাঙ্ক্ষা সে উচ্চাভিলাষ কি অনুন্নত ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে নব চেতনার সঞ্চার না করিয়া থাকিতে পারে? উন্নতি ও জাগরণের সেই অমৃতস্রাবী বাঁশরীর স্বর দীন দরিদ্র অনাথ কাঙ্গাল অক্ষম দুর্ব্বলের ভগ্ন কুটীর দুয়ারেও যে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সুতরাং ঐ যে দরিদ্র অজ্ঞ কৃষক উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—নীরবে অত্যাচার সহিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে—ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে তাহাদিগকে দোষ দিতে পার না,—অথবা "চাষা বেটারা কি সব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে" বলিয়া বিদ্রূপ করা উচিত নয়। ইহা এ যুগের যুগমাহাত্ম্য। তুমি আমি নগণ্য রাম শ্যাম,—২।৪ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ১০।২০ জন অত্যাচারী জমিদার ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না—পারিতেছে না। এ উত্থানের—এ জাগরণের পশ্চাতে অলক্ষ্যে প্রেমময়ের ইঙ্গিত কার্য্য করিতেছে। মানুষের কি সাধ্য ভগবানের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে? অনন্ত শক্তিশালী বিশ্ব সম্রাটের স্নেহাশীষ ধারা নিয়ত যাহাদিগের মাথার উপর বর্ষিত হইতেছে—ন্যায়পরায়ণ ইংরেজরাজ যাহাদিগকে তুলিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ আছেন—ভারতের সমুদয় জননেতা যাহাদিগকে হাত

ধরিয়া তুলিবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, হৃদয়হীন গর্ব্বিত সমাজপতি তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি করিতে পারিবে? বৈশাখের দারুণ ঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া যায়—বিরুদ্ধবাদিগণের শক্তিহীন উচ্চ চীৎকার ধ্বনিও তেমনি অনন্ত আকাশে মিলিয়া যাইতেছে;—কোনই অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না।

আমাদের 'এখন নিতান্ত কর্ত্তব্য—এই নব জাগ্রত উন্নতি তৃষ্ণা বা শক্তি সামর্থ্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা অভিনন্দিত করা—যুগযুগান্তের ঘৃণা বিদ্বেষ অপ্রীতি অনৈক্য হৃদয় হইতে ভ্রাতৃত্বের পূত মন্দাকিনী ধারায় মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহুপাশে বক্ষে টানিয়া লওয়া, দূরে পরিত্যক্ত ভ্রাতৃগণকে আপনার করিয়া লওয়া; এই ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচের মিলনের উপরই সমাজ ও দেশের সমুদয় কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের জাতীয় দুর্গতির অবসানের অন্য পথ নাই।

বহুশত বৎসর হইতে আমরা—অভিজাতবর্গ নানাপ্রকারে এই মহৎ প্রাণ নিরক্ষর শ্রমজীবী ও চাষা নামক বিশ্বের ভরণপোষণকারী, সৃষ্টিরক্ষক, সৃষ্টিপালক বিরাট মানবমণ্ডলীকে "ছোটলোক" বলিয়া পদতলে দলিত করিয়া—দাবাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাই সেই সর্ব্বশক্ত্যাধার ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি জনসাধারণ কারাকক্ষে অবস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিহীন সিংহের মত আমাদের পদতলে থাকিয়া আমাদের ইঙ্গিতে আমাদের পদসেবা করিয়াছে, আমাদের ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গে পরিচালিত হইয়াছে—এতদিন তাহারা প্রকৃত মানুষের ন্যায় জগতের সমক্ষে মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই। অবাধ বিদ্যা প্রচারের মহিমায় আজ তাহাদের সমুদয় দৌর্ব্বল্য, সমুদয় দৈন্য অবসাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে, সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচারে তাহাদের যুগযুগান্তের মালিন্য মুছিয়া গিয়াছে। আশায় তাহাদের বক্ষঃস্থল

প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে—হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষারূপ গুরুতর অপরাধে জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদের "দয়াল দণ্ডের" অবসান হইয়াছে। কার সাধ্য এই উন্নতি স্রোত বাধা দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখে। রাজ আইনে শিক্ষার স্রোত বন্ধ করিয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দরুণই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক আইনের বলে মূর্খ থাকিয়া গেল—কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতগগনে জোনাকী পোকার ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ভারতবর্ষের পতনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ। জ্ঞান বিস্তারের উপরই এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি। জ্ঞানের উপরই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি উন্নত হইলেই সমষ্টি বা সমগ্র দেশবাসী উন্নত হইতে পারে। অবজ্ঞাত প্রপীড়িত জাতির উত্থানও এই শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপর নির্ভর করিতেছে।

সমগ্র হিন্দুস্থানে সত্য, ধর্ম্মের পবিত্র আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা ও শঠতার পাপান্ধকার আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারে? আর মিথ্যা প্রতারণায় কতকাল লোকের চক্ষু ঢাকিয়া রাখা চলে? দুঃখের অমানিশা রজনী প্রভাত হইয়াছে। সাম্য, প্রেম ও শিক্ষার বিজয় পতাকা লইয়া রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রভাতের কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলী ধ্বনির মধ্যে প্রতি গৃহ দ্বারে সমাগত। পরম হিতৈষীরূপে অতিথী-দ্বয়কে বরণ ডালা সাজাইয়া ধান্য দূর্ব্বাদলে মাল্য চন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া লও। হে বিরাট—হে সমাজরূপী হিরণ্যগর্ভ! আর কতকাল দুঃখ দুর্দ্দশার ক্ষীরোদ সাগরে যোগনিদ্রারূপ মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে। ঐ যে তোমার নাভিকমলোৎপন্ন স্বকর্ম্মোদ্ভব মধু কৈটভরূপ অবিদ্যা ও অপ্রেম অসুর সমাজ দেহরূপী কমলযোনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। উঠ উঠ

নিদ্রিত বিরাট—, আর কতকাল দুঃখ সাগরে মোহনিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকিবে। জাগ, উঠ, অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্র সর হও। হিংসায় বিদ্বেষে, স্বার্থপরতা ও অপ্রেমে হিন্দুসমাজ মরিতে বসিয়াছে, ডুবিতে বসিয়াছে। অভিনব আদর্শ লইয়া সমাজ সমক্ষে উপনীত হও দেখি! তোমাদের দেখাদেখি এ পতিত জাতির হিংসা বিদ্বেষের দারুণ বহ্নি—প্রেমের বারিধারায় নির্ব্বাপিত হউক। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। উঠ জাগ। তোমাদের তুলিতে ও উঠাইতে কত কত মহাপ্রাণ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজে এ দেশের ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছে। তোমরা উঠ, জাগ, মানুষ হও—প্রেমিক হও ইহাই তাহাদিগের প্রার্থনা ও কামনা ছিল। প্রার্থনা পরিপূরণে বিমুখ করিও না। বিংশতি কোটি নরনারী পরস্পর প্রেম মন্দাকিনী নীরে স্নান করিয়া জাতীয় কল্যাণসাধন যজ্ঞে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রতী হও। সহস্র যুবক ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করিয়া বিংশতি কোটি নরনারীর কল্যাণ সাধনে তৎপর হও। সমাজসেবা ভগবৎ সেবারই নামান্তর। তোমাদের আদর্শে সমাজের জড়তা, অবসাদ অপসারিত হউক। সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাউক। প্রতি গৃহ হইতে দেব শিশুসকল আবির্ভূত হউক। নন্দনের পারিজাত পুষ্প তোমাদের গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠুক। প্রেম-গঙ্গা তোমাদের গৃহ পরিজন শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া দিক্। সকলে একপ্রাণ, একমন হও। হরিসংকীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কারে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রাম গ্রামান্তর মুখরিত হইয়া উঠুক। সমুদয় অপ্রেম মনোমালিন্য—সংকীর্ত্তন বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। নিজদিগকে কখনও হীন, অপদার্থ ও দুর্ব্বল ভাবিও না। বিশ্বসম্রাটের সন্তান কেন মরার মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিবে? তোমার অপমানে যে পিতারই অপমান। ভয় কি? বল বল—

"যিনি মহারাজা বিশ্ব যাঁর প্রজা জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই রাজপুত্র হই. পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার॥
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমাকে কেবা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার পিতার পরিবার পিতার রাজ সিংহাসন হৃদয় আমার॥
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে
বায়ু বহে গায়, জলদ জল যোগায়, (তাইতে) রবি শশি নাশে অন্ধকার॥

বিশ্ব সম্রাটের পুত্রের একি জড়তা, একি ভ্রান্তি! চেয়ে দেখ জ্ঞান বিজ্ঞান জগতে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে? এখনও কি তোমাদের নিদ্রা সাজে? শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার মধ্য হইতে নিপীড়িত, পদাঘাতে জর্জ্জরিত, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী যুবা বৃদ্ধ এমন কি অন্ধ খঞ্জ, মূক বধির পর্য্যন্ত বিধাতার অলক্ষ্য আদেশে—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের কি এখনও জড়তা শোভা পায়? শীত ঋতুর দারুণ হিমানী-সঙ্কুচিত শুষ্ক-বিটপী শ্রেণী যেমন বসন্তের মলয়-হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া সতেজ হইয়া উঠে, যুগ যুগান্তের অত্যাচার নিষ্পেষিত, বিশুষ্ক প্রাণও তেমনি বিংশ শতাব্দীর নব চেতনার সঞ্জীবন-স্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া সতেজে বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া জগতের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। পদাহত ধূলিকণা পর্য্যন্ত যখন অত্যাচারীর শিরোদেশে মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া থাকে, তখন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানব সন্তান চিরকাল অবিচার অত্যাচার সহিয়া সহিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে ইহা কি কখন সম্ভব? হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীর কি কথা, এই নব জাগরণের যুগে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত নব জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগরণের চিহ্ন সারা বিশ্বজগৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের কি কথা তরু, গুল্মলতা, পাতা, মাটি, পাথর পর্য্যন্ত এ জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পল্লীর গৃহে গৃহে, রাজবাটে গোচারণ মাঠে

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। সে শঙ্খের মধুর শব্দে কোটি কোটি প্রকৃতিপুঞ্জ — কুম্ভকর্ণের মহা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়াছে। কেহই আর নিদ্রায় নাই। বৃন্দা বিপিন বিহারী শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ভুবন মনোমোহন বাঁশরীর তানে মর্ত্ত বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনাগণ যেমন করিয়া শরতের চাঁদিমা রজনীতে রাস রসোৎসবে নিভৃত নিকুঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন,—দীন বৎসল করুণাময়ের অলক্ষ্য বংশীনাদে এবার তেমনি নিপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ সাম্যমৈত্রী ও জাগরণের পবিত্র পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। কার সাধ্য ইহাদের গতিরোধ করে। আজ দেশ শুদ্ধ লোকে সকলেই আপন আপন ন্যায্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার জন্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া গভীর আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। কার সাধ্য এ আন্দোলনে বাধা দান করিয়া ইহাদিগকে দাবাইয়া রাখে। কে এমন ভ্রান্ত শ্রীভগবানের কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। এ আন্দোলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। কোন কালে কোন দেশে কখনও হয় নাই। এ আন্দোলন কখনও নিরর্থক উত্থিত হয় নাই, নিরর্থক হইবার নহে। এ আন্দোলন মূলে দীন বৎসল নারায়ণের অদৃশ্য সঙ্কেত দেদীপ্যমান বলিয়া মনস্বীগণ উপলব্ধি করিয়াছেন।

সমুদয় অবজ্ঞাত সমাজ শ্রীভগবানের আদেশে গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার আয়োজন করিয়াছে। ভগবানের কৃপাশক্তি বা করুণার ইঙ্গিত না পাইলে সমাজের চির অবজ্ঞাত চির ঘৃণ্যজাতি সকল এমন করিয়া হিন্দুসমাজ শরীর, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশাল অট্টালিকা কাঁপাইতে সমর্থ হইত না। উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে অধঃ উর্দ্ধে সমুদয় দিকে শ্রীহরির কল্যাণময়ী বাণী উত্থিত হইয়াছে। সে কল্যাণ-বাণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত করিয়া— মুখরিত করিয়া নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তর তারেও বাজিয়া উঠিয়াছে।

তোমাদের মুষ্টিমেয় জন কয়েকের ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি, "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" রব মোটেই সেখানে পঁহুছিবার উপায় নাই। কোটি কোটি জন সংখ্যার তুলনায় জনকয়েক অত্যাচারী অভিজাত ব্যক্তি বিধাতা পুরুষের কার্য্যের বিরুদ্ধে অনর্থক দণ্ডায়মান হইয়া বৃথা চীৎকার করিয়া শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছে। ঐ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইবার জন্য—নমঃশূদ্র দ্বিজ হইবার জন্য, কায়স্থ, রাজবংশী পোঁার, ঝালমাল, পোঁদ প্রমুখ জাতিসমূহ কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা পদ্মরাজ, কেহ বা ঝল্লমল্ল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কেহবা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় হইবার জন্য, ঐ যে তন্তুবায় কর্ম্মকার, বারুজীবী, সুবর্ণ বণিক্‌, সচ্চাষি, মাহিষ্য, সৎগোপ, সাহা, কপালী, পাটনী, বৈশ্য হইবার জন্য জড়প্রায় সমাজ শরীর, কম্পান্বিত করিয়া গভীর আন্দোলন তুলিয়াছে ইহা কি মানুষের চেষ্টায়—মানুষের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে কর? ভূল, তোমাদের বড় ভূল। ইহা মানুষের শক্তিতে মানুষের অনুপ্রেরণায় কদাচ সম্ভব নহে। ইহার মূলে ভগবৎ প্রেরণা—ভগবৎ ক্রিয়া বিদ্যমান! শত শত শতাব্দীর অবিচার ও অত্যাচারের ফলে, শত শত শতাব্দীর পেষণ ও নির্য্যাতনের ফলে, শত শত শতাব্দীর বঞ্চনা প্রতারণার ফলে, শত শত শতাব্দীর পীড়ন ও পদা-ঘাতের ফলে—আজি এই নব জাগরণের সূত্রপাত—নবজীবনের আবির্ভাব,—নবচেতনার উদ্ভব। এই অবিচার ও অত্যাচার দমনের প্রতিকার পন্থা দীনবৎসল—ভগবানই প্রতি মানব হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন। শ্রীহরির স্নেহবিজড়িত প্রেমমাখা আহ্বান বাণী, জাগরণ ধ্বনি, তাহাদিগের কর্ণমূলে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের কি সাধ্য—সমাজপতির কি শক্তি—ইহার গতিরোধ করিতে পারে? মুনি ঋষির নাম লইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অত্যাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা ইহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া দুই পা দিয়া দলন করিয়াছে, ইহাদের ধন অর্থ,

কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছাদিত করিয়া মনের সুখে যথেচ্ছারূপে শোষণ করিয়াছে, মনের আনন্দে স্বার্থপরতার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া ইহাদিগের হৃদয় রুধির, বক্ষের শোণিত, স্মৃতি সংহিতাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনের সুখে পান করিয়াছে। মানবরূপী নারায়ণের জীবন্ত প্রতিমাকে "চলমান শ্মশান", "জঘণ্য প্রভব হি সঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। বেদান্তের যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গস্বরূপ, চিৎসূর্য্য ঈশ্বরের কিরণকণা, প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান—নারায়ণের যাহারা জীবন্ত বিভূতি—এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব সন্তানকে হীন বৈশ্য শূদ্র—শ্বপচ চণ্ডাল নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে দুই পা দিয়া দলন করা হইয়াছে। অত্যাচারিগণ ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা কি মহাপাপব্রতে ব্রতী হইয়া অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে। জানিত না এ পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, কি কঠোর দণ্ড ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় সহস্র বর্ষ হইল সেই প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে। যে অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে নরনারায়ণ সারথীবেশে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ ভিখারী পাণ্ডবগণের প্রতি দারুণ অত্যাচারী দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদির বুকের রক্তে ধরিত্রীর তর্পণ করিয়াছিলেন, সত্যে নরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিদ্বেষী ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদারণ পূর্ব্বক ভক্তচূড়ামণি শিশু প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বামনরূপে যিনি বাসববিজয়ী বলীর দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে পাতালে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলের মদগর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য যিনি পরশুরামরূপে কুঠার হস্তে ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক বহুবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের নামে, যাগ যজ্ঞের নামে যখন লক্ষ লক্ষ অনাথ মানব, পশুপক্ষী, ছাগ, মেষ মহিষের পবিত্র রক্তে দেবমন্দির সকল—যজ্ঞভূমিসমূহ রঞ্জিত হইয়া

ভূত প্রেত পিশাচের লীলা নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল, যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অবোলা বাক্‌শক্তিবিহীন বলির পশুর প্রাণের বেদনা—হৃদয়ের অস্ফুট আর্ত্তনাদ নিবারণকল্পে যিনি রাজপুত্র বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্মের" বিজয়পতাকা ভারত গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং যে ভগবান্ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র রূপে শ্রীনবদ্বীপে শচীগর্ভ দুগ্ধ সিন্ধুতে উদয় হইয়া জগতে নবযুগের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তিনিই আজ জাতিকুল মদান্ধ অভিজাতবর্গের ঘৃণা ও অবমাননা, উচ্চ জাতিগণের অত্যাচার ও অবিচার, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার করাল কবল হইতে তাঁহার আত্মা হইতে প্রিয়তম দীনদরিদ্র, কাঙ্গাল বুভুক্ষিত, অধম অস্পৃশ্য অনাথ আর্ত্ত সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে এই সামাজিক আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। কার সাধ্য ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়! ভগবানের এই জীব উদ্ধার কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া উন্মাদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। সমাজপতির সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্বজাতিপ্রেমবর্জ্জিত অভিজাতগণ মনে করে না—অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের নিমিত্ত উপরে একজন আছেন। তিনি দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, তিনি কাঙ্গালের সখা, পতিতের পাবন, তিনি দীন দরিদ্রের চির আশ্রয়, চিরসুহৃদ। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তিনি অনেক সহ্য করেন কিন্তু সেই অত্যাচারের মাত্রা বা সীমা দারুণ ভাবে লঙ্ঘিত হইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দীন দরিদ্র ধার্ম্মিক সজ্জনগণের রক্ষার জন্য অত্যাচারীগণের পাপ মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কখন বা নিজে আইসেন, কখন বা স্বীয় অংশ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। এবার ভগবান্ সাধারণ চক্ষুর বিষয়ীভূত জড়দেহে নরবপু লইয়া আবির্ভূত

না হইয়া তথা কথিত অবজ্ঞাত দীন দরিদ্র নিম্নশ্রেণীস্থ সমুদয় নরনারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসিয়া নবজাগরণ রূপে—নূতন চৈতন্যশক্তিরূপে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হইয়াছেন।

অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদে ভগবানের স্বর্গ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; তাই তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের অবিরল নয়নজল মুছাইবার জন্য তিনি এবার কোটি কোটি অংশে বিভক্ত হইয়া নিপীড়িত পদদলিত অত্যাচারে জর্জ্জরিত বুভুক্ষিত জনগণের হৃদয়ের নবচৈতন্যরূপে, নব জাগরণের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া সামগানে,—বেদমন্ত্রে, নানাবিধ মাঙ্গলিক স্তোত্রে ও বন্দনায়—জয় ও শান্তি উচ্চারণপূর্ব্বক বিংশতি কোটি নরনারী তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করুন।

সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এমন কি স্মরণাতীত কাল হইতে এই সব অবজ্ঞাত, পদদলিত, নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ প্রকৃতপুঞ্জ তথা কথিত হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই দারুণ অপরাধে—বীণাপণি ভারতী জননীর কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন্তে মৃতবৎ জড়বৎ—অজ্ঞান পশুর ন্যায় কালযাপন করিতেছিল। ইংরাজ রাজত্বে, অবাধ বিদ্যা প্রচারে নবযুগের নূতন শিক্ষা প্রভাবে তাহাদের মনের অন্ধকার, গৃহের অন্ধকার দূরে প্রস্থান করিয়াছে। বিদ্যাচর্চ্চার স্বর্ণকিরণে দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এক্ষণে তাহাদের নিজেদের স্বরূপ—নিজেদের অধিকার দাবী দাওয়া ভালরূপই বুঝিতে পারিতেছে। আর তাহাদিগকে অজ্ঞতার আবরণে, কুসংস্কারের প্রাচীরে, মূর্খতার ঘনান্ধকারে ভুলাইয়া রাখে কাহার সাধ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে যেমন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরহৃদয় সৈন্যগণ নবীন বলে নূতন উৎসাহে, নব চেতনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান যুগেও লক্ষ

লক্ষ অবজ্ঞাত জনসাধারণ ভারতী মাতার বীণাধ্বনি শ্রবণে নব উৎসাহে তেমনি জাগিয়া উঠিয়াছে। যে বিদ্যা দুর্ব্বলের বল, নির্ধনের ধন, অন্ধের যষ্টি, বোবার বাক্‌শক্তি, যে বিদ্যা আঁধারের দীপ শিখা—অমানিশা রজনীর ধ্রুব নক্ষত্র, জলমগ্ন নাবিকের আশার তরণী, পথভ্রান্ত পোতাধ্যক্ষের দিক্ নির্ণয় যন্ত্র সে বিদ্যা এতদিন ব্রাহ্মণের গুপ্ত গৃহে—মণিময় কৌটায় বঞ্চনা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য আবরণে আবদ্ধ ছিল। শূদ্র নামক ধরিত্রী প্রতি-পালক—বিশ্বের বরণীয়—সরল শান্ত অকপট সমাজ সেবকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল! আজ নবযুগের মাহাত্ম্যে উহা অভিজাতবর্গের হস্তচ্যুত হইয়া—খুলিয়া গিয়া আচণ্ডালের মধ্যে—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে পারিতেছে সেই মুঠ মুঠ ভরিয়া লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিতেছে। কাহারও নিষেধ নাই—মানা নাই, বারণ নাই যাহার যত ইচ্ছা, যত শক্তি লইয়া যাইতেছে এবং লইয়া গিয়া আপন আপন গৃহ ভবন সজ্জিত করিতেছে। হিন্দু রাজত্বে যাহা হয় নাই, বৌদ্ধ রাজত্বে যাহা হইতে পারে নাই, মুসলমান রাজত্বেও যাহা স্বপ্নাতীত ছিল ইংরেজ রাজত্বে বর্ত্তমান যুগে তাহাই সম্পন্ন হইল। শূদ্রের জাগরণ এ যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার, চিরস্মরণীয় ঘটনা। ব্রাহ্মণগণ স্মৃতি সংহিতাতে লিখিয়াছিলেন—"যে শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিবে—তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে, যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিবে—সুতপ্ত তৈল অথবা গলিত ধাতব পদার্থ তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন—"শূদ্রদিগকে কখন জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ দিবে না—তাহাদের বেদমন্ত্র স্বাহা স্বধা বষট্‌কারাদি উচ্চারণে অধিকার নাই; শূদ্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দান করিবে না। বিড়াল, নকুল, ভেক, কুকুর, গাধা, পেচক, কৃকলাশ প্রভৃতি হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" অত্রিসংহিতার মধ্যে লেখা হইয়াছে—"জপ, তপস্যা,

তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্র সাধন, দেবতা আরাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্বজনক। শুধু ইহাই নহে—"জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্মনিরত শূদ্রকে বধ করিবেন ইত্যাদি।" এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ভারতে ৬ কোটি মুসলমান ও প্রায় ১ কোটি খৃষ্টানের উদ্ভব এবং সহস্র বৎসরের দাসত্ব। পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে একজন হিন্দুভ্রাতা যে হ্রাস হয়—তাহা নহে; পরন্তু একজন শত্রু বৃদ্ধি হয়। ভগবানের অপার করুণায় অবিচার অত্যাচারের যুগ অতীত হইয়াছে। এই সব মহাপাপের ফল যাহা তাহাত সকলেই হাতে হাতে পাইতেছেন। সহস্র বৎসরের দাসত্বই এই সব গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় কি? পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইহারা নানাদেশ হইতে আইনের বলে তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। তথাপি আমাদের লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আর্য্য আর্য্য করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক আসর মাতাইয়া রাখিতে আমরা বিলক্ষণ মজবুত। আপনাপন জাতীয় গৌরবের স্মৃতিটুকু দেখাইয়া নিজেদের বৃথা গর্ব্বের ঢাক নিজেরাই বাজাইতেছি ও আনন্দে আটখানা হইয়া আর্য্যজাতির ও আর্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা উড়াইতেছি। যেমনটি দেখান হইয়াছে—তেমনি পাওয়া যাইতেছে; যাহা দেওয়া হইয়াছে—তাহাই ফিরিয়া আসিয়াছে। চিন্তা করিয়া হৃদয়বান্ মনস্বীগণ বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছেন ও ভগবৎ পাদপদ্মে কৃত পাপের ক্ষমা চাহিতেছেন। নিপীড়িতের উত্থানের একমাত্র উপায়—শিক্ষা প্রচার। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষার সংযোগ না ঘটিলে—এ জাগরণ কুম্ভকর্ণের মত নিরর্থক জাগরণ বলিয়া জানিবে। শিক্ষাবিহীন কত শত সমাজ জাগিয়া—কত কত পত্রিকা বাহির করিল কিন্তু গ্রাহক অভাবে বংশপত্রের অগ্নির মত মুহূর্ত্ত পরই সব শেষ হইয়া গেল। আবার যে নিদ্রা সেই কালনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলকে

শিক্ষা দান করিতে হইবে। পুথিগত বিদ্যালাভের সময় যাহাদের অতিবাহিত হইয়াছে—তাহাদিগকে মুখে মুখে ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হইবে। সত্য প্রেম পবিত্রতার মহাপুণ্যপিঠে সকলে সমবেত হইয়া মানুষ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা, নিজেদের সংকীর্ণতা কুসংস্কার, নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সমাজের দুরবস্থা ও শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে নয়ন জল বর্ষণ কর। শ্রীহরির পাদপদ্মে সহায়তা লাভের জন্য নিবেদন ও প্রার্থনা জানাইতে পারিলে সাহায্য আসিবেই আসিবে। স্বজাতি প্রেমের পূত মন্দাকিনী ধারায় পরজাতি বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেল। অন্য জাতির দোষ উদ্ঘাটন ও বর্ণনা করিয়া জিহ্বা ও হস্তকে কলুষিত না করিয়া বরং সে সময়টুকু স্বজাতির কল্যাণকর কোন কার্য্যে অতিবাহিত করিতে চেষ্টা কর। পরজাতিবিদ্বেষে জাতির অভ্যুত্থান হইবে না —বরং জাতীয় পতনই ঘটিবে। অন্য জাতির গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা কর। তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করিয়া কালী ও লেখনীকে অযথা কলঙ্কিত করিও না। নিজেদের দৈন্য দুর্ব্বলতা, নিজেদের অধঃপতন শোচনীয়তা চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী হও। যাহারা এখনও আলস্য বশতঃ মোহ ঘুম ঘোরে নিদ্রায় নিমগ্ন আছ—তাহারা উঠ, জাগ। এই নব যুগে কেহই আর ঘুমে অচেতন থাকিও না। ঐ যে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুলের সুমধুর কলধ্বনি শ্রুত হইতেছে—কাল-বিভাবরী অবসান প্রায়। প্রভাত অরুণের কিরণচ্ছটায় সারাবিশ্ব আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—এখনও কি তোমাদের শয্যায় পড়িয়া ঘুম ঘোরে অচেতন থাকা উচিত? উঠ উঠ। জগতে মহা কর্ম্মের রোল উঠিয়াছে। যে যাহার কর্ম্মপথে যাত্রা করিয়াছে। তুমিও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর। অগ্রসর হও। এগিয়ে যাও— এগিয়ে যাও! সম্মুখের পথিককে ধৃত কর। পশ্চাতে কে পড়িল,

কে ডাকিল বা কে রহিল তাকাইও না। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়—যাত্রা যদি স্বজাতি কল্যাণদ্যোতক হয়, পথ যদি সত্যালোক উদ্ভাসিত হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে নিরাপদে সফলতা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মণিময় কিরীট সুশোভিত স্বর্ণমন্দিরে উপনীত করিবেই করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিণাম ও প্রতিকার।

বর্ত্তমান হিংসা বিদ্বেষমূলক অশাস্ত্রীয় বৈদেশিক জাতিভেদের ফলে ভারতের হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ পরিণাম যে অতিশয় শোচনীয়, ইহা দেশের সমুদয় মনস্বী ব্যক্তিগণ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় কৃষি প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখার ফলে দেশ হইতে দিন দিন হিন্দু শিল্পকারগণের লোপ সাধন হইতেছে। এখন সর্ব্বসাধারণের মনে অভিজাতবর্গের দেখাদেখি একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ঐ কার্য্যগুলি বাস্তবিকই হীন কার্য্য, উহা করিলে সমাজে ছোট হইয়া থাকিতে হয়। শাস্ত্রকারগণ দিবারাত্র শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া আমাদিগের এই ধারণা শিথিল না করিয়া বরং আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্যের প্রতি কেন এই অস্বাভাবিক ঘৃণা, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া দেখিলাম মনু প্রভৃতি সংহিতাযুগের শাস্ত্রবাক্যই ইহার মূলীভূত কারণ। সংহিতাদি শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশই কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির বিলোপের অন্যতম কারণ। সংহিতাযুগে রাজা, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণের হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন; ব্যবহারিক আইনপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণ আইন লিখিতেন এবং উহা রাজাজ্ঞায় প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিদ্যা-জ্ঞান-চর্চ্চাদি ব্রাহ্মণগণই করিতেন, পরে উহা বংশানুক্রমিক হওয়ায় ব্রাহ্মণপুত্রগণই বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, বৈশ্য শূদ্রগণ উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল। কাজেই ক্ষত্রিয় রাজগণের শাসনদণ্ডের অমিত প্রতাপে সংহিতাদি শাস্ত্র-বাক্যের

প্রভাব অত্যল্পকাল মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চাবিহীন বৈশ্য-শূদ্রসন্তানগণের হৃদয়ে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। দেশের সর্ব্বনাশকর ঐ সব অযৌক্তিক শাস্ত্র-বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারে কার সাধ্য! ব্রাহ্মণগণ আপন আপন স্বার্থ ও খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যা তা লিখিলেন এবং উহাই শাস্ত্রের নামে, সংহিতাদির নামে ভগবৎ আদেশরূপে সমাজে অনায়াসে প্রচলিত আইন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। সংহিতাদিযুগকে বৈশ্য ও শূদ্র নিগ্রহের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য ও শূদ্রগণের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আধ্যাত্মিক অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত ও প্রাণপণ সচেষ্ট। শ্লোকের পর শ্লোক, শাস্ত্রের পর শাস্ত্র, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া বৈশ্য শূদ্রগণকে নড়নচড়ন রহিত ও নিয়মের সুদৃঢ় জালে মাকড়সার মত আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রক্তের সম্বন্ধ, ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ, দেশের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল এইখানেই নৃশংসভাবে আভিজাত্য-গর্ব্ব ও আত্মম্ভরিতার সুতীক্ষ্ণ খড়্গে বলি প্রদত্ত হইল। ইহার পরিচয় নবম অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কৃষি-কার্য্যের উপর সমগ্র মানবজাতির জীবন নির্ভর করে। কৃষিই আর্য্যদিগের আদিম যুগে একমাত্র উপজীবিকা ছিল। যে কার্য্যের উপর মনুষ্যজাতির জীবনধারণ নির্ভর করে, শাস্ত্রকার তাহাকে অতি হীন চিত্রে চিত্রিত করিলেন। শাস্ত্রকার লিখিলেন :—"মৎস্য ব্যবসায়ীর সমগ্র বৎসরের মৎস্য নিধনরূপ পাপ লাঙ্গলীর (লাঙ্গলবাহক কৃষকের) এক দিনের পাপের সমান।" কৃষিকার্য্য করিতে হইলে হল দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যস্থ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বধ হয়, একারণ নিয়ম করিলেন, কৃষিকার্য্য অতি হেয়—মৎস্য ধরা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও পাপজনক কার্য্য। এইখানেই কৃষিকার্য্যের মুণ্ডপাত করা হইল! চাষা শব্দ তিরস্কারের মধ্যে গণ্য হইল!

শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধেও মনুর সুকঠোর আদেশ :—

মনু বলেন :—

শিল্পেন ব্যবহারেন * * *

* * * কৃষ্যা রাজোপ সেবয়া ॥৬৪

* * * * *

কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ ॥৬৫ ; তৃতীয় অধ্যায়।

"বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্প কার্য্য * * * কৃষি, রাজসেবা * * * বেদহীন হওয়া এই সকল কারণে কুল শীল অপকৃষ্ট হইয়া যায়।"

মনু এইরূপে ক্রমশঃ ইক্ষু প্রভৃতি রসবিক্রেতা (১), বাস্তু বিদ্যাজীবী, স্বয়ংকৃত কৃষিজীবী (২), বণিক বৃত্তিজীবী (৩), লৌহবিক্রয়ী (৪) প্রভৃতিকে অত্যন্ত হীন চিত্রে চিত্রিত করিয়া ঐ সমস্ত ব্যবসা ও ব্যবসায়ীকে সর্ব্বজন সমক্ষে ঘৃণিত করিয়াছেন।

যে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশ, দেশ বলিয়া পরিচিত, যাহা জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ এবং যাহা সামাজিক উন্নতির মুখ্য উপায়স্বরূপ, অপরিণামদর্শী শাস্ত্রকারগণ দুই চারিটী শ্লোক রচনা করিয়া চিরকালের জন্য তাহার মূলে ভীষণ কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই স্থানেই হিন্দুসমাজের মৃত্যুবীজ উপ্ত হইয়াছে, এই কারণেই প্রাচীন ভারতের গগনস্পর্শী উন্নত শির আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত !

যে আয়ুর্ব্বেদ বেদের উপাঙ্গ স্বরূপ, জগতে বরেণ্য ও আদর্শ সেই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার চর্চ্চাকারী চিকিৎসককে মনু মাংসবিক্রেতা ও সুরা-বিক্রেতাদিগের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

---

(১) ১৫৯ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।
(২) ১৬৫ ঐ ঐ ঐ
(৩) ১৮১ ঐ ঐ ঐ
(৪) ২২০ ঐ চতুর্থ অধ্যায়, ঐ

মনু বলেন :—সোম বিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয শোণিতম্।

১৮০।৩য় অধ্যায়, মনু।

"সোমলতা বিক্রেতাকে যাহা দান করা যায়, তাহা বিষ্ঠাবৎ; চিকিৎসক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূঁয ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য।"

চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূর স্যোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ। ২১২, চতুর্থ অধ্যায়।

—মনুসংহিতা।

"চিকিৎসকের, মৃগাদি পশুহন্তা ব্যাধের, ক্রূর ব্যক্তির * * * অন্নভোজন করিবে না।"

মনু, শব স্পর্শ করা অত্যন্ত অপরাধজনক ও দোষাবহ বলিয়া বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারাই শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্রপ্রয়োগ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল।

ইহার উপর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধি রচনা করিয়া তাহারও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। সমুদ্রযাত্রার উপর বাণিজ্য ব্যাপার, দেশের সমৃদ্ধি, সমাজের বল, বৈদেশিক সংশ্রবজনিত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকার দরুণই ভারত ভূমি দিন দিন সম্পদহীন অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যের সহিত দেশের শক্তিস্বরূপ অর্থ, অর্থের উপর সমাজ, সমাজের সহিত দেশের ও জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সমাজ ও দেশের কল্যাণ করিতে হইলেই সমুদ্রে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন আর্য্যগণের উন্নতির সময় সমুদ্রযাত্রা অবাধে প্রচলিত ছিল। ফলতঃ এই সমস্ত বিধি নিষেধ আমাদের প্রাচীন বরেণ্য আর্য্যজাতির উদ্ভাবিত নহে—"উহা পরবর্ত্তী একদল অযোগ্য স্বার্থপর ব্যক্তির মস্তিষ্ক কল্পিত মাত্র।" ভারতের উন্নতির সুখসূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ, তখন হিংসা বিদ্বেষ আত্ম-কলহ প্রতারণা শঠতা চতুরতায় ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। কে

কাহাকে কিরূপে দমন করিবে, নিগ্রহ করিবে, অপদস্থ করিবে এই চিন্তায় সতত উদ্‌গ্রীব। কুরুক্ষেত্রের কালসমরে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল পূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তৎপরে বৈশ্য শক্তি যাহা অবশিষ্ট ছিল ব্রাহ্মণ কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়া শাস্ত্রের নামে তাহাও ধ্বংসের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিলেন।

শাস্ত্র বলিতেছে :—কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবতম্। গীতা

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

গো-পালন কৃষি শিল্প বাণিজ্য কুশীদ প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ সকলেই এক বিরাট বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈশ্যজাতীয়। সৎগোপ, মাহিষ্য, সচ্চাষী, কর্ম্মকার, সুবর্ণবণিক, সাহা, তাম্বুল বণিক, শঙ্খ বণিক, গন্ধ বণিক, মোদক, তিলি, কুম্ভকার, বারুজীবী, সূত্রধর, কপালী প্রভৃতি জাতিগণ সকলেই শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্য, কিন্তু এই বিরাট শক্তিশালী বৈশ্য জাতিকে সঙ্করবর্ণান্তর্গত পৃথক পৃথক জাতিতে বিভক্ত করিয়া ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ লেখকগণ গৃহে গৃহে ধ্বংসের করাল বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন; অপ্রেম স্বার্থপরতা স্বজাতি-বিদ্বেষ আত্ম প্রতারণার লক্ লক্ শিখা মুখব্যাদন করিয়া উঠিল। এই জাতিবিদ্বেষের ও জাতি বিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ বিভিন্ন ব্যবসায়ী একই বিরাট বৈশ্য জাতি সঙ্করবর্ণান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। শাস্ত্রকারের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে যদিও এখন এই সমস্ত সম্প্রদায় আপন আপন বংশ পরিচয় পূর্ব্বেতিহাস কতকটা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্য হইতে পরস্পর বিদ্বেষভাব, উচ্চ নীচ, বড় ছোট ভাব আজিও তিরোহিত হইতেছে না। আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। যদি

ইহারা সকলেই বৈশ্য সন্তান হয়, তবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিবে না কেন? ভ্রাতৃভাব পোষণ করা ত দূরের কথা, এক ভাই অন্য ভাইয়ের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত! ইহাতে দেশের কি আশা করা যাইতে পারে? একেই ত শাস্ত্রবাক্য, তার উপর আবার বল্লালী কৌলীন্য! কুব্জত্বের উপর পৃষ্ঠব্রণ! সমাজ দেবতা আর কত সহ্য করিবেন! যে বল্লাল নিজে লম্পট, চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, তিনিই হইলেন সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ। মণিদত্ত নামক জনৈক সুবর্ণবণিক সন্তানের সুবর্ণ ধেনুর প্রতারণা ও চৌর্য্যাপরাধে বল্লালসেন সমগ্র স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন "অদ্যাবধি এই সুবর্ণবণিকেরা বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।" তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন। জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ পাপাত্মা বল্লালের এই সম্পূর্ণ অন্যায় আদেশ মস্তক অবনত করিয়া গ্রহণ করিল।

এইরূপে সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ব্যবসায়গত হিংসা বিদ্বেষ পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়া হিন্দুসমাজ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ প্রায় ৫০০ শত জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একই ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান কত শত ভাগে, একই একই ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান কত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা এক পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন হইয়া একই পিতৃমাতৃ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছে, একই ক্রীড়াভূমিতে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে আজ তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রদত্ত জল পান করিতে কুণ্ঠিত—আহারে অসম্মত! একই স্নেহময়ী মাতার স্তন্যদুগ্ধে জীবনধারণ করিয়া একই মায়ের কোলে নাচিয়া খেলিয়া তিলি সৎগোপ তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলটুকু গ্রহণেও কুণ্ঠিত,

অসম্মত! সুতরাং কেমন করিয়া সমাজ-শরীর পুষ্টতা লাভ করিবে, বলশালী হইবে, পৃথিবীর জীবিত জাতিগণের সহিত প্রতিযোগীতায় সাহসী হইবে?

যেখানে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সহানুভূতি, একতার একান্ত অভাব সেখানে কিরূপে উন্নতি সম্ভব? এই স্নেহহীনতা, এই সামাজিক অবিচার অত্যাচার নির্য্যাতন, এই ঘৃণা অবমাননার পরিণাম একটিবার চিন্তা করিয়া দেখ। বিগত প্রায় সহস্র বৎসরে ৪০ কোটি হিন্দুসন্তান লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসরেই প্রায় ৪ কোটি হিন্দুর লোপ সংঘটন হইয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসরে বহু লক্ষ হিন্দুসন্তান সামাজিক অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় খৃষ্টধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। ঘৃণা অবমাননার ফলস্বরূপ এই কয়েক শত বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দুসন্তান ঐরূপ ভাবে মুসলমান ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে। কিন্তু হায়! সমাজপতিগণের এদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! যাহারা এসব কথা বলে তাহারা তাঁহাদের চক্ষে ভ্রান্ত অবিবেকী ধর্ম্মভ্রষ্ট কদাচারী সমাজ-দানব। যেরূপ অনুপাতে হিন্দুর লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, আর কয়েক শতাব্দীর পর একটি হিন্দুও হিন্দুর নাম রক্ষার জন্য জীবিত থাকিবে না। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম করিয়া দেশবাসী পাগল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা অনেকেই জানেন না ও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না। স্ত্রী-আচার, দেশাচার, লোকাচার নামক কতকগুলি পদার্থ ধর্ম্মের পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া সমাজ শাসনে ব্যাপৃত আছে। লোকে কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার যথারীতি পালন করিয়াই ধার্ম্মিক আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে। ওদিকে দেশ সমাজ দিন দিন ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ষ্টিমারের অখাদ্য আহারে সমাজপতি বাবুগণের জাতি যায় না, বিদ্যা-

শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি যায়; বিধবার ব্যভিচারে জাতি যায় না, কিন্তু বিধবার বিবাহে জাতি যায়, কুলে কলঙ্ক হয়; সুরাপানে জাতি যায় না, পতিত হইতে হয় না, সুরা বিক্রয়ে জাতি যায়, পতিত হইতে হয়; গরু বাছুর কুকুর বিড়াল সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত সেবনে জাতি যায় না, কলের জল, সোডা, লেমনেড, বরফ মুসলমান ও সাহেব বাড়ীর পাঁউরুটী, বিস্কুট, জমাট দুগ্ধ সেবনে জাতি যায় না, সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর নমঃশূদ্র প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দেব দ্বিজে ভক্তিমান অতিথিপরায়ণ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত জলপানে জলস্পর্শে জাতি যায়; অনাচরণীয় হিন্দু ভ্রাতার জল অপব্যবহার্য্য কিন্তু জলমিশ্রিত, অশুদ্ধ ভাণ্ডে আনীত বাজারের মুসলমানের দুগ্ধ ব্যবহার্য্য; ভাতেরই অন্যতম সংস্করণ সিদ্ধ তণ্ডুল অবাধে প্রচলিত। এই সব সামাজিক অবিচার বিষের ন্যায় সমাজ শরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ভগবানের রাজ্যে অত্যাচার অবিচার কতদিন সহ্য হয়! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকগণ! তোমরা কোথায়? এই অবিচার ও সামাজিক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদিগকে ভগবানের নামে আহ্বান করিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে যাহারা প্রায় পশু পদবীতে উপনীত হইয়াছে, যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের অজ্ঞাত মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য—মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদের বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? তোমাদেরই বুকের রক্ত, প্রাণের প্রাণ, দেহের জীবন স্বদেশবাসী ভাই হইয়া তাহারা কি চিরকাল এইরূপ হীন অপদার্থ অবজ্ঞাত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে? বিশ্বের সংবাদ, জগতের মঙ্গল বার্ত্তা, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও সভ্যতা, আশা ও ভরসা কি তাহাদের দ্বার-দেশে কখন পঁহুছিবে না? তাহাদের হৃদয়দ্বার কি চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে? উহার কি কখন উন্মোচন হইবে না? এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ

প্রেমিক! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর! প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া উপস্থিত হও। দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে যাত্রা কর। তাহাদের সহস্র বর্ষের অন্ধকার গৃহ বিদ্যার বিমল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক। ঐ দেখ তোমার একই মাতৃ অঙ্কের ভ্রাতৃবৃন্দ রোগক্লিষ্ট, অবসন্ন দেহ, উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, আনন্দবিহীন— একটীবার তাহাদের দিকে সপ্রেম নয়নে করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন কর, একটীবার তাহাদিগকে বাহুপাশে টানিয়া লও। সমাজের সর্ব্বস্ব কোটি কোটি অনুন্নত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য তোমরা কি সহায়তা করিবে না, যত্নবান হইবে না? তাহাদিগকে কি ন্যায্য সামাজিক অধিকার প্রদান করিবে না? সমাজ-পতিগণের নিকট অল্পই আশা রাখিও। আর কতকাল তাঁহাদের কৃপার আশায় মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে? সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে উঁহাদের জন্ম। দেশের কথা, সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিবার তাঁহাদের মোটেই অবসর নাই। তোমরাই সর্ব্বস্ব, তোমরাই আশা, তোমরাই ভরসা। ভিন্নধর্ম্মী মুসলমান ও খৃষ্টানগণ, ধোপা, নরসুন্দর বেহারা পাইবে, আর তোমার স্বধর্ম্মী, তোমার ভগবতী মার আদরের সন্তান, তোমার দয়াল হরির স্নেহের ভক্ত, তোমার অনুন্নত ভাই পাইবে না? একি ঘোর অবিচার নহে? কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম বা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে ধোপা, নরসুন্দর ও বাহক পাইবে, কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিলে পাইবে না এ কেমন কথা? তবে কি হিন্দুধর্ম্মই এই নীচতার কারণ বুঝিতে হইবে? আবার বলি, করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে করুণ কণ্ঠে বলি, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ সমাজপতি সহৃদয় যুবকগণ, কালবিলম্ব করিও না। ঐ যে শ্রীভগবান্ মঙ্গল মধুর স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে তাঁহার প্রাণপ্রিয় দীন দরিদ্র

অভাজন অনুন্নত সন্তানগণের উন্নয়নের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—এস, এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন কর—তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তোল—উঠাও। তুমি আমি দুই চারিজন ভদ্রলোক লইয়া সমাজ নহে, সর্ব্বসাধারণকে লইয়া সমাজ, ব্যষ্টির উন্নতিতে উন্নতি নহে—সমষ্টির উন্নতিতেই উন্নতি,—সমাজের মঙ্গল। সহস্রভাগে বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে উহার প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অংশকে উন্নত করিয়া লইতে হইবে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ও পুষ্ট না হইলে দেহ যেমন সতেজ ও পুষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি না হইলে হিন্দু সমাজের উন্নতি অসম্ভব। কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিম্বা বাদ দিয়া উঠিবার উপায় নাই। একের উন্নতি অন্যের উন্নতিসাপেক্ষ। শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রে ধর্ম্মে তাহাদিগকে আপনাদের নিজেদের মত উন্নত করিতে হইবে। দেশের সেবায় তাহাদিগকে পার্শ্বে রাখিতে হইবে, সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, না আসিলে নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, অবজ্ঞাত জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে দেশের শক্তি, সমাজের বল, জাতির মেরুদণ্ড, উন্নতির নিদান, মাতৃপূজা যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ। উহাদিগকে চাই-ই। শতকরা ৫৮ জন অস্পৃশ্য, সমাজ-দেহের অর্দ্ধ অঙ্গ অচল, অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যতদিন না বঙ্গের অভিজাত সন্তান আপন হৃদয় প্রেমানলে দ্রবীভূত করিয়া সমাজের প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালের জন্য ঢালিয়া না দিবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। যে দিন সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিবে, ব্রাহ্মণ সন্তান জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইবেন, যে দিন সমাজস্থ এক জনের দুঃখ কষ্ট সকলের প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে, একজনের অপমানে—এক জনের নিগ্রহে সকলে সমভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত মনে

করিবে—সেই দিন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি। যাহারা সমাজের মঙ্গলার্থ আপন আপন সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-কল্যাণ, ভোগস্পৃহা বলিদান করিয়া তোমাদের সেবায় নিমগ্ন আছে; যাহাদিগের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপর ধনবানের ঐশ্বর্য্য, মানীর সম্মান,—অভিজাতবর্গের ভোগের অন্ন, বিলাসের সামগ্রী, উন্নত স্বর্ণখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ, পরিধেয় বসন ভূষণ, খাদ্যসম্ভার নির্ভর করে, যাহাদিগের বিন্দু বিন্দু হৃদয়-রুধিরে বড় লোকের বিশাল অট্টালিকার এক একখানি ইট পাথর গাঁথা—তাহাদিগের সংবাদ কয়জন রাখেন? কয়জন তাহাদের চিন্তায় বিরলে নয়নজল বর্ষণ করেন? বঙ্গীয় যুবক! তোমরাও কি নিষ্ঠুর পাষাণ থাকিবে—স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিবে—আপন স্বার্থচিন্তায় বিব্রত থাকিবে? এস, ইহারা উঠিবার জন্য ঐ যে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে—ঐ যে করুণনেত্রে দয়া ভিক্ষা করিতেছে; উহাদের হাত ধরিয়া তোল, উঠাও, উহাদের কাতর-ক্রন্দনে মনোনিবেশ কর, উহাদের অশ্রুজলে আপন নয়নজল মিশাও—অধিকার দাও—আভিজাত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সামাজিক দারুণ বন্ধন খুলিয়া দাও—উহারাও তোমাদের মত মানুষ হউক—উন্নত হউক—ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুসমাজে নবজীবন সঞ্চার করুক—প্রতি পল্লীগৃহে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠুক—আনন্দ কোলাহলে প্রতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠুক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন।

অস্পৃশ্যতা ভারতের এক মহাপাপ। যে সমুদয় গুরুতর পাপে ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, অস্পৃশ্যতা তন্মধ্যে অন্যতম। অস্পৃশ্যতা ৬০ কোটি হিন্দু অধ্যুসিত হিন্দুস্থানকে ভিন্ন ধর্ম্মীর পদানত করিয়াছে, হিন্দুর গৌরব-ভাস্করকে অবমাননা ও লাঞ্ছনার ঘন কৃষ্ণ মেঘে আবৃত করিয়াছে, বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ অতলতলে ডুবাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্যতা আমাদিগকে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকের নুক্কারজনক স্থানে নিমগ্ন ও অবনমিত করিয়াছে। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের আন্দোলন আলোচনা, আমাদের শাস্ত্রপুরাণ এই অস্পৃশ্যতার পাপ শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। বাক্যে আমরা মহা সাম্যবাদী, কার্য্যে আমরা মহা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন। ধর্ম্ম ও পুণ্য হানিকর নিকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে এই অস্পৃশ্যতার জন্ম। কিন্তু ইহা এখন দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া, ন্যায় সত্য অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে যথেচ্ছাচার চালাইয়াছে। ইহাকে বাধা দিবার সামর্থ যেন কাহারও নাই। কোনও মহাপুরুষ এক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ সব পলায়ন, এখন আছে কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা আমায় ছুঁওনা, দুনিয়া মহা অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র। ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলোকেও নাই, ব্রহ্ম এখন যাগ যজ্ঞে ব্রতঃ

তপস্থায় নাই, ব্রহ্ম এখন মুনিকাননে—তীর্থক্ষেত্রে, বেদ বেদান্তে নাই—ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।”

আমরা ভারতের সমাজপতিগণ ৭ কোটি নর-নারীকে, ভাই-ভগিনীকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি। বাঙ্গলায় শতকরা ৫৮ জনই অস্পৃশ্য,—অবশিষ্ট ৪২ জন আমরা তাহাদিগকে পশু পক্ষীরও অধম করিয়া রাখিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ছুঁইনা—দূর দূর করিয়া ঘৃণায় তাড়াইয়া দেই। মানুষ হইয়া মানুষকে—হিন্দু হইয়া হিন্দুকে, ভাই হইয়া ভাইকে আমরা দিনরাত্রি দুই পা দিয়া দলন করিতেছি, পশুর অধম ঘৃণা করিতেছি। হিন্দুসমাজে পশু পক্ষীরও যে অধিকার আছে, পশু পক্ষীরাও যে আদর যত্ন সোহাগ ভালবাসা পায়, আমাদের অস্পৃশ্য-অনাচরণীয় ভ্রাতারা সেটুকুও পায় না। ঘৃণায় ঘৃণায় আমরা তাহাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া লইয়াছি। যুগ যুগান্তর হইতে ঘৃণা অবজ্ঞা, অপমান লাঞ্ছনা, অবিচার অত্যাচার ভোগ করিয়া করিয়া মনুষ্যত্বহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‘তোরা ছোটলোক, তোরা অপবিত্র, তোরা অস্পৃশ্য, তোরা নীচ জাত, তোরা ইতর, অধম’ এই কথা হাজার হাজার বৎসর হইতে শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্যই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা যে মানুষ, সমদর্শী ভগবানের স্নেহের সন্তান, শ্রেষ্ঠপিতা পরমেশ্বরের সর্ব্বগুণান্বিত আদরের পুত্র কন্যা, এ কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যে সচ্চিদানন্দ সাগর শ্রীভগবানের এক একটী তরঙ্গস্বরূপ, চিৎসূর্য্যের এক একটী কিরণতুল্য, তাহারাও যে অদ্বৈতবাদের এক একটী মূর্ত্ত ব্রহ্ম, এ কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে উচ্চ জাতিদের সেবা পরিচর্য্যা, কাজকর্ম্ম দাসত্ব গোলামী করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম এবং তাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছে। তাহাতে তাহাদের অরুচি নাই, ঘৃণা নাই, তাহাতে তাহাদের অপমান নাই—অবমাননা বোধ নাই।

শাস্ত্র বলে আত্মহত্যা মহাপাপ।" লোকে ফাঁসিকাষ্ঠে, বিষ পানে, গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে। আমরা সকলে তাহাকে নিন্দা করি। কিন্তু আমরা বলি—ইহা প্রকৃত আত্মহত্যা নহে, ইহা প্রাণত্যাগ মাত্র। ইহাতে আত্মার হত্যা হয় না। আত্মার হত্যা সেখানে, যেখানে আত্মারূপী ভগবান্—অত্যাচারে অবিচারে, অনাদরে অবহেলায়, ঘৃণায় অবমাননায়—মৃতবৎ—জড়বৎ অবস্থান করিতেছে। নিত্য চিৎস্বরূপ যেখানে শূদ্ররূপে দাসরূপে অধম অস্পৃশ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে সেখানেই প্রকৃত আত্মহত্যা—আত্মার হত্যা হইতেছে। আর তাহার পরিণাম!! পরিণাম হাতে হাতে, সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও দাসত্ব।

এই মনুষ্যত্ব হরণকারী মহাপাপ মূর্ত্তি অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে ভারতে স্বরাজ লাভ সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহার বিষে যে কেবল উচ্চ জাতীয়েরাই জরাজীর্ণ, এই জাত্-সর্পের বিষে যে কেবল অভিজাতবর্গেরই মহানিষ্ট সাধিত হইয়াছে—এমন নহে; ইহার বিষে উচ্চ নীচ (?) ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলেই জর্জ্জরিত। এই গুরুতর কারণেই এই পাপ সমান ভাবে রাজ্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হইতেছে না। তথাকথিত উচ্চ জাতিগণ তথাকথিত নীচ জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে এবং নিম্ন জাতিগণ আবার তথাকথিত তন্নিম্ন জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে। এক অস্পৃশ্য অন্য অস্পৃশ্যকে, এক অধম অন্য অধমকে, এক নিপীড়িত অন্য নিপীড়িতকে, এক দাস অন্য দাসকে ঘৃণা করিতেছে, এক অবমানিত লাঞ্ছিত পদদলিত ভাই অন্য এক লাঞ্ছিত পদদলিত ভাইকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছে এবং এই জন্যই ভারতের উর্ব্বর বক্ষে ইহা এমন করিয়া শিকড় গজাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই জন্যই ঘৃণা অবজ্ঞার এমন তাণ্ডবী লীলা অনায়াসে চলিতে পারিতেছে। একটু দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে সহজবোধ্য করা যাউক। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ আদি তথাকথিত উচ্চ জাতি কামার কুমার

তিলি তাম্বুলী গোপ গন্ধবণিক প্রভৃতি নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত ভাইগণকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন—বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলেই জলাচরণীয় জাতি। তাঁহারা সে অবজ্ঞার ঝাল সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর কৈবর্ত্ত ভ্রাতৃগণের উপর ঝাড়িয়া সেই অবজ্ঞার ক্ষোভ দূর করিতে চেষ্টা করেন। আবার সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিগণ উচ্চ (?) দুই শ্রেণীর অবজ্ঞার ঝাল পোদ নমঃশূদ্র মালী ঢুলি প্রভৃতি ছোট ভাইদের উপর ডবল মাত্রায় ঝাড়িয়া স্বীয় অপমানবিক্ষুব্ধ মর্ম্ম-জ্বালা দূর করিতে প্রয়াস পান। এইরূপে নমঃশূদ্র পোদ ভ্রাতারাও পাটনী কোনাই প্রভৃতি ভাইগণকে সমান মূল্যে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা আবার (পাটনী কোনাই প্রভৃতি) চর্ম্মকার ডোম ম্যাথরকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্ব জাতির অবমাননার জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রকারে—এ জাতি সে জাতিকে, এ সম্প্রদায় সে সম্প্রদায়কে, এ শ্রেণী সে শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া করিয়া ভারতে ঘৃণা অবজ্ঞার বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতি বিদ্বেষের এই বিরাট হিমাচল কিছু দুই-দশ দিনে, দুই-দশ জনের, দুই-দশ জাতির দোষে গড়িয়া উঠে নাই। কেবল উচ্চ জাতির দোষে এই পাপ এত বড় হইয়াছে বলিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে। এজন্য উচ্চ নীচ বড় ছোট ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই অল্পাধিক দোষী এবং দায়ী। অনেকে কেবলই ব্রাহ্মণগণের দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি—এ ভারতে ব্রাহ্মণ কয় জন? ২২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ১ কোটি মাত্র। এই ২১ কোটি নির্য্যাতিত ও ব্রাহ্মণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুষ্টিমেয় ১ কোটি ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া বয়কট করিয়া অত্যাচার-বর্জ্জিত বিরাট বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ স্থাপন করুন না কেন? ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় কয় জন? শতকরা প্রায় ৬ জন মাত্র; বাকী ৯৪ জন ত ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত ব্রাহ্মণেতর জাতি। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই সাম্যবিরোধী ব্রাহ্মণ্য শক্তিভ্রষ্ট গোটা কয়েক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকে বাদ

দিয়া এই বাঙ্গালায় একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন না কেন? সে শক্তি কাহারও আছে কি? কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিনটী তথাকথিত উচ্চ জাতিকেই হিন্দুসমাজের যত অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত এই যে, এই তিন গর্ব্বিত উচ্চ জাতিই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে সাম্যবাদ প্রচলনের বিষম পরিপন্থীস্বরূপ। যত ঘৃণা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য নাকি এই তিন জাতির নিকট হইতেই আমদানি। তাঁহাদিগকেও বলি, বাঙ্গালায় ইঁহারা কয়জন? বাঙ্গলার প্রতি ১০০ জন হিন্দুর মধ্যে ইঁহারা ১৩ জন মাত্র। বাকী ৮৭ জন অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত ভ্রাতারা ইঁহাদিগকে বয়কট্ বা বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের মনঃমত নূতন একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন। আমরা জানি ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত তিন উচ্চ জাতিকে বাদ দিয়া নূতন বিশুদ্ধ সমাজ সঙ্ঘ গঠন করিবার শক্তি কাহারও নাই। দোষ যে অল্প বিস্তর সকলেরই। কিন্তু কেহই আপন আপন সমাজের সমাজপতিগণের দোষ দেখিতে পাইতেছেন না; নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, নিজেদের নীচতা হীনতা, নিজেদের দুর্ব্বলতা কেহই দেখিতে পাইতেছেন না। সকলেই উচ্চ জাতিদের দোষ দেখাইয়া দিয়াই খালাস্। অস্পৃশ্যতা দোষ সমাজের সর্ব্বজাতির মধ্যে অঙ্কুর গজাইয়া বসিয়াছে। অস্পৃশ্যদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতার ব্যাধি বেশী করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভাত খাওয়া দূরে থাকুক—সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর কাপালী যোগী কৈবর্ত্ত কি কখন নমঃশূদ্র বা পোদের জল পান করেন? নমঃশূদ্রগণ কি ঢুলি পাটনি মুচির জল খান? না তাঁহাদের কুয়া ছুঁইতে দেন অথবা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন? দর্পণে যেমনটী দেখান যায়, দর্পণ তেমনই দেখাইয়া থাকে। ঘৃণার বিনিময়ে প্রেমের আশা করা কি অন্যায় নয়? উন্নতির অস্পৃশ্য ভ্রাতারা উচ্চ জাতিদের দোষ দেন—তাঁহারা তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাঁহারা নিজেরা যে নিম্নতর অস্পৃশ্য ভাইদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া

রাখিয়াছেন—তাহাদের জল তাঁহারা ছোন না—ইহা কি অন্যায় নহে, ইহা কোন্ সাম্যবাদের অন্তর্গত ? সেইজন্য বলি—সকলে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা ব্যতীত এই মহাপাপ-মহীরুহের উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর হইবে না। কেবল উচ্চজাতির উদারতা সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের অপেক্ষা ছোট ও নীচ (?) ভাইদের উপর উদারতা—সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ব দেখাইতে হইবে। নিজেরা কথায় ও কার্য্যে—মনঃপ্রাণে সাম্যবাদী হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া উচ্চ জাতিগণকে সাম্যবাদী হইবার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। সহস্রবার বলি অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি বহু প্রকারে দায়ী, কিন্তু একথাও না বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, বর্ত্তমান-অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিগণও অল্প দায়ী ও সামান্য দোষী নহেন।

আব্রহ্ম পেশোয়া, আসিন্ধু হিমালয় সর্ব্বত্র স্বরাজের গগন পবন মুখরিত কারী বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। আসুন আমরা সকলে, সর্ব্ব জাতি সর্ব্ব সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ভারতে এক বিরাট হিন্দুসমাজ—সাম্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করি যার যা কিছু ত্রুটী ও দোষ, গলদ ও অপরাধ আছে সরলভাবে স্বীকার ও পরিহার করিয়া সকলে একত্র মিলিত হই। সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিতে অগ্রসর হই। এ সময়ে যেন আমরা কেহ কাহারও দোষ দিয়া, এক জাতি অন্য জাতির ঘাড়ে সমুদয় অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরাজিত বিদ্বেষ প্রচারে মনোযোগী না হই। পরাধীনতার এই সহস্র বৎসরে আমরা পরস্পর বহু ঝগড়া বিবাদ, বহু নিন্দা তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই কিম্বা পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল কিছুমাত্র নরম বা শিথিল হয় নাই। এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থকে যেমন ভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে, কামার কুমার তিলি তাম্বুলি সাহা সুবর্ণবণিক কপালী সুতার পোদ নমঃশূদ্রকেও ঠিক তেমনি ভাবে খাটিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি

প্রত্যেক জাতির প্রতি প্রেম-প্রবণ হইতে হইবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতিকে সহোদর ভাইএর মত জ্ঞান করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতিকেই স্বীয় স্বীয় জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তন্নিম্ন বা তাঁহাদের অপেক্ষা নীচ (?) জাতীয় ভাইগণকে আপনার ভাইএর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। সকলকেই নিজ নিজ নীচ (?) জাতীয়—কনিষ্ঠ ভাইদের—ছোট ভাইদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে। কেবল উচ্চ জাতিদের দোষ দিলে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের গালাগালি দিলে কিম্বা নিন্দা করিলে অস্পৃশ্যতা দোষ দুরীভূত হইবে না। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম বোধ জাগাইতে না পারিলে কিছুতেই ভারত বক্ষ হইতে এই মহা পাপ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারা যাইবে না। বেদ ও উপনিষদের শিক্ষায়, ভাগবত ও গীতার শিক্ষায়, তন্ত্র ও পুরাণের শিক্ষায় আমাদের বিশেষ কিছু হয় নাই। এমন কি দয়ার অবতার ভগবান্ বুদ্ধের সাম্যবাদ প্রচারে, শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে, রামানুজ মধ্বাচার্য্য নিম্বার্ক তুকারামের ভক্তিবাদে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের পাষাণ গলান প্রেম সঙ্কীর্ত্তনেও এই পাপ বিনষ্ট হয় নাই।

সমধর্ম্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে, ২২ কোটি হিন্দুর নরনারীর মধ্যে প্রথমতঃ এই চেষ্টা সফল ও সার্থক করিয়া তারপর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে জল-চলের প্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষণিক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা হঠাৎ ভাব-প্রাণোদিত হইয়া অথবা সাম্যবাদের মিথ্যা ধুয়া ধরিয়া ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার ফল হিন্দুসমাজ মধ্যে কখনই ভাল হইবে না। তুমি আমি কোন্ ছার—নগণ্য, আধুনিক যুগের যুগাবতার মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন—দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষিগণও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আর্য্য ও শিখ সমাজে এ বিষয়ে জোর করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

তাঁহাদের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হয় নাই। আর যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব ও সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইয়াছে। বিরাট হিন্দু সমাজের বিস্তৃত বক্ষে নাস্তিকের স্থান হইয়াছে কিন্তু ইঁহাদের স্থান হয় নাই। ইহাতে হিন্দু সমাজের কতখানি ক্ষতি বা লাভ হইয়াছে—সে বিচার আমরা এখানে করিতে চাই না। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রাচীন সনাতন পন্থী হিন্দু সমাজে বলপূর্ব্বক কোন বিধি প্রচলিত হয় নাই। বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু একাকারের নামে শিহরিয়া উঠে। সেই জন্য বলি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বতন্ত্র সমাজের লোকদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে খাওয়া পরায় বিশেষ সাবধানতা সহকারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইবে। খেয়াল বশে কিম্বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সাম্যের নামে অন্যায় ঘা দিলে অচলায়তন সমাজ তাহা সহ্য করিবে না। সমাজের শতকরা প্রায় ৯৫ জন নিরক্ষর; এবং নিরক্ষরগণ প্রায়ই ধর্ম্মান্ধ হন। এমতাবস্থায় তুমি আমি রাম শ্যাম যদু হরি এবং এইরূপ কয়েকজন সাম্যবাদী সাম্যবাদের নামে অনাচার ও কদাচার করিতে আরম্ভ করিলে সমাজ তাহা অনুমোদন করিবে না—এবং শুধু তাহাই নহে, সহ্যও করিবে না। শিশুর অজ্ঞতা, বালকের চপলতা ও যুবকের উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে সমাজের অনিষ্টই করিবে—কল্যাণ কিছুমাত্র হইবে না। অন্য সমাজের কল্যাণ চিন্তা কিছু দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া হিন্দু তুমি, আগে হিন্দু সমাজের ন্যায় অন্যায়—মঙ্গলামঙ্গল—ভাল মন্দের ভাবনা ভাবিতে শেখ। হিন্দুর সন্তান তুমি, হিন্দু সমাজস্থ অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার দোষ দূর করিতে মনোযোগী হও। অন্য সমাজের ভাবনা পরে ভাবিও। তাহারা কি তোমাদের সমাজের ভাল মন্দ ভাবিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিয়াছে? নিজের ভাই ভগ্নী মাতা পিতার মুখে ক্ষুধার অন্ন—পিপাসার জল না দিয়া রুশিয়ার দুর্ভিক্ষে অর্থ প্রেরণ করা মহা সাম্যবাদ ও মহা উদারতার পরিচায়ক

হইলেও উহা সুভ্রাতা কিম্বা সুপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। অগ্রে নিজ নিজ গৃহ পরিবারের, নিজ নিজ সমাজের জাতির স্বীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাই ভগিনীগণের সংস্কার সাধন করিয়া,—নিজের ভাইকে ভাই বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া তারপর বিমাতার পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে হইবে। আমার দেহের সমরক্ত সহোদর ভাইদের ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া, ঘৃণা অবজ্ঞায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া, গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া পাড়াপ্রতিবাসীদের লইয়া ঘর করিতে,—উদার সাম্যবাদী হইতে কে উপদেশ দিবে? সাহা সুবর্ণবণিক কাপালী নমঃশূদ্র পাটনী পোদভাইদের আমরা জল-চল করিয়া না লইয়া—দূর সম্পর্কিত বিদেশাগত ভাইদের একেবারে ভাত-চল করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র,—লাভ কিছুই হইবে না। কোন ধীর স্থির বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা সমর্থন করিবেন না। ইহাতে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা সাম্যবাদী হঠাৎ দেশভক্ত ভাইদের জিজ্ঞাসা করি—তোমরা তোমাদের পাড়া-প্রতিবাসী স্বধর্ম্মাবলম্বী গো বিপ্ররক্ষক—গো বিষ্ণুপূজক সাহা সুবর্ণবণিক কাপালী কৈবর্ত্ত-ভাইদের দূরের কথা—তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের জল-চল করিয়া লইতে পারিয়াছ কি? তোমার বাড়ীর কাছের গ্রহ বিপ্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কুয়া ছুঁইবার অধিকার দিতে পারিয়াছ কি? সমাজের এই বীভৎস অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনে কখনও দল বাঁধিয়া তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছ কি? সে সাহস—সে শক্তি—সে মনোবল—সে উদারতা—সে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ তোমাদের আছে কি? নীরব রহিলে কেন, উত্তর দাও। বুঝিয়াছি তোমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই। থাকিলে হিন্দু সমাজের তথা হিন্দুস্থান ভারতবর্ষের এ দশা ঘটিত না।

আর এক কথা অস্পৃশ্যতা দূরকরণ অর্থে কেহ যেন—কোন পণ্ডিত যেন একেবারে ভাত-চল হওয়া বুঝিয়া না বসেন। ভাত চল হওয়ার ঢের

দেরী। দু'দশ শতাব্দী অন্তে যদি হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিবেন। শত শত শতাব্দী অতীত হইয়াছে—তথাপি বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও কামার কুমার তিলি তাম্বুলি গোপ নাপিত প্রভৃতি পরস্পর জল-চল বিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে ভাত-চল হয় নাই। অন্য জাতির মধ্যে দূরে থাকুক এক প্রদেশের ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের ভাত-চল নাই। শীঘ্র যে সে সম্ভাবনা আছে—তাহারও কোন লক্ষণ বা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সে জন্য বলি—আপাততঃ ভাত-চলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া—সেরূপ কোন মহৎ চেষ্টায় মাথা না ঘামাইয়া বঙ্গের বা ভারতের অনাচরণীয় ভাইদের অগ্রে জলাচরণীয় করিয়া লইবার জন্য সকলে দলবদ্ধ ভাবে ভারতের সমুদয় হিন্দুজাতি চেষ্টিত হউন, ইহাই প্রার্থনা !!

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন—

"ভারতে হিন্দুয়ানির নামে স্পর্শদোষের দোহাই দিয়া ঘোর পাপাচার চলিতেছে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান যতদিন না হয়, ততদিন ভারতবাসী কোনরূপ স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত হইবে না। আমি হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন ও ভারতবাসীর আচার-পদ্ধতি নিবিষ্টভাবে অনুবর্ত্তন করি এবং সনাতন হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলি। ফলে বিবেকবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রকৃত আনুষ্ঠানিক (orthodox) হিন্দু, স্পর্শদোষ না মানিয়াও নিজের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারেন। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পরস্পরে বৈবাহিক আদান প্রদান বা একত্রে পান ভোজন, হিন্দুত্বের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুযায়ী নিষিদ্ধ হইলেও, কাহাকে অস্পৃশ্য মনে করা পাপজনক; অথচ এই পাপ হিন্দু সমাজে অবাধে চলিয়াছে। পরলোকগত মনিষী গোখলে বলিতেন যে, হিন্দুরা স্বদেশে জাতভাইদের ঘৃণা করিয়া যে দারুণ পাপ অর্জ্জন করে, তাহার প্রতিফল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য উপনিবেশে সুদে আসলে উশুল

হয়। আমি ভারতের নিগৃহীত ও নিগ্রহকারী—এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা এযাবৎ অনুষ্ঠিত অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়চিত্ত স্বরূপ এই আত্মশুদ্ধিমূলক মহান্দোলনে—এই আত্মোন্নতির চেষ্টায় অগ্রসর হউন ; নচেৎ পরিত্রাণ নাই।"

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ১০৮ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলিয়াছেন—"যাদের পতিত বলিয়া, অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিয়াছ তাদের কাছে ডাক, ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, সমগ্র ভেদ দূর কর।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখিয়াছেন—"যদি হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্য ও জল অনাচরণীয় জাতিগুলিকে পাংক্তেয় করিয়া না লয়, যদি হিন্দুরা তাহাদের সমাজভুক্ত অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও ঘৃণার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া না ধরে, তাহা হইলে এক বৎসরেই বল—আর ১০০ বৎসরেই বল, স্বরাজ আমরা লাভ করিতে পারিব না।"

"আমরা যতদিন আমাদেরই দেশের কতকগুলি লোককে এই ভাবে মানব সমাজের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিব, তাহাদের অঙ্গস্পর্শে নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে থাকিব, ততদিন আমাদের স্বরাজের পথে উন্নতিলাভের আশা নাই। আমাদের এই কপট ব্যবহারের জন্যই আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই দুর্ভোগ ভুগিতেছি।

অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, এ শয়তানী। শয়তানী করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের আসন ন্যায় ও সত্যের উপরে নহে। শাস্ত্র কেবল যুক্তিকে পবিত্র ও সত্যকে আরও সপ্রকাশ করিবার জন্যই।

অস্পৃশ্যতা চালাইতে দিয়া হিন্দুধর্ম্ম পাপগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা আমাদিগকে অবনত করিয়াছে, আমাদিগকে সাম্রাজ্যের পারিয়া করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য মুসলমানগণও আমাদের নিকট হইতে এই সংক্রামক পাপটি পাইয়াছেন।

তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা ও কানাডায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই পারিয়ার মত ব্যবহৃত হইতেছে।

এই অস্পৃশ্যতা পাপ দূর না হইলে স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। যুধিষ্ঠির তাঁহার কুকুরটিকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে চাহেন নাই। আজ যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদিগকে বাদ দিয়া কিরূপে স্বরাজলাভ করিবার আশা করেন ?

আমরা আমাদের ভাইদের চাপিয়া রাখিবার অপরাধে অপরাধী। আমরা তাহাদিগকে বুকে হাঁটাইতেছি, নাকে খৎ দেওয়াইতেছি। আমরা রক্ত চক্ষু দেখাইয়া তাহাদিগকে রেলের কামরা হইতে ঠেলিয়া দিই। বৃটিশ শাসনে ইহার বেশী কি আমাদের করিয়াছে ? আমাদিগকে এ পাপ প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ দোষ দূর করিতে না পারিলে আমরা স্বরাজ পাইয়াও রাখিতে পারিব না। আমরা আমাদের দুর্ব্বল ভাইদের প্রতি অবিচার করিয়াছি, তাহার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত আমরা পশুর মধ্যেই গণ্য থাকিব। স্বরাজ পাইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

এই অস্পৃশ্যতা ধর্ম্ম জগতে বিষম অন্তরায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মত এবং ঐতিহাসিক হিসাবে একটা মিথ্যা বস্তু। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আর্য্যরক্ত অন্ত্যজদের মিশিতে দেওয়া ঠিক নহে ; কিন্তু সে পবিত্র আর্য্য আজ কোথায় ?

এই মিথ্যা অস্পৃশ্যতা আবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। যদি আমরা জাতীয়তা ক্ষেত্রে প্রকৃতই কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে এ দূষিত ক্ষতস্থান আরোগ্য করিতেই হইবে।*"

* গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।—দৈনিক বসুমতী।

"জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার দ্বারা এদেশের অধঃপতন যে কত দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সম্প্রতি মান্দ্রাজের একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ত্রিচূড়ের সংবাদে প্রকাশ, পুদুকোটা গ্রামের জনৈক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ মহিলার একজন নায়ার চাকর ছিল। একদিন এই চাকরের মাথা হইতে তিনি একটি তরিতরকারীর ঝাঁকা নামাইয়া লইয়াছিলেন, এই অপরাধে সমাজ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করে। এরূপ খামখেয়ালি অনুদার সমাজের নমুনা জগতের আর কোথাও মেলে না। আর এইটাই সমাজের বিশিষ্টতা মনে করিয়া আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা গর্ব্ব করেন। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ মহিলাটি সমাজের এই অন্যায় কষাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের মন স্বাধীন তাঁহারা কখনো এই সব অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারেন না। হিন্দু সমাজ তাহার অচলায়তনের প্রাচীরটা সঙ্কীর্ণতার দ্বারা যতই উঁচু করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার জন-বল ততই কমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। * * * তথাপি এদিকে সমাজের কোন হুঁস নাই। *"

"উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সর্ব্বদা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অযথা উৎপীড়ন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ঘৃণার চক্ষেও দেখেন। এমন কি কোন হিন্দু নাপিত অথবা ধোপা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কাজ করে না; অথচ ইহারাই মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু ধোপা ও নাপিতগণ বিনা আপত্তিতে তাহাদের সেবা করিবার জন্য উদগ্রীব হয়। হিন্দু সমাজের এই আত্মঘাতী নীতির ফলে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং নিম্ন শ্রেণীর বহু হিন্দু অনন্যোপায় হইয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, মান্দ্রাজে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের ভেদ বাঙ্গলা দেশ হইতে অধিক। এই বিষয়ে বাঙ্গলাও মান্দ্রাজ হইতে পশ্চাৎপদ নহে।

* অস্পৃশ্যতার অত্যাচার, প্রবাসী মাঘ, ১৩২৯।

আমরা অন্যত্র এই সংবাদটী প্রকাশিত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, আমাদেরই অনুদারতার ফলে দিন দিন হিন্দু সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বাঙ্গালী নাপিত ও ধোপা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের কার্য্যই করে, কিন্তু করে না কেবল ইহাদের। একজন হৈহয় ক্ষত্রিয় যতক্ষণ হিন্দু থাকিবে, ততক্ষণ কোন নাপিত তাহাকে কামাইবে না; কোন ধোবা তাহার কাপড় কাচিবে না; কিন্তু যেই সে খৃষ্টান কিম্বা মুসলমান হয়, অমনি তাহার পক্ষে নাপিত ধোপা পাওয়ায় আর বিঘ্ন থাকে না। বর্ত্তমানে ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, পুরোহিত, দেবমন্দির—সকল হইতেই হৈহয় ক্ষত্রিয় বঞ্চিত। ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরহিত্য করিলে সে ব্রাহ্মণের হাতের জল অস্পৃশ্য বিবেচিত হয়, হৈহয় ক্ষত্রিয় জুতা খড়ম পায় দিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়ীতে গেলে তাহা নিতান্ত অসহনীয় হয়। হিন্দুর প্রতি হিন্দুর এই প্রকার অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ফলে বহুলোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে;—মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছে। কুড়িগ্রাম পোষ্টের অধীন ভোট জাতীয় সমস্ত হিন্দুরা মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন একযোগে সকলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।*"

"আহার, জলপানসম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, মনুষ্যত্বকে অপমান না করিয়া, প্রয়োজন মত পন্থা অনুসরণ করিলেই হইল; আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলার কোন জাতিকে জল অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া কোন জাতির ঠেকাইয়া রাখা উচিত নহে। তা' ব্রাহ্মণোত্তমই হউক, আর চণ্ডালাধমই হউক—মানুষের নিকট মানুষের ব্যবহার পাইবার দাবী ও অধিকার এ যুগে সকলেরই আছে—ইহাই যুগধর্ম্ম। কালপুরুষের ইঙ্গিত—বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের অধিকাংশ জাতি আর পতিত-পর্য্যায়ভুক্ত থাকিবেন না। স্ব স্ব বর্ণোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা আয়ত্ত করিবার যে উৎসাহোচ্ছল

* আনন্দবাজার পত্রিকা', ফাল্গুন ১৩২৯।

উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে,—কোন হাস্যকর মূঢ়তা তাহা বাধা দিতে পারিবে না। আমরা সেই ভরসাতেই বাঙ্গলার হৃদয়বান যুবক-শক্তিকে পুনঃ পুনঃ জাতীয়-চরিত্র হইতে ছুঁৎমার্গের জঘন্য লজ্জা চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আভিজাত্য ও কাঞ্চনকৌলিন্যের ঝুঁটা অহঙ্কার ভূলুণ্ঠিত হউক, বাঙ্গলার বুকে মনুষ্যত্বের মহিমা অভ্রভেদী শির তুলিয়া গৌরবগর্ব্বে দণ্ডায়মান হউক। সকলের শুভ ইচ্ছা এই শুভদিনকে নিকটবর্ত্তী করুক। আমরা প্রপীড়িত মনুষ্যত্বের মুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্মের জগত-উপপ্লাবী মহালীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" *

অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ ভারতবর্ষ হিন্দুস্থানকে ডুবাইয়াছে, মুষ্টিমেয় বিদেশী বিজাতি ও বিধর্ম্মী ৩৩ কোটি নরনারীর উপর একাধিপত্য করিতে সক্ষম হইতেছে। অস্পৃশ্যতার মহাপাপ কোটি কোটি হিন্দুকে পরাজিত ও পরাধীন করিয়াছে এবং দিন দিন ধ্বংস করিতেছে। বিগত সাত শত বৎসরে ৬০ কোটি হিন্দু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এবং কমিয়া ২২ কোটিতে পরিণত হইয়াছে এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বিগত ৫০ বৎসরে ৫০ লক্ষ ভিন্ন ধর্ম্মী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ হিন্দু সন্তান এই বঙ্গদেশে—কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু সমাজপতিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি দিন গড়ে ৩৫২ জন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। হিন্দু সমাজের মনস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ হিন্দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল। বিরাট হিন্দু জাতিকে এই ক্ষয় ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিগত ভাদ্র মাসে (১৩৩০) পুণ্যভূমি কাশীধামে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দু নেতৃবর্গ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী একত্র হইয়াছিলেন—হিন্দু মহাসভার সপ্তম অধিবেশনে। পুনরায় গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯২৪ সালে) তীর্থরাজ প্রয়াগধামে অখিল ভারতীয়

* আনন্দবাজার পত্রিকা।

হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের সাধু সন্ন্যাসী, প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং হিন্দু সমাজের অগ্রণী, প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ একত্রিত হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও শুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে অবজ্ঞাত শ্রেণীর নর-নারায়ণ-দের বিদ্যালয়ে ও দেব মন্দিরে প্রবেশাধিকার দান এবং ছুঁৎমার্গ পরিহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি আজ ৪ বৎসর ধরিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রস্তাব প্রতি বর্ষে গ্রহণ করিতেছে এবং সকলকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেকেই আপন আপন জীবন ও আচরণ দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতের সহর ও নগর হইতে অস্পৃশ্যতা তিরোহিত হইয়াছে উহা দূর পল্লীতে মাত্র আছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক পল্লী হইতেই এই পাপ অচিরাৎ পলায়ন করিবে। ভারতের সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য ভ্রাতা ভগিনীগণের মর্ম্মন্তুদ বেদনা দয়াল হরির স্বর্গ সিংহাসনে পৌঁছছিয়া তাঁহার কোমল প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে। এই বার সর্ব্ব দুঃখের অবসান, সর্ব্ব তাপের প্রশমন ও সর্ব্ব বেদনার নিবৃত্তি। এই সাত কোটি নরনারীকে মানবের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করতঃ আমরা নব বলে নূতন শক্তিতে স্বরাজ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অধিকার না দিলে অধিকার পাইবার কোন আশা নাই। দেওয়া এবং পাওয়া ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা অধিকার দিব না, অধিকার পাইব? এক গ্লাস জল দানের, একটা শব্দ উচ্চারণের, একখানা পুস্তক পাঠের তুচ্ছ অধিকার আমরা দিব না—আর বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতি ইংরাজ গোটা ভারত রাজ্যের অধিকার আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন—এরূপ আশা করা কি পাগলামি নহে। অস্পৃশ্যতা ও বর্ত্তমান অন্যায় অন্যায্য জাতিভেদের মহাপাপে এ দেশ ডুবিয়াছে। ইহার

আশু প্রতিকার চাই। নমঃশূদ্র, পোদ, মালী, পাটনী প্রভৃতি সমাজের ও জাতির অশেষ উপকারী, নিত্য সেবাপরায়ণ সরল অকপট ভাইদিগকে ধোপা, নাপিত, বেহারা দিতে হইবে। সকলকে ভাই বলিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে। কাহাকেও বাদ দিয়া স্বরাজ সংগ্রামে জয়ের আশা নাই। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ব্যতীত ২২ কোটি স্বজাতীয় হিন্দু নরনারীর মধ্যে প্রকৃত জাতিয়ত্ব ও আপন বুদ্ধি জাগ্রত হইবে না। হিন্দু জাতির এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রত্যেক জাতিকে আপন আপন জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ছোট ভাইদের জলচল করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তিলি, তাম্বুলি, নাপিত, মোদক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জলাচরণীয়গণ এই দণ্ডে সুবর্ণ বণিক, সাহা, কপালী, মাহিষ্য, (আদি কৈবর্ত্ত ঝালমাল, সূত্রধর প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন এবং সুবর্ণ বণিক, সাহা, মাহিষ্য আদি কৈবর্ত্ত) কাপালিকগণও আবার এই দণ্ডে,—সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন। এইরূপ ভাবে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক, ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অনুন্নত ও অবনত—লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত কোনাই. বেহারা, ঢুলি, চর্ম্মকার ও হাড়ি ভাইদের জলচল করিয়া লইবেন। এমনি করিয়াই সমুদয় অচল জাতির জলচল করিয়া লইতে হইবে। যদি কোন সম্প্রদায় তন্নিম্ন সম্প্রদায়স্থ ভ্রাতৃগণের জলপানে অসম্মত ও কুণ্ঠিত হন—তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ জাতিগণের নিকট জলচলের দাবী করা সঙ্গত ও শোভন হইবে কি? তাঁহারা এই কথাটা নিজেরাই ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অধিকার না দিলে অধিকার মিলিবে না—অধিকার দিলে তবে অধিকার পাওয়া যাইবে। ভারত জননীর সুসন্তানগণ কোটি কোটি অস্পৃশ্য ভাইদের তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন সর্ব্ব জাতির উত্থান ও মুক্তির উপরই ভারতের অভ্যুত্থান ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে। কারণ কাহাকেও বাদ দিয়া—পরিত্যাগ করিয়া কাহারও

উঠিবার সাধ্য নাই। ভারত শুধু উচ্চ জাতিরই নহে—ভারত আচণ্ডালের ভারত।

অতএব নিবেদন, এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্ত হইতে ইহাকে সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। কোন দোহাই, কোন যুক্তি, কোন শাস্ত্র আমরা শুনিব না। ইহার অনুকূলে কোন যুক্তি ও ন্যায় থাকিতে পারে না। ইহা জীব-ব্রহ্ম, নর-নারায়ণবাদ অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, শাস্ত্রের মহিমা ও মর্য্যাদা ধ্বংস করিয়াছে—অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছে। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—সকলের জলই সকলে খাইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ বা পাপ নাই। আসুন, আমরা সকল জাতি—সমগ্র হিন্দু সমাজ মিলিয়া এই পাপ প্রথা উঠাইয়া দেই, সকলের হাতের জল সকলে খাই। এই প্রকারে ভারত হইতে জাতিদ্বেষ—জাতি হিংসা—দূর করি। যাহারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু।

ঘরে বিড়াল, বেজী, সাপ, কুকুর গেলে, ছাগল, ভেড়া, ইন্দুর গেলে কৈ কাহারও ত ভাত ডাল দ্রব্য জল নষ্ট হয় না,—আর মানুষ গেলে নষ্ট হইবে? মানুষ কি তবে ছাগল ভেড়া বিড়াল বেজি অপেক্ষাও অপবিত্র, ঘৃণিত ও দূষিত? দেবমন্দিরে পশু পক্ষী গেলে দেবতা অশুদ্ধ হয় না—কিন্তু মানুষ গেলে দেবতা অশুদ্ধ, অপবিত্র হয়,—শালগ্রামকেও পঞ্চগব্যে শুদ্ধ করিতে হয়। তবে কি বুঝিব, মানুষ পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধম, হীন অপবিত্র? ভাই সকল, এই সব পাপাচারেই হিন্দু জাতি ডুবিয়াছে। পদাঘাতে এই সব পাপাচার, দেশাচার, অনাচার, অত্যাচার, স্ত্রী-আচার, লোকাচার ভাঙ্গিতে হইবে। "ধর্ম্ম মার্গ, জ্ঞান মার্গ, যোগ মার্গ, ভক্তি মার্গ সব পলায়ন, আছে কেবল ছুঁৎমার্গ; আমায় ছুঁওনা—আমায় ছুঁও না রব। ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই, মুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই—যাগ যজ্ঞ

তপস্থায় নাই! ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।" কে বড়, কে ছোট, কে উচ্চ কে নীচ, কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট—সকলেই ভগবানের সন্তান—বিরাট পুরুষের দেহজ—আত্মজ। কাহাদের ঘৃণা করিব? যাহাদের না হইলে সমাজের এক দণ্ড চলে না, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমের উপর আহার বিহার, অন্ন জল, ভোগ বিলাস নির্ভর করিতেছে,—যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, রক্ত মাংস মেদ অস্থি—যাহারা দেশের সর্ব্বস্ব, প্রাণ, আত্মা, তাহাদিগকে কি আমরা ঘৃণা করিতে পারি? স্বজাতি, স্বধর্ম্মাবলম্বী এবং স্বদেশবাসী ভাই ভগিনীগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার মহাপাপেই না ভারত ডুবিয়াছে। ভারতবর্ষের যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ,—ভারত জননীর যাহারা শ্রেষ্ঠ সন্তান—সেই মহাত্মা গান্ধী—তিলক, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ সকলেই অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী। আমরা কাহার কথা শুনিব? মহা মনীষি মদন মোহন মালব্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কথা শুনিব, না তর্কবাগীশ তর্করত্নের কথা শুনিব? তর্করত্নের যুগ গিয়াছে,—এখন ন্যায়রত্নের যুগ। এ যুগে অন্যায়, অসত্য, কাপট্য, ভণ্ডামী চলিবে না। তোমার তলে তলে সব চলে,—আর প্রকাশ্যে জলটুকু চলিবে না? এখন আর কপট হিন্দুয়ানী চলিবে না। ভণ্ড আর্য্যামীর যুগ গিয়াছে। এখন সত্য ও যুক্তির যুগ। এই বঙ্গদেশে ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৫০ লক্ষ মাত্র—আচরণীয়; অবশিষ্ট দেড় কোটিই অনাচরণীয়; ৪ ভাগের ৩ ভাগকেই আমরা পশুর অধম করিয়া পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিয়াছি। এই এক কোটি ৫০ লক্ষ লোককে বাদ দিয়া—হীন করিয়া রাখিয়া আমরা কিছুতেই বড় হইতে,—বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ইহাদিগকে এই দণ্ডে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে,—শ্রীবুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম লইয়া ইহাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া—ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রেমের অমৃত প্রলেপে যুগ যুগান্তরের ঘৃণাবমাননা হিংসা দ্বেষে ক্ষত বিক্ষত প্রাণের ব্যথা, বেদনা

দূর করিয়া—আরোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ২২ কোটি হিন্দুকে এক করিতে হইবে। কাজ শক্ত,—পথ কণ্টকাকীর্ণ, বাধা বিঘ্ন পদে পদে—তবু আমরা এই পথেই যাত্রা করিব। পার্থ সারথী আমাদের পশ্চাতেই আছেন—তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক,—নেতা, পরিচালক এবং এই ন্যায় সত্য ও ধর্ম্ম-যুদ্ধের সেনাপতি। মানুষের—সমাজপতিগণের কি সাধ্য আমাদের গতিরোধ করে। দেশকে আমরা তুলিবই তুলিব, ভারতের মুক্তি আনিবই আনিব। আমরা জ্যোতির সন্তান, আমরা কাহাকে ভয় করিব—গ্রাহ্য করিব।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কথাটা শুনিয়াই হয়ত অনেকে চম্‌কিয়া উঠিবেন, নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, লেখককে কালাপাহাড় বলিয়া ঘোর কলির আগমনের স্বপ্ন দেখিবেন। অনাচরণীয়ের জল পান করা দেশাচার ও লোকাচার বিরুদ্ধ হইলেও অশাস্ত্রীয় নহে। আমরা শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি করি না। স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া থাকি মাত্র, ফলতঃ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আমাদের অনুমাত্রও নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচার, স্ত্রী-আচার, দেশাচার ও অন্যায় আচার অবিচারের আমরা অধিক ভক্ত—লোকাচার ও দেশাচারের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ শাস্ত্রের দোহাই সকলেই দিতেছে। সংহিতাদির মধ্যে মনুসংহিতা শ্রেষ্ঠ। মনুর নামে সমাজপতিগণের মুখে জল আইসে, কণ্ঠ গদ্গদ হইয়া উঠে। সেই মনু মহারাজ জলকে সচল করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিতেছেন :—

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথা ভয় দক্ষিণাম ॥২৪৭
শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মনীন্ দধি।
ধানা মৎস্যান্‌পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ম্নুদেৎ ॥২৫০

(চতুর্থ অধ্যায়; মনুসংহিতা।)

"কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল ও খাদ্য যাহা অযাচিতভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয় দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়।" "শয্যা, গৃহ, কুশ, কর্পূরাদি, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, ধান্য, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও শাক এ সমুদায়ও অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না।"

শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, বচনবাগীশগণ, মনুর বচন মানিতে প্রস্তুত আছেন ত? শাস্ত্র বলেন—মদ্যপায়ী এবং মদ্যপায়ীর সংস্রবকারিগণ মহাপাপী, দণ্ড—প্রাণদণ্ড। "পাচক (রাঁধুনী) ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।" (অত্রি সংহিতা ৯২) শূদ্র সেবায় (ম্লেচ্ছের ত কথাই নাই) চান্দ্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)। লশুন, পলাণ্ডু ভোজনে চান্দ্রায়ণ। হংস, কপোত, মৎস্য, মাংস ভোজনে দ্বাদশাহ উপবাস (উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়)। এই ত শাস্ত্রের আদেশ ও উক্তি। আপনারা যখন শাস্ত্রের কোন আদেশই পালন করিতে সমর্থ নহেন—তখন বাড়াবাড়ি না করিয়া দেশের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য ভাইদের বাহুপাশে বুকে টানিয়া আনুন। অস্পৃশ্যতারূপী মহাপাপ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন।

এই অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের মহাকবি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"কহিলা মহর্ষি; বৎস! অস্পৃশ্য পারিয়া।
বিপ্রগ্রামে বাপী-স্পর্শে নাহি অধিকার;
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল পানে।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধদ্রব্যে যদি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল;
তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইল তা'রে।
জান কি এ পারিয়ায়? এই জাতি মাঝে

জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে ঋষিসম;
এই জাতি সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি' দ্রবিড়
করেছিল মধুময়; তবু দশা হেন।
'দয়া মূল ধর্ম্ম' এই শাস্ত্রের বচন;
কিন্তু বল, কোথা দয়া? কুক্কুর-ভোজন
নহে দূষ্য; দূষ্য নরশিশুর ভোজন!
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তা'র।
আছে শাস্ত্রবাণী, সত্য, গুণ কর্ম্মবশে
জাতি-সৃষ্টি; বিচারিয়া কিন্তু বল তুমি
জাতি-দর্প, জাতি-দ্বেষ কোন্ শাস্ত্রবাণী?
কোন ঋষি হেন শাস্ত্র করিলা প্রচার?
নিজে নর নারায়ণ বিঘোষিলা যথা
অবিভেদে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
জ্ঞানীর লক্ষণ, সেথা বর্ব্বরতা হেন?
উচ্চ ধর্ম্মনীতি হেন প্রচারিত যথা,
এই নীচ আচরণ সাজে কি তথায়?
ভুলিয়াছে আর্য্যসুত, দেব রঘুমণি
চণ্ডালে বাঁধিয়াছিলা প্রেম-আলিঙ্গনে;
ভুলিয়াছে বুদ্ধরূপী প্রভু বিশ্বম্ভর
উচ্চ নীচ, দ্বিজ শূদ্র, সবে সমভাবে
শিখাইয়া ছিলা নীতি, ধর্ম্ম, সদাচার।
সর্ব্ব জীবে আত্মারূপে বিরাজিত যিনি,
দেখ ভাবি', কি বেদনা লাগে তাঁ'র প্রাণে

হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস! মহা গদা তাঁ'র,
হয় ত, কখন্ আসি' পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ-পরম্পরাক্রমে।"

পারিয়াদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার প্রতিফল—হিন্দুস্থান ও গর্ব্বিত ভারতবাসী হাতে হাতে পাইয়াছে।

হিন্দুর প্রতি হিন্দুর, স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতির এই দলন ও পীড়ন, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুচতুর ইংরেজ বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসী দ্বারা ভারতবাসীকে দলনকরতঃ পলাসীর যুদ্ধে হিন্দুর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন। * অন্ত্যজ পীড়নের সূত্র ধরিয়া ভগবান্ ইংরাজকে হাত ধরিয়া ভারত সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—অন্ত্যজের হাতে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া। অন্ত্যজ পারিয়া নারায়ণের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ফল—ভারত এখন হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করিতেছে। ভারতবাসী, উচ্চ জাতিত্বের বৃথা দাবী ও গর্ব্বকারিগণ সাবধান হও। তথাকথিত অন্ত্যজ-ভ্রাতার বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া—ভাই বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর,—শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ এই পতিত জাতি ও পতিত দেশের উপর বর্ষিত হউক।

---

* The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's sepoys, and are, still enlisted in the Madras sappers and miners.

Encyclopaedia Britanica Vol. XX. P. 802

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পরিপোষক 'কলির দেবতা' হে পূজনীয় সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! উপসংহারে আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বশেষে এ দীন সমাজ সেবকের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। প্রথমতঃ আদ্যোপান্ত এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তারপর ধীরভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, দুই চারি পাতা পড়িয়াই ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িবেন না। ক্রোধে অধীর হইলে চলিবে না, ধীর স্থির ভাবে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজপতি হওয়া কেবল মুখের কথা নহে, ইহার জন্য প্রচুর পরিমাণ হৃদয় শোণিত দানের প্রয়োজন। ফাঁকি দিয়া সমাজপতি হওয়া চলে না। স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগ ভিন্ন কেহ কোন কালে কোন দেশে সমাজপতি হইতে পারেন নাই। আপনাদের সে 'ত্যাগ' কোথায়? কাজের মধ্যে দিবারাত্র কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছেন মাত্র। শাস্ত্রের প্রমাণ ভিন্ন আপনারা অন্য কোন কথা, কোন যুক্তি কানে তুলিতে চাহেন না। জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্র কিছু প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন কি? দেশের কল্যাণ বাসনা, সমাজের হিতচিন্তা লইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের স্বার্থ স্মরণ করিয়া হৃদয় দিয়া হিন্দুশাস্ত্র কখন আলোচনা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, বুঝিব শাস্ত্র পাঠ আপনাদের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র! শুধু, 'দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং' এর জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিলে চলিবে না, শুধু 'অন্নারম্ভ', 'চূড়াকরণ', 'বিবাহ', 'শ্রাদ্ধ', 'দোল-দুর্গোৎসব' করাইয়া দশটা টাকা উপার্জ্জন করিলে চলিবে না, শুধু বিরাট গীতা রাস মহাভারত পড়িয়া, দুই দশখানা প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি লিখিয়া দিয়া কিছু আদায় করাই সমাজপতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। এগুলি সমাজপতির কার্য্য নহে, এগুলি ব্যবসাদারের কার্য্য! সমাজপতিত্ব,—গ্রহণে নয় দানে, ভোগে নয় ত্যাগে, ঘৃণায় নয় প্রেমে, বর্জ্জনে নয় আলিঙ্গনের উপর নির্ভর করে। আপনাদের মুখে অনবরত শাস্ত্রের দোহাই, অনুষ্টুপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের ছড়াছড়ি, ঘটত্ব পটত্বের বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া যাই! আপনারাই কি সেই প্রাচীন ঋষিগণের সন্তান? সত্যযুগের ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র ত্রিজগতের কল্যাণকামী সত্য জ্ঞানময় বপুঃ সর্ব্বজীবের অহৈতুক কৃপাপরায়ণ ইহলোকের আদর্শ পরলোক-দ্রষ্টা দিব্য-চক্ষুষ্মান্ আপনারাই কি সেই ব্রাহ্মণ? তবে কৈ আপনাদের যোগ তপস্যা, যাগ যজ্ঞ, কৈ আপনাদের হিংসা-বিদ্বেষ-পরিশূন্য পবিত্র মুনিকানন ঋষির আশ্রম? কৈ আপনাদের সামগান মুখরিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দণ্ডকমণ্ডলু কাষায় কৌপীন, বেদ বেদান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং কৈ আপনাদের সর্ব্বোপরি উন্নত ললাট বিশাল উদার বক্ষঃস্থল! আপনাদের জ্ঞান বিদ্যায়, সংযম সাধনায়, আপনাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, শাসন সঞ্চালনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতির কি উন্নতিই না সাধিত হইয়াছিল? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ের সমভাবে সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান করিতে আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণ—পূতচরিত্র ঋষিগণ—কতই না প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন! জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে নক্ষত্রে, ভূচরে খেচরে, কীটে পতঙ্গে যাঁহারা বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক ভাবাবেশে তন্ময়চিত্তে কত কথাই না বলিয়া গিয়াছেন, কত শ্লোকই না লিখিয়া গিয়াছেন,

সঙ্গীতের সুর লহরীতে কত সামগানই না গাহিয়া গিয়াছেন! সেই সুপবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, ঋষি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্তমন্দাকিনী ভাগীরথীর পবিত্র তটে বসবাস করিয়া আপনারা—হে আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, মনে মনে আর্য্য ম্লেচ্ছ উত্তম অধম ব্রাহ্মণ শূদ্র দ্বিজ চণ্ডাল প্রভৃতি কি জঘন্য, কি নারকী ভাবই না পোষণ করিতেছেন, কি জঘন্য যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন করিতে যাইয়া জগতের মনিষীবৃন্দের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছেন! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পড়িয়া এত দ্বৈধ ভাব, এত হীন বুদ্ধি কেন? ব্রাহ্মণ! কৈ সে আপনাদের সমুদ্রের ন্যায় বিশাল বিস্তৃত অপার অনন্ত হৃদয়, কৈ সে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণের ন্যায় আচণ্ডালে সমদৃষ্টি সমপ্রাণতা, কৈ সে ধরণীর মঙ্গল সাধনায় উৎসর্গীকৃত নিঃস্বার্থ প্রাণ! অসীম সাগরে সঙ্কীর্ণতা কেন? ঋষি বংশধরগণের হৃদয়ে এত ভেদবুদ্ধি, এত নারকী প্রবৃত্তি কেন? মহা সাম্যবাদের প্রচারকগণের বংশধর আজ নরকের ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, ভীষণ বৈষম্যবাদ প্রচারে উন্মত্ত! জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি, সাধনা, পুণ্য আজ পদদলিত! হায় ব্রাহ্মণ! আপনারাই না একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃতের সন্তান অমৃতের অধিকারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন? আপনারাই না বিশ্ববাসীকে উপনিষদের কণ্ঠে সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনাইয়া অভয় প্রদান করিয়াছিলেন? জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে জগৎপাতার মহিমা—তাঁহার সত্বা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন ও অনুভব করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? কিন্তু আজ কি পরিবর্ত্তন! সে সব ঋষি ও ঋষিবাণী আজ কোথায়? পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহগণের সে সব মহামূল্য সত্য, পবিত্র জ্ঞান ও বেদবাণী আপনারা আজি বিস্মৃত এবং তজ্জন্যই আপনাদের এই শোচনীয় পরিণাম! এই মর্ম্মস্পর্শী অধঃপতন!! হে ব্রাহ্মণ, হে চতুর্ব্বর্ণের চির আরাধ্য চির বন্দনীয় সমাজপতি ব্রাহ্মণ! একবার পূর্ব্বপুরুষগণের

গৌরব, আত্মস্বরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ের কালিমা, মনের অন্ধকার, চিত্তের দুর্ব্বলতা, অপসারিত করিয়া দিন। একদিন জগতের পূজার্হ ছিলেন—আবার পূজার্হ হউন। হৃদয়কে প্রশস্ত করুন, বৈষম্য ভাব দূর করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদাভেদ বোধ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন। শুধু যজ্ঞোপবীত সর্ব্বস্ব হইলেই চলিবে না, শুধু বচনের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবেন না, শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিলেই আপনাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে না। সে দিন—সে যুগ অতল কাল-সিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়াছে। সে বর্ব্বর যুগ এখন আর নাই। ইহা বিজ্ঞানের যুগ, বেদান্তের যুগ। স্মৃতি সংহিতার শ্লোক ভুলিতে চেষ্টা করুন, আপনাদের সেকেলে পুঁথি পাতড়ার কথা শিকায় তুলিয়া রাখুন, অধিকার অনধিকারের টীকায় শক্তিক্ষয় করিয়া আর লাভ নাই। টীকা টীপ্পনী ভাষ্য তদ্ভাষ্যের ক্ষমতার কথা, উহার পাঠ ও আলোচনার ফল, হাজার বৎসরের দাসত্বে আমরা বিলক্ষণই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাতে আর মন ভেজে না, প্রাণ গলে না। শাস্ত্রের দোহাই দ্বারা বচনের আবৃত্তি দ্বারা আধিপত্য করিবার কাল আপনাদের অতীত হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হউন। আচণ্ডালে আলিঙ্গন দিয়া তাহাদিগকে প্রণব ওঁকার মন্ত্রে দীক্ষিত করুন, গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হউক। প্রাতঃ সন্ধ্যায় আবার নীরব পল্লীভবন মুখরিত হইয়া শিশুর কণ্ঠে পাখীর কলতানে কল্লোলিনীর তরঙ্গ ভঙ্গে সামগান উদ্গীত হউক। ব্রাহ্মণ! আবার সেই ব্রাহ্মণ হউন, আবার ঋষিত্ব লাভ করুন।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আপনাদের শাস্ত্রকারই বলিয়াছেন :—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥

[ভা]গবত।

ক্ষান্তং দান্তং জিত-ক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

গৌতম সংহিতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই এতগুলি লক্ষণের মধ্যে আপনারা কতটার অধিকারী। পিতামাতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে, এই যে এক ধুয়া ধরিয়া আছেন, পিতৃ পিতামহগত সাত্ত্বিকভাব পুত্রে না আসিয়াই পারে না, এই যে বলিতেছেন, করযোড়ে নিবেদন করি, পিতৃ পিতামহগত এই সব গুণাবলীর মধ্যে বংশানুক্রমিক জন্মগত ভাবে আপনারা কোন্‌টী পাইয়াছেন? বংশানুক্রমিক গুণই স্বীকার করিলে কঠোর ভাবে বলিতে হয়, আপনারাই প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য—নতুবা শূদ্রজনোচিত তমঃ ও রজোগুণ এত অধিক পরিমাণে আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাইব কেন? কেবল কি শূদ্রগুণেই পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শরীরের যে বর্ণ উহাও শূদ্র তনয়ের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ত কখন ব্রাহ্মণের শরীরের রং হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চলোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামাসিতস্তথা॥

মহাভারত ; শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ ও শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাধারণ রং"। বহু ব্রাহ্মণ কেবল যে বর্ণ সম্বন্ধেই শূদ্রবৎ হইয়াছেন তাহা নহে, ক্রিয়া বিষয়েও শূদ্রতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ আর এখন সেরূপ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ যোগনিরত নহেন, ব্রাহ্মণ আর এখন অধ্যয়ন অধ্যাপনামগ্ন হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত ধ্যান ধারণাপরায়ণ বেদপাঠী নহেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই এখন হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধে পূর্ণ, বিষয় প্রমত্ত, ধনলুব্ধ, অনৃতভাষী এবং অন্তঃ বহিঃ শৌচাচার

বিহীন। তাঁহাদিগের বৃত্তির স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান এখন হোটেল খুলিয়াছেন, দোকান দিয়াছেন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী, ব্যবসায়ী সবই হইয়াছেন, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ বেতন-ভোগী হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত; ব্রাহ্মণ এখন সুরাপায়ী; লবণ তৈল মাংসবিক্রেতা। এমন কাজ নাই, যাহা ব্রাহ্মণসন্তান গ্রহণ করেন নাই। শূদ্রান্ন, ম্লেচ্ছান্ন (?), যবনান্ন (?) কোন অন্নই আর বাকি রাখিতেছেন না। অথচ ইঁহারাই আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করেন, শ্লোক আওড়াইয়া শাস্ত্রের দোহাই দেন, পুরাণ সংহিতা ভিন্ন কোন কথা শুনিতে চাহেন না। ইহার কোন্‌টী শাস্ত্রসম্মত? মহর্ষি মনু ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ শ্লোকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন? মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ সংহিতাকারগণ যে সব বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি যথাযথ পালন করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রতিপন্ন করিবার শক্তি আপনাদের আছে কি? বর্ত্তমান যুগে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি আদেশ প্রতি পালিত হইতে পারে কি? শাস্ত্রকার ত বলিতেছেন ঃ—

স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদামৃগঃ।
ধর্ম্ম্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৪

সংবর্ত্ত সংহিতা।

যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥২

প্রথম অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

"কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগ্য স্থান॥"

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণসার মৃগ কি স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে? যদি না করে, তবে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, পূজ্যপাদ পুরোহিতগণ বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ কিরূপে সম্পাদন করাইয়া

থাকেন? শাস্ত্রাদেশ পালন করিতে হইলে ত এদেশে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত? হিন্দুশাস্ত্র অন্যত্র স্পষ্টভাবে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন :—

ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥১॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ; বিষ্ণুসংহিতা

"ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না।"

ম্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ বিশেষতঃ।
ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো ম্লেচ্ছদেশে ন চ ব্রজেৎ ॥৪

১৪শ অধ্যায়; শঙ্খ সংহিতা।

"ম্লেচ্ছদেশে * * * বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না।" ম্লেচ্ছদেশ কাহাকে বলে?

উত্তর :—চাতুর্ব্বণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥৪

(চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ; বিষ্ণুসংহিতা।)

"যে দেশে চতুর্ব্বণ্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।"

এদেশ ত চতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাবিহীন; বিশেষতঃ আপনাদেরই নিত্য কথিত সদা সর্ব্বদা আলোচিত ম্লেচ্ছাধিকৃত ভূমি। এ ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে আপনারা পিতৃ-পিতামহগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিরূপে করিতেছেন ও করাইতেছেন। শাস্ত্রমতে ত এ শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ। ক্রিয়া কলাপ ভিন্ন ও ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত দেশে বাস করিতে শাস্ত্রকারের নিষেধ আজ্ঞা। মনু বলিতেছেন :—

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক জনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ॥৬১

(চতুর্থ অধ্যায়; মনুসংহিতা।)

শূদ্রবশবর্ত্তী রাজ্যে বাস করিবে না; অধার্ম্মিক বহুলদেশে, বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিকর্ত্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না।"

তথাকথিত ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে বাস করা ত দূরের কথা, শূদ্রবশবর্ত্তী দেশে বাস করিতেও মনুর নিষেধ।

রজতখণ্ডের প্রলোভনে অশাস্ত্রীয়—আপনাদেরই কথিত ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত দেশে চির অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কলাপ করাইতে পারেন আর বিদ্যার্থী দেশের কল্যাণকারী প্রবাসী ম্লেচ্ছদেশাগত ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণকে গ্রহণ করিতে পারেন না? তাহাতে শাস্ত্রের নিষেধ! অধর্ম্ম ভয়!! না সেখানে বুঝি দক্ষিণার ব্যবস্থা নাই বলিয়া?

শূদ্রের দান গ্রহণ সম্বন্ধে সমুদয় শাস্ত্রকারগণের একবাক্যে নিষেধ আজ্ঞা। শূদ্রের অন্ন ত রক্তুতুল্য হেয়। অত্রি বলেন—"ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রান্ন রুধিরবৎ অভক্ষ্য" (১) আর তাহা ভোজনে :—* * * নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" (২)

"শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে।" (৩)

"যে দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই দ্বিজের

(১) অনুবাদ—৩৬১। অত্রিসংহিতা।

(২) অনুবাদ—৫৬। প্রথম অধ্যায়; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

(৩) অনুবাদ—১৯ শ্লোক; প্রথম অধ্যায়; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন তাহারই—কেননা, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি।” (১)

এই ত গেল শূদ্রের অন্ন ভোজনের কথা। শূদ্রের চিড়ামুড়ি ভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন ঃ—শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহমৃচ্ছতি। ৪৬। প্রথম অধ্যায় ; ঐ

“ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে।”

অতঃপর হোটেলাদির অন্নভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের মত উদ্ধৃত করিতেছি। “মিলিত জন সমূহের (‘মেছ’, হোটেলাদির) অন্ন * * * ভোজনে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ২১৯। চিকিৎসকের অন্নভোজন পূয সমান, * * * বৃদ্ধি উপজীবির (সুদখোর মহাজনের) অন্ন ভোজন বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহ বিক্রয়ীর অন্ন-ভোজন শ্লেষ্মাভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে।” ২২০। (২)

ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন শূন্য বড় বড় সহরে বা নিঃসম্পর্কিত বিদেশে কার্য্যব্যপদেশে যাতায়াত করেন, কিন্তু হোটেলে বা মেছে খান না, এমন ব্রাহ্মণ সন্তান বাঙ্গালায় কয়জন আছেন? যাঁহারা আছেন তাঁহারা নগণ্য মুষ্টিমেয়। তাঁহাদের দুই চারিজন লইয়া সমাজ নহে। কত উপাধিধারী টোলের অধ্যাপকের কথা জানি যাঁহারা বিদেশে হোটেলাদির অন্ন নির্ব্বিচারে—নিরাপত্তিতে আহার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার সমাজপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সমাজ শাসনে প্রবৃত্ত আছেন। মেছ হোটেলে রসুয়ে ঠাকুরের অন্ন ত দূরের কথা, প্রতিদিন রেলে ষ্টিমারে বাবুর্চ্চির তৈয়ারী অন্ন ব্যঞ্জন কুক্কুট মাংস নির্ম্মিত কালিয়া

(১) অনুবাদ—৪৩ শ্লোক ;।প্রথম অঃ ঐ।

(২) অনুবাদ—৪র্থ অধ্যায় ; মনুসংহিতা।

কোর্ম্মা, চপ্, কট্‌লেট শত শত ব্রাহ্মণ সন্তান মনু রঘুনন্দনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, যথেচ্ছারূপে গলাধঃকরণ করিতেছেন। কলিকাতা ও ঢাকার কত বাবু ব্রাহ্মণগণের কথা জানি যাঁহারা প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মুসলমানের দোকান হইতে কুক্কুট মাংস আনিয়া জিহ্বার তৃপ্তিসাধন ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন! বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় ছাত্রাবাসে বিশেষতঃ কলিকাতা ও ঢাকাতে মুসলমানের পাউরুটি বিস্কুট ত নিত্য নিয়মিত ব্যবহৃত খাদ্য। বড় বড় ছাত্রাবাসের সংবাদ যাঁহারা কিছুমাত্র রাখেন, তাঁহারাই জানেন, রসুয়ে বামন ২।৪।১০ দিনের জন্ত কার্য্যগতিকে অন্যত্র গেলে বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি ছাত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে এবেলা ওবেলা দিনের পর দিন রন্ধনাদির কার্য্য উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া সকলে মহানন্দে একত্র—কোথাও বা একপাত্রে ২।৩ জন ভোজন করিয়া সে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া দেন। কত ব্রাহ্মণের সন্তান ষ্টীমারে কেরাণীগিরি করিয়া মুসলমান বাবুর্চ্চির অন্ন, কত প্রকার হিন্দুর অখাদ্য মাংস প্রতিদিন আহার করিতেছেন, সমাজে তাহাতে কথাটী মাত্র নাই। বরং শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকুরে ছেলে বাটী গেলে পিতামাতার কত সন্তোষ, কত আনন্দ! সহরের অধিকাংশ মিঠাইএর দোকান শূদ্রদের স্থাপিত। তথা হইতে পয়সা দিয়া কত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রতিদিন লুচি, কচুড়ি, আলুরদোম তরকারী ও কত প্রকার ভাজা দ্রব্য কিনিয়া লইয়া আহার করিতেছেন এবং বাসাস্থ পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের জন্য লইয়া যাইতেছেন। যাহার যা অভিরুচি সে তাহাই করিতেছে—তাহাই খাইতেছে; যে ভাবে খুসি সেই ভাবে চলাফেরা করিতেছে। সমাজে সমুদয় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছে—যার যা খুসি কর, খাও দাও মজা লোট—কেবল কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে—নিতান্ত সুশীল, সুবোধ, ভাল মানুষের মত জবাব দিতে হইবে—'না,—আমি ত করি নাই—আমি ত সেই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।' বাস্!—তবেই হইয়া গেল। আর কোন গণ্ডগোল নাই—কোন সামাজিক শাসনের অধিকার নাই। কেবল কোনরূপে কষ্টে স্বষ্টে যো সো করিয়া "না" কথাটি বলিতে পারিলেই হইল! এই ত হতভাগ্য হিন্দুসমাজের সমাজ শাসন!

শূদ্রের চিড়া মুড়ি ত এখন ডাল ভাতের মধ্যে গণ্য। সিদ্ধ অন্নও অবাধে প্রচলিত। অথচ এগুলি শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণের অখাদ্য ও অব্যবহার্য্য! যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিত তাঁহারাও স্নাতা, ধৌতবস্ত্র-পরিহিতা, আচারনিষ্ঠা শূদ্রা বিধবার প্রস্তুত চিড়া প্রভৃতি ব্যবহারে দ্বিধা বোধ করেন না। এজন্য কিন্তু সাত দিন ব্রত করার বিধান আছে। তা থাকিলই বা, তাহাতে কি আইসে যায়? এ হইতেছে ব্রাহ্মণের খাওয়া দাওয়ার কথা, এখানে শাস্ত্রের কথা কেন? খাওয়া দাওয়া, টাকা পয়সা, ভোগ বিলাসের কাছে কি শাস্ত্র? এখানে কে শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া কষ্ট পাইতে যাইবে? শাস্ত্র হইতেছে অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায়, শূদ্র-শাসনের বেলায়,—শাস্ত্র হইতেছে বিচার বিতর্কের বেলায়, শূদ্রদের নিকট হইতে টাকা পয়সা দক্ষিণা লইবার বেলায়! সকলেই সকল করিতেছে, কেবল বাহিরে একটা নীচ আর্য্যামির আবরণ আছে মাত্র! একটা সুন্দর গল্প আছে। একজন গোঁড়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ কার্য্যব্যপদেশে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাত্রা করেন। সারা দিন হাঁটিয়া পথশ্রমে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রয় অভাবে সায়ংকালে অগত্যা এক হিন্দুমুচিবাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সরল-

হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ মুচি পরম ভক্তিভরে তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইল। চাউল, দাইল, তরকারী প্রভৃতি দিয়া পাকের আয়োজন করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন হওয়ায়, বিশেষতঃ মুচিবাড়ী রন্ধন করিয়া আহার করিলে লোকে কি বলিবে, এই আশঙ্কায় রন্ধন করিতে অসম্মত হইলেন এবং জলখাবার কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্থ বহু অনুসন্ধানে দেড় পোয়া পরিমিত পুরাতন চিড়া আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। চিড়া ত বহু কষ্টে পাওয়া গেল, এখন উহা খান্ কি দিয়া? দরিদ্র পল্লী, নিকটে দোকান পসার কিছুই নাই, গৃহেও মিষ্ট দ্রব্যের অভাব। ওদিকে ব্রাহ্মণও ক্ষুধায় আকুল, বিলম্ব সহ্য হয় না। ডাকিয়া বলিলেন—'খুঁজিয়া দেখ আর কিছু পাও কি না।' মুচি তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সাহসে ভর করিয়া করযোড়ে বলিল—'গৃহে কাসুন্দ আছে—প্রভুর আজ্ঞা পাইলে তাহাই দিতে পারি।' ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কি করেন—এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন—'হাঁ নিয়ে এস।'

"লেখা আছে পুথির কোনে।
দোষ নাই কাসুন্দের সনে॥"

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রের প্রতি ত এইরূপ অগাধ বিশ্বাস! এইরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। ভিতরে ঘোর মালিন্য, জঘন্য পুতিগন্ধ, বাহিরে লোক দেখান ধর্ম্মাচরণ।

চিকিৎসকের অন্ন ও কুসীদজীবী মহাজনের অন্ন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ডাক্তার, কবিরাজ ও মহাজনদের কৃপাভিখারী কে নয়? সমাজে ইহাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম। ধনী দরিদ্র, জমিদার মধ্যবিত্ত, মূর্খ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই ইহাদের দ্বারস্থ। ডাক্তার কবিরাজ ও প্রভূত ধনশালী কুসীদজীবী নিমন্ত্রণ করিলে কোন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কয়জন

সমাজপতি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন না? অর্থের ক্ষমতায়, উজ্জ্বল টঙ্ক-ঝঙ্কারের নিকট শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ব্যবস্থা কম্পবান—স্মৃতি সংহিতা কেঁচো প্রায়, মনু রঘুনন্দন করযোড়ে তটস্থ। যেখানে দারিদ্র্য—দৌর্ব্বল্য—অজ্ঞতা—শক্তিহীনতা, সেইখানেই তাহাদের সিংহতুল্য বিক্রম প্রদর্শন! এই ত সমাজের অবস্থা।

তারপর সুরাপানের কথা। শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—"মদ খাওয়া, মহা পাপ, অনন্ত নরক, এমন পাপ আর নাই।" কার্য্যতঃ কিন্তু অন্যরূপ দেখিতাম। অনেককেই তাহাদের মদ্য পানের কথা সগৌরবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—মদ্যপানে যে কত আনন্দ, কত স্ফূর্ত্তি—তাই তাহারা বলিত। তাহাদের কথা শুনিয়া মনে ভাবিতাম, এ বুঝি অশিক্ষিত শূদ্রেরাই খায়, বিদ্বান লোক ও ব্রাহ্মণাদি জাতি বোধ হয় ইহা খায় না। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সহরে পড়িতে গেলাম। সেখানে যাইয়া যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলাম।

যেই দিনই অধিক রাত্রিতে বাহিরে সদর রাস্তায় বাহির হইয়াছি, সেই দিনই মদ্যপায়ীগণের বিকট কোলাহল এবং উচ্চ হাস্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি! কে উহারা জানিবার জন্য যখন আর একটু অগ্রসর হইয়াছি, তখনই কতকগুলি পরিচিত মুখ দেখিয়াছি ও অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছি, ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রতিবাসী এবং আত্মীয়। পদগৌরব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ইঁহাদের কেহ এম-এ, বি-এল, ; কেহ বি-এল, কেহ বি-এ পাস করিয়া স্কুল শিক্ষক। এবং এইরূপ আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তি। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম সহরের প্রায় চৌদ্দ আনাই ইহাদের দলভুক্ত। শুধু কি এইখানেই পর্য্যবসান, ইহার সঙ্গে বারবণিতার সংমিশ্রণ। সহরে সভাসমিতি প্রায়ই হয়, ছোটবেলা হইতে সভাসমিতিতে যাওয়া একটা রোগ, কাজেই যেখানেই সভা হইত সেইখানেই আমি প্রায়

সকলের আগে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। একে একে সভাপতি, বক্তা, প্রবন্ধলেখক ও শ্রোতৃগণ আসিতেন। সভাগৃহ লোকারণ্য হইয়া উঠিত। তারপর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। সে প্রবন্ধে, সে বক্তৃতায় কত যে নীতির কথা, কত যে ধর্ম্মের কথা, কত যে সমাজ-সংস্কারের কথা, কত যে দেশ উদ্ধারের কথা বাহির হইত তাহার সংখ্যা নাই। লোকে ধন্য ধন্য করিত, খুব করতালি ধ্বনি করিত। দেখিয়া শুনিয়া আমিত অবাক্! আমার মনে হইত যাহারা নিজেরা মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন, তাহারা সমাজ সংস্কারের কথা কেমন করিয়া বলে? তাহারা লোক শিক্ষা দিতে চায় কোন্ সাহসে? তাহারা দেশের কথা মুখে আনে কেমন করিয়া? মনে হইত, এ সভাসমিতি নয়, পণ্ডশ্রম মাত্র। হতাশ প্রাণে অবসন্ন মনে বাসায় ফিরিতাম। এইরূপ ভাবে দেখিয়া দেখিয়া এখন অনেকটা অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছি। সে সব পাপ দৃশ্যে এখন আর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে না। কত সহরে বাস করিলাম, সর্ব্বত্রই ঐ এক ভাব, এক দৃশ্য। ভদ্রলোক-দের মধ্যে বার আনা—চৌদ্দ আনাই মাতাল ও ব্যভিচারী। তারপর ক্রমে যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ততই গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিলাম, শুধু উকীল মোক্তার নহে, শুধু শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নহে, এ অমৃতরূপ সদ্য হলাহল-পানে প্রায় সকলেই অভ্যস্থ। জমিদার, তালুকদার, বড় লোক, বিদ্বান লোক এবং এমন কি সমাজপতি বঙ্গ বিখ্যাত গুরুবংশেও এ হলাহল প্রবেশ করিয়াছে; কুলোপুরোহিতগণ পর্য্যন্ত মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিবার নয়, এ কথা শুনিবার নয়। মনে হয় ইহারাই কি পরম পবিত্র আর্য্যবংশের কুল-প্রদীপ? মনে হয় ইহারাই কি ঋষিগণ প্রদর্শিত বিধি ব্যবস্থার একমাত্র নায়ক? হায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ! ভারত মহাসাগর এখনও তোমাকে স্বীয় গভীর গর্ভে গ্রহণ করেন নাই কেন?

শাস্ত্রে সুরাপায়ী মহাপাতকীর মধ্যে পরিগণিত।

উশনঃ সংহিতা বলেন :—

ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।

মহা পাতকিন স্ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১, ৮ম, অঃ।

"ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি রক্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে সে—ইহারা অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী॥

মনু বলেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাপকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫

একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা।

বিষ্ণু সংহিতা বলিতেছেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণ-হরণং গুরুদার-গমনমিতি মহাপাতকানি ॥১॥
তৎ সংযোগশ্চ ॥২॥ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্ ॥৩॥
একযান ভোজনাশনশয়নৈঃ ॥৪॥ যৌন স্রোবমৌথ সম্বন্ধাৎ সদ্য এব ॥৫॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অত্রি বলেন :—

ব্রহ্মহা প্রথমশ্চৈব দ্বিতীয়ং গুরুতল্পগঃ

তৃতীয়স্তু সুরাযোঽয়ং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে।

পাপনাশ্চৈব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ।১৬৪ অত্রি সংহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।

এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥২২৭

তৃতীয় অধ্যায় ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

গৌতম সংহিতা বলেন :—

ব্রহ্মহঃসুরাপ গুরুতল্পগ মাতৃপিতৃযোনিসম্বন্ধস্তেন নাস্তিক নিন্দিত কর্ম্মাভ্যাসি পতিতাত্যাগ্য পতিতত্যাগিনঃ পাতকসংযোজকাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরন্।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠ সংহিতা বলিতেছেন :—

পঞ্চ মহাপাতকান্যাচক্ষতে গুরুতল্পং সুরাপানং ভ্রূণহত্যাং
ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং পতিত-সম্প্রয়োগঞ্চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই ত গেল সুরাপানরূপ মহাপাতকের কথা। এখন উহার প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তের কথাই শ্রবণ করুন—

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুর্ম্মহাপাতকিনস্ত্বিমে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা ॥৬॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ—বিষ্ণু সংহিতা।

"এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ বা পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।"

এক্ষণে জ্ঞানকৃত সুরাপানের কথা বলা যাইতেছে : —

সুরাপস্য ব্রাহ্মণ স্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃশুধ্যেৎ।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়—গৌতম সংহিতা।

"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপ ক্ষয় হয়।"

সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ তদা।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তয়া মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ॥১২
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্‌দ্রবমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাৎ ততঃ॥১৩

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ—উশনঃ সংহিতা।

সুরাম্বুঘৃত গোমূত্রপয়সামগ্নি সন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছ্যতি॥২৫২॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

সর্ব্বশেষে ব্যবস্থাকারের সম্রাট মনুর উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। মনু সুরাপান সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥৯১
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশাকৃদ্রসমেব বা॥৯২

একাদশঃ অধ্যায়ঃ—মনুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপ ক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জলন্ত সুরা পান করিবে; ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়।৯১। অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি॥৯২।"

প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস ভক্ষণ তুল্য আর পাপ নাই, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, শাস্ত্রকারগণ গোমাংস ভক্ষণও সুরাপান অপেক্ষা অল্প পাতকজনক বলিয়াছেন।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্ ॥৯৭॥

জাত্যপহারিণা শতম্ ॥৯৮॥ সুরয়া বধ্যঃ ॥৯৯

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ—বিষ্ণুসংহিতা।

"অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থদণ্ড ; আর সুরাদ্বারা দূষিত করিলে বধ দণ্ড।"

মহাপাতকিগণের পরিচয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথাশাস্ত্র উল্লেখিত হইল। এক্ষণে তদপেক্ষা অল্প পাতকী উপপাতকগণের পরিচয় এবং উহার প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উল্লেখ করিব।

"গোহত্যা, অযাজ্য যাজন, (শূদ্রযাজন) পরস্ত্রীগমন, * * * বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা ; বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন ; বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন ; রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা ; বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা ; ওষধি নষ্ট করা ; জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন ; দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয়—পরন্তু আপনার জন্য পাকানুষ্ঠান ; লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ ; সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা ; নৃত্যগীত বাদিত্রোপ সেবন ; স্ত্রীহত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়" (৬০—৬৭ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়, অনুবাদ মনুসংহিতা)।

উপপাতকীদের সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

গুরুর অলীক-নিন্দা করা, বেদনিন্দা ; অধীত-বেদ-বিস্মরণ, অভোজ্যান্ন ভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্নভোজন), অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি

ণ), পরস্বাপরণ, পরদারগমন, অনুচিত কর্ম্ম (ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈশ্য শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা) অসৎ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় হত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা, গোহত্যা অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয় * * * দ্রুম গুল্ম লতা ও ওষধির বিনাশন, * * * দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়), চার্ব্বাকাদি অসৎ শাস্ত্র চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ * * * এই সকল উপপাতক। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত কিম্বা গোমেধযজ্ঞ করিবে। এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে।" (অনুবাদ—বিষ্ণুসংহিতা, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়)।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ একই কথা বলিতেছেন:—"গোহত্যা * * * সামান্যতঃ চৌর্য্য, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী (ঋতুমতী স্ত্রী) ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্য-ক্ষত্রিয়হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, * * * অপত্য-বিক্রয়, ধান্যহরণ, গবাদি পশু-হরণ, * * * পিতৃব্য-মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা * * * তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যমর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্নপুষ্টতা, চার্ব্বাকাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন * * * এই সকলের প্রত্যেকটীই উপপাতক মধ্যে গণ্য। ২৩৪—২৪২। (অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, বৈশ্যহত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অপরাধ অযাজ্য যাজন (শূদ্রযাজন), সুদ খাওয়া, স্বর্ণখনিতে ও বড় পুলে চাকরি করা,

ক্রমগুল্মলতা ওষধির বিনাশন, জাল দিবার জন্য তাজা গাছ কাটা, দেবতাদির জন্য নহে, পরন্তু নিজের জন্য পাকানুষ্ঠান করা, লবণাদি বিক্রয় করা, শূদ্রসেবা, পেঁয়াজ রসুন খাওয়ার অপরাধ সমান। শাস্ত্রকার না খেপিলে এমন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে মনুসংহিতাদি হইতে মহাপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে উপপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখিত হইতেছে। উপপাতকিগণের বিস্তৃত তালিকা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। গোহত্যা উপপাতকের অন্যতম। শাস্ত্রকার মনু অন্যান্য উপপাতকগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা গোহত্যার সমতুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নে মনুসংহিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "উপপাতকীরা উপপাতক ক্ষয়ের জন্য নিম্নলিখিত এই সকল নানাবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।১০৮। উপপাতক সংযুক্ত গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিবে,—মুণ্ডিত শিরা, ছিন্ন শ্মশ্রু এবং গোচর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ হইয়া গরুর গোষ্ঠে বাস করিবে। ১০৯। দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই দুই মাস একদিন উপবাসানন্তর দ্বিতীয় দিনের স্বায়ংকালে কৃত্রিম লবণ-বর্জ্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে, সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে।১১০। মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভী সকলের অনুগমন করিবে এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ সকল গাভি-সমুত্থিত ধূলি সেবন করিবে। কণ্ডূয়নাদি দ্বারা গো পরিচর্য্যা করিয়া গাভি-দিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রিকালে তথায় বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে।১১১। গো সকল উত্থিত হইলে উত্থিত হইবে,—গমন করিলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে,—উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে,—বীতমৎসর ভাবে নিয়ত তাহাদিগের এইরূপ সেবন করিবে।১১২। ব্যাধিত বা চৌর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, পতিত বা পঙ্কমগ্ন হইলে যথাশক্তি সর্ব্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে।১১৩। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবল

বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া কখন আত্মরক্ষা করিবে না ।১১৪। আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা খলে অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভী শস্য ভক্ষণ করিতেছে, অথবা বৎস দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া, গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না ।১১৫। যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, সে তিন মাসে গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।১১৫। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক আচরিত হইলে একটী বৃষভ এবং দশটী স্ত্রী গবী দক্ষিণা দিবে। যদি উহা না থাকে, তবে যথাসর্ব্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।১১৭। * * * অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ (১) ব্রত করিবে" ।১১৮।

এই ত গেল উপপাতকের কথা। অন্যান্য পাপ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—" * * * অতিশয় দুর্গন্ধ লশুন পুরীষাদি এবং মদ্যের আঘ্রাণ, এই সকলের প্রত্যেকে জাতিভ্রংশকর পাতক।" (২) ইহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মনু বলেন :—

জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতম মিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥১২৫

মনু সংহিতা ; একাদশ অধ্যায়।

(১) "ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্যায় উপবাস দিয়া শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনরায় প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে। ইহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত বলে। চান্দ্রায়ণ এক মাস সাধ্য।" অনুবাদ—২১৭ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা।

(২) অনুবাদ—৬৮ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা। ঐ অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু সংহিতা।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে কৃচ্ছ্র সান্তপন (১) নামক ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।" (২) "গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষের বধ—এ সকলের প্রত্যেককে 'সঙ্করীকরণ পাতক' জানিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্তি হয় ।৬৯। নিন্দিত হইতে ধন প্রতিগ্রহ, বাণিজ্য (কুসীদ জীবন, বিষ্ণু সংহিতা) শূদ্রসেবা ও মিথ্যা কথন— এই সকল পাপে পাত্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্য ইহাদিগকে 'অপাত্রীকরণ পাতক' বলে ।৭০। কৃমি, কীট ও পক্ষীর হনন, ফল কাষ্ঠ ও পুষ্পের চুরি এবং অতি যৎসামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য—এই সকলের প্রত্যেককে 'মলাবহ-পাতক' বলা যায়। ইহাতে চিত্তমল উপস্থিত হয় ।৭১।" (একাদশ অধ্যায় ; মনুসংহিতা—অনুবাদ অংশ)

(১) "প্রত্যহ অভ্যাস্থ গোমূত্র, গোময়, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক প্রভৃতি দ্বারা মহা সান্তপন অর্থাৎ এক একদিন গো-মূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও একদিন (ছয় দিন অতিবাহিত করিবার পর শেষ সপ্ত দিন) উপবাস, এই সাত দিন-সাধ্য ব্রত সান্তপন (কৃচ্ছ্র-সান্তপন)।" অনুবাদ—১৯।২০ শ্লোক ; ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু সংহিতা।

(২) "দ্বিজ প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র আচরণ কালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় ভোজন করিবে ; পর তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে ; তার পর তিন দিন অযাচিত ভাবে যখন উপস্থিত হইবে, তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে ; সুতরাং ঐ ব্রত দ্বাদশ দিন সাধ্য। প্রথম তিন দিন কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ ষড়্‌বিংশতি গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস এবং তৃতীয় দিন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে।" অনুবাদ—মনু সংহিতা ; একাদশ অধ্যায়।

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ॥২১২

ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধিও কথিত হইতেছে :—

সঙ্করাপাত্র কৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।
মলিনী করণীয়েষু তপ্ত স্যাদ্ যাবকৈস্ত্র্যহম্॥১২৬

ঐ

"শঙ্করীকরণ এবং অপাত্রীকরণ পাতক করিয়া একমাস কাল চান্দ্রায়ণ করিবে। এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র যবাগূর ক্কাথ ভোজন করিবে"।১২৬

* * * * *

* * * "হংস, বক বধে ব্রাহ্মণকে একটী গোদান। * * * ছাগ এবং মেষ বধে একটী বৃষ দান করিবে"।১৩৭। * * * আমমাংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশু বধে, পয়স্বিনী ধেনু ও অক্রব্যাদ হরিণাদি পশু বধে বৎসতরী দান করিবে"।১৩৮। * * * যে সকল প্রাণী অন্নাদিতে জন্মায়, গুড়াদি রসে জন্মায় এবং ফলে কিম্বা পুষ্পে জন্মায়—সেই সকল প্রাণিবধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।১৪৪। কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায় এবং যে নীবারাদি বনে আপনা আপনি জন্মায়—উহাদের অকারণ ছেদ করিলে, পাপক্ষয়ার্থ এক দিবস দুগ্ধব্রত হইয়া গরুর অনুগমন করিবে।"

* * * "অভোজ্যদিগের অন্ন ভোজনে; স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণে সপ্ত দিবারাত্র যবের যাউ পান করিয়া থাকিবে"।১৫৩।

* * * "শুষ্ক মাংস ও ভূমিজাত ছত্রাক এবং হরিণমাংস কি গর্দ্দভমাংস—এইরূপ সন্দিগ্ধ মাংস এবং সূনা অর্থাৎ পশুবধ স্থান হইতে আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়"।১৫৬।

"আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিসিদ্ধ ভোজন করা উচিত নহে। প্রমাদ বশতঃ এরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে

কিম্বা তাহা অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মসুর্চ্চলা নামক ওষধির কথিত জল পান করিবে" ।১৬১।

* * * "পতিতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত একযানগমন, একাসনোপবেশন এবং একপঙ্‌ক্তিভোজনরূপ সংযম করিলে পতিত হইতে হয়; যাজন, অধ্যাপন এবং যোনি-সংসর্গে সদ্যই পাতিত্য হয়। পরন্ত এক বৎসরে নহে (কারণ উহাতে সদ্যঃ পাতিত্য) ১৮১। যেরূপ পাপীর সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গ শুদ্ধির জন্য সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিতে হইবে" ।১৮২।

* * * "ব্রাহ্মণ গর্হিত উপায়ে যদি ধন উপার্জ্জন করেন, তবে ঐ ধন দান করিয়া বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।১৯৪। সমাহিত মনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া দুগ্ধ পান করতঃ একমাস কাল গোষ্ঠবাসী হইয়া অসৎ প্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবেন।১৯৫। গোষ্ঠ হইতে পুনরাগত, উপবাস কৃশ প্রণত ঐ ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরা জিজ্ঞাসা করিবেন—সৌম্য! তুমি কি আমাদের সহিত সমান ব্যবহার হইতে চাও'?১৯৬। তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে 'সত্য সত্যই আর আমি অসৎ প্রতিগ্রহ করিব না,' তবে গরুকে ঘাস খাইতে দিবে,—গরুতে যে স্থানে ঘাস খাইবে, সেই তীর্থ স্থানে উহার সহিত 'ব্যবহার করিব' বলিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিবেন" ।১৯৭।

* * * "বেদোক্ত নিত্য কর্ম্মের অকরণে (যাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষরূপে কথিত নাই) এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তও জানিবে" ।২০৪। নিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি পাপ বা তথা কথিত কতকগুলি গুরুতর পাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংহিতাকারগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"চাণ্ডালান্নভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি; যথা, ব্রাহ্মণ—

চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয়—সান্তপন; বৈশ্য—ষড়্‌রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র—ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।” (অত্রিসংহিতা অনুবাদ ১৭২—১৭৩)।

“চণ্ডাল সমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ ঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই।” (উশনঃ সংহিতা—২৬১ পৃষ্ঠা, নবম অধ্যায় ৭২ শ্লোক।)

“শূদ্রান্ন জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রত্রয় করিবে।” (আপস্তম্ব-সংহিতা ১৫—নবম অধ্যায়) “যে ব্রহ্মচারী শূদ্রহস্তে আনীত অন্ন কিম্বা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে।” (৬১ —নবম অধ্যায়, উশনঃ সংহিতা)।

“মূঢ়াত্মা দ্বিজাধম জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্র (১) ব্রত করিবে।” (৫০—নবম অধ্যায়; উশনঃ সংহিতা অনুবাদ।)

“শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস ভক্ষণে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য, মাংস অথবা বরাহ ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস। * * * রোগ বশতঃ মৃত পশু প্রভৃতির মাংস যাহা মাত্র আত্মভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত * * কুক্কুট

(১) “তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুধ পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে; ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র।” “ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং ত্র্যহমুষ্ণং পয়স্ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াদেষ তপ্ত কৃচ্ছ্রঃ ॥১১। ষটচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ বিষ্ণুসংহিতা।

ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পলাণ্ডু বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু বা বেগুন) এবং চণ্ডলীর ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। * * * নরভোজনে তপ্ত-কৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে, অলাবু ভোজনে প্রাজাপত্য করিবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেক পক্ক কৃসর সংযাব (মোহন ভোগ), পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে।"

* * * "যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ-দুগ্ধ, অজা-দুগ্ধ, বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এক পক্ষ গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। এই সকল দুগ্ধ-বিকার দধি ঘৃত ছানা মাখন প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে সাত দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে"। অনুবাদ—উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়।)

বিষ্ণুসংহিতার একপঞ্চাশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই :—

"সুরাপায়ী ব্যক্তি যজন যাজনাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া এক বর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মলমদ্য ও সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ গাঁজর) এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্ বরাহ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গো (এতদন্যতমের) মাংস ভোজনেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। গণ (হোটেলাদির অন্ন) ভোজনে ৭ দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, দাম্ভিক, চিকিৎসা-জীবী, লুব্ধক, ক্রূর, * * * সুবর্ণকার, শক্র, পতিত, পিশুন (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শৌণ্ডিক, তৈলিক, মত্ত,

ক্রুদ্ধ, আতুর ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও ৭ দিন দুগ্ধ আহারে জীবনধারণ করিবে। * * * রোহিত, রাজীব, শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে"। ব্রাহ্মণ শূদ্র আপামর প্রায় সকলেই এখন গো বিক্রয় করিয়া থাকে কিন্তু শাস্ত্রকার গো বিক্রয়ীর জন্য তপ্তকৃচ্ছ ব্রত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারের মতে—বক, হাঁস, চকা, কপোত, মৎস্য, মাংস ও শূকর ভোজন সমান অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত ১২ দিন উপবাস। কপোত ও কুক্কুট ভোজন, সাদা বেগুন ও লাউ ভোজন তুল্যাপরাধ; দণ্ড প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত মোহন ভোগ, পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি তিন রাত্রি উপবাস। পেঁয়াজ, রসুন এবং এতদ্‌গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি বিড়্ বরাহ গ্রাম্য কুক্কুট গোমাংস এবং বধ্যস্থানস্থিত কশাইএর মাংস ভক্ষণ তুল্যাপরাধ, দণ্ড চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হোটেলের অন্ন, ছুতার, চামার, সুদখোর মহাজন, ডাক্তার কবিরাজের অন্ন, সুবর্ণকারের অন্ন, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, তন্তুবায়, রজক, কর্ম্মকার, ব্যাধ, লৌহবিক্রয়ী, শুঁড়ি, তৈলিক প্রভৃতির অন্ন এবং বৃথা মাংস ভোজন—তুল্যাপরাধ। দণ্ড ৭ দিন দুগ্ধ আহারে জীবনধারণ করা। রুই শোল ভিন্ন অন্য সর্ব্ব প্রকার মৎস্য ভোজনে—সকল প্রকার জলজ প্রাণীর মাংস ভক্ষণে তিন দিন উপবাস।

যম বলেন:—সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে।" (১১শ শ্লোক)

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে সদা অনুষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রায় সমুদয় পাপ

কার্য্যগুলির তালিকা ও উহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি উদ্ধৃত হইল। এই মহাপাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ পাতক, অপাত্রীকরণ এবং মলিনীকরণ পাতকগুলির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিত হইল। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজপতিগণ এই সমস্ত পাতকীগণকে শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেছেন কি? তাঁহাদের সে ক্ষমতা আছে কি? এ সমুদয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত চালাইতে গেলে হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কি? হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে বা না করে, আপনারা নিজেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন কি? সমাজে জোর করিয়া ব্যবস্থা চালাইতে চান, জোর জবরদস্তি করিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে মনুসংহিতা-কথিত ধর্ম্মবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি চালাইয়া বাঙ্গলাদেশ ধর্ম্মের মহাবন্যায় ভাসাইতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করি আপনারা নিজেরা কি শাস্ত্রকথিত বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলেন? শাস্ত্র মানিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখেন কি? নিজে না মানিয়া মানাইতে চাহেন, নিজে বিধিমত না চলিয়া অন্যের উপর চালাইতে চাহেন? নিজেরা ধর্ম্ম না করিয়া অন্যকে জোর করিয়া ধার্ম্মিক করিতে চাহেন? ধর্ম্মে তাহা সহিবে কেন? মাথা দিতে পারেন না, মাথা নিতে চাহেন? আদেশ প্রতিপালন করিতে চাহেন না, আদেশ চালাইতে চান? হুকুম তালিম করিতে পারেন না, হুকুম দিতে চাহেন? সেবা করিতে কাতর—নেতা হইতে সাধ? বাঙ্গলা দেশ বলিয়া এত অত্যাচার নীরবে সহ্য হইয়াছে। আর না,—আর আপনাদের জারি জুরি খাটিতেছে না। ইংরাজ রাজত্বে অবাধ বিদ্যা প্রচারে আপনাদের আধিপত্যের এখন মরণ কাল উপস্থিত! এক টুকরা সূতা সম্বল করিয়া গুরুগিরি করিবার সাধ—নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা? আপনাদের বাসনাকে ধন্যবাদ! মনে করিয়াছেন এইভাবেই পূর্ব্বপুরুষগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। ভুল, আপনাদের বড় ভুল। তাঁহারা শুধু পৈতা-সর্ব্বস্ব ছিলেন না।

শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরাক্রম ক্ষত্রিয় রাজগণকে করতলগত করিতে পারেন নাই। পৈতার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম্ম-বল, স্বার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম। আকাশের ন্যায় তাঁহাদের বুকখানা ছিল, সাগরের ন্যায় হৃদয়খানা ছিল—সূর্য্যের ন্যায় জগতের কল্যাণকামী আচণ্ডাল সমদৃষ্টি প্রাণখানা ছিল। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগ মনখানা ছিল। কত ছিল। সসাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা ছিল। সাধে কি ক্ষত্রিয় রাজা ধনবান্ বৈশ্য দাসের মত পদ সেবা করিত—বাধ্য থাকিত।

আর আপনাদের এখন আছে কি? অমন সব দেবপ্রতিম বিশালহৃদয় মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাঁহারা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন? অমন সব ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞ নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাট-গণের এত উন্নতি? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই না ভারতের চতুর্ব্বর্ণের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব? আর আপনারা? আপনাদের কথা আর কি বলিব, যখন আপনাদের ন্যায় পাত্রের গলায় ভারত সমাজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার মালা উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জ্বল ভাস্কর অবনতির কাল অস্তাচলে চিরতরে ডুবিয়া গেল! মালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। যদি কেহ সহানুভূতি বশে ঐ বিচ্ছিন্ন মুক্তাখণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকার-ধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। আপনারা রাখিয়াছেন কি? গুরু পুরোহিত পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া গিয়াছে। আরও কি বাসনা আছে? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল? অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ভগবান্ হরির চরণ-দর্শন-দানের অধিকারী আপনারাই কি বঙ্গের গুরু সম্প্রদায়? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়াছেন কি? নিজে না দেখিলে অন্যকে—শিষ্যকে দেখান কি করিয়া? দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজা গ্রহণ করেন কিরূপে? অধম হইয়া সর্ব্বোত্তম গুরুরূপী নারায়ণের পূজা গ্রহণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—বুক দুর দুর করিয়া উঠে না? অপরাধ স্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্র ভয়ে ভীত হন না? ধন্য আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত মস্তকে কেমন করিয়া পা উঠাইয়া দেন ভাবিতে পারি না।

আর পুরোহিত! পুরের হিতসাধন ত দূরের কথা, আপনাদের দ্বারা অহিতই সাধন হইতেছে। চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে অন্যকেও ডুবাইতেছেন। আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া অবশিষ্টটুকুর লোভ ত্যাগ করুন। এটুকু ডুবাইবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে। দেবতার প্রিয় লীলাস্থল সহস্র সহস্র ঋষির পদব্রজে পবিত্রীকৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরিচয় রামমোহন রায়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু দ্বারা ধরিত্রীর বুধ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন। জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতীয় আর্য্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে।

শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরাক্রম ক্ষত্রিয় রাজগণকে করতলগত করিতে পারেন নাই। পৈতার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম্ম-বল, স্বার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম। আকাশের স্থায় তাঁহাদের বুকখানা ছিল, সাগরের স্থায় হৃদয়খানা ছিল—সূর্য্যের ন্যায় জগতের কল্যাণকামী আচণ্ডাল সমদৃষ্টি প্রাণখানা ছিল। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগ মনখানা ছিল। কত ছিল। সসাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা ছিল। সাধে কি ক্ষত্রিয় রাজা ধনবান্ বৈশ্য দাসের মত পদ সেবা করিত—বাধ্য থাকিত।

আর আপনাদের এখন আছে কি? অমন সব দেবপ্রতিম বিশালহৃদয় মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাঁহারা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন? অমন সব ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞ নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাট-গণের এত উন্নতি? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই না ভারতের চতুর্ব্বর্ণের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব? আর আপনারা? আপনাদের কথা আর কি বলিব, যখন আপনাদের স্থায় পাত্রের গলায় ভারত সমাজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার মালা উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জ্বল ভাস্কর অবনতির কাল অস্তাচলে চিরতরে ডুবিয়া গেল! মালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। যদি কেহ সহানুভূতি বশে ঐ বিচ্ছিন্ন মুক্তাখণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকার-ধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। আপনারা রাখিয়াছেন কি? গুরু পুরোহিত পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া গিয়াছে। আরও কি বাসনা আছে? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল? অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ভগবান্ হরির চরণ-দর্শন-দানের অধিকারী আপনারাই কি বঙ্গের গুরু সম্প্রদায়? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়াছেন কি? নিজে না দেখিলে অন্যকে—শিষ্যকে দেখান কি করিয়া? দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজা গ্রহণ করেন কিরূপে? অধম হইয়া সর্ব্বোত্তম গুরুরূপী নারায়ণের পূজা গ্রহণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—বুক দুর দুর করিয়া উঠে না? অপরাধ স্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্র ভয়ে ভীত হন না? ধন্য আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত মস্তকে কেমন করিয়া পা উঠাইয়া দেন ভাবিতে পারি না।

আর পুরোহিত! পুরের হিতসাধন ত দূরের কথা, আপনাদের দ্বারা অহিতই সাধন হইতেছে। চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে অন্যকেও ডুবাইতেছেন। আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া অবশিষ্টটুকুর লোভ ত্যাগ করুন। এটুকু ডুবাইবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে। দেবতার প্রিয় লীলাস্থল সহস্র সহস্র ঋষির পদব্রজে পবিত্রীকৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরিচয় রামমোহন রায়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু দ্বারা ধরিত্রীর বুধ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন! জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতীয় আর্য্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে।

তাই সে এত অত্যাচার, এত বিপ্লব, এত নিপীড়ন সহ্য করিয়া আজিও জীবিত আছে। বর্ত্তমান কালের সমাজপতিরূপ কুচিকিৎসকগণের কুচিকিৎসায় অনবরত বিষ-প্রয়োগে হিন্দু সমাজ মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছে। মরে নাই, বিষ-ক্রিয়ায় হতচেতন হইয়া আছে মাত্র। বর্ত্তমান যুগের কতকগুলি সুচিকিৎসক উহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আশা জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান যুগাচার্য্যগণের সুচিকিৎসা বাধা বিঘ্ন, অতিক্রম করিয়া বহুদিন নিয়মিতভাবে চলিলে আবার মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজ জাগিবে, উঠিবে, রোগমুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় ভারতগগনে শোভমান হইবে। পুরোহিত,—কি মঙ্গলপ্রদ নাম! শুনিলে কর্ণকুহর শীতল হয়। পুরোহিত কে? "বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ" ব্যক্তিই পুরোহিত। যে সে কি পুরোহিত হইতে পারে? যাকে তাকে কি পুরোহিত নির্ব্বাচন করা উচিত? শাস্ত্রকার পুরোহিত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"বেদেতিহাসধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ।"

৪৯। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ, বিষ্ণুসংহিতা।

বাঙ্গলা দেশে কোটী কোটী হিন্দু সন্তান কি উপরি লিখিত গুণসম্পন্ন পুরোহিত দ্বারা দৈনন্দিন শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? বাঙ্গলায় এমন পুরোহিত কয়টী আছে বলিয়া দিবে কি? কেবল যে শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার কর, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার তোমাদের ক্ষমতা আছে কি? বর্ত্তমান কালের যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহারা পুরোহিত নহেন— পুরোহিত নামের কলঙ্ক। দুই চারি জন ভাল লোক থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিরাট হিন্দু সমাজের কি প্রত্যাশা! এই অযোগ্য শাস্ত্রবিরোধী পুরোহিতগণ দ্বারা কিরূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতে পারে?

শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপ—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন—অশাস্ত্রীয় পুরোহিত দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? পবিত্র গঙ্গাজল গোমাংস সংমিশ্রণে কি অপবিত্র হয় না? তোমাদের শাস্ত্রকারই তাহা অনুমোদন করিতেছেন না। তারপর বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজা, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা। দীন হীন দরিদ্র, অধম, ক্ষুৎক্ষাম, জ্যোতির্হীন চক্ষু শূদ্রকে ভোজন করান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-ভোজনই প্রশস্ত ও পুণ্যজনক বলিয়া তোমরা বিশ্বাস কর। তোমাদের ব্যবস্থাপকগণও তোমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ক্রিয়া অন্তে তোমরা যে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, সে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ত তোমাদের শাস্ত্র অনুমোদন করিতেছেন না।

ব্যবস্থাশাস্ত্রকার-শ্রেষ্ঠ-মনু বলিতেছেন (তৃতীয় অধ্যায়):—

* * * "এই শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, যে যে ব্রাহ্মণকে পরিতোষ করাইতে হয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় এবং যেরূপ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইতে হয় দ্বিজোত্তমগণ! আমি সেই সমুদয় সম্যক্‌রূপে বলিতেছি।১১৪। দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদি পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রসক্ত হইবে না। ১২৫। ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলেও তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল শুদ্ধাশুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্র বিচার,—এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না। এ কারণ ব্রাহ্মণ-বাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়।১২৬। * * * পূজ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃসম্বন্ধীয় হব্য কব্যাদি অন্ন সকল প্রদান করা দাতাগণের উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণে দান করিলে মহাফল জন্মে।১২৮। দ্বিজ, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ইহাতেও তাঁহার পুষ্টতর ফললাভ হইবে; কিন্তু

বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই।১২৯। বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ তাহা নিরূপণ করিবে। এইরূপ বংশপরম্পরাশুদ্ধ, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য বহনে তীর্থ-স্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৩০। বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।১৩১। জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্য কব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখন শুদ্ধ হয় না। অর্থ এই যে, মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইলে পাপ কখন বিদূরিত হয় না।১৩২। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য যে কয়েকটী গ্রাস ভোজন করেন, মৃত হইলে পর পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।১৩৩। দ্বিজগণের মধ্যে বা কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপস্যাপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন—উভয় নিষ্ঠ এবং আর কতকগুলি কর্ম্মনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে কব্য, তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেই যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু দেব সম্বন্ধীয় হব্য সকল যথান্যায় ঐ চারি প্রকার ব্রাহ্মণকেই দেওয়া যাইতে পারে।১৩৪। * * * শ্রাদ্ধ কার্য্যে মিত্রতা নিবন্ধন ভোজন করাইবে না; ধনান্তর বা কারণান্তর দ্বারা মিত্রের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান কর্ত্তব্য।১৩৮। যাঁহার শ্রাদ্ধ অথবা দৈবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ যাঁহার শ্রাদ্ধাদিতে মিত্রগণই ভোজন করেন, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই।১৩৯। যে মনুষ্য মোহ বশতঃ শ্রাদ্ধ কার্য্য দ্বারা মিত্রতা সম্পাদন করিতে যায়,

শ্রাদ্ধমিত্র দ্বিজাধম কখন স্বর্গ-লাভের অধিকারী হয় না।১৪০। দ্বিজগণ কর্তৃক মিত্রতা-সাধন যে গোষ্ঠী ভোজন, উহাকে ঋষিরা পিশাচ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। * * * লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করিয়া বপনকারী যেমন কোন ফল লাভ করে না, তদ্রূপ অবিদ্বান ব্রাহ্মণকে হবি দান করিয়া দাতা কোন ফল পান না।১৪২। পরন্তু বিদ্বান ব্রাহ্মণকে বিধিবৎ দক্ষিণা দান করিলে দাতা ও প্রতিগৃহিতা—উভয়েই ইহ পর—উভয় লোকেই ফলভাগী হন।১৪৩। * * * শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে অথবা সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে কিংবা সমাপ্তাধ্যায় সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।১৪৫। এই তিন ব্রাহ্মণের একজনও যাহার শ্রাদ্ধে অর্চ্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্ত পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তিলাভ হয়।১৪৬। হব্য কব্য প্রদানে পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই মুখ্যকল্প জানিবে। তদভাবে সাধুজনানুষ্ঠিত বক্ষ্যমান অনুকল্প বিধি এই যে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃস্বস্থ পিতৃস্বস্থপুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে।১৪৭-১৪৮। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না। কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন।১৪৯।

"যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, বেদাধ্যয়ন-শূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ এবং বহু যাজনশীল ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ১৫১। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমা-পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত—বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুৎসিত নখ রোগ বিশিষ্ট গুরুর প্রতিকুলাচরণকারী, শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগকারী, কুসীদজীবি, যক্ষ্মারোগী জীবিকার জন্য ছাগ গো প্রভৃতি পশুপালক, * * * পঞ্চ-

মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-রহিত, গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট মঠ বা ধনাদিজীবী—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না।১৫৪। যিনি শূদ্র-শিষ্য, যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর-ভাষী * * * যে ব্রাহ্মণ পিতামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিলিত হইয়াছে—যে স্তুতিবাদ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী, যে পাপ রোগী, যে অপবাদযুক্ত এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে তাহারা হব্য কব্য গ্রহণে উপযুক্ত নয়।১৫৯। যাহার অপস্মার রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেত কুষ্ঠ আছে, যে ব্যক্তি দুর্জ্জন, উন্মত্ত, অন্ধ বা বেদ নিন্দক, নক্ষত্রাদি গণনা দ্বারা যাহার উপজীবিকা, * * * যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি) ইহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।১৬২। যে বাস্তুবিদ্যাজীবী অর্থাৎ জীবিকার জন্য বাটী নির্ম্মাণাদি করে (ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি), যে দৌত্য কর্ম্ম করে, যে বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষ রোপণ করে, যে ব্রাহ্মণ হিংসাবৃত্তি করে, যে শূদ্রসেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে নানাজাতীয় লোকের যাজক, যে ব্রাহ্মণ আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়, যে স্বয়ংকৃত কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ব্যাধির দ্বারা যাহার চরণ স্থূল হইয়াছে এবং সাধুদিগের নিন্দিত, তাহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।১৬৫। * * * এই সকল নিন্দিতাচারী পংক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, দৈব ও পৈত্র্য উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবেন। তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র উপশম হইয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণও তদ্রূপ ; তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ঘৃতাহুতি প্রদান করে না, তদ্রূপ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয়।১৬৮।

দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য প্রদান করিলে, দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি অবশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৬৯। শাস্ত্রাচারবর্জ্জিত, পঙ্‌ক্তিদূষণ প্রভৃতি এবং অপরাপর চৌরাদি দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে হব্য কব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করে।১৭০। * * * শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে যে পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করে, সেই সেই পঙ্‌ক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন।১৭৮। ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হইলেও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, অপক্ক শরাবাদি পাত্রে জল প্রবেশ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকেন। ১৭৯। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূয ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য; দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায়, তাহা নিষ্ফল এবং বৃদ্ধিজীবীকে (সুদখোর) যাহা দেওয়া যায়, তাহা দেবাদি সমীপে স্থান লাভই করিতে পারে না।১৮০। বণিক্-বৃত্তিজীবী * * * দ্বিজকে যে হব্য কব্য দান করা যায়, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন ফল হয় না। উহা ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়।১৮১। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত অসাধু ও অপরাপর অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা মেদ, মাংস, রক্ত, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ।১৮২। আবার যে দ্বিজোত্তমগণ কর্ত্তৃক অপাঙ্‌ক্তেয় তস্করাদি দ্বারা দূষিত পংক্তিও পবিত্র হয়, সেই পংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্রভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৩।

"সমুদায় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।১৮৪। যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রত সহকারে অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি

পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ যিনি ব্রত সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টী বেদাঙ্গে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত এবং যিনি সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন, এই ছয়জন সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ।১৮৫। বেদার্থের বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহু দানশীল, শতবর্ষায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ—ইহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। শ্রাদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্ব দিনে অথবা শ্রাদ্ধ দিনে ন্যূন সংখ্যায় অন্ততঃ তিনটী পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে।১৮৭। * * * নিমন্ত্রিত সেই ব্রাহ্মণ-শরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন; তাঁহারা যথায় গমন করেন, বায়ু-প্রমাণ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা আসীন হইলে পিতৃগণ উপবিষ্ট হন"।১৮৯।

অত্রি বলেন ঃ—"যাহারা অঙ্গহীন, রোগী, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, হিংসক, কপটাচারী, আত্মগোপন পূর্ব্বক বেদাভ্যাসকারী সেবাজীবী, কপিলবর্ণ, কাণ, শ্বিত্ররোগী, শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁকড়া চুল) পাণ্ডুরোগী, বৃথাজটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধস্বভাব, দ্বিভার্য্য এবং বৃষলী-পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্বনাশক) অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন বা অধিকাঙ্গ হইবে, তাহাকেও অপনীত করিবে (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)।৩৩৮—৩৪০। বহুভোজী, মৎসরী ইহাদিগকে পাত্রীয়ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের দুইটী চক্ষু, এক হীন হইলে কাণা, এবং দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহার শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা নাই, সেই অন্ধাধমকে শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না। বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—কেবল বেদদ্বারা নহে—ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন। যিনি যোগজনিত দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ

(সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধি নিষেধ দর্শন করেন, তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ। সর্ব্বদা শ্রুতি স্মৃতিপরায়ণ ব্রতী (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চিরস্বর্গবাসী হন। এবংবিধ ব্রাহ্মণে যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসু-রুদ্রাদিরূপী) পিতা পিতামহ প্রপিতামহ উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্ব্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরকমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। এই জন্য শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিচার করিবে”। (অনুবাদ—ঊনবিংশ সংহিতান্তর্গত অত্রিসংহিতা)

উপরে দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে অপাঙ্‌ক্তেয় অযোগ্য বা পতিত ব্রাহ্মণ-গণের বিস্তৃত তালিকা উদ্ধৃত হইল। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, এইরূপ পতিত ব্রাহ্মণ ভোজন নিষ্ফল হয় ও পিতৃপিতামহগণ নরকে গমন করেন। আমরা ত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রকৃত ব্রাহ্মণ একটীও দেখিতেছি না। প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য, আচরণ, ব্যবহার ও ব্যবসায়াদি দ্বারা পতিত—অপাঙ্‌ক্তেয়। কৈ আপনাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ, কোথায় আপনাদের গুরু পুরোহিত! ইঁহাদের কেহই ত ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা আমার কথা নহে, আপনাদেরই শাস্ত্রের কথা। কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ? যাহা দেখিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলিই ত কেবল নামমাত্র পৈতাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ। বেশী দেখিতে চাই না, আপনাদের মনু যাজ্ঞবল্ক্য যম আপস্তম্ব কথিত, আপনাদের বিষ্ণু অত্রি পরাশর ব্যাস নির্দ্দেশিত, আপনাদের সংবর্ত্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি শঙ্খ, লিখিত দক্ষ, আপনাদের শাতাতপ বশিষ্ঠ উশনঃ অঙ্গিরঃ ব্যবস্থিত একটী, দশকর্ম্মান্বিত একটী পুরোহিত, একটী ব্রাহ্মণের নাম করুন। বেশী নয় একটী, সমগ্র বঙ্গে—সমগ্র ভারতে একটী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের নাম করুন। ব্রাহ্মণ,

কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ, এ বঙ্গে কোথায় ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ নাই। ৪৮ বৎসর, না হউক ২৪ বৎসর, না হউক অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী বেশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এমন ব্রাহ্মণ এদেশে কেহ আছেন কি? তাই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণ নাই। শাস্ত্র আছে ব্যবস্থা আছে, গুরু আছেন পুরোহিত আছেন, আড়ম্বর আছে বাক্য আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। বেদ আছে বেদান্ত আছে, পুরাণ আছে সংহিতা আছে, সাঙ্খ্য আছে পাতঞ্জল আছে, মনু আছে স্মৃতি আছে, ব্রাহ্মণ নাই। ব্রত আছে উপবাস আছে, পূজা আছে অর্চ্চনা আছে, মন্ত্র আছে তন্ত্র আছে, ক্রিয়া আছে কর্ম্ম আছে, ব্রাহ্মণ নাই। উপনয়ন আছে যজ্ঞোপবীত আছে, যোগী আছেন যতি আছেন, ব্রহ্মচারী আছেন সন্ন্যাসী আছেন, ধার্ম্মিক আছেন দিব্যদর্শী আছেন, ব্রাহ্মণ নাই। মঠ আছে আশ্রম আছে, ধর্ম্ম আছে পুণ্য আছে, ব্রাহ্মণ নাই। আপনাদেরই হিন্দুশাস্ত্র, আপনাদেরই মনু—স্মৃতি বলিতেছেন ব্রাহ্মণ নাই। আপনাদেরই শাস্ত্র ব্রাহ্মণের যে সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপনাদেরই ব্যবস্থাকার যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দিয়াছেন—তেমন ব্রাহ্মণ—হিন্দুসমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তেমন ব্রাহ্মণ একটিও নাই, একটিও থাকিতে পারে না। আপনাদেরই দিবারাত্র কথিত ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত ভূমিতে ব্রাহ্মণ থাকিবে কিরূপে? অর্থের লালসায়, ধনের প্রলোভনে আপনাদেরই ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ যদি ব্রাহ্মণেতর জাতির বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিতে পারেন—তথা কথিত শূদ্রগণের দান গ্রহণ করিতে পারেন, মদ্যপায়ী মহাপাতকীর সংসর্গে মহাপাতক অর্জ্জন করিতে পারেন, অর্থের লোভে শূদ্র শিষ্য শূদ্র যজমান রাখিতে পারেন, পুত্রকে শাস্ত্রবিগর্হিত অসৎশাস্ত্র (?) (ইংরেজী প্রভৃতি) অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তবে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে—সমাজ ও জাতির মঙ্গলের

জন্য, দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য—জাতিক্ষয় নিবারণের জন্য সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে জলচল, আহারাদি, সমুদ্রযাত্রা এবং বালিকা বিধবা বিবাহাদি কি চলিতে পারে না? বোঝার উপর শাকের আঁটিটা কি উঠিতে পারে না, বহিতে পারেন না? মহা মহা পাপ যে ক্ষেত্রে অনায়াসে হজম করিতে পারেন সে ক্ষেত্রে কি এই সব সামান্য অপরাধ হজম করিয়া লইতে পারিবেন না? অর্থের কুহকে ভোগবাসনার মোহে পাপ ইন্দ্রিয় সেবায় যদি ধর্ম্মশাস্ত্র পদদলিত হইতে পারে তবে দেশের কল্যাণের জন্য জাতীয় উন্নতির জন্য হিন্দুজাতিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি এক আধটুকু শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে না? অবশ্য পারা যাইবে—অমন শাস্ত্রাদেশ বঙ্গোপসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আমাদিগকে উত্থিত হইতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে ছোঁয়াছোঁয়ীর ব্যাপারের বড়ই বাড়াবাড়ি। অমুকে অমুকের হাতে খাইয়াছে ত উহার জাতি গিয়াছে। কায়স্থ সন্তান কি একটী সৎগোপ সন্তান যদি গুণে প্রকৃত ব্রাহ্মণও হয়—এবং ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তদভাবে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয় এবং যদি সেই ব্রাহ্মণের ছেলে ঐ কায়স্থ বা সৎগোপের অন্ন আহার করেন তবেই ব্রাহ্মণ পুঙ্গবের জাতি নষ্ট হইল। আজকালকার সমাজের কর্ত্তারা তাহার উপর খড়্গহস্ত ও তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত। কিন্তু গুণবিদ্যাহীন, ব্যভিচারী চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ব্রাহ্মণের হস্তে খাইতে কাহারও আপত্তি নাই। এই ত হিন্দুসমাজের অবস্থা। বস্তুতঃ পাপরোগগ্রস্থ চরিত্রহীন অধার্ম্মিক তামসভাবাপন্ন জাতির প্রস্তুত অন্ন সত্যব্রত ধার্ম্মিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতির গ্রাহ্য নহে, তাহাতে স্বাস্থ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু নামে মাত্র ব্রাহ্মণ এমন চরিত্রহীন কুৎসিত কদাচারী ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিতে বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্র কোনই বাধা প্রদান করিতেছে না। শাস্ত্র বাধা না দিলেও যুক্তি উহা সর্ব্বথা পরিহারযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আহারীয় সামগ্রী প্রিয়, প্রাণতৃপ্তিকর,

হৃদ্য, পরিষ্কৃত এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে ব্রাহ্মণতনয়া বা ব্রাহ্মণতনয়ের পাকেও শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, মনের পুষ্টি জন্মিবে না বরং আরও স্বাস্থ্যহানি হইবে। ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত বা পাপী ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যে অসৎগুণবর্দ্ধক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার হইতে পারে। নামে ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মে চণ্ডাল এমন এক ব্যক্তি অন্ন স্পর্শ করিলে ক্ষতি নাই, আর নামে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, কায়স্থ বা গোপ, গুণে ব্রাহ্মণ এমন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন অগ্রাহ্য, ইহা শাস্ত্রের আদেশ কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ-ক্রিয়া মাত্র। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ অযৌক্তিক প্রথার প্রশ্রয় দিবেন ইহা কথনই মনে করিতে পারি না। ইহা পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্থাপনের অন্যতর চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুপথ্য, এমন খাদ্য সচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহা অবশ্য গ্রহণযোগ্য। বংশ গৌরব সেইখানেই গ্রাহ্য যেখানে বংশধর পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষের বংশোচিত গুণসম্পন্ন! নতুবা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে গুণেরই সম্মান ও আদর করিতে হইবে। বংশ গৌরবে সে যতই বড় ও গৌরাবন্বিত হউক না কেন, যাহাকে দেখিলে তাহার হাতের খাদ্য গ্রহণ করিতে অপ্রবৃত্তি অনিচ্ছা বা ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহার প্রদত্ত বা প্রস্তুত খাদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে স্বাস্থ্যহানিই নহে তাহাতে ধর্ম্মহানিও করিবে। যুক্তিসিদ্ধ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অপর মতে খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে তাহা যে মরণ কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বৈদিক যুগে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে যে এরূপ আঁটাআঁটী নিয়ম ছিল না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি যে, এমন শত শত ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মুখে একরূপ মনে অন্য রকম। গোপনে তাঁহারা

যথা ইচ্ছা ভাবে চলিয়া থাকেন—সমাজ তাহা দেখে না, দেখিলেও কিছু বলে না। আমি এমন অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিয়াছি, যাঁহারা প্রকাশ্যে নিম্নজাতীয়া রক্ষিতা নারী রাখিয়াছেন। কেহ বা লজ্জা ও সঙ্কোচের মাথা খাইয়া নিজ বাড়ীতেই পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের দধি ক্ষীর বাতাসা সন্দেশ চিনি প্রভৃতি কোন কোন দিন বা সম্পূর্ণই প্রণয়িনীর ঘরে উঠে, কোন দিন বা উহার অর্দ্ধভাগ পরিমাণ স্বীয় গৃহে আইসে। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"তেমন কিছু ছিল না তবে জলখাবার ও খাবার জন্য যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছিল ভোজনান্তে উহাই যত্ন করিয়া তুলিয়া খোকা খুকিদের জন্য আনিয়াছি।" এই সমস্ত ব্রাহ্মণের কাহারও পেষা গুরুগিরি, কাহারও যাজনিক, কাহারও বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতি। যাজনিকগণকে পদ্মাপূজা কালীপূজা দুর্গাপূজাদি করাইতে এবং মেষাদি উৎসর্গ ও বলি দিতে হয় সুতরাং তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তিমন্ত্রের উপাসক। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন পঞ্চমকার-সাধনে তাঁহারাই অনেকেই তৎপর। গুরু ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, শিষ্যগিরি ব্যবসা, মাঝে মাঝে ভাগবৎ পাঠ করেন—মুখে ধর্ম্ম কথার বিরাম নাই, মোটা মালা গলায়, হাতে হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক চন্দনের হরিনামাঙ্কিত ছাপ, শিষ্য ও শিষ্যাগণকে মধুর রস ব্যাখ্যা করিয়া শুনান—পদকীর্ত্তনে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যান। অথচ অন্তরে পাপ পরিপূর্ণ, ছাগ-প্রবৃত্তি, ভয়ঙ্কর ব্যভিচারী। নিজে নিম্নজাতীয়া রমণী বা কোথাও শিষ্যা লইয়া ব্যভিচারে প্রমত্ত—পাপ সমুদ্রে নিমজ্জিত, গোপনে অস্পর্শীয়া পাপিষ্ঠার প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত, নারকী লীলার অভিনেতা অথচ বাহিরে তিনিই—অমুকে ত্রিরাত্রি অশৌচের স্থানে দুই রাত্রি অশৌচ পালন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিতেছেন, অমুকের মৃত শিশু পুত্রকে পুতিয়া ফেলার পরিবর্ত্তে দাহ করিয়াছে জন্য

দাহকারীগণকে দণ্ডার্হ করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন। শুনিয়াছি অমুকে যবনের সংস্পর্শ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকে যবনান্ন গ্রহণ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকের পিতার অমুক সাম্বৎসরিক সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বাদ গিয়াছে, সুতরাং এই সব অহিন্দু ব্যবহারে ও গুরুতর অপরাধে আমি ইহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলাম। অমুকে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়াছে—তা যাউক, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অমুককে সমাজচ্যুত করা গেল। গ্রামের সকলে বলিতেছে, অমুক মাঝি হিন্দুর অখাদ্য ঘেড়ে মাছ খাইয়াছে সুতরাং সে পতিত হইল—৮৷১০ টাকা ব্যয় করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে তবে উহাকে তোলা যাইতে পারে, ইত্যাদি। একজন লোক মারা গেল—স্বজাতীয়গণ শবদাহ করিয়া আসিল, ইতিমধ্যে একজন শত্রু প্রতিবাসী আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিল—ঐ মৃত ব্যক্তির পায়ে এক খানা খারাপ ঘা ছিল! আর যাইবে কোথায়, অমনি শববাহক, দাহকারী কাষ্ঠবহনকারী প্রত্যেকের এক একখানি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা দরিদ্র, শ্রাদ্ধই হয় না—তার উপর আবার এতগুলি লোকের প্রায়শ্চিত্তের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কেবল কি এইখানেই শেষ, এইরূপ শত শত বিবরণ লেখা যাইতে পারে। ব্যারাম পীড়া নাই, হিন্দু গৃহস্থ সন্ধ্যাবেলা গোয়ালে গরু তুলিয়াছেন, পরদিন প্রভাতে দেখা গেল গরু মরিয়া আছে। আর কি, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের অর্থাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পাঁতির টাকা পড়িয়া গেল। এমনও জানি ৪৷৫ বৎসরের শিশু, নবনীত-কোমল হাত দিয়া সন্ধ্যাবেলা ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্যশূন্য মনে ঢিল ছুড়িতেছে, ঘটনাক্রমে উহার একখণ্ড নিকটবর্ত্তী একটী বৎসের গাত্র স্পর্শ করিল কিন্তু উহাতে বৎসের কি হইবে? যথাকালে গৃহস্থ অন্যান্য গরুর সহিত বৎসটীকেও

ঘরে তুলিল। পরদিন দেখা গেল, বৎসটী মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে। পাড়ায় সোর গোল পড়িয়া গেল—বৈকাল বেলা ছেলেকে ঢিল ছুড়িতে কে নাকি দেখিয়াছিল, কথা ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়িল ও অবশেষে পণ্ডিত ঠাকুরের কাণে এই কথা গেল। আর কথা কি, অমনি একজন লোক পাঠাইয়া ছেলের পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলা হইল, তোমার ছেলেই গো-হত্যাকারী। সে শিশু সুতরাং তোমাকে এজন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইতেছে। আর কত লিখিব, আপনাদের এই সব পণ্ডিত ও সমাজ-পতিগণের ব্যবহারের কথা লিখিতে বসিলে একখানা স্বতন্ত্র দীর্ঘ পুস্তক হইয়া পড়ে। হায়! বঙ্গের সমাজপতিগণ! আপনারাই আবার পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, বিধি-ব্যবস্থা-দাতা! "নিজের বেলা লীলা খেলা, দোষ লিখেছেন শূদ্রের বেলা,"—আপনারা নিজেরা নরক সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছেন, কিন্তু শূদ্রদের মস্তকের উপর যত বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্র-তন্ত্রের গুরুভার চাপাইয়া উহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন, উহাদিগকে মাথা তুলিবার সুযোগ দিতেছেন না, হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিতেছেন না। কপটতার এই সব মহা মহা পাপের জন্য আজ তাকাইয়া দেখুন—ব্রাহ্মণ জাতির কি শোচনীয় পরিণাম। ঋষির বংশধর আজ গাড়োয়ান মুটে মজুর (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচুর দেখা যায়) দারোয়ান—আদালতের পেয়াদা। এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে ঘূর্ণ্যমান! এ দৃশ্য—এই শোচনীয় অবস্থা দেখিবার নহে, লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

আপনারা ভিতরে ভিতরে যা তা পাপের অভিনয় করিতেছেন আর মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া সমাজের শীর্ষস্থান সমাজপতির পবিত্র আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শূদ্রদের দণ্ডমুণ্ড বিধান করিতেছেন। বাহিরে কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি যথাযথ পালন করিতেছেন, কিন্তু হায়! জানেন নাকি বাহিরের রীতিনীতিই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট?

হইয়াছি। এই সত্য ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা রসাতলে যাইতে বসিয়াছি, অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। যেখানে আমি আমার নিজ ইচ্ছামত সত্যের অপলাপ করিতেছি সেখানেও অন্যের কিছু বলিবার অধিকার নাই। কেননা বাহ্যিক নিয়ম রক্ষার কোনই ক্রটী পরিলক্ষিত হইতেছে না। এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটা অন্যায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা মনে করি "না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব"। প্রায়শ্চিত্তেই সব শেষ হইয়া যায়, এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এই ধারণা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়মের উপর আমাদের আদৌ আস্থা নাই। তবে লোকাচার ও সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে সে কথা বলিতে পারিতেছি না। আমি যাহা করি—তুমি তাহা জান, এবং তুমি যাহা কর আমি তাহা জানি, এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজেরও সকলে জানে। আমার কথাও তুমি বল না—তোমার কথাও আমি বলি না এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজ জানিলেও কিছু বলে না। চোরে চোরে মাসতুত ভাই সাজিয়া আমরা পরস্পরের দোষ পরস্পরে ঢাকিয়া লইয়াছি। এইরূপ ভাবে দীর্ঘকালগত আমাদের ব্যষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ও পাপ তিল তিল করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল পর্ব্বতাকার ধারণকরতঃ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট সমষ্টির উপর চাপিয়া পড়িয়াছে। সে চাপনে সমাজ-শরীর বিকল অচল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সোজাভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, নড়ন চড়নের শক্তি নাই,—সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

এই কথায় কথায় প্রায়শ্চিত্ত করা সম্বন্ধে মাননীয় এন্, জি, চন্দ্রভারকর মহোদয় মান্দ্রাজে সমাজ-সংস্কার সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"I have heard many say—'I shall violate a caste-rule and then take *Prayaschitta*". I do not think that

those of us who are sincerely anxious for the welfare and progress of Hindu society—who think that morality is a greater cementing bond of society than anything else—ought to be practised to a theory which teaches men that they have a license to sin freely, for every time they sin they can do penance and pass for sinless men. And a *Prayaschitta* has already become licentious, so to say, for many a sin and many a flagrant departure from the path of Virtue."

এই ত প্রায়শ্চিত্তের অবস্থা। আবার সেই প্রায়শ্চিত্তেরই বা কত রকমারি ভাব। দোষী ব্যক্তি যদি মস্তক মুণ্ডন করে, পূর্ব্বদিন নির্জ্জলা উপবাসী থাকে ত কথিত কয়েক কাহন দণ্ডার্হ হইবে। আর যদি সে একটু বাবুগোছের হয় ও মস্তক মুণ্ডন করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক কাহনের দ্বিগুণ ব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দোষী ব্যক্তি যদি আরও উচ্চতর ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়, তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাহনের চতুর্গুণ কাহন ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু চতুর্গুণ কাহন ব্যয় করার জন্য তাঁহাকে আর মাথা মুণ্ডন করিতেও হইবে না—উপবাসীও থাকিতে হইবে না। তার পরিবর্ত্তে তার একজন প্রতিনিধি কর্ম্মচারীকে উপবাসী থাকিতে হইবে এবং মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে অর্থাৎ টাকার উপরই প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্ভর করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই কি সত্য? টাকা কি কখন পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে সমর্থ? এরূপ হইলে ত রাজা মহারাজা ও জমিদারগণই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্পাপ! শ্যামকুমার রায় চৌধুরী যেন জমিদার, গরুর মাথায় আঘাত করিয়া একটী গোহত্যা করিয়াছেন, তাঁহার প্রচুর টাকা। রামকুমার দে তাঁহার একজন

বেতনভোগী সামান্য কর্ম্মচারী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় ব্যবস্থা করিলেন—এই সজ্ঞানকৃত গোহত্যারূপ মহাপাপের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও উহাতে ২৫৲ টাকা আন্দাজ ব্যয় করিতে হইবে এবং ইহাতে শ্যামকুমার বাবুকে ২৫৲ টাকা ব্যয়, মাথা মুণ্ডন করিতে এবং উপবাসী থাকিতে হইবে! শ্যামকুমার বাবু বড়লোক—জমিদার, তিনি কি মাথা মুণ্ডন করিতে পারেন? লোকে দেখিয়া বলিবে কি? আর উপবাস! তাঁর কি আর উপবাস করিবার শক্তি আছে? যে অম্লপিত্তের পীড়া, সকালে স্নান করিয়া চারিটী আহার না করিলেই অম্ল উঠে। কাজেই স্থির হইল কর্ম্মচারী রামকুমারই মাথা মুণ্ডন করিবে এবং উপবাসী থাকিবে তবে সেজন্য বাবুর কিছু বেশী টাকা (১০০৲) ব্যয় করিতে হইবে। ২৫৲ দণ্ড কিন্তু মাথা মুণ্ডন না করার জন্য দ্বিগুণ দণ্ড ৫০৲ লাগিল, এবং উপবাস না করার জন্য চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ মোট ১০০৲ লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রামকুমার উপবাসী রহিল, ক্ষৌরকার আসিয়া মাথা মুণ্ডন করিয়া দিয়া গেল—পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আসিলেন। ওদিকে বাবু সকালে চারিটী আহার করিয়া দিব্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিলেন। অপরাধ করিল একজন, মাথা মুণ্ডন ও উপবাস করিয়া মরিল আর একজন—এবং ইহাতেই বাবু গোহত্যা জনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন! বলিহারি হিন্দুসমাজের এবম্বিধ ব্যবস্থা দান করাকে? এ দেখিতেছি "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ" এর মত অদ্ভুত ঘটনা। একটী ছোট শিশুকে গুরু মহাশয় বলিয়াছিলেন সর্ব্ব প্রাণীকে যে আপনার মত দেখে সেই পণ্ডিত। মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীর দিন পিতা বলিলেন, "খোকা যাও স্নান ক'রে এস, সরস্বতীর পদে অঞ্জলি দিতে হবে"। খোকা পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে গেল, মাঘ মাস দারুণ শীত, জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে;

অদূরে ঐ খোকাদের বাটীর একটী বাগ্দি বালক চাকর কি করিতেছিল, ঐ বাগ্দি বালককে দেখা মাত্র খোকার গুরুমহাশয়ের শ্লোক মনে পড়িয়া গেল,—তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া সে তাহাকে টানিয়া আনিয়া পুকুরে চুবাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া দেবী-মণ্ডপের দ্বারের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল—'ইহারই হাতে ফুল বেলপাতা দিন এবং মন্ত্র পড়ান—এ অঞ্জলি দিলেই আমার অঞ্জলি দেওয়া হইবে, পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সেদিন উপদেশ দিয়েছিলেন 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ'।

বাঙ্গলার প্রায়শ্চিত্ত সমস্যাও কি বঙ্কিমবাবুর এই রহস্যময় গল্পের ন্যায় কৌতুকজনক ও হাস্যোদ্দীপক নহে? তবে এই যে ব্যাপার ইহার মূলে স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। কোনরূপে একটী প্রায়শ্চিত্তের যোগাড় করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণের বেশ দুপয়সা লাভ আছে। তাম্র মূল্যের সমান অর্থ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত এবং অগ্রদানী পৃথক পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ কথিত পরিমাণ তাম্রের মূল্য ১৲ হইলে পণ্ডিত, পুরোহিত ও অগ্রদানী প্রত্যেকে ১৲ পাইবেন। কাজেই যত টাকা বাড়িবে এ তিনজনের ততই সুবিধা। এই জন্যই শূদ্রের উপর প্রায়শ্চিত্ত দানের এত ঝোঁক ও আগ্রহ। হায় স্বার্থপর সমাজপতিগণ! নিরক্ষর সরলপ্রাণ শূদ্রগণের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ কি এমনি করিয়া ধর্ম্মের নামে—শাস্ত্রের নামে শোষণ করিতে হয়?

সমাজপতিগণ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি জাতীয় অর্ণবপোতের তলদেশে যে সব বড় বড় ছিদ্র রহিয়াছে উহা বন্ধ না করিয়া আপনারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র লইয়া অত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন,—না, সাহসে কুলায় না বুঝি? খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু বড় বড় দোষগুলি চোখে দেখিতে পান না। রাজ রাজরা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদার

তালুকদার এবং উকীলের মুহুরী ও সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কয়জন আপনাদের রঘুনন্দন মানিয়া চলেন? জানেন না কি শতকরা কতজন লোক মদ্যপায়ী ব্যভিচারী। চিকিৎসক ত সুরাবিক্রেতা ও মাংসবিক্রেতা কসাইর ন্যায় পাপভাগী, তারপর যাহারা প্রকাশ্য ভাবে অর্থ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দান করেন, সুদ লইয়া টাকা ধার দেন, যাহারা রক্ষিতা রমণী রাখেন ইহাদের সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন। ব্রাহ্মণগণের ত ম্লেচ্ছ (?) রাজ্যে বাস করার কথা নাই, শূদ্রের দান গ্রহণ করার বিধি নাই; দাসত্ব করা ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ। দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব যে স্বীকার করিতে চাহেন না, জিজ্ঞাসা করি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের চলিবার উপায় কি? এই সব গুরুতর পাতক সম্বন্ধে ত কৈ একটি কথাও শুনিতে পাই না। এই সব অপরাধের জন্য কৈ কাহাকেও ত কোনদিন প্রায়শ্চিত্ত করাইতে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিলাম না। কলিকাতা মহানগরীতে এমন শত শত হিন্দু আছেন, যাহারা প্রতিদিন ইংরাজদিগের হোটেলে হিন্দুর অস্পর্শীয় অভক্ষ্য খাদ্যদ্রব্য সকল আহার করিতেছেন। অথচ সমাজে তাহাতে উচ্চবাচ্য নাই, শুধু তাহাই নহে—ইঁহারাই আবার অনেক স্থলে সমাজপতি ও দলপতি বলিয়া পরিচিত। শুধু কি ইহাই, আমরা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি, অমুক সাহেব বাড়ীতে অমুক তারিখে বিরাট ভোজ হইয়া গেল, উহাতে সমাজের কত গণ্যমান্য ব্যক্তি আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, বিলাতি খানায় মুখরুচি সম্পাদন করিয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। ইঁহাদের বাটীতে নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া কাণ্ড নির্ব্বাহ হইতেছে, নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিতেছেন, খাইতেছেন, বিদায় পাইতেছেন, একটুও উচ্চবাচ্য নাই। ইঁহাদের কি জাতি যাইতে পারে না? না, সেখানে রৌপ্যমুদ্রার চাকচিক্য অধিক। আর শাসনই বা করিবে কে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত বিষবৃক্ষের

নগেন্দ্র দত্তের ন্যায় রাজা মহারাজা ও জমিদারগণের হস্তের ক্রীড়ণক মাত্র। তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তি বিদায় প্রভৃতিই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবিকার প্রধান উপায়। হায় হিন্দু সমাজ ! হায় রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত !!

সমাজ শরীরের বড় বড় ব্যাধির দিকে আপনাদের আদৌ দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি শুধু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে। প্রথমতঃ 'Oil your own machine' নিজের চরকায় তৈল দিন, পরে অন্যের ভাবনা ভাবিবেন। পূর্ব্বে নিজেদের ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার করুন, তারপর অন্যান্য সমাজের উপর আধিপত্য করিতে অগ্রসর হইবেন। শাস্ত্রের কঠিন বিধি কি শুধু নিরীহ শূদ্রদের জন্য ? নিজেদের জন্য নহে ? নিজেরা শাস্ত্র মানিবেন না, ব্যবস্থা মানিবেন না কিন্তু অন্যকে মানাইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিবেন। এ যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু অত্যাচারিগণ, আপনারা কি জানেন না অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্য উপরে একজন আছেন। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সহস্র বৎসরের মহা শিক্ষাতেও কি এ জ্ঞান হয় নাই ? আপনাদের অত্যাচারী পূর্ব্বপুরুষগণের মহাপাপের ফলই যে আপনাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ তাহা কি আজও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ?

"সর্ব্ব শাস্ত্রে পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনং ধ্রুবং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্" ॥

এইটী তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। পাপ বিনা সাজা মিলে কি ? আপনারা কি বলিতে চাহেন হিন্দুরা চিরকালই ধার্ম্মিক—চিরকালই ন্যায়-পথবর্ত্তী, কিন্তু ভগবান্ অন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে এই কঠোর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দুঃখ দিতেছেন ? তাঁহার ন্যায়-তৌলদণ্ড সম্বন্ধে অন্যায় দোষারোপ করিবেন না। যতদিন হিন্দুজাতির মধ্যে ন্যায়, সত্যপরায়ণতা, ধর্ম্ম, দয়া প্রভৃতি গুণ ছিল, যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পর গাঢ়

প্রীতি প্রণয় ছিল, যতদিন চারি শ্রেণীর মধ্যে অখণ্ড ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ ছিল—যতদিন প্রাণী মাত্রকে হিন্দুগণ নিজ স্বরূপের প্রতিবিম্ব স্বরূপ অবলোকন করিতেন—ততদিন হিন্দুর সিংহাসন জগতের সর্ব্বোপরি স্থানে সমাসীন ছিল—কিন্তু তার পর—আহা তার পর যখন ন্যায় তুলাদণ্ডের অসত্যের দিক্ কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িল—অমনি ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি ভগবান্ ভারতবর্ষকে দুঃখ শোক ও পরাধীনতার ঘনাবর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন।

হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণাবলে যখন স্বার্থপর পশুবলদৃপ্ত স্নেহমমতাহীন হিন্দুরাজগণ অত্যাচারে নিরীহ প্রজাকুলকে জর্জ্জরিত ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিল, অমনি শ্রীভগবানের ন্যায়ের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, অত্যাচারের মধ্য হইতে ভগবানের বরাভয় হস্ত উত্তোলিত হইল, ভগবান্ মুসলমানের হাত ধরিয়া ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; ব্রাহ্মণের গর্ব্ব পূর্ব্বেই খর্ব্ব হইয়াছিল এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব যাহা কিছু ছিল, সেটুকুও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে ভারতবক্ষে মুসলমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। ভগবান্ অনেক সহ্য করেন, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যাচার যখন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে, যখন মানবপুঞ্জ কেবল কোথায় ভগবান্, কোথায় ভগবান্ বলিয়া কাতর ক্রন্দনে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, অমনি মাভৈঃ বাণীতে ভূমণ্ডল কাঁপাইয়া তিনি স্বয়ং মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ হন। অত্যাচারীগণের হৃদয়-রক্তে ধরাতল অভিসিক্ত, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় গগনে আবার শান্তির বিমল চন্দ্রমা উদিত এবং ধরা আবার সুশীতল হয়।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সামাজিক অত্যাচার যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে এবং সেই ভীষণ অত্যাচারে নিরীহ নরনারীর প্রাণ যখন পিষিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন সেই দারুণ অবস্থার মধ্য হইতেই উহার প্রতিকার পথ বাহির হইয়া পড়ে। শেষে পদদলিত নিষ্পীড়িত

জনগণের প্রতিহিংসা বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব উপস্থাপিত হয়। এইরূপ সময়ে প্রায়শঃই দেখা যায় এক একজন অসীম প্রতিভাশালী মহাত্মার আবির্ভাব হয়। লক্ষ লক্ষ লোকে যে বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছিল, তাহা ইঁহারা দর্শন করেন, সহস্র সহস্র মানব হৃদয়ে যে ক্রোধবহ্নি ধূমায়মান হইতেছিল তাহা ইঁহাদের হৃদয়ে ভয়ানক দাবাগ্নির আকার ধারণ করে, শত শত অন্তঃকরণে যে কামনা জাগিতেছিল তাহা ইঁহাদের প্রাণে পুঞ্জীভূত হয়। ইঁহারা নিপীড়িত পদদলিত বুভুক্ষিত নিগৃহীত প্রকৃতিপুঞ্জের নেতৃস্বরূপ হইয়া সিংহ গর্জ্জনে জগৎকে কম্পিত করিয়া আবির্ভূত হয়েন, জগতের সমুদয় শক্তিপুঞ্জকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দেন এবং বজ্রদৃঢ় করে অত্যাচারীর পাপ-সিংহাসন এক আছাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন। ইঁহারা মানবকুলে বীর সদৃশ। রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইউরোপের বীরবর মার্টিন লুথারের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ফরাসী বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। ধনশালীগণের অত্যাচার যখন নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল; এক পক্ষে ফ্রান্সের দীন দরিদ্র প্রকৃতিপুঞ্জ সামান্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, অপর পক্ষে ধনীগণ নিজেদের অট্টালিকায় বিলাসিনী প্রণয়িনী-গণের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছেন, এক পক্ষে প্রজাকুল ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও অনশন যন্ত্রণায় পথে ঘাটে ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অপর পক্ষে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ধনিগণ তাঁহাদের দুঃখ দৈন্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া বরং অবজ্ঞা-সূচক ভাষায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন। এই ভীষণ বৈষম্য ভাব, এই ঘোর দুঃখ দুর্দ্দশা, এই ভয়ানক সামাজিক

অত্যাচার যখন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল তখন আকাশ-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধরিত্রী বিকম্পিত হইয়া ভগবদ্বাণী প্রচারিত হইল "অভ্যুত্থান কর, অভ্যুত্থান কর"। ঠিক এইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী আর্য্য সমাজে ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতাপে নিম্নজাতি সকল যখন নির্য্যাতিত হইতে লাগিল, রাজাদের শক্তি পর্য্যন্ত যখন নামমাত্র অবশেষ রহিল, আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার দাসত্বে যখন সাধারণ প্রজাবৃন্দের মনুষ্যত্ব গতপ্রায় হইল, অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ যখন পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল—তখন ঈশ্বর বজ্রনাদে আদেশ করিলেন "উত্থান কর"; অমনি রাজপুত্র প্রেমাবতার শাক্যসিংহ সত্যের বিমল উজ্জ্বল আলোক হস্তে ধারণ করিয়া ভারতের ঘনান্ধকার মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে আসিল বলিয়া ভারতময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিদ্ধার্থ একদিকে রাজৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিলেন, অন্য দিকে ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। তিনি সকলকে প্রেমের আহ্বানে ডাকিয়া বলিলেন, "হে পদদলিত নিপীড়িত জাতি সকল, আমার নিকট আগমন কর। আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিতেছি। আমার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, ইহার নিম্নদেশে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ রমণী, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলে সমভাবে বাস করিবে"। এই মহাবাণী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র বৎসরের গুরুভার যেন মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল। প্রজাবৃন্দের দগ্ধ মরুতুল্য হতাশ প্রাণে আশার অমৃতধারা সিঞ্চিত হইল। মহাপ্রাণ লুথারের অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেমন চারিদিকে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধের আগমনে ভারতবর্ষেও সেই দশা ঘটিল। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদের পন্থা খুলিয়া দিলেন। সেই হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীন চিন্তার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ঐ সঙ্গে ভারত

সমাজ বহুবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। তার পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের দিবস হইতে নিম্নজাতীয় লোকদিগের উন্নতির সূচনা আরম্ভ হইল। দলে দলে নিম্নশ্রেণীর লোক সকল মহামতি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে শ্রমণ শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এই স্থানে জাতিভেদের মূলে প্রথম আঘাত পড়িল।

জাতিভেদের উপর দ্বিতীয় আঘাত করিলেন মুসলমান রাজারা। ইঁহারা জাতিভেদ ও পুতুল পূজার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন—'আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র বুঝি না, যে আমাদিগের কার্য্য করিবে আমরা তাহাকেই পুরস্কৃত করিব। ব্রাহ্মণগণ বংশমর্য্যাদায় গর্ব্বিত হইয়া এই সব যবন রাজাদিগের অনেক তফাতে রহিলেন, ওদিকে দলে দলে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এবং নিম্নজাতীয় হিন্দুসন্তানগণ অগ্রসর হইয়া রাজসরকারে প্রবিষ্ট হইতে ও কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য মুসলমান বাদসাহগণের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে এই হইল যে মুসলমান সহবাসে আসিয়া, তাঁহাদের রাজনীতি চাল চলন দেখিয়া শুনিয়া এবং মুসলমানি সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া, অনবরত পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া শুনিয়া এই সকল হিন্দু কর্ম্মচারীগণের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া গেল, ব্রাহ্মণেতর জাতির হৃদয় হইতে "ব্রাহ্মণে দেবতা জ্ঞান" ভাব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কেবল ইহাই নহে, মুসলমান আগমনের পর কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের হস্তে প্রচুর ধন সঞ্চয় হইতে লাগিল। ইঁহারা মুসলমান বাদসাহগণের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া জমিদারী লাভ করিতে লাগিলেন। একদিকে এই সমস্ত শূদ্রগণের পদমর্য্যাদা, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা হইতে লাগিলেন, অপর দিকে পারশ্য ভাষার বহুল প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় এবং হিন্দুরাজগণের প্রতাপ খর্ব্ব হওয়ায় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাভাবে

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণগণ মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অর্থসম্পদে সাধারণতই দরিদ্র, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতীয় কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি ধনিগণের বিদায়প্রার্থী ও ভাগ্যোপজীবী হইতে বাধ্য হইলেন। কাজেই তখন তাঁহারা সাধারণকে পরিতুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"The Brahmins lost the patronage of enlightened Hindu kings, and became more dependent than ever for their living on the gifts of the lower castes .... they had now to please the mob more than ever."

(*Hindu Civilisation under British Rule.*)

ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আস্তে আস্তে হিন্দুদিগের শাস্ত্রসমূহ অত্যন্ত জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে বিদ্যাচর্চ্চা এবং শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী হইতে লাগিলেন। কেবল শাস্ত্র কথিত কতিপয় ক্রিয়াকর্ম্মবিধিই তাঁহাদের শিক্ষনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতেই অনেক ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি বেদের জ্ঞান কাণ্ড এবং দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় জলাঞ্জলি দিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিই একমাত্র জীবিকোপযোগী করিয়া লইলেন।

এইরূপে হে বঙ্গের সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের দশা মলিন হইয়া আসিল। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রগণকে যে ঘৃণা করিয়া বেদবিদ্যার অধিকারলাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—ইহা তাহারই বিষময় ফল। মানুষ হইয়া মানুষকে যদি অমন করিয়া ঘৃণা না করিতেন তবে কি এই ভারতবর্ষ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইত? দেশের বার আনাই বৈশ্য শূদ্র, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাদানে বঞ্চিত রাখাই ত এ অনর্থ সৃষ্টির একমাত্র মূল! যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাদিগকে নানা বিষয়ে

শিক্ষাদান করিতেন—ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, যদি তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক আক্রমণের সময় তাহারা (বৈশ্য শূদ্রেরা) কি কখন দূরে নিশ্চেষ্টমনে দাঁড়াইয়া থাকিত ? তাহারা কি ক্ষত্রিয় ভাইদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বুকের রক্ত দিতে পরাঙ্মুখ হইত ? তাহারা কি নিশ্চল নিথর নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিদেশীর দাসত্বপাশ গলে তুলিয়া লইত ? তাই বলিতেছিলাম, আপনাদের দোষেই ভারতের যা কিছু সর্ব্বনাশ সব সাধিত হইয়াছে।

ভগবান্ বুদ্ধ আসিয়া পথভ্রান্ত তোমরা, তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন, অমানিশার অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিব্য চাঁদের জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। "কিন্তু উল্‌টা সমঝিলি রাম" ; তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরেই তোমরা কোথায় তাঁর পথানুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা না করিয়া কি না আরও প্রচার করিতে লাগিলে - ও পাষণ্ড নাস্তিক ধর্ম্মধ্বংসী, বেদ লুপ্ত করিতে উহার উৎপত্তি—উহার কথা হিন্দুগণের শোনা উচিত নয়।" তখন ভ্রান্ত হিন্দুরাজগণের হৃদয়ে অল্পে অল্পে এই বিষ প্রবেশ করিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণগণ মূর্খ হিন্দুরাজার সহায়তায় দেশের সর্ব্বত্র পুনরায় বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যাগ যজ্ঞাদি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই দেখিতে দেখিতে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাহীন বৈশ্য শূদ্রগণ আবার বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের বেড়াজালের মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবার দেশে নানা প্রকার পীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। মুসলমানের আগমনে এই অত্যাচারের অনেকটা দমন হইলেও সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়াছিল না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যানলে ভারত যখন আবার দগ্ধ হইতে লাগিল, যখন নীচজাতি সকল কুক্কুর শৃগালের

ন্যায় আবার ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সকল নীচজাতিগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিল; আবার যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল; যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তখনই অমনি ঘৃণা বিদ্বেষের তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া—পরম প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি মানবকুলের সুখ শান্তি পরিবর্দ্ধনার্থ স্বীয় পারিবারিক সুখ বিসর্জ্জন করিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর নয়ন জল মুছাইবার জন্য প্রিয়তমা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোক-সিন্ধুতে ভাসাইলেন, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য মাতৃসুধা ধারা পরিত্যাগ করিলেন। গৌরাঙ্গের প্রেম সংকীর্ত্তনে বঙ্গভূমি উথলিয়া উঠিল, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল, জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের সূর্য্যরশ্মি-সন্তপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারি-বর্ষণ হইল। সেই আহ্বানে সেই সংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া একই পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইল। খোল করতালের মধুর ঝঙ্কারে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল—"আমরা সব এক পিতার সন্তান—এক ভগবানের দাস, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।" মহা সাম্যভাবের মহা বন্যায় ভারতবর্ষ ভাসিয়া গেল। ইহাই ভেদ বৈষম্যে তৃতীয় আঘাত।

যাহাদিগের এক একজনের উৎপত্তিতে সসাগরা ধরিত্রী কৃতার্থ এবং ধন্যা হইয়াছে সেই বুদ্ধ সেই শঙ্কর সেই রামানুজ সেই চৈতন্য একে একে আসিয়া তোমাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উন্নতির দিব্য পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতেও তোমাদের চক্ষুর অন্ধতা দূর হইল না,

নয়ন উন্মীলিত হইল না। হইবেই বা কেন, বিধাতা তোমাদের অদৃষ্টে যে অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন, কার সাধ্য বিধাতার লিপি খণ্ডন করে?

কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের শেষ প্রভুত্বটুকু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় সমধিক দীপ্তিমান বোধ হইলেও উহার মরণ কাল উপস্থিত! শত চেষ্টা করিলেও আর উহাকে তোমরা সজীব রাখিতে পারিতেছ না। বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তোমাদের প্রভুত্বের উপর ক্রমাগত যেরূপ আঘাতের উপর আঘাত পড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ইহার মরণের আর অধিক বিলম্ব নাই। সামান্য আঘাত নহে,—পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকগণের পরেও, মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক সংস্কারকগণ ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের উপর যেরূপ গভীর ও গুরুতর আঘাত দিয়াছেন, (চতুর্থ আঘাত) তাহাতে আমরা উহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারিতেছি না। ইহা ভিন্ন স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ, খ্রীষ্টিয় মিশনারী-সমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির প্রচারকগণ ইহার উপর দিবারাত্র আঘাত করিতেছেন। বাপ, আর কত সহ্য হইবে। একেই ত ব্রাহ্মণ্যশক্তি হিন্দুরাজার সহায়তা বিনা আজ সহস্র বৎসর অনাহারে অনাদরে জীর্ণা শীর্ণা, তাহাতে আবার হিন্দু ক্ষত্রিয়-শক্তি ও বৈশ্য-শক্তি কর্ত্তৃক পরিপুষ্টিতা-বিরহিত। কাজেই এই সমস্ত সুতীব্র আঘাত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র ন্যায় অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছে।

৫ম আঘাত। ইহার উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাদানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার নাই। চির পদ নিষ্পেষিত জাতি সকল নানা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ পাঠ করিতেছে। পুস্তকে নানাদেশের নানা জাতির

স্বাধীনতার সংগ্রাম, মানবজাতির সর্ব্বদেশস্থ সামাজিক ইতিবৃত্ত, পৃথিবীর শৈশব ও পরবর্ত্তী অবস্থা, নানা জাতির সভ্যতার বিবরণাদি পাঠ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এক নব ভাব নব আশা জন্মিয়াছে। তাহারা কত রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে শিখিতেছে। তাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া সামাজিক জীবনের এক নূতন রাজ্য স্থাপনের আশা মনে মনে পোষণ করিতেছে। ছুতার, গোয়ালা, সুবর্ণবণিক, মাঝি, সাহা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র. বারুই, তিলি, মালি, কামার, কুমারগণ, বিদ্যালয়ে নিজ নিজ সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের সন্তান একসঙ্গে খেলা করিতেছে ও পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিই। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই সব লাঞ্ছিত নিম্নশ্রেণীর সন্তানগণ কেহ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী, সবজজ, মুন্‌সেফ, হাইকোর্টের উকীল, ব্যারিষ্টার, বড় বড় ডাক্তার, মোক্তার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংবাদ পত্রের সম্পাদক, লেখক, বাগ্মী প্রভৃতি হইতেছেন এবং আপন আপন সমাজের মধ্যে আপনাদের বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া দিতেছেন। ইঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণীয়গণ বিদ্যা অভাবে অদৃষ্টক্রমে বেতনভোগী পরিচারকরূপে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণীয়গণকে এইরূপ নিম্নতর কার্য্যে ব্যাপৃত ও হীনাবস্থায় দেখিয়া দেখিয়া শূদ্রসন্তানগণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রতি দেবভাব বহুল পরিমাণে দিন দিন অপসৃত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে না। ইহাতেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

৬ষ্ঠ আঘাত। তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেশে যতই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ততই লোকের হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন

করিতেছে। দেশে যতই জ্ঞান বিদ্যার আলোচনা, শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চা, ইতিহাস পাঠের আগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে—ততই প্রাচীন কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে মন হইতে অপসারিত হইতেছে। ভগবান্ একজনকে ব্রাহ্মণ, একজনকে শূদ্র করিয়াছেন, এখন একথা একজন বার বৎসরের বালকও বিশ্বাস করে না।

৭ম আঘাত। আর এক কারণে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য নষ্ট হইতেছে। সেটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার। মুদ্রাযন্ত্র হওয়ায় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়া স্বল্পমূল্যে দেশের সর্ব্বসাধারণের হস্তে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। শূদ্রগণ এখন অবলীলাক্রমে বেদ বেদান্তের মর্ম্মার্থ পুরাণ সংহিতার দৌড় ভালরূপই বিদিত হইতে পারিতেছে। যে শাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণ এতকাল শূদ্রগণকে ভয় দেখাইয়া শাসনে রাখিয়াছেন, এবং তাহাদের উপর প্রভুত্ব খাটাইয়াছেন, এক্ষণে উহা ঐ হীনজাতীয় শূদ্রগণের হাতে আসিয়াছে এবং তাহারা সে অস্ত্র কিদৃশ ধারাল বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন—শূদ্রের বেদাধিকার নাই। এখন দেখিতেছি শূদ্র ত দূরের কথা, ম্লেচ্ছগণ (!) বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, বেদ সংগ্রহকার—বেদ প্রকাশক।

এই সমুদয় কারণে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতিই ইহার তলে ঘুণ হইয়া লাগিয়াছে। সুতরাং ইহার আর বিনষ্ট হইবার অধিক বিলম্ব নাই। শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে। এই কালস্রোতকে ফিরাইবার শক্তি কাহারও নাই, বৃথা উদ্যম ত্যাগ করুন। পূর্ব্বে নিম্নজাতীয় কেহ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার চেষ্টা করিলে, ঘৃত অগ্নিবর্ণ করিয়া মুখে ঢালিয়া দিয়া সেই শূদ্রকে বিনষ্ট করা হইত। আর এখন শূদ্র অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে

ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন—ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

বঙ্গীয় সমাজপতিগণ! বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা সময়ের অপ্রতিহত স্রোত আদৌ বুঝিতে পারিতেছেন না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম বিভাগ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনুষ্যকুলের প্রকৃতি,—তাহাদের শক্তি সামর্থ্য, শারীরিক গঠন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আপনাদের নিজেদের মধ্যেই না কত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণা, বেদ বেদান্ত চর্চ্চা প্রভৃতি সাত্বিক ক্রিয়াকলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন তাঁহাদের বংশধর আপনারা কি করিতেছেন ভাবিয়া দেখুন দেখি? ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকলাপের কোন একটাও ঠিকভাবে পালন করিবার শক্তি এখন আপনাদের নাই। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ এক কোটী, ইহাদের মধ্যে কয়জন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে জীবন অতিবাহিত করেন? উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শতকরা ২০·২৫ জন ব্রাহ্মণ সন্তান ধর্ম্মচর্চ্চা ও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, অবশিষ্টগণ পৌরোহিত্য বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা কিছুই করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা যোদ্ধা, কেহ বা দুগ্ধবিক্রেতা, পাচক রাখাল, গাড়োয়ান মুটে জলবাহক গায়ক বাদক নর্ত্তক এবং কেহ বা কুস্তিগীর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ সহস্র কার্য্য সম্পাদন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাহার কিঞ্চিৎ অভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

শ্রীযুক্ত লালা বৈজনাথও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন :—

"In fact there is no trade in which a Brahman will

not now engage and the statistics of crime of the sea-ports show that there is no crime which he will not commit. What a fall for those, who profess to act as mediators between man and god."

(*Fusion of Sub-castes in India*)

শুধু কি ব্রাহ্মণদিগের অবস্থাই এইরূপ হীন হইয়াছে? তাহা নহে, কালপ্রবাহে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও এইরূপ হীনদশা উপস্থিত। ক্ষত্রিয়গণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই—পূর্ব্বে যাঁহারা আপন আপন ভূজবলে বীর্য্য ও পরাক্রমে দেশ রক্ষা করিতেন, অগণ্য প্রকৃতিপুঞ্জ শাসন করিতেন, যাঁহারা মণিমাণিক্যমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়া রাজছত্রশোভিত চারুচামিরসেবিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এখন তাঁহাদের কি হীনাবস্থা। সে যুদ্ধ নাই, সে যুদ্ধক্ষেত্র নাই, সে সাহস সে শক্তি সে আত্মবিসর্জ্জন কিছুই নাই। এখন তাহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। পূর্ব্বকার সে উন্নত চরিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে—এখন অনেকেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হীনমতি এবং অলস। সেই ক্ষত্রিয় জাতির কঙ্কালবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যে এক কোটি রাজপুত এখন ভারতে অধিবসতি করিতেছে তাহাদিগের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝল্লমল্লগণই বাঙ্গলার ঝালমাল ক্ষত্রিয়; কি ছিল আর কি হইয়াছে। লালা বৈজনাথ ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিতেছেন :—

"Now a days they chiefly concern themselves with agriculture or engage in petty quarrels, or pass their time in indolence on debauchery or take to menial occupations".

(*Fusion of Sub-castes in India*)

তুমি আমি রাম শ্যাম এই ২।৪ জন লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। কালের পরিবর্ত্তনে যেমন বহির্জগতের পরিবর্ত্তন হয়—তেমনি সমাজেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কাল সমাজের অধীন নহে বরং সমাজকেই কালের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। এইজন্য এক সময়ের রীতিনীতি আচার ব্যবহার আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা অন্য সময়ের উপযোগী হয় না,—হইতেও পারে না। সেই স্মরণাতীত সত্যযুগের বৃক্ষ ত্বক্ পরিহিত অরণ্যাচারী পর্ব্বত গুহাবাসী মৃগমাংসভোজী প্রাচীন আর্য্যগণের কথা একবার কল্পনা করুন আর আপনাদের নিজেদের দিকে চাহিয়া দেখুন। কি পরিবর্ত্তন! আকাশ পাতাল প্রভেদ! এখন ভাবিয়া দেখুন যদি কেহ আপনাকে সেই বেশে সেইরূপ খাদ্য ও পানীয় দিয়া সেইরূপ ভূষায় সজ্জিত করিয়া বর্ত্তমানকালের কোন সভ্য জাতির মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে কি আপনি লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া যাইবার উপক্রম হন না?

সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আর সমাজের পরিবর্ত্তনে আপনার আমার এবং আমাদের সকলেই অবস্থা, মতিগতি আকাঙ্ক্ষা কামনা চালচলন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

সত্য যুগের সেই পুণ্য দিনে, সেই সরল শান্ত অকপট সত্যবাদী শুদ্ধচিত্ত হিংসা দ্বেষ অজ্ঞাত ধীর ধর্ম্মপরায়ণ বেদ অধ্যয়নশীল মনীষীবৃন্দের সময়ে যে নিয়মে যে ভাবে সমাজ চলিত, রাজ্য চলিত, জনপদ শাসিত হইত, এখন আর সে নিয়মে চলিতে পারে না। এখন নীবার ধান্যের ষষ্ঠাংশ লইয়াই রাজা অব্যাহতি দেন না, অনায়াসপ্রাপ্য ফলমূলে গিরিনিস্যন্দিনী স্রোতস্বিনীর শীতল স্নিগ্ধ সুস্বাদু সলিলে বৃক্ষ বল্কলে এখন আমাদের আর চলে না। অভাব বোধ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচ্য পাশ্চত্য

নানাবিধ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সহবাসে আমাদের এই পরিবর্ত্তন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত বিধি ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া তদনুমোদিত জীবিকোপযোগী ব্যবসায় বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলা প্রত্যেকের পক্ষেই অসম্ভব! মনুসংহিতা মানিয়া চলিয়া পেটের দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করা একালে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শাস্ত্র মানিয়া চলিলে এখন চলে কই? তাই ব্যবস্থাদাতা সমাজ শিরোমণি মহা মহা পণ্ডিতগণও পেটের দায়ে মনু ও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া স্কুল কলেজে বেতনভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি- ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকরি করার বিধি কোন্ সংহিতার কোন্ পৃষ্ঠায় লেখা আছে? আর কোন্ ঋষিই বা শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন? নিজেদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া বিধিব্যবস্থার কঠোর প্রাণঘাতী বন্ধন শিথিল করিয়া দিন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দাসত্ব হইতে সর্ব্বসাধারণকে অব্যাহিত দান করুন। "* * * * চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। * * * যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যে বাধা দেয় তাহাই পৈশাচিক ভাবাপন্ন এবং পতন অবশ্যম্ভাবী" (১) "স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দু'চার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ

(১) উদ্বোধন, ৪র্থ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বৎসর, ১৩১০।

করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপরদিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।" * * * "ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে?" * * * "পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। * * * আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভের জন্য সভা সমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। * * * দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! * * * ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।" (১) বঙ্গের ও ভারতবর্ষের সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ কামধেনু হইতে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থারূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া নূতন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করুন এবং উহা দেশীয় ধনাঢ্য ও রাজন্যবৃন্দের অর্থ সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক এবং পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বল্প মূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিন। সামাজিক অত্যাচারের বিষময় ফলে প্রতিদিন শত শত হিন্দুসন্তান, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী" প্রথম ভাগ।

আলিঙ্গন করিয়েছে। এইরূপে কোটী কোটী হিন্দুভ্রাতাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। কয়েক শত বৎসরে হিন্দুর জনসংখ্যা কল্পনাতীত শোচনীয় ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে হিন্দু জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এই কয়েক শত বৎসরে ৩৮ কোটি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে! আরও কি আপনাদের হিংসা বিদ্বেষের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখা সঙ্গত? ভ্রাতৃত্বের প্রেমামৃত ধারায় ইহা নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলুন, অনাদৃত ভ্রাতৃগণকে বাহুপাশে টানিয়া লউন—মরণোন্মুখ হিন্দুসমাজ রক্ষাপ্রাপ্ত হউক।

সমাজে দুই প্রকারের লোক দেখা যাইতেছে। এক নিরাশাবাদীর দল, আর আশান্বিতের দল। প্রাচীনগণ প্রায়ই প্রথম দলভুক্ত, তরুণগণ দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত। নিরাশাবাদী দলভুক্ত প্রাচীনগণ বলেন—সমাজ ত দিন দিন রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। ১০ টাকা মণ চাউল, ৫।৫৷৹ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি, গুড়, মশলা, ডাল তরকারী জুতা ছাতি বাসন পত্র সবই অগ্নি-মূল্য। নিত্য দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, ক্ষয়—বসন্ত প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক যমালয়ে যাইতেছে। পূজা অর্চ্চনা, দোল দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ শান্তি, বিধি ব্যবস্থা লোপ প্রায়; দেব দ্বিজে ও গুরু পুরোহিতে ভক্তি নাই, কাশী বৃন্দাবন গয়া প্রয়াগ—তীর্থ মাহাত্ম্য, গঙ্গাস্নানে বিশ্বাস নাই। জাতির বিচার, খাদ্যাখাদ্য বোধ, লজ্জা সরম, ভয় ভক্তি নাই। স্ত্রী স্বাধীনতা;—মেয়েছেলের লেখাপড়া, বিধবা বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। আর কি সমাজের কল্যাণ আছে; ঘোর কলির সূত্রপাত; একাকারের আর বিলম্ব নাই; ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য দলের তরুণগণ বলিতেছে—কলি গত হইয়া সত্য যুগের আবির্ভাব! দীর্ঘ সপ্তশত বৎসরের দাসত্ব ভোগের পর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পরাজিত নিপীড়িত দাসত্বে অভ্যস্ত নরনারী স্বর্ণকাটির সঞ্জীবন স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে! ভারতের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আব্রহ্ম পেশোয়া আসিন্ধু হিমাচল বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে নিনাদিত ও মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। যে রাজভয়, কারাভয় ও মৃত্যুভয়ে পরাধীন জাতি সতত ভীত, সন্ত্রস্ত ও ম্রিয়মান থাকে—সেই ত্রিবিধ ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র সহস্র দেশভক্ত অম্লান বদনে হাসিমুখে সর্ব্ব প্রকার নিগ্রহ বরণ করিয়া লইতেছে। শিশু, বালক ও পুরন্ধ্রীগণ পর্য্যন্ত প্রফুল্ল বদনে কারাগার বরণ করিয়া লইতেছে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশভক্ত বীরের শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীন ভারত কেন, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এরূপ কথা কেহ কখন পড়িয়াছে কি ? এমন অপূর্ণ কাহিনী কেহ কখন শুনিয়াছে কি ? নরকুল মুকুটমণি—ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ রত্ন মহাত্মা গান্ধির বিশ্বপ্রেম বিশ্বে এক অভিনব তরঙ্গ—বিপুল কলরব তুলিয়াছে। সত্বরই বিশ্ববাসী নরনারী, রাজা প্রজা, জেতা জিত—উচ্চনীচ ভাব ভুলিয়া প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ ও মিলিত হইবে। ভারত—জগদ্‌বাসী নরনারীর তীর্থক্ষেত্র,—ভারতের পবিত্র তপোবন বিশ্ববাসীর শান্তি নিকেতন হইবে। ভারত হইতে জাতি-বিদ্বেষ সম্প্রদায়-ভেদ—দিন দিন তিরোহিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালবাসা, প্রীতি মমতার সঞ্চার হইতেছে। প্রাচীনগণের সর্ব্ব প্রকার অভিযোগের কারণ—রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নানাপ্রকার কুসংস্কার, আভিজাত্য, নারী নির্য্যাতন প্রভৃতি।

যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ও দেশভক্তগণের নিগ্রহভোগে, আত্মত্যাগে পুণ্য ও সাধনাবলে পরাধীনতা রূপ ব্যাধি দূরীভূত হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বপ্রকার উপসর্গও ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। মূল ব্যাধি আরোগ্য হইলে তাহার উপসর্গ কতক্ষণ থাকিতে পারিবে ? চারি মহাভাবে ভারত ডুবিয়াছে—নারী ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর ও নির্য্যাতন ; একই ভগবানের বিভিন্ন উপাসকগণের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা দ্বেষ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রাদেশিক অনৈক্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীই প্রধান,

ভয়াবহ ও মারাত্মক। শ্রীভগবানের কৃপায় বাতাস অনুকূলে বহিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গদেশের কথাই বলি—এখানে ৫০ বৎসরের শিক্ষায়, খবরের কাগজ, সভা, সমিতি, আলোচনা, আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব ও প্রচার ফলে—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে সমাজে নব জাগরণ আসিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সমাজ—জাতীয় সমিতি স্থাপন ও অনেকে সংবাদপত্র বাহির করিয়া আপন আপন সমাজ-সংস্কারে এবং সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে—ইহা অতিশয় শুভ লক্ষণ। ব্রাহ্মণগণ—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বৈদ্যগণ বৈদ্য সম্মিলনী, কায়স্থগণ কায়স্থ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং এইরূপ ভাবে, তন্তুবায়গণ কুম্ভকারগণ, তিলিগণ, বারুজীবি, গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক, কংস বণিক, স্বর্ণকার, মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্ত ও আদি কৈবর্ত্ত) তাম্বুলি, মোদক, সূত্রধর, পাটনী মাহিষ্য, শঙ্খবণিক, চাষা ধোপা বা সচ্চাষী, কপালী, তেলী (কাম্পিল্য দেশাগত বৈশ্য), সাহা প্রভৃতি জাতিগণ বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সভা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কায়স্থ, কর্ম্মকার, গোপ, রাজবংশী, ঝালমাল, পোদ (পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়) পুঁড়ো, হদি (হৈহয় ক্ষত্রিয়) কোচ বা শঙ্কর দাস (খশ ক্ষত্রিয়) বাগ্দী (ব্যগ্র ক্ষত্রিয়) গণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈদ্য, যোগী, নাপিত প্রভৃতি জাতিগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজদিগকে পরিচিত করিতেছেন। অবশিষ্ট অনেক জাতি স্পষ্টতঃ উচ্চ জাতিত্বের দাবী না করিলেও সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সম্মানজনক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতেছেন। যুগযুগান্তের পর নিপীড়িত নর-নারায়ণগণের যোগ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে এবং ভাঙ্গিতেছে। সমাজপতি মুষ্টিমেয় ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৩০ জন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেতর প্রায় ২ কোটি বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানকে মানুষ ও উন্নয়ন করিবার জন্য আর বেগ পাইতে হইতেছে না। তাহারা নিজেরাই নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া

লইতে উদ্যত ও যত্নবান্ হইয়াছে। ব্রহ্মই যখন অজ্ঞানতার আচরণে আবৃত হইয়া জীবনাম ধারণ করেন, তখন এই সমস্ত জীবন্ত সচল ব্রহ্ম একেবারে নিজেদিগকে ব্রহ্ম না বলিয়া এমন কি ব্রাহ্মণও না বলিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলেতেছেন—ইহাতে ভাগ্য মনে করিতে হইবে। চটিয়া জ্ঞানহারা হইবার কি আছে। আমরা ত মানুষ করিবই না, তাহারা নিজেরাই যদি মানুষ হইতে চেষ্টা করে—সে ত ভাল কথা, সুখের কথা।

সমাজপতি পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আমার করযোড়ে শেষ নিবেদন, তাঁহারা কিছুদিন দর্শন শাস্ত্র আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ঘটত্ব পটত্বের বাদানুবাদ, রজ্জুতে সর্পভ্রমের গভীর গবেষণা, প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ নিরূপণ, দ্বৈতবাদ বিচার, অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, টিক্‌টিকি পতন হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটীনাটীর নূতন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কাজের কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। যে দেশের কোটি কোটি লোক অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিবারাত্র ছট্‌ফট্ করিতেছে, যে দেশের দুর্ভিক্ষে ম্যালেরিয়ায় বসন্তে প্লেগে অজীর্ণ রক্তামাশয়ে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যে দেশের কোটি কোটি লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতার অতলস্পর্শ জলে ডুবিয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, যে দেশে কোটি কোটি ঋষির বংশধর ভ্রাতৃসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের রক্ত পান করিতেছে, সে দেশের পক্ষে ষড়দর্শনের আলোচনায় সময়াতিবাহিত করা নিতান্তই অশোভনীয়। হে বঙ্গের বড় বড় মাথাওয়ালা সমাজপতিগণ! আপনারা আর ও সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম কি জানিস্, আগে কূর্ম্ম অবতারের পূজা চাই—কূর্ম্ম হচ্ছেন এই পেট, এর পূজা না হ'লে কোন কিছু হয় না।" যাহাতে আপনাদের ভাইরা দুইটী খাইতে পায়, অগ্রে তাহারই পন্থা

বাহির করুন। আপনাদের ষড়দর্শনের আলোচনা—আপনাদের শাঙ্খ্য পাতঞ্জলের চর্চ্চা, আপনাদের টীকা টিপ্পনির অপূর্ব্বত্বের কথা ত যুগ যুগান্তর হইতে শুনিয়া আসিতেছি। উহাতে আর নূতনত্ব কি আছে? উহা কিছু দিন বন্ধ থাকুক। হিন্দু শাস্ত্র একেই ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম অনন্ত, তাহাতে আবার ভাষ্যকারগণের সুবিস্তৃত ভাষ্য ও ব্যাখ্যার সম্মিলনে উহার অসীমত্ব আরও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। ভাষ্যের ভাষ্যে তস্য ভাষ্যে টীকা টিপ্পনীতে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"র ন্যায় জটিলতর ও হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ঐ ভাষ্যসমূহ সর্ব্বসাধারণকে পাঠ ও স্পর্শ করিবার অধিকার দিতে আপনারা নারাজ। ঐ ভাষ্য পড়িতেছেই বা কে, আর বুঝিতেছেই বা কে—তদনুসারে জীবন গঠন করা ত দূরের কথা। দেশের প্রায় পনর আনা লোকই নিরক্ষর, যে এক আনা অবশিষ্ট আছে, উহার মধ্যে কয়জন সংস্কৃত জানে—এবং কয়জনেরই বা সংস্কৃত ভাষ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে? সুতরাং যাহা পোনে ষোল আনা লোক বুঝিতে অক্ষম এবং বুঝিলেও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে প্রায় অসমর্থ, সেরূপ সামাজিক অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, যাহাতে দেশের উপকার হয়, যাহাতে হিন্দুজাতি পুনরায় বিগতশ্রী লুপ্তগৌরব লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করুন, শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ঐ গ্রন্থ পরিশোভিত করুন, সর্ব্বসাধারণকে ডাকিয়া ঐ গ্রন্থ তাহাদের হস্তে এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় মুখে মুখে যতটা পারেন বুঝাইয়া দিন। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার কেন্দ্র—শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করুন। আধ্যাত্মিক বন্যায় দেশকে ভাসাইয়া ফেলুন। "প্রথমতঃ বেদে উপনিষদে পুরাণে তন্ত্রে সংহিতায় যে সব সত্য নিহিত আছে তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ হইতে ঋষির আশ্রম হইতে সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির

করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিন।" ঐ সকল সত্যের মহা স্রোত হিমালয় হইতে কুমারিকা, পেশোয়া হইতে আসাম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যাউক। সমগ্র হিন্দুজাতি আচণ্ডাল ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শ্রবণ করুক। আপনাদেরই ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ দানমেকং কলৌ যুগে॥

মনু সংহিতা ১ম অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক।

তপস্যাই সত্যযুগের, জ্ঞানচর্চ্চা ত্রেতাযুগের, যাগ যজ্ঞ দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম ছিল কিন্তু এই কলি যুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম।" আবার দানের মধ্যে ধর্ম্ম দান আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জ্যোতি দান করিয়া জড়প্রায় হিন্দুজাতির চক্ষুর ধাঁধা ঘুচাইয়া দিন। তারপর ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিদ্যাদানে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে ধর্ম্ম ও বিদ্যাদানে বঞ্চিত করার দরুণই ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের কারণ। শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপে জ্ঞানের অগ্নিকণা ধরাইয়া দিন দেখিতে দেখিতে উহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। আমাদের কৃতযুগের ঋষিগণ যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-বিদ্যারূপ ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন—সেইগুলি বাহির করিয়া আচণ্ডালের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন। যে সর্প দংশন করিয়াছে সেই আবার তাহার বিষ উঠাইয়া লউক। যাঁহারা সর্ব্বসাধারণকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া দেশকে বিষ-জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন—তাঁহারাই, সেই ব্রাহ্মণগণই আবার আচণ্ডালের গৃহে গৃহে যাইয়া বিদ্যা বিতরণ করুন—পূর্ব্ব বিষ উঠাইয়া লউন। বেদ বেদান্তরূপ ধন. ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিন, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাউক। স্মৃতির টোল উঠাইয়া দিয়া বেদান্ত পাঠের টোল

স্থাপন করুন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শ্রবণে আচণ্ডালের হৃদয় আত্ম মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক—সুপ্ত-ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হউক। জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের গৃহে সমভাবে প্রচার করুন :— 'হে অমৃতের অধিকারীগণ! তোমরা পাপতাপ জর্জ্জরিত হীন অপদার্থ মানুষ নও—তোমরা দেবশিশু—ভগবানের সন্তান—লীলাচ্ছলে মর্ত্তে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছ মাত্র। তোমরা যে সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের এক একটী তরঙ্গস্বরূপ।'

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল পুত্রকে বেশী করিয়া শুনাইতে হইবে, কেননা সে জীবনে ইহা শুনিবার কখন সুযোগ পায় নাই! ব্রাহ্মণ সন্তানের শুনিবার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। সত্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন, আবার সকলকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। নিজেরা ঋষি হউন এবং প্রত্যেককে ঋষি হইবার জন্য উপদেশ ও সাহায্য করুন। নবযুগের স্বর্ণ করোজ্জ্বল শিক্ষালোক সারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া ঐ যে প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে। শান্তি ও জয় উচ্চারণপূর্ব্বক উহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া লউন।

সমাপ্ত

ভারতের অবজ্ঞাত শ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব, অসাধারণ প্রতিভাবান্ ও
যুগান্তরকারী লেখক, নবদ্বীপ বিশ্ব-বৈষ্ণব সভার উপাধি-প্রাপ্ত
শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

গ্রন্থাবলী ও তৎসম্বন্ধে অভিমত

১। জাতিভেদ (পরিবর্দ্ধিত ৩য় সং) ২৲, ২। শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ১৲, ৩। জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ১৲, ৪। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ১৲, ৫। দেবী-পূজায় জীব-বলি (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ।৹, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ।৹, ৭। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ৵৹, ৮। বিধবার নির্জ্জলা একাদশী /৹, ৯। বিদেশী-বর্জ্জন /৹, ১০। স্বাধীনতার বাণী ৵৹, ১১। গো কোরবানি বা আত্মবলি ৵৹, ১১। বৈশ্যতত্ত্ব বা তেলী-জাতির ইতিবৃত্ত ।৹, ১২। মালীজাতির উদ্বোধন (২য় সং) ।৹, ১৩। স্বরাজ সংগ্রামে নরসুন্দর সমাজ (শ্রীকেদারনাথ শীল ও দিগিন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ৵৹ ১৪। খশ্ ক্ষত্রিয় জাতির উদ্বোধন /৹, ১৫। জলচল—আশার সংবাদ ৵৹, ১৬। স্বরাজে কারাবাস ৵৹ (যন্ত্রস্থ)।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—(দিল্লী হইতে) সমাজ সংস্কার জন্য পাঁচখানা গ্রন্থের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইহা আমাকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিতেছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকই সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন—এই সংবাদই আমাকে অত্যন্ত তৃপ্তি দিতেছে।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার অসাধারণ শক্তি লইয়া নিম্ন শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা

ঘোষিত হইয়াছি। গ্রন্থকারের ক্ষমতা অসাধারণ, গবেষণা গভীর হইতেও গভীর। (নব্য ভারতের সমালোচনা)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অতি যত্ন ও তৃপ্তির সহিত পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তথা কথিত পতিত জাতিদের বিষয় যে প্রকার সৎসাহস ও নির্ভীকতা সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আপনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বাস্তবিক আপনার মত দুই চারিজন 'কালা পাহাড়' বাঙ্গালা দেশে জন্মিলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত।

বারীন্দ্র ঘোষ—অনুপম জিনিষ, ইহার তুলনা নাই।

যুগান্তর সম্পাদক উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ, অধ্যাপক গৌহাটী কলেজ—ঢের পাণ্ডিত্যের ও পড়াশুনার প্রমাণ পাইয়াছি।

"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার" সম্পাদক—Cultivating Pods প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ (জনকা, মেদনীপুর) কোটি কোটি নিষ্পীড়িত মানবের দাবদগ্ধ হৃদয়ের জ্বলন্ত যন্ত্রণা নিজ হৃদয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আপনি যে জ্বালাময়ী বাণীতে, যে বজ্র কঠোর সিংহনাদে অহংসর্ব্বস্ব আত্মপ্রত্যয়ক মানবগুলিকে ধ্বংসের কবল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন যদি তাহাতে উহাদের কর্ত্তব্যবোধ জাগরিত না হয়, তবে বুঝিব এ দেশ রসাতলে যাইবে, ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত নির্য্যাতিতের যে সুরে উদ্বোধন করিয়াছিলেন—তাহার ঝঙ্কার বাঙ্গালী বহুদিন শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিতে পারে নাই; আজ কে জানিত, সুদূর সিরাজগঞ্জের কোন্ পল্লী ধন্য করিয়া, কোন্ বংশ পরিবার ভূষিত করিয়া আপনি সেই মারণ-বিমোহন আহ্বান লইয়া কোটি কোটি মানবের অন্তর জয় করিতে সমুপস্থিত হইবেন। আপনিই প্রকৃত 'সুরেশ' নামের উপযুক্ত।

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম নেতা, "বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, জমিদার কসাড়িয়া (মেদিনীপুর)—অনুন্নত-দিগের এমন অকপট সুহৃদ্ একালে অতীব বিরল। যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ আপনার মধ্যেই দেদীপ্যমান। অনুন্নত নারায়ণগণের উন্নয়নের জন্য আপনার অমানুষিক সাধনা ও স্বার্থত্যাগ আপনাকে দেবতার আসনে উন্নীত করিয়াছে। মঙ্গলময় তাঁহার মঙ্গল শঙ্খ আপনার হস্ত দিয়াই বাজাইতেছেন, এই শঙ্খনিনাদে ভারতের নিদ্রিত অনুন্নত সমাজ অচিরাৎ জাগরিত হইবে, সন্দেহ নাই।

"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচারের" অন্যতম সম্পাদক ও নেতা শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি, এল, কাঁথি—আপনি আমার চক্ষে সেই সুদূর অতীতের মহত্ত্ব বিমণ্ডিত আর্য্য ঋষি; সরল, অকপট, উদার, সর্ব্বভূত হিতরত মহর্ষি বলিয়া পরিস্ফুট।

ত্রিপুরা জেলার বিখ্যাত নেতা ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা রামকানাই দত্ত—পাঠ করিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। স্বদেশের, স্বজাতির এবং সমাজের উন্নতিকল্পে সংস্কার ব্রতে আপনি ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যে প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া গিয়াছেন, স্বজাতিবৎসল রাজা রামমোহন রায় যে প্রেমের ধ্বজা ধারণ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি বংশীবাদন করিয়া তাহাই প্রচার করিতে-ছেন। একদিন হিন্দু জাতির নমস্য এবং সম্পূজিত হইবেনই হইবেন। লোকমতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অকুতোভয়ে আপনি যে সমাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনার বীরত্ব অবশ্যই আপনাকে জয়যুক্ত করিবে।

ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস—আপনার রচনাবলী আমার মত পরিবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছে। আপনার সাবেক্ষণতার বিরুদ্ধ বিমুখীন আলোচনার আমার দৃঢ় প্রভাব হইয়াছে যে বর্ত্তমান কালের এই

ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির সামাজিক উচ্চাধিকার লাভের প্রচেষ্টা সমাজের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর।

"ব্রহ্মচর্য্য সাধন" প্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এল, এম, এস—আপনি জাতিভেদ গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদ এবং ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। জাতীয় জীবনের উন্নতি আপনার কামনা ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি। আপনার ন্যায় বহু শাস্ত্রবিৎ, সহৃদয় এবং সত্যপ্রিয় মহাজনের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গোস্বামী (জয় জয় মহাপ্রভুর মঠ, নবদ্বীপ)—কয়েকখান অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিলাম। যতবার পড়িয়াছি, প্রাণখানা কাঁদিয়া উঠে। কি যেন কাহার আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার প্রাণ এই মহান্ কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনি জগতের অনেক হিত করিতেছেন।

বঙ্গীয় কপালী বৈশ্য সমিতির সভাপতি শ্রীরামগতি সরকার, এম, এ, বি, এল, স্মৃতি-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ—আপনি বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নিম্ন জাতির—ঘৃণিত ও অধঃপতিত জাতির কর্ণধার হইয়াছেন—ইহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের যোগ্যতর কাজ আর নাই।

শ্রীমহীতোষ কুমার রায় চৌধরী এম্, এ, বি, এল, গঙ্গানন্দপুর সাধারণ পাঠাগার (যশোহর)—আপনি জাতিভেদ প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম (ধুবড়ী বোড়ো হোষ্টেল, আসাম)—আপনার "শূদ্রের বেদাধিকারের" অবতরণিকা পাঠ করিয়া আমাদের পতিত, অজিলষ্ট ও সভ্যতালোক বঞ্চিত "বোড়ো" জাতির দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া শুষ্কপ্রাণে আশার সঞ্চার হইল। আশা করি আপনার ন্যায় উদার, সমদর্শী ও পতিতের হিতাকাঙ্খী সৎ ব্যক্তির লেখনী-শক্তির জোরে ও পতিত-পাবনের কৃপায় একদিন আমাদের উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইব।

যোগী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীইন্দুভূষণ নাথ (কোডার মা—হাজারিবাগ জেলা)—অনুন্নত জাতির উন্নতিকল্পে আপনি যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

মেদনীপুরের জমিদার ও বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শ্রীরাধানাথ পতি, বি, এল,—আমি অনেক বই পড়িয়াছি কিন্তু এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ কথা স্বাভাবিক নিয়মে ও সময়োচিত প্রণালীতে লিখিত পুস্তক আমার হাতে পড়ে নাই। উহা যেমন পণ্ডিতের তেমনই মূর্খের আদরণীয়।

নমঃশূদ্র-প্রতিনিধি ও মাদারীপুরের উকীল শ্রীবিষ্ণুচরণ অধিকারী—আপনি আমাদের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন ও করিয়াছেন তজ্জন্য আপনার নিকট আমরা চিরঋণে ঋণী।

মহাভারত-মঞ্জরী, বীর-কেশরী নেপোলিয়ন ও সম্রাট আকবর প্রণেতা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল, পূর্ণিয়া—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সুন্দর সম্মিলন মহাশয়েই দ্রষ্টব্য। আপনার সকল বইগুলিই সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকগুলির খুব প্রচার হওয়া আবশ্যক। আপনার পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

ঝল্লমল্ল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নেতা ডাক্তার হৃদয়নাথ [illegible] ভি, এল, এম, এস (সোণাতলা, বগুড়া)—একাল পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার গ্রন্থাবলীই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আপনি বর্ত্তমান যুগের একজন অসাধারণ মানুষ। আপনি যুগধর্ম্মের একজন ঋষি বা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপে ভগবৎ প্রেরিত পুরুষ।

শ্রীরাধিকানাথ মণ্ডল (অরুণাচল আশ্রম, শিলচর)—আপনার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ ও সাধু। আপনার পুস্তকগুলি অতি সুন্দর; ভাব, ভাষা, যুক্তি সবই উত্তম। আপনার উদ্যম অতিশয় মঙ্গলপ্রদ ও প্রশংসনীয়।

ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির সামাজিক উচ্চাধিকার লাভের প্রচেষ্টা সমাজের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর।

"ব্রহ্মচর্য্য সাধন" প্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এল, এম, এস—আপনি জাতিভেদ গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদ এবং ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। জাতীয় জীবনের উন্নতি আপনার কামনা ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি। আপনার ন্যায় বহু শাস্ত্রবিৎ, সহৃদয় এবং সত্যপ্রিয় মহাজনের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গোস্বামী (জয় জয় মহাপ্রভুর মঠ, নবদ্বীপ)—কয়েকখান অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিলাম। যতবার পড়িয়াছি, প্রাণখানা কাঁদিয়া উঠে। কি যেন কাহার আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার প্রাণ এই মহান্ কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনি জগতের অনেক হিত করিতেছেন।

বঙ্গীয় কপালী বৈশ্য সমিতির সভাপতি শ্রীরামগতি সরকার, এম, এ, বি, এল, স্মৃতি-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ—আপনি বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নিম্ন জাতির—ঘৃণিত ও অধঃপতিত জাতির কর্ণধার হইয়াছেন—ইহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের যোগ্যতর কাজ আর নাই।

শ্রীমহীতোষ কুমার রায় চৌধরী এম, এ, বি, এল, গঙ্গানন্দপুর সাধারণ পাঠাগার (যশোহর)—আপনি জাতিভেদ প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর যে প্রভূত উপকার সাধণ করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম (ধুবড়ী বোড়ো হোষ্টেল, আসাম)—আপনার "শূদ্রের বেদাধিকারের" অবতরণিকা পাঠ করিয়া আমাদের পতিত, অভিশপ্ত ও সভ্যতালোক বঞ্চিত "বোড়ো" জাতির দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া সুপ্তপ্রাণে আশার সঞ্চার হইল। আশা করি আপনার মত উদার, সমদর্শী ও পতিতের হিতাকাঙ্ক্ষী সৎ ব্যক্তির লেখনী-শক্তির জোরে ও পতিত-পাবনের করুণায় একদিন আমরাও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইব।

যোগী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীইন্দুভূষণ নাথ (কোতার মা—হাজারিবাগ জেলা)—অনুন্নত জাতির উন্নতিকল্পে আপনি যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

মেদনীপুরের জমিদার ও বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শ্রীরাধানাথ পতি, ব, এল,—আমি অনেক বই পড়িয়াছি কিন্তু এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ কথা স্বাভাবিক নিয়মে ও সময়োচিত প্রণালীতে লিখিত পুস্তক আমার হাতে পড়ে নাই। উহা যেমন পণ্ডিতের তেমনই মূর্খের আদরণীয়।

নমঃশূদ্র-প্রতিনিধি ও মাদারীপুরের উকীল শ্রীবিষ্ণুচরণ অধিকারী—আপনি আমাদের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন ও করিয়াছেন তজ্জন্য আপনার নিকট আমরা চিরঋণে ঋণী।

মহাভারত-মঞ্জরী, বীর-কেশরী নেপোলিয়ন ও সম্রাট আকবর প্রণেতা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল, পূর্ণিয়া—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সুন্দর সম্মিলন মহাশয়েই দ্রষ্টব্য। আপনার সকল বইগুলিই সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকগুলির খুব প্রচার হওয়া আবশ্যক। আপনার পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

ঝল্লমল্ল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নেতা ডাক্তার হৃদয়নাথ হালদার ডি, এল, এম, এস (সোণাতলা, বগুড়া)—একাল পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার গ্রন্থাবলীই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আপনি বর্ত্তমান যুগের একজন অসাধারণ মানুষ। আপনি যুগধর্ম্মের একজন ঋষি বা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপে ভগবৎ প্রেরিত পুরুষ।

শ্রীরাধিকানাথ মণ্ডল (অরুণাচল আশ্রম, শিলচর)—আপনার উদ্দেশ্য অতি শুভ ও সাধু। আপনার পুস্তকগুলি অতি সুন্দর; ভাব, ভাষা, যুক্তি সবই উত্তম। আপনার উদ্যম অতিশয় মঙ্গলপ্রদ ও প্রশংসনীয়।

নমঃশূদ্র প্রতিনিধি ডাক্তার শ্রীকালীচরণ মণ্ডল (দিনাজপুর)—বই গুলি ছাপাইয়া দেশের যে কত মঙ্গল করিয়াছেন, দেশবাসী সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। বইগুলি দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের সহকারী সভাপতি ও বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীদীননাথ দত্ত এম, এ,—আপনার সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার জন্য আমরা সকলেই আপনার নিকট ঋণী।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম নেতা, ভূতপূর্ব্ব ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব সম্পাদক শ্রীরাইচরণ সরকার বি, এল, ডায়মণ্ড হারবার—আপনি মহানুভব ও মহা জ্ঞানী। আপনি আমাদিগের মধ্যে কিছুদিন থাকিলে এই অধঃপতিত জাতির শক্তিসঞ্চার হইতে পারে।

"ধ্বংসোন্মুখ জাতি" প্রণেতা,লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, ডি, আই, এম্, এস :—আপনি যথেষ্ট কাজ করিতেছেন ও আমার বিশ্বাস আপনার দ্বারাই এইরূপ কাজ হইবে। দেশের লোককে জাগান প্রধান কর্ম্ম। আপনি মহা কর্ম্ম করিতেছেন ; সকলেরই অভিবাদনের পাত্র।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণের নামীয় পত্র ৬।৬।১৯১৯ * * * দিগিন বাবু প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অতিশয় আশার বিষয়—উনি একা অনেকের কাজ করিতে পারিবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঝা, সহকারী সম্পাদক মালদহ রাষ্ট্রীয় সমিতি—আপনার গ্রন্থাবলী শীঘ্রই দেশে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিবেই করিবে মালদহে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে।

বঙ্গীয় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ-যুবক-সঙ্ঘের সম্পাদক, 'ব্রাহ্মণ শূদ্রের সংঘর্ষ' প্রণেতা শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য—আজ দেশ পতিত লাঞ্ছিতকে বুকে ধরা শিখিতেছে মাত্র, আপনার জীবনব্যাপী সাধনা ও ত্যাগ কি বিফল হইবে? ২০।২১ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আপনি পতিত সমাজের কথা ভাবিয়া কত

চোখের জল, হৃদয়-রুধির দান করিয়া আসিতেছেন। লাঞ্ছিতের বেদনা আপনার মত এমন করিয়া কে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে?

মালী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীদামোদর দাস বি, এ,—নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের জন্য দিগিন্দ্র বাবুর মত আর কাহাকেও অক্লান্ত সাধনা, জীবনব্যাপী তপস্যা ও সর্ব্বত্যাগ করিতে দেখিলাম না। ইহার ফল ও ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যে 'জলচল' করা তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল, উহা দেশের নানাস্থানে আরম্ভ হইয়াছে।

খশ ক্ষত্রিয় সমিতি সম্পাদক শ্রীবনমালী বর্ম্মা—আপনি পতিত জাতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। আপনি আসায় আমাদের সমাজ মধ্যে যারপর নাই উৎসাহ,উদ্যম ও জাগরণের সঞ্চার হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা "হিন্দু পত্রিকার" সহকারী সম্পাদক শ্রীমৎ কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য মীমাংসাতীর্থ:—

আপনি নিপুণ তুলিকায় পতিত পাপ পঙ্কিল সমাজের যে করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে শতমুখে প্রশংসা করা উচিত। আপনার সহিত সকল বিষয়ে আমি একমত নহি কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে আপনার সদুদ্দেশ্যে আমি সন্দেহ করি না। আপনি সমাজের আবর্জ্জনা অত্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামী দুষ্টামী দূর করিয়া সামজকে সমাজে পরিণত করিতে চাহেন, ইহার জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি। আপনার জাতিভেদ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি উহার কথা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এফ্, সি, এস্; ডি, এস্, সি; পি, এইচ্, ডি; সি, আই, ই:—

The evils of the caste system have been very admirably set forth by the author. The author has shown

considerable powers of research and his work is as thoughtful as suggestive. The book ought to find a large number of readers.

হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম্, এ; বি, এল্, পি, আর, এস্ ঃ—মহাশয়ের "জাতিভেদ" পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। অধিকাংশ কথায়ই মহাশয়ের মতের সহিত আমার একতা আছে। আমরা যে নিম্নশ্রেণীস্থ ভ্রাতৃগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় বি, এল্, সি, আই, ই, ঃ—এতদ্বিষয়ের আলোচনা যত অধিক হইবে ততই মঙ্গল। আশা করি আপনার গ্রন্থ যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্ ঃ—আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি নানা গ্রন্থ হইতে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আপনার গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আপনার অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। পুস্তকের ভাষা সুখপাঠ্য। যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিতে ভালবাসেন তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমার বিবেচনায় এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল ঃ— পুস্তক খানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনার এ কথা শতবার সত্য

"আমি হীন" ভাবিতে ভাবিতে মানুষ হীনতর হইয়া যায়। আমাদিগের ক্রটীতে যে কত লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দু সমাজের বাহিরে চলিয়া গেল তাহা মনে করিলে ভীষণ কষ্ট হয়। আপনার ভয়শূন্য আবেগপূর্ণ জ্বালাময় কথাগুলি প্রাণে বড় লাগিয়াছে। ভগবান্ আপনাদিগের এই মহতী চেষ্টার উপরে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

সুবিখ্যাত লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ—আপনার "জাতিভেদ" পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। আজিকালি এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। আপনার যুক্তিপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের (সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের) চৈতন্যোদয় হইতে পারে।

কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ ঃ—আপনার পুস্তক আমি যতটুকু পাঠ করিতে পারিয়াছি সেটুকু আমার নিকট উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে।

শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সম্পাদক রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি, এল ঃ—আপনার পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় বহু অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে সত্যনিষ্ঠা তাহা দ্বারা এই গ্রন্থ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অধিক কি লিখিব, আপনি যে পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পুরস্কার যদিও আমাদের দেশে পাওয়া সম্ভব নয়, নিজের কর্ত্তব্য করিবার অবসর ও সাহস থাকাই যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিবেন।

"হিন্দুপত্রিকা" সম্পাদক রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম,এ, বি,এল, ঃ—You are being very good work.

শ্রীহট্ট কলেজের প্রিন্সিপাল অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ঃ—I have found the book very interested and really suited

to the purpose for which it has been written. It very ably gives the pros and cons of caste distinction and also indicates the direction in which reformation is necessary to suit the modern requirement according to the present condition of the Hindu Society.

পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল গোপালচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ ঃ—তোমার "জাতিভেদ" পাঠ করিয়া তোমার উদ্যম, শ্রমশীলতা, সঙ্কল্পসাধনে ঐকান্তিকতা এবং সার্ব্বজনীন সহৃদয় প্রীতি দেখিয়া বস্তুতঃ তুমি আমার ন্যায় শিক্ষকের "অযোগ্য-শিষ্য" এই বাক্যের ব্যাজস্তুতি হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং পিতা যেমন সর্ব্বত্রই পুত্র কর্তৃক অতিক্রান্ত হইতে ইচ্ছা করেন এবং হইয়া আনন্দানুভব করেন, আমিও সেই আনন্দে আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলাম।

রিপন কলেজের অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ঃ—প্রকৃত জাতিভেদ জন্মগত নহে কিন্তু গুণ ও কর্ম্মগত, এই মত সমর্থন করিবার জন্য আপনি যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়। অধুনা আমাদের সমাজের জাতিভেদ যে ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা হিন্দু সমাজের অনিষ্টকর ও পরিণামে হিন্দু জাতির উচ্ছেদকারক ইহা আপনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

রাজবংশী বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নেতা রায় সাহেব শ্রীপঞ্চানন বর্ম্মা এম এ, বি এল, এম্ এল সি,—এই পরার্থপরতা আপনাকে দারিদ্র্যব্রতী, মহোৎসাহী ও ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিয়াছে। আপনি প্রাণপাত করিয়া সমাজের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

আসাম বঙ্গ যোগী সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীহরিমোহন নাথ (চট্টগ্রাম)—দিগিন্দ্র বাবু যে ভারতের অনুন্নত সমাজের মঙ্গলের জন্য খাটিতেছেন তাহা

বাস্তবিকই তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক। তিনি যে ভাবে নীরবে অনুন্নত জাতিকে জাগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়।

অসমীয়া কৈবর্ত্ত সম্মিলনের সম্পাদক গণেশচন্দ্র হাজরিকা (ডিব্রুগড়)—আপনি আমাদের ২য় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে আগমন করিয়া যে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমাদের সমাজ মধ্যে জাগরণের বিরাট তরঙ্গ উঠিয়াছে। আপনার সমাজ-সংস্কার ব্রতের মহিমা ভারতে অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইবে।

আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীপদ্মধর চলিহা এম এ, বি এল, (শিবসাগর)—আপনার মধুর বাণী আজিও শিবসাগরবাসীর কাণে বাজিতেছে—আপনি শিবসাগরে জাগরণ তুলিয়া ও চেতনা সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (শ্রীহট্ট)—আপনার ভাষা মর্ম্মস্পর্শী, লেখায় প্রাণ আছে। গ্রন্থগুলিতে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নমঃশূদ্র হিতৈষী সম্পাদক শ্রীভারতচন্দ্র সরকার—নমঃশূদ্র জাতির প্রতি আপনার যে অযাচিত প্রেম তাহা জীবনে ভুলিতে ও পরিশোধ করিতে পারিব না। এই অধঃপতিত নির্ধন ও নিরক্ষর জাতির ভক্তি-উপহার ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার আর কি আছে? সমগ্র সমাজের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপহার দিতেছি। আমরা আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করি নাই; আপনিই আমাদের অভাব জানিয়া আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন; প্রকৃত মহাপুরুষ ও অবতারের লক্ষণই এই।

বঙ্গ, বিহার প্রদেশ ও কলিকাতা আর্য্য সমাজের সভাপতি, বহু গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শঙ্করনাথ—আপনি যথার্থ দেশের হিতকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন,

এজন্য শরীর, রক্ত, মন ও কতক পরিমাণে নিজ হইতে ধন ব্যয় করিয়াও দেশের উপকার সাধন করিতেছেন।

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম, এ,—পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লিখিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে মনে হইতেছিল, আমার প্রাণের কথা এ কে লিখিলেন? পুস্তকখানির উপর নিজের রচনার মত মায়া জন্মিয়াছে। পুস্তকখানি সকল গৃহে—বঙ্গের ও ভারতের, প্রত্যেক হিন্দু গৃহে শোভা পায় ইহাই আমার বাসনা। আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

২য় পত্র—সংবাদ পত্রে মহাশয়ের তপস্যার খবর পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং আপনাকে শত পুরুষের শক্তি দান করুন। আপনার মত ঐকান্তিক সাধক বঙ্গদেশে বিরল। লোকশিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্ আপনার মধ্য দিয়াই কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী—পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। হিন্দু সভার জন্য কিছুদিন বাঙ্গালা দেশের ভিতর ভ্রমণ করিব। আপনি কি ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন?

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী এম, এ, বি এল—অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের আপনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। * * আপনিই মাতার সুসন্তান ও দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সেবক। আপনার তুলনায় আমরা নগণ্য।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, বি এল, এম ডি,—শ্লোকগুলি সুন্দর সংগ্রহ করা হইয়াছে।

রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম, এ, বিদ্যানিধি—বিষয়ের গুরুত্ব স্মরণ করিলে আপনার চেষ্টার প্রশংসা করিতে হয়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,—পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি।

৺যদুনাথ ঘোষ বি. এ, হেড্ মাষ্টার সৈদপুর হাই স্কুল—পাঠ করিয়া খুব প্রীত হইয়াছি—যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ, হেড্ মাষ্টার দলপাড়া হাই ইংলিশ স্কুল (নোয়াখালি)—আপনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছেন। ফরাসী বিপ্লব ও রুস দেশের অনার্য্য ভাবের অত্যাচার হইতে যাঁহারা সমাজকে রক্ষা করিতে চাহেন—তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত হিতকারী, আপনার চেষ্টা এজন্য ধন্যবাদের ও প্রশংসার যোগ্য।

কপালী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী—আপনি যথার্থই বঙ্গীয় অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়সমূহের বন্ধু।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীহরদয়াল নাগ—আপনি পতিতমানবের বিশেষতঃ ভারতবাসীর মুক্তির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। আপনার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় তেলী সম্প্রদায়ের নেতা ও বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস তত্ত্বনিধি—বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের হৃদয় যে উপাদানে গঠিত, আপনার হৃদয় সেই উপাদানে গঠিত। দরিদ্রের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই ভগবানের অবতার। যে ব্রাহ্মণ জাতিদিগের বিধানে শূদ্রকুল চির পতিত, জ্ঞান রত্নলাভে বঞ্চিত হইয়াছিল, সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনাথ শূদ্রকুলের দুঃখে আপনার হৃদয় কাঁদিয়াছে, নিজের স্বার্থ চিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া অহোরাত্র শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, তাহাদের উদ্ধারের জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়া আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়াছেন, উহাতে আপনার অমানুষিক উদারতার পরিচয় পাইতেছি। পদদলিত শূদ্রজাতি আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

বগুড়া জেলা সাহিত্য সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মজুমদার— আপনার শাস্ত্রজ্ঞান লিপি কৌশল ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম। এই হতভাগ্য দেশে আপনার ন্যায় লেখক খুবই কম। আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সমাজ সেবায় ব্রতী হইয়াছেন ভগবান তাহা সফল করুন।

পাবনা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীহেমচন্দ্র রায় এম এ,—শূদ্রজাতির প্রতি আপনার সহানুভূতি আন্তরিক এবং তাহা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শ করে। আপনার ভূত দয়া ও আন্তরিকতার প্রমাণ যথেষ্ট স্থলে পাইয়াছি।

করটিয়ার (ময়মনসিংহ) জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খান পনি সাহেব লিখিয়াছেন:—আপনি যে পথে চলিতেছেন, উহাই এক্ষণে ভারতের গন্তব্য পথ। এ পথ যতই কণ্টকাকীর্ণ হউক না কেন, আমাদিগকে এপথে চলিতেই হইবে।

কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, শোভা বাজার রাজবাটী—আপনার পুস্তক পাঠে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। আপনি দেশের ও সমাজের একটা কাজ করিয়াছেন; আপনার গ্রন্থের বহুল প্রচার বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়।

হিন্দুরঞ্জিকা সম্পাদক সুকবি শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল, রাজসাহী— আপনার জাতিভেদ এখানে যাঁহাকে দেখিতে দিয়াছি, তিনিই খুব প্রশংসা করিয়াছেন। আপনি যেরূপ Plain living and high thinkingএর আদর্শ স্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাতে আমার অনেকবার মনে হয় যে এই কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন যাপন করি।

কর্ম্মকার সম্প্রদায়ের নেতা, বগুড়ার উকীল শ্রীবসন্তকুমার কর্ম্মকার— আপনি যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সেজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ দেই। আশা করি সমগ্র অনুন্নত জাতি আপনাকে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞানে পূজা করিতে ভুলিবে না। আপনি যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া জীবনের

কল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আপনার লক্ষ্য সাধন হইবে তাহা নিঃসন্দেহ জানিবেন। আপনার লিখিত পুস্তকগুলি অনুন্নত জাতিদের (উচ্চজাতিদের সহিত) জাতীয় সংগ্রামে আয়ুধের কাজ করিবে।

ঝল্লমল্ল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতির নেতা বগুড়ার উকীল শ্রীঅনন্তচন্দ্র দাস—আপনি পতিতজাতির ত্রাণকর্ত্তা দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ। আমার তেমন ভাষা নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই যে আমার মনের মতন করিয়া আপনার গুণের বর্ণনা করি। আপনিই বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত সমাজ-সংস্কারক। আমরা যে আপনার মত লোক পাইব তাহা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আপনার ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত বইগুলি বর্ত্তমান কালের নিপীড়িত জাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

নাপিত কুল দর্পণ প্রণেতা ও বঙ্গীয় নাপিত সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীতুষ্টলাল বিশ্বাস—জাতিভেদ পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ আপনার শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ক বহুদর্শিতার কথা শুনিয়া আরও আশান্বিত হইলাম। আমার পুস্তক সত্বরই বাহির হইবে। আপনার পুস্তকের সাহায্য যথেষ্ট লইয়াছি ; এজন্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

নাকালিয়া (পাবনা) মাহিষ্য শাখা সমিতির সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীরাধাবল্লভ বৈষ্ণব—আপনার জাতিভেদ চিরলাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত শূদ্রজাতির পরম মঙ্গলকর। এজন্য সমগ্র শূদ্রজাতি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

কংসবণিক সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দন—জাতিভেদ পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

সুবর্ণ বণিক সমাজের নেতা—'পাগল রাধামাধব, রাঙ্গা পা দু'খানি' প্রভৃতি প্রণেতা—বিবিধ পত্রিকার লেখক রসিকলাল দে (সোণামুখী)

আপনি অবজ্ঞাত নিম্ন শ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব। আপনি সত্য কথা বলিয়া জগতের মহা মঙ্গলসাধন করিতেছেন। আপনিই প্রকৃত রাধামাধবের কথিত নির্গুণ ব্রাহ্মণ, প্রাণ গৌরাঙ্গের সেবার অধিকারী, তাঁহার নিজ জন্।

পাটনী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীরমেশচন্দ্র দাস (শ্রীগৌরী, শ্রীহট্ট) —আপনার জাতিভেদ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অবধি ইহাই ধারণা হইতেছে যে পৃথিবীতে যখন কোন যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটে তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঘটনা বিষয়ক ভাব জগতে আন্দোলিত হইতে থাকে। তাই মনে হয় জগতে এমন দিন আসিবে যে দিনে আপনাকেও বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের নামের তালিকাতে নামভুক্ত করিতে মানবগণ কুণ্ঠিত হইবে না। আপনি যেরূপ হৃদয়ের রক্ত দ্বারা বইখানি লিখিয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইতেছেন, সেরূপ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বাসনার সঙ্গে দৃঢ়বীর্য্যের সমাবেশ অতি বিরল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জ্ঞাতি বংশধর ঢাকা দক্ষিণ (শ্রীহট্ট) নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ স্থাপনকারী শ্রীইন্দ্রকুমার মিশ্র—আপনি ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব জীবনের স্বার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা,শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন (পাবনা)—বহু শতাব্দীর নিপীড়িত, নিগৃহীত, ঘৃণিত শূদ্রজাতির জন্য যে আপনার প্রাণ কাঁদিয়াছে ইহা হিন্দুজাতির এক মহা সমুন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, সম্পাদক, উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি, বর্দ্ধমান—আপনি একজন বহুশাস্ত্রদর্শী, সুপণ্ডিত এবং আপনার হৃদয় মহান্ ও উদার। তদ্ভিন্ন আপনি জাতি তত্ত্বালোচনা বিষয়ে বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি ৮ম সুবর্ণ বণিক সম্মিলনী রাজসাহী—আপনি ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

দয়া করিয়া আমাদের সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্র, শ্রীআশুতোষ ধারা ও শ্রীগিরিশচন্দ্র পাত্র মির্জ্জাবাজার মেদিনীপুর—বঙ্গীয় বৈশ্য স্বর্ণকার সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনে আপনি সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন।

ফরিদপুরের সদর সবডিভিসনাল অফিসার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন—গ্রন্থখানি একটি মহাবস্তু। ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজের উত্তমাঙ্গ মুখস্বরূপ, সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তাঁহাদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। যদি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ আপনার মত উদারচিত্ত হইতেন—তবে দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত। আশা করি আপনার উদ্যম ও লেখনীধারণ নিষ্ফল হইবে না।

বিংশতি লক্ষ ব্যগ্রক্ষত্রিয় (বাগদী) জাতির নেতা ও পরিচালক,—"ভারত বন্ধু" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (হাওড়া)—আপনি ভারতীয় পতিত জাতির উদ্ধারকল্পে জাতিভেদ নামক পুস্তক রচনা করিয়া দেশের যে কি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

আপনি যে দ্বিতীয় চৈতন্য অবতাররূপে তথা কথিত অবজ্ঞাত জাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে যে অচিরে উন্নতিপথে ধাবিত করিবেন, তাহা আমার স্থির বিশ্বাস।

আমিও আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ও আপনার পদানুসরণ করিয়া সেই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছি।

আপনার কৃপাবলে পূর্ব্ববঙ্গস্থ নমঃশূদ্র জাতি উন্নতিমার্গ লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এতাদৃশ আর একটি বিশাল জাতি আছে, যাহারা বাগদী নামে খ্যাত এবং যাহাদের সংখ্যা ঐ নমঃশূদ্র সন্তানগণ অপেক্ষা কম নহে। আমার একান্ত প্রার্থনা যে, এই অস্পৃশ্য পতিত জাতির উন্নতিকল্পে সময়ে

সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবন্ধ লিখিবেন। আপনার শাস্ত্রসম্মত প্রবন্ধসমূহ যে অমোঘ মন্ত্রবলের ন্যায় এই জাতির উপর কার্য্য করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লেখক জগদানন্দ রায় (বোলপুর, শান্তি নিকেতন)---গ্রন্থকার সুবিচারকের মত তাঁহার প্রত্যেক উক্তিটিকে নানা প্রমাণ প্রয়োগে সমর্থন করিয়াছেন। মোট কথা পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক জা[illegible]ছ ; এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

জাপান প্রত্যাগত শ্রীযদুনাথ সরকার এম, এ, এস, (বিকানির)—গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। মৃত জাতির পক্ষে ইহা মৃতসঞ্জীবনী সুধারূপে গৃহীত হওয়া উচিত। এ দুর্দ্দিনে এরূপ গ্রন্থের সমূহ প্রচলন সমাজের পক্ষে শুভ অদৃষ্ট বলিতে হইবে।

ভুবন বিখ্যাত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বেঙ্গলী পত্রিকায়" লিখিয়াছেন :—

The book "Jatibheda" under notice is an excellent and unique work from the pen of Babu Digindra narayan Bhattacharjee. It differs in its object and aim from the other publication of like na ture. It does not seek to accentuate the difference between the different castes of the huge Hindu Community nor does it seek to bolster up the cause of one caste at the cost of the others. On the contrary the main object of the author has been to try to remove the angularities between the different castes existing on causes which have no "Shastric" foundation to stand upon. This work will render invaluable service to the Hindu Community for which it is intended. The author in dealing with the

genesis and laws of the caste system from the Vedic to the present time has displayed considerable research and critical acumen. The Special merit of the work consists in the fact that the author being a Brahmin himself and drunk deep in the lore of Sanskrit literature, has not allowed himself to be tremelled by the traditionary and orthodox and for the matter of that twisted and perverted views which his castemen largely display in grappling with subjects which more or less affect the caste question. The author has not been swayed in the least as will be apparent from the perusal of the book, by the traditionary views of the orthodox section of his caste nor has he looked upon the caste questions and the inportant issues consequent upon them—the burning topic of the day—with the coloured glass of prejudices. His work, if read with patience and with an open and unbiassed mind will dispel many of the prejudices which account for the present degenerate condition of the great bulk of the Hindu Community, the amelioration and welfare of whose social and moral condition is the main object of the author. The author has disclosed, facts and figures in his support from the ancient lore of the "Rishis" that have lain obscured hitherto in the mass of mis-representation and mis-statements to prove that the treatment which the so called "High castes" accord to their brother is unjustifiable and inhuman. The style of the book is elegant and convincing and there is no doubt that his work will be a valuable acquisition to the Bengali literature. The author deserves every encouragement at the hand of

thoughtful men. It is the duty of the educated public to extend its helping hands to this young author and to see that the indefatigable iudustry and untiring zeal he has displayed in this work for the good of the suffering and down-trodden section of the community do not go unrewarded and unrecognised.

The Bengalee. 26th June, 1912.

নব্যভারত :—এরূপ সহৃদয়তাপূর্ণ পুস্তক আমরা অল্পই পড়িয়াছি। গ্রন্থকার অসাধারণ গবেষণা বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "নিম্ন শ্রেণীকে" অগ্রাহ্য করা সমীচীন নয়। গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য ও গবেষণা অসাধারণ এবং তাঁহার হৃদয়খানি উদারতা ও মহত্বপূর্ণ। এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি এদেশে অমর হইবার যোগ্য। বিধাতা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সঞ্জীবনী :—জাতিভেদের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিগিন্দ্রবাবু প্রাণের ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে যাঁহারা মানুষ, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের প্রাণ দ্রবীভূত হইবে। অবনত শ্রেণীর লোকদিগকে মনুষ্যত্বের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুগণ যে আত্মহত্যা করিতেছেন, গ্রন্থকার তাহা হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন; যে অবনত শ্রেণীর লোকদিগকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইয়াছে তাঁহারা সমাদরে এই গ্রন্থ পাঠ করুন। যাঁহারা দেশের অস্থিমজ্জাস্থানীয় লোকদিগকে অবনত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারও এই গ্রন্থ পাঠ করুন।

সময় :—গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালা-ভাষায় সচরাচর প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। গ্রন্থকার যে সকল গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে আলোচনার যোগ্য। আমাদের দেশের "জাতিভেদ" প্রথা যে গুণ ও কর্ম্মগত গ্রন্থকার তাহা নানা যুক্তিতর্কের সমাবেশে প্রমাণ করিয়াছেন এবং

এই জাতিভেদ প্রচারফলে দেশে যে বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহাও অতি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সকল কথার সকলে অনুমোদন করিতে না পারে, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে যুক্তিপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই গ্রন্থের প্রধান গুণ এই যে ইহার সর্ব্বত্রই আন্তরিকতা পরিস্ফুট। লেখক বিলক্ষণ লিপিদক্ষ। আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহার কাগজ ও ছাপা উত্তম।

কায়স্থ পত্রিকা :—দিগিন্দ্রবাবু "জাতিভেদ" নামক গ্রন্থে নিম্নশ্রেণীর জন্য বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে বহু প্রমাণ উপস্থিত করতঃ সমালোচনা করিয়া দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে জাতিবিভাগ ছিল না—কর্ম্মের দ্বারায় পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হইয়াছে মাত্র। সমাজের উন্নতকামীদিগের প্রতি গৃহে পুস্তকখানা রাখা কর্ত্তব্য মনে করি।

হিন্দু পত্রিকা :—নবীন লেখকের সহৃদয়তা প্রশংসনীয়; তিনি হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদীগণ এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। এ গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে, যে জন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা জাতিভেদ ও তদানুসাঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় আমোদ পাইয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাতে অনেক উপকরণ পাইবেন। অনুসন্ধিৎসুগণ পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। মূল্যের তুলনায় পুস্তকখানি খুব সুলভ।

মানসী :—গ্রন্থকার হিন্দুর জাতিভেদের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানসময়ে হিন্দুসমাজে যে সমস্ত অনাচার ও কপটতা প্রবেশলাভ করিয়াছে, অতি তীব্র ও কঠোর ভাষায় তাহা নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

প্রবাসী—এই পুস্তকখানির নাম সংবাদপত্রে বিশেষরূপে বিঘোষিত না হইলেও বঙ্গভাষায় সম্প্রতি যে কয়েকখানি খাঁটি বই লিখিত হইয়াছে,

ইহা তাহাদের অন্যতম একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে গ্রন্থকার জাতিভেদের ভীষণ অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরাজলেখকদিগের পুস্তক হইতেও মধ্যে মধ্যে সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। * * * ভূমিকায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে—পুস্তকখানিতে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে * * * দুর্বল, ক্ষীণ, অত্যাচারক্লিষ্ট নীচ হিন্দু জাতিসমূহের সহিত লেখকের সমবেদনা সর্বত্র পরিস্ফুট। ভবিষ্য হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা ও গভীর স্বদেশবৎসলতা লেখকের ভাষাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এজন্য ভাষা স্থলে স্থলে তীব্র হইলেও অসঙ্গত হয় নাই। লেখক প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ নিজকে বিলোপ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। আশ্বিন ১৩২২

The Modern Review—This book decently printed on good paper, containing a mine of trustworthy information * * * and we could not recommend a better one to those who take an interest in the momentous question with which it deals. * * * The Smritis and the Samhitas have been analysed, and books by prominent Indian and European authors touching the matter under discussion have been laid under contribution, with a view to demonstrated, the gross injustice which is eating like a canker in to the vitals of our social system. * * * The author's deep sympathy for "the submerged tenth" of Hindu society reveals itself everywhere. The author has presented the caste for refrom

in a really able manner, in this proving himself a true representative of the ancient Brahmins to whose degenerate modren successors an ostrich like policy commends itself, as the best solution of a problem which is every day becoming more and more insistent and acute. As Dr. Mukherji says, there is much in the book to read, ponder and learn. (July 1915.)

ভক্তি—গ্রন্থকার যেরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া ও যেরূপ গবেষণা করিয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্হ। বহু পরিশ্রমে নানা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রয়োগাদি সংগ্রহ করায় গ্রন্থখানির অঙ্গ-সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা একবার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেক জানিতে পারিবেন। মাঘ ১৩২১।

যোগি-সখা (কার্য্যালয় হইতে)—এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক বঙ্গভাষায় সম্ভবতঃ প্রথম দেখিয়াছি। দাস-প্রথা নির্ম্মূল করিয়া উইলবারফোর্স প্রমুখ মনীষিগণ যেরূপ ইংরেজের ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, মহাশয়ের নামও বাঙ্গালার ইতিহাসে সেইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সন্তানের কৃতজ্ঞতা ও কাতর প্রার্থনা গ্রন্থকারের সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হইবে।

সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র "সমাজবন্ধু" সম্পাদক শ্রীঅধরচন্দ্র দাস—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে উপেক্ষিত সম্প্রদায় সকলের সামাজিক উন্নতির জন্য "জাতিভেদ" প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার আদ্যন্ত পাঠে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই পুস্তকের বহুল প্রচারে হিন্দুসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

মাধুকরী—দিগিন্দ্রবাবু সুবক্তা, সুলেখক ও নিম্নশ্রেণীর জাতিবৃন্দের উন্নতিপ্রয়াসী বলিয়া বঙ্গদেশে সুপরিচিত। দিগিন্দ্রবাবুর বিশাল হৃদয় কেবল নিম্নস্তরের জাতিবৃন্দের জন্যই কাঁদে নাই, নিরীহ পশুর রক্ষণকল্পেও তাঁহার মর্ম্ম ফাটিয়া অশ্রুর উৎস উৎসারিত হইয়াছে;

প্রবর্ত্তক—লেখক শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহদন্তঃকরণ কোটি কোটি শূদ্রভ্রাতৃগণের বেদনায় ব্যথাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ মাত্রেই যে ভগবানের অংশ, সন্তান—সমাজের অন্ধ চক্ষুতে অঙ্গুলি দ্বারা দেখানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। দিগিন্দ্রবাবু হৃদয় দিয়া সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটি অনুভব করিয়াছেন ও মর্ম্ম চিরিয়াই তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন। বইগুলি পড়িতে পড়িতে সখারাম বাবুর মর্ম্মস্পর্শী লেখনীর কথা মনে পড়িয়া যায়। লেখক কারুণ্যপূর্ণ তারস্বরে এই বিরাট সমাজরূপী হিরণ্য গর্ভকে মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে ডাক দিয়াছেন। সহৃদয় গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক। দিগিন্দ্র বাবুর প্রাণপূর্ণ লেখাগুলি অনেকখানি চক্ষুরুন্মিলনে সহায়তা করিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

উদ্বোধন—গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি সাধু। গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ওজস্বিনী ভাষায় শূদ্রনামধেয় জ্যোতির তনয়গণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইবে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সেবক—শূদ্রকথিত, নিগৃহীত নিপীড়িত জাতির পক্ষে দিগিন্দ্র বাবু যে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার জাতীয় পুস্তকগুলি পাঠ করিলে প্রাণে একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এই অন্ধ তমসাবৃত যুগে তিনি

দেশে একটি নুতন দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন ;—যাহার আলোকে অত্যাচার প্রপীড়িত জাতিসমূহ নিজ মূর্ত্তি ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে। জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি।

ভক্তি—আমরাও গ্রন্থকারের সুরে সুর মিলাইয়া একবার সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি। ইহাতে জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। অধঃপতিত সমাজের উন্নতিবিধানকল্পে গ্রন্থকারের যেরূপ উৎসাহ তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। * * * জাতিভেদ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারাই গ্রন্থকার জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি যে ভাবে সমাজের উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই গ্রন্থকারের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীসজ্জনতোষিনী—গ্রন্থকার বিশেষ নিরপেক্ষ, পরদুঃখকাতর এবং সকল জীবে দয়া করিবার একান্ত পক্ষপাতী। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও উদারতা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক সাত্ত্বিক মহৎ ব্যক্তিই তাঁহার লক্ষ্য সাধনের সহায়তা করিবেন আশা করি। আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি (জাতিভেদ) নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক, নীচ হৃদয় ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণও ইহা পাঠে লাভবান্ হইবেন। উদারমতি হরিজনগণও বৈষ্ণবের সুনির্ম্মল স্বভাব দর্শক লেখকের উদারতা ও বুদ্ধি মত্তা লক্ষ্য করিয়া সুখী হইবেন। লেখক যেরূপ উদার, যেরূপ মহৎ হৃদয়, যেরূপ সম্ভ্রান্ত, যেরূপ পণ্ডিত, যেরূপ নিঃস্বার্থ তাহাতে সর্ব্বসদ্গুণগণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমাদের মনে হয়—তিনি হরিবিমুখ সামাজিক গণের ক্ষুদ্র চিত্তবৃত্তিকে স্বীয় মহত্ত্ব ও আদর্শ জীবনের দ্বারা উন্নয়ন করিবেন।

পতাকা—লেখক হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে আবেগময়ী ভাষায় হিন্দু সমাজের নিখুঁৎ চিত্র ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের সঞ্জীবনী সুধা। এই পুস্তক হিন্দু সমাজের জাত্যভিমানী তথা কথিত উচ্চ এবং কুসংস্কারাপন্ন তথা কথিত নিম্ন উভয় শ্রেণীরই অবশ্য পাঠ্য। ইহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষা এবং শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি বাস্তবিকই অত্যাচারী ও অত্যাচারপ্রাপ্ত উভয় শ্রেণীর প্রাণের ভিতর এক অভিনব ভাব আনয়ন করে। ইহার ভাব এত উদার, গবেষণা এত গভীর যে, এই পুস্তক যিনি একবার পাঠ করিবেন তিনি এই উদীয়মান এবং প্রতিভাবান্ লেখককে হিন্দু সমাজের প্রকৃত চক্ষুদাতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ব্রহ্মবিদ্যা—বর্ত্তমান সময়েও অনেক মহৎ ব্যক্তি এই জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসার জন্য নানারূপ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। এই গ্রন্থের যিনি লেখক তিনি এই শ্রেণীর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি। এই উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণটী যে কেবল গ্রন্থই লিখিয়াছেন তাহা নহে—সমাজ সেবার এই অত্যাবশ্যকীয় বিভাগে অর্থাৎ অবনত জাতির উন্নয়ন কার্য্যে তিনি পরিশ্রমও করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থখানি একজন কর্ম্মীর রচনা বলিয়া আদরের সহিত পঠনীয়। গ্রন্থকার যুগবাণীর একজন বিশেষ প্রচারক। গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণের যেরূপ ভাবে চিন্তা করা উচিত ঠিক সেই প্রণালীতেই চিন্তা করেন।

নীহার—গ্রন্থকার লোকাচারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় স্বাধীন মত প্রচারে সাহসী হইয়াছেন। তাঁহার উন্নত ভাব, স্বাধীনচিত্ততা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। গ্রন্থকার এমন উদারভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের উদার হৃদয় ও সমাজের শুভ চিন্তার

প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক কালে সকলেরই পাঠ করা উচিত। ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে।

যুগবার্ত্তা—প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য। লেখকের ভাব ও ভাষা গঙ্গা যমুনার ন্যায় মিশিয়া পাঠককে স্বদেশপ্রেমের পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত করিবে।

জাগরণ—লেখক স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মকথা সত্যই উপাদেয়। গ্রন্থকার প্রাণ দিয়া পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী। পুস্তকগুলিকে গৃহ-পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে দেখিতে চাই।

নায়ক—পুস্তিকাগুলি সুলিখিত। লেখকের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং লিখিবার ভঙ্গিটুকু বেশ। ভাষায় রাবীন্দ্র প্রভাব নাই, ইহাই অধিকতর প্রশংসার কথা।

উপাসনা—গ্রন্থকার শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর জন্য অমৃত তুলিয়া আনিয়াছেন।

যোগি-সখা—বর্ত্তমান গণতন্ত্রীযুগে আভিজাত্যের বৃথা আড়ম্বর যে নিশ্চিতরূপে বিড়ম্বিত হইবে, ইহা লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত উদারপ্রকৃতি নেতা সমাজ-সংস্কারে মনোযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দিগিন্দ্রবাবু অন্যতম। তিনি বিরাট হিন্দু সমাজের অন্তর্গত তথা কথিত অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জ্বলন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা যোগি-সখার পাঠকগণকে দিগিন্দ্রবাবুর পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সেবা—পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ শাস্ত্র ও যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা একান্ত প্রশংসনীয়, এতদ্বারা বঙ্গবাসীর বিশেষ কল্যাণ হইবে। নব্য শিক্ষিত কি

রক্ষণশীল প্রত্যেক বঙ্গবাসী নরনারীর ইহা একবার পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার তাঁহার আবেগময়ী ভাষায় তাঁহার প্রাণের দুঃখ উবারিয়া বলিয়াছেন।

সম্মিলনী—গ্রন্থকার তাঁর শাণিত শাস্ত্রীয় তরবারি দিয়া জাতিভেদের মিথ্যা বিগ্রহকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, জাতিভেদ যে অর্থে হিন্দু সমাজে প্রচলিত—তা কি মানুষ, কি ধর্ম্ম, কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, কি জাতীয়তা, কি স্বাধীনতা, কি প্রাণ, কি আত্মসম্মান, কি বুদ্ধি, কি হৃদয় সকলেরই বিরোধী। অতএব যতদিন না হিন্দু সমাজ জাতিভেদকে পদাঘাতে দূর করিয়া সেই শূন্য পীঠের উপর সাম্য প্রেম স্বাধীনতা এই ত্রিমূর্ত্তির দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, ততদিন তার সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ—নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয়। গ্রন্থকারের উদ্যম, অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা যত না চমৎকৃত হইয়াছি, তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হইয়াছি তাঁহার সহৃদয়তা ও ঔদার্য্য দেখিয়া একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রাহ্মণ যে সত্যের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব, সংস্কার ও সুবিধাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এ মহত্ত্ব ব্রাহ্মণেরই সাজে,—ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই সর্ব্বাগ্রে প্রত্যাশাই করা যায়। আমাদের প্রার্থনা, দিগিন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থখানি যেন বাংলার ঘরে ঘরে সেই বিপ্লবের বীজ বহন করে,—যাহাতে হিন্দু সমাজের কৃত্রিম অট্টালিকা অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইয়া তাহার উপর প্রকৃতির শ্যামলশ্রী আবার জাগিয়া উঠে।

উপাসনা—নব যুগের যে অগ্রদূতগণ সমগ্র জাতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র বাবুও তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার লেখা শুধু কথার কথা নয়, কথার পশ্চাতে কাজ আছে—অতএব কাজের কথা। দিগিন্দ্র বাবু, পতিত বলিয়া অভিহিত জাতিসমূহের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া সব্যসাচীর মত শাস্ত্র ও যুক্তি সমভাবে, সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন।

অদম্য উদ্যম লইয়া তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন—সমাজের সর্বস্তরে মিশিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক রচয়িতার উদ্দেশ্য মহৎ। সমাজের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দিগিন্দ্র বাবু জাতিভেদ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। প্রত্যেকটী অধ্যায়ে লেখকের গভীর গবেষণা, শাস্ত্রালোচনা ও লিপিচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের আবেগ এবং বিচার বুদ্ধি লইয়া রচিত এই পুস্তকখানি স্থানে স্থানে অনেকের পক্ষে সুখপাঠ্য না হইলেও সুপাঠ্য একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। গ্রন্থকার হৃদয়ের উষ্ণ রক্তে কতকগুলি নগ্নসত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! লেখককে তাঁহার কঠোর সত্যপরায়ণতা ও নির্ভীক দৃঢ়তার জন্য শতবার ধন্যবাদ প্রদান করি।

নারায়ণ—এই চারখানি পুস্তকে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে পড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে। যাঁহারা শুধু তিন গ্রন্থি পৈতার জোরে ব্রাহ্মণ সাজিয়া অপরের নিকট হইতে পূজার দাবী করিয়া বেড়ান, পরকে ছোট করাই যাঁহাদের বড় হইবার একমাত্র উপায়—তাঁহাদের নিকট এ পুস্তকগুলি বিভীষিকাময়। তাঁহারা যে পৈতা ছিঁড়িয়া গ্রন্থকারকে শাপ দিবেন ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমে তথা কথিত উচ্চ বর্ণের শ্রীচরণতলে দলিত ও মথিত হইয়া আসিতেছে, যাহারা চিরদিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, যাহারা সমাজের সেবা করিয়া পুরস্কার স্বরূপ লাথি ঝাঁটা পায়, যাহাদের বুক ফাটা কান্না মুখে ফুটিতে পায় না—তাহাদের নীরব প্রার্থনার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা হইলে, গ্রন্থকার ভগবানের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। সামাজিক বর্ণ বিভাগ যে মানুষেরই সৃষ্টি এবং প্রথমে যে আদর্শ লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছিল, অভিজাতবর্গ অহঙ্কারের বশে যে তাহা হইতে ভ্রষ্ট

হইয়া কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে, গ্রন্থকার অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। * * তবে নূতন সমাজ গঠন করিয়া বাঙ্গালায় যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন প্রয়াসী সেই বজ্রকঠোর ও পুষ্পকোমল যুবকবৃন্দকে আমরা এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

টাঙ্গাইল হিতৈষী—দিগিন্দ্র নারায়ণ পণ্ডিত জাতির বন্ধু। তিনি দীর্ঘ কাল হইতে অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি পাপের বিনাশসাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য তিনি দেশের ধন্যবাদের পাত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা—অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি সমাজ-শরীর হইতে অস্পৃশ্যতারূপ ঘৃণিত ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিতে গিয়া অনেক প্রকারে নির্য্যাতীত হইয়াছেন। * * অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা দোষ দূরীকরণ এবং তথাকথিত নিম্নজাতিকে সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অধিকার দিবার বিষয় অনেকে ভাবিতেছেন। * * সৌভাগ্যের বিষয় সমগ্র ভারতে এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্বে হইতেই বাঙ্গলা দেশের ২।৪ জন নিঃস্বার্থ নীরব কর্ম্মী অবনত শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দিগিন্দ্র বাবুও এই শ্রেণীর একজন নীরব কর্ম্মী। * * বিবেকানন্দের জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশে, ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে,—দুই কোটি বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে তথা কথিত উচ্চবর্ণীয়-দের নিকট অনাচরণীয় বলিয়া পরিত্যক্ত এক কোটি এগার লক্ষ বিভিন্ন জাতিকে সমাজে যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিবার জন্য, বাঙ্গলা দেশের জাগ্রত যুবকগণ কি কিছুই করিবেন না? এই সমগ্র বাঙ্গলা দেশে একমাত্র সিরাজগঞ্জের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে,

দীন-দরিদ্র-অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায় সমস্ত অধিকারের দাবী লইয়া চিরবধির হিন্দু সমাজের দ্বারে যোড়করে উপস্থিত হইতে দেখিতেছি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মুখপত্র "প্রতিজ্ঞা"—নিপীড়িত জাতির অভ্যুদয় ও উন্নতি চেষ্টায় যে অত্যল্প সংখ্যক বঙ্গবাসী আত্মমন নিয়োজিত করিয়াছেন তন্মধ্যে দেবহৃদয় ঋষিপ্রতিম কর্ম্মযোগী অটল স্বার্থত্যাগী বঙ্গীয় নিপীড়িত জাতির অকৃত্রিম সুহৃৎ একনিষ্ঠ সাধক দিগিন্দ্র নারায়ণের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই বিগতভী মহাপুরুষের বীরবাণী অলীক আভিজাত্য গর্ব্বিত পরশ্রীঅসহিষ্ণু তথা কথিত উচ্চ সমাজের অন্তস্থল প্রকম্পিত করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহার অমর গ্রন্থাবলীর অমৃত আস্বাদনে কেহই বঞ্চিত থাকিবেন না। আমরা আশা করি, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই এই যুগান্তরকারী লেখকের অতুলনীয় গ্রন্থরাজি স্বয়ং পাঠ করিয়া এবং অন্যকে শুনাইয়া লক্ষ লক্ষ নিদ্রিত প্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারে সহায়তা করিবেন। * * দিগিন্দ্র বাবু নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া সামাজিক আভিজাত্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এ দেশ আবার গৌরবচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইবে। বাঙ্গলার লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং দিগিন্দ্র নারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণ কুলোজ্জ্বলকারী মহাত্মাগণের সমপ্রাণতা নির্ম্মল জ্যোতি বিভাসিত নব প্রভাতের আগমনী বিঘোষী মধুর বিহঙ্গ কাকলীর ন্যায় দেশে নবযুগের নবীন উষার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে।

নীহার—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সুবক্তা ও সুলেখক দিগিন্দ্র বাবু (তৃতীয় বার কাঁথি) আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনে এতদঞ্চলে বিরাট সামাজিক সভানুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে। তিনি একাধারে সুবক্তা, সুলেখক, স্বদেশভক্ত, উদারহৃদয়, নানা শাস্ত্রবিদ্ ও বহুদর্শী পণ্ডিত।

স্বরাজ (পাবনা)—সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ অসহযোগী কর্ম্মী, অবজ্ঞাত নিম্ন শ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব দিগিন্দ্র বাবু "জাতিভেদাদি" নানা সুচিন্তিত

গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিয়া ইতঃপূর্বেই সুধীসমাজে পরিচিত হইয়া আছেন। দিগিন্দ্র বাবু তাঁহার কর্ম্মময় জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। নিন্দুকের আক্রমণ, সমাজের অত্যাচার, জেলের নির্য্যাতনকেই অঙ্গের চিরভূষণ করিয়া একান্তমনে একনিষ্ঠার সহিত তিনি দেশের সেবা করিয়া যাইতেছেন। যে পাপ ও দুর্নীতিকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান সমাজদেহ দাঁড়াইয়া আছে, দিগিন্দ্র বাবু তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া নূতন ভিত্তির উপর নবীন সমাজ-দেহ গড়িয়া তুলিতে চান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় বাস্তবিকই তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়রূপে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ কালাপাহাড়ের হয়ত এখন প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই জন্যই বুঝি দিগিন্দ্র বাবুর ন্যায় নির্ভীক তেজস্বী লেখক এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। দিগিন্দ্র বাবুর প্রত্যেক পুস্তকের ভিতরেই গভীর মানবপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। এই মানব প্রীতিরূপ উৎস হইতেই তাঁহার সমুদয় চিন্তা গবেষণা ও গ্রন্থাদির উদ্ভব। ভারতের মুক্তি মন্ত্রের উপাসক, দেশের একনিষ্ঠ সেবক উদারহৃদয় দিগিন্দ্র বাবুর সাধনা সফল হউক।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত 'বঙ্গীয় জন-সঙ্ঘ'	।০
শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য প্রণীত 'ব্রাহ্মণ শূদ্রের সঙ্ঘর্ষ'	⁄০
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল, প্রণীত 'মহাভারত মঞ্জরী'	৬৲

প্রাপ্তিস্থান—

১। গ্রন্থকার শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
দরিদ্রবান্ধব ঔষধালয়—সিরাজগঞ্জ।

২। শ্রীদামোদর দাস বি, এ, গ্রন্থপ্রকাশক
৩৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

৩। [illegible]
[illegible] কলিকাতা।

বিধবাবিবাহের আপত্তি খণ্ডন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহের আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন এ আন্দোলন কালের চক্রে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু তিনি যে ক্ষুদ্র বীজ বঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতে বপন করিয়াছিলেন আজ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া এক বিশাল মহীরুহের আকারে সমস্ত হিন্দুস্থানকে আবৃত করিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক নগরে, গ্রামে, এমন কি ক্ষুদ্র পল্লীতেও বিধবার বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। অনেকে এখনও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করে। প্রধান প্রধান কয়েকটী আপত্তির খণ্ডন নিম্নে সন্নিবেশ করা হইল।

(১) কেহ কেহ বলেন "বিধবার বিবাহ ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ। স্ত্রীর অদৃষ্টে বৈধব্য না থাকিলে কি স্বামী মরিত? কর্ম্মের গতি কে রোধ করিবে?" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পত্নী বিয়োগের পর যখন স্বামী পুনরায় বিবাহ করেন তখন তাঁহারা এই যুক্তিটী একেবারেই ভুলিয়া যান। স্ত্রীবিয়োগই যদি স্বামীর অদৃষ্টে থাকে এবং ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় তবে কেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ কার্য্য করেন? কর্ম্মানুসারেই বৈধব্য প্রাপ্তি ঘটে—কিন্তু তাহার অর্থ এ নয় যে ভবিষ্যতে আর বিবাহই করিবে না। বিপদ যখন আসিয়াছে তখন আর প্রতিকারের প্রয়োজন কি? রাস্তায় যদি কেহ হোঁচট খাইয়া পড়ে

তখন কি এই উপদেশ দিতে হইবে যে তোর অদৃষ্টেই পতন ছিল উত্থানের চেষ্টা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ? গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে বা ঝড়ে পড়িয়া গেলে কি বুঝিব, আর গৃহের প্রয়োজন নাই? রোগ হইলে কি চিকিৎসা করা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ? কত নিঃসন্তান পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বিবাহ করিয়া সন্তানের জনক হইয়াছে। ঈশ্বরের আজ্ঞা বিরুদ্ধ হইলে তাহাদের শতবার বিবাহেও সন্তান জন্মিত না। কত শত বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিয়া সন্তানের জননী হইতেছেন। ইহাও কি কর্ম্মের গতি ও ঈশ্বরেচ্ছা নয়? বিধবা বিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইলে বিধবার যৌবনোদ্গম বা মাসিক ঋতু হইত না।

(২) অনেকে বলেন "বিপত্নীক পুরুষ যদি পুনর্ব্বিবাহ করে তবে সেটা তাহাদের পক্ষে অন্যায়! তাই বলিয়া কি বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিবে! বিপত্নীকের বিবাহ বন্ধ কর। সমাজের পুরুষ যদি দোষী হয় তবে স্ত্রীকেও কি দোষ করিতে বাধ্য করিব?" ইহারা ভুলিয়া যান—বিধবা বিবাহ শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ শাস্ত্রে বিধবার বিবাহকে অধর্ম্ম না বলিয়া ধর্ম্মই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষে পুরুষে বিবাহ হয় না। যদি বিপত্নীক পুরুষগুলির পুনর্ব্বিবাহ অধর্ম্মই হয় তবে স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে দোষের ভাগিনী করিবার কি অধিকার তাঁহারা রাখেন? যদি পুনর্ব্বিবাহ করা পুরুষের পক্ষে দুর্ব্বলতা হয় তবে স্ত্রীর দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার দুর্ব্বলতাযুক্ত পুরুষের নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরং দেখা যায় স্ত্রীর সর্ব্বনাশ ও অধঃপতনের একমাত্র কারণ পুরুষ।

(৩) কেহ বলেন 'কলিযুগে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। আদিপুরাণে আছে—'ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা। কলৌ পঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥ অর্থাৎ বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃবধূতে সন্তানোৎপত্তি ও সন্ন্যাসধারণ এই পাঁচটী কলিযুগে

নষ্ট না করিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে তাঁহারা সময় ব্যয় করিতে বলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে ইহা সত্য নয়। পূর্ণ যুবাবস্থাতেও স্বামীর মৃত্যু হইতে পারে ও যুবতী স্ত্রীও বিধবা হইতে পারে। বাল্যবিবাহ বন্ধ হইলেও বিধবা দেশে থাকিবেই। দ্বিতীয়তঃ দেশে এখন কোটি কোটি বিধবা জীবিত আছে। তাহাদের কি উপায়? ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহ বন্ধ হইলে জীবিতা বিধবাদের বর্ত্তমান দুঃখ কেমন করিয়া দূর হইবে? তৃতীয়তঃ বাল্যবিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। মাতাপিতা পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বালিকা শিশুর অজ্ঞাতসারে ও ঘুমের ঘোরে যে সর্ব্বনাশ করিল —তাহাকে শাস্ত্রে বিবাহই বলে না। ইহা একটা ষড়যন্ত্র মামলা। নাবালিকা কন্যা, স্বামী কি পদার্থ তাহাই বুঝে না, তখন তাহার বিবাহ বোধই হয়না। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র মতে ইহা বাস্তবিক বিবাহ নহে। সুতরাং যাহার বিবাহই হয় নাই তাহার বৈধব্য কিরূপে ঘটিবে?

(৯) কেহ বলেন "বিধবা বিবাহ লোকাচার বিরুদ্ধ।" ইহারও কোন অর্থ নাই। প্রথমতঃ বঙ্গদেশের বাহিরে প্রত্যেক প্রদেশেই বিধবা বিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত। বঙ্গদেশেও প্রতিবৎসর শত শত বিধবা বিবাহ চলিতেছে। গত ৩ বৎসরে শুধু পাবনা জেলায়ই সাত শত বিধবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ লোকাচারের দোহাই দিলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মাপকাঠি লোকাচার য়—শাস্ত্র ও যুক্তি। যেস্থানে মাতাল, ব্যভিচারী, চোর ও মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বেশী সেস্থানে লোকাচারের দোহাই দিয়া মদ্যপান, ব্যভিচার চুরি ও মিথ্যাচরণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিলে এবং সদনুষ্ঠানকে লোকাচার বিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিলে সমাজের পতন অনিবার্য্য।

(১০) কেহ বলেন "দেশে স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। অবিবাহিতা কুমারীদের বিবাহ দেওয়াই এক সমস্যা—সুতরাং বিধবা বিবাহের প্রচলন হইলে কুমারীদের বিবাহের জন্য ছেলে পাওয়া দুষ্কর হইবে।

ই হারা জানেন না ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা কম ; পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সংযুক্তপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কম। বঙ্গদেশে নবশাখ, সাহা, কৈবর্ত্ত, নমশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ে মেয়ের সংখ্যা এত কম য কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই তাহাদের বংশ লোপ পাইবে। বঙ্গদেশে হাজারপুরুষে ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ত্রী ৯৯৫, কায়স্থ ৯৮৭ এবং বৈদ্য ৯৯২। বঙ্গদেশে বহু সম্প্রদায় আছে তাহাদের কন্যার সংখ্যা কম বলিয়া হাজার টাকা কন্যা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। বিবাহের টাকা উপার্জ্জন করিতে করিতে বরের বয়স ৩০।৩৫ হইল, এদিকে কন্যার পিতা টাকার লোভে শিশু কন্যাকে বৃদ্ধের কবলে ফেলিয়া দিল। কন্যা বয়স্থা হইতে হইতেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। ইহার ফলে একদিকে শিশু বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি—অন্যদিকে টাকার অভাবে বহু পুরুষ অবিবাহিতই থাকিয়া যায়। হিন্দুর বংশ এইভাবেই লোপ পাইতেছে।

(১১) অনেকে বলেন "বিধবা বিবাহ চলিলে স্ত্রীরা স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিবে না ও স্বামীকে গুপ্তহত্যা করিবে।" ইহাও অলীক কল্পনা। বিধবা বিবাহ প্রচলনের পূর্ব্বেই কি সকল স্ত্রী সকল স্বামীকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিত ? পুনর্ব্বিবাহের অধিকার থাকাতেও স্বামী যদি স্ত্রীকে গুপ্ত হত্যা না করিয়া ভালবাসিতে পারে—বিধবা বিবাহের প্রচলন হইলে স্ত্রীই বা স্বামীকে ভালবাসিতে পারিবে না কেন ?

(১২) কেহ বলেন-"ঘোর কলিকাল, তাই বিধবা বিবাহ আন্দোলন দেশে আসিয়াছে--নতুবা শাস্ত্রে কখনও বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা নাই।" এই শ্রেণীর লোক অনেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন ত দূরের কথা—শাস্ত্র চোখেই দেখেন নাই। ইহারা শুধু অন্যের মুখেই ঝাল খাইয়া থাকেন। বেদ স্মৃতি ও পুরাণে বিধবা বিবাহের পক্ষে অসংখ্য আদেশ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ বেদ—"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ। তৃতীয়োঃ

অগ্নিষ্টে পতিস্ তুরীয়াস্ত মনুষ্যজাঃ॥ (ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০, সুক্ত ৮৫ মন্ত্র ৪০), অর্থাৎ সোম প্রথমে প্রাপ্ত হয়, পুনরায় গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হয়, অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি এবং চতুর্থ মনুষ্য। এই মন্ত্রে পতির নাম চারিটী বলা হইল। প্রথম পতির নাম সোম, দ্বিতীয় গন্ধর্ব্ব, তৃতীয় অগ্নি এবং চতুর্থের নাম মনুষ্যজ। এই মন্ত্রে স্ত্রীর একাধিক পতি সিদ্ধ হইল। ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্তপ্রেমম্। ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্মৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ দেহি॥ (অথর্ব্ব বেদ, কাণ্ড ১৮, সুক্ত ৩, মন্ত্র ১) অর্থাৎ এই স্ত্রী পতিলোকের আকাঙ্ক্ষা করিয়া মৃতপতির পার্শ্বে আছে। হে মনুষ্য তোমার নিকট সে আসিতেছে। সে পুরাণ বা সনাতন ধর্ম্মের অনুগামিনী। ইহাকে এই লোকে বা স্থানে সন্তান ও ধনকে প্রাপ্ত করাও। তৈত্তিরীয় অরণ্যকেও এই মন্ত্রটী আছে। উদীর্ধ নার্য্যাভিজীবলোকং গতাসু মেতমুপশেব এহি। হস্তগ্রাভস্য দধিষোস্তবেদ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভুব॥" (অথর্ব্ব ১৮।৩২ ও ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮) অর্থাৎ হে নারী! তুমি মৃতপতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ; এই পতির পার্শ্ব হইতে উঠ; জীবিত পতির আকাঙ্ক্ষা কর; যে তোমাকে পুনর্ব্বিবাহ করিবার আশায় হস্ত ধারণ করিয়াছে তাহার জায়াত্ব প্রাপ্ত হও। দ্বিতীয়তঃ স্মৃতিঃ—যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বাপি স্বেচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্‌গত প্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মহতি। (মনুঃ—৯।১৭৫।১৭৬।১) যে স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করিয়াছে সে আপন ইচ্ছায় পুনর্ব্বিবাহ করিয়া যে পুত্র উৎপাদন করে সে জন্মদাতার পৌনর্ভব পুত্র। সেই স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি হয় ও দ্বিতীয় পতির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে দ্বিতীয় পতির সহিত পুনর্ব্বিবাহ সংস্কারের অধিকারিণী হয়।

মহর্ষি নারদও বিধবা বিবাহের আজ্ঞা দিতেছেন। কন্যাবাক্ষত-

যোনির্বা পাণিগ্রহণদূষিতা। পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ (নারদসংহিতা ১২।৪৬) অর্থাৎ কন্যাই হউক অথবা অক্ষতযোনি বাল-বিধবাই হউক যাহার শুধু বিবাহই হইয়াছে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ বলে। সে পুনর্ব্বিবাহ সংস্কারে অধিকারিণী। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন—যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সাপুনর্ভূর্ভবতি॥ (বশিষ্ঠ. অধ্যায় ১৭) অর্থাৎ নপুংসক পতিত, পাগল ও মৃত পতিকে ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। পাণিগ্রাহে মৃতে বলা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ (ঐ ১৭ অধ্যায়) অর্থাৎ বিবাহের পরেই যদি পতির মৃত্যু হয়, যদি শুধু মন্ত্র দ্বারাই তাহার সংস্কার হইয়া থাকে তবে সে অক্ষতযোনি, পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার আছে। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের বিধানও শাস্ত্রে এইরূপ অসংখ্য ব্যবস্থা আছে। ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের বিধানও শাস্ত্রে দুষ্প্রাপ্য নহে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষতা ও অক্ষতা দুইপ্রকার বিধবাকেই পুনর্ব্বিবাহের আদেশ দিতেছেন। অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। স্বৈরিণী বা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা আচার অধ্যায় ৬৭ শ্লোক)। স্ত্রী দুইপ্রকার—অনন্যপূর্ব্বা ও অন্যপূর্ব্বা। বিবাহের পূর্ব্বে অন্য পতির সহিত সম্বন্ধ না ঘটিলে সেই স্ত্রীর নাম অনন্যপূর্ব্বা এবং বিবাহের পূর্ব্বে অন্য পতির সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে সেই স্ত্রীর নাম অন্যপূর্ব্বা। অন্যপূর্ব্বা দুই প্রকারের—স্বৈরিণী ও পুনর্ভূ। যাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে। পুনর্ভূ দুই প্রকারের—ক্ষতা ও অক্ষতা। পূর্ব্বপতির সহিত সংযোগ ঘটিলে তাহাকে ক্ষতা এবং যাহার মাত্র বিবাহ সংস্কারই হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বপতির সহিত সংযোগ ঘটে নাই তাহাকে অক্ষতা বলে। এই দুই

প্রকার স্ত্রীকেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য "পুনঃ সংস্কৃতা" বা "পুনর্ভূ" বলিতেছেন —অর্থাৎ তাহারা পুনর্ব্বিবাহের অধিকারিণী। স্মৃতি শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের এইরূপ অসংখ্য বিধান আছে।

(১৩) অনেকে বলে "বিধবা বিবাহের প্রচলন না হইলে ক্ষতি কি?" চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই আর বুঝিতে বাকি নাই—বিধবা বিবাহের অভাবে অসংখ্য ক্ষতি হইতেছে। এখানে মাত্র ৫টার উল্লেখ করিলাম। ১ম—লোকক্ষয়; ২য়—ব্যভিচারের আধিক্য; ৩য়—বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি; ৪র্থ—ভ্রূণহত্যা এবং ৫ম—বিধবার প্রতি ক্রূরতা; ৬ষ্ঠ—গুণ্ডার অত্যাচার। নারীহরণ সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বর্ত্তমানে হিন্দুর লোক সংখ্যা ২১ কোটি ৭৩ লক্ষ। এক সময় সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু হিন্দুই বাস করিত। কমিতে কমিতে দুই তৃতীয়াংশ পড়িয়াছে। আট শত বৎসরে এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। হিন্দুর লোকক্ষয়ের কারণগুলি যেমন তেমনই বর্ত্তমান থাকিলে ভবিষ্যতে হিন্দুর শেষচিহ্নটুকুও ভারত হইতে মুছিয়া যাইবে। ভারতে বিধবার সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৷৷• কোটি। ইহার মধ্যে হিন্দু বিধবার অবস্থা অতি শোচনীয়। হিন্দু জাতি অসংখ্য উপ-জাতিতে বিভক্ত। বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে বিবাহযোগ্য পুরুষ হইতে বিবাহযোগ্য কন্যার সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে একদিকে বহু পুরুষ কন্যার অভাবে অবিবাহিত অন্যদিকে বহু কন্যা নিঃসন্তান বিধবা। হিন্দুর মধ্যে বিবাহযোগ্যা বিধবার তালিকা এইরূপ:

একমাস হইতে এক বৎসর বয়সের বিধবার সংখ্যা ৮৬৬, এক বৎসর হইতে ২ বৎসর ৭৫৫, দুই হইতে তিন ১৫৬৪, তিন হইতে চা'র ৩৯৮৭, চা'র হইতে পাঁচ ৭৬০৩, মাত্র ৫ বৎসরের ১৪৭৭৫, পাঁচ হইতে দশ ৭৭৫৮৫ এবং দশ হইতে ১৫ বৎসরের ১৮১৫০৭। ১৯১১ সনের

মনুষ্য গণনার বিবরণ হইতে জানা যায় ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত বিধবার সংখ্যা ৭ লক্ষ ২ হাজার।

২। অনেকে বলিয়া থাকেন "এইসব বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইয়া সমাজে থাকিলেই তো চলিয়া যায়!" কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ বুকে হাত দিয়া একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা কত কঠিন। শরীর বিধবা হইলেই মন বিধবা হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম নিয়মিত ভাবে চালাইবার জন্য এবং ব্যভিচার দমনের জন্যই বিবাহপ্রথার সৃষ্টি। বিধবা বিবাহের অভাবেই আজ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও মাতৃত্বের মস্তকে কুঠারাঘাত এবং ব্যভিচারের প্রসার। বিধবা বিবাহ বন্ধ করিলেই স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বন্ধ হইতে পারে না। সমাজে বিধবার জন্য কয়টী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে? বিধবার শিক্ষা দীক্ষার জন্য মাতাপিতা অভিভাবক কতটুকু চেষ্টা করিতেছেন? সমাজ আজ ব্যভিচার ও বিলাসের লীলাভূমি। (যাহার জনক জননী ভ্রাতা ভগ্নী ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ সে বিধবা কেমন করিয়া সহজেই "যোগিনী" হইতে পারে? পশু প্রকৃতি পুরুষ যে সমাজে অহর্নিশি কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায় বিধবা সে সমাজে কেমন করিয়া ব্রহ্মচারীণী থাকিতে পারে? ব্যাস, পরাশর, বিশ্বামিত্র, সর্ব্বত্যাগী মহাদেব এবং পিতামহ ব্রহ্মার মস্তকও যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় বিঘূর্ণিত হইয়াছে—তখন শিক্ষা দীক্ষা হীনা, বিকৃত সমাজে প্রতিপালিতা বিধবার নিকট হইতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আশা করা একরূপ বাতুলতা মাত্র। এত বাধা সত্ত্বেও যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্যের তরঙ্গসঙ্কুল গভীর পরীক্ষা সাগরে উত্তীর্ণা হন তিনি মানবী নহেন—দেবী। নিম্নলিখিত অবস্থাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি বিধবাকে ইন্দ্রিয় দমনের উপায়, যোগাভ্যাসের প্রণালী ও শুধু আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিখান হইত তবে কতকাংশে ব্রহ্মচর্য্য সম্ভবপর

হইত কিন্তু ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য ক্রীড়াকৌতুক নহে যে সকলেই শিখিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ যদি বিধবাগণকে পুরুষের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরাইয়া কোনও এক নির্জ্জন স্থানে রাখা হইত তবে ব্রহ্মচর্য্য কতকাংশে সম্ভব হইত কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা শুধু অসম্ভবই নয়, সংযম রক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা অধম উপায়। কাহারও জিহ্বা কাটিয়া যদি বলা যায় "ইনি বড় সত্যবাদী" তবে ইহা অপেক্ষা মিথ্যাচরণ আর নাই। ধর্ম্মপরায়ণতা আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মোগল বাদসাহগণ যখন কন্যাদের গৃহ কোণে বন্ধ রাখিত তখন দেখা যাইত—কঠিন হইতেও কঠিনতর পর্দ্দার আড়ালেও গুপ্ত ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত। তৃতীয়তঃ পুরুষ মাত্রেই যদি জিতেন্দ্রিয় হইত তবে ত কতকটা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের পক্ষে সুবিধা হইত কিন্তু সমগ্র নারীর পক্ষে "যোগিনী" হওয়া যেরূপ অসম্ভব—সমগ্র পুরুষের পক্ষে "যোগী" হওয়াও সেইরূপই অসম্ভব।)

৩। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় তৃতীয় ক্ষতি বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। ভারতের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এক ভয়াবহ বিভৎস দৃশ্য সম্মুখে আসে। প্রত্যেক নগরের মুখ্য গলি ও বাজার আজ বেশ্যার বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, প্রয়াগ, কাশী ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি সহরের প্রায় স্থানেই বড় বড় ধনী, ব্যাপারী ও মহাজনের মাথার উপরে বেশ্যা বসিয়া আছে। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও দ্বারকার ন্যায় তীর্থস্থানে প্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য সহস্র সহস্র বেশ্যা দিন দিন আধিপত্য জমাইয়া বসিতেছে। ইহারা সব কোথা হইতে আসিল? ইতিহাস সংগ্রহ করিলে জানা যাইবে—ইহাদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে বৈধব্য-পীড়িত বিধবার মধ্য হইতে আসিয়াছে। ইহারা নিজে ত মজিয়াছেই—মজাইছে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। ইহারা বৃদ্ধাবস্থায় জীবিকা সংস্থানের জন্য নানারূপ গুপ্ত উপায়ে সমাজ

হইতে যুবতী বিধবাকে প্রলোভন দিয়া বেশ্যা পল্লীতে লইয়া আসে ও নিজের জাতি কুটুম্ব বাড়াইতে থাকে।

৪। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় ৪র্থ ক্ষতি ভ্রূণহত্যা ও শিশুহত্যা। হিন্দুশাস্ত্রে ভ্রূণহত্যা মহাপাতকের মধ্যে গণ্য। ইংরাজ-রাজ্যেও ভ্রূণহত্যা এবং শিশুহত্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু কঠিন নিয়ম এবং কঠিন শাস্তিই পাপকে বন্ধ করিতে পারে না। কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ। কারণের অভাব যতদিন না হইবে ততদিন কার্য্যের অভাব হইবে না। বৃক্ষের বিনাশ করিতে হইলে মূলের বিনাশ চাই। যতদিন বিধবা রূপী মূল থাকিবে ততদিন ভ্রূণহত্যা ও শিশুবধরূপী বৃক্ষ থাকিবেই। ভারতে প্রতিদিন সহস্র গর্ভপাত হয়। এমন পল্লী নাই, যেখানে ভ্রূণহত্যা না হইয়াছে। তীর্থস্থানগুলি আজকাল গর্ভপাত ও শিশুপাল বধের মশানরূপে পরিণত হইয়াছে। বহু স্থানে মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন, বংশের "মান মর্য্যাদা" রক্ষার-জন্য গর্ভবতী বিধবাকে বা গর্ভস্থ সন্তানকে বিষ প্রয়োগে গুপ্তহত্যা করিয়া থাকে। কখনও বা বিধবা তাহার নবজাত শিশুকে হত্যা করিতে যায় কিন্তু তাহার হস্ত আরষ্ট হইয়া যায়—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন সে বিশ্বপিতার উপর নির্ভর করিয়া শিশুকে রাজপথে, নদীতীরে বা শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে রাখিয়া আসে। এইরূপ কত ঘটনা পুলিসের ডাইরীভুক্ত হইয়া যায় এবং কত পণ্ডিত, জমিদার, সমাজপতি ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পরে। পশুপক্ষীরাও আপন সন্তানকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করে কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সামাজিক দুর্ব্বলতার জন্য এইরূপ ক্রূরতা করিতে বাধ্য হয় ও সমাজের মধ্যে প্রেম ভালবাসার পরিবর্ত্তে হিংসা ও নিষ্ঠুরতার বিষবায়ু সঞ্চয় করে।

৫। বিধবা বিবাহের প্রচলন না হওয়ায় পঞ্চম ক্ষতি বিধবাদের প্রতি নানারূপ নিষ্ঠুর আচরণ। মাতার পুত্র দেহত্যাগ করিলে মাতা কখনও

বলিবে না যে তাহার নিজের দুর্ভাগ্যেই পুত্রের মৃত্যু হইল। কিন্তু সকলেই একসঙ্গে কর্কশ কটূক্তি করিয়া বলিবে "স্ত্রীর দুর্ভাগ্যেই উহার অকাল মৃত্যু ঘটিল"। পুরুষ মনে করে যে ইন্দ্রিয় দমন তাহাদের পক্ষে খুবই সরল কিন্তু বাধা শুধু বিধবার রূপ ও যৌবন। তাই ব্রহ্মচর্য্যের নামে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করা হয়, অলঙ্কার ছিনিয়া লওয়া হয়, নিরামিষ ভোজন, অর্দ্ধাহার ও নির্জ্জলা একাদশীর ব্যবস্থা করা হয়, স্বল্প বস্ত্রে লজ্জা নিবারণের আদেশ দেওয়া হয়। বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে অমঙ্গল হইবে বলিয়া তাহাকে বহিষ্কার করিয়া রাখা হয়। কেহ বলেন "এ সবই বিধবার আত্মোন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এরূপ না করিলে তাহারা বিলাসিতার মোহে নিমজ্জিত হইবে, পরকালের জন্য সব কষ্টই সহ্য করা উচিত। বুঝিতে পারিনা—ইহারা পরকাল ও আত্মোন্নতি কাহাকে বলেন। গুপ্ত ব্যভিচার, গর্ভপাত ও বালহত্যার মহাপাপে ভীত না হইয়া ইহারা আত্মোন্নতির অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। যে বিধবার ইহজীবনে মাতৃত্বের পথ বন্ধ করিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের নামে ঘৃণা, অশান্তি ও কঠোরতার চিতা বহ্নিতে দগ্ধ করা হইতেছে—সে বিধবা পরকালে কোথায় শান্তি পাইবে জানিনা। ইহজীবনে যাহার আত্মগৌরব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল সে পরজন্মে গোলাম হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। একদিকে নির্জ্জলা একদশীর কঠোর পীড়নে শত সহস্র বালবিধবার কচি প্রাণ গ্রীষ্মের অগ্নিদাহী জ্বালায় একবিন্দু জলের অভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে অন্যদিকে বিধবার মাতাপিতা ভ্রাতা ভগ্নী চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আস্বাদন করিয়া থাকে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাই লিখিয়াছেন—

> "সুজলা এই বাংলা দেশে কে ক'রেছে সৃষ্টিরে।
> নির্জ্জলা ঐ একাদশী কোন দানবের দৃষ্টিরে॥
> শুকিয়ে গেল শুকিয়ে গেল পুড়ে গেল বাংলা দেশ।
> মাতৃজাতির নিঃশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ॥"

৬। বিধবা বিবাহের প্রচলন না হওয়ায় ষষ্ঠ ক্ষতি—নারীহরণ ও নারী ধর্ষণ। বিধবাকে শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী ও ননদের কটূক্তি লাঞ্ছনা এবং পিত্রালয়ে ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা ও অত্যাচার সহ্য করিয়া কাটাইতে হয়। গুণ্ডা বদমায়েস অসহায়া বিধবার নির্য্যাতনের সুবিধা লইয়া অনেক সময় দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে অপহরণ করে। গুণ্ডার হস্ত হইতে নারীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেও সমাজ, আত্মীয় স্বজন, মাতাপিতা এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণের হুঁকা মুসলমান স্পর্শ করিলে যেমন আস্তাকুড়ায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, আমাদের মাতা ভগ্নীকেও গুণ্ডা স্পর্শ করিলে ঠিক তেমনই অস্থানে কুস্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তখন সে নারীর স্থান পাদ্রীর গির্জ্জায়, মৌলবীর মসজিদে না হয় বেশ্যাপল্লীতে। বিধবাকে পাত্রস্থা করিলে এইরূপ কলঙ্ক, দুর্ঘটনা ও উদ্বেগের হস্ত হইতে একরূপ নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

(১৪) অনেকে বলেন "উচ্চজাতি বিধবা বিবাহ করিলে তবে নিম্নজাতি বিধবা বিবাহ করিবে। গণ্যমান্য লোকের মধ্যেই বা কে বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেছে?" ইহারা জানেন না প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে কয়েক সহস্র করিয়া বিধবার বিবাহ হইতেছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির মধ্য হইতেই অর্দ্ধেকের বেশী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন করেন। তাহার নিজ পুত্রকে বিধবার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিবাহ করিয়াছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে। সেদিনও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিধবা কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ইহা ছাড়া মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বর্ত্তমানের সমাজ সংস্কারকামী দেশহিতৈষী সকল নেতাই বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী।

বৈদিক সন্ধ্যা বিধি

ও

গায়ত্রী ব্যাখ্যা

শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী,
প্রচার মন্ত্রী, বঙ্গ-আসাম আর্য্যপ্রতিনিধি সভা
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ
কর্ম্মাধ্যক্ষ, আর্য্য-গৌরব—মাসিক পত্র
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩য় সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৩৮

মূল্য এক আনা

উপক্রমণিকা

ভগবান বেদমন্ত্রদ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে উপদেশ দিতেছেন—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্ম রাজণ্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়

চারণায় চ। (যজুর্ব্বেদ ২৬২)

এই চারি বেদরূপ কল্যাণদায়িনী বাণী আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য সকলের জন্যই প্রদান করিয়াছি।" তাই একদিন সমগ্র আর্য্য বালক-বৃদ্ধ-যুবা-নরনারী বেদমন্ত্রের আশ্রয়ে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া সেই বিশ্বপিতা, জগতের নিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তির মূল কেন্দ্র পরমাত্মাকে প্রাণ ভরিয়া উপাসনা করিত। আর্য্যজাতি তখন স্বাধীন-সবল জ্ঞানী-কর্ম্মী ও ভক্তরূপে জগতের নিকট পূজিত, সম্মানিত ও আদৃত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আর্য্যজাতির! ভারতের এক বর্ব্বর যুগে—বিরাট অখণ্ড জাতি সহস্র সম্প্রদায়ে ও লক্ষ উপজাতিতে বিভক্ত হইল, এক উপাস্য দেবতা ভগবানকে ভুলিয়া শত সহস্র ভগবানের এবং এক বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রকে ভুলিয়া শত শত অপ-মন্ত্রের সৃষ্টি করিল। একদল স্বার্থপর ভণ্ড প্রচার করিতে লাগিল "বেদমন্ত্র শূদ্র পড়িলে বা শুনিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিবে। বেদ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া। শূদ্র বামুনের "ফাটা চরণের ধূলো" বালতি বালতি জলে মিশাইয়া পান করিলেই চৌদ্দপুরুষ স্বর্গে যাইবে।" তাহারা নিজেকে কেহ ভূদেব, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ভগবানের দালাল বা ঠিকেদার বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিল এবং "দ্বিজদাস" শূদ্রের স্বর্গ-নরকের চাবি কাঠি দখল করিয়া বসিল। তাহারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ নাম "ওঁ" ওঙ্কারকে ভুলাইয়া "নমঃ" অর্থাৎ নমস্কার শিখাইতে লাগিল। বেদমাতা গায়ত্রী ভুলাইয়া কাম-গায়ত্রী, ক্রোধ-গায়ত্রী, দুর্গা-গায়ত্রী, রাহু-কেতু-শিব-গায়ত্রীর প্রচার করিতে লাগিল। বেদমন্ত্র ভুলাইয়া "হিরিম্-ক্রীম্-ফুট-

ফাট্ স্বাহা" প্রভৃতি ভূতুরে মন্ত্র কাণের ভিতর চুপে চুপে দিয়া কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। শূদ্রজাতি জালিয়াৎ-যাদুকরের ঐ সব মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাই প্রাণ ভরিয়া জপ করিতে লাগিল। এ দিকে শূদ্রের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া ভগবানের বরপুত্র বামুণেরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল। কোটি কোটি ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ প্লাবনে বেদ ভুলিল, সন্ধ্যা ভুলিল, এমন কি গায়ত্রী ভুলিল। বৌদ্ধ প্লাবনের পর বৌদ্ধদের নকল করিয়া ব্রাহ্মণ দুই বেলার স্থানে তিন বেলা করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিল। গায়ত্রীকে বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা এই তিনরূপে কল্পনা করিল। এমন কি পতিতপাবনী সর্ব্ব-পাপ-বিনাশিনী গায়ত্রীকে অভিশপ্তা মনে করিয়া নিজেরা মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রীকে শাপ হইতে উদ্ধার করিতে লাগিল। কি স্পর্দ্ধা! আরাধ্যা গায়ত্রীকে নিজেরাই দয়া করিয়া উদ্ধার করিতে ব্রতী হইল। বেদ আজ বহু বামুন চর্ম্মচক্ষুতেই দেখে নাই—বৈদিক সন্ধ্যাও ভুলিয়া গিয়াছে—আজও তাহারা গায়ত্রীকে কেহ কেহ সন্ধ্যা করিতে বসিয়া শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ধন্য করিতেছে। যে বৈদিক সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া ভারতের কত বেশ্যাপুত্র-বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াছে, দাসীপুত্র নারদ দেবর্ষি হইয়াছে, দাস ধীবরজাতীয় ব্যাস মহাপণ্ডিত হইয়াছে—সে বৈদিক সন্ধ্যা গেল কোথায়? সে উপাসনা পদ্ধতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই, বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের কোনও কোনও স্থানে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দুই এক জন এতদিনেও কত বিপ্লব, দুর্য্যোগ ও ঝটিকা সহ্য করিয়া সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষি-যুগের সন্ধ্যা-উপাসনা পদ্ধতিকে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট—এমন কি ব্রাহ্মণ নামধারী-দের নিকটেও তাহা অজ্ঞাত ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাট প্রদেশে মহাপুরুষ—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়া পদদলিত শূদ্রজাতিকে অভয় বাণী শুনাইলেন "বেদ ও ভগবান শুধু ব্রাহ্মণের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী নরনারীর।" তাঁহার এই রুদ্র আহ্বানে শূদ্রজাতির নিদ্রা-ভঙ্গ হইল! উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লক্ষ লক্ষ শূদ্র-কথিত হি দ্বিজন্দুত্ব

গ্রহণ করিল, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিল। তিনি সকলকে বৈদিক সন্ধ্যা শিখাইলেন। সে আজ ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দেখিতে দেখিতে বঙ্গ-দেশেও সে ঢেউ আসিয়া পৌছিল।

বাঙ্গালার কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ হইতে নমঃশূদ্র, মুচি, মেথর পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু আজ শূদ্রত্ব বা গোলামী পরিহার করিয়া দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতেছে। বাঙ্গালার স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন! তুমি আজ প্রেতলোকে কি ব্রহ্মলোকে জানি না। একদিন নবদ্বীপের টোলে বসিয়া ঘোষণা করিয়াছিলে—"বাঙ্গালা দেশে সকলেই শূদ্র, কেবল আমরাই দুই চারি জন সনাতন-ধর্ম্মের মৌরশী পাট্টাদার বামুন আছি। দেখিয়া যাও, আজ বাঙ্গালার সমগ্র "শূদ্র' তোমার স্মৃতির বিধি লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, তোমার তিপান্ন পুরুষ যে বৈদিক সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছিল সেই বেদমন্ত্রে সন্ধ্যা উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে।

বৈদিক সন্ধ্যাবিধি

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবার বিধান আছে সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটী হইল "ব্রহ্মযজ্ঞ বা সন্ধ্যা"। যজ্ঞ অর্থে সদনুষ্ঠান। প্রত্যহ (১) ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা, ঈশ্বর-স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা; (২) দেবযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম; (৩) পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ জীবিত মাতাপিতা ও আচার্য্যের শ্রদ্ধার সহিত সেবা; (৪) ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পশুপক্ষী কীটাদিকে আহার্য্য প্রদান এবং (৫) অতিথিযজ্ঞ অর্থাৎ অভ্যাগত সৎপুরুষের সেবা করা—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠানেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে দুই ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে দুই ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত এই দুই সময়ের মধ্যেই দুইবার সন্ধ্যা করা প্রশস্ত। শুদ্ধ ও শান্ত হইয়া

স্থির আসনে বসিয়া প্রথমে আচমন, প্রাণায়াম ও শিখা বন্ধন করিবে।

আচমন—দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া নিম্নলিখিত তিনটী মন্ত্রে তিনবার যথাক্রমে আচমন করিবে—

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা।

অর্থ :—হে ঈশ্বর! আপনি জীবের আশ্রয়দাতা ও পালনকর্ত্তা। কৃপা করিয়া আমাকে সত্য, কীর্ত্তি, শোভা ও ধন প্রদান করুন। (আশ্বালয়ণ গৃ—সূ—অ—১। ক ২৪।)

প্রাণায়াম—ভিতরের বায়ু নাশারন্ধ্র পথে সজোরে বাহিরে আনিয়া যথাশক্তি শ্বাস বন্ধ রাখিতে হইবে, পুনরায় ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভিতরে যথাশক্তি বন্ধ রাখিয়া ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে একবার প্রাণায়াম হইবে। এই প্রাণায়াম তিনবার করিতে হইবে। প্রাণায়ামে মন প্রফুল্ল, চিত্তশান্ত, শরীর বলযুক্ত হয়।

শিখা-বন্ধন—নিম্নলিখিত গায়ত্রী দ্বারা শিখা বন্ধন করিতে হইবে। শিখায় বাতাস লাগিয়া মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া শিখা বন্ধন করা হয়। শিখা আর্য্য-জাতির বাহ্য চিহ্ন মাত্র।

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থ :—ওঁ (পরমেশ্বর) ভূঃ (যিনি প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ) ভুবঃ (সর্ব্ব দুঃখবিনাশক) স্বঃ (সুখদাতা সুখস্বরূপ) সবিতুঃ (সমস্ত জগতের উৎপাদক) দেবস্য (পরমাত্মার) বরেণ্য (অতি শ্রেষ্ঠ, গ্রহণ ও ধ্যান করিবার যোগ্য)

ভর্গঃ (সর্ব্ব ক্লেশনাশক, পবিত্র ও শুদ্ধস্বরূপ) তৎ (তাহাকে আমরা) ধীমহি (ধারণ করি) যঃ (যে পরমাত্মা) নঃ (আমাদের) ধিয়ঃ (বুদ্ধিকে উত্তম গুণ ও স্বভাবের দিকে) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণা করেন)।

হে প্রাণদাতা, দুঃখনাশক, আনন্দস্বরূপ প্রভো! আপনি সমস্ত জগতের উৎপাদক, পূজনীয়তম, পাপ-দুঃখ-ক্লেশ-তাপনাশক ও বিজ্ঞান-স্বরূপ। আমরা আপনার গুণ ও স্বভাবকে মনদ্বারা ধারণ করিতেছি, আমাদের বুদ্ধিকে বৃদ্ধি করিয়া দিন। [যজুর্ব্বেদ অ ৩, ম ৩৫। অথর্ব্ব ৩৬, ম ৫। ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০। সাম ৬।৩।১০]

সন্ধ্যা-আরম্ভ

আচমন—নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা ৩ বার আচমন করিবে। আচমনে শ্লেষ্মার নিবৃত্তি হয়।

১। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

অর্থ। সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশক পরমেশ্বর বাঞ্ছিত ফল ও আনন্দ প্রদান করিয়া আমাদের কল্যাণকারী হউন এবং আমাদের উপর সর্ব্বদা সুখ বর্ষণ করুন। [যজুর্ব্বেদ অধ্যায় ৩৬, মন্ত্র ১২]

ইন্দ্রিয় স্পর্শ—নিম্ন লিখিত মন্ত্রে জল দ্বারা যথাক্রমে একে একে মুখ, নাক, চক্ষু, কর্ণ, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, বাহুদ্বয়, করতল ও করপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ ও মন শান্ত হয়।

২। ওঁ বাক্ বাক্। ওঁ প্রাণঃ প্রাণঃ। ওঁ চক্ষুঃ চক্ষুঃ
ওঁ শ্রোত্রম্ শ্রোত্রম্। ওঁ নাভিঃ। ওঁ হৃদয়ম্।
ওঁ কণ্ঠঃ। ও শিরঃ। ওঁ বাহুভ্যাং যশোবলম্।
ও করতল করপৃষ্ঠে।

অর্থঃ—হে ঈশ্বর আমার বাণী, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তককে বলবান কর। আমাদের দুই বাহুতে যশ ও শক্তি দাও; করতল ও করপৃষ্ঠ দ্বারা ধর্ম্ম কার্য্য করিব।

মার্জ্জন—নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা হাতে জল লইয়া যথাক্রমে একে একে মস্তক, চক্ষু, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, পদ ও মস্তকের উপর জল ছিটাইয়া দিবে। প্রথম দক্ষিণ, তৎপর বাম অঙ্গ স্পর্শ করিবে। এক এক মন্ত্র দ্বারা এক একঅঙ্গে মনঃ সংযোগ করিলে সঙ্কল্প শক্তির বৃদ্ধি হয়।

৩ ওঁ ভূঃ পুনাতু শিরসি। ওঁ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ। ওঁ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে। ওঁ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে। ওঁ জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্। ওঁ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ। ওঁ সত্যং পুনাতু পুনঃ শিরসি। ওঁ খং ব্রহ্ম পুনাতু সর্ব্বত্র॥

অর্থঃ—হে ঈশ্বর! তুমি আমার মস্তক, নেত্র, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, পদযুগল ও মস্তকাদি সকল অঙ্গকেই পবিত্র ও বলবান কর।

৪। ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ। ওঁ স্বঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ। ওঁ তপঃ। ওঁ সত্যম্।

অর্থঃ—ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকলের পিতা, সর্ব্বজ্ঞ ও অবিনাশী।

অঘমর্ষণ—নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমকে মনন করিবে। অঘ অর্থে পাপ ও মর্ষণ অর্থে দূর করা। সৃষ্টি তত্ত্ব চিন্তা করিলে পাপ পলায়ন করে।

৫। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।

অর্থ ঃ—জ্ঞানময় ও অনন্ত শক্তিশালী ঈশ্বর হইতে বেদ ও কার্য্যরূপ প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার সামর্থ্য হইতেই প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকৃত

অবস্থা ও সূক্ষ্ম জল উৎপন্ন হইয়াছে। [ঋগ্বেদ ম ১০। সূ ১৯০। মন্ত্র ৩]

৬। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী।

অর্থ:—জগতের শাসনকর্ত্তা পরমেশ্বর আপন সহজ স্বভাব হইতে ঐ সূক্ষ্মজলের পর কালের বিভাগ অর্থাৎ দিন ও রাত্রির গতি উৎপন্ন করিলেন। [ঋগ্বেদ মং ১০। সূক্ত ১৯০। মন্ত্র ২ ॥

৭। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

অর্থ:—বিধাতা প্রথম কল্পের ন্যায়ই পূর্ব্ববৎ সূর্য্য,চন্দ্র,দিব্যলোক,পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষ এবং অন্য লোকান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। [ঋগ্বেদ মং ১০। সূ ১৯০। মন্ত্র ৩]

মনদ্বারা পরিক্রমা—১নং মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া নিম্ন লিখিত দুইটী মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের ব্যাপকতা মনে মনে চিন্তা করিবে। ইহাতে আত্মিক বল ও ঈশ্বর-ভক্তি জন্মিবে।

৮। ওঁ প্রাচীদিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যোনম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভেদধ্মঃ।

অর্থ:—হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! আপনি আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন। আপনি স্বাধীন, রাজা ও রক্ষাকর্ত্তা। সূর্য্যকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিরণ দ্বারা পৃথিবীর উপর জীব উৎপন্ন হয়। আপনার আধিপত্য, রক্ষা ও জীবন প্রদানের জন্য প্রভো! আপনাকে বার বার নমস্কার করি। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে কিংবা যাহাকে আমরা দ্বেষ করি তাহাকে আমরা আপনার ন্যায় বিচারের উপর ছাড়িয়া দিতেছি (যাহাতে তাহারা ও আমরা মিত্ররূপে পরিণত হইতে পারি)। অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। ম ১॥

৯। ওঁ দক্ষিণা দিগিন্দ্রোঽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতর ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ। ২

অর্থ :—হে পরমেশ্বর! আপনি দক্ষিণদিকেও বিদ্যমান আছেন। আপনিই আমাদের রাজাধিরাজ ; আপনি বক্রগামী প্রাণীসমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আপনার———পূর্ব্ববৎ। [অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। ম ২]

১০। ওঁ প্রতীচীদিগ্বরুণোঽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যো ঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ। ৩

অর্থ :—হে সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার! আপনি আমার পশ্চাৎদিকে আছেন। আপনি আমাদের মহারাজা। বড় বড় বিষধর প্রাণী হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছেন, আমার প্রাণকে অন্ন দ্বারা বাঁচাইতেছেন, আপনার—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। [অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। ম ৩]

১১। ওঁ উদীচীদিক্ সোমোঽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাঽশনি রিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যোঅস্তু যো অস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ। ৪

অর্থ :—হে পিতা আপনি আমার বামদিকে সোম নামে ব্যাপক আছেন ; আপনি আমার পরম স্বামী ; আপনি স্বয়ম্ভু ; আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা ; আপনিই তড়িৎ শক্তির দ্বারা আমার রক্তের গতি এবং প্রাণরক্ষা করিতেছেন। আপনার—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ [অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। ম ৪]

১২। ওঁ ধ্রুবাদিগ্বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যোনমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু, যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ।৫

অর্থঃ—হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর! আপনি আমার নিম্নদিকে বিদ্যমান আছেন। আপনি আমার রাজা; আপনি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ লতাদি দ্বারা আমার প্রাণকে রক্ষা করিতেছেন, কৃষ্ণ গ্রীবাযুক্ত দুষ্ট প্রাণী হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনার—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। [অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। ম ৫॥]

১৩। ওঁ ঊর্দ্ধাদিগ্ বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ তেভ্যোনমো অধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ। ৬

অর্থঃ—হে মহান্ প্রভো! আপনি উপরেও ব্যাপক। আপনি পবিত্র আত্মরূপী স্বামী। কুষ্ঠাদি ভয়ঙ্কর রোগ হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি বর্ষণ করিয়া যে কৃষি সিঞ্চন করিতেছেন তদ্দ্বারাই আমাদের জীবন সঞ্চার হয়। আপনার—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। [অথর্ব্ব কা ৩। সূ ২৭। মন্ত্র ৬॥]

উপস্থান—নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তেজোস্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান করিবে। 'উপ' অর্থে নিকটে, 'স্থান' অর্থে অবস্থান করা—ভগবানের গুণ চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া।

১৪। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা।

অর্থঃ—হে ঈশ্বর আপনি বিদ্বান্দের হৃদয়ে বিস্ময় কর এবং শ্রেষ্ঠ; আপনি মিত্র, বরেণ্য, তেজস্বী ও বিদ্বান্দের চক্ষুস্বরূপ; দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ

লোকের ধারণ কর্ত্তা; চর ও অচর প্রাণীদের উৎপাদক ও আত্মা। আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। [যজুর্ব্বেদ অ ১৩, ম ৪৬॥]

১৫। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।

অর্থ :—হে জগদীশ্বর! আপনি বেদের উৎপাদক ও প্রকাশস্বরূপ; আপনার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য সংসারের পদার্থ সমূহ পতাকার কার্য্য করিতেছে। [যজুর্ব্বেদ অ ৩৩। ম ৩১॥]

১৬। ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।

অর্থঃ—হে প্রভো! আপনি অজ্ঞান অন্ধকারের পরপারে সুখস্বরূপ প্রলয়ের পরপারে দিব্যগুণযুক্ত। সর্ব্বত্র বিদ্বান্‌দের এবং ধর্ম্মাত্মাদের মুক্তি-দাতা। আপনাকে এইরূপ ভাবে জানিয়া বা দেখিয়া যেন আপনার উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই। [যজুর্ব্বেদ অ ৩৫। ম ১৪]

১৭ ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ
শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্ ভূয়শ্চ
শরদঃ শতাৎ॥

অর্থ :—হে সর্ব্বদ্রষ্টা! আপনি অনাদিকাল হইতে সর্ব্বজ্ঞ ও সংসারের হিতের জন্য শুদ্ধরূপে বর্ত্তমান। প্রভো! আমরা আপনার মহিমাকে শত বৎসর যেন দেখি, শত বৎসর যেন বাঁচিয়া থাকি, শত বৎসর যেন আপনার আজ্ঞা শুনিতে পারি, শত বৎসর যেন আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি, শত বৎসর যেন পরাধীন না হইয়া বাঁচি এবং শত বৎসরের অধিক বাঁচিয়া থাকিলেও যেন এই ভাবেই থাকিতে পারি। [যজু অ ৩৬, ম ২৪।

গায়ত্রী মন্ত্র—১নং মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে ও গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিয়া জপ করিবে।

১৮। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

নমস্কার—১নং মন্ত্রে তিনবার আচমন করিয়া নিম্ন মন্ত্রে নমস্কার করিবে—**১৯। ওঁ নমঃ শম্ভবায়চ ময়োভবায়চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায়চ নমঃ শিবায়চ শিবতরায় চ॥**

অর্থ :—আমি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, কল্যাণকারী, সুখদাতা, মঙ্গলময় ও অশেষ কল্যাণকারী ঈশ্বরকে নমস্কার করি। [যজু অ ১৬, ম ৪১॥]

গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদেই গায়ত্রী মন্ত্র বিদ্যমান (ঋগ্বেদ, ৩।৬২।১০ ; যজুর্ব্বেদ, ৩।৩৫ ; সামবেদ, ৬।৩।১০ ; অথর্ব্ব বেদ, ৩।৬।৫ দ্রষ্টব্য)। গায়ত্রীই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র, তাই গায়ত্রীকে বেদমাতা বলে। পরমাত্মার উপাসনার জন্য গায়ত্রীই সিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র, এ জন্য ইহাকে গুরু-মন্ত্রও বলে। গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ। গায়ৎ+ত্রৈ+ক (গায়ন্তং ত্রায়তে), স্ত্রীত্বম্। গায়ৎ বা গানকারীকে ত্রাণ করে বলিয়াই ইহার নাম গায়ত্রী। ব্রহ্মই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। সমগ্র বেদ ও উপনিষদের যাবতীয় জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে গায়ত্রীতে বিদ্যমান আছে। গায়ত্রী মন্ত্রে দশটী শব্দ আছে যথা তৎ, সবিতুঃ, বরেণ্যম্, ভর্গঃ, দেবস্য, ধীমহি, ধিয়ঃ, যঃ, নঃ, প্রচোদয়াৎ। সন্ধি করিলে হইবে এইরূপ "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"॥ গায়ত্রী মন্ত্রের ছন্দের নামও গায়ত্রী। সন্ধি করিয়া পাঠ না করিলে ভুল হইবে। গায়ত্রীর পূর্ব্বে তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূঃ, ভুর্বঃ, স্বঃ (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। প্রত্যেক বেদ মন্ত্রের পূর্ব্বে ওম্ (ওঁ) শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাকে প্রণব বলে। প্রণব ও তিন

মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বে যোগ করিয়া দিলে গায়ত্রী মন্ত্র এইরূপ হইল—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

গায়ত্রী ছন্দের তিনটী পাদ, চতুর্থ পাদ নাই। তিন পাদে বিভক্ত করিলে এইরূপ হইবে—

(১) তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং॥ (২) ভর্গো দেবস্য ধীমহি॥ (৩) ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

প্রত্যেক পদে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকা উচিত। ২য় ও ৩য় পাদে ৮টী করিয়া অক্ষর আছে কিন্তু ১ম পাদে ৭টী অক্ষর। ছন্দে শুধু স্বরবর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণেরই গণনা করা হয়। "তৎ" শব্দের "ৎ" কে অক্ষর গণনায় এইজন্য ধরা হয় নাই। শাস্ত্রকার সেইজন্য বিধান দিয়াছেন "ণ্য" স্থলে "ণিয়" পাঠ করিতে হইবে। ইহাতে ছন্দের অঙ্গহানি দূর হইবে। এই ভাবে পাঠ করিবে—

"তৎ সবিতুর্ব্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।"

"ওঁ" ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। অবতি ইতি ওন্—রক্ষা করেন বলিয়া ইহার নাম ওম্। অ+উ+ম্=ওম্। এই এক ওম্ নাম দ্বারা ভগবানের সকল নাম প্রকাশ হইয়া থাকে। "অ" হইতে বিরাট, অগ্নি ও বিশ্ব প্রভৃতি, "উ" হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু ও তৈজস প্রভৃতি এবং "ম" হইতে ঈশ্বর, আদিত্য ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি নাম সূচিত হয়।

ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবী, ভুবঃ অর্থাৎ অন্তরিক্ষ, স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গ। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন সৎ, চিৎ আনন্দ: যাহা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ; যাহা অবিচলিত অব্যক্ত সুখ স্বরূপ। মহর্ষি মনুর মতে ভূঃ—প্রাণ স্বরূপ, ভুবঃ—দুঃখ নাশক ও স্বঃ—সুখ স্বরূপ। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই শব্দ তিনটী দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রটী এইভাবে সাজাইলে অর্থ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে—

সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ॥

"সবিতুঃ"—জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য, জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের; সূ+তৃচ =সবিতৃ, ষষ্ঠী বিভক্তির এক বচনে সবিতুঃ, প্রসব কর্ত্তার অর্থাৎ সৃষ্টি কর্ত্তার, "দেবস্য"—দিব্ ধাতু হইতে দেব। দিব্ ধাতুর সাধারণ অর্থ রশ্মি প্রদান করা। মহর্ষি পাণিনি বলেন—"দিবু ক্রীড়া বিজিগীষা ব্যবহার দ্যুতি স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি গতিষু" অর্থাৎ ক্রীড়া, জয়েচ্ছা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি, আনন্দ, মত্ততা, নিদ্রা, জ্ঞান ও গতি - এই দশ অর্থে দিব্ ধাতু ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার যে কোন একটা কার্য্য যাহাতে প্রকাশ পাইবে তাহাকেই দেব বলা যাইতে পারে। শব্দ বিজ্ঞান-বিদ্ মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিতেছেন—"দেবো দানাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো বা ভবতি" (নিরুক্ত ৭।১৫)। যাহা দান করিতে পারে, নিজে উজ্জ্বল হইতে পারে, অন্যকে উজ্জ্বল করিতে পারে কিংবা যাহা রশ্মির কেন্দ্র তাহাই "দেব।" বর্ত্তমান সময়ে দেব সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা জন সমাজে প্রচলিত আছে। উক্ত গুণগুলির একটিও না থাকিলে তাহাকে দেব বলা যায় না। বেদে দেব, জ্যোতি, অগ্নি আদি শব্দ ঈশ্বর বাচক। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে মাতা, পিতা এবং আচার্য্যকেও দেব বলা হইয়াছে—

মাতৃ দেবো ভব পিতৃ দেবো ভব আচার্য্য দেবো ভব (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনু ১১)। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" বিদ্বানেরাই দেব।

কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে "দেবস্য" পরমাত্মাকেই বলা হইয়াছে; যিনি "জ্ঞান ময়" বা "জ্যোতির্ম্ময়" এমন পুরুষের। "তৎ"—ভর্গস্ শব্দের বিশেষণ অর্থ সেই। "বরেণ্যং"—বরণীয়ম্ প্রার্থনীয়ম্ উপাসনীয়ম্—যাহা বরণীয় প্রার্থনীয় ও উপাসনীয়। "ভর্গঃ"—ভর্গস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, দ্বিতীয়া বিভক্তি

এক বচনে ভর্গঃ। ভর্গ অর্থে পাপ নাশক, তেজ, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ। "বীর্য্যম্ বৈ ভর্গঃ" (মাধ্যন্দিনীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ৫ অং ৪।৪.১৯) ভর্গ অর্থে বীর্য্যও বুঝিতে হইবে। "ধীমহি"—এই পদটী লৌকিকে "ধ্যায়েম" হইবে। ধ্যৈধাতু আত্মনেপদী নহে কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে আত্মনেপদী ও সম্প্রসারণ যুক্ত হইয়াছে। ধীমহি—ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম। ধ্যান করিবার যোগ্য বলিয়া মন দ্বারা ধারণ করি বা চিন্তা করি। "যঃ"—যিনি, দেব বা সবিতৃকে বুঝাইতেছে। নঃ—অস্মাকম্ আমাদের। "ধিয়ঃ"—কর্ম্মানি বুদ্ধিঃ বা। ধী শব্দের প্রচলিত অর্থ বুদ্ধি কিন্তু বেদে বহু স্থলে উহার অর্থ "কর্ম্ম"। "প্রচোদয়াৎ"—প্রেরয়েৎ প্রেরয়তি বা প্রেরণা করেন বা চালিত করেন। এক সঙ্গে গায়ত্রীর অর্থ এইরূপ হইবে—

যে জগৎ প্রসবিতা দেবাদিদেব আমাদের কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে প্রেরণা দান করেন আমরা সেই পরমাত্মার অবিদ্যা নাশক পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ চিন্তা করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দেশে যুগান্তর আনিয়াছে।

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী প্রণীত—

(১) সমাজ-বিপ্লব (বর্দ্ধিত ও সংশোধিত ২য় সংস্করণ) ।৵০ (২) ব্রাহ্মণ শূদ্রের সংঘর্ষ (৩য় সং) /০ (৩) শুদ্ধি (২য় সং) /০ (৪) ভারতে আর্য্যসমাজ (২য় সং) /০ (৫) বৈদিক সন্ধ্যাবিধি ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা (২য় সং) /০ (৬) অগ্নিহোত্র /০ (৭) ভাটপাড়া বধকাব্য ৵০ (৮) দিগ্বিজয়ী দয়ানন্দ (৬৪ পৃষ্ঠা) /০ (৯) হিন্দীশিক্ষক ॥০ (বাঙ্গালীদের পক্ষে সহজে হিন্দীভাষা শিক্ষার কৌশল)। (১০) বিধবা বিবাহের আপত্তি খণ্ডন (৩য় সং) ৷২০ (১১) বেদসার ২৲ (যন্ত্রস্থ)। **শ্রীযুত দিগিন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত—** (১) জাতিভেদ ২৲ (২) শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার ১৲ (৩) জলচল ও স্পর্শ দোষ বিচার ১৲ (৪) চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ ১৲। **শ্রীযুত ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত—**(১) হিন্দুধর্ম্মের ব্যাধি ও চিকিৎসা ।৹ (২) জাতের খবর ৵০। **শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত—**(১) বিধবা বিবাহ ॥০ (২) বিদ্রোহী শূদ্র ।০

মাসিক পত্র—**আর্য্য গৌরব**—(বার্ষিক ১৲)

সম্পাদক—**শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী**

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, জাতিভেদ দূরীকরণ, দলিত জাতির উদ্ধার, বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার, নারী জাগরণ, তরুণ আন্দোলন, সাম্যবাদ এইরূপ নানা বিষয়ের প্রচার কল্পেই "আর্য্য-গৌরবে"র আবির্ভাব। **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী** প্রণীত—সত্যার্থ প্রকাশ (বাঙ্গালা) ১৲ এই গ্রন্থ ভারতের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

'আর্য্য-গৌরব' কার্য্যালয়

১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগোপাল প্রেস হইতে

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

প্রকাশক—বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা,

২০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

মহাপ্রাণ ঋষিগণ একবাক্যে বিধবা বিবাহের বিধি ব্যবস্থা দিয়া বেদ, পুরাণ, তন্ত্র স্মৃতি সংহিতাদি হিন্দুর ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুর প্রাচীন ও প্রামানিক কোন শাস্ত্রগ্রন্থে বিধবা বিবাহের নিষেধাত্মক ব্যবস্থা অতি বিরল। তথাপি শাস্ত্রের নামে মিথ্যা প্রচার করিয়া ও অসার দেশাচারের দোহাই দিয়া বিধবা বিবাহে বাধা দান নিতান্ত অন্যায়। সমাজের পৌনে ষোল আনা লোক সংস্কৃত মূল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার বা শুনিবার সুবিধা পান না, তাই তাঁদের করকমলে অর্পণার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণীত হইল। সমাজের সহস্র সহস্র নর নারী ইহার সাহায্যে শাস্ত্রকার গণের মহৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবাহেচ্ছু বিধবার বিবাহের আয়োজন অনুষ্ঠান ও বহুল প্রচলনে মনোযোগী হইলে হিন্দু সমাজ আশু ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র সকলের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও অক্লান্ত চেষ্টার উপর এই মঙ্গল কার্য্যের সফলতা নির্ভর করিতেছে। বিধবা বিবাহ ও সমাজের অন্যান্য গুরুতর সমস্যা সমাধানের ভার দু দশজন ধর্ম্মধ্বজীর হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া আর সকলের নিশ্চিন্তমনে কালযাপন কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণ কর হইবে না। শাস্ত্র নিচয়ে বিধবা বিবাহের অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার কয়েকটী মাত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তৎসহ এ বিষয়ে সুধীগণ ও জননায়ক গণের অভিমত প্রদত্ত হইল। সমাজ মুষ্টিমেয় শাস্ত্র ব্যবসায়ীর নহে—সমাজ সকলের। ইহার উন্নতি অবনতিতে সকলেরই লাভ লোকসান সমান। সুতরাং সকলের বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা আবশ্যক। এই প্রমাণসকল সংগ্রহ করার জন্য নবদ্বীপের শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বিনীত

সম্পাদক—বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা

২০৫ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন মতে গভর্ণমেণ্ট বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত করিয়া দিয়াছেন। প্রাতঃস্মরনীয় প্রণ্ডিত প্রবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে ইহা সংঘটিত হয়।

হিন্দুর আদি ও সর্ব্বশাস্ত্রের মূল শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের বিধান এইরূপ—

১। উদীষ্ব নার্য্যভিজীবলোকমগতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্বমভিসম্বভুব ॥
ঋগ্বেদ (১০, ২, ১৮, ৮)।

অর্থ :—হে নারী, তুমি মৃত পতির নিকট শয়ন করিয়াছ। এক্ষণে এস্থল হইতে উঠিয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। যিনি তোমার হস্ত ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু পতি। অধুনা তুমি তাহার পত্নী হও।

২। ইমা নারীরবিধবা সুপত্নী আঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো হনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ে যোনিমগ্রে॥
ঋগ্বেদ (১০, ২, ১৮, ৯৮, ৭)॥

অর্থঃ—(সংগ্রামাদি স্থলে নিহত ব্যক্তিগণের বিধবা পত্নীসকল রোদন করিতে থাকায় তাহাদিগকে বলা যাইতেছে) কেন ইহারা আর্ত্তনাদ করিতেছে ? উহারা বিধবা হইয়া থাকিবে না। উহারা চক্ষুতে ঘৃতাক্ত অঞ্জন ও অঙ্গে বেশভূষা ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম পতি বরণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করুক।

৩। কো বাংশয়ুত্রা বিধবেব দেবরং।
মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥
ঋগ্বেদ (১০, ৪০, ২)

অর্থ :—হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যে প্রকার বিধবা নারী তাহার শয়নকালে

যেমন বা দ্বিতীয় বরকে আকর্ষণ করে, সেরূপ কে তোমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ?

৪। যা পূর্ব্ব পতিং ছিত্বা অথান্যং বিন্দতেপরং।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিয়োষতঃ॥
অথর্ব্ববেদ (৯, ৩, ৫, ২৭)

অর্থ :—যাহার পূর্ব্বস্বামী মৃত হইয়াছে সে আবার বিবাহ করিবার সময় যদি পঞ্চৌদন যজ্ঞ করে, (পাঁচজনকে খাওয়াইয়া দেয়) তবে উহাদের আর কখন বিরহ ব্যথা ভোগ করিতে হইবে না।

৫। সমানলোকা ভবতি পুনর্ভূর্বাহপরঃ পতি।
অর্ব্ববেদ (৯, ৩, ৫, ২৮)।

অর্থ :—বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে সে নব পতিসহ পতিলোক প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর স্মৃতি সংহিতার বিধান উদ্ধৃত হইল।

মনু বলিয়াছেন—

৬। যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্চতে
সা চেদক্ষত যোনিঃ স্যাদ্গত প্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্তা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ৯।১৭৫।১৭৬

অর্থ :—যে নারী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয় অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র হয় তাহাকে পৌণর্ভব বলে। যদি সেই নারী অক্ষত যোনি হয় অথবা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে আশ্রয় করে, পরে আবার সে স্বামীগৃহে আসে তাহার বিবাহ সংস্কার হইতে পারে।

প্রাচীন ঋষিরা যে স্মৃতি কলিযুগের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই পরাশর সংহিতার মতে এইরূপ—

৭। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥ ৪।২৬

অর্থ—পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্ন্যাসী হইলে ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে কিম্বা পতিত হইলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীগণ পুনরায় পতি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ পুনরায় বিবাহ করিবে।

পরাশর পুত্র ব্যাসদেব পুরাণে এই ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

৮। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥

গরুড় পুরাণ ১০৭ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ১৫৪ অধ্যায়।

উক্ত শ্লোক সহ—অগ্নিপুরাণের পরবর্ত্তী চরণে এইরূপ—

মৃতে চ দেবরে দেয়াৎ তদভাবে যথেচ্ছয়া।

অর্থ—"পতি মরিলে দেবরের সঙ্গে বিবাহ দিবে তদভাবে অন্য কাহারো সঙ্গে বিবাহ দিবে :

নারদ এই মতের প্রতিধ্বনি ও অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন—

৯। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।
অষ্টবর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্,।
অপ্রসূতাতু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

ইত্যাদি।

অর্থ—স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে আদি পঞ্চবিধ কারণে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী পুত্রবতী হইলে ৮ বৎসর, পুত্রবতী না হইলে ৪ বৎসর অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে।

যদি পূর্ব্বোক্ত বচন বাক্‌দান বিষয়ক হইত তবে বাক্‌দানে সন্তানবতীর সম্ভাবনা কোথায় আছে।

আর "মৃতে চ দেবরে দেয়াৎ তদভাবে যথেচ্ছয়া" বাকদত্তার আবার দেবরই বা কিরূপে সম্ভবে। সুতরাং এ বচনে যাহারা বাক্‌দান প্রমাণ করিতে যান তাহারা হাস্যাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই।

পরাসর সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে বাগ্দানের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই আর অগ্নিপুরাণের বিবাহ প্রকরণেই এই শ্লোকটি পাওয়া যায়। ফলতঃ বিধবা বিবাহে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্যই অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণে ব্যাস এবং নারদ আর পরাসর এই একটি মাত্র শ্লোকের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

স্মৃতির নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ও বিধবা বিবাহের সমর্থন করিতেছে—

১০। অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ৩।৬৭

অর্থ—ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনি হউক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে তাহাকে পুনর্ভূ বলা যাইবে।

১১। অক্ষতায়াং ক্ষতায়ং বা জাত পৌনর্ভবস্তথা।

অর্থাৎ অক্ষতা অথবা ক্ষতযোনিতে জাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলা যাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২য় অধ্যায়।

১২। পানিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

বশিষ্ঠসংহিতা ১৭।৭৪

অর্থ—যে বালিকার কেবল মন্ত্রদ্বারা পানি সংস্কার হইয়াছে সে যদি বিধবা হয় এবং অক্ষতযোনি থাকে তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইবে।

১৩। নিস্পৃষ্টো বা হতো বাপি যস্যা ভর্ত্তা ম্রিয়েত বা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গত প্রত্যাগতাপি বা
পৌনর্ভবেন বিধিনা পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

বোধায়ন স্মৃতি ৪র্থ প্রশ্ন, ১ম অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

অর্থ—যদি পতি দীপান্তরিত হয়, অথবা যুদ্ধাদিক্ষেত্রে আহত হইয়া থাকে, অথবা মৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পুনর্বিবাহ হইতে পারে। কন্যা অক্ষতযোনিই হউক অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহিতাই হউক।

তন্ত্রের আদেশ যথা—

১৪। পরিনীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ
সাত্যুদ্‌বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেদয়ং বিধিঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১১শ উল্লাস।

অর্থ—স্বামীর সহিত রমণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন স্ত্রী বিধবা হয় তবে পিতা সেই কণ্যার পুনরায় বিবাহ দিবে।

১৫। অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমা নিরবায়াম বীর্য্যবান
সুতায়াং নাগরাজস্য জাত পার্থেন ধীমতা॥

ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীন চেতসা ॥
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান নামে এক শ্রীমান বীর্য্যবান পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ সেই দুঃখিতা পুত্রহীনা বিধবা কন্যা উলুপীকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দেন।

১৬। স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এবচ
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা ঃ
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ-ভূষণা।
পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয়াসিন্ধুধৃত কাত্যায়ন বচন।

অর্থ ঃ—যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র দাস অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকে ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রে দান করিবে। এই যে পুনর্দান ইহার মন্ত্র ও শাস্ত্রানুযায়ী প্রথম বারের ন্যায় একই।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অযোগ্য স্বামী বর্ত্তমানে ও কন্যার পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহের আর কথা কি ?

১৭। প্রতিগৃহ্য চ যঃ কন্যাং বরো দেশান্তরং ব্রজেৎ
ত্রীনৃতূন্ সমতিক্রম্য সা চান্যং বরয়েদ্বরম্।
বিধানপারিজাতোদ্ধৃত নারদ বচন।

যদি বর কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশান্তরে যায় তাহা হইতে তিন ঋতু অতিক্রম করিয়া কন্যা অন্য বর গ্রহণ করিবে।

প্রমাণ ও উদাহরণ।

১। রাণী—তারা ও রাণী—মন্দোদরী পুত্রবতী হইলেও বিধবা হইয়া স্ব স্ব দেবরকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

২। নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে তাহার রাণী—দময়ন্তী অযোধ্যায় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন "বীর নল জীবিত আছেন কিম্বা মরিয়াছেন তাহা দময়ন্তী জানেন না। এজন্য তিনি সূর্যোদয়ে দ্বিতীয় পতিকে বরণ করিবেন।

বনপর্ব্ব ৭০—২৬ মহাভারত।

৩। অর্জ্জুন বিধবা উলুপীকে বিবাহ করেন।

৪। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন রাজা শম্বর অসুরকে বধ করিয়া তাঁহার বিধবা রাণী মায়াবতীকে বিবাহ করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও তাঁহার মহিষী রুক্মিণী প্রভৃতি সকলে সেই পুত্রবধুকে কত যত্ন ও সমাদর করিয়াছিলেন।

৫। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির মাধবী নামে একটি রূপবতী কন্যা ছিল। প্রথমে চন্দ্রবংশীয় পরম ধার্ম্মিক রাজা হর্য্যশ্বের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে একটি পুত্র হইলে, মাধবী তাঁহাকে ত্যাগ করেন, এবং কাশীরাজ দিবোদাসের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া এক পুত্র, তৎপর পরম ধর্ম্মজ্ঞ উশীনরের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া—ভুবন বিখ্যাত পুত্র মহারাজ শিবিকে ও তৎপর বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পরিণীতা হইয়া তাহার ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন। তৎপর বিশ্বামিত্রকেও ত্যাগ করিলে মহারাজ যযাতি ও তৎপুত্র পুরু ও যদু মাধবীর পুনঃ স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। মাধবী বিবাহে বিতস্পৃহ হইয়া বনে গিয়া তপস্যা অবলম্বন

করেন।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব—১১৫—১২০ অধ্যায়।

মহারাজ শিবি পৌণর্ভব পুত্র বলিয়া সমাজে নিন্দিত হন নাই। ব্যাসজননী সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুরাজার ঔরসে যে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র বীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা ও পৌনর্ভব বলিয়া নিন্দিত হন নাই! পরাশর তনয় মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহারই সহোদর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র বীর্য্য ধীবর কন্যার গর্ভজাত বলিয়া তৎকালীন হিন্দু সমাজে নিন্দিত হন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে—

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন।

২। প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ, বিধবা বিবাহ করেন।

৩। হাইকোর্টের বিচারপতি ও ভাইস চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা;

৪। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষের ভগিনী;

৫। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্র পালের কন্যা;

৬। ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট পূর্ণচন্দ্র নাগের কন্যা;

৭। নারায়ণগঞ্জের লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র চন্দ্র ধর মহাশয়ের কন্যা;

৮। বরিশালের গভর্ণমেন্ট উকীল গণেশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের কন্যা;

৯। ঢাকা জেলার পশ্চিমদিক নিবাসী ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল বসুর কন্যা;

১০। চট্টগ্রামের উকীল বিপিনচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কন্যা;

১১। ময়মনসিংহের উকীল নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের কন্যা; (নিশিকান্ত বাবু সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভায়রা ভাই;)

১২। ঢাকা লক্ষ্মী বাজারের জমিদার শ্রীললিত মোহন রায় বি, এল মহাশয়ের আমেরিকা প্রত্যাগত পুত্র প্রভৃতি সকলেই বিধবা বিবাহ করিয়াছেন।

হিন্দু ধ্বংস হইতে চলিল

১৯১১ সনে ভারতে হিন্দু ছিল—২১, ৭৩, ৩৭, ৯৪৩ জন

১৯২১ সনের গণনায়— ২১, ৬২, ৬০, ৬২০ জন বাদ দিলে

১০, ৭৭, ৩, ২৩ জন হিন্দু ১০ বৎসরে কমিয়া গেল।

প্রতি ১০০ জন পুরুষ মধ্যে ২০ জন হিন্দু কন্যা অভাবে বিবাহ করিতে পারে না।

প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ২৫ জন বিধবা।

(১৯২১ সালের আদম সুমারী মতে)

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা—২, ০৮, ৭৯, ১৪৮ জন

তন্মধ্যে নারীর সংখ্যা— ৯৬, ৬৭, ৪০৮ জন বাদ দিলে

১, ১২, ১১, ৭৪০ জন পুরুষ

ইহার মধ্যে পুরুষ— ৯৬, ৬৭, ৪০৮ জন বাদ দিলে

১৫, ৪৪, ৩৩২ জন পুরুষ স্ত্রী অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না।

বঙ্গদেশে পুরুষের সঙ্গে বিবাহ যোগ্যা নারী—

৯৬, ৬৭, ৪০৮

তন্মধ্যে বিধবা— ২৪, ৭৪. ৯০৬ জন বাদ দিলে

বিবাহ যোগ্যা নারী থাকে—	৭১, ৯১, ৫০২
ইহার মধ্যে দাসী, ভিখারিণী বঞ্চিতা, বেশ্যা—	১, ৬৬, ৫০৭ বাদ দিলে
বিবাহ যোগ্যা নারী থাকিল—	৭০, ২৪, ৯৯৫ জন
বঙ্গে হিন্দু পুরুষের সংখ্যা—	১, ১১, ৩২, ৫৯২ জন
তন্মধ্যে বিবাহ যোগ্যা নারী—	৭০, ২৪, ৯৯৫ জন বাদ দিলে
	৪১, ০৭, ৫৯৭ জন পুরুষ কণ্যা

অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না, এবং তাহাদের পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধ, শান্তি, জল, পিণ্ড লোপ পাইতেছে ; ১, ৮২, ২১৪ জন বৈরাগী ও ও বৈষ্ণব হইয়া ২, ১৯, ৬৫৩ জন বিধবাকে বৈষ্ণবী করিয়া লইয়া ঘর সংসার করিতেছে, কিন্তু সমাজের ভয়ে ও কুব্যবহারে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন ছেলে মেয়েদের ভ্রূণহত্যা করিতেছে।

দ্রষ্টব্য :—বিধবাবিবাহ সহায়ক সভা

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে

২০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে।

জাতি হিসাবে স্ত্রী পুরু[illegible]

বাংলা দেশে অল্প কয়েকটি ভিন্ন প্রত্যেক [illegible]
সংখ্যা কম। ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে নীচে হিসাব [illegible]

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	[illegible]
বাগদি	৪৪৮ ২০১	[illegible]	[illegible]
বৈদ্য	৫২,[illegible]	[illegible]	[illegible]
বারুজীবী	৯৬,৫৩২	৮৯ [illegible]	[illegible]
ভুঁইমালী	৪১,৭৭৯	৪০,০৭৩	১,৭০৬
ভুইয়া	৩২,৯৭৮	২৬,৪১০	৬,৫৬৮
ব্রাহ্মণ	৭০৯,৮১০	৫৯৯,৭২৯	১১০, ৮১
চামার	৯২,৫৮৫	৫৯,৬৮৭	৩২,৯৯৮
সচ্চাষী	৬,৬৮১	৬,৩৫৮	৩২৩
ধোবা	১১৮,৮৭৬	১০৮,৫৯২	১০,২৮৪
ডোম	৭৬,০৭৪	৭৪,১৮৯	১,৮৮৫
দোসাদ	১৮,৩১৪	১১,৮০৭	১৬,৫০৭
গন্ধবণিক	৭৫,০৭৬	৬৬,৮১০	৮,২৬৬
গোয়ালা	৩২৩,২২৯	২৬০,৭৪১	৬২,৪৮৮
হাড়ি	৭৫,৬৪৪	৭৩,২০৩	২,৪৪১
যোগী	১৮৬,১৬৬	১৭৯,৭৪৪	৬,৪২২
কাহার	৭৫,৫৪৯	৪৬,৩৪৯	২৯,২০০
মাহিষ্য	১১,১৩,৬৫৮	১০,৯৭,০২৬	১৬,৬৩২
আদি কৈবর্ত্ত	১৯৮,২৭৪	১৮৫,৭৭৫	১২,৪৯৯
কলু	৫০,৪৩৫	৪৫,৪৭১	৪,৯৬৪
কর্ম্মকার	১৩৩,৪৯৫	১২৩,৩৯২	১০,১০৩
কাওরা	৫৬,৩৬২	৫৪,২৯০	২,০৭২
কপালী	৮০,৫৫৯	৭৮,৩০৫	২,২৫৪
কায়স্থ	৬৭৮,৯০৭	৬১৮,৮২৯	৬০,০৭৮
কোচ	৬৭,৬২৮	৬৩,৬৪৫	৩,৯৮৩
কুম্ভকার	১৪৬,৮৩০	১৩৭,৮২৩	৯,০০৭

াতি	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রীর সংখ্যা কত কম
র্মী	১০৩,৫১২	৭৭,৯৩৫	২৫,৫৭৭
লাহার	৩৩,৭৫১	৩১,৩৫২	২,৩৯৯
াল	৫৯,৩১১	৫৮,২২৬	১.০৮৫
ালী (মালাকর)	৩০,৭৩৭	২৬,৩২৭	৪,০৫০
ালো	১১২,৭৩২	১০৮,৪৬৬	৪,২৬৬
ায়রা	৬৪,৫০৭	৫৭,০২৭	৭,৪৮০
চি	২২৫,৯৪২	১৯১,৬১২	৩৪,৩৩০
ড়া	২০,৭৪১	১৯.৮৩৩	৯০৮
নমঃশূদ্র	১০.১৯,০৫৭	৯,৮৭,২০২	৩১,৮৫৫
াপিত	২৩০,৫২১	২১৩,৬৬৭	১৬,৮৫৪
ুনিয়া	৩৬,৯২৯	২১,৮৯৩	১৫,০৩৬
ওরাঁওন	৩৪,৫২৯	৩০,১৪৮	৪,৩৮১
পুণ্ড্র মাহিষ্য (পাটনী)	২২,৫৮৮	২১,৩৬৭	১,২২১
পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়	৩০০,০৩৪	২৮৮.৩৬০	১১,৬৭৪
রাজবংশী (ক্ষত্রিয়)	৮৯০,০৩৫	৮৩০,০৭৬	৬৩,৯৫৯
রাজপুত (ক্ষত্রী)	৮০,৫৩৮	৪৪,৯৭৫	৩৫,৫৬৩
সদ্গোপ	২৭০,২১১	২৬৩,০২৫	৭,১৮৬
সাঁওতাল	৭৯,৮০১	৭৮,৫৮২	১,২১৯
সাহা	১৮৪,১৯০	১৭৫,৫৪১	৮,৪৯৬
সোণার (স্বর্ণকার)	২৫,৭৬৩	২০,৪৮৮	৫,২৭৫
সুবর্ণবণিক	৫৯,৯৭৬	৫৭, ৪৭	২,৮২৯
শুঁড়ি	৪৭,৯০০	৪৪,৫৯২	৩,৩০৮
সূত্রধর	৮৭,৬৭১	৮০,৯০৬	৬,৭৬৫
তাম্বুলী	২৩, ৪৩	২২,৮০২	৪৪১
তন্তুবায় ও তন্ত্র	১৬৯ ৯০১	১৪৯,৭১২	২০,১৮৯
তিলি এবং তেলি	২০৯,১৭৫	১৮৭,৭৫১	২০,৪২৪
তিয়র	৮৯,০০১	৮৬,৭২০	২,২৮১
[illegible]	১১,৬২,৮১৮	৯৭২,৩০০	১৯০,৫১৮

বিধবা বিবাহ

বিদ্যাসাগর ও সার গঙ্গারাম।

অর্দ্ধ শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তপস্যা ও সাধনা সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র বিধবা বিবাহের স্রোত প্রবল বেগে বহিয়া অজ্ঞানান্ধ সমাজপতি গণের অন্যায় বিধি নিষেধ লোকাচার দেশাচার ভাসিয়া চলিয়াছে। অভাগিনী বিধবাগণের দুঃখ তাপ দিন দিন লোপ প্রাপ্ত হইতেছে; তাঁহাদের মলিন মুখে হাঁসি, আনন্দ, তৃপ্তি, স্বস্তি ফিরিয়া আসিতেছে। সহস্র সহস্র বিধবা পুণর্ব্বার বিবাহ করিয়া সীমন্তে সিন্দুর, হস্তে শাঁখা লোহবলয় ও শাড়ি পরিধান করিয়া ক্রোড়ে বুক জুড়ান পুত্র কন্যা পাইয়া দুঃখময় সংসার নরককে স্বর্গ বলিয়া মনে করিতেছে। বিদ্যাসাগরের দেবাত্মা স্বর্গ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে বিধাতার বিধি উল্টাইয়া দিয়া নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু একদল হৃদয়হীন মায়ামমতাশূন্য কঠিনপ্রাণ সমাজপতি পণ্ডিত বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতেছে দেখিয়া হিংসানলে দগ্ধ হইতেছেন। বিদ্যাসাগরের স্বজাতীয় যে বাঙ্গালীগণ পদে পদে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহার আরব্ধ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে দেয় নাই—সময়ের মহা পরিবর্ত্তনে,—, বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের ভালমন্দ ও লাভক্ষতি আলোচনা করিয়া তাহাদেরই বংশধরগণ পিতৃপুরুষগণের বিধবা পীড়নরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জেলায় জেলায় বিধবা বিবাহ প্রদান করিয়া জাতিরক্ষায় উপায় বিধান করিতেছেন। তাঁহার জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলাই এই কার্য্যে প্রথম আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, পরে অন্যান্য সমুদয় জেলায় বিধবা বিবাহ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জাবের

দানবীর মহাত্মা সার গঙ্গারাম বিধবা বিবাহ প্রচলনে ও বিধবাশ্রম স্থাপনে উপযুক্ত পরিচালকবর্গের হাতে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪৫০।৫০০ শত করিয়া বিধবা বিবাহ দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহাপ্রাণ নেতৃবর্গ দুঃখসাগরে নিমগ্না অভাগিনী শত শত বিধবার বিবাহ প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে সহানুভূতির অমৃত প্রলেপ দিতেছেন। এবার আর তর্ক বিতর্ক বাদ প্রতিবাদ ও পাঁতি সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টায় শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন হইতেছে না; এবার একেবারে হাতে কলমে কাজে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাল্যবিধবাগণের বিবাহ দিয়া দেওয়া হইতেছে।

শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারই প্রবল।

বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত যুক্তি ও প্রমাণ সঙ্গত—ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর বাঁচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ ইহা তদানিন্তন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় হস্তলিখিত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। লোকে মুখে বৃথা শাস্ত্রের দোহাই দিলেও—শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃতপক্ষে লক্ষ জনের মধ্যে এক জনেরও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রীআচার লোকাচার, দেশাচার শাস্ত্রকে আচ্ছাদিত ও শক্তিহীন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। সমাজে শাস্ত্রের কোনই মূল্য নাই; এই অচলায়তন সমাজে শাস্ত্রের কোনই স্থান নাই। শাস্ত্রের শ্লোক মুখে মুখে উচ্চারণ করিলেও বাস্তবিক পক্ষে কেহই শাস্ত্র মানে না ও মানিতে প্রস্তুত নহে। এইযে অহরহঃ মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা শঠতা, মদ্যপান ব্যভিচার, চুরি ডাকাতি, পরের সর্ব্বনাশ স্বার্থসেবা চলিতেছে—ইহাকি সব শাস্ত্রসম্মত

ইহার অনুকূলে কি কোনও শাস্ত্র যুক্তি আছে? যাহারা পাপে ডুবিয়া আছে তাহারাও সর্ব্বদা নির্লজ্জের মত শাস্ত্রের দোহাই দেয়—যেন তাহাদের শাস্ত্রের প্রতি কত অগাধ শ্রদ্ধা! ভণ্ডামীতে—স্বার্থপরতায় সমাজ পরিপূর্ণ! "বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে নাই" বলিয়া লোকে যখন বলিতে লাগিল,—তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলেন,—শাস্ত্র হইতে প্রমাণ দেখাইতে পারিলেই ইহারা তাহা গ্রহণ করিবে। এই আশায় তিনি আহার নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সপ্তাহ কাল ধরিয়া শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া প্রমাণরূপ মণিরত্ন উত্তোলন করতঃ বড় আশায় দেশ বাসীর হস্তে প্রদান করিলেন! তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এই বার সকলে তাঁহার কথা শুনিবে—শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ তাঁহার সত্য-মত সকলে গ্রহণ করিবে? কিন্তু তাহা হইল না—লোকেরা বলিতে লাগিল—হাঁ শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু ইহা দেশাচার ও লোকাচার বিরুদ্ধ, অতএব গ্রহণের অযোগ্য! তখন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন অন্ধ সামাজিক গণের কাছে শাস্ত্র মিথ্যা—যুক্তি মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, ঋষিবাক্য মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, সংহিতা মিথ্যা, রামায়ণ মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা—ইহাদের কাছে লোকাচার দেশাচারই সত্য। তখন মর্ম্মদাহী ভাষায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ধন্যরে

মুর্খেরা লোকাচারকেই ধর্ম্ম মনে করে।

দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্ত দিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃখলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য

হইতেছে, অধৰ্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্ত হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক (লৌকিক আচার বা লোকাচার) রক্ষার গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরনীয় হইতেছে; আর দোষ স্পর্শ শূন্য প্রকৃতি সাধু পুরুষেরাও অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন, তোর অধিকারে যাহারা, জাতি ভ্রংশকর ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া কালাতিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার বিহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।"

এই মিথ্যা অশাস্ত্রীয় দেশাচার লোকাচার নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিবার জন্য চাই একদল অসীম সাহসী, দৃঢ় বিশ্বাসবান্ সমাজ-অগ্রাহ্যকারী—সর্ব্বভয়-ভাবনা-মুক্ত-ধৃত-ব্রত গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এক এক দল বীরহৃদয় নরনারী, ইহাঁরা সমাজের সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামী কপটতা, মৌখিক সাধুতা ও শাস্ত্রানুরক্তি, অবিচার অত্যাচার দূর

বিধবার প্রতি অত্যাচার।

করিতে জীবন পণ করিবেন। যত বিধি নিষেধ ব্রত ব্যবস্থা সংযম ব্রহ্মচর্য্য নারীর জন্য—বিধবার জন্য। পুরুষদিগের জন্য কোনও বিধি নিষেধ শাসন সংযমের প্রয়োজন নাই, যত শাসন দণ্ড যত অবিচার অত্যাচার বিধবা নারীর জন্য—বলবান পুরুষগণ নিজেরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ

করিবে, বেদ বেদান্তপাঠ ও পূজার্চ্চনা নিজেরা করিবে, কিন্তু নারীদিগকে সব বিষয়ে বঞ্চিত রাখিবে; স্ত্রীর মৃত্যুরপর নিজেরা বারবার বিবাহ করিবে কিন্তু বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহে অনুমতি দিবেনা। শুধু তাই নহে একসময়ে পুরুষদিগের এমন একাধিপত্য ছিল যে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পত্নীকে চিতায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া মারিয়া দাসী সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বর প্রথা ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সতী দাহ করিতে না পারিয়া সমাজপণ্ডিতগণ ক্রোধে ক্ষোভে রোষে হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিধবা নির্য্যাতনের সব বাছা বাছা বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। বিধবার ভাল কাপড় চোপড়—শাড়ি অলঙ্কার, হাতের শাঁখা, সিঁথির সিন্দুর—সব কাড়িয়া লইয়া—মাথার শোভা বেণীবদ্ধ কেশদাম নিজ হস্তে কাটিয়া ফেলিয়া ১ বেলা আতপ চাউল কাঁচা কলা সিদ্ধ আহারের ব্যবস্থা করিয়া, নির্জ্জলা একাদশী অম্বুবাচীর কঠোরতার বিধি প্রণয়ন করিয়া নারী পীড়ন করিয়াছে। (ব্রহ্মচর্য্য মুখে বলা ও পুথি পত্রে লেখা বড়ই সহজ কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালন করা বড়ই কঠিন। আমার যতই বয়স বাড়িতেছে ততই এই ধারণা বদ্ধ মূল হইতেছে যে ইন্দ্রিয় নিরোধ করা—কামোৎপন্ন পিতামাতা জাত জীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব মানুষের পক্ষে আরও অসম্ভব। যাহারা বড় বড় ধর্ম্ম শাস্ত্রের বাঁধা বুলি,—গীতা ভাগবত বেদ উপনিষদের শ্লোক আওড়ান তাঁহাদের কয়জন জীবনে বিবাহ না করিয়া এবং সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয়

ব্রহ্মচর্য্য সহজ নহে।

নিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরস্মৈপদী ইন্দ্রিয় নিরোধ বা ইন্দ্রিয় সংযম ব্রহ্মচর্য্য বলা খুবই সহজ কিন্তু আত্মনেপদী আচরণ করা কঠিন এক প্রকার অসাধ্য। এযে স্রষ্টার বিধান, দেহ মনের ধর্ম্ম।

স্রষ্টার অমোঘ বিধান অগ্রাহ্য করিবার শক্তি সৃষ্ট জীবের নাই। অন্য পরে কা কথা - ধ্যান-তপস্যা মগ্ন সাত্ত্বিক আহারী বনবাসী মুনি ঋষিগণ পর্য্যন্ত বার বার পদস্খলনের প্রমান দেখাইয়াছেন। কশ্যপ ঋষি দেব মানব যক্ষ রক্ষ দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরাদি বহু সন্তানের জনক ছিলেন, পরাশর ঋষি প্রাতঃকালে নদী পার হইবার সময়ে কৈবর্ত্তরাজ কন্যা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া বেদব্যাসের পিতা হন। শত শত রাণীর স্বামী, ৬৫ পুত্রের জনক বিশ্বামিত্র শেষ জীবনে গেলেন বনে তপস্যা করিতে, সেখানে স্বর্গ বিদ্যাধরী মেনকাকে দেখিয়া শকুন্তলার জনক হইলেন। রামায়ণের আদি কাণ্ড নবম সর্গে আছে—যে "অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ রাজার রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় ঋষিগণের কথামত পরমাসুন্দরী বেশ্যাগণকে পাঠাইয়া তরুণ ঋষিকুমার (যিনি জীবনে জন্মাবধি স্ত্রী পুরুষ কিম্বা অন্য কোনও জন্তু পর্য্যন্ত দেখেন নাই) বনচারী তপশ্চর্য্যা-পরায়ণ ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া আনিয়া নিজ কন্যা শান্তার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। পাণ্ডু এক হরিণীরতা ঋষিকুমারকে শরবিদ্ধ করায়—তিনি অভিশম্পাত দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং হিমালয় রাজ কন্যা ভগবতী গৌরীর দর্শনে শিবের ধ্যানভগ্ন হয় এবং তার ফলে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম। চির ব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্য্যের—মাসব্যাপী রাজরাণী সম্ভোগ ও রতিশাস্ত্র অভিজ্ঞতা লাভের ইতিহাস সকলেই জানেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা যেমন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা কেহ তপস্যা করিয়া জয় করিতে পারে না, নরনারীর মিলনও দেহীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহাকে রোধ করিবার উপায় নাই। সহজ স্বাভাবিক প্রকৃতি সিদ্ধ অবস্থাকে বলপূর্ব্বক বাধা দিতে গেলেই অসরল অস্বাভাবিক রূপে দেহী তাহার দেহ মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবেই করিবে। জোর করিয়া সাদা থান ধুতি পরান যায়,

চুল কাঁটান যায়, শাঁখা সাড়ি বাজু বালা হার কঙ্কনাদি অঙ্গাভরণ কাড়িয়া লওয়া যায়, আতপ চাউল কাঁচা কলা সিদ্ধ খাওয়ান যায় কিন্তু বলপূর্ব্বক বিধবা নারীর ইন্দ্রিয় দমন করান যায় না, ব্রহ্মচারিণী করা যায় না। প্রতিদিনকার ইন্দ্রিয়সেবী বহু পুত্র কন্যার জনক জননী গণ, সমাজপতি জ্ঞানান্ধ পণ্ডিতগণ: কিরূপে বুঝিবে—ইন্দ্রিয় দমন ব্রত কত কঠিন। মুনি ঋষিগণের মধ্যে কয়জন আমৃত্যু ব্রহ্মচারী ছিলেন? তাঁহারা পর্যান্ত নারী দর্শনে ধৈর্য্যহারা হইয়া—কত পুত্র কন্যার জনক হইয়া বসিয়াছেন সেই সুকঠোর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে কাম রাজ্যের মধ্যে বাস করিয়া, প্রতিদিনকার ইন্দ্রিয়সেবী দেহ সুখকামী আত্মীয় ও অনাত্মীয়গণের সঙ্গে বসবাস করিয়া? অসম্ভব—ইহা একরূপ অসম্ভব। ১৬ বৎসরের খোকা—১৷৷০ দিনের ব্রহ্মচারী শুকদেব গোস্বামীর কথা বলিও না; ৫০ বৎসর বয়সের যদি কোন শুকদেব শাস্ত্রে পাইয়া থাক তার কথা উল্লেখ কর। ব্রহ্মচর্য্যের বৃথা বক্তৃতা করিও না। দেহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দেহীর পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। এইরূপ বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিণী তৈয়ার করিতে যাইয়াও না ১,৬৬,৫০৭ জন হিন্দু বেশ্যা ২,১৯,৬৫৩ জন বৈষ্ণবী এবং ১,৮২,২১৪ জন বৈষ্ণব সৃষ্টি করিয়াছ! ৪৫।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত-নারী-স্পর্শ বিমুখ এবং অন্য কোন প্রকার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন নাই এমন কোনও পণ্ডিত ভাট পাড়ায় বা অন্য কোন পাড়ায় যদি কেহ থাকেন তিনিই বলুন আমরণ পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা সহজ কি কঠিন; ৫০ বৎসরে তৃতীয় বার বিবাহকারী পণ্ডিতের মুখে বিধবার ব্রতচর্য্যের কথা মোটেই শোভা পায় না। ৪৬ বৎসর বয়স্ক দীন লেখক বুঝিতেছেন ইন্দ্রিয়-দমন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে ও কত কঠিন।) বিধবাগণের জন্য তিনটি পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—১। সহমরণ, ২। ব্রহ্মচর্য্য, ৩। পুন-

বিবাহ। ভারত সম্রাট পাণ্ডুরাজের মৃত্যুর পর তদীয় ছোট রাণী মাদ্রী নকুল সহদেবকে সপত্নী কুন্তীর হস্তে প্রতিপালনের ভার দিয়া স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইয়াছিলেন, কুন্তী দেবী পাঁচ অনাথ পুত্রের লালন পালন

মহাভারত ও রামায়ণী যুগে বিধবা বিবাহ।

ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্রহ্মচারিণী রূপে থাকিয়া গিয়াছিলেন এবং কুন্তী নন্দন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজকন্যা বিধবা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রে নিহত বিখ্যাত বীর ইরাবান—তাঁহাদেরই সন্তান। ভারতের শ্রেষ্ঠ একই সম্রাট পরিবারে এই তিনটি দৃষ্টান্তই একাধারে পাওয়া গিয়াছে—তবে আর বিধবা বিবাহে আপত্তি উঠে কেন? এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রগ্রন্থে আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে। এত কাল যে লোকে জানিতে পারে নাই তার দুই কারণ; একটি—নারী নিগ্রহকারী অত্যাচারী পণ্ডিত স্বামীর দল—শাস্ত্র নিজেদের গুপ্ত গৃহে লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যকে তাহার মর্ম্মাস্বাদে বঞ্চিত রাখিয়াছিল—আর দ্বিতীয় কারণ অব্রাহ্মণ কোটি কোটি নরনারী বেদ বেদান্ত পুরাণ সংহিতাদি পাঠে বঞ্চিত থাকিয়া এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া এই সব প্রমাণ অনবগত ছিল, এক্ষণে অবাধ বিদ্যা প্রচার এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হওয়ার ফলে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শাস্ত্রের মর্ম্ম ও সমাজ পতি তর্কবাগীশগণের পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিতেছে এবং দলে দলে লোক এই সব স্বদেশী গভর্ণরদের বিরুদ্ধে ভীম বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। কয়জন জানিত—ভগীরথ বিধবা জননীর পুত্র, অযোধ্যার সম্রাট ভগবান রামচন্দ্র বালী বধের পর তার স্ত্রী তারার সহিত দেবর সুগ্রীব, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর সহিত দেবর বিভীষণের বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন। ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়—সম্ভবামি যুগে যুগে"

আমি ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। বিধবা বিবাহ যদি ধর্ম্মহানিকর ও অধর্ম্মজনক হইত তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ অবতার রামচন্দ্র কখনই এরূপ অধর্ম্মজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রাক্‌জ্যোতীশ পূরের (কামরূপ—আসাম) সম্রাট নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহার বহু বিধবা নারীকে আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন—শম্বরাসুরকে বধ করিয়া তদীয় বিধবা পত্নী মায়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুর শাশুড়ী কৃষ্ণ ও রুক্মিনীদেবী সাদরে পুত্রবধূকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে তুলিয়া লইয়াছিলেন কোনও তর্করত্ন তর্কবাগীশ স্মৃতিরত্ন বাধা দেয় নাই, 'এক ঘরে' করিতে চেষ্টা করে নাই। যযাতীর কন্যা মাধবীর ক্রমাগত (১) হর্য্যনব (২) দিবোদাস (৩) উশীনর ও (৪) বিশ্বামিত্র এই ৪ জনের সঙ্গে পর পর ৪ বার বিবাহ হইয়াছিল। শ্যেন রূপী ধর্ম্মকে দেহ-মাংস-দাতা মহাত্মা শিবি—এই উশীনরের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। স্বয়ং শাস্ত্র লেখক ও শাস্ত্র কর্ত্তা বেদব্যাস বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মদান করিয়াছিলেন। সে যুগের কথা ছাড়িয়াই দেই—এই সে দিন ৪॥০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন চরিত "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা নারায়নীর গর্ভজাত পুত্র। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের যোটেই অভাব নাই; কিন্তু বিস্তৃত ভাবে দেখাইবার স্থানাভাব।

আধুনিক শ্রেষ্ঠ মানবগণের বিধবা বিবাহ সমর্থন।

রাজা রামমোহন রায়, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী জগৎপূজ্য নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎরায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বসু বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য দেশবাসী-গণকে কতই না অনুরোধ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ন চন্দ্রের,

বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিধবা বিবাহ দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের বিধবা কন্যা, হাইকোর্টের বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার, আলিপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল বাহাদুরের বিধবা কন্যার, বরিশালের গভর্ণমেণ্ট উকীল গণেশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল, এর বিধবা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন। ঢাকার জমিদার ও উকীল মনস্বী ললিত মোহন রায় তাঁর দুইটী পুত্রকেই বিধবা বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণে বলুন দেখি—আমরা কাহাদের কথা শুনিব; রামকৃষ্ণ, বাল্মিকী বেদব্যাস মুনিঋষিগণের কথাই শুনিব না তর্কবাগীশ তর্করত্বের কথা শুনিব? মহাত্মা গান্ধী, ব্রজেন্দ্র শীল, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই শুনিব না গ্রামের বিদ্যা জ্ঞানহীন মূর্খ মোড়ল দের মাতব্বর মণ্ডলদের কথা শুনিব? এই সব গ্রাম্য হৃদয়হীন, পাষাণপ্রাণ স্নেহমমতাশূন্য জাতিধ্বংসকারী অজ্ঞ সমাজপতিদের অনুমতি বা সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দেশের কল্যাণকামী সুসন্তানগণ বিধবা কন্যা ভগিনীগণের

নারী নিগ্রহই ভারতের অবনতির কারণ।

বিবাহ দিন। অনুমাত্র দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করিবেন না; ঘরে ঘরে বিধবা ভগবতী গণের পীড়ণ, গঞ্জনা, দুঃখ কষ্ট, আর্ত্তনাদ ও নয়ন জলে হিন্দু জাতির সমুদয় মঙ্গল ধ্বংস হইতেছে। শাস্ত্রে বলিয়াছে, যে গৃহে নারী সুখী, সেই গৃহস্থের পুণ্যময় গৃহেই লক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজ করেন। কিন্তু কোন্ গৃহে নারীগণের বুকফাটা আর্ত্তনাদ ও কাতর ক্রন্দন নাই? সাধে কি দেশের, সমাজের, জাতির এই দুর্দ্দশা! সাধে কি আমরা পরাধীন—পর পদদলিত স্বাধীন রাষ্ট্র জগতের কাছে অবজ্ঞাত? তিন যুগে তিনটী নারী নিগ্রহের ফলে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছে। সতীর অবমাননার ফলে

সত্য যুগে বিখ্যাত দেবীযুদ্ধ, ত্রেতায় সীতাহরণের পাপে লঙ্কার রাম রাবন যুদ্ধ, দ্বাপরে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও সভাস্থলে নিগ্রহ করিবার ফলে কুরু ক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে প্রায় ৪০ লক্ষ ক্ষত্রিয়ের বিনাশ! তবু এই হতভাগ্য জাতি নারীপীড়ণ ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না। ভাই সকল এখনও সাবধান হও, এখনও পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণের আচরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিধবার দুঃখ দূরীকরণে অগ্রসর হও। ও কি করিবে, সে কি বলিবে, পাঁচজন একঘরে করিবে, হুকাকল্কী বন্ধ হইবে, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ লোপ হইবে, এই সব মূর্খজনোচিত দুর্ব্বল উক্তি আর করিও না, বিধবা বিবাহ দ্রুত দেশ মধ্যে প্রচলিত হইতেছে। কে কাকে বন্ধ করিতে যাইবে, প্রায় সকলের ঘরেইত ২।১টী করিয়া বিধবা কন্যা ভগিনী আছে। দুইচার দশ বিশজন বা একাকীই সাহস করিয়া বিধবা বিবাহ দিলে ধীরে ধীরে এই মহাপুণ্যকর প্রথা পুনরায় সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রথম প্রথম একটু আধটু বেগ পাইতে হইবে বই কি? তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই; রবীন্দ্রনাথ গানে বলিয়াছেন—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে"— আর একটী গানে বলিয়াছেন "আপন জনে ছাড়বে তোরে তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

একা বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, নানক, জগতে কি না পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। একা রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী ভারতে কি না যুগান্তর আনিয়াছেন—সাহস অবলম্বন কর, বুকে বল বাঁধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীম বলে দাঁড়াও; কেহই তোমাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না। সমাজপতি মরা ভূত প্রেতের ভয়ে বিচলিত ও ভীত হইওনা। জানত ভাই সব রামনামে ভূত পালায়। কষ্টে সৃষ্টে গ্রামে গ্রামে ২।১টী করিয়া ক্রমে ২।৪টী করিয়া

বিধবা বিবাহ দিতে থাক। যতই বিবাহ দিবে ততই লক্ষ হস্তীর, কোটি সিংহের বল অনুভব করিয়া, বিরুদ্ধবাদীদের বৃথা ভয় কোথায় পলায়ন করিবে। সমাজপতি বিরোধীগণ প্রাণশূন্য মরা বাঘ ভাল্লুক; কামড়াইবার, বক্ষ বিদারণ করিবার, থামচাইবার শক্তি আর উহাদের নাই। উহারা চিত্রপটের শক্তি সামর্থ্যহীন মরা প্রাণহীন ছবির তুল্য। উহাদের কিছু মাত্র শক্তি সামর্থ্য নাই। উহারা শিশুর কাছের জুজু মাত্র; সমাজ ভয়, জুজুর ভয় ও ভুতের ভয়ের মতই মিথ্যা। দাঁড়াও বুক বাঁধিয়া তরুণ দেশভক্তের দল, তোমরা যদি কুমারী বিবাহ না করিয়া নিরপরাধ বিধবাগণকে বিবাহ করিতে আরম্ভ কর, কার সাধ্য তোমাদের বাধা দিতে পারে? কার সাধ্য একঘরে করিবার প্রশ্ন

হে বীর, সমাজ বিপ্লব আরম্ভ কর।

তোলে? এই মহা যুগপরিবর্ত্তনের সময় তোমরাও এক একটা মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর; কেহ বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনে, কেহ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে, কেহ গৃহ সমাজ বিতাড়িত ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণকারী ভাইদিগকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া লইতে—কেহ পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে, কেহ পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপণ করিয়া নিরক্ষর বালক বালিকা গণকে শিক্ষা দানে—আত্ম জীবন নিয়োজিত কর "যদি জন্মেছ ত একটা দাগ রেখে যাও"। এলে আর গেলে সমাজ বক্ষে কোন চিহ্নই রাখিয়া যাইবেনা? তাহা হইতে দিবে না। জীবনে একটা কিছু মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লইয়া যাও। নারী পীড়ন ভারতের এক মহাপাপ। এই মহা পাপ বলপূর্ব্বক বৈধব্য রক্ষার অত্যাচারেই বেশী মাত্রায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিধবাগণকে জোর জবরদস্তি করিয়া বিবাহ দানে বাধা দিয়া সমাজ গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিয়াছে এবং সমাজ মধ্যে ব্যভিচারের, ভ্রূণ ও শিশু হত্যার পাপ স্রোত

অবাধ গতিতে চলিয়াছে। বিধবা অভাগিনীগণকে অন্নবস্ত্রদানের প্রলোভনে রক্ষিতারূপে রাখিতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বিবাহিত ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেই যত আপত্তি ধর্ম্মলোপ ও সমাজ ভয় !! হা পাপিষ্ঠ পুরুষ জাতি, এমনি করিয়া মাতৃজাতি নারীগণের সতীত্বের নারীত্বের ও মর্য্যাদার অপমান কত কাল অবাধে চালাইবে ? বিধবাগণ অবলা, অশিক্ষিতা ও অবোলা তাহাদের দুঃখে তোমাদের পাষাণ প্রাণ টলেনা, পাথর হৃদয় গলেনা। তারা যদি লেখা পড়া জানিত,—পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বিধবাগণের বিবাহের কথা জানিত তবে তাহা দিগকে রক্ষিতা রূপে রাখিবার হীন সঙ্কল্প মনের কোনেও স্থান দিতে পারিতে না। সংসার অনভিজ্ঞ অজ্ঞান অবুঝ ও অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের সতীত্ব লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলিয়া অব্যাহতি পাইতেছে। এখনও এই হীন অভিসন্ধি দুরাশা অবিচার ও অত্যাচার ত্যাগ কর! নানা মিথ্যা কারণ উত্থাপিত করিয়া আর বিধবাগণকে বিবাহ দিতে বাধা প্রদান

কন্যাদান, গোদান অথবা ভূমিদান নহে।

করিও না। প্রায় সকলেরই এই এক সাধারণ প্রশ্ন যে, যাহাকে একবার সম্প্রদান করা হইয়াছে তাহার ২য় বার সম্প্রদান হইবে কিরূপে এবং যিনি একবার কুমারী বিবাহে অন্যকে সম্প্রদান করিয়াছেন তিনি আবার সেই দত্ত বস্তু পুনরায় অন্যকে দিতে পারেন কিরূপে ?

উত্তর ঃ—জীবিত নরনারীকে দান বা বিক্রয় করিবার স্বত্ব কাহারও নাই। পিতামাতা ইচ্ছা করিলেই নরমাংস ভক্ষক বা ব্যাধকে পুত্রকন্যা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না। পুত্রকন্যার দেহের উপর পিতামাতার কোনও স্বত্ব বা অধিকার নাই। তা থাকিলে জারজ সন্তানবধে মাতা আইন অনুসারে অপরাধিনী হইতেন না। কিন্তু তা নয়। সদ্যজাত অপোগণ্ড শিশু হত্যায় বা সন্তানকে নদীজলে নিক্ষেপে মাতার অধিকার নাই।

ঘোড়া গরু ছাগল যেমন দান বা বিক্রয় করা যায় পুত্রকন্যাকে তা কখনও করা যায় না। ক্রেতা বা দান-গ্রহীতা ইচ্ছামত এই সব প্রাণীকে বলি, হত্যা বা জবাই করিতে পারে—তাহাতে দাতা বা বিক্রেতার মতামতের কোন অপেক্ষা বা অধিকার নাই। কিন্তু জামাতা কন্যার উপর পীড়ন করিলে তার বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ চলে এবং বিচারে নিগ্রহ করা প্রমাণিত হইলে স্বামীর ২।৪।৮ মাস বা ২।৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া থাকে। উৎপীড়িতা কন্যাকে পিতা স্বামীগৃহ হইতে আইন বলে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিতে পারে। কিন্তু পশুপক্ষী সম্বন্ধে এ সব কোন অধিকার নাই। বিক্রীতা প্রদত্তা ছাগীর, গাভীর বা অশ্বিনীর গর্ভজাত বৎস কখনও বিক্রেতা বা দাতা ফিরাইয়া পান না— বা পাইবার স্বত্ব থাকে না কিন্তু অপুত্রক পিতার দৌহিত্র মাতামহের সমুদয় সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকে।

এ সম্প্রদান শব্দের অর্থ একেবারে দান নহে, ইহার অর্থ পালন কর্তৃত্ব দান। হিন্দু শাস্ত্রে আছে স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের রক্ষণাধীন। কাজেই পিতা রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণপোষণ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া যৌবনে সেই রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ ও পালন কর্তৃত্ব ভার জামাতার উপর বা হস্তে অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই পালন-ভার-গ্রহণকারী জামাতা অকালে লোকান্তর গমন করিলে, পালন কর্ত্তা পিতা পুত্রাদি না জন্মিলে অগত্যা পুনরায় অন্য বরের হস্তে সেই ভরণপোষণ বিহীনা বা দত্তা কন্যাকে অর্পণ করেন, করিতে বাধ্য হন— ইহাই বিধবা বিবাহ। সম্প্রদান অর্থ পালন কর্তৃত্বদান—অন্য কিছু নয়।

আর এক কথা যাহার যাহা আছে সে তাই দান করিতে পারে—যাহার যাহা নাই সে কখনও তাহা অন্যকে দান করিতে পারে না। কন্যার

সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ জনকত্ব পিতৃত্ব, কন্যার উপর পিতার দাবী পিতৃত্বের। স্বামীত্বও নহে পতিত্বও নহে। পিতার নিকট কন্যার পিতৃত্ব (সম্বন্ধই) আছে স্বামীত্ব বা পতিত্ব নাই; কাজেই যাহার যাহা আছে সে তাহাই দিতে পারে, যাহা নাই তাহা দিতে পারে না। কন্যার উপর পিতার পিতৃত্ব সম্বন্ধ ও দাবী আছে; সে তাহাই মাত্র দান করিতে পারে; স্বামীত্ব বা পতিত্ব নাই কাজেই সে তাহা দান করিতে পারে না। সম্প্রদান অর্থ সম্যক প্রকারে দান বুঝাইলে বর কন্যার পিতাই হইত; পোষ্যপুত্র দানের মত। পুত্রের পিতা পুত্র দান করে, গ্রহীতা ও পুত্রত্বই (পুত্রত্ব সম্বন্ধই) পাইয়া পিতা হয়।

কাজেই কন্যাদান অর্থ কন্যাকে দেওয়া নহে কন্যার ভরণ পোষণত্ব বা **পালন কর্ত্তৃত্ব** দান।

গোত্রান্তরের খাঁটী কথা।

৩। প্রথম বিবাহের গোত্রান্তরিতা কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহেও পিতার গোত্রই উচ্চারিত হইবে)

এবারও সম্প্রদানের মত শাণ্ডিল্য গোত্রে জাত কন্যার বাৎস্য গোত্রে জাত পুত্রের সহিত বিবাহ হইলে কন্যার গোত্র (পিতৃবংশের পূর্ব্বতম পুরুষের নাম) কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তবে গোত্রান্তর বলে কি কি অর্থে? ঐ পূর্ব্বের ন্যায় পালন-ভরণ-রক্ষণ পোষণ কর্ত্তৃত্ব আজ হইতে বাৎস্য গোত্রজ শ্রীঅমুক বরের করে অর্পিত হইল। এ ভিন্ন গোত্রান্তর অর্থ পূর্ব্ব পুরুষের নাম একেবারে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বদলাইয়া যাইতে পারে না। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ৫০ পুরুষ নিম্নতম (অধস্তন) বংশে জাত কন্যার সহিত যদি শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৪০ পুরুষ অধস্তন বংশধরের বিবাহ হয় তবে পরদিন হইতেই কন্যার উর্দ্ধতন পুরুষের নাম রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে কখনও শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইয়া যাইতে

পারে না। বিবাহে কন্যার পিতৃপুরুষের বা পিতৃবংশের নাম পরিবর্তিত হইয়া অন্য পুরুষ বা অন্য বংশের নাম কখনও হইতে পারে না। শ্বশুরকে এবং শাশুরীকে পুত্রবধূ পিতৃ-মাতৃ তুল্য জ্ঞান করে এবং আজ কাল বহু শিক্ষিত গৃহে পুত্রের মতই পুত্রবধূ বাবা, মা, দিদি, পিসিমা, মাসিমা বলিয়া শ্বশুর, শাশুরী ননদ, পিসিশাশুরী ও মাসিশাশুরীকে সম্বোধন করিয়া থাকে; কিন্তু কেহ যদি পুত্রবধূর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ অথবা প্রবৃদ্ধ প্রপিতামহর নাম জিজ্ঞাসা করে, কোন্ বংশে জাত জিজ্ঞাসা করে বধূ নিজের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বা প্রবৃদ্ধ-প্রপিতামহর নাম এবং বংশের নামই উল্লেখ করে, স্বামীর পিতা বা পিতৃপুরুষগণের নাম বা বংশের উল্লেখ করে না। সে কারণ 'সাবর্ণ গোত্রজা (গোত্রে বা বংশে জাত কন্যা) কন্যার বিবাহের পরই ভরদ্বাজ গোত্রজা হইতে পারে না। কন্যার উদ্ধতন পিতৃপুরুষ যদি সাবর্ণ ঋষি হন তবে বিবাহের পরদিনই স্বামীর উদ্ধতন পিতৃপুরুষ ভরদ্বাজ হইয়া যাইতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও এই অর্থ যে: এতদিন কন্যা সাবর্ণ গোত্রজের পালনীয়া, রক্ষণীয়া, ভরণীয়া ছিলেন আজ হইতে (বিবাহের পর হইতে) কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রজ (গোত্রীয়, ভরদ্বাজ গোত্রে জাত—ভরদ্বাজ বংশীয়) পুত্রের বা বরের পালনীয়া, ভরণীয়া বলিয়া গণ্য হইলেন। সেই অর্থে কন্যার গোত্রান্তরিতা হওয়া। নতুবা বিবাহের পরই কন্যার উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষের নাম বদলাইয়া যাইতে পারে না।

বঙ্গীয় তেলীবৈশ্য সম্মিলনীর

কালনা অধিবেশন।

সভাপতি

শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ

অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি

শ্রীসন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(কালনা, বর্দ্ধমান)

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩

কলিকাতা

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

এক আনা।

মানবের জন্মগত অধিকার।

সমবেত প্রতিনিধিবর্গ, সজ্জনমণ্ডলী ও ভ্রাতৃগণ!

সকলে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। বিগত বিংশতি বর্ষ হইতে বঙ্গ ও আসামের অসংখ্য সভায় আহূত হইয়া নিপীড়িত ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে মানবের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার অর্জ্জনের বোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং ইহা অপেক্ষা বড় ব্রত আর নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সমাজে যাঁহারা যতদূর দলিত ও নির্য্যাতিত, অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত, অবমানিত ও অত্যাচারিত, তাঁহাদের জন্য আমার প্রাণও ততখানি বেদনাতুর—সহানুভূতিসম্পন্ন—মমত্বমাখা। তাঁহাদের আহ্বান—আমার নিকট দেবাশীর্ব্বাদেরই মত। সেই কারণে আপনাদেরও স্নেহের আহ্বান—আপনার জনের ডাকের মতই আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। আমার ব্যথাভরা শুষ্ক কণ্ঠের ক্ষীণ ধ্বনি যে আপনাদের কর্ণপর্য্যন্তও পঁহুছিয়া আপনাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—আপনাদের প্রাণেও মনুষ্যত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে—আমাকে ঠিক ভাইএর মত আপনার জন জ্ঞানে ডাকিবার বল ও সাহস—ভরসা ও দাবী জন্মিয়াছে দেখিয়া আমি মনে মনে নিজকে অতিশয় ধন্য ও সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছি। আমার এমন কি আছে—কোন্ গুণ আছে—যার জন্য ভিন্নবর্ণভুক্ত হইয়াও আপনারা আমাকেই সভাপতি রূপে আহ্বান করিলেন? আমার নিপীড়িত নর-নারায়ণপূজা যে গৃহীত হইয়াছে—ইহাতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত মস্তকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনাদিগকে

ধন্যবাদ দিতে গিয়া—আমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধকে খর্ব্ব করিতে চাই না—আপনারা সকলে আমার প্রাণভরা প্রীতি-সম্ভাষণ ও সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

তেইশ কোটি নরনারীসমন্বিত হিন্দুর সমাজ-তরণী জলধিমগ্নপ্রায়। মনস্বীবর্গ জীবন পণ করিয়া তরণী উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। আমরাও আরোহী। নৌকা নিমজ্জিত হইলে আমাদিগকেও ডুবিয়া মরিতে হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ—মহৎ ক্ষুদ্র, ধনী নির্ধন, সকলেরই একই দশা। সে কারণ ভারতব্যাপী উদ্ধার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দুগণই বাঁচিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী আমরা—বঙ্গদেশস্থ আর্য্য হিন্দু জাতির বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। বাঙ্গলার হিন্দু নরনারীর সংখ্যা দুই কোটি সাত লক্ষ—তন্মধ্যে শতকরা ছয় জন ব্রাহ্মণ, একজন বৈদ্য, ছয় জন কায়স্থ—ইঁহারাই তথা-কথিত ভদ্র ও উচ্চ জাতি; বাঁকি ষোল জন আচরণীয় এবং অবশিষ্ট সমুদয় অনাচরণীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে এই মুষ্টিমেয় নগণ্য ভদ্র জাতি—অগণ্য মানবপুঞ্জের প্রতি দারুণ অত্যাচার ও অমানুষিক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। যাহারা প্রতিদিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে স্বদেশবাসী, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি অবিচার করিয়া বিজাতি বিধর্ম্মী ও বিদেশীর কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে তখন অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ বিদ্রূপের হাসি না হাসিয়া পারেন না। যাহারা নিজেদের ভরণপোষণকারী রক্ষা-কর্ত্তা—সেবক ভ্রাতাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুই একটি সামাজিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত—তাহারাই চায় গোটা ভারতের স্বাধীনতার অধিকার! পাগলামী আর কাহাকে বলে? তাই সপ্ত শত বৎসরেও সেই ন্যায়বান্ বিচারপতি বিশ্বপতির আসন টলে নাই—প্রাণ গলে নাই। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যেমন উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন—এমন কোন্ দেশের কোন্ ঋষি কোন্ যুগাচার্য্য করিয়াছেন? কাহাদের কণ্ঠে জীব-

ব্রহ্মের অভেদ উক্তি—তত্ত্বমসী শিবোহং যত্র জীব তত্র শিব বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল? নর-নারায়ণ শব্দ সৃষ্টি করিয়া কাহারা ভাষাজননীর কণ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন? আর কাহারাই বা এমন করিয়া দুই পা দিয়া সমাজ শাসনের নিষ্ঠুর অজুগাতে কোটি কোটি নরনারী দলিয়া আসিতেছে। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক শব্দ সৃষ্টি করিয়া দিবারাত্র মানবপেষণ যন্ত্র অবিরাম গতিতে চালাইয়া আসিতেছে। আর তাহার ফল? ফল ত হাতে হাতে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর হস্তে পরাজয় ও লাঞ্ছনা—নির্য্যাতন ও অধীনতা স্বীকার! রবীন্দ্র নাথ সত্যই বলিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান।
অপমানে হ'তে হবে, তাহাদের সবার সমান॥"

কাদের ছোট, হীন, অস্পৃশ্য বলিতেছি আমরা, যাহাদের না হইলে এক দণ্ড চলিবার নয়, যাহাদের সেবা—হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমের উপর সমাজ-সৌধ টিকিয়া আছে, যাহারা যুগযুগান্তর হইতে বিদেশী অত্যাচারী শাসকগণের হস্ত হইতে—মান, ইজ্জৎ, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, যাহারা অন্নে, বস্ত্রে, খাদ্যে, পানীয়ে, শিল্পে, বাণিজ্যে, দেশবাসীর সেবা ও সহায়তা করিতেছে, নিজেরা সম্মান হারাইয়া উচ্চ জাতিগণের সম্মান বাড়াইয়া আসিতেছে—যুগযুগান্তর হইতে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার বিনিময়ে সহাস্য মূক মুখে নীরবে সেবা ব্রত চালাইয়া আসিতেছে—তাহারাই হইল কিনা ছোট লোক, ইতর লোক—অস্পৃশ্য? জানি না এই অবিচার, অন্যায় ও মানব-পীড়ন জননী জন্মভূমি আর কতকাল সহ্য করিবেন। সীমা যে ছাড়িয়াছে—অসহনীয় যে হইয়া উঠিয়াছে তাহার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। বঙ্গের দিক্ চক্রবাল আলোড়িত করিয়া—নিপীড়িত অগণ্য মানবপুঞ্জের জীর্ণ কুটীর হইতে 'অভ্যুত্থান কর', 'অভ্যুত্থান কর'—এই কঠোর বজ্রধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের অবাধ বিদ্যা প্রচার—

ছাপাখানা, সংবাদ পত্র—সমুদয় ভণ্ডামী, দুষ্টামী, কাপট্য, শাঠ্য—তুক তাক্ ভাঙ্গিয়া দিতেছে; বিংশ শতাব্দী সমুদয় অন্ধবিশ্বাস—লোকাচার, স্ত্রী-আচার, দেশাচার, অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছে। এই নবজাগ্রত যুগে আর মনু রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া সমাজ পীড়ন, সমাজ শাসন চলিবে না। এক দল মন্ত্রাস্ত্রবিদ্ নিমন্ত্রণ-ব্যবসায়ীর কথায় ও স্বার্থপরতায় অগণ্য মানব আর আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়া থাকিবে না, আর তাহারা কলির—কল্কি-নারায়ণগণের পা চাটিয়া—সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়া—পাদোদক খাইয়া—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া জন্ম জীবন ধন্য ও কৃত কৃতার্থ বোধ করিবে না। সে বর্ব্বর-যুগ অতীত হইয়াছে—মানব-দলনের বর্ব্বর প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। মানুষ যে কখনও মানুষের উপাস্য ভগবান্ নয়—এই সত্য দৃঢ় বিশ্বাস সকলের প্রাণে দিন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। একদল বংশানুক্রমে পায়ের ধূলি ও পাদোদক দিয়াই যাইবে—আর একদল খাইয়াই যাইবে—এসব ধর্ম্মাচার আর এ যুগে চলিবে না। অবশ্য রাম কৃষ্ণ জন্মমাত্রই রাবণ কংস ধ্বংস হয় নাই—সে জন্য কিছু সময় লাগিয়াছিল, বড় হইবার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও সভামধ্যে লাঞ্ছনার পাপের ফল তদ্দণ্ডেই দুঃশাসন দুর্য্যোধন লাভ করে নাই সত্য,—সেজন্য বনপর্ব্ব, বিরাটপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব লাগিয়াছিল। তারপর কুরুকুল নির্ম্মূল। শত-করা ৮০ জন যাহাদের স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জীবিকার জন্য অন্য বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবিকা মারিতেছে—আশ্চর্য্য ও পরিহাসের বিষয় এই যে সেই বৈশ্য শূদ্র যদি বিনিময়ে শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের বৃত্তি গ্রহণে অগ্রসর হয়—তখন মহা কোলাহল ধর্ম্ম গেল—ঘোর কলি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই এর অবধি থাকে না। তোমারা করিবে তাদের বৃত্তি লোপ আর তারা তোমাদের বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিলেই দোহাই দিবে শাস্ত্রের, স্বপ্ন দেখিবে ঘোর

কলির !! মজা ত মন্দ নহে ? সাহা সুবর্ণ বণিক তেলী নয়—শূদ্রের অন্নাহারে জলপানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির জাত্ যায়—সাহা নমঃশূদ্রজাতি ভুক্ত হইতে হয়—কিন্তু সাহা সুবর্ণ বণিক তেলী নমঃশূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের অন্ন পানীয় গ্রহণে কখনও ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে পারেনা। দেখা যাইতেছে কায়স্থ ব্রাহ্মণের অন্ন পানীয়ের কোনও ধক্ নাই—শক্তি নাই— মহিমা নাই—কিন্তু সাহা সুবর্ণ বণিক নমঃশূদ্র কৈবর্ত্তের অন্ন পানীয়ে অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান। আর এক কথা—এই সব অশুদ্ধ অস্পৃশ্য অনাচরনীয়গণের মন্দির প্রবেশে, ঠাকুর দেবতা স্পর্শে বিগ্রহদেব অশুদ্ধ হন—অস্পৃশ্য হন—অব্যবহার্য্য হন কিন্তু ইহারা দেবতার সংস্পর্শে আসিয়া দেবতা হয় না শুদ্ধ হয় না— পবিত্র হয় না। দেখা গেল দেবতা অপেক্ষা ইহাদেরই তাড়িৎ শক্তি অধিক। এই সব ছেলেমানুষেমি ও ভণ্ডামী আর বেশী দিন চলিবে না ইহা নিশ্চিত।

কতকগুলি জীর্ণ পুথির শ্লোক আওড়াইয়া আর মানবপেষণ কার্য্য অবাধে চলিবে না। প্রকৃত ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গে এখন স্বার্থপর নিমন্ত্রণব্যবসায়ীগণের স্বেচ্ছাকল্পিত বচন মিশিয়া উহাকে জগাখিচুড়ি করিয়া তুলিয়াছে। শাস্ত্রেরও সংস্কার করিতে হইবে—আসল শাস্ত্র হইতে ভেজাল শাস্ত্র কষিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

এদেশের বহু পণ্ডিতমূর্খের ধারণা ব্রাহ্মণগণ বিরাট পুরুষ ভগবানের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইতে, বৈশ্য ঊরু ও শূদ্র পাদ হইতে উদ্ভূত। শূদ্রকে "জঘন্য স্থান" হইতে উৎপন্ন বলিয়া—ছোট বলা হইয়াছে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম জঘন্য স্থানই বটে! এমন না হইলে কি আবার ঋষি। আমি বলি যদি ইহাই সত্য হয় তবে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পূজনীয় ও আরাধ্য,—কেন না—শ্রীপাদনিঃস্রিতা জাহ্নবী যখন ত্রিলোক আরাধ্যা দেবী। বস্তুতঃ এসব রূপক বর্ণনা

মাত্র। পুরাণকারগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন—ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। (পদ্মপুরাণ); একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির; ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) ইত্যাদি। অর্থাৎ আদি যুগে সৃষ্টির প্রথম কালে একবর্ণ মাত্র ছিল। সেই ব্রাহ্মণ কথিত একবর্ণ হইতে পরে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হয় এবং এইরূপে চতুঃর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। গায়ের জোড়ে বড় বলিলেই ত ন্যায় শাস্ত্র অনুসারে বড় হওয়া যায় না। ঋষিদের নামে আইন রচিয়া অন্য সকলকে ধীরে ধীরে বিদ্যা জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া এ দেশকে মূর্খের দেশে পরিণত করা হইয়াছে। শাস্ত্রের নামে যা তা লিখিয়া ও বলিয়া এদেশের কোটি কোটি নরনারীর মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হইয়াছে। সহস্র অন্যায় ও লক্ষ অনাচার করিলেও ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণই, আর অশেষ সৎগুণে ভূষিত হইলেও—ধর্ম্ম দয়া সত্য তিতিক্ষা ভক্তি ভূষণে অলঙ্কৃত হইলেও শূদ্র সন্তান শূদ্রই—ইহা আধুনিক অত্যাচারীগণেরই বিধান। ইহার মূলে কোন শাস্ত্র নাই,—শাস্ত্র থাকিতে পারেনা। কে না জানে বেশ্যা পুত্র বশিষ্ঠ, বেদব্যাস কৈবর্ত্তকন্যা গর্ভ-সম্ভূত, দাসীপুত্র নারদ,—শূদ্রাণী গর্ভ সম্ভূত মহামুনি কুশিক, সিন্ধু মুনি শূদ্রাগর্ভ সমুৎপন্ন; ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর পুত্র শুকদেব গোস্বামী; নাবিক কন্যা গর্ভসম্ভূত মুনি শ্রেষ্ঠ মন্দপাল—দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল; পরাশর ঋষি শ্বপাক (চণ্ডাল জাতীয়) কন্যার গর্ভজাত; ক্ষত্রিয় পুত্র বিশ্বামিত্র ঋষি, ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র ব্রাহ্মণ মিত্রয়ু; শিনির পুত্র গার্গ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অধিক দেখাইবার স্থানাভাব। গুণ কর্ম্ম ও বৃত্তি দ্বারা একই ব্রাহ্মণবর্ণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকার বলিতেছেন ইহারা পরস্পর জ্ঞাতিভ্রাতা। পরিতাপের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ এখন মানুষকে জ্ঞাতিত্বে বঞ্চিত করিয়া বিড়াল বেজি—কাক কবুতরকে জ্ঞাতিত্বে বরণ করিয়া

লইয়াছেন। এই সব পশুপক্ষী রান্না ঘরে গেলে, খাদ্যদ্রব্যে মুখ দিলে—রান্না ঘর ও খাদ্যদ্রব্য অশুচি অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য হয় না—কিন্তু শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ধরিত্রীর গৌরব মানুষ ঘরে গেলে ঘর—দেবতা—খাদ্যদ্রব্য, জলের কলসী পর্য্যন্ত অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া যায়। মানব পীড়ন আর কাহাকে বলে? আমি আপনাদিগকে সেই মানবোচিত অধিকার সমাজের নিকট কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে বলি। এইটাই আসল গোড়ার কথা। বালক বালিকাগণকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা রহিত করা—বিধবা বিবাহ প্রচলন,—উচ্চ শিক্ষা লাভ—বৈশ্যোচিত আচার অনুষ্ঠান, ১৫ দিন অশৌচ—ও উপবীত গ্রহণ, এসব উহার আনুষঙ্গিক ডাল পালা মাত্র।

সমাজের একজনকেও নিরক্ষর রাখা চলিবে না, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে সকলকে লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বয়স্কগণকেও বিদ্যার অধিকারী করিতে হইবে। একবেলা বা একদিন না খাইলেও বরং চলিতে পারে, কিন্তু পড়াশুনা ব্যতীত দিন কাটান অসম্ভব—এই ভাব সকলকে দিতে হইবে। বিদ্যা অন্ধের চক্ষু—খঞ্জের পদ, অসহায়ের সহায়, বান্ধবহীনের মিত্র;—বিদ্যা—অন্ধকার ভবনের আলোক—দিক্‌হীন পথিকের ধ্রুব নক্ষত্র,—বিদ্যা সর্ব্বস্ব,—দেহের রক্ত—মরণাহতের সঞ্জীবনী সুধা। বিদ্যা অভাবেই দেশ ও জাতির আজ এই শোচনীয় অধঃপতন। ধনবানগণের নিকট আমার অনুরোধ মহোৎসবের নামে—সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় নয়—অপব্যয় না করিয়া এই অর্থ সমাজ মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্যয় করুন। অন্নদান অপেক্ষা প্রাণদান বড়, প্রাণদান অপেক্ষা বিদ্যাদান বড় এবং বিদ্যাদান অপেক্ষা জ্ঞানদান বড়—শাস্ত্রকারগণের ইহাই মত। সমাজে বাল্য বিবাহের ফলে—বালিকা বধূ ও

শিশুহত্যার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অসংযত স্বামীনামক পরম-গুরুগণের অত্যাচারে নির্ব্বাক বধূগণ অকালে জননী হইতে বাধ্য হইয়া প্রতিদিন অকালে শমন ভবনে যাত্রা করিতেছে—ক্ষীণায়ু মাতৃহারা সন্তানগণ ২।৪।১০ মাস পরই মার কোলে ছুটিয়া যাইতেছে। অথচ এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—মনোযোগ নাই। বধূ, কন্যা ও শিশুহত্যার কারণ স্বরূপ,—দুর্বল ক্ষীণাঙ্গ স্বল্পশক্তি বংশধর প্রজননের হেতুস্বরূপ, বালবিধবাবর্দ্ধক এই বাল্য বিবাহ প্রথা সমাজ হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে। আর একপাপ—পণ প্রথা। পুত্রপণ ও কন্যাপণ উভয়ই মন্দ,—উভয়ই নরনারীর মর্য্যাদা হানিকর কুপ্রথা। পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠান এই অপবিত্র কুপ্রথায় কলুষকালিমায় লিপ্ত করিয়াছে। বহু বালিকা এই কুপ্রথার ফলে ধনবান—আতুর বৃদ্ধ ও রোগীর অঙ্কশায়িনী হইয়া—অকাল বৈধব্য যন্ত্রণা লাভ করিতেছে—অন্যপক্ষে বহু সচ্চরিত্র সুপুরুষ যুবক বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে একদিকে বিধবা অন্যদিকে অবিবাহিত যুবক দ্বারা সমাজ মধ্যে ব্যাভিচারের পথ প্রশস্ততর হইতেছে। বাল-বিধবা-গণের পুনর্ব্বিবাহের কথা উঠিলেই একদল অজ্ঞ ভণ্ড সমাজহিতৈষীর চক্ষু সতীত্ব হানির আতঙ্কে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। যাহারা নিজেরা ক্রমান্বয়ে ২য় তৃতীয় ও ৪র্থ বার পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মুণ্ডপাত করিতেছেন—সেই সব পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী পরিবেষ্টিত বুড়া বাঁদরগণই বেশী বিরোধী। (যে সব গৃহে পিতা, মাতা, খুড়া, জেঠা, ভাই, ভগিনীগণ ভোগবাসনা ও লালসা কামনার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন—সেই গৃহে ১৫।১৬।১৭ বর্ষ বয়স্কা কন্যা ও ভগিনী যে ব্রহ্মচারিণী সাবিত্রী তৈয়ার হইতে পারেনা—কামান্ধগণের এই মোটা কথাটা বুঝিবার শক্তি নাই। পবিত্র তপোবন ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী গড়িতে পারেনা। বল পূর্ব্বক ব্রহ্ম-

চারিণী তৈয়ার করিবার স্পর্দ্ধার ফলেই বঙ্গদেশে ১লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০৭ ও আসামে ২২ হাজার ৫১৯ জন বেশ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। বলপূর্ব্বক সাদা কাপড় পরান যায়—চুল কাটান যায়, শাঁখা সাড়ি কাড়িয়া লওয়া যায়—আতপ চাউল—কাঁচা কলা সিদ্ধাহারের ব্যবস্থা করান চলে—কিন্তু ইন্দ্রিয়দমন করান যায় না—ব্রহ্মচারিণী নির্ম্মাণ করা চলে না। প্রতিদিনকার ইন্দ্রিয়সেবী সমাজপতি অন্ধগণ কিরূপে বুঝিবে—ইন্দ্রিয় দমন ব্রত কত কঠিন। মুনি ঋষিগণ পর্য্যন্ত ললনাগণের বিলোল কটাক্ষে যে ক্ষেত্রে ধৈর্য্যহারা হইয়া পুত্র কন্যার জনক হইতে বাধ্য হইয়াছেন—সেই ইন্দ্রিয় জয় করিবে কিনা গৃহে অবরুদ্ধা কাম ভোগের লীলা ক্ষেত্রের অধিবাসিনী কয়েকটী বিধবা নারী? চিত্তজয় অত সহজ নহে। পুরুষগণের মধ্যে কয়টী ইন্দ্রিয়বিজয়ী বীরেন্দ্রপুঙ্গব আছেন। নিজেরা ব্রহ্মচর্য্যে ব্রত পালন না করিয়া পরস্মৈপদী ব্রহ্মচর্য্যের বড় বড় কথা মোটেই শোভা পায়না।) ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব সমাজেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় কালনার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল ভ্রাতাও আপনাদের তেলী সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া একটি বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। অন্ধ—অজ্ঞ—ও ভ্রান্ত সমাজপতিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার পরিবর্ত্তে একঘরে করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। আমি মনে করি অচিরেই সমাজপতি ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

১৯২১ সনের বঙ্গদেশের সেনসাস্ রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রতি সহস্র পুরুষে তেলী ভ্রাতাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ৯০১ জন। এই হিসাবে প্রতি সহস্র পুরুষে ৯৯জন কন্যা অভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। অপর দিকে ৪০ বর্ষ বয়স্কা বিধবা-গণেরও সন্তান হইতে পারিতেছে না। এই দুই পক্ষ হইতে বংশ বৃদ্ধির পথ

রুদ্ধ হওয়ায় সমাজে নরনারীর সংখ্যা দিন দিন ক্ষয় ও অল্প হইয়া আসিতেছে। ইহার আশু প্রতিকার করিতে হইলে অগৌণে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন একান্ত আবশ্যক।

তেলীজাতির ইতিবৃত্ত পুস্তকে তেলীগণ যে বৈশ্যদ্বিজ বর্ণান্তর্গত ইহা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ প্রয়োগে প্রমাণিত করা হইয়াছে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাইনা। প্রত্যেক শিক্ষিত তেলী ভ্রাতাকে ঐ পুস্তক আদ্যন্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি—এবং শক্তিতে কুলাইলে এই পুস্তকখানা সহস্র সহস্র ছাপাইয়া বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হৃদয়বান্ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে দিবার ব্যবস্থা করুন। নিজেরা বৈশ্যোচিত আচার ব্যবহার,—উপবীত ও ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করুন। যদি না পারেন—অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া যদি সত্যই আপনাদের প্রতি বিশ্বাস না জন্মে—তবে সাহসী তেজস্বী যুবকগণকে নেতৃত্বের আসন দিয়া নিজেরা পশ্চাতে সরিয়া পড়ুন। আমরা দেখিতেছি দুর্ব্বল ভীরু সাহসহীন বীর্যহীন অবিশ্বাসী—কুসংস্কার ও গতানুগতিকের দাস নেতাদের অপরাধেই জাতি অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সেনাপতিদের দোষেই বার বার যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতেছে। মুখেও বলিবে—আমরা বৈশ্য ক্ষত্রিয়—আর আচরণ করিবে অধম দাস শূদ্রদের মত। এই সব মনমুখভিন্ন দুর্ব্বলচেতা নেতারা সরিয়া পড়ুন। ধন ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি নেতৃত্বের একমাত্র মাপকাঠি নহে—নেতৃত্বের বড় উপাদান জাতির প্রতি অগাধ প্রেম—দীনতম ভ্রাতাদের জন্য অসীম স্নেহ ও সহানুভূতি—সর্ব্বস্ব ত্যাগ। এই পুণ্যভূমি ভারতে রাজচক্রবর্ত্তীগণ কখনও সমাজ নেতৃত্ব করেন নাই—করিয়াছেন—সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ—বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ—শ্রীগৌরাঙ্গ। সেই জন্যই বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা—মহাত্মা গান্ধি। আমি বঙ্গদেশস্থ সমুদয় তেলী ভ্রাতৃগণকে যোগী বৈদ্য কায়স্থ—রাজবংশী কোচ হৈহয় ক্ষত্রিয় ভ্রাতাদের

ন্যায় অগৌণে বৈশ্যদ্বিজোচিত উপবীত আদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

অতঃপর চারিশ্রেণী বা থাকের মধ্যে পরস্পর মিলন ও আদান প্রদানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যত সত্বর সম্ভব—চারিশ্রেণীর বুদ্ধিমান নেতৃবৃন্দ দ্বিধামাত্র না করিয়া খাওয়া দাওয়া ও কন্যা দান আরম্ভ করুন। তেলী তেলীকে কন্যা দিবে না? সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে কি ছিল জানেন কি? তখন নিয়ম ছিল—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের কন্যা, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের কন্যা, বৈশ্য—বৈশ্য শূদ্রের কন্যা এবং শূদ্র শূদ্রের কন্যা অবাধে বিবাহ করিতেন। আপনারা ত নিজেদের কন্যাই নিজেরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না—কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অসবর্ণ বিবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত সামান্য ও ছোট কথা—ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতেছে—যে দিন ২৩ কোটি আর্য্য হিন্দু জাতি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের অন্নজল ও কন্যা গ্রহণ করিবে। ইহা ভিন্ন এই মরণোন্মুখ জাতির বাঁচিবার উপায় নাই। বিবাহের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে— ভগিনী মাসি পিসির সঙ্গে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যা ও বর পণের অত্যাচারে—বর কন্যাগণের উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়সে—বিবাহ হইতে পারিতেছে না। বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইলে এই কুপ্রথা আপনা আপনি তিরোহিত হইয়া যাইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে আসিয়া দেশের কাজ যে ভাবে সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ১। জাতিভেদের আবর্ত্ত ধ্বংস করিয়া, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তন করাই প্রথম নির্দ্দেশ ছিল। (প্রবর্ত্তক—পৌষ ১৩৩২)

শারীরিক বলচর্চ্চা।—অকৃষিজীবী দুর্ব্বল হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি চর্চ্চার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এখন শরীরে বল, বাহুতে শক্তি—বুকে তেজ—বজ্রদৃঢ় মুষ্টি সঞ্চয় করিতে না পারিলে পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগের সম্ভাবনা—পদে পদে—নারীর অমর্য্যাদা ও মন্দিরের অপবিত্রতার

সম্ভাবনা। ভারতবাসী যে আজ এরূপ অধঃপতিত—তাহার মুখ্য কারণ তাহার শক্তি সাধনার অভাব। "শক্তিহীন হইলেই সব কিছু মৃত্যুর খোরাক হয়।" ৺ অশ্বিনী দত্তকে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"গীতা উপনিষদ্, বেদ আমি তুচ্ছ করি, যদি ইহা শক্তিসাধনার অন্তরায় হয়।" স্মরণ রাখিবেন—এই পৃথিবীতে শক্তিহীনের বাঁচিয়া থাকিবার তিল মাত্র স্থান নাই। শক্তিহীন সমাজ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর তুল্য অভাগা। নীরবে সমস্ত অপমান হজম করা ব্যতীত দুর্ব্বলের আর কোন উপায় নাই। বলবানের এক ধমক অত্যাচারীর মাথা গুলাইয়া দেয়, বুকে ভয় আনে—ভবিষ্যৎ অত্যাচারে বিরত করে। এই যে যুগযুগান্তর হইতে বলবান্ নয়—দুর্ব্বল ভীরু দাসত্বভারে পীড়িত—মেরুদণ্ড ভগ্ন—সমাজপতিগণ নির্ব্বাধায় কোটি কোটি নরনারীর উপর অত্যাচার ও অবিচার করিয়া আসিতেছে—ইহারও মূলে ঐ শক্তিহীনতা—শারীরিক বল চর্চ্চার অভাব। এই সুদীর্ঘ অতীতের শত সহস্র অনাচার অত্যাচার নীরবে ইহারা সহিয়াছে—কিন্তু একজনও একটা অনাচার করিতে পারে নাই। পারিলে এই অনাচার কোন্ দিন বন্ধ হইয়া যাইত।

বলিবার বহুকথা থাকিলেও সময় অল্প। সভার অন্য বহু প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। তাই এক্ষণে উপসংহার করিতে চাই। আমি আজ ২০ বৎসর যাবৎ সারা বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছি। আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহা শুধু আপনাদের আমন্ত্রণে নয়—আমি হয়ত না ডাকিলেও আসিতাম—এবং ভবিষ্যতেও আসিব। যত দিন এ জাতির প্রত্যেক প্রাণে মনুষ্যত্ব বোধ উদ্বোধিত না হয়—তাবৎ এই ভাবেই ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জীবন পাত করিব। এ ভিন্ন অন্য কামনা নাই—অন্য ভাবনা নাই। আপনারা সভাতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা কি আমাকে শুধু চোখের দেখা দেখিতে আসিয়াছেন—না আমার বাণী মাত্র

শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন। যদি তাই হয়—তবে আমার সমস্তই ব্যর্থ—আসাও ব্যর্থ, বলাও ব্যর্থ। এই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে এমন কে কে আছেন—যাঁহারা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া হউক—আংশিক ভাবে হউক, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা হউক—অবসর মত হউক—কে কি ভাবে আমার এই মনুষ্যত্ব বোধ উদ্বোধনের অভিযানে—এ জাতির সাহায্য করিতে চান—তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলুন ও লিখিয়া দিন। নতুবা আমি ছাড়িব না। আমি শুধু নিমন্ত্রণ খাইতে আসি নাই—অথবা বায়না লইয়া বক্তৃতা করিতে আসি নাই—আমি আসিয়াছি—আপনাদের মোহ ঘুম ভাঙ্গিতে,—অত্যাচারিগণের অত্যাচার অবিচার হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে—আপনাদের মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে,—জ্ঞান ও কর্ম্মে, ধর্ম্মে ও বীরত্বে—মহিমায় ও বীর্য্যে—ভূষিত করিতে। ধনবানগণের প্রতি আমার অনুরোধ—তাঁহারা একজন পিতা বা মাতার মুক্তির জন্য—দারুণ যমকিঙ্করগণের কঠোর পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করিতেছেন কিন্তু এ দিকে যে জাতির লক্ষ লক্ষ পিতা মাতা নিমন্ত্রণব্যবসায়ী সমাজপতি যমদূতগণের হস্তে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টা অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিতেছে,—পরলোকে নহে—ইহ লোকেই যমযাতনা ও যমদণ্ড ভোগ করিতেছে সে দিকে আপনাদের লক্ষ্য নাই—অর্থ ব্যয়ে প্রবৃত্তি নাই। দিঘী সরোবর পুকুর পুষ্করিণী খনন,—রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ,—হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ—বিগ্রহ স্থাপনে পুণ্য আছে, ধর্ম্ম আছে, পরলোকের মঙ্গল আছে—কিন্তু ইহাতে জাতির মুক্তি নাই—জাতির উদ্ধার নাই। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে—দুর্ভিক্ষে অন্নদানে, সেবাশ্রম স্থাপনে, ঔষধ দানে—গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণে বাঁচাইতে পারা যাইবে না। সপ্ত শত বৎসরে ৩৭ কোটি ক্ষয় হইয়াছে—এই অনুপাতে ইহার পরমায়ু আর ৪২০ বৎসর মাত্র। যে সম্প্রদায়ের

অন্নজলে আপনাদের দেহ পরিবর্দ্ধিত,—যে মাতৃজাতির বক্ষসুধা পানে আপনারা জীবিত তাহার প্রতি কি আপনাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই? পত্রিকাখানিকে সত্বর মাসিকে পরিণত করার একান্ত দরকার—একজন বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা মনুষ্যত্ব জাগানের ব্যবস্থা করাও দরকার—তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুড়িয়া সভা সমিতি করিবেন—চাঁদা ও গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন।

কে আছ মায়ের বীর সন্তান—সে অগ্রসর হও,—আমি তাহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিব। যাহাতে সমাজমাতা ও দেশজননীর সমস্ত দুঃখ দৈন্য শোকতাপ অপমান লাঞ্ছনা দূরীভূত হইয়া আবার পূর্ব্ব গৌরবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তজ্জন্য আসুন আমরা জীবন পণ করি। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে উভয়েই তুল্য পাপী, সমান অপরাধী। যুগ যুগান্তর মানবের উপর মানবের এই অস্বাভাবিক অমানুষিক পীড়া ও লাঞ্ছনা, ঘৃণা ও অবমাননা—চলিতে পারিত না যদি নিপীড়িতগণ ইহা নীরবে নির্ব্বাধায় নির্ব্বাকে সহ্য না করিত। অত্যাচারীগণই যদি সংখ্যায় ১২ আনা হইয়া আপনারা চারি আনা হইতেন—তাহা হইলেও ভীতির কারণ ছিল না—সহস্রে ১ জন থাকিলেও আশঙ্কার কিছু ছিল না, কেননা "যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ ক'রে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানেন? সহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ ক'রে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে।" দিগন্ত-ব্যাপী বিশাল অরণ্যানি—লৌহ নির্ম্মিত কুঠারকে নিজেরাই আছারীরূপে, সাহায্য না করিলে কার সাধ্য অরণ্য ধ্বংস করিতে পারে—কাটিয়া কাটিয়া সমস্ত বন জঙ্গল নিঃশেষ করিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? কিন্তু বঙ্গের নিপীড়িত জাতিদের সংখ্যা ত মুষ্টিমেয় নহে বরং ৪ ভাগের ৩ ভাগ। অথচ ইহারাই নির্ব্বাধায় সামাজিক অবিচার, মুষ্টিমেয় অভিজাত বর্গের হাতে ভোগ করিয়া চলিয়াছে। আমি বেশী চাইনা—সহস্রের

মধ্যে একজন মাত্র মানুষের মত মানুষ চাই—সন্তানের মত সন্তান চাই, বীরপুত্র চাই,—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চাই। জগতে এমন কোন বাধা নাই, আভিজাত্যের দুর্গে এমন কোন অস্ত্র নাই যাহা নির্ভীক বীরের গতিরোধ করিতে পারে—কিম্বা ধ্বংস করিতে পারে। সাধনার বলে পৃথ্বীতলে অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে। কায়মনবাক্যে যদি আপনারা সত্যই সমাজজননীর দুঃখ মোচনে সঙ্কল্প-বদ্ধ হইয়া থাকেন,—ইহা যদি লোক দেখান বার্ষিক রীতি মাত্রই না হয়—যদি আপনারা সামাজিক পীড়নে—ও স্বজাতির দুঃখ দৈন্য মোচনে সত্যই হৃদয়ে উন্মাদনা বোধ করিয়া থাকেন, তবে ধন, বিদ্যা, সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হউন, শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষিত হইবেই হইবে—জাতি জাগিবেই জাগিবে। বন্দেমাতরম্।

সমাপ্ত